উদ্বোধন

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০-০০৩

মাঘ, ১৩৮২
৭৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৮তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ২৫৲ টাকা এয়ার মেল-এ ৯০.০০ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায়, এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥০টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭৮তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮২ হইতে পৌষ, ১৩৮৩ ; ইংরেজী : ১৯৭৬)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী ধ্যানানন্দ
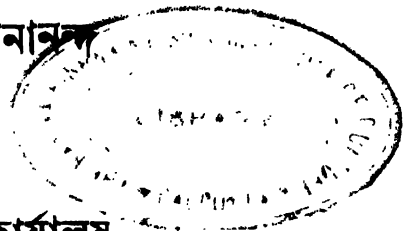
উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০-০০৩

বার্ষিক মূল্য ১২.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৭৮তম বর্ষ

(মা   ১৩৮২ হইতে পৌষ, ১৩৮৩)

চিত্রসূচী ঃ

দিব্য বাণী

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণব-
মহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ-
প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল॥

—শঙ্করাচার্য: বিবেকচূড়ামণি, ৩৭,৩৮

ঋতুরাজ যথা অযাচিতভাবে কত শত তরুবরে
কিশলয়দলে নব ফলফুলে শোভায় ভূষিত করে,
তেমনি মহান শান্ত সাধুরা আপন সাধনবলে
নিজে তরি' ঘোর ভবপারাবার তারিতে আর্তদলে
অহেতুকৃপায় নবীন চেতনা জাগাতে, উজ্জীবিতে—
ভক্তি-মুক্তি-জ্ঞান-ফল দিতে বিরাজেন ধরণীতে।

এই তো স্বভাব মহাত্মাদের, পরদুখ দূর করা—
তাপিত জীবের লাগিয়া আপনি করুণায় দেন ধরা,
রবির প্রখর কিরণনিকরে তাপিত এ বসুধায়
সুধাকর যথা শীতলতা ঢালে অযাচিত জোছনায়।

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ ও উদ্বোধনের নববর্ষ

অতীতকালে মহাশক্তিধর বামদেবাদি ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে যদি তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূনশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণও বাহ্য ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করিয়া—ব্রহ্মজ্ঞানের এই অপরিহার্য সাধন অবলম্বন করিয়া—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে কোনও তারতম্য ঘটিবে না। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান চিরদিন সকলেরই পক্ষে সমান। কথাগুলি বলিয়াছেন আচার্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে।

ব্রহ্মজ্ঞানে তারতম্য না থাকিলেও শক্তিতে তারতম্য অবশ্যই আছে—তারতম্য আছে হৃদয়বত্তায় সহমর্মিতায় পরদুঃখকাতরতায়। শ্রীমা সারদাদেবী বলিয়াছিলেন: ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, কিন্তু শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিল-দরিয়া লোক ভূ-ভারতে নেই। নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় সর্বভূতে এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন স্বামী সারদানন্দ। তাঁহার বিশাল হৃদয়ের কথাও তাঁহার জীবন-চরিতের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে হৃদয়বত্তায় তাঁহার অপেক্ষাও বড়, ইহা অন্তর্যামিণী শ্রীশ্রীমায়েরই উক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণও সকলেই এই বিষয়ে একমত। স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে আবু পাহাড়ে যে-পত্র লেখেন, তাহার একাংশ স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট প্রায়ই উত্থাপন করিতেন—কথাগুলি এতই মর্মস্পর্শী: 'জগদ্ধিতায় বহুজনসুখায় হচ্ছে ধর্ম, আর নিজের জন্য যা করা যায় সবই অধর্ম।' ব্রহ্মানন্দজী বেলুড় মঠে সাধুসভায় আবেগভরে বলিয়াছিলেন: 'উঃ! কি ভয়ানক কথা বল দেখি! এ-কথার কি মূল্য আছে!'

প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন: 'হরি ভাই, এত তপস্যাদি করলুম, তবু ধর্ম-টর্ম তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। তবে দেখছি, ভারত-ভ্রমণ ক'রে আমার heart (হৃদয়) খুব বেড়ে গেছে। দেশের দীন-দুঃখীদের জন্য প্রাণটা কাঁদছে। সকলের জন্য খুব feel (সমবেদনা অনুভব) করছি। তাই আমেরিকায় যাচ্ছি। দেখি, এদের জন্য সেখানে কি করতে পারি।'

আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী একদা বলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। কিন্তু স্বামীজী তখন এতই গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া বারাণ্ডায় পায়চারি করিতেছিলেন যে, পাছে তাঁহার চিন্তায় বাধা পড়ে এই আশঙ্কায় স্বামী তুরীয়ানন্দ নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটু পরে স্বামীজী সাশ্রুনয়নে মীরা-বাঈ-এর একটি বিখ্যাত গীত আরম্ভ করিলেন। নিজের হাত-দুইখানিতে মুখ লুকাইয়া রেলিং-এ ভর দিয়া বিষাদভরে গাহিলেন, 'দর্দ ন জানে কোঈ…ঘায়ল কা গত ঘায়ল জানে, ঔর ন জানে কোঈ'—এই বিষণ্ণসঙ্গীতে সমস্ত আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্বামীজীর আর্তিভরা স্বরলহরী গুরুভ্রাতারও হৃদয়ে তীব্র বেদনার সঞ্চার করিল এবং তিনিও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, জগতের আর্ত নিপীড়িত শোষিতদের দুঃখে অপার সহানু-

ভূতিতেই স্বামীজীর এই মর্মবেদনা।

উল্লিখিত বলরাম মন্দিরেই একদিন স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সায়নভাষ্যসহ ঋগ্বেদ পড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কুশলপ্রশ্নাদি ও বেদসম্পর্কিত কিছু কথাবার্তার পর গিরিশবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন: হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে?

সমাজের বিভীষিকাপূর্ণ চিত্রগুলি গিরিশবাবু একের পর আর উপস্থাপিত করিতে থাকিলে স্বামীজী অশ্রুসংবরণ করিতে না পারিয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। গিরিশবাবু শরচ্চন্দ্রকে বলিলেন: দেখ্‌লি কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখ্‌লি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হওয়ায় স্বামীজীর বেদবেদান্ত সব উড়ে গেল।

'কন্যাকুমারী-মন্দিরতলে হে যতি, কে তুমি শিলাসনে/ঝর ঝর ঝরে করুণার ধারা যুগল কমল-নয়নে'—ভক্ত গায়ক-গীতিকারের হৃদয়োৎসারিত সঙ্গীতের বাণীও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। মনে পড়ে আমেরিকায় প্রসিদ্ধ ধনীর আতিথ্যে ইন্দ্র-পুরীসম প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত স্বামীজী ভারতের দুঃখদুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া গভীর বেদনায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে শয্যা-ত্যাগ করিয়া কক্ষতলে পড়িয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মনে পড়ে যে-মঠ স্থাপনের জন্য—তাহাও অপরদেরই জন্য, নিজের জন্য নহে—বৎসরের পর বৎসর তাঁহার চিন্তার অবধি ছিল না, যাহার জন্য বিদেশে বক্তৃতাদি করিয়া ও ভক্তের নিকট ভিক্ষা করিয়া প্রাণপাত শ্রমে তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই বেলুড় মঠের জন্য ক্রীত নূতন জমি পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় প্লেগ-মহামারী দেখা দিলে অম্লানবদনে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন—বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা রোগীদের সেবা করিবার জন্য।

বস্তুতঃ এই বিশাল হৃদয়ই ছিল স্বামীজীর সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূলে। নেতা হিসাবে তিনি যাঁহাদের কর্মে অনুপ্রাণিত করিতেন, তাঁহাদেরও এই হৃদয়বত্তার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে নির্দেশ দিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি পত্রে স্বামীজী লেখেন: 'It is the heart, the heart that conquers, not the brain.'—হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক নহে। নিবেদিতাকে লেখেন: ''আমি দেখতে পাচ্ছি আর আমার চিরকালের ধারণাও ছিল তাই যে, হৃদয়—শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারা যায়।'

স্বামীজীর বিশাল হৃদয়ের নিকট স্বদেশ বিদেশ বলিয়া কিছু ছিল না। যাহার যাহা অভাব—ব্যষ্টির বা সমষ্টির, স্বদেশের বা বিদেশের—তাহা মিটাই-বার জন্য তাঁহার হৃদয় সর্বদা ব্যাকুল হইত। উচ্চতম ভাবসমূহের প্রচারের দ্বারাই বিশ্বমানবের মহত্তম কল্যাণ সম্ভব—ইহা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার গুণে বুঝিয়াছিলেন। কি করিয়া তাহা কার্যে রূপায়িত করিবেন, সে বিষয়ে তিনি সর্বদাই চিন্তা করিতেন। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক ছিল।

স্বামীজী জানিতেন ভাবপ্রচারের ব্যাপারে

পত্র-পত্রিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এইজন্য ভারতে এবং পাশ্চাত্যেও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিবার কথা তিনি ভাবিতেন—ইহা তাঁহার পত্রাবলী পাঠে জানিতে পারা যায়। নিদ্রিত ভারতকে প্রবুদ্ধ ও উজ্জীবিত করিবার জন্য স্বামীজীর অন্তরে যে-সকল পরিকল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, সেগুলির মধ্যে ইংরেজীর অতিরিক্ত ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সাময়িক পত্রিকার প্রবর্তন অন্যতম। তাঁহার জীবৎকালে মাদ্রাজ হইতে প্রথমে ইংরেজীতে 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং পরে কলিকাতা হইতে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে তাঁহার অমোঘ ইচ্ছার ফলশ্রুতি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়ম্' (তামিল), 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভা' (তেলেগু), 'জীবন-বিকাশ' (মারাঠি), 'প্রবুদ্ধ কেরলম্' (মালয়ালাম) ও 'বিবেকজ্যোতি' (হিন্দী) পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় এবং অদ্যাবধি ভারতের সর্বত্র উচ্চতম চিন্তারাশির বিকিরণে সহায়তা করিতেছে।

'উদ্বোধন' প্রকাশিত হইবার চার বৎসরেরও পূর্ব হইতে পত্রিকাটির জন্য স্বামীজীর ভাবনার অন্ত ছিল না। নিজ গুরুভ্রাতৃগণকে তিনি পত্রিকাটির সম্পর্কে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত স্বামীজীর একটি পত্রে আছে: 'সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নেই।' চিঠিখানি পড়িয়া প্রথমতঃ মনে হয় উদ্বোধন পত্রিকাটির প্রকাশের পরিকল্পনা 'সারদা'র অর্থাৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের। পত্রটিতে কোনও তারিখ নাই, শুধু সালের উল্লেখ আছে। তাহাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, কারণ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-এর একটি পত্রে দেখা যায় স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে 'আদ্ধেক বাংলা আদ্ধেক হিন্দী'তে একটি পত্রিকা এবং সম্ভব হইলে আর একটি পত্রিকা ইংরেজীতে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। সুতরাং পরিকল্পনাটি যে মূলতঃ স্বামীজীরই এবং ব্রহ্মবাদিনের ক্ষেত্রে যেমন চিরনমস্য আলাসিঙ্গা পেরুমল স্বামীজীর সঙ্কল্প কার্যে রূপায়িত করিতে অগ্রণী হইয়াছিলেন, উদ্বোধন পত্রিকার ক্ষেত্রেও মহাশক্তিধর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তেমনই অগ্রণী হইয়াছিলেন—মনে হয় ইহাই প্রকৃত তথ্য। উদ্বোধন প্রকাশের জন্য অর্থভিক্ষা করা (পত্রে মিস ম্যাকলাউডের নিকট), নানাভাবে নির্দেশ দেওয়া, এমন কি পত্রিকাটির জন্মের বৎসরাধিক কাল পূর্বেই অসুস্থ শরীরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার জন্য প্রবন্ধ লেখা, পত্রিকাটির নামকরণ, প্রকাশের পর লেখকদের উহার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতে উৎসাহিত করা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার স্বামীজী করিয়াছিলেন। এইভাবে বহু বাধাবিঘ্নের পর উদ্বোধনের জন্ম হইল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি—১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ।

স্বামীজীর বিরাট হৃদয়ের অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষরবাহী 'উদ্বোধন'-পত্রিকা এই মাঘে ৭৮তম বর্ষে পদার্পণ করিল। যে হৃদয়বত্তা, যে নিঃস্বার্থপরতা, যে সেবাবুদ্ধি স্বামীজী আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত করিতে সমগ্র জীবন আপ্রাণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন—নববর্ষের প্রারম্ভে প্রার্থনা করি তাহা আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক; উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অদ্ভুত ধৈর্য কষ্টসহিষ্ণুতা কঠোরতা ও ত্যাগ-তপস্যার সমুজ্জ্বল আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। কাহারও একক শ্রমে এই জাতীয় কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। রচনায় মুদ্রণে গ্রহণে পঠনে বিজ্ঞাপনদানে নানাভাবে বহু ব্যক্তি একটি পত্রিকার সহিত

সংশ্লিষ্ট থাকেন। ইহার সাফল্যের জন্য সকলেরই সহযোগিতা পূর্ববৎ অব্যাহত থাকুক--ইহাই আমরা কামনা করি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সকলেরই অন্তরে সঞ্চারিত হউক--ভগবচ্চরণে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নববর্ষের এই শুভদিনে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমাদের হৃদয়ের প্রীতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই--সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : এবং জগদুৎপত্তিং পরমাত্মনঃ উক্ত্বা তস্য জগৎস্থিতিহেতুত্বম্ অপি আহ, **যেন পিনদ্ধম্** ইতি। **পুনঃ** পশ্চাৎ **যেন** পরমাত্মনা এতৎ জগৎ **ইত্থং** বর্ণাশ্রমাদিভেদেন **পিনদ্ধং** সুদৃঢ়ং বদ্ধম্ ইতি অর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়' (বৃঃ উঃ ৪।৪।২২) ইতি। অস্যাঃ চ অয়ম্ অর্থঃ—এষ* স বা এষ মহানজ ইতি উপক্রম্য সর্ববশিত্বেন সর্বেশ্বরত্বেন চ উক্তঃ প্রকৃতঃ পরমাত্মা সেতুঃ ইব সেতুঃ। সেতুসাম্যম্ এব আহ, এষাং লোকানাং ভূরাদিভেদেন দেব-তির্যগাদি-মনুষ্যভেদেন বর্ণাশ্রমাদিভেদেন চ ভিন্নানাং ভূতানাং চ অসংভেদায় অসাংকর্যায় বিধরণঃ বিধারয়িতা। যথা লৌকিকসেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদাং তত্রত্যজলানাং চ অসাংকর্যায় বিধারয়িতা তদ্‌বৎ ইতি। **যেন ব্যাপ্তম্** ইতি। **যেন** চ অধিষ্ঠানভূতেন সর্বং জগৎ আকাশেন ইব **ব্যাপ্তম্** অন্তর্বহিঃ পূর্ণম্ ইতি অর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥' (নারাঃ উঃ ১৩।১) ইতি। সর্বব্যাপকত্বে হেতুঃ—নারায়ণঃ ইতি। নরাৎ পুরুষাৎ উৎপন্নানি সর্বাণি জগন্তি নারাণি, তেষাম্ অয়নম্ অধিষ্ঠানম্ ইতি অর্থঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্।

অনুবাদ : এইরূপে পরমাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি বলিয়া তাঁহার জগৎ-স্থিতির কারণত্বও (আচার্য) বলিতেছেন—**যেন পিনদ্ধম্**]

পুনঃ—পশ্চাৎ (জগৎ সৃষ্টির অনন্তর) **যেন**—যে পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ **ইত্থং**—বর্ণাশ্রমাদিভেদে **পিনদ্ধম্**—সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ (বিধৃত) হইয়া রহিয়াছে, ইহাই অর্থ। [এ বিষয়ে শ্রুতি—'এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়'। এই শ্রুতির ইহাই অর্থ : সেই এই মহান্

* মূল শ্রুতিতে প্রথমের এই "এষ" শব্দটি নাই, এখানেও থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

অজ—মহান্ এবং জন্মরহিত—এইরূপে (বর্ণনা) আরম্ভ করিয়া 'সর্ববশিত্বেন' অর্থাৎ সকলের নিয়ন্তৃ-রূপে এবং 'সর্বেশ্বরত্বেন' অর্থাৎ সকলের ঈশ্বররূপে বর্ণিত প্রকরণে প্রস্তাবিত পরমাত্মাই যেন একটি সেতু। (শ্রুতি-) প্রসিদ্ধ সেতুসহ (পরমাত্মার) সাদৃশ্যও বর্ণনা করিয়াছেন—লৌকিক সেতু (আল) যে প্রকার বিভিন্ন ক্ষেত্রসম্পদের অর্থাৎ শস্যের এবং ক্ষেত্রস্থিত জলরাশির অসাংকর্যের জন্য অর্থাৎ মিশ্রিত না হওয়ার জন্য বিধারক হয় অর্থাৎ বিভাজকরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ এই ভূরাদি লোক-, দেবতির্যক্ মনুষ্যাদি- ও বর্ণাশ্রমাদি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সকলের অসম্ভেদ, অর্থাৎ অসাংকর্য অর্থাৎ অমিশ্রণের নিমিত্ত (পরমাত্মা) বিধারয়িতা (অর্থাৎ সকলকে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।)।]

যেন ব্যাপ্তম্ : যেন—অধিষ্ঠানভূত যাঁহার দ্বারা সর্ব জগৎ আকাশের ন্যায় **ব্যাপ্তম্**—অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহাই অর্থ। [এবিষয়ে শ্রুতি—'সমস্ত জগতে যাহা কিছু দৃশ্যমান এবং শ্রূয়মাণ হয়, আন্তর এবং বাহ্য, সেই সমস্ত বস্তু পরিব্যাপ্ত করিয়া নারায়ণ অবস্থিত।' 'নারায়ণ'—এই শব্দের দ্বারাই তাঁহার সর্বব্যাপকতা বলা হইয়াছে। ('নারায়ণ'-শব্দের অর্থদ্বারাই ইহা প্রতিপাদন করা হইতেছে—) 'নর' বা পুরুষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সর্ব জগৎকেই বলা হয় 'নার', তাহাদের অয়ন বা অধিষ্ঠানই নারায়ণ।* (উদ্ধৃত শ্রুতির) অন্য অংশ স্পষ্টার্থ।

* 'নারায়ণ'-শব্দের ব্যাখ্যা গীতার শাংকর-ভাষ্যভূমিকার টীকায় আনন্দগিরি এইভাবে করিয়াছেন: আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ইতি স্মৃতিসিদ্ধঃ স্থূলদৃশাং নারায়ণ-শব্দার্থঃ। সূক্ষ্মদর্শিনঃ পুনরাচক্ষতে—নর-শব্দেন চরাচরাত্মকং শরীরজাতম্ উচ্যতে। তত্র নিত্য-সন্নিহিতাঃ চিদাভাসাঃ জীবাঃ নারাঃ ইতি নিরুচ্যন্তে। তেষাম্ অয়নম্ আশ্রয়ো নিয়ামকঃ অন্তর্যামী নারায়ণ ইতি।

কঠোপনিষৎ-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

নচিকেতাকে যমরাজ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করবেন। তার আগে নানা প্রলোভন দিয়ে তাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। উদ্দেশ্য—পরীক্ষা করে দেখা যে, নচিকেতা সমস্ত প্রলোভনকে অতিক্রম করে আত্মতত্ত্বে মন স্থির করতে পারবেন কিনা। যখন পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, নচিকেতা যোগ্য অধিকারী, তখন যমরাজ নচিকেতাকে অজস্র প্রশংসা করলেন—তাঁর ত্যাগের জন্য, তাঁর ধীমত্তার জন্য, তাঁর অধিকারের বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং শেষকালে বললেন:

'ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা'

(কঠ ১।২।৯)

—নচিকেতা, তোমার মত প্রশ্নকারী, তোমার মত জিজ্ঞাসু, তোমার মত এরকম অধিকারী যেন আমাদের হয়। তারপর, যে-বস্তু নচিকেতা চাইছেন, সেই আত্মতত্ত্বের প্রশংসা করছেন যমরাজ। কারণ, তার দ্বারা 'প্রষ্টা' যিনি, প্রশ্নকর্তা যিনি, তাঁর আগ্রহ আরও বাড়বে। সেইজন্য বলছেন:

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥
১।২।১২

'তং দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি' —সেই দেব, অর্থাৎ প্রকাশমান যে আত্মতত্ত্ব —'দেব'-শব্দের দ্বারা ইন্দ্রাদি কোন দেবতাকে এখানে বোঝাচ্ছে না; 'দেব'-শব্দের ধাতুগত অর্থ 'প্রকাশমান'—সেই স্বপ্রকাশ আত্মতত্ত্বকে জেনে 'ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি'—ধীর বুদ্ধিমান জ্ঞানবান ব্যক্তি হর্ষ এবং শোককে পরিত্যাগ করেন। পরিত্যাগ করেন আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, এদের উর্ধ্বে যেয়ে। পরিত্যাগের জন্য তাঁর কোন চেষ্টার দরকার হয় না। হর্ষ এবং শোক —সুখ এবং দুঃখ—তখন আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আত্মস্বরূপ, যার বর্ণনা যমরাজ করবেন, তাকে জানলে, সুখদুঃখ সেই বিদ্বান ব্যক্তিকে—সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি এদের উর্ধ্বে অবস্থান করেন।

'হর্ষশোকৌ জহাতি' — 'জহাতি'-পদটি বিধির দ্যোতক নয়। 'জহাতি' মানে 'ত্যাগ করবেন'; 'ত্যাগ করা উচিত' —এরকম নয়। আমরা দেখি লট্-বিভক্তিযুক্ত অনেক পদ বিধিলিঙের অর্থে প্রযুক্ত হয়—যেমন, অগ্নিহোত্রং জুহোতি। 'জুহোতি'র অর্থ 'জুহুয়াৎ'। 'অগ্নিহোত্র করে' নয়, 'অগ্নিহোত্র করবে'—বিধি। এখানে 'জহাতি'র অর্থ 'জহাতি'ই—'জহ্যাৎ' নয়—বিধিলিঙ্ নয়। কারণ, এখানে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানীরই প্রসঙ্গ, জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকের নয়। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি হর্ষশোক থেকে মুক্ত হন—হর্ষশোকের অতীত হন— এ-ই অর্থ।

এর দ্বারা বোঝা গেল আত্মতত্ত্বের প্রয়োজন। আত্মস্বরূপকে জানলে, আমাদের কি লাভ হবে, এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে। কি লাভ হবে? —না, মানুষ সুখদুঃখের অতীত হবে। যমরাজ এইভাবে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজনের কথা বললেন।

সাধারণ মানুষ হয়তো এই সুখদুঃখের অতীত যে তত্ত্ব, তার দ্বারা আকৃষ্ট হবে না। কেননা তার দৃষ্টিতে সুখ নেই, দুঃখও নেই- সে তো গাছ পাথরের মত অবস্থা! জড়ত্ব! এই রকম আশঙ্কা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সুখদুঃখের অতীত অবস্থা পাথরের অবস্থা নয়। পাথরেতে সুখদুঃখের প্রকাশ নেই, কিন্তু আত্মাতে সুখ-দুঃখের প্রকাশ নেই শুধু নয়, সুখদুঃখ সেখানে নেই। এই যে সুখদুঃখের অতীত অবস্থা, এটি জড় অবস্থা নয়। যদি জড় অবস্থা হোত, তা হলে বীজাকারে সুখদুঃখ যেখানে থাকত, সুখদুঃখের কারণ সেখানে থাকত। সুখদুঃখের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা, অজ্ঞান। যতদূর অজ্ঞানের রাজত্ব, ততদূর সুখদুঃখেরও রাজত্ব। সেখানে তারা আছে হয় প্রকাশিতরূপে না হয় অনভিব্যক্ত, অপ্রকাশিতরূপে—বীজরূপে। তাই যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ সুখদুঃখ থেকে নিষ্কৃতি নেই। মাত্র যদি আত্মাকে জানা যায়, আত্মার স্বরূপ যদি কেউ বোঝে, নিজেকে যদি আত্মা বলে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে সুখদুঃখের অতীত হোতে পারে। আর এইটিই চরম কাম্য আমাদের যে, আমরা সুখদুঃখের অতীত হব। কেন, সুখের অতীত কেন হব? দুঃখ আমরা এড়াতে চাই ঠিকই; কিন্তু সুখকে তো এড়াতে চাই না! তার উত্তর এর আগেই দিয়েছেন যে, যা কিছু অনিত্য, তা দুঃখময়। সুখও যদি অনিত্য হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তাও দুঃখময়। যে-সুখের সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচিত, সে-সুখ দুঃখেরই এক রূপান্তর মাত্র। সুতরাং, এই সুখকে দুঃখেরই এক রূপান্তর বুঝে পরিহার করতে হবে; অর্থাৎ সুখদুঃখের

ঊর্ধ্বে, অতীতভূমিতে যেতে হবে— আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে। আত্মজ্ঞ হ'লেই সুখদুঃখ থেকে মুক্তি। কিন্তু সে-মুক্তি যে সহজ নয়, সে-কথা শ্লোকের অন্য পদগুলি দিয়ে বলছেন।

প্রথমেই বলছেন, সেই আত্মতত্ত্ব কি রকম? সেই 'দেব' কি রকম? না, 'দুর্দর্শং' —অতিশয় কঠিন দর্শন যাঁর, অতিশয় দুঃখকর, অতি আয়াস-সাধ্য দর্শন যাঁর। কেন আয়াস-সাধ্য? 'গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্'—যেহেতু আত্মা কোথায় যেন এক গোপন কোণে লুকিয়ে আছেন। গূঢ়, গহন, সাধারণের অগম্য এমন একটি স্থল, সেখানেতে তিনি 'অনুপ্রবিষ্টম্'—লুকিয়ে আছেন। সেটি কোথায়? অজ্ঞানের ভেতরে তিনি নিজেকে ঢাকা দিয়ে রয়েছেন; আবরণের দ্বারা নিজেকে ঢেকে রেখেছেন। তা হ'লে? তা হলে তাঁকে আমরা তো মোটেই জানি না। না—তাও নয়। 'গুহাহিতং' —হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত অর্থাৎ, যদিও তাঁকে আমরা সংসার-ধর্মবর্জিতরূপে অনুভব করতে পারি না, তবুও আমরা তাঁকে হৃদয়-গুহাতে অবস্থিতরূপে জানি, যেখানে অবস্থিত থেকে তিনি আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উদ্ভাসন করছেন, সমস্ত জ্ঞানকে প্রকাশিত করছেন। এখানে একটু বিশেষ অর্থে এই গুহাহিতং' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত। দুটি কথা বলেছেন, 'গুহাহিত'ও বলেছেন গহ্বরেষ্ঠ'ও বলেছেন। দুটি কাছাকাছি শব্দ, তাৎপর্যও কাছাকাছি দুটির। গুহাতে—হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত। সেখানে থেকে আমাদের মনের সমস্ত বৃত্তিকে তিনি উদ্ভাসিত করছেন। আমাদের মন জড়; সুতরাং মনের যত তরঙ্গ, সেগুলি নিজেরা প্রকাশ পায় না। তিনি তাদের ভেতরে থাকায়, তারা প্রকাশিত হচ্ছে। এইজন্য তাঁকে 'গুহাহিতং' বললেন।

আমরা এখানে আবার একটি প্রাচীন উপনিষদের শিক্ষা পাচ্ছি যে, হৃদয় হল আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্র; মস্তিষ্ক নয়—হৃদয়। 'হৃদয়েন এব হি বিজানাতি'—হৃদয়েরই দ্বারা সব জানে। আমরা বলি বটে মন চেতন। আসলে কিন্তু মনও চেতন নয়। শাস্ত্র মনকে জড় বলেছেন। কারণ, সে জড়-ধর্মী, জড় তার উপাদান এবং জড় ছাড়া চেতনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, পরোক্ষভাবে আছে। আত্মা হৃদয়েতে অবস্থান করছেন বলে তাঁর আলোকে অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। 'গুহাহিত'-শব্দের এই তাৎপর্য।

সুতরাং তাঁকে যদিও সাক্ষাৎভাবে আমরা জানছি না, তাহলেও মনের সমস্ত বৃত্তিগুলির প্রকাশকরূপে তাঁকে জানছি। তাঁর পরিচয় এইভাবে পরম্পরাক্রমে পাচ্ছি, সাক্ষাৎভাবে পাচ্ছি না। যখন তাঁর অনুভব আমাদের হচ্ছে, তখন উপাধিযুক্তরূপে অনুভব হচ্ছে। উপাধি মানে অপরের ধর্ম যা বস্তুন্তরে—অন্য বস্তুতে আরোপিত হয়। জড়ের ধর্ম যে পরিবর্তন, জড়ের ধর্ম যে সুখদুঃখ, সেগুলি চেতন যে আত্মা তাঁতে উপহিত হয়, আরোপিত হয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি—এগুলি সব আত্মার উপাধি। এই উপাধিযুক্তরূপে, অনাত্ম ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরূপে, আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছেন। আর তিনি আছেন বলে এই জড়ের ধর্মগুলিও প্রকাশিত। তিনি যদি না থাকতেন, তাহলে 'জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ' হোত—সমস্ত জগৎটা অন্ধকার হয়ে যেত। কারণ, পরপ্রকাশ যে বস্ত, সে প্রকাশমান কোন বস্তুর সাহায্য ছাড়া প্রকাশিত হয় না। যেমন সূর্য যদি না থাকে, সে যদি কিরণ বিকিরণ চারদিকে না করে, তাহলে এই পৃথিবীর কোন জিনিসই আমরা দেখতে পেতাম না। সুতরাং সূর্যের আলো যেমন বস্তুকে প্রকাশ করে,—বস্তু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, —ঠিক

তেমনি সেই সূর্যকেও আবার যিনি প্রকাশ করছেন, সূর্যের তথাকথিত প্রকাশধর্মী যে আলো, সেই আলোকেও যিনি প্রকাশ করছেন, তিনি হলেন আত্মা। মন আমাদের সবকিছু জানে। মনের সাহায্য ছাড়া আমরা কিছু জানতে পারি না, সেই মন আবার যাঁর কিরণেতে উদ্ভাসিত, তিনি হলেন আত্মা।

মনকে কেন স্বপ্রকাশ বলি না? তার যুক্তি আছে। যা স্বপ্রকাশ হবে, তা নিত্য হবে। স্বপ্রকাশ বস্তু অনিত্য হোতে পারে না। কারণ, উৎপত্তি এবং বিনাশ যে কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই কারণকেই আমরা প্রকাশমান বলি—যার প্রভাবে বস্তু প্রকাশিত বা তিরোহিত হয়। তাহলে প্রকাশ আমরা তারই আছে বলব, কার্যের আছে বলব না। সমস্ত মনের ধর্মগুলি, বৃত্তিগুলি হল কার্য, যেহেতু তা উৎপত্তি-বিনাশশীল। সুতরাং বৃত্তিস্বরূপ মনকে আমরা স্বপ্রকাশ বলতে পারি না। মনের দ্বারা সব জানি; মনকে জানি কার দ্বারা? যদি বলি মনকে জানি মনের দ্বারা, তাহলে একটা logical fallacy হয়, ন্যায়ের, তর্কের একটা দোষ হয়—যে কর্তা, সেই কর্ম হয়ে যায়। 'কর্তৃ-কর্ম-বিরোধ' বলে একে। আমি জানি আমার দৃশ্য বস্তুকে। দৃশ্য বস্তু আর আমি যদি এক হোতুম, তাহলে আমি আর জ্ঞাতা হোতে পারতুম না। দৃশ্য বস্তু থেকে আমার ভিন্ন হওয়া চাই। তা না হলে আমি সে-বস্তুকে জানতে পারতুম না। সুতরাং মনকে যদি আমি জানি, তাহলে মন থেকে আমার ভিন্ন হওয়া চাই। তা না হলে মনকে জানতে পারতুম না। তা যদি হয়, তাহলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত এলো যে মন স্বপ্রকাশ নয়। সুতরাং যাঁর আলোকে মন আলোকিত, তাঁকেই বলা হয় আত্মা; তিনিই হলেন স্বপ্রকাশ, মন হল পরপ্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ আত্মা যদি হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থান না করেন, অর্থাৎ তাঁর আলোকে যদি মন উদ্ভাসিত না হয়, তাহলে মনের সামর্থ্য নেই যে, জগতের কোন বস্তুকে সে প্রকাশ করে। সুতরাং তিনি গুহাহিত রয়েছেন এই কথা ধরে নেওয়া হচ্ছে। যদিও আমরা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করছি না, তবু আমরা বুঝতে পারি তিনি যদি না থাকেন, তা হলে আমাদের কোন জ্ঞান হোতে পারে না।

হ'লেন না হয় তিনি হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত, তাঁকে আমরা দেখি না কেন?—অর্থাৎ সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁকে অনুভব করি না কেন? তার উত্তরে বলছেন 'গহ্বরেষ্ঠং' —গহ্বরে, দুর্গম প্রদেশে, হৃদয়-মধ্যে তিনি অবস্থান করছেন। গর্তের মধ্যে রয়েছেন। এইজন্য তিনি প্রকাশিত নন। ভাব হচ্ছে এই: যেমন একটা গর্তের চারপাশে দেওয়াল থাকলে আমরা তার ভেতরের বস্তুকে দেখতে পাই না, ঠিক সেই রকম হৃদয়-গহ্বরের মধ্যে তিনি রয়েছেন। দেওয়াল কিসের সেখানে? —অজ্ঞানের; বিষয়ের দেওয়াল। নানা বস্তুর নানা জ্ঞান সেখানে সেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইজন্য আমরা সেই আত্মাকে বুঝতে পারি না। তাই বললেন তাঁকে 'গহ্বরেষ্ঠ' —গহ্বরেতে অবস্থিত।

এই যে আত্মা—তিনি গহ্বরেষ্ঠই হোন আর গুহাহিতই হোন, তিনি কিন্তু স্বপ্রকাশ যদি না হতেন, তাহলে আমরা জগতে কিছু দেখতে পেতুম না, জানতে পারতুম না—এ কথা বুঝলুম। এখন যেহেতু স্বপ্রকাশ বস্তুর প্রকাশ এবং অপ্রকাশের কোন কারণ নেই, সেহেতু স্বপ্রকাশ আত্মবস্তু 'পুরাণম্'। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'পুরাপি নব ইব' —পুরাতন হয়েও যেন নতুন। পুরাতন কাকে বলে? —না, যার

অঙ্গের বিকার হয়েছে—যে জিনিসটা পুরোনো হয়ে গেছে। 'পুরোনো হয়ে গেছে' অর্থাৎ নতুন অবস্থায় যেমন চক্‌চক্ করত, তেমন করছে না; নতুন অবস্থায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেরকম সুন্দর ছিল, এখন তা নেই; তার অঙ্গের বিকার হয়েছে; ধর্মের অপচয় হয়েছে। কিন্তু আত্মা 'পুরাণ' কেন? —না, পুরাতন হয়েও, নিত্যকাল থেকেও তিনি 'নব ইব' যেন নতুন, অর্থাৎ অঙ্গের কোন বিকার, ধর্মের অপচয়-উপচয় —হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি তাঁর। এইজন্য তিনি 'পুরাণ'।

এমন যে আত্মা, তাঁকে জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন; দেখে হর্ষশোক থেকে উত্তীর্ণ হন। দেখেন কি করে? আমরা দেখছি যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। তাহলে আমরা সবাই দেখতুম, সবাই অনুভব করতুম। তাহলে ধীর ব্যক্তির ধীমত্তা কোন্‌খানে? কি উপায়ে জ্ঞানী ব্যক্তি, বিবেকী ব্যক্তি, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মতত্ত্বকে জানেন? সেই উপায়ের কথা বলছেন: 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' —অধ্যাত্মযোগের প্রাপ্তির দ্বারা। অধ্যাত্মযোগ কাকে বলছেন? —না, 'আত্মানম্ অধিকৃত্য ইতি অধ্যাত্মঃ'—আত্মসম্বন্ধী; অধ্যাত্মযোগ মানে আত্মবিষয়ক যোগ। যোগ মানে উপায়। সুতরাং আত্মসম্বন্ধী যে-যোগ অর্থাৎ আত্মস্বরূপের যে প্রাপ্তি, তারই উপায়কে অধ্যাত্মযোগ বলা হয়। সেই অধ্যাত্মযোগের 'অধিগমে'র দ্বারা—প্রাপ্তির দ্বারা, অর্থাৎ সেই অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করে ধীর বিবেকী ব্যক্তি আত্মাকে জানেন, সেই 'দেব'কে জানেন।

আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কিন্তু তাঁকে জানবার কোনও উপায় নেই। কেন না, তিনি কোন বিষয় নন। আমরা আমাদের থেকে ভিন্ন বিষয়কে, দৃশ্য বস্তুকে জানি। আমাদের জানা এই রকম। যে-বস্তুকে জানি, সে আমার থেকে ভিন্ন। কিন্তু আত্মাকে ঐরকমভাবে জানা যায় না। আত্মাকে বিষয় করা যায় না। বিজ্ঞাতা যিনি সর্বদা, তাঁকে কি করে জানবে? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' (বৃহ. উ. ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫) —এই বিজ্ঞাতাকে কোন্ উপায়ে, কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানবে? ইন্দ্রিয়গুলি সেখানে সব অচল। তিনি একমাত্র জ্ঞাতা হয়ে রয়েছেন, আর সব বস্তু তাঁর জ্ঞেয়। এখন সেই নিত্য জ্ঞাতা যিনি, তাঁকে কি করে জানবে? তাঁকে জ্ঞানের বিষয় আমরা কোন মতেই করতে পারি না। এইজন্য তিনি আমাদের কাছে অজ্ঞেয়বৎ হয়ে রয়েছেন। কারণ, আমাদের বুদ্ধি কাজ করে বিষয় নিয়ে। বিষয়কে সে প্রকাশ করে। বিষয়কে অবলম্বন করে অন্তঃকরণের পরিণামপ্রাপ্তি হয়। এখন আত্মার সম্বন্ধে সেই প্রশ্ন খাটে না, কারণ আত্মা হলেন নির্বিষয়; তাঁকে কেউ বিষয় করতে পারে না। সুতরাং বিষয়-জ্ঞান যেমন করে হয়, আত্মজ্ঞান কখনও তেমন করে হোতে পারে না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, আত্মাকে কেউ জানতে পারে না। মন আত্মাকে জানতে পারে না কারণ, মনকে তিনি প্রকাশ করছেন, মনের যিনি প্রকাশক, তাঁকে মন প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং, এই যে স্বপ্রকাশ আত্মা, তাঁকে জানতে হলে তাঁতে প্রতিষ্ঠিত না হলে হয় না। এইজন্য আত্মস্বরূপেতে প্রতিষ্ঠাই হল আত্মাকে জানা। এছাড়া আত্মাকে জানার অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই। এখানে যমরাজ বলছেন যে, ধীর ব্যক্তি সেই দেবকে, স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগাধিগমের দ্বারা জানেন। অধ্যাত্মযোগের যে অধিগম, যে প্রাপ্তি, তার দ্বারা জানেন—আত্মবিষয়ক যে যোগ, আত্মাতে স্থিতিরূপ যে যোগ, সেই যোগের দ্বারা তাঁকে জানেন। অন্য কোন

উপায়ে তাঁকে জানা যায় না একথাই এখানে বলছেন। কথাটি আমাদের বেদান্তের একেবারে নিষ্কর্ষ বলে মনে রাখতে হবে। বেদান্ত বলেন যে, আত্মবস্তু হচ্ছেন স্বপ্রকাশ। তাঁকে আর কেউ প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং, তাঁকে জানব বা বিষয় করব কি করে? নিত্য যিনি অবিষয়, নিত্য যিনি বিষয়ী বা জ্ঞাতা, তাঁকে আমরা প্রকাশ করব কি উপায়ে? —না, তৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। প্রকাশ তাঁকে করা যায় না; আমরা প্রকাশস্বরূপ হোতে পারি; হলে তাঁর উপলব্ধি হয়। কি করে? আত্ম-অভিন্নরূপে—বিষয়রূপে নয়। আত্ম-অভিন্নরূপে, এটুকু বুঝতে হবে। আত্ম-অভিন্নরূপে তাঁকে উপলব্ধি করা ছাড়া আর অন্য উপায়ে উপলব্ধি করা যাবে না। এই কথাই 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' এই বাক্যে বলা হয়েছে।*

* ৮ই জুন ১৯৭৫, রবিবার প্রাতে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যার প্রথমার্ধ। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

স্বামীজীর গানের খাতা

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

স্বামীজীর গানের খাতার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছি (আশ্বিন, ১৩৮২ সংখ্যা উদ্বোধন)। এখন স্বরলিপি ও গানগুলি বিস্তারিতভাবে ক্রমে প্রকাশ করা হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খাতাটি দুই দিক হইতেই লেখা, মাঝে সাদা পৃষ্ঠা। আমরা একদিক হইতে, প্রথমদিক হইতে, শুরু করিলাম। খাতাটির মাঝের কয়েকটি পৃষ্ঠার বাঁধন কাটিয়া যাওয়ায় ভবিষ্যতে পৃষ্ঠাসংখ্যা লইয়া কোন বিভ্রান্তি যাহাতে না হয়, সেজন্য আমরা নূতন করিয়া দুইদিক হইতেই পত্রাঙ্ক দিয়াছি; আমাদের দেওয়া এদিককার পত্রাঙ্কগুলি এখানে '**পৃষ্ঠা—১**', '**পৃষ্ঠা—২**',—এভাবে দেখানো হইল। ইহা ছাড়া, এদিককার মূল লেখাতেই কোন কোন পৃষ্ঠায় 'No. 1', '(10)', '9' প্রভৃতি সংখ্যা—স্বরলিপি ও গানের সংখ্যা—দেওয়া আছে। সেগুলিও যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট হইল।

পূর্বেই বলা আছে, এদিককার পৃঃ ১৬ পর্যন্ত কালিতে লেখা, তারপর হইতে পেন্সিলে।

পৃষ্ঠা—১ (ফাঁকা)

পৃষ্ঠা—২

No. 1 রাগিণী ছায়ানট, তাল কাওয়ালি রাত্রি প্রথম প্রহরে।

রে, পামা, পা, পা, মাপা, মা, গা, গা, রে, গা, মা, পা, গামা, রেগা, সারেসা
২ বার।

।

পা, ধা, পা, ধা, ধা, পাধানিসা, ধানিপা, | ২ বার। রে, গা, মা, পা, গামা, রেগা, সারেসা ১ বার।

পা, পা, ধা র্সা, র্সারের্সা, র্সার্সার্সা, র্সা রে রে´র্গা, রে´, র্সা, নিনি, ধা | ২ বার | পা, ধা, পা, ধা, ধা, পাধা, নিসা, ধানিপা, | ২ বার।

রে, গা, মা, পা, গামা, রেগা, সারেসা | ১ বার |

পৃষ্ঠা—৩

No. 2 দ্বিতীয় ছায়ানট, তাল কাওয়ালি।—

অস্থায়ী—

ধানি, ধাপা, মাধা, পামা, গাগা, রে, গা, মা, পা, ধা, পা, মাগা, রেগাসা | ২ বার |

অন্তরা।

পা, ধা, পা, ধা, ধা, পাধা, নির্সা, ধানিপা, | ২ বার | ধাধা, পাপা, ধাধা, পাপা, রে, গা, মা, পা, ধাপা, মাগা, রেগা, সা | ১ বার | পা, পা, ধা, র্সা, র্সারে´র্সা, র্সা র্সা র্সা, র্সা, রে´, রে´, র্গা, রে´র্সা, নিনি, ধা | ২ বার | পা, ধা, পা, ধা, ধা, পাধা, নির্সা, ধানিপা | ২ বার | ধা, ধা, পা, পা, ধা, ধা, পা, পা, রে, গা, মা, পা, ধাপা, মাগা, রেগা, সা, | ১ বার |

পৃষ্ঠা—৪

No. 3 রাগিণী জংলা সারঙ্গ তাল ঢিমা তেতালা।—

রেমা, রেমা, মাপা, মাপা, ধা, ধা, ধা, ধা, মাপা, ধাপা, মা, মা, রেমা পামা রে, সা, | ২ বার |

মাপা, ধাপা, মা, মাপাধা, মাপাধা, মাপাধা, র্সা, র্সা, রে´, রে´, র্সা, র্সা, ধার্সা, ধাপা, ধাপামা, মাপা, ধাপা, মা, মা, রে, মা, পামা, রে, সা | ১

No. 4 রাগিণী ইমন্ তাল একতালা।—

ধানি, ধাপা, মা, ধা, পা, মা, গা, রে, গা, মাপামা, গারে, সা | ২ | পা পা, ধার্সা, র্সা র্সা র্সা, নি, ধা, পা, ধা, নিনিধা, পা, | ২ বার | রে, গা, মাপামা, গারে, সা | ২ বার |

পৃষ্ঠা—৫

রাগিণী মল্লার তাল একতালা।

০	১	+	১	০	১	+	১
সা সা,	মাপা,	ধা, ধা,	ধা,	পা, ধা,	মাপা,	ধাধা,	পামা, | ২
০	১	+	১	০	১	+	১
র্সার্সা,	র্সার্সা,	রেঁরেঁ,	র্সার্সা,	ধাপা,	ধাপা,	ধাধা,	পামা | ২
০	১	+	১	০	১	+	১
সা —	মা —	পা —	ধা,	পাধা,	মাপা,	ধাধা,	পা, মা | ২

পৃষ্ঠা—৬

রাগিণী মেঘমল্লার তাল কাওয়ালি

গাগা, গামা গারে গামা পাধাপা—
গাগা, গামা গারে গামা পামাগা (সারে)
গাগা, গামা গারে গামা পাধাপা (২ বার)
ধার্সা নির্সা ধা, নি, ধা, পা, গামা, পাধাপা (২ বার)
গাগা, গামা, গারে, গামা, পামাগা (সারে)

পৃষ্ঠা—৭

রাগিণী কলঙ্গড়া তাল খেমটা।—

মাপাগা মামা পাধা নিসা নিধাপা ॥ ২
পা নিনি র্সার্সা রে রে রে সা রে সা—
নি নি নি র্সার্সা রে রে রে সারেসা—
(নি নি নি) (নি রে রে র্সারের্সা) নি রে রে—
সা রে সা) নি সা নি ধা পা)

পৃষ্ঠা—৮

রাগিণী মচ্ বেহাগ তাল একতালা—

\+
গামা পাপা গামা পাপা গামা পামা গারেসা + | ২
low
র্সার্সা গামা পাপা নিনি র্সারে র্সার্সা নিনিসা
পাপা নিনি র্সার্সানি সারে র্সার্সা নিনিসা | —
পাধা নিধা পামা গা গামা পামা গারেসা | —

৭—৯

রাগিণী Italian ঝিঁঝিট তাল কাওয়ালি

গামা গামা রেগা সারে মাগামা=মা + | ২ | —

মা মা পা মা পাপা, (—মামা-মানি—নিনি—) mistake

মা মা মাধা ধাধা মামা মানি নিনি, ধাপা ধাপা মামা ॥

র্সাসানি সাসানি ধামা পাপা পাধাপা পা ধা পা —

পাধা নিসা নিনি। | ১ ধা পা ধা পা মামা ॥ ১ ॥—

পৃষ্ঠা—১০

বিভাষ কাওয়ালী

+

পা পাধা পাধা গা গাপা গাপা গারে সারে গা পা

গা রে সা রে সা ঃ ২ ধ্‌া সা ধ্‌া সা সারে সারে পা গা

ধা ধা পা গা পা রেগাসা ॥ পা গা পা ধা পা ধা ধা র্সা

ধা পা রে পা গা পা গারে সা ॥ ৮

সারং তাল কাওয়ালী— 9

+

রেমা রেমা মা পা মা পা র্ধা ধা ধা মা পা ধা পা মা মা

+ ৩

রেমা পামা রেসা | ২ রেমা পাধার্মা মাপা ধা সা পা

১ ৩

ধা র্সা র্সা রেঁর্গা রেঁর্সা রেঁসা | ধার্সা ধাপামা | মাধা

০ ২ ০

পা ধা ধা | ধা র্সা ধা পা | মা | মা পা ধাপা | মারে সা ঃ ॥

শেষের স্বরলিপিটিতে স্বামীজী পেন্সিল দিয়া নিম্নোক্ত চিহ্নগুলি দিয়াছেন: দ্বিতীয় লাইনে লেখার উপর '/', '+' ও '৩' চিহ্ন; তৃতীয় লাইনে 'রেঁর্গা'-র উপর '১'; তারপর দ্বিতীয় 'রেঁর্সা'-র 'রে'-র উপরকার ' / ' ও শেষে দাঁড়ি; 'ধাপামা'-র পর দাঁড়ি এবং 'মাধা'-র 'মা'-র উপর '৩'; চতুর্থ লাইনে ভিতরকার সব দাঁড়িগুলি এবং উপরকার দুইটি '০' ও '২'।

পৃষ্ঠা—১১

বেহাগ তাল কাওয়ালী 10

\+ +

নিসা ধান পা গা মা পা মা গা রে সা, গা গা সা সা

মাপা নিপা নির্সা রেঁর্সা নিধাপা | ২ পা পা নি নি

র্সানি র্সা র্সার্সা রেঁর্সা নিপানি | ২ র্সার্গা রেঁর্মা র্গারেঁর্সা

র্সার্সা রেঁর্সা নিপানি পাধানিধা পা মা গা, গা মা পা মা গা রে সা ॥

স্বামীজীর গানের খাতা, পৃষ্ঠা ৪১

স্বামীজীর গানের খাতা, পৃষ্ঠা ১৪

পৃষ্ঠা—১২

দেশ মল্লার তাল (কাওয়ালী) 11

\+ ১ ০ ১ +
মা মা মা মা পা পা ধা পা ধা ধা পা ধা মা পা ধা ধা পা ধা পা,
০ ১ +
মা গা রে গা সা ॥ ২ রেরে রেরে পামা মাগা রেগাসা | ২ রেমা
পা ধা র্সারে´র্সানি ধাপা মাগা রেগা সা ॥ ১ মাপামাপাপা—
মাপা নিনি র্সার্সার্সা নিসা রে রে রে রে রে সারে সানি ধাধাপা | ২
ধা ধা ধা ধা ধা, সা সা রে সা নি ধাপা | ২ মাপা, মাপা, সা,
নি ধা পা মা গারে সা ॥

পৃষ্ঠা—১৩

9 খাম্বাজ কাওয়ালি যমুনা পুলিনে

র গা রে মা	গ গ সা সা	রে রে রে গ	ম পধ পম
য মু না পু	লি নে ব সে	কাঁ দে রা ধা	বি নো দিনি
নিনি সা ধ	নি প প	ধ প ম গ	ম পধ পম
বিনে সেই রা	কা শ শী	বাঁ কা শ্যাম	গু ণ মণি
প প প প	ধ ধ নিধ নি	সা রে রে গ	নি নি সা সা
গু কা ল ক	ম ল মা লা	বা ডি ল বি	র হ জা লা
নি নি নি নি	সা সা ধ ধ	নি নি প মগ	মা পধ পম
কাঁ দে য ত	ব্র জ বা লা	বি নে কা লা	গু ণ মণি

পৃষ্ঠা—১৪

(10)

বসন্তবাহার কাওয়ালি

সামা মামা মাপা মাগা মাধা ধাপা ধানিসা।
নিসা নিধাপা মাপা মাগা মামা গারেসা ॥
ধাধা ধানি নিসা সানি সারে রে রে নি নি সা।
নিসানি ধাপা মাপা মাগা মামা গারেসা ॥

(11) খাম্বাজ লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

রেগা সারে | সামাগা রেগামা | মধপ। জল কোম্পানি বাহাদুর জুলুম লিয়া
মগম | পপপ | সানিধ | পমগ ॥ মেরে মহাল মুলুক সব লুট লিয়া
মগম | ধধধ | পধসা | নিধপ। মহালো মহালো মে বেগম রোএ
মগম | পপপ | সানিধ | পমগ ॥ ঝাড়িপটিমে গা—গরিয়া[২]

---

১ 'সঙ্গীত-কল্পতরু', ৩য় সং, পৃঃ ৪৬২। ইহাতে 'রাকা শশী' স্থলে 'বাঁকা শশী' রহিয়াছে।

২ আমরা ঠিক মতো পড়িতে না পারিয়া গত আশ্বিন সংখ্যায় (পৃঃ ৪৫৪, ১৯শ লাইন) ভুল করিয়া 'জল কো পানি বদাদুর' এবং 'ঝাটপটিমে' লিখিয়াছিলাম।

পৃষ্ঠা—১৫ (ফাঁকা)

পৃষ্ঠা—১৬

কাওয়ালি

গ গ রে সা | নি সা গ ম | প, ম | গ রে সা।
ধা ধ্ধা | পা প্পা | ম গ ম্মা | পা॥
নি | সা | সা নি ধা পা | মা গা রে সা
সা নি | ধা পা | মা গা | রে সা॥

আড়া খেমটা

সানি সস রেসা নিধা, মম পধা নিসা পধা।
পাপা নিসা রেরে রেসা, মপ মগ রেরে সানি॥
পাপা নিসা রেরে রেরে, সস নিনি সরে সস,
পপ নিনি রেরে রেগা, মপ মগ রেরে সানি॥

কায় কব

পৃষ্ঠা—১৭

এই পৃষ্ঠায় স্বামীজী 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি' গানটি রচনা করিয়াছেন, বিস্তারিতভাবে গত আশ্বিন সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, রচনার পর স্বামীজী গানটির সামান্য পরিবর্তন করিয়াছেন, যাহা বাণী ও রচনায় পাওয়া যায়। রচনার অল্পকাল পরেই স্বামীজী যে গানটির কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন মিলে 'সঙ্গীত-কল্পতরু' ৩ পুস্তকে—

৩ 'সঙ্গীত-কল্পতরু' পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১২৯৪ সালে (আগস্ট/সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ খৃঃ); প্রকাশক—শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক। বইটি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল—নয় মাসের মধ্যেই তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়—২য় সংস্করণ মাঘ, ১২৯৪-এ এবং তৃতীয় সংস্করণ ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫-এ (মে, ১৮৮৮)। প্রথম সংস্করণের 'বিশেষ কথা'য় বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন, "...প্রায় একবৎসর অতীত হইল, ইহার সঙ্কলন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, মহাশয়ই প্রথমতঃ ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।..."

এই পুস্তকে স্বামীজী কর্তৃক রচিত "এক রূপ অরূপ নাম বরণ" এবং "তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা" গানদুটিও রহিয়াছে, পূর্বোক্ত গানটির মতই স্বামীজী এদুটিরও যে পরিবর্তন তখনই করিয়াছেন, সেই পরিবর্তিত আকারে। যথাস্থানে সেগুলিও দেওয়া হইবে।

ইহা ছাড়া, স্বামীজীর গানের খাতায় অন্য যেসব গান আছে, সেগুলির মধ্যে এই গানগুলিও 'সঙ্গীত-কল্পতরু'-তে পাওয়া যায়: 'চমকে চপলা, চমকে প্রাণ', 'ধন্য ধন্য ধন্য আজি', 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি', 'ব্রজকিশোরী...খেলত রঙ্গে', 'যমুনা পুলিনে বসে' 'হরশঙ্কর শশিশেখর', এবং 'সীতাপতি রামচন্দ্র'। স্বামীজী খাতায় কোথাও এগুলির কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন, কোথাও কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়াছেন, কোথাও দু-চার লাইন মাত্র লিখিয়াছেন। 'সঙ্গীত-কল্পতরু'র সঙ্গে স্বামীজী বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া আমরা তাঁহার গানের খাতায় গানগুলির সঙ্গে প্রয়োজনমতো 'সঙ্গীত-কল্পতরু' হইতেও উদ্ধৃতি দিব।

সাংঘাতিক রকমের ছাপার ভুল এবং স্বামীজীর হস্তাক্ষর ঠিকমতো পড়িতে না পারার নজির সত্ত্বেও। 'সঙ্গীত-কল্পতরু'-তে প্রকাশিত এই গানটি নিম্নে প্রদত্ত হইল, গানের খাতায় স্বামীজীর মূল রচনাটিরও পুনরুল্লেখ করা হইল :

[গানের খাতায়]

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে জগত সংসার ভাসে—
ওঠে ভাসে ডোবে অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ২ ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল—
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ
সে ধারাও বন্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিশাইল—
অবাঙ্ মনস গোচর বোঝা প্রাণ বোঝে যার॥

[সঙ্গীত-কল্পতরুতে]

রাগিণী বাগেশ্রী তাল আড়াঠেকা

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোম, ছায়া সম, ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুন, অহং স্রোতে নিরন্তর।
সেই ধারা বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্যে মিশাইল,
অবাঙ্মন সগোচর, বোধে প্রাণ বোঝে যার॥

নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এখানে ছাপার ভুল সত্ত্বেও পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, স্বামীজী তখনই 'ওঠে ভাসে ডোবে' স্থলে 'ওঠে ভাসে ডোবে পুন', এবং 'বোঝা প্রাণ বোঝে যার' স্থলে 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার' করিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা—১৮

রে বিহঙ্গ মম মন—চিদানন্দাকাশে ব্রহ্মসহবাসে—সুখে কর বিচরণ—যোগ পক্ষপুটে কার আরোহণ

পৃষ্ঠা ১৯

রে গ মা=ম্ম প প পা প্প ম প ধা সা—নিসা নি ধ প
আ ম রা যে শি শু অ তি অ তি ক্ষু দ্র — ম — ন
রু দ্র মু খ কেন তবে দেখাও মোদের সবে

ধ´ ধ´ ধা ধ প ধ পা—প ম প ধা—প ম প রে—মা
প দে প দে হ য় নি ত্য চ র ণ স্খ ল অ ন অ
কেন দেখি মাঝে মাঝে ভ্রুকুটী বি —ষ—ম—।

ম ম মা ম্ম প প পা-প্প ধ ধ ধা—ম পা
ক্ষু দ্র আ মা দে র প রে ক রি ও না রোষ

পা ধ নি সা নি সা নি সা ধ´ ধ´ ধ´ ম পা
স্নে হ বা ক্যে ব লো পিতা (?) কি ক রে— ছি দোষ

শতবা-র পড়ি ভুলে শতবার লও তুলে
মোদের সহায় হও দুর্বল শরণ।
পৃথ্বির ধুলিতে দে—ব মোদের জনম্
পৃথ্বির ধুলিতে অন্ধ মোদের—নয়ন।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে— খেলা করি—ধুলি লয়ে
মোদের সহায় হও দুর্বল শরণ—

পৃষ্ঠা · ২০

এই পৃষ্ঠায় স্বামীজী 'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ' গানটি রচনা করিয়াছেন, স্বরলিপিসহ। গত আশ্বিন সংখ্যায় উহা বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে। গানের খাতায় স্বামীজীর মূল রচনাটির (মাত্রা ও স্বরলিপি বাদ দিয়া) পুনরুল্লেখসহ 'সঙ্গীত-কল্পতরু'[8] হইতেও গানটি উদ্ধৃত হইল:

['সঙ্গীত-কল্পতরু']

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

এক রূপ অরূপ নাম বরণ
অতীত আগামী কালহীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন,
নেতি, নেতি বিরাম যথায় ॥ ১ ॥
তথা হতে বহে কারণ ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজ্জলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহ মহ মিতি সর্ব্বক্ষণ ॥ ২ ॥
কোটী চন্দ্র, কোটী তপন,
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন
করি দশ দিকে জ্যোতি মগন ॥ ৩ ॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণ,
সুখ দুখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ,
যেই সূর্য্য সেই কিরণ.

নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

[স্বামীজীর গানের খাতা]

একরূপ অরূপ নাম বরণ
অতীত আগামি কালহীন
দেশ হীন সরব হীন
নেতি নেতি বিরাম যথায়্।
তথা হতে বহে কারণধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজ্জারা
গরজি গরজি ওঠে তার বারি
অহং অহং ইতি সরবক্ষণ।
সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে
কতই রূপ কতই শক্তি
কত গতি স্থিতি কে করে গণন।
কোটী চন্দ্র কোটী তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহা ঘোর রোলে ছাইছে গগন
করি দশ দিক জ্যোতি মগন।
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী—
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ
সেই সূর্য্য তার কিরণ।
যেই সূর্য্য সেই কিরণ।

৪ তদেব, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৫৮৩।

পৃষ্ঠা—২১

বাহার রামপ্রসাদ

রে সা ধা—নি সা সা গা রে গা— রে সা রে মা গা— রে গ রে সা—
হৃৎক ম ল ম ঞ্চে দো-ও লে ক রা ল ব—দ অ — নি

সা সা পা-ম পধ — মপধনিসা নিনিধধপ মপধা— র্সর্স গমপমগরেসা
মন্ প ব নে দুলা — আ — — — ছে দিবস — যা মি ই — —নি
(করাল -- বদনি)

নি নি সা — রের্গমা — রেগ মপ — ম — র্গর্গর্গ র্গমা—গ রেগ রে সা —
আ বি র রু ধির অ — — তায়্ কিশোভা হয়ে ছে — পায়্

রে রে রে সা নি নি ধ নি ধ পা—মপ ধনির্ধপ গ র্সরের্গরে মা
কা ম আ দি মো হ — যায়্ হেরি লে অ— ম — --- নি

পৃষ্ঠা-২২

মেঘ

ম ম ম রে রে রে সা সা সা সা— সা সা মাম্মা মা—মম গমপা পধপ
চ ম কে চ প লা চ ম কে প্রা ণ চা হ মা চ প ল হা—সি নি ই—

ম প নি নি ৷ া সা সাসাসা সাসাসা নিসারে রে ম রেসা নি নি নি নি সা
ক ড় কড় কড় কুলিশ না দিছে ভী —ম্ নিনাদিনি ক লু য হ রা -

রে রে রে রে রে রে সা সা সা রেসা ধাপা মামামা মা—ম্ম গমপা পধপ
গ র জে গ র জে ঘ নে ঘ নে — ঘন দেখা দে বি ন্দু বা —সি নি ই—

পৃষ্ঠা—২৩

খাম্বাজ

সা নি ধা ম গ ম পা র্নী সা গ গম পপ প র্স ধনিন পপ মগ
শি ব শং কর বং বং ভো লা কৈলা—স পতি মহা রাজ রাজা

গম গমপ পপধা ধনি ধনিসানিধ র্সা ম প প প মপধনি—ধা
উড়ে সিং— হকিবোল্[৫] গলে ব্যা—ল মাল লোচন বি শা — ল

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ৭ম সংস্করণ, ৪র্থ পুনর্মুদ্রণে (৩০৮ পৃষ্ঠায়) এই গানটি রহিয়াছে; সেখানে আছে 'উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল'।

ম ম্ম পধ | সা নি সা সা নি সা সা নি সারে সা সা নি স ধাপ
লা লে লাল্ ! ভা লে চ ন্দ্র শোভে সু ন্দ—র বি রা — জে
(শঙ্কর বং)

পৃষ্ঠা—২৪

ভৈরব একতালা

নিসা গা-রে-সা নসা সা—ধ সা সাসাম্মা—সম গরেগমা—
হর শং কর শ শি শে খ র পি না কী ত্রিপু রা রি

ধ ধ ধ ধা—ধ ধ মা ম ম ম ম গ রে গ মা—
বি ভূ তি ভূ ষ ণ ম ণ্ডি ত ফণি হা — — রে

ধ পধা নি নি সা সা সা সা সসা রে রে রে সা নিসানি ধা প্প
উ ষ্কা রূ ঢ় গ র ল ভ ক্ষ অ ক্ষ মা লা শোভীত ব ক্ষ

ধা নি সা-ম্মা নি ধা পা—প্পা মা ম্ম মমম গরেগা মা—
ভি ক্ষা ল ভ্য ভূ ত প ক্ষ র ক্ষক ভব পা আ আ—রে* [ক্রমশঃ]

* 'সঙ্গীত-কল্পতরু'তে গানটি রহিয়াছে :—

হরশঙ্কর, শশিশেখর পিণাকী ত্রিপুরারে। বিভূতি ভূষণ, দিগ্‌বসন,
কাঙ্গালী জটা ভারে ॥ অনল ভালে মদন-দমন, তরুণ-অরুণ-কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত বরণ, মণ্ডিত ফণিহারে। উল্কারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা
শোভিত বক্ষ, ভিক্ষালক্ষ্য, পিশাচ-পক্ষ রক্ষক ভবপারে ॥ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা এবং যাঁহারা উহা বুঝেন, তাঁহাদিগের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা। ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য অভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ শব্দ-সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান বলিতেছেন—

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

—হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন আমি সেখানেই অবস্থান করি।

ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ ; কীর্তনে আমরা ভাবের যথার্থ প্রকাশ দেখিতে পাই ধ্রুপদ ও খেয়ালে উচ্চ সঙ্গীত-বিজ্ঞান রক্ষিত হইয়াছে। কোন কৃতী গায়কের সঙ্গীত প্রতিভা যদি কীর্তনের ভাবধারা ও ধ্রুপদ খেয়ালের উচ্চ বিজ্ঞান সম্মিলিত করিতে পারে, তাহা হইলেই যথার্থ আদর্শ সঙ্গীতের সৃষ্টি হইবে।

দেশের বর্তমান অবস্থায় ধ্রুপদ গানই একমাত্র উপযোগী। যে সব গীত-বাদ্য মানুষের হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে এবং ধ্রুপদ গান শুনিতে লোককে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাতৃদর্শনে বিবেকানন্দ

[দেশ—ত্রিতাল]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কে রে বীরেশ্বর কম্পিত কলেবর
গর্গর ভাবে আজি মাতৃপদে লুটায় ॥
কমল-নয়নে তাঁর বহিতেছে প্রেমধার
শ্রীবদনে মা নাম, আবেশে অবশ কায় ॥
ধূলি-অবলুণ্ঠিত চিন্ময় তনু তাঁর
নেহারি' মায়ের প্রাণে উথলে স্নেহ-পাথার
আকুলা জননী তাই রহিতে না পারি' আর
বাহু দুটি প্রসারিয়া যতনে তুলিলা তায় ॥

০	৩	+	২
সা রা মা পা	না — র্সা র্সা	পা র্রা র্সা ণা	ধা ধা ণা ধপা
কে ০ রে বী	রে • শ্ব র	ক ম্ পি ত	ক লে ব র০
মা ধা পা পা	মা গা মা গা	রা গা গা গরা	সা ন্া সা সা
গ ০ র্গ র	ভা বে আ জি	মা ০ তৃ প০	দে লু টা য় ॥
রা রা মা মা	মা মা মগা রা	রা গা গা মা	রগা গরা সন্া সা
ক ম ল ন	য় নে তাঁ০ র	ব হি তে ছে	প্রে০ ম০ ধা০ র
মরা মা মা পা	পা ধা ণধা পা	মা ধা পা মগা	রগা গরা সন্া সা
শ্রী০ ব দ নে	মা • না০ ম	আ বে শে অ০	ব০ শ০ কা০ য় ॥
পা র্রা র্সা ণা	ধা ণা ধা পা	মা ধা পা মগা	রগা গরা সন্া সা
বা হু দু টি	প্র সা রি য়া	য ত নে তু০	লি০ লা· তা০ য় ॥
গা মা পা না	না না নর্সা র্সা	পা র্সা র্সা র্সা	র্সা না রর্সা র্সা
ধূ লি অ ব	লু ০ ণ্ঠি ত	চি ০ ন্ম য়	ত নু তাঁ০ র *
পা ধা র্সা র্রা	র্রা র্রা র্রা র্গা	র্সা র্রা র্সর্গা র্রা	র্সা ণধা পা পা
নে হা রি মা	য়ে র প্রা ণে	উ থ লে০ স্নে	হ পা০ থা র
পা র্রা র্রা র্রা	র্রা র্গা র্রর্গা র্মর্গা	র্রা র্রা র্গা র্রা র্গর্রা	র্সা না র্সা র্সা
আ কু লা জ	ন নী তা০ ০০	ই র হি তে না০	পা রি আ র

* তান :
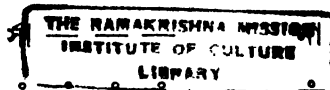
মা পা না —	র্সা [illegible]	[illegible] সা র্রা —	সনা ধপা মগা রসা
মা • ০ ০	০ • ০ ০	০ ০ ০ ০	০০ ০০ •০ ০০

আত্মস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত*

১

সংসারের বুকে এসে সব কিছুর দিকেই মানুষ তাকায়, দেখতে চায় বিশ্বসৌন্দর্যের অফুরন্ত ধারাকে; কিন্তু বুঝতে চায় না শুধু তাদের অন্তরতর সত্তার গভীরতম সত্যকে। অথচ এই দেখার মধ্যেই যেমন ধর্মবুদ্ধির সম্পূর্ণতা, উপলব্ধির প্রগাঢ়তা, তেমনি জীবনেরও আসে পরমতম সার্থকতা। তবু জীবন-সাধনার পীঠভূমি তৈরী করে নিতে চায় না মানুষ একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে; চিরদিন থেকে যায় তারা ধ্যান-শান্তির গৌরব-বঞ্চিত। তাদেরই আত্মদর্শন ঘটাতে যুগে যুগে আবির্ভাব হয় আত্মস্বরূপ মনীষীদের। কারণ আত্মদর্শন না হলে জীবনোপলব্ধি বা সত্যোপলব্ধি ঘটে না, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে আমাদের জীবন্মুক্তি। আর তা ছাড়া, এই আত্মদর্শনের সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে জীবনের অন্তর্গূঢ় শক্তি। আত্মদর্শনই জীবনকে মুক্ত করে বহুবিধ দুর্বলতার কুয়াশাজাল থেকে, হৃদয়ের কাছে উন্মোচিত করে দেয় সত্যদর্শনের উদার দিগন্তকে।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এমনি একজন আত্মস্বরূপ মনীষী মহাপুরুষ; পৃথিবীর জনমানসে আত্মদর্শনের সূর্যদীপ্তিকে প্রকাশ করবার জন্যই আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানসত্তা সপ্তর্ষিলোক থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছিল স্বামীজীর ঋষি-আত্মাকে আধুনিক যুগের কালভূমিতে; ধ্যানগম্ভীর অদৃশ্যের সুদূরতা থেকে একেবারে কাছের আন্তরিকতায়।

স্বামীজী নিজেই নিজেকে আত্মস্বরূপ বলেছেন; আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেই, আত্মার শক্তিকে উপলব্ধি করেই তিনি আত্মস্বরূপ। তিনি বেদান্তবাদী— বেদান্তের মূর্তবিগ্রহ; ধর্মচিন্তায় তাঁর উপনিষদেরই একান্ত প্রভাব। যে-উপনিষদ আত্মার জিজ্ঞাসাকেই সবচেয়ে বড় করে বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, সেই উপনিষদকেই তিনি মানব-জীবনের ধ্যানচিন্তায় একমাত্র গ্রহণীয় ও বরণীয় বলে মনে করেছেন। তিনি তাই অকুণ্ঠ-ভাবেই বলতেন, 'উপনিষদের ধর্ম প্রেমের ও জ্ঞানের। এই উপনিষদগুলিই আমাদের একমাত্র শাস্ত্র।'[১] উপনিষদের এই প্রেম ও জ্ঞানের মানস-দীক্ষাকে গ্রহণ করেই, আর জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা যে-সত্যের মুখটি আবৃত হয়ে রয়েছে, সেই সত্যকে অবারিত করে দিয়ে ও নিজের অন্তরে গ্রহণ করেই তিনি আত্মস্বরূপ— মুক্তস্বরূপ। যুগাবতার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তিনি বলেছিলেন, তাঁর 'জীবন উপদেশ অপেক্ষা সহস্র-গুণে উপনিষদ-মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ।' এই জীবন্ত ভাষ্যের কাছে যাঁর দীক্ষা, চরম উপলব্ধিও তাঁরই প্রাপ্য। সেই প্রাপ্তির সৌভাগ্যে তিনি আত্মস্বরূপ। জগতের পাত্রে আত্মজ্ঞানের অমৃত-

* পি এইচ. ডি. (কলি.)। বর্ধমান শ্যামসুন্দর কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। গ্রন্থকার।

১ একটি বক্তৃতার উক্তি। মিস মেরী হেলকে লিখিত একটি চিঠিতেও (১৭।৬।১৯০০) আছে: 'ধর্মের যাবতীয় তত্ত্ব উপনিষদ থেকে পাওয়া যায়।' 'উপনিষদের অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম'। বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৮।১৪০-১

ানের আনন্দে তিনি পূর্ণকাম।

২

ব্রহ্মধ্যানমগ্ন সপ্তর্ষির অন্যতম প্রধান ঋষি তিনি। দেহধারণের পূর্বেও তিনি আত্মস্বরূপ—রেও। তবে দেহধারণ করলেই মায়ার অতি ক্ষ্ম আস্তরণ আধিকারিক পুরুষদেরও অন্তঃকরণকে াবৃত করে। স্বামীজীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম টেনি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সে-আবরণ উন্মোচিত রেছিলেন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ ষ্টাব্দে। নির্বিকল্প সমাধিতে অনাবৃত আত্মস্বরূপের পরোক্ষ অনুভূতিতে নরেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন রূপপ্রতিষ্ঠ। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ের রিসমাপ্তি এখানেই। কিন্তু শুধু জীবন্মুক্তির ানন্দে ভরপুর হয়ে থাকতে বিবেকানন্দের াবির্ভাব হয়নি। কাশীপুরেই একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব একখানি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন—নরেন শিক্ষে দিবে।' নরেনকে যে এনেছেন তিনি স্বয়ং সেইজন্যই! সুতরাং আচার্যের জীবন শুরু হল— আচার্যত্বের অভিমান দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলেন। মোটামুটি বলা যায় প্রায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত স্বামীজীর এই আচার্যাভিমান শ্রীরামকৃষ্ণদেব রেখে দিয়েছিলেন। এই অবধিই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়ে সে-অভিমান ক্রমশঃ অপস্রিয়মাণ — পরিশেষে সম্পূর্ণ অপসারিত। স্বামীজী আর নেতা বা আচার্য নন — তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বালক মাত্র। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বামীজী তাঁর জীবনের এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়েও আত্ম-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পত্রাবলীতে আমরা অনেক ধরনের কথা পাই। সেগুলির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব এই পরিপ্রেক্ষিতেই। নতুবা স্বামীজীর আপাতদৃষ্টিতে অনেক স্ববিরোধী উক্তির সামঞ্জস্য করা যাবে না। অনাবৃত আত্মস্বরূপের দর্শন একবার হলে, সে জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি নেই — এই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের আলোকেই স্বামীজীর জীবন ও বাণী পর্যালোচনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে লোককল্যাণকল্পে যে-সব আধিকারিক পুরুষদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা 'অহং'-লেশশূন্য হয়ে নির্বিকল্পভূমিতে আরূঢ় হয়েও ব্যুত্থানদশায় যে-'অহং' রেখে দেন— ঈশ্বরই তাঁদের সে-'অহং' রেখে দেন— তার আকারই 'অহং'-এর মত, প্রকৃতপক্ষে তা 'অহং' নয় -- 'কাঁচা আমি' নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় তা 'পোড়া দাড়'র মত। বিবেকানন্দের আচার্যাভিমান বা বালকত্ব-অভিমান সেই জাতীয় 'অহং'— বেদান্তের পরিভাষায় 'বাধিতের পুনরাবৃত্তি' মাত্র।

৩

প্রথম পর্যায়ে দেখি, তরুণ যুবক নরেন্দ্রনাথ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে নিজের আত্মিক জিজ্ঞাসাকে কয়েকটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছেন, যেমন নিজের আত্মাকে তুলে ধরেছিলেন একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একটি চূড়ান্ত প্রশ্নের দ্বারা—'আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?' মহর্ষি সেদিন নরেন্দ্রনাথের চোখ দুটিতে যোগীর দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণ একদিন তাঁর এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে কয়েকদিন পরে তাঁকে বলেছিলেন বিশ্বজননীর কাছে নিজেই আবেদন জানিয়ে নিজের সাংসারিক দুঃখকষ্টের লাঘব করে নিতে। কিন্তু তরুণ নরেন্দ্রনাথ সেদিন চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তির কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন ভক্তি ও জ্ঞান। জগন্মাতার কাছে সংসারের দুঃখ-বেদনার কথা জানাতে সম্পূর্ণই ভুলে গিয়েছিলেন। আত্মস্বরূপতার প্রাপ্তির পথে —'প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি'র পথে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি, পূত মন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল সেদিনকার সেই পুণ্যলগ্নটিতে। সর্বজীবের মধ্যেই যখন নিজের

আত্মার উপস্থিতি,[২] তখন তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের মা ও ভাইদের সাংসারিক সচ্ছলতা মাতৃরূপিণী পরমাত্মার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন কি করে? পরম সত্যের মন্ত্রধ্বনির আনন্দকে বিলিয়ে দিতে হবে যে সকলের মাঝে! আত্মার ঊর্ধ্বমুখী শিখাটিকে সপ্তর্ষিলোকের মহা-ঋষি নীচের দিকে টেনে আনবেন কি যুক্তি দিয়ে? জীবনের মহালগ্নকে সার্থক করে তুলতে হবে যে উপলব্ধির প্রগাঢ়তায়! নরেন্দ্রনাথ সেদিন ঠিক তাই করেছিলেন। 'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতা' বিশ্বজননীরই প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথের এই শুভবুদ্ধির উদয় —মায়েরই এ মঙ্গলাশিস—বরপুত্রকে অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

এর পরে দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথ নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চান ধ্যানের অতলান্তুতায়, নির্বিকল্প সমাধির আত্মনিমগ্নতায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, একান্ত স্বার্থপরের মত এই ব্যক্তিগত ধ্যানানন্দ নিয়ে থাকলে নরেন্দ্রনাথের চলবে না। কারণ নরেন্দ্রনাথ যে একটি বিরাট পাত্র! গুরু আশীর্বাদ করেছিলেন পৃথিবীতে বহু মহৎ কাজ তিনি করবেন, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা আনবেন তিনি; বহু দীন-দুঃখীর দুঃখও ঘুচিয়ে দেবেন। নির্বিকল্পভূমিতে আরূঢ় করে দিয়ে বিলোমমার্গে ব্যবহারভূমিতে এনে বলেছিলেন: 'চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।'

৪

তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র ভারতের দুঃখদারিদ্র্য-নির্জিত জনসাধারণের করুণ জীবনইতিহাসের সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বললেন: হরিভাই, তোমাদের এই তথাকথিত ধর্মটাকে আজও আমি বুঝতে পারলাম না। আমাদের মনে হয়, তিনি তাঁর এই কথা কয়টিতে এই সত্যটিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, যে-ধর্ম কেবল অনুষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়, দরিদ্র জনগণের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করবার অনুপ্রেরণা যোগায় না, কেবল বদ্ধ ঘরে ব্যক্তিগত মুক্তির জন্যই নিজের গোপন সাধনায় আত্মপ্রকাশ করে, সে-ধর্মকে তিনি কোনোদিনই মানতে পারেন নি। কর্মকে তিনি বলেছেন চিত্তশোধনকারী এবং জ্ঞানের প্রাপক।[৩] এ-কর্ম পরোপকারের কর্ম। জীবকে আত্মজ্ঞানে আপন ভেবে বুকে টেনে নেওয়ার কর্ম। বুদ্ধদেবকে এইজন্যই তিনি তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও বলেছেন যে, তাঁদের মতে মানুষ এবং যে-কোনো জীবের মঙ্গলসাধনই একমাত্র কর্ম।[৪] 'স্বামি-শিষ্য সংবাদে'ও তাঁর ওই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় - পরের কল্যাণসাধনই সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্মের অনুধ্যান এবং কর্মে রূপায়ণই তাঁর জীবনের সত্যানুভূতির মূল উৎস থেকে প্রবাহিত হয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে। দেশের প্রতি ভালবাসাও তাঁর ওই উৎস থেকেই।

যেদিন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে দেশের ক্ষুধিত, দরিদ্র জনসাধারণকে দেখলেন, বুঝতে পারলেন মর্মান্তিক নিঃস্বতার ভয়াবহতাকে, বিদেশে গিয়ে সেখানে দুঃস্থ জনসাধারণেরও সুবিধাগুলি দেখে নিশীথ রাত্রির

২ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ। ঈশোপনিষৎ: মন্ত্র ৭

৩ 'Work purifies the heart and so leads to Vidya (wisdom).'
C. W. VII (1963), p. 39

৪ তদেব

নীরব প্রহরে নিজের দেশের অভুক্ত জনগণকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেছেন, সেদিন তাঁর বিশাল হৃদয়ের এক বেদনার্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়; এবং তারই প্রকাশ ঘটল ব্যবহারিক বেদান্তে। সূচনা যার জ্ঞানের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করে, পরিণতি তার যোদ্ধা সন্ন্যাসীর নিষ্কাম কর্মে। এইজন্যই তিনি নিজেকে একাধিকবার যোদ্ধা সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেছেন। সত্যজ্ঞানের অলোকদীপ্তি দিয়ে কুসংস্কারের তমসার নিবিড়তা অপসারিত করাই তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'ফল কথা - আমি বৈদান্তিক; সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না।'[৫] এর পরেই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অন্য একটি পত্রে লিখেছেন, 'প্রথমতঃ আত্মা স্বাভাবত জ্ঞাতা নহেন। "সচ্চিদানন্দ" সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র; "নেতি নেতি" সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করে।'[৬]

আত্মস্বরূপের উপলব্ধির পথে মানুষকে ভেতরের দিক থেকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বহু নিষ্ঠাময় সাধনায় প্রশ্নের উত্তরও আসে নিজেরই অন্তরের গভীরতম স্তর থেকে। এইজন্যই তিনি বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, 'এই আত্মাই মানুষের অন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই জড় মনকে উহার যন্ত্র, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় উহার অন্তঃকরণরূপে ব্যবহার করেন, আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসহায়ে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কাজ করে।'[৭] ঋষিদৃষ্টির প্রজ্ঞা নিয়েই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সেই আত্মার চৈতন্য-স্বভাবকে এবং অবিনাশী অপরিণামী শাশ্বত সত্তাকে। চিরন্তন সত্যের যিনি ধ্যানী, তাঁরই ধ্যানদৃষ্টিতে ধরা পড়ে এই আত্মার স্বরূপ। আত্মস্বরূপ বিবেকানন্দ মহান আচার্যরূপে স্বদেশে ও বিদেশে এই আত্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন।

উপনিষদের প্রতিধ্বনি করে স্বামীজী বলেছিলেন, আত্মার এই দুরবগাহ তত্ত্বকে, অনন্ত আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাকে দূর করতে হবে। মস্তিষ্ক শরীরেরই অঙ্গ, তাই শরীরের অন্য অঙ্গগুলি দুর্বল হলে মস্তিষ্কের দুর্বলতাও অপরিহার্য। এই শারীরিক দুর্বলতা দূর করবার জন্যই তিনি ব্যবহারিক বেদান্তমূলক ভাষণে মাদ্রাজে একবার বলেছিলেন, 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে।' রক্ত তাজা হলে শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য যে আরও ভাল করে আমাদের দেশীয় তরুণগণ অনুভব করতে পারবে, এ-কথা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন। এ না বলে তাঁর উপায় ছিল না। অদ্বৈতবাদের মধ্যেই যে মহিমময় আত্মার উদ্ভাসন, এবং প্রত্যেকের মধ্যেই যে সেই আত্মার স্থিতিভূমি, এটুকু উপলব্ধি করবার জন্য যে শক্তির সাধনা অপরিহার্য, ভারতীয়দের সেদিন এ-কথা বুঝবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তা না হলে দরিদ্র নিপীড়িত বুভুক্ষু ভারতবাসীর জন্য সুদূর আমেরিকায় দুর্লভ শ্রদ্ধা ও সম্মানের মাল্য গলায় নিয়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যা ছেড়ে সারারাত অশ্রুপাত করতেন না। এই আত্মতত্ত্বের যে নিবিড় অনুভূতি, তার জন্যই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ ঋষিত্ব অর্জন করেছিলেন; অর্থাৎ তাঁরা আত্মস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে উপলব্ধি করে অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন।[৮] মৃত্যুহীন সত্তার উপলব্ধিই তো অমৃতত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই

৫ বাণী ও রচনা ৭।১২১
৬ তদেব ৭।১৪৭
৭ তদেব ৫।৩০৬
৮ তদেব ৫।১৪৮

ঋষিত্ব লাভই হিন্দুর নিকট মুক্তি।'[৯] ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, চিত্তশুদ্ধির নামই মুক্তি। চিত্তশুদ্ধির কথা স্বামীজীও উপলব্ধ প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। কারণ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত 'অভীঃ' মন্ত্রের দ্বারা উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর এই 'অভীঃ' মন্ত্রের উৎসমূলই হচ্ছে আত্মা। 'আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব থেকেই ভয়ের উদ্ভব ঘটে।'[১০] যে অনন্ত শক্তি অব্যক্তভাবে রয়েছেন, স্বামীজীর একমাত্র বক্তব্য, তাঁকেই ব্যক্ত করে তুলতে হবে। 'ভারত জগৎকে এক মহাশক্তি শিখাইবে, কারণ ইহা আর কোথাও নাই। ইহাই আধ্যাত্মিকতা— ইহাই আত্মবিজ্ঞান।'[১১] এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বামীজী একবার যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তিনি সাধারণত দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন। সচরাচর কখনো অদ্বৈতবাদের শিক্ষাদানে উৎসাহ বোধ করতেন না। কিন্তু আমাকে তিনি সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। পূর্বে আমি দ্বৈতবাদী ছিলাম।'[১২] অপার অতল সত্যের শিক্ষাদাতা যুগাবতার একজন ঋষির ঋষিকে অদ্বৈততত্ত্বের যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষার উৎসমূল থেকেই অমৃতধারার প্রস্রবণ সমগ্র জগতের আত্মার অভিমুখে এইভাবেই অভিসিঞ্চনের লক্ষ্য নিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের শেষ পাদে। আজও তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তেমনি অবারিত গতিতে।

এইজন্যই আত্মস্বরূপ স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর উজ্জ্বল প্রত্যয়কে বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন এইভাবে, 'আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম। আমরা কি করিতেছি? ঠিক ইহার বিপরীত। আত্মাকে জড়বস্তুরূপে অনুভব করিতেছি। অমৃতস্বরূপ ঈশ্বর হইতে আমরা মৃত্যু ও জড়বস্তু নির্মাণ করি; এবং প্রাণহীন জড়বস্তু হইতে চেতন "আত্মা" সৃষ্টি করি।'[১৩] স্বামীজীর আসল কথাটি হচ্ছে, অমৃতস্বরূপ আত্মারূপী যে-ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। আত্মার পূর্ণাভিব্যক্তি একদিনে ঘটে না, ঘটে ধীরে ধীরে নিষ্ঠাময় সাধনার মধ্য দিয়ে। তাই এ-কথাও তিনি বলেছেন, 'ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সমষ্টি নয়, পরন্তু ধর্মকে ক্রমবিকাশ বলে মনে করতে হবে।'[১৪] ধর্ম তো নিজের সত্তার মধ্যেই। চিত্ত বা আত্মশুদ্ধির মধ্যেই তো ধর্মের নিগূঢ় মর্মরূপ। ধর্ম কাউকে কিছু নতুন জিনিস দান করে না, ধর্ম শুধু সমস্ত বাধাবিঘ্নকে দূর করে দিয়ে আত্মার প্রতি দৃষ্টি দিতে শেখায়।[১৫] এইজন্যই তিনি বেদের কর্মকাণ্ডের দিক পরিহার করে জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। সত্যজ্ঞান লাভ করলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ ও অজ্ঞানতার কুয়াশা যেমন দূরীভূত হবে, তেমনি এক সামগ্রিক ঐক্যবোধের আনন্দসীমায় পৌঁছান যাবে। দ্বৈতবাদ মুছে যাবে চিরদিনের জন্য। কিন্তু এই জ্ঞান কখনো যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে সাধিত হয় না; এই আত্মিক জ্ঞান আসে মনন, অনুসন্ধান এবং একনিষ্ঠ আরাধনার দ্বারা।[১৬] দর্পণের ধূলি-জঞ্জালকে দূরে সরিয়ে দিলেই ভেতরকার উজ্জ্বলতার আত্মপ্রকাশ

৯ তদেব ৫।১৪৮ ১০ তদেব ৫।৫৩ ১১ তদেব ৫।৫২

১২ 'He used generally to teach dualism. As a rule, he never taught Advaitism. But he taught it to me. I had been a dualist before.' C. W. VII, p. 412

১৩ বাণী ও রচনা ৮।৪৪০ ১৪ তদেব ৮।৪৪০ ১৫ C. W. VII, p. 62

১৬ C. W. VII, p. 42

হতে দেরী হয় না ; ঠিক তেমনি মনের মালিন্যকে দূর করতে পারলেই বুঝতে পারা যায় যে, আত্মাই ব্রহ্ম। তাই তাঁর বাণী জেগেছিল মিস মেরী হেলকে লিখিত একটি চিঠিতে,—'সব রকম ভাবালুতা ও আবেগ দূর করতে আমি বদ্ধ পরিকর, ...আমি হলাম অদ্বৈতবাদী ; জ্ঞান আমাদের লক্ষ্য —ভাবাবেগ নয়,...আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ।'[১৭] এখানে দেখা যায়, আত্মসংবিদের পুণ্যপ্রদীপ মিস হেলের অন্তরের গভীরে জ্বালিয়ে দিতে চাইছেন স্বামীজী। খাদ মিশানো মনকে পরমতম ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর করতে চাইছেন। এর পরেই তিনি আবার বলেছেন, 'আমার উপর কারও কোনো অধিকার নেই, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই।'[১৮] এ সবই অপরের শিক্ষার জন্য। স্বাভাবিক জীবনধর্মের মর্মমূল থেকে কিভাবে আত্মতত্ত্বকে উদ্ধার করতে হয় তা শেখানোই তাঁর জীবনব্রত হয়ে দেখা দিয়েছিল। জ্ঞানের উপর যে-সমস্ত আবরণ পড়ে থাকে, মহৎকর্ম সেই আবরণটিকে দূর করে দেয় ; এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি। স্বামীজী বলেন, 'Jnana-bala-kriya (knowledge, power, activity) is God.'[১৯] অর্থাৎ জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর। সেই সগুণ ঈশ্বরও আত্মারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[২০] এইজন্যই স্বামীজী বলেছিলেন, 'মানুষের স্বভাবে যে-মহত্ত্ব রয়েছে, তাকে কখনো ভুলো না। ভূত বা ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর কেউ হন নি, কোনোদিন হবেনও না। আমিই সেই অনন্ত সমুদ্র, খ্রীষ্ট ও বুদ্ধেরা তারই তরঙ্গমাত্র।'[২১]

এই আত্মস্বরূপের প্রাপ্তির সাধনের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী যেমন নিষ্কাম কর্মের উপর জোর দিয়েছেন, তেমনি ভক্তির কথাও বলেছেন—ভক্তিকে তিনি বাদ দেন নি। কারণ নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের ফলেই আমাদের ভক্তি লাভ ঘটে।[২২] এক কথায় বলতে গেলে, স্বামীজীর মতে জ্ঞান ও ভক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আত্মোপলব্ধির প্রত্যয়সিদ্ধ আবেগে যেমন তিনি বলেছেন, 'একমাত্র জ্ঞানই আমাদেরকে সম্পূর্ণতা দান করে।'[২৩] আবার তেমনি শঙ্করাচার্যের কথা উল্লেখ করেও বলেছেন, 'নিজস্ব সত্তার সুতীব্র-সন্ধানই হচ্ছে ভক্তি।'[২৪] সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, এ তাঁর সত্যানুভূতির মর্মলোক থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। সেইজন্যই কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও যোগের সমন্বয়কারী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শুনতে পাই, 'সচ্চিদানন্দ আমার আত্মার মহান রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না।'[২৫]

৫

স্বামীজীর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনায় তাঁর কয়েকটি পত্রকেই মুখ্য উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। মিস মেরী হেলকে

১৭ বাণী ও রচনা, ৮।১৪৩

১৮ তদেব ৮।১৪৪

১৯ C. W. VII, p. 56

২০ Ibid. p. 57

২১ 'Never forget the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I am.' Ibid. p. 78

২২ 'This absolute and continuous remembrance of the Lord is what is meant by Bhakti. This Bhakti is indirectly helped by all good works.' Ibid. p. 38

২৩ 'Knowledge alone can make us perfect.' Ibid. p. 38

২৪ 'Intense search after my own reality is Bhakti.' Ibid. p. 57

২৫ বাণী ও রচনা, ৭।১২১

লেখা ২৮।৩।১৯০০ তারিখের চিঠিতে পাই: 'সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই উর্ধ্বে।… এখন আমি সেই শান্তির—সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল বস্তুকে তার নিজের স্বরূপে আমি দেখছি, সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত নিজের ভাবে পরিপূর্ণ।…"আমি মুক্ত" অতএব আমার আনন্দের জন্য দ্বিতীয় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। "চির একাকী, কারণ আমি মুক্ত ছিলাম, এখনও মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকব"—এই হ'ল বেদান্তবাদ।…"আমি মুক্ত"। আমি একা—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"।'[২৬]

জীবনের প্রান্তলগ্নে পৌঁছে চিঠির মধ্যে হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন স্বামীজী। ১৮।৪।১৯০০ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিখানিই সম্ভবত এই সময়কার সবচেয়ে হৃদয়-গ্রাহী পত্র। তা থেকে একটু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন, কারণ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানিতেই বিশেষভাবে পাওয়া যায়। স্বামীজী লিখেছেন: 'আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার সমুদয় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।… লড়াইয়ে হার-জিত দুইই হ'ল—এখন পুঁটলি-পাটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। "অব শিব পার করো মেরা নেইয়া"—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু। যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধিমাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদবোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই!…যাই, প্রভু, যাই! · সেই পুরানো "বিবেকানন্দ" কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না! শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!'[২৭]

১৭ই জুন ১৯০০ তারিখে মিস মেরী হেলকে স্বামীজী লিখছেন: 'এখন প্রভু আমাকে অপর পারে নিয়ে চলুন। তাই হোক, প্রভু, তাই হোক। ভারত বা অন্য কোন দেশের জন্য চিন্তা আমি ত্যাগ করেছি।'[২৮]

২৫শে অগস্ট ১৯০০ তারিখে বেলুড় মঠের ট্রাস্ট-ডীড প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে লিখছেন স্বামীজী প্যারিস থেকে: 'এদিকে ট্রাস্টের দলিল-গুলি দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল; সুতরাং আমি ব্রিটিশ কনসালের আফিসে গিয়ে সই করে দিয়েছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে আমার আর কোন

২৬ বাণী ও রচনা, ৮।২২৪ ২৭ তদেব ৮।১৩১-২ ২৮ তদেব ৮।১৪২

ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও আমি ত্যাগ করেছি। এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন · এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল! আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ করছি। কুড়িটি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করলাম—তা ভুলের ভিতর দিয়েই হোক বা সাফল্যের ভিতর দিয়েই হোক—এখন আমি কাজ থেকে অবসর নিলাম।'[২৯]

এইভাবে দেখা যায় তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা ১৯০০ খৃষ্টাব্দে—পরিসমাপ্তি ৪ঠা জুলাই ১৯০২-এ।

৬

আত্মস্বরূপ স্বামীজী তাঁর এক শিষ্যকে লিখেছিলেন: 'হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।'[৩০] এই হৃদয় ও সহানুভূতির অপূর্ব আস্বাদ নিয়েই স্বামীজী শাশ্বতকালের জন্য ভারতের অধ্যাত্মরাজ্যে অমৃতত্বের অধিকারী। এইজন্যই মহাপ্রয়াণের দিন পূর্বাহ্ণে মঠের প্রাঙ্গণে পদচারণা করতে করতে 'তিনি আপন মনে বলেছিলেন, 'যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।'[৩১] অদূরে দাঁড়িয়ে স্বামী প্রেমানন্দজী শুনতে পেয়েছিলেন আত্মচৈতন্যের প্রত্যয়লব্ধ এই বাণী। ভারতীয় বেদান্তধর্মের উপলব্ধির ইতিবৃত্তের মহাপ্রাঙ্গণে এইরূপ আর একটি আত্মস্বরূপতার প্রত্যয়-উজ্জ্বল মহাপুরুষের আবির্ভাব কবে ঘটবে, তা কেবল ভারতেরই ভবিতব্যের প্রশ্ন হয়ে থাকবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চাবি-দেওয়া স্বরূপ-ঘরের সন্ধান স্বামীজী কাজ শেষ হলেই পেয়েছিলেন। নিজেকে জানতে পেরেছিলেন অন্তর পুরুষের সহজাত অনুজ্ঞা থেকেই। এই অন্তরপুরুষ একদিকে অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে স্বামীজীর অন্তরাত্মা।

২৯ তদেব ৮।১৫২　　৩০ তদেব ৬।৩৬৪　　৩১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩।৪৫৬

বাংলার নারী-উন্নয়ন আন্দোলন

ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ পর্বঃ নারী-উন্নয়নে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

(১)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার একটি অনন্যসাধারণ গৌরবমণ্ডিত পরিবার। তার সহিত প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন আর একটি পরিবার আমাদের বিশাল দেশের আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নাই। সম্পূর্ণ একটি শতাব্দী ধরে এই পরিবারের মানুষ বাংলার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন অধিকার করে এসেছেন। দ্বারকানাথ ব্যবসায় ও সমাজ-উন্নয়নে, তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম-আন্দোলনে

এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির জগতে দেশের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু সমগ্র পরিবারের সন্তানদের মধ্যে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল যাতে তা সকল সাংস্কৃতিক এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য সকল কৃতিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। 97654

তাঁর সাধনা, ঋষিজনোচিত আচরণ এবং নিজ প্রবর্তিত ধর্মকে জাতীয় রূপ দেবার চেষ্টা তাঁকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করে গড়ে তুলেছিল। ফলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তাঁর পরিবারের মানুষ সকলেই তাঁকে অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা করত। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুদক্ষ-ভাবে পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলে তাঁর পরিবার এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছিল যা তাঁর সন্তানদের জাতীয়তাবোধে সংস্কৃতি-চর্চায় এবং সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে উৎসাহিত করত এবং অবাধ সুযোগ দিত। কার ঠাকুর কোম্পানি (Carr Tagore & Company) দেউলিয়া হবার পর তাঁর সুব্যবস্থায় সকল ঋণ পরিশোধ হবার পর পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি মোটামুটি আর্থিক সচ্ছলতা এনে দিয়েছিল। জমিদারী হতে যা আয় হত তাতে বিরাট পরিবারের অবাধ বিলাসের সুযোগ ছিল না; কিন্তু সাংস্কৃতিক চর্চায় কোনও বাধা সৃষ্টি করে নি। অতিরিক্তভাবে মহর্ষির দৃষ্টান্ত এবং মিতব্যয়িতার গুণে পরিবারের মানুষ আলস্য ও বিলাসে গা ঢেলে দিয়ে সাধারণ জমিদার বাড়ীর ছেলের মত জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হন নি। তাঁরা নানা প্রগতিশীল আন্দোলনে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন এবং নানা-ভাবে সংস্কৃতি-চর্চা করে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করবার সাধনা করতেন।

মহর্ষি নিজে ধর্ম-আন্দোলনে এবং সাধন-জীবনে ডুবে থাকলেও সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর সহানুভূতি ছিল। কাজেই নারী-উন্নয়ন আন্দোলনেও তাঁর অন্তরের অনুমোদন ছিল। তার কয়েকটি ভাল প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন প্রথম বেথুন বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়, তখন তিনি তাঁর প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে সেখানে ভর্তি করে দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহকে আইনসম্মত করবার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদন-পত্র স্থাপন করেন, তখন মহর্ষি তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন। অনুরূপভাবে হিন্দুসমাজে পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আবেদন-পত্র স্থাপন করেন, মহর্ষি তাতেও স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই তাঁর পরিবারের মানুষের পক্ষে নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল।

এখন সংক্ষেপে মহর্ষির পরিবারের মানুষরা নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন তার একটি পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি। আমরা দেখব এতে বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বধূ সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে একটি জমিদার পরিবারে মেয়েদের যে অবরোধের মধ্যে বাস করতে হত, সে অবরোধ-প্রথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নারীর শিক্ষা, নারীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান, নারীর সক্রিয় সাহিত্যচর্চা, এমন কি বাহিরে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া এই পরিবারের মহিলাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এ পরিবারে সেকালের রীতি অনুযায়ী নাকি কঠোরভাবে অবরোধ-প্রথা পালন করা হত। তার নিদর্শনস্বরূপ এখনও মহর্ষি-ভবনে এমন একটি সিঁড়ি আছে যা চারদিক হতে ঘেরা। সেটি নাকি অন্দরমহলে মহিলাদের উপরনীচে করবার জন্যে সংরক্ষিত ছিল। উদ্দেশ্য, এই সিঁড়ি ব্যবহার করলে বাহির মহলের কোনও পুরুষের

দৃষ্টি তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। আরও কাহিনী আছে যে, সেকালে বাড়ীর মেয়েদের গঙ্গাস্নান করতে হলে অন্দরমহল হতেই পাল্কী চড়ে যেতে হত এবং পাল্কীর বাহিরে না যেতে দিয়ে পাল্কীশুদ্ধ তাঁদের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হত।

(২)

মহর্ষির পরিবারে যিনি এই কঠিন পর্দাপ্রথা ভাঙতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি বেশ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে যে প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা হয়, তাতে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তখন সবে ভারতীয়দের নিকট সিভিল সার্ভিসের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। তিনি তার সুযোগ নিয়ে বিলাতে গিয়ে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান হিসাবে পরের বৎসর বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কাজে যোগ দেন। পরে চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার কিছু আগে অবসর গ্রহণ করে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হতে বালিগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন।

প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান হিসাবে তাঁর খ্যাতি। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল তাঁর নারী-উন্নয়ন আন্দোলন। সেকালে গৌরীদানের যুগে নিতান্ত বালিকা বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত এবং স্বামীদের গৃহে এসে বাস করতে হত। তাদের শিক্ষারও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অন্তঃপুরে অসূর্যম্পশ্যা বন্দিনী ভাবেই তাদের জীবন যাপন করতে হত। কর্মে, বচনে, চিন্তায় তাদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ত প্রশ্নই ওঠে না। ঘরের বাহিরে মেয়েদের চলাফেরার কোনও স্বাধীনতা ছিল না। মনুর নির্দেশ অনুসারে বাল্যে পিতার অধীনে থাকতে হত, বয়স হলে স্বামীর অধীনে জীবন কাটত এবং বার্ধক্যে বিধবা অবস্থায় পুত্রের আশ্রিত হয়ে বাস করতে হত। মেয়েদের এই পঙ্গু, বদ্ধ জীবন বাল্যকালে সত্যেন্দ্রনাথের মনকে অত্যন্ত পীড়া দিত।

সুতরাং বাল্যকালেই সমাজব্যবস্থা অনুসারে নারীজাতির এই দুর্দশা তাঁর মনে গভীর সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। তাই দেখি বাল্যকাল হতেই নারীর উপর এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে সুরু করেছিলেন। এই নিয়ে নিতান্ত বালক অবস্থাতেই মায়ের সঙ্গে তাঁর তর্ক লেগে যেত। তাঁর বাল্যকথা' নামে পুস্তকে এবিষয় উল্লেখ আছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?' আমাদের অন্তঃপুরে কয়েদখানার মত যে নবাবী বন্দোবস্ত ছিল, তা আমার আদবে ভাল লাগত না। আমার মনে হত, এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।"

তাই মনে হয় তিনি যেন উত্তর-জীবনে এই পরিবারে নারীজাতির স্বাধীনতা স্থাপনকে জীবনের মুখ্যব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয় তাঁর মনের দৃঢ়তা এত বেশী ছিল যে, প্রয়োজন হলে গুরুজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তার সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের বিবাহের পরে একটি পারিবারিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

তাঁর বিবাহ হয় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহিত। তাঁর পিতা ছিলেন যশোহরের মানুষ। কলিকাতায় তাঁর নিজস্ব কোনও বাড়ী ছিল না। একবার তাঁর পিতা কলিকাতায় একখানি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। সে সময় তাঁর মা তাঁর কলিকাতার ভাড়া বাড়ীতে

তাঁকে আনিয়ে নিয়ে কিছুকাল নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং অসঙ্গতও নয়। কিন্তু বাদ সাধল সত্যেন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবীর সংস্কারবোধ। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ হল নিজের শ্বশুরবাড়ীর আভিজাত্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের অতিসচেতনতা। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে আত্মীয়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়ীতে উঠলে শ্বশুর পরিবারের মান থাকে না। তাঁর সংস্কার মেয়ের মায়ের ব্যাকুলতার কথা ভাবতে সুযোগই দিল না।

মায়ের এই নির্দেশের খবর সত্যেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হল। তিনি এটি নারীজাতির প্রতি অত্যাচারের নিদর্শন বলেই গ্রহণ করলেন। তাঁর মায়ের আদেশ তাঁর পত্নী ও কুটুম্বদের মনে গভীর বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি তখন পিতার নিকট গিয়ে সব বললেন এবং পিতাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানালেন। মায়ের যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল উদারহৃদয় পিতা তা সহজেই বুঝে ফেললেন। তিনি তখনই সারদা দেবীর কাছে গিয়ে যা বললেন তা আমরা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মুখে শুনে নিতে পারি। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন (ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী'):

"এসে মাকে বললেন—সত্যেন্দ্রের বউ-এর মা তাকে নিতে পাল্কী পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি ভাড়া বাড়ী বলে তাকে যেতে দাও নি? ভাড়া বাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও ও মায়ের কাছে যাবে। এখনি পাঠিয়ে দাও।'"

আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিলাতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবাস-জীবনে নারীকে অবরোধ হতে মুক্তি দেবার তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা আরও বলবতী হল। সে দেশে তিনি এমন একটি সমাজের মধ্যে স্থাপিত হলেন যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা সর্বতোভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আহারে বিহারে সামাজিক অধিকারে সে দেশের নারী তখন পুরুষের সমস্থানীয়। অপরদিকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই সমাজের মানুষেরা তখন শৌর্যে, আধিপত্যে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছে। তাই তাঁর মনে হয়েছিল এই জাতির সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ তাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তাঁর এই ধারণা সমর্থনযোগ্য বৈ কি। সমাজদেহ চলে দুটি পায়ের উপর নির্ভর করে। তাদের একটি যদি হয় পুরুষ অপরটি হল নারী। একটি পা পঙ্গু হলে চলতে কত অসুবিধা হয়। আমাদের দেশের সমাজবিধি নারীকে পঙ্গু করে রেখেছে; তাই আমরা এত দুর্বল। অপরপক্ষে এরা নারীকে সমান অধিকার দিয়ে সমানে সহযোগিতা করবার সুযোগ দিয়েছে। তাই তারা এত প্রবল জাতি। এই ধরনের চিন্তা তাঁর মনে তখন ক্রিয়া করছিল। প্রবাস হতে তাঁর পত্নীকে তিনি যেসব চিঠি লিখতেন তাতে এই ধরনের চিন্তা প্রকট হত। তাদের একটি হতে প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"এ দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যত বিষয়েই ভিন্নতা থাকুক, এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু, সুন্দর, প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে স্ত্রীসৌভাগ্য অনেক দূর।" (১৬।১১।১৮৬৩ তারিখের চিঠি)

এইসব চিন্তার ফলে প্রবাস-জীবনে তাঁর মনে একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়েছিল যে, তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে আনিয়ে সেখানকার সমাজের সহিত পরিচয় করিয়ে দেবেন।

সেখানকার সমাজের সহিত পরিচিত হলে সেখানে মেয়েরা কতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, তার আস্বাদ পেলে এঁরও মনে নিজের দেশে অনুরূপ সামাজিক পরিবেশ রচনা করবার প্রেরণা আসবে। অর্থাৎ নারীস্বাধীনতা-আন্দোলনে সহধর্মিণীকে সহযোদ্ধায় রূপান্তরিত করবার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি প্রবাস-জীবনে তাঁকে কাছে চেয়েছিলেন। এই প্রস্তাবটি তাঁর পিতার নিকট তিনি স্থাপনও করেছিলেন। কিন্তু মহর্ষি নানা-বিষয়ে উদার হলেও তাঁর স্বাভাবিক রক্ষণশীল মনোভাব এ-প্রস্তাবে তাঁকে সম্মতি দিতে বাধা দিয়েছিল। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথের সে ইচ্ছা তখন অপূর্ণ রয়ে যায়। সে দুঃখ তিনি স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে লিখে মনকে হাল্কা করতে চেয়েছিলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন :

"আমি একবার ভাবিয়াছিলাম তুমি যদি কোন রকম করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া এখানকার উন্নত সমাজের মধ্যে বাস করিতে পার তবে আমার এখানে যাহা কিছু শিক্ষা ও উন্নতি লাভ হইয়াছে, তুমিও তাহার ভাগী হইতে পার। এই অভিপ্রায়ে তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন, বাবা মহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবা মহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি।" (২।৪।১৮৬৪ তারিখের চিঠি)।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে বোম্বাই প্রদেশে কাজে যোগ দেবার আগে তিনি কলিকাতায় আসেন। তখন তিনি মনকে প্রস্তুত করে ফেলেছেন যে, দেশে তাঁর অন্যতম ভূমিকা হবে মেয়েদের পিঞ্জরবদ্ধ অবরুদ্ধ অন্তঃপুরিকার বিড়ম্বিত জীবন হতে মুক্তিদাতার। এই উদ্দেশ্যের কথা তাঁর স্মৃতিচারণে স্পষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"আমাদের স্ত্রীরা পর্দার অন্ধকারে কি খর্বাকৃতি বদ্ধ জীবন যাপন করেন—উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সংকীর্ণ—তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়া কিছুই স্ফূর্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্দা উচ্ছেদস্পৃহা আরও জেগে উঠল।" (আমার বাল্যকথা)।

এই পর্দা উচ্ছেদ অভিযান তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিয়েই সুরু হয়েছিল। এ বিষয় তিনি স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণীর ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী যখন চাকুরীতে যোগ দেবার জন্য বোম্বাই রওনা হন, তিনি তখন পর্দা হতে নিজেকে মুক্ত করেই বেরিয়েছিলেন। সেই প্রথম এ-বাড়ীর বধূ দশজন পুরুষের সামনে প্রকাশ্যে বাহির হয়েছিলেন। তারপর প্রবাসে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পত্নীরা যেভাবে জীবন যাপন করতেন সেইভাবেই জীবন যাপন করেছিলেন।

এইভাবে পত্নীকে প্রবাসে মুক্ত জীবনের সহিত অভ্যস্ত করিয়ে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যখন প্রথম জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছুটি কাটাতে আসেন তখন পর্দাপ্রথা ভাঙার কাজ পরিবারের মধ্যেই আরম্ভ করে দেন। কলিকাতায় লাটপ্রাসাদ হতে বিলাতী রীতি অনুসারে তাঁদের উভয়েরই নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাঁরা উভয়েই সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ীর প্রচলিত পর্দাপ্রথার উপর দারুণ আঘাত হেনেছিলেন, এ-কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথের নিজের মুখেই শোনা যেতে পারে। 'আমার বাল্যকথা'য় তিনি লিখেছেন :

"আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহাব্যাপার! শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগে, লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে

পালিয়ে গেলেন।”

প্রসন্নকুমার ছিলেন এই ঠাকুরপরিবারেরই পাথুরিয়াঘাটা শাখার বিখ্যাত মানুষ। তিনি সম্পর্কে মহর্ষির পিতৃব্যস্থানীয় এবং সেই অধিকারবলে ঠাকুরপরিবারের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এ-ঘটনা কলিকাতার সমাজে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। রক্ষণশীল সমাজ যেমন আঘাত পেয়েছিল, সমাজের প্রগতিশীল অংশ তেমন তাতে খুসী হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে আই. সি. এস. পরীক্ষা উপলক্ষ্যে প্রবাসে থাকবার সময় সত্যেন্দ্রনাথের মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল যে, তাঁর পত্নীকে ইংলণ্ডের সমাজের সহিত পরিচিত করিয়ে দেবেন। মহর্ষি আপত্তি করায় তাঁর সে ইচ্ছা তখন পূর্ণ হয় নি। সে ইচ্ছা কিন্তু তিনি ত্যাগ করেন নি। সে ইচ্ছা পূরণের সুযোগ এল যখন তিনি বোম্বাই প্রদেশের সিভিলিয়ান হিসাবে জীবন যাপন করছেন।

তখন প্রথম সুযোগেই সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সন্তানদের নিয়ে বেশ কিছুকাল একাই স্বাধীনভাবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রবাসে সংসার চালাতে অভ্যস্ত হন। তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাতে যেমন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলাতের সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের সুযোগ হবে, তেমনই তিনি আত্মনির্ভর হতে শিখবেন, পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার অভ্যাস পরিবর্তিত হবে।

সেই কারণে ব্যবস্থা হয়েছিল এই রকম। তখন তাঁদের দুই পুত্র ও এক কন্যা। ঠিক হল তিনটি সন্তানকে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একাই আগে রওনা হবেন। এইভাবে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক ইংরেজ দম্পতীর সঙ্গে তিনি বিলাত রওনা হয়ে যান। বিলাতে প্রথম তিনি ওঠেন মহর্ষির জ্ঞাতিভ্রাতা প্রসন্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের লণ্ডনের বাড়ীতে। সেখান হতে পরে ব্রাইটনে গিয়ে তাঁরা বাস করতে আরম্ভ করেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ লম্বা ছুটি নিয়ে তাঁদের সহিত যোগ দেন এবং সকলে মিলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতে ফিরে আসেন। বিলাতে একাকিনী প্রবাস-জীবন যাপন করে তিনি নিশ্চয় পাশ্চাত্য মহিলাদের মত স্বাবলম্বিনী হবার ক্ষমতা ভালভাবে অর্জন করেছিলেন। তার খুব ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হতে। প্রবাসে একা থাকার সময় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। তার চিকিৎসা করা, সেবা করা এবং নিদারুণ সন্তানবিয়োগশোক সঙ্গীবিহীন অবস্থায় একাকী বহন করা—সবই তিনি পেরেছিলেন।

এইভাবে দীর্ঘ প্রবাসবাসের ফলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষে অভিযানের উপযুক্ত সহকর্মিণী হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। বিলাতের নারীসমাজের সংস্পর্শে এসে তিনি স্বামীর আশা পূরণ করেছিলেন, তাঁদের সদ্গুণগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করে। স্বামী যা চাইতেন, নিজের আচরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি শুধু ঠাকুরবাড়ীর পর্দাপ্রথার বিলোপসাধন করেন নি, দেশের স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রাথমিক কাজও এগিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামী নিজের মনে মহিলাদের দুর্গতিমোচনের জন্য যে ইচ্ছা পোষণ করতেন, তিনি উপযুক্ত সহধর্মিণীরূপে তা পূরণ করেছিলেন।

এই অভিযানের ফলে ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে দারুণ পরিবর্তন এসেছিল। তার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিকথায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

“আমাদের বাড়ীতে মেজদাদাই এ সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন সেমিজ, জামা, জুতা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম, তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্কার

যছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।" (সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি)।

সৌদামিনী দেবী জোড়াসাঁকোর বাড়ীর মেয়ে-মহলে যে আমূল পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রেরণা সত্যেন্দ্রনাথের কাছ হতে এসে থাকলেও, তাকে রূপ দিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তিনি দুঃসাহসিকতার সহিত আপন আচরণের মধ্য দিয়ে এই সকল পরিবর্তন প্রবর্তন করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। সেকালে মধ্যবিত্ত বা ধনী হিন্দু মেয়েরা একরকম অবরোধবাসিনী হয়ে থাকতেন। যে পরিবারের আভিজাত্য যত পরিমাণে বেশী, সেই পরিমাণে অবরোধবাসের কঠোরতা বেশী ছিল। ঠাকুরবাড়ীতে মেয়েরা পাল্কী ছাড়া বাড়ীর বাহিরে যেতে পারতেন না। তখনকার এই অবরোধপ্রথার কঠোরতার ফলে মেয়েদের বাহিরে যাবার উপযুক্ত বেশও ছিল না। বাড়ীর অন্দরমহলে একখানি সাড়ি মাত্র অবলম্বন করে শালীনতা রক্ষা করতে হত। বাহিরে গেলে তার উপর একটি চাদর গায়ে ঢাকা দেওয়া হত। আর ঘোমটা এমন লম্বা হত যে মুখ একেবারে ঢাকা পড়ে যেত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রথম বাহিরে যাবার সজ্জা উদ্ভাবন করে বাঙালী মহিলার অবরোধপ্রথা ভাঙবার পথ উন্মুক্ত করে দেন। তিনিই প্রথম মেয়েদের মধ্যে অন্তর্বাস ব্যবহার প্রথা প্রচলিত করেন। এমন কি বর্তমানে যে 'কুঁচি' করে সাড়ি পরবার রীতি প্রচলিত আছে, তিনিই বাঙালীর সমাজে এই ধরনের রীতি প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন।

(৩)

মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথেরও নারী-উন্নয়ন-আন্দোলনে কিছু ভূমিকা ছিল। তা সামান্য হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পরিবারের ছেলেদের এবং মেয়েদের বাংলা সাহিত্য শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। আমরা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' হতে জানতে পারি শৈশবে এক সময় হেমেন্দ্রনাথই তাঁর শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর কাছে শৈশবে বাংলা শিক্ষা করে ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন সে কথা তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে যা তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল তিনি মেয়েদের এবং পুত্রবধূদেরও বাংলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার পাট এক রকম ছিল না। কারণ, একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিল যে লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। ঠাকুরবাড়ীর তরুণরা এ-রীতি মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বিবাহ হত নিতান্ত বালিকা বয়সে এবং অক্ষর-জ্ঞানবিহীন অবস্থাতেই তাঁরা শ্বশুরবাড়ীতে বাস করতে আসতেন। তাই হেমেন্দ্রনাথ বাড়ীতে বাংলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে যে সব বালিকাবয়সী নবীন বধূরা আসতেন, তাঁরাও তাঁর কাছে বাংলা শিখতে বাধ্য হতেন। তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

(৪)

এইবার এই বাড়ীর আর এক বধূর নারী-উন্নয়ন-আন্দোলনে ভূমিকার কথা উল্লেখ করবার সময় হয়েছে। তিনি হলেন মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে তিনি এই বাড়ীতে বধূরূপে আসেন। এই বাড়ীর নূতন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে তিনি নিজেকে মনের মত করে গড়ে তোলেন। সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে কাব্যসাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। সেই সূত্রে তাঁর অল্পকালস্থায়ী জীবনে দেশকে তিনি দুটি জিনিস দিয়ে গেছেন।

প্রথম হল স্নেহ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, প্রয়োজন হলে নিরুৎসাহ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তিকে তিনি পরিস্ফুট করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে না। কাজেই সবিস্তারে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় হল এই বাড়ীতেই অন্দরমহলে সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি অবরোধ-জীবনের উপর একটি নূতন আঘাত হেনেছিলেন। আমাদের আলোচনা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হতে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি সেখানে বলেছেন:

"সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চার আমি অংশীদার ছিলাম।"

সে-সময় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পরিগণিত হতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য রচনা করে এবং বাংলায় সনেট লিখে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক নূতন যুগ এনেছিলেন। তাঁর অনুসরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন আরও মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। বিহারীলাল ঠিক সে-পথে যান নি। তাঁর আকর্ষণ ছিল গীতি-কবিতার প্রতি। প্রকৃত গীতি-কবিতার বাংলা সাহিত্যে আমদানী তিনিই প্রথম করেন। সুতরাং এ-বিষয় তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন। তরুণ বয়সের রচনায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধু। সেই সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল। কাদম্বরী দেবী তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। শ্রদ্ধা জানাতে তাঁকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। এইভাবে দুজনের মধ্যে একটি মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। একজন কবি, অপরজন ভক্ত, কাব্যই এঁদের যোগসূত্র। এইভাবে কাদম্বরী দেবীর সাহিত্য-প্রীতি অন্দর-মহলের কঠোর অবরোধ ভাঙায় সাহায্য করেছিল। বাহিরের মানুষের জন্যও সেখানে দরজা খুলে গিয়েছিল।

কাদম্বরী দেবী এই শ্রদ্ধাভাজন কবিকে শুধু খাইয়েই তৃপ্তি পান নি, তাঁকে কিছু উপহারও দিয়েছিলেন। সেই উপহারকে কেন্দ্র করে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছিল। কাদম্বরী দেবী স্বহস্তে একটি আসন বুনে তার মাঝখানে কবির 'সারদামঙ্গল' হতে এই স্তবকটি উদ্ধৃত করে বসিয়েছিলেন:

হে যোগেন্দ্র, যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও।

মনে হয় এটি শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা নয়, এর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি প্রশ্নার্থ ছিল। কাদম্বরী দেবী এ-প্রশ্ন কবিকেই করেছিলেন। কবি বিহারীলালও তার মধ্যে সেই অর্থই পেয়েছিলেন। তাই দেখি, এই গুণী মহিলার অকাল-মৃত্যুর পরে তাঁর উপহৃত আসনে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল কবি একটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থে তার উত্তর দিয়েছিলেন। তার নাম রেখেছিলেন 'সাধের আসন'। তিনি বলেছিলেন যোগেন্দ্র মহাদেবের ধ্যানের বিষয় ছাড়া আর কিছু তিনি জানেন না এবং সেই কাব্যগ্রন্থে যোগেন্দ্রের ধ্যানের বিষয়কেই স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং কাব্যটির জন্মকথা যেমন নাটকীয় তার বিষয়বস্তুও অসাধারণ। নেপথ্যে থেকে কাদম্বরী দেবী নানাভাবে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে গেছেন।

কাদম্বরী দেবীর আনুকূল্যে আর একটি অভাবনীয় জিনিস সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য এ বিষয় উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁর স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশও অনুকূল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটক যখন বাঙালীর উদ্যমে প্রথম সুরু হয়, তখন অপেশাদার মহলে পুরুষ দ্বারাই নারীচরিত্র অভিনীত হত। সেকালের পর্দার যুগে গৃহস্থ-ঘরের মহিলারা এসে নারীচরিত্র অভিনয় করবেন, তা ছিল অভাবনীয়। কিন্তু এ বিষয় কাদম্বরী দেবীই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে।

(৫)

মহর্ষির মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র গণেন্দ্রনাথের নাট্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বাস করতেন ৫নং বাড়ীতে। সেটা এখন নেই। তার জায়গায় যে মাঠ আছে সেখানে আজকাল রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা স্থাপন করেন। এই বৎসরেই সেখানে তিনি মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করান। সেই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অহল্যা দেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আরও কিছুকাল পরে দেখি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুরবাড়ীতে বিদ্বজ্জন সমাগম নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাতে যেমন সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা ছিল, তেমনি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। একে উপলক্ষ্য করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধের উদ্দীপক নানা নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটক শুধু বিদ্বজ্জন সভায় পঠিত হত না অভিনীতও হত।

এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত একটি নাটকের অভিনয় আমাদের কাছে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করে তার নাম দেন 'এমন কর্ম আর করব না'। তার নাম পরে পরিবর্তন করে 'অলীক বাবু' রাখা হয়। সেই নামেই তা এখনও জনপ্রিয় হয়ে বেঁচে আছে। এখন আমাদের সম্পর্ক বিদ্বজ্জন সমাগমের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নাটকের ঠাকুরবাড়ীর মানুষদের দিয়ে প্রথম অভিনয় নিয়ে।

নাটকটি রচনার অল্পকাল পরেই অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকে হেমাঙ্গিনী চরিত্রে তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবী অভিনয় করেছিলেন। সুতরাং তিনি বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে স্ত্রীচরিত্রের ভূমিকায় বাংলাদেশে প্রথম অভিনয় করেছিলেন। নারীপ্রগতির পথে এটি নিশ্চয় একটি বড় পদক্ষেপ। সুতরাং এটি তাঁর বড় কৃতিত্ব।

এর পরে ঠাকুরবাড়ীতে নারীচরিত্রে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই নামতেন। তার আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এসে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামে গীতিনাট্যটি রচনা করেন। তাও বিদ্বজ্জন সমাগমের পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাকুরবাড়ীর ছাদে অভিনীত হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেন। সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন হেমেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা প্রতিভা দেবী। পরে বিখ্যাত ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এইভাবে ঠাকুরবাড়ীর আনুকূল্যে রঙ্গমঞ্চে পুরনারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই দৃষ্টান্তের সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল আরও অনেক পরে। মণিপুরে ঘরের মেয়েরা নাচে ও নাচ দেখে, কারণ তা সেখানে পূজার অঙ্গ বলে স্বীকৃত। আমাদের সমাজে মেয়েদের নাচ একেবারেই অপাংক্তেয় ছিল। যে-মেয়ে নাচত তার সমাজে কোনও স্থান ছিল না এবং

যারা সে নাচ দেখত, তাদেরও মানুষ শ্রদ্ধা করত না। এশিয়ার অন্যত্র কিন্তু নৃত্য উচ্চ স্থান পেয়েছে। জাপানী মেয়েদের নৃত্য আদরের বস্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন জাপানে যান, তখন মাননীয় অতিথি হিসাবে তাঁকে জাপানী মেয়েদের নাচ দেখানো হয়। সে নাচের উৎকর্ষ যেমন তাঁকে মুগ্ধ করে, তেমন তাদের অঙ্গসজ্জার শালীনতাও মুগ্ধ করেছিল (জাপান যাত্রী-১৪)। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যাভা ভ্রমণে গিয়ে তিনি বলিদ্বীপের নাচ দেখে আসেন। বাসীরা হিন্দু। তাদের মেয়েরাও নৃত্যকে ধর্মের অঙ্গ করে নিয়েছে। তাদের নাচও তাঁকে মুগ্ধ করে।

জাপানী মেয়েদের নৃত্য দেখে শান্তিনিকেতনের উৎসবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যকে স্থান দেওয়ার ইচ্ছা হয়। তার ফলে দেখি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শান্তি-নিকেতনের উৎসবে নৃত্য স্থান পেয়েছে। সেই বৎসর 'অচলায়তনে'র গানের সঙ্গে মূকাভিনয় ও দেহভঙ্গির সাহায্যে গানের ভাবের রূপ দেওয়া হয়েছিল। তাই দেখি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মণিপুরী রীতিতে 'নটীর পূজা'র নৃত্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নটরাজ' কাব্যনাট্যের সঙ্গে মণিপুরী নৃত্য সংযোজিত হয়। একই সময় এর পরিবর্তিত রূপ 'ঋতুরঙ্গে' দক্ষিণী রীতির নৃত্য প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ কথাকলি ও ভরতনাট্যম্-এর প্রভাব তার ওপর এসে পড়ে।

পরের অবস্থায় দেখা যায় শুধু নৃত্যনাট্য নয়, বিদেশী নৃত্যেরও সংযোজন সুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যরীতিতে নানা রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। উদ্দেশ্য, অভিনয়কে যতখানি সম্ভব মাধুর্যমণ্ডিত করা। এখানে নাট্যরথ যেন নৃত্য ও সঙ্গীতের যুগল অশ্ব দ্বারা দর্শকের হৃদয় অধিকার করবার অভিযানে পরিচালিত করা হয়েছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে 'নবীনে'র অভিনয়ে যে নৃত্য প্রবর্তিত হয় তাতে যেমন মণিপুরী রীতি স্থান পেয়েছিল, তেমন বাউল নৃত্য, রাইবিশে নৃত্য এবং হাঙ্গেরীর লোকনৃত্য সংমিশ্রিত হয়েছিল। এই বছরেই 'শাপমোচনে'র অভিনয় ব্যালে নাচের আদর্শে গড়ে তোলা হয়। এই সব নৃত্যে মেয়েদের অংশ মেয়েরাই অভিনয় করত।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যরীতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্যাভিনয়ে। দুবছরের মধ্যে অন্য দুটি নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'র নৃত্যরূপ গড়ে ওঠে। প্রতিক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পূর্বের রচনা হতে সংগৃহীত কাহিনী অবলম্বন করে নৃত্যনাট্যের উপযোগী সংগীতধারা রচনা করেন। তারপর নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের নৃত্যরূপ দেন। তাদের মধ্যে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছিল। তারপর এই নৃত্যশিল্পীগোষ্ঠী বিখ্যাত শিল্প-পরিবেশক হরেন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে ভারতের নানাস্থানে নৃত্য দেখিয়ে আমাদের সংস্কৃতির একটি নূতন দিগন্ত প্রসারিত করে দেয়। ঘরের মেয়েরা, ছাত্রীরা এখানে শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

সুতরাং বলা যায়, ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্টতম মানুষের নেতৃত্বে নারীর অধিকার নৃত্যমঞ্চেও স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে নারীর মুক্তি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(৬)

বর্তমান যুগে বাঙালী মহিলারা সাহিত্যশিল্পী হিসাবে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। এই বিষয়েও প্রথম পথ প্রদর্শন করেন ঠাকুর-বাড়ীরই এক মেয়ে। নাম স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং রবীন্দ্র-নাথের থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে সাহিত্যরচনায় অতি অল্পবয়সেই আকৃষ্ট করে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য সাধনা আজীবন চলেছিল। কারণ, দেখি

তাঁর শেষ গ্রন্থ 'দিব্যকথন' নাটক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তার দুবছর পরেই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তিনি শুধু এই বিষয় পথপ্রদর্শিকা ছিলেন না। রচনার পরিমাণ ও সাহিত্যিক গুণও তাঁর যথেষ্ট ছিল। দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক, স্বরলিপি পুস্তক, সংকলিত পুস্তক ছাড়াও তিনি ২৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন :

"পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার কনিষ্ঠা (অনুজা) ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্যচর্চায় আমরা তাঁহাকেও একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেকে প্রথম মহিলা সম্পাদিকারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া পত্রিকা 'ভারতী' ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মলাভ করে। দ্বিজেন্দ্রাথ তার প্রথম সম্পাদক। নয় বৎসর পর স্বর্ণকুমারী দেবী এই সাংস্কৃতিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো (?) বৎসর কাল তার সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন।*

(৭)

ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা ছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভ করে চন্দ্রমুখী বসুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন ঠাকুরবাড়ীর দুই মেয়ে, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী। প্রথমা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা এবং মহর্ষির দৌহিত্রী। দ্বিতীয়া হলেন সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা এবং মহর্ষির পৌত্রী। সরলা দেবী ছিলেন ইন্দিরা দেবী হতে এক বছরের বড়। উভয়েই অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। সরলাদেবী পাশ করেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আর ইন্দিরা দেবী তার দুবছর পর। তিনি ঘরে পড়ে ফরাসী ভাষায় অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন।

সরলা দেবী 'জীবনের ঝরাপাতা' নামে যে আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন তাতে অনেক কথা পাওয়া যায়। তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যে অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁর মা 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকার দায়িত্ব হতে অবসর† গ্রহণ করবার পর তিনি ও তাঁর অগ্রজ ভগিনী হিরণ্ময়ী দেবী দুই বৎসর সেই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।†† তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে তিনি নিজে সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়ে তা তাঁর রবিমামাকে শোনাতেন এবং রবীন্দ্রনাথ তার অনুসরণে কিছু কিছু সঙ্গীত রচনা করে তাতে সরলা দেবী প্রদত্ত সুর প্রয়োগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আমার সোনার

* 'জীবনের ঝরাপাতা'-গ্রন্থের রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত (১৯৭৫) সংস্করণের ২১৭ পৃষ্ঠা হইতে 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সম্পাদক-সম্পাদিকার নাম ও কার্যকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রাবণ ১২৮৪-১২৯০ ; স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯১-১৩০১ ; হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী, ১৩০২-১৩০৪ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩০৫ ; সরলা দেবী, ১৩০৬-১৩১৪ ; স্বর্ণকুমারী দেবী, ১৩১৫-১৩২১ ; মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৩২২-১৩৩০ ; সরলা দেবী, ১৩৩১-আশ্বিন ১৩৩৩।—সঃ

† স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় দফায় সম্পাদনা-কাল : ১৩১৫-১৩২১। মোট সম্পাদনা-কাল প্রায় ১৮ বৎসর।—সঃ

†† রবীন্দ্রনাথ মাত্র এক বৎসর সম্পাদনা করেন (১৩০৫ বঙ্গাব্দ)।—সঃ

বাংলা' প্রভৃতি। তাঁর চরিত্রের একটি বড় গুণ ছিল তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করে যা ভাল বুঝতেন তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমালোচনা করে কিছু প্রতিকূল মন্তব্য করেন। সরলা দেবী তা অনুমোদন করতে পারেন নি। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"বড় হয়ে যখন বিচার-বিবেচনাশক্তি খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল তখন বঙ্কিমকে পড়ে দেখে অনুভব করলুম, বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করি নি আমরা, সেদিন মাতুলভক্তিতে অযথা বঙ্কিম-মত-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলুম।" (জীবনের ঝরাপাতা)।

তাঁর স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার এবং তা নির্ভয়ে প্রকাশ করবার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা পাই। মহর্ষি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দুধর্মের প্রতীকপূজাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তাকে পৌত্তলিকতা বলতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর পরিবারেও অল্পবিস্তর এই প্রতীকপূজার বিরোধী মনোভাব সক্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি মহর্ষির দৌহিত্রী হয়েও এই সংস্কারকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নূতন কথা বলতে সুরু করলেন।[১] সে কথা তাঁর মুখেই শোনা যাক :

"কোরাণ ও বাইবেলের দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন রায় সাকার পূজার বিরোধী হয়ে কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারার টীকা নেওয়া ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে আকারবর্জিত নিরাকার ঈশ্বরের প্রণিধানের পক্ষপাতী হল। কিন্তু পারলে কৈ? ঈশ্বরের চরণকল্পনা ব্যতিরেকে তাঁকে প্রণিপাত করা যায় না,…তাঁর আঁখি কল্পনা ব্যতিরেকে দিবীব চক্ষুরাততম্— আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহমাখা নির্নিমেষ আঁখি দেখা যায় না।… তা দোষের নয়, কারণ খ্রীষ্টানরাও তাই করেন। কিন্তু ছবিতে, মৃত্তিকায় বা প্রস্তরে আমার কাল্পনিক ভাবমূর্তিকে আকারযুক্ত করলেই Heathenism হল।" (জীবনের ঝরাপাতা)।

সরলা দেবীর এই মন্তব্যগুলি দেখায় তিনি গতানুগতিক পথে চলতে চাইতেন না, নিজের স্বাধীন[২] চিন্তায় যা ভাল বুঝতেন তাই বলতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা। পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবকে তিনি উপেক্ষা করতেন।

১ সুরু করিলেন কবে? যে-উদ্ধৃতিটি অব্যবহিত পরেই দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সরলা দেবীর যে-উক্তি আছে, তাহা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের—মহর্ষি তাহার ৪০ বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং ঠাকুরবাড়ীর গৌরবরবিও তাহার ৪ বৎসর পূর্বে অস্তমিত। সুতরাং সরলাদেবী ৭৩ বৎসর বয়সে (মৃত্যুবর্ষে) যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রাসঙ্গিক নহে। গবেষণার দ্বারা যদি আবিষ্কার করা যায় যে, ভারতী পত্রিকার সম্পাদনাকালে এই জাতীয় কোনও উক্তি তাঁহার সম্পাদকীয় রচনায় প্রকাশিত হইয়াছিল, অথবা ওই কালের এই ধরনের কোনও তথ্য পাওয়া যায়, তবেই তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক হয়। সেক্ষেত্রে উহা তাঁহার স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক না হইলেও স্বাধীনচিন্ততার পরিচায়ক বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবে।—সঃ

২ সরলা দেবীর স্বাধীন চিন্তা অবশ্যই ছিল—'জীবনের ঝরাপাতা'-গ্রন্থেই একাধিক স্থলে তিনি তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আলোচ্য উদ্ধৃতিটি ওই গ্রন্থের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত। উহার শিরোনাম : 'ভারতী সম্পাদনাসূত্রে অধ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রবেশ।' সমগ্র পরিচ্ছেদটি পড়িলেই উদ্ধৃতিটির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব—প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে পড়িলে ভ্রান্ত ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। সরলা দেবী ওই পরিচ্ছেদের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন অধ্যাত্মচিন্তায় তাঁহার মনের উপর স্বামী বিবেকানন্দের অপরিসীম প্রভাব। আদিতে আছে: 'স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আমার জীবননদী আর একটা ভাবের ধারায় ভরাট হল।' মধ্যে আছে: 'স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন, আমি মহর্ষির দৌহিত্রী বটে, ব্রাহ্মভাবে মানুষ বটে, কালী-দুর্গার

সরলা দেবীর সব থেকে বড় কীর্তি হল রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় অনুপ্রবেশ। তিনি বাঙালীর দুর্বলতা এবং অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার অক্ষমতা সহ্য করতে পারতেন না। কলিকাতায় সেকালে বাঙালীর জীবন অতি হেয় অবস্থায় অধঃপতিত হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়মের গোরা সৈন্য ময়দানে যখন বেড়াতে বের হত, পথে বাঙালী যুবক দেখলে লাথি মারত। কোনও সঙ্গত কারণ তার ছিল না; তারা যে শাসক জাতির প্রতিনিধি সেটাই তারা এই অপমানকর আচরণ দিয়ে প্রমাণ করে উল্লাস বোধ করত। কিন্তু বাঙালী তরুণ এত ভীরু ছিল যে তার প্রতিবাদ করতে সাহস করত না; অপমান নীরবে সহ্য করে কাপুরুষের মত ফিরে আসত।

বাঙালী তরুণের এই সাহসিকতার অভাব এই তেজস্বিনী মহিলার মনে বড় আঘাত দিয়েছিল। তিনি তাই বাঙালীকে বীর হতে, সাহসী হতে শিক্ষা দেবার এক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সেইজন্য দুর্গাপূজার অঙ্গ হিসাবে বীরাষ্টমী ব্রত প্রচলিত করেন। অষ্টমীর দিনে তরুণদের ব্রত নিতে হত কাপুরুষতা ত্যাগ করে বীর হবার, নির্ভীক হবার। অত্যাচার হলে অত্যাচারীকে প্রত্যাঘাত করতে তিনি শিক্ষা দিতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে অসংখ্য তরুণ বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সে পরিবেশ রচনা করায় তাঁর একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ইন্দিরা দেবী ছিলেন তুলনায় ধীর প্রকৃতির মানুষ এবং রবিকাকার একান্ত ভক্ত। পিতামাতা পরিবারে যে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, তিনি তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে সকল সুপ্ত গুণগুলি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উচ্চতম সম্মান লাভ করেছিলেন বি. এ. পরীক্ষায় ফরাসী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে। পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে সঙ্গীতচর্চায় উৎসাহিত করেছিল। ফলে তিনি পিয়ানো ও রবীন্দ্রসংগীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে' রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ অনুধাবন করতে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। শেষ বয়সে তিনি স্বামী প্রমথ চৌধুরী সহ শান্তিনিকেতনে বাস

বিদ্বেষপুষ্ট ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমার উপর খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বটে, এ সবই সত্য। কিন্তু তা হলেই বা? নরেন দত্তরূপে তিনি যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ‡ অনুগামী ছিলেন, তিনিও কি তখন ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন না? পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে সাকার-নিরাকার-ভেদের পর্দা তাঁর জ্ঞানচক্ষু থেকে আস্তে আস্তে সরে যায় নি কি? আমারও যেতে বাধা।' অন্তে আছে: 'তারপরে এলেন এক "Dynamic personality"—স্বামী বিবেকানন্দ। "Dynamic" সেই—যার ভিতর বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার শক্তি। সেই বারুদের আগুন থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ আমার ভিতর এসে পড়েছিল—আমায় ভেঙ্গে গড়ে তুলছিল।' সুতরাং আলোচ্য উদ্ধৃতিটি সরলা দেবীর স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক নহে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবেরই পরিচায়ক। আরও উল্লেখ্য যে, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদটি 'সম্পাদকীয় জীবন—স্বামী বিবেকানন্দ'-শীর্ষক একবিংশ পরিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতেই পঠনীয়, কারণ উহাতেও তাঁহার জীবনে স্বামীজীর অভ্যুদয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এ-বিষয়ে আরও অনেক তথ্য পরিবেশিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থানাভাব!—সঃ

‡ মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতে নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' বা 'আশার দলে' নাম লিখাইয়াছিলেন। তবে তিনি কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজেরও সভ্য ছিলেন এ-বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই সদস্য ছিলেন।—সঃ

করতেন। সেখানে বিশ্বভারতীর জন্য যখন প্রথম উপাচার্য পদ সৃষ্টি হয়, তিনিই সেই পদ অলংকৃত করেছিলেন। সুতরাং তিনিই ভারতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। তাই 'ছিন্ন পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত। তা বাংলা পত্রসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা গ্রহণ।

এই আশীর্বাদ তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল, কারণ তিনি পুরুষের সহিত সমান অধিকার পেয়ে নিজের সুপ্ত গুণগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন [ক্রমশঃ]

প্রসঙ্গতঃ

উদ্বোধন ৭৭তম বর্ষ ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত দুইটি গান সম্বন্ধে স্বামী প্রভানন্দের যে অভিমত আমরা উদ্বোধনের ৭৭তম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় (পৃঃ ৫৯৮) প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে বিষয়ে প্রথম গানটির সম্পর্কে লেখক আমাদের জানাইয়াছেন যে, এই গানটি সম্বন্ধে স্বামী প্রভানন্দের অভিমত ঠিক নয়। সম্প্রতি তিনি নীলকণ্ঠের রচিত গানটি চব্বিশপরগণা জেলার মাধবকাটি গ্রামের অধিবাসী শ্রীসুধীরচন্দ্র বৈরাগীর নিকট পাইয়াছেন এবং আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। কথামৃতকার এই গানটির প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন—"নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন, 'যার জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন' " (কথামৃত ৪।২২।৫), তাহা এই গানের মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে। --স্বামী প্রভানন্দ কর্তৃক উল্লেখিত রঘুনাথ রায় দেওয়ান রচিত গানের মধ্যে তাহা নাই। অধিকন্তু শ্রীসুধীরচন্দ্র বৈরাগীর নিকট প্রাপ্ত গানটি যে নীলকণ্ঠেরই রচিত, তাহা গানের শেষ কলিতে নীলকণ্ঠের ভণিতা হইতেই স্পষ্ট। গানটি আবিষ্কারের জন্য ডক্টর দত্ত আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ। গানটি হইল :

মহিষমর্দিনী মাতা শরতে ভুবনে আসে
দেখে অতসী-বরণা রূপ আনন্দে জগত হাসে।
অসুরনাশিনী বলে রক্তপদ্ম পদতলে
অঞ্জলি রচনা করে, অশুভ সব বিনাশে ॥
গঙ্গা যাঁর জটায় বহে রাজেশ্বরী তাঁর হৃদয়ে রহে,
সেই রাজরাজেশ্বরীর জগতে রূপ বিকাশে।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে জ্ঞান, ধন জাগায় বঙ্গে,
গণেশ কার্তিক দুয়ে সিদ্ধি বিজয় প্রকাশে ॥
দশদিকে বিভূতি মার বরাভয় ছড়ায় আর,
নীলকণ্ঠ বলে মাকে বসাই হৃদয়-বাসে ॥

—সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মিশনের বাত্যাত্রাণ সেবাকার্য

আবেদন

ক্রমান্বয়ে চার বৎসর খরার পর গুজরাত রাজ্য যখন সবে একটু সামলাইয়া উঠিতেছিল এমন সময় ১৯৭৫ সনের ২২শে অক্টোবরের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে সৌরাষ্ট্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহু ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছেন এবং ৫০ কোটি টাকারও বেশি সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির লোকসান হইয়াছে। সরকার ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। যান-বাহন ব্যবস্থা অতি সত্বর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ-সরবরাহ পুনরায় চালু হইবার ফলে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত নগর-জীবন ক্রমশ স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। সরকার ও জনসাধারণ যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষয়ক্ষতির নিরাকরণে সাহসিকতার সহিত সচেষ্ট হইয়াছেন। এই দুঃসাধ্য প্রয়াসে রাজকোটে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমও দুর্গতদের সেবায়—শহর ও গ্রামাঞ্চলের গৃহহারা ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণকার্যে— যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য আশ্রয়, আহার্য, ঔষধ, বাসনপত্র, পরিধেয় বস্ত্র ও কম্বলাদি আচ্ছাদনের আশু প্রয়োজন। কাজটি খুবই কঠিন ; তথাপি আশ্রম দুর্দশাপন্নগণের অত্যাবশ্যক ত্রাণকার্যে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। আশ্রমের এই সেবাকার্যে সহায়তার জন্য বদান্য জনসাধারণের অকুণ্ঠ আনুকূল্য প্রার্থনীয়।

'বাত্যাত্রাণ সেবাকার্যের জন্য' এই কথা উল্লেখ করিয়া সর্বপ্রকার দানসামগ্রী, নগদ টাকা, চেক বা ড্রাফ্‌ট নিম্নলিখিত যে-কোন ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক বা ড্রাফ্‌ট 'Ramakrishna Mission' এই নামে লিখিবেন।

		টেলিফোন
১।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট ৩৬০০০১	২৪-৪০৭
২।	রামকৃষ্ণ মিশন, ১২ নং রোড, খার, বোম্বাই ৪০০০৫২	৫৩২৪৪২
৩।	রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২	৬৬-২৩৯১
৪।	অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০০১৪	৪৪-২৮৯৮
৫।	রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০০৫৫	২৭-৭১১১
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ৬০০০০৪	৭১২৩১

বেলুড় মঠ
১০।১২।৭৫

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

নাম

বকলম

সেদিন একটা বইয়ে পড়ছিলাম ঃ
একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কী নাম ?'
পাশে বসেছিলেন এক ভক্ত-সন্তান—
'আমার নাম কী ?' শ্রীমা তাঁর কাছে জানতে চান।

এইভাবে বোধ হয় ভুলে যেতে হয়
আপনার নাম পার্থিব পরিচয়।

এক টুকরো মাংসের লোভে কুকুর যেমন হন্যে
আমরা তেমনি লালায়িত নিজের নামটুকুর জন্যে ;
তেমনি গ্লানিকর বিচ্ছিরি—
এই নামের কাঙালগিরি।

মিথ্যে নামটাকে যখন মনে হবে শূকরী-বিষ্ঠা
তখনই বুঝি জাগে আসল নামে নিষ্ঠা ?
যখন স্বনাম মনে আসে না আদপে
তখন মন বসে নাম-জপে ;
তখনই নিরন্তর সে-নামের ঢল নামে
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রাণায়ামে ;
যে-নাম শ্রবণে কীর্তনে স্মরণে—
ভয় দূর হয় জীবনে মরণে ;
যে-নাম এ যন্ত্রণা-যুগে সবচেয়ে দামী ;
যে-নামের অনুগামী নামী !

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

হে স্বামীজী,
আমি শুনেছি তোমার বাণী—
আমি পেয়েছি তোমার আহ্বান ;
আমি জাগ্‌ছি ; আমি জাগ্‌বো।

তোমার 'অভীঃ' মন্ত্র
আমার মধ্যে যে কী প্রচণ্ড শক্তি দিচ্ছে,
তা' আমি কী ক'রে প্রকাশ করবো এ দুর্বল ভাষায় !
এ মন্ত্র যে অগ্ন্যুৎপাত,
এ মন্ত্র যে দাবানল,
এ মন্ত্র যে প্লাবন,
এ মন্ত্র যে দুন্দুভি, শঙ্খ. ঘণ্টা, বিষাণ,
ওঙ্কার, টঙ্কার ও বজ্রের সমন্বিত ধ্বনি !
আমি উপলব্ধি করছি—
"আমি জন্ম হ'তেই 'মায়ের' জন্যে বলিপ্রদত্ত !"

ঐ, ঐ, আবার তুমি উদাত্ত কণ্ঠে বল্‌ছো—-
"বিশ্বাস রাখ,—বিশ্বাস রাখ,—
বিশ্বাস রাখ,—হে নির্ভীক !"

✓ ভারতপথিক বিবেকানন্দ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার কাঞ্জিলাল

এসেছিলে সাথে নিয়ে কি অমর জ্যোতির্ময় প্রাণ
পুণ্য-পূত যার স্পর্শে বিশ্বতল হলো মহীয়ান।
মুছে গেল অন্ধ গ্লানি পুঞ্জীভূত মনের আঁধার,
নব জ্ঞান-সম্বোধির হোমানল জ্বলিল আবার।
শোনালে শাশ্বত বাণী মৃতুঞ্জয় মহাভারতের—
প্রতি জীব সদাশিব, জীব-সেবা পূজা ঈশ্বরের।
নির্জিত দেশের দুঃখে কত অশ্রু তোমার নয়নে,
প্রেম-ঘন দিব্য মূর্তি, সম জ্ঞান চণ্ডাল ব্রাহ্মণে ;
চিন্ময় আত্মার স্পর্শে, স্নেহে. বীর্যে, কোমলে কঠোরে
আসমুদ্র হিমাচল এক মন্ত্রে এক কর্মডোরে
এক নব চেতনায় রূপান্তর করিলে সম্ভব ;
অভিন্ন দেশের প্রাণে চিরন্তন সে বাণী বৈভব।
হে গুরু, হে মহাভাগ, যতদিন চন্দ্র-সূর্য রবে
তোমার প্রাণের বরে মরণেরো নব জন্ম হবে।

সমালোচনা

সাধুসন্তের মহাসংগমে: শঙ্করনাথ রায়। প্রকাশক: শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা ৯। (আশ্বিন, ১৩৮০), ২৩৫, মূল্য দশ টাকা।

বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত নাম শঙ্করনাথ রায়ের আলোচ্য গ্রন্থখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রকাশকেরা গ্রন্থটিকে 'প্রথম খণ্ড' জেনেই প্রকাশ করেছিলেন। লেখকের দেহাবসানে অন্য খণ্ডগুলির প্রকাশের সম্ভাবনা আর নেই। তাঁর অন্যান্য রচনার মতো সুখপাঠ্য, তার উপর অনেক অজনা তথ্যের বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপূর্ণ এ গ্রন্থখানি পাঠ করতে করতে একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা ও বেদনাবোধ জাগা স্বাভাবিক। শঙ্করনাথ না লিখে গেলে আলোচ্য গ্রন্থের মহাপুরুষদের কথা আমরা হয়তো জানতেই পারতাম না, সেই কারণে কৃতজ্ঞতা। আর এ গ্রন্থের যদি আরো কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়ে লোকলোচনের অন্তরালবাসী ভারতের সাধকদের পরিচয় আরো বেশী পরিমাণে আমাদের সামনে তুলে ধরতো, সেই মহৎ সম্ভাবনার অকালাবনষ্টির জন্য বেদনাবোধ।

অনন্তের আহ্বান কখন কার জীবনে কেমন করে এসে স্পর্শ করে, সেকথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যখন করে তখন জীবনপদ্মের উন্মেষকাহিনী চিরকালের স্মরণীয় সম্পদ। এ গ্রন্থে যেসব সাধক-সাধিকার কথা আলোচিত—মৌনী দিগম্বরজী, আদিত্যনাথ বাবা, মহাত্মা সুন্দরানন্দজী, ফরসিবাবা, বীতরাগানন্দজী, মহাকাল বাবা, রামাইৎ মুক্তানন্দজী, মহাত্মা নাগেশ্বরজী, প্রেমকিশোর বাবা, ভৈরবদাসজী, মুরলীদাসজী, মাতঙ্গীমায়ী—মোট বারোজন—এঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আগ্রহেই লেখক তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন তাঁর বক্তব্য—"এঁরা কখনো সমাজজীবনের পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়ান নি, জনসমাজ ও জনচেতনার আরো গভীর স্তরে অবস্থিত থেকে নিজেদের গোপন রেখেছেন। ·· নির্জন সাধনপীঠে বসে এঁরা তপস্যার প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নির্ধারিত লগ্ন উপস্থিত হলে সে প্রদীপটিকে ন্যস্ত করেছেন ঈশ্বরচিহ্নিত কোন শিষ্য বা শিষ্যার হস্তে। এমনি করে স্বল্পপরিচিত অথচ ব্রহ্মবিদ্ বলে উচ্চকোটির সাধুসমাজে সম্মানিত এই মহাত্মারা তাঁদের যাঁর যাঁর গুরুপরম্পরাকে, নিগূঢ় সাধনধারাকে, রেখেছেন অব্যাহত।"

সেইসঙ্গে গ্রন্থের নামকরণপ্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য—"ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা আর ব্রহ্মসাধনার সিদ্ধপীঠ—এই দুইকেই আমরা আখ্যাত করেছি 'মহাসংগম' বলে। তাই এ গ্রন্থে বিবৃত সাধুসন্তদের প্রজ্ঞানঘন জীবন এবং ব্রহ্মজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তপস্যাস্থলগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আমরা করেছি।" —বলা বাহুল্য সে চেষ্টা পরম শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও শুভবোধের দ্বারা সুসম্পন্ন।

প্রথম রচনায় লেখকের আবাল্যবন্ধু গঙ্গাধরের 'মৌনী দিগম্বরজী'তে পরিণত হওয়া থেকে শেষ রচনা জ্বালামুখীর তপস্বিনী মাতঙ্গীমায়ীর বিচিত্র জীবনকথা অবধি বর্ণনার সরসতায় ও অধ্যাত্মপরিবেশ সৃষ্টির সার্থকতায় সমগ্র বইখানি এক বৈঠকে পড়ে যাওয়ার আনন্দ যতখানি, অবসর মতো ধীরে ধীরে পড়লেও তেমনি পরিতৃপ্তি। তবু, মাঝে মাঝেই মনে হয়, অলৌকিক

ঘটনাবলী যেন একটু বেশী পরিমাণে দেখা দিত শঙ্করনাথের রচনায়। এ গ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু যা কোনোমতেই সাধারণ স্তরের লৌকিক জীবন নয়, তার বর্ণনায় অ-লৌকিকতা স্বাভাবিক। শুধু আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রাধান্যের দ্বারা সে প্রবণতা সংযত হলেই সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর।

এ গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরীর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার উল্লেখ করে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের রেখাচিত্রশিল্পীর পরিচয়ও জানতে ইচ্ছা হয়। তাঁর শিল্পকৃতিও অভিনন্দনযোগ্য। এ জাতীয় গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক—দুইই সৌভাগ্যবান। বলা বাহুল্য, আমরা পাঠকেরাও সে পুণ্যফলের অধিকারী

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৮২, শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর ১২৩-তম শুভ জন্মতিথি মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজন বিশেষ পূজা হোম ও আলোচনাদির মাধ্যমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। পূজার পর প্রায় ২০,০০০ ভক্ত প্রসাদ ধারণ করেন। অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীভূপেন চক্রবর্তী কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।*

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ বলেন: ... শ্রীশ্রীমা নিজমুখে বলে গেছেন, ঠাকুর বলেছেন, স্বামীজী বলেছেন, যাঁকে আমরা জগজ্জননী বলি, ঈশ্বর বলি, দর্শনের ভাষায় সগুণ ব্রহ্ম বলি, তিনিই শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীরূপে এসেছিলেন। এসেছিলেন আমাদের ভগবানলাভের পথ দেখাতে।

জীবন ও জগতের মূলে যে চরম সত্য রয়েছে, বেদান্ত তাকে 'ব্রহ্ম' বলছেন; আর তন্ত্র তাকেই বলছেন 'মা'। বেদান্তের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মই তন্ত্রের সগুণা ও নির্গুণা মা। তন্ত্র বলছেন, তিনি 'সগুণা নির্গুণাপি চ', 'সাকারাপি নিরাকারা' —শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা বারবার বলে গেছেন, 'ঈশ্বর সাকারও নিরাকারও'। একথা শুধু শাস্ত্রের উদ্ধৃতিমাত্র নয়, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো যুক্তিসহায়ে লব্ধ একটা বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত-মাত্রও নয়. এটি অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার পরীক্ষিত সত্য। আমাদের যুগেও, এই সেদিনকার কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই নির্গুণ নিরাকার সত্যকে সর্বভূতে দেখেছেন—'মা দেখিয়ে দিলেন, মন্দিরের মেজে চৌকাঠ মার্বেল ... সব চৈতন্যে জরে রয়েছে।' আবার সেই সত্তাকেই তিনি দেখেছেন মা-কালীরূপে, সবার ভেতর, সবকিছুর ভেতর। শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত-সাধনার গুরু তোতাপুরীও তাঁর কৃপায় নির্বিকল্প সমাধিতে প্রত্যক্ষ করা সত্তাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন জগন্ময়ী জগন্মাতা রূপে —'জলে মা, স্থলে মা, শরীর মা, মন মা, ... যা কিছু দেখছি, শুনছি, কল্পনা করছি মা, সবই মা ... আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা - তুরীয়া নির্গুণা মা।' একই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলেছিলেন,

* ভাষণ তিনটি শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত ও শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। অনুলিখিত ভাষণগুলি সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত। দ্বিতীয় ভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।—সঃ

'তুই যাঁকে ব্রহ্ম বলিস, আমি তাঁকেই কালী বলি।' স্বামী সারদানন্দকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ব্রহ্মের কোন রূপ আছে কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যা কিছু দেখছ সবই তাঁর রূপ।' আধুনিক বিজ্ঞানের সব কিছুর মধ্যে 'বস্তু'রূপে, সত্তারূপে একমাত্র শক্তির (Energy—স্থির বা তরঙ্গাকার) আবিষ্কার এই সত্যটির বৌদ্ধিক ধারণায় আমাদের সহায়তা করে; শুধু ভাবলেই, বিশ্বাস করলেই হল এই অচেতন শক্তিরও মূলে রয়েছেন সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি মা। এই অদ্বয় সত্তা বা সচ্চিদানন্দময়ী মা-ই আমাদের মা সারদামণি হয়ে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই।

আমাদের 'চিন্তায়' ব্রহ্ম ও শক্তি, সগুণা ও নির্গুণা মা পৃথক হলেও বস্তুতঃ যে অভেদ, শ্রীরামকৃষ্ণ বহু উপমা দিয়ে তা বুঝিয়েছেন, যার অন্যতম হল, চাঁদ ও চাঁদের আলো অভেদ, একটিকে ভাবতে গেলেই অপরটিকেও ভাবতে হয়, পৃথকভাবে কোনটিকে ভাবাই যায় না—যেকথা দেবীভাগবতে আছে, 'চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা'— শিব বলছেন শক্তিকে লক্ষ্য করে। জগৎরূপেও অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তিরূপেও অভেদ। যা কিছু বিশ্বজগতে প্রকাশিত, এমনকি ঈশ্বরীয় রূপও—তা সবই তাঁর শক্তি, মা; আর এইসব প্রকাশের ভিতরে সত্তা হিসাবেও সেই মা— 'তুরীয়া নির্গুণা মা,' ব্রহ্ম। তন্ত্র তাই বলছেন, তোমার যেমন ভাল লাগে—যে কোন রূপে বা অরূপে— সেভাবেই মাকে চিন্তা করে তাতে মন একাগ্র কর, তাঁকে প্রত্যক্ষ কর—'পুংরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং স্ত্রীরূপাং বা বিচিন্তয়েৎ। অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥'—'পুরুষ বা নারীরূপে/সচ্চিদ্-আনন্দরূপে,/পূর্ণব্রহ্মরূপে,/যে ভাবেতে প্রাণ চায়/সেভাবে ভাবিয়া মায়/হের চিদানন্দময়ী জননীরে আপন স্বরূপে।' চরম সত্য মনবুদ্ধির অতীত; মনবুদ্ধির পারে গিয়ে তা উপলব্ধি করতে হলে, যতক্ষণ না মনবুদ্ধির পারে যেতে পারছি ততক্ষণ আমাদের একটা স্থূল অবলম্বন চাইই যাতে মন একাগ্র করতে পারি। তার জন্য যে কোন ঈশ্বরীয় রূপকে বা সত্যের নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের (যা আমাদেরও স্বরূপ) চিন্তাকে অবলম্বনরূপে নিয়ে এগুলেই হল—সবই পরিণামে একই লক্ষ্য, সচ্চিদানন্দে পৌঁছে দেবে।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দময়ী মা-কালীই আমাদের মা সারদাদেবী হয়ে এসেছিলেন; যে মা ভবতারিণী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রয়েছেন, তিনিই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর রূপ ধরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আমাদের ভগবানলাভের পথ দেখিয়ে গেছেন আদর্শ জীবন দেখিয়ে। এজন্যই তিনি অবতাররূপে, মানুষ হয়ে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর বাইরের রূপ আলাদা হলেও বস্তুতঃ তাঁরা অভেদ—দু-জনেই মা-কালী। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সারদাদেবীকে মা-কালী রূপে দেখতেন—'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন (চন্দ্রাদেবী) এবং এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন (সারদা দেবী) আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্যি সত্যি দেখতে পাই,'— সারদাদেবীও তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মা-কালী রূপে দেখতেন, তাঁর দেহত্যাগের পর কেঁদে উঠেছিলেন এই ব'লে—'মা-কালী গো, কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!' শ্রীশ্রীমা শিবুদার কাছে নিজমুখেই দুবার বলেছেন যে তিনি মা-কালী; ডাকাত-বাবা তাঁকে মা-কালী রূপে দেখেছিল, তা-ও বলেছেন। জগন্মাতাকে তন্ত্রে কালী দুর্গা সরস্বতী ষোড়শী প্রভৃতি বহুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বামীজী

শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলেছেন, ঠাকুর তাঁকে ষোড়শীজ্ঞানে পূজা করেছেন, সরস্বতীও বলেছেন। এই জগন্মাতাই যে অবতার হয়ে আসেন, তাও বলা হয়েছে শাস্ত্রে, এমনকি মায়ের কোন্ রূপ কোন্ অবতারদেহ ধারণ করেছে তাও —'কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী' ইত্যাদি। পুরাণে আছে, ভগবান যখন পুরুষদেহ ধারণ করে দেবলোক বা নরলোকে অবতীর্ণ হন, তাঁর শক্তিও স্ত্রীরূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গিনী হয়ে আসেন। অন্যান্য অবতারে মা সারদাই যে সীতা, রাধা প্রভৃতি রূপে এসেছিলেন, মা নিজেই তা বলে গেছেন।

তবে অবতার দেখতে আমাদের মতো হলেও তাঁদের জীবনের সব ঘটনাই আমাদের শিক্ষার জন্য অভিনয় মাত্র—আমাদের জীবনের ঘটনার সঙ্গে তাঁদের জীবনের ঘটনার এখানে আকাশ-পাতাল তফাত—একজন শূলবেদনায় ছটফট করছে, আর একজন রঙ্গমঞ্চে সেই ছটফটানির নিখুঁত অভিনয় করছে, এ দুই-এ যা তফাত, ততখানি তফাত।

শ্রীশ্রীমা নিজস্বরূপ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকেই সজাগ ছিলেন—দলঘাস কাটার সময় সমবয়সী সঙ্গিনীর আবির্ভাব, কামারপুকুরে থাকাকালীন হালদারপুকুরে স্নানে যাবার সময় নিত্য আটজন সমবয়সী মেয়ের আবির্ভাব প্রভৃতি বহু ঘটনা এর সাক্ষ্য বহন করছে। এই আটজন মেয়ের আবির্ভাব আর স্বামীজীর মাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলা স্মরণ করিয়ে দেয় মা দুর্গার ধ্যান-মন্ত্র, যাতে তাঁর অষ্টসখীর নাম বলে বলা হয়েছে— 'আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।' নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে এই সজাগতা সত্ত্বেও, সে অসীম শক্তি অনন্ত ঐশ্বর্যকে অবগুণ্ঠিত ক'রে একজন নিরক্ষরা সাধারণ পল্লীরমণীরূপে, আমাদের অতি সাধারণ অতি পরিচিত অতি আপনার 'মা'-রূপে জীবন কাটিয়ে গেছেন তিনি—বাবুরাম মহারাজের ভাষায় 'রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনী সেজে' ঘর নিকুচ্ছেন, কুটনো কুটছেন, বাসন মাজছেন, ঝাঁট দিচ্ছেন—আমাদের মায়েদের জন্য আদর্শ রেখে যাবেন বলে; হরীশকে শাস্তি দেওয়া প্রভৃতি দু-চারটি ঘটনায় মাত্র কদাচিৎ তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাল্যে সমবয়সিনীদের সঙ্গিনীরূপে, নিজ মাতার গৃহকর্মের সহায়িকারূপে, ছোট ভাইদের অভিভাবিকারূপে, বধূরূপে, ভক্তদের ও রামকৃষ্ণ সংঘের জননীরূপে—সর্বাবস্থাতেই শ্রীশ্রীমা নিস্বার্থপরতার, অপার স্নেহের, কোমলতার, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ের আদর্শ রেখে গেছেন—নারীত্বের, বিশেষ করে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ রেখে গেছেন।

মা-রূপে তিনি বিশ্বজননী—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও জননী। নিজেই বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে 'সন্তানভাবে দেখি,' 'সবাই আমার সন্তান'। 'এই পিঁপড়েটিরও মা তুমি?'—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'হ্যাঁ'। এই বিশ্ব-মাতৃত্বের আবরণ দিয়েই তিনি নিজস্বরূপ ঢেকে রাখতেন; তাঁর এই ঢেকে রাখার ক্ষমতা, বাবুরাম মহারাজের কথায়, ঠাকুরের চেয়েও বেশী। ঠাকুরের মধ্যে তবু লোকে অন্ততঃ তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের প্রকাশ কিছু দেখতে পেতো প্রায় সকলেই, কিন্তু মাকে দেখে বাইরে থেকে কিছুই বোঝার সাধ্য ছিল না। সন্তানদের পাপ-তাপ গ্রহণ করে কোলে টেনে নেবার ক্ষমতাও তাঁর ঠাকুরের চেয়ে বেশী ছিল—বাবুরাম মহারাজের ভাষায়, 'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, মার কাছে চালান দিচ্ছি, মা তা অবহেলে গ্রহণ করছেন, হজম করছেন।' এজন্য, এবং একেবারে সহজ সরলভাবে থাকতেন বলে মহা পাপীতাপীরও, অতি সাধারণেরও তাঁর কাছে এগিয়ে যাওয়া সহজ ছিল। তিনি যে সকলেরই

মা!—'শরৎও আমার যেমন ছেলে (মুসলমান ডাকাত) আমজদও তাই !' সেজন্য গিরিশবাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন—যে অতি ঘৃণ্য, মহাপাপী, লোকত্যাজ্য, তারও আশ্রয়দাতা শ্রীরামকৃষ্ণ—'তব দ্বার মুক্ত তার পতিতপাবন!' —সেকথা মা-র ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। মা বলেছেন যে, ঠাকুর নিজে সব ভাল ভাল ছেলেগুলিকে যাচাই করে বেছে নিয়েছেন, আর তাঁর কাছে ঠেলে দিয়েছেন পিঁপড়ের সার!

স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি মাকে স্বরূপে চিনেছিলেন। সর্বসাধারণ তাঁকে পেয়েছে স্নেহময়ী করুণাময়ী জননীরূপে—'আপন মা' রূপে। বিশ্বে যত মা আছে—দেবতা মা, মানুষ মা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ মা—সবার স্নেহের সমষ্টি ছিলেন আমাদের মা সারদদেবী—'নিখিল-মাতৃ-হৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মূরতি!'

এই অপার ভালবাসার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই তিনি আমাদের—বিশেষ করে গার্হস্থ্যাশ্রমে থেকে যাঁরা ভগবানলাভ করতে চায় তাঁদের—হাতে নাতে ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন কিভাবে তা করতে হয়। অত্যন্ত অশান্তির, ঝঞ্ঝাটের সংসার যাকে বলে তারই মধ্যে ছিলেন তিনি, দুটি পাগল-কে নিয়ে ঘর করতে হত সর্বক্ষণ; তারই মধ্যে থেকে, সংসারের সব কাজ করেও কিভাবে ভগবানে মন রাখতে হয়, মনের প্রশান্তি বজায় রাখতে হয়, তা আমাদের দেখিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'অশান্তি কাকে বলে, জীবনে তা জানলুম না মা'। চৌদ্দ বছর বয়সে কামারপুকুরে ঠাকুরের সঙ্গে যখন বাস করেছেন, বলছেন, 'তখন থেকেই সর্বক্ষণ হৃদয়-মধ্যে আনন্দের একটি পূর্ণঘট বসানো রয়েছে।' কাজের জন্য জপধ্যানের অবসর পাই না, একথা বলারও পথ রাখেননি, সব কাজ করেও তিনি বলেছেন, দিন লক্ষ নাম জপ করতেন। গৃহস্থাশ্রমে থেকে কিভাবে ভগবানলাভ করতে হয়, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তা বলে গেছেন; কিন্তু বিবাহ করলেও এবং ভারতের চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করে সন্ন্যাসের পরও বিবাহিতা পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সংশ্রব রাখলেও সংসারী তিনি কখনো ছিলেন না। স্বামীজী ঠাকুরের সেই কথা আধুনিক যুগের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা আধুনিক মনের গ্রহণোপযোগী ভাষায় সারা জগতে প্রচার করেছেন; তিনিও সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীশ্রীমা নিজে সংসারের মধ্যে জড়িত থেকে কি ক'রে তা করতে হয়, দেখিয়ে গেলেন।

আজ পুণ্য দিনে, এই পুণ্যক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রার্থনা করি, সব কাজের মধ্যে থেকেও মনের প্রশান্তি বজায় রাখার, ভগবানলাভের জন্য চেষ্টা করার, তাঁকে লাভ করার প্রেরণা ও শক্তি তিনি যেন আমাদের সকলকেই দেন। প্রার্থনা করি, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অনুক্ষণ যেন মার চিন্তায় —যার যেভাবে ভাল লাগে—সারদাদেবীরূপে, বা রামকৃষ্ণরূপে, অথবা নিজেরই স্বরূপরূপে তাঁকে ভেবে—'পুরুষ বা নারীরূপে, সচ্চিদ্-আনন্দরূপে—পূর্ণব্রহ্মরূপে'—যার যেভাবে ভাল লাগে সেভাবে তাঁকে ভেবে যেন সচ্চিদানন্দময়ী মাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন:

যে যুগে আমরা বাস করছি, তা দিন দিন জটিলতর হয়ে উঠছে। চারিদিকে একটা উদ্দাম গতিবেগ, প্রবল উত্তেজনা, দুর্নিবার সংক্ষোভ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। জীবনের যেন কোন মানে নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন স্থির লক্ষ্য নেই। তাই বর্তমান যুগের অনেক প্রখ্যাত দার্শনিক, যাঁরা অস্তিত্ববাদী (existentialists) ব'লে পরিচিত, মনে করেন যে, আমরা আজ এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়েছি, যার ওপর আমাদের কোন হাত নেই, কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা

নেই—আমরা সম্পূর্ণ অসহায়, আমাদের জীবন অর্থহীন যুক্তিহীন সামঞ্জস্যহীন।

আমার মনে হয়, এই যুগসঙ্কট থেকে, যুগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ফেরাতে হবে সেই সব মহাপুরুষ আর নারীদের দিকে—সেই সব মহান আত্মার দিকে, যাঁরা আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় হয়ে রয়েছেন। আজ আমরা যাঁর আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপনে এখানে সমবেত হয়েছি, সেই শ্রীমা সারদা দেবী নিঃসংশয়ে তাঁদেরই অন্যতম।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা মুখ্যতঃ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কথা—মহিমার কথা বলেছেন। আমি মুখ্যতঃ মায়ের উপদেশের কথাই বলবো—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করবো—মায়েরই উপদেশের আলোচনা করে তাঁর চরণে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবো।

মা বলেছিলেন, 'ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা।' মায়ের এই কথার মধ্যেই সব উপদেশের সার নিহিত রয়েছে। ভগবান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য—তাঁকে না পেলে আমাদের ঘুরে-মরা সাঙ্গ হবে না।

কিন্তু ভগবান লাভের পথ অতি দুর্গম। আপনারা কঠোপনিষদের সেই বিখ্যাত মন্ত্রটি জানেন: 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' —জ্ঞানীরা, ক্রান্তদর্শীরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের মতোই দুর্গম। এই ক্ষুরধার পথকেও মা সহজ করে দিয়েছেন। মায়ের এক শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'মা, ব্রহ্মজ্ঞান কি ক'রে হয়? এ কি প্রত্যেক বিষয়টি নিয়ে প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে হয়, না আপনি হয়?' মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঐ পথ বড় কঠিন, তোমরা ঠাকুরকে ডাকো, তিনি সময় হলে জানিয়ে দেবেন।' মায়ের এই উপদেশ শোনামাত্রই আমাদের গীতার সেই 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' ইত্যাদি শ্লোকের কথা মনে পড়ে। ভগবানই সাধুদের অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে পেতে চান, তাঁদের পরিত্রাণের জন্য দেহ-ধারণ করে অবতীর্ণ হন। গীতা যেমন বলেছেন, অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মকে জানা বড় কঠিন, অবতারে মন সমর্পণ করলে, তিনিই মৃত্যু-সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করেন, মা-ও এখানে ঠিক তা-ই বলছেন।

তারপর মা বলেছেন ত্যাগের কথা। মায়ের একজন শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'মা, এবার কি ঠাকুর একটা নতুন জিনিস দিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন যে, সর্বধর্মসমন্বয় করে গেলেন?' মা উত্তর দিয়েছিলেন: 'দেখ বাবা তিনি যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানরা, মুসলমানরা, বৈষ্ণবরা যে যেভাবেই তাঁকে ভজনা ক'রে বস্তুলাভ করে, তিনি সেই সেই ভাবে সাধনা ক'রে নানা লীলা আস্বাদ করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোনও হুঁশ থাকত না। তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ও-রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনও কেউ দেখেছে!' আপনারা জানেন ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে সেই 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'-র কথা—ত্যাগের দ্বারাই (আত্মাকে) পালন করো। সব উপনিষদেরই সার কথা হল—'ত্যাগ'।

মায়ের সমস্ত জীবন এই ত্যাগের শ্রীতে মণ্ডিত ছিল। তিনি সংসারেই ছিলেন—বাহ্যতঃ সন্ন্যাসিনী হন নি। কিন্তু তিনি জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, কি করে সংসারে থেকেও প্রকৃত ত্যাগীর জীবন যাপন করতে হয়। তিনি বলতেন, এই

ত্যাগের পথ জীবনের শুরুতেই গ্রহণ করতে হয়। বলতেন, 'চড় খেয়ে রামনাম অনেকেই বলে, কিন্তু শৈশব হ'তে ফুলের মতো মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পারে, সে-ই ধন্য।' বলতেন, 'বৃদ্ধ বয়সে কফ-শ্লেষ্মায় ভরা শরীরে সামর্থ্য নেই, মনে বল থাকে না—তখন কি কোন কাজ হয়!'

যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন: ভগবানের রাজ্য আমাদের অন্তরেই আছে। আমাদের প্রকৃত সম্পদ বাইরে নেই। উপনিষদের যুগে মৈত্রেয়ী সেই কথাই বলেছিলেন: 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।' রাজর্ষি জনক বলেছিলেন: 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।' শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন: 'জগন্নাথস্বামী নয়ন-পথগামী ভবতু মে।' একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি—এঁরা সকলেই আমাদের অন্তরে যে ভগবান রয়েছেন তাঁরই কথা বলেছেন। কিন্তু এই যে অন্তর্যামী পুরুষ তাঁকে পেতে হলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়—অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়। আসল কথা—ঠিক ঠিক আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। একজন ভক্ত মাকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'মা, ভগবান যদি সর্বশক্তিমান হন, পরম দয়াল হন, তবে তাঁরই সৃষ্ট জীবের কাছে তিনি ধরা দেন না কেন?' মা বলেছিলেন—'ভগবানকে চায় কে? লোকে কত রকমের কঠোরতা করে, কিন্তু সত্যি সত্যি প্রাণ থেকে ভগবানকে চায় না—মুখেই বলে ভগবানকে চাই। ভগবানকে যে ঠিক ঠিক চায়, ভগবান তাকে নিশ্চয়ই দর্শন দেন।'

আরেকটি কথা মা বিশেষভাবে বলতেন। সেটি হল জপধ্যান। বলতেন: 'ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে।' পবিত্র মন না হলে কিছুই হবে না, তাই ইষ্টের ধ্যান, ইষ্টনামজপের কথা মা বার বার বলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন: 'মন না মত্ত হস্তী! হাওয়ার সঙ্গে ছোটে।' আপনারা জানেন, অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে মনের এই চঞ্চলতার কথা বলেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ—অভ্যাস ও বৈরাগ্য—এই দুটি উপায়ে মন স্থির করতে বলেছিলেন। মা-ও তা-ই উপদেশ দিতেন। বলতেন: 'মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি ক'রে যাবে নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে—বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মত। বাতাস থাকলে প্রদীপের শিখা স্থির থাকে না, মনেও কামনাবাসনা থাকলে মন স্থির হয় না।'

জপধ্যান প্রসঙ্গে মা আরও বলতেন: 'অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম না করলাম তার বিচার আসে। পরে জপ করতে করতে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। ধ্যানে প্রথমে মুখটি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি করে?'

ধ্যানজপ করতে গিয়ে কাজকর্মের চিন্তা আসায় উদ্বিগ্ন হলে মা আশ্বাস দিতেন: 'কাজকর্ম সম্বন্ধে মন তো যাবেই—টাকাকড়ি, পুত্রপরিবার, এই সব বিষয়ে মন যাওয়া খারাপ।' বলতেন: 'ধ্যান না হয়, জপ করবে, "জপাৎ সিদ্ধিঃ"—জপ করলেই সিদ্ধি লাভ করবে। ধ্যান হল ভাল, না হলে জোর ক'রে ধ্যান করবার দরকার নেই।'

সত্যনিষ্ঠা, নির্জনবাস ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ আপনারা সবাই জানেন। মা-ও সেই সব উপদেশই দিতেন। বলতেন: 'সত্যে থাকবে তা হলেই ঈশ্বরলাভ হবে। সত্যই কলিযুগের তপস্যা।' বলতেন: 'নির্জনে সাধনা দরকার। সম্ভব হলে প্রতিদিনই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও একান্তবাস করা ভাল।'

এযুগে আমরা প্রায়ই প্রাসঙ্গিকতার কথা

বলে থাকি— বড় বড় লেখকদের বা অন্য ক্ষেত্রে যাঁরা বড় হয়ে গেছেন বর্তমানকালে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা কী তা প্রশ্ন করি। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশ্ন উঠলে, আমি এই উত্তরই দোব যে, তাঁর জীবন, তাঁর বাণী, তাঁর দর্শন সমগ্র মানব-জাতির পক্ষেই আজও প্রাসঙ্গিক আছে এবং অনাগত যুগযুগান্ত ধরে প্রাসঙ্গিক থাকবে, কারণ তা সনাতন সত্যের ওপর—শাশ্বত প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সভাপতির ভাষণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বলেন :

আমাদের কৈশোরে যখন বেলুড় মঠে আসতে আরম্ভ করেছিলাম, তখন মা ঠাকুরানী সম্বন্ধে মানুষের জানা ছিল কম। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ১৯৫৩ সালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্ম শতবার্ষিকীর উদ্বোধনের সময় থেকে একটা উদ্বেল-স্রোত, প্রাণ-চঞ্চল ভাবপুঞ্জের বন্যা, যে-বন্যা মানব-মানবীকে দুর্বার বেগে মাতা-ঠাকুরানীর জীবনীর এবং বাণীর কাছে উপনীত করেছে। মায়ের জীবনী এবং বাণীর প্রতি মানুষের স্বত-উৎসারিত আকর্ষণ এখন চারদিকেই অনুভব করা যায়। আমি চিন্তা করেছি এটা কেমন ক'রে ঘটল। এ তো কোন মানুষের কাজ নয়। আমরা নিজেরা মাতাঠাকুরানীর গৌরব-বৃদ্ধির জন্য কোন আয়োজন করে এটা করতে পারিনি। মা-ই মানব-মানবীর হৃদয়ে তাঁর সিংহাসন পেতেছেন।

এই যে জগৎ— এ-জগতে মানুষের ভেতরে কি দেখা যায়? ভোগৈষণা। পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা— এই তিন ভোগৈষণায় মত্ত হয়ে রয়েছে মানুষ। এবং সে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কি ক'রে তার ভোগ-তৃষ্ণা মিটিয়ে ফেলবে। বৎসর-খানেক পূর্বে আমি পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখেছি যে, মানুষের ভোগের পরিসীমা নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভেতরে রয়েছে প্রবল অশান্তি। সেই প্রাণচাঞ্চল্য, যা রোমক জাতির ভেতরে ছিল, তার সুদীপ্ত মহিমার প্রকাশ সেখানে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেটি মানুষের যে ধর্মীয় নীতি তার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সেজন্য আশঙ্কা হয় যে, এই যে বিরাট পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, যে-সভ্যতার ছিটেফোঁটা লাভ করবার জন্য আমরা উন্মুখ এবং লালায়িত, সেই সভ্যতার দশাও হয়ত রোমক সভ্যতার দশার মতই হবে। রোমক সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ ছিল যে, রোমের প্রাচুর্যের মধ্যে যে-দৃষ্টির সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল, যে-নীতি-শক্তির দরকার ছিল, সেটির অভাব ঘটেছিল। সেই অবস্থায় আজ আমাদের সভ্যতা যেন এসে পৌঁছেছে। তাই যদি আমাদের সভ্যতা এবং সমাজকে— সমগ্র জগতের সভ্যতা এবং সমাজকে বাঁচাতে হয়, তাহলে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ভোগের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ঊর্ধ্বমুখে নিয়ে যেতে হবে। আর মাতৃভাবের বিকাশের দ্বারাই এটি সহজে করা সম্ভব। নিজের স্ত্রী ছাড়া সমস্ত নারীকে মাতৃরূপে দেখা। নিজের স্বামী ছাড়া সমস্ত পুরুষকে সন্তানরূপে দেখা—এইটিই হচ্ছে অবলম্বনীয় ভাব—যে-ভাবের দ্বারা মানবজাতির সভ্যতার বুনিয়াদকে শক্ত করা যাবে। নতুবা সংশয় আছে, ভয় আছে, সমগ্র মানব-সভ্যতা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্যই মাকে রেখে গিয়েছিলেন ঠাকুর—মাতৃভাব প্রচারের জন্য। তাঁর জন্মের শতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে দিন দিন মানুষের ভেতরে এই মাতৃমূর্তির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি এবং পূজার ভাব প্রস্ফুরিত হচ্ছে। তারই প্রকাশ আজ আপনারা বেলুড় মঠে দেখছেন। শুধু বেলুড় মঠে কেন, যেখানে যেখানে আমাদের কেন্দ্র রয়েছে সেখানে সেখানে তো বটেই, তাছাড়াও বহুস্থানে ভারতে এবং ভারতের

বাইরে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

কিন্তু একটা কথা অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হয়। এই যে নারী, যাঁকে আমরা মা বলছি, মা ঠাকুরানী বলছি—এ নারীর ভেতরে কি ছিল? প্রায়-নিরক্ষরা একটি সাধারণ গ্রাম্য রমণী, যিনি হয়ত কিছু ধর্মের কথা, আধ্যাত্মিকতার কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা তো তাঁর ভেতরে দেখতে পাইনি স্বামী বিবেকানন্দের যে মহিমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দের যে গরিমা, অথচ সঙ্গে সঙ্গে দেখছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি এই নারীর সামনে নতজানু হয়ে তাঁদের অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা তাঁকে নিবেদন করেছেন। এটা কি তিনি কেবলমাত্র গুরুপত্নী ছিলেন বলে? তা নয়। সেই কথাই একবার পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন—কেউ একজন যখন সংশয় প্রকাশ করেছিল মায়ের ভগবত্ত্বে অথচ বিশ্বাস প্রকাশ করেছিল ঠাকুরের অবতারত্বে। বলেছিলেন, 'তোমার তা হলে বিশ্বাস ভগবান একটি ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়েকে বে করেছিলেন।'

তাই মায়ের জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে, প্রথম আমাদের এই দিক থেকেই মায়ের জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ভগবান হন— যে-ভগবানের আবির্ভাবের কথা ভগবান শঙ্করাচার্যের মতন 'কট্টর' বেদান্তীও স্বীকার করেছেন গীতার ভাষ্যমুখে—'স চ ভগবান্…নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ … লক্ষ্যতে' — 'সেই ভগবান যিনি স্বভাবত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব তিনি নিজ মায়ায় যেন দেহবান হয়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন' এবং গীতামুখে যে-কথা বলেছেন, 'ধর্মের গ্লানি হলে অধর্মের অভ্যুত্থান হলে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ম'। —তা হলে শ্রীশ্রীমায়ের অবতারত্বও স্বীকার করতে হয়।

আমরা যদি জগতের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখি, জগতের ইতিহাসে দু'রকমের লোক আছে —এক রকমের লোক যারা বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, আর এক রকমের লোক যারা তা করেনি। সাম্রাজ্যের উদয় এবং বিলয় ঘটেছে। সেই সাম্রাজ্য-স্থাপনকারীদের সুকৃত দুষ্কৃতের গন্ধ এখনও আমরা ইতিহাস থেকে পেয়ে থাকি। সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের মানুষ ইতিহাসে আছেন যাঁরা মানুষের কোন কিছু জয় করে নিতে চাননি —স্থল না, জল না। তাঁরা চেয়েছিলেন কেবল-মাত্র মানুষের ভেতরে, তাদের অন্তরাত্মার ভেতরে যে সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা রয়েছে, তা জাগিয়ে দিতে। এঁরাই হচ্ছেন রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্য প্রভৃতি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি। তিনিও এইভাবে মানুষের সুপ্ত যে আধ্যাত্মিকতা তাকে জাগরিত করতে এসেছিলেন, কেননা জগতে সেটিরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যদি ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণ সেইভাবে এসে থাকেন, তাহলে বেশ তো তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন কি করে সুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে জাগাতে হয়, তাও জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন—আবার সঙ্গে সারদামণি দেবীকে আনবার প্রয়োজনটা কি? এটি বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে যে, সমস্ত জগতের যে অধিবাসী তারা কেবলমাত্র একজাতীয় জীব নয়। জগতের অধিবাসীর ভেতরে অর্ধেক হচ্ছে নারী, অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ। ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম অপর'কে শিক্ষা দেন। এবং ভগবানের প্রবর্তিত এই যে ধর্মশিক্ষা—এ শিক্ষা তাঁর জীবনে রূপায়িত দেখেই মানুষ শিক্ষা লাভ করে। যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিলেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বারবার বললেন, তখন নারীজাতির পক্ষে বলা স্বাভাবিক —বেশ তো কথা, তিনি ছিলেন ত্যাগীর সম্রাট, সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, তাই শিক্ষা দিয়েছেন,

বলেছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, (আমি শুনেছি স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখের মুখে যে, নারীদের যখন শিক্ষা দিতেন তখন বলতেন, পুরুষ-কাঞ্চন ত্যাগ।) বেশ কথা—উনি তো বললেন বেশ! কিন্তু ওঁর পক্ষে একথাটি যেমন আচরণ করা সম্ভব, আমরা নারী, আমাদের পক্ষে কি সেভাবে আচরণ করা সম্ভব? এইখানেই মূল সূত্র—শ্রীশ্রীমা ঠাকুরানীর আবির্ভাবের প্রয়োজনের। এমন একজনের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল অবতারপুরুষের সঙ্গে, যিনি নারীর দিক থেকে আদর্শস্বরূপা হবেন—যাঁকে দেখে নারীরা শিখতে পারবে, কি রকম ক'রে ধর্মাচরণ করতে হয়। এবং সেই দিক দিয়েই মা ঠাকুরানীর আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রবেদিত যে সমস্ত সত্য বা প্রস্ফুটিত যে সমস্ত সত্য, সেইগুলি প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং প্রবেদিত হয়েছে জননী সারদামণির দ্বারা—নারীর দেহমনের উপযোগী করে সেগুলি ধরা হয়েছে। শুধু এইটুকু বললেও কিন্তু সারদামণির যে মহত্ত্ব সেটির পরিমাপ হবে না। তিনি আর একটি জিনিস দেখিয়েছেন, যেটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখাননি। সেটি হচ্ছে যে, সংসারে থেকে সংসারীরা—তাঁরা নারীই হোন বা পুরুষই হোন—কি করবে।

মা ঠাকুরানী সংসারী ছিলেন—তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেননি। তিনি দেখিয়ে গেছেন, কিভাবে মানব-মানবী সংসারে থেকেই ধর্মাচরণ করবে। কাজেই মা ঠাকুরানীর আবির্ভাবের এইদিক দিয়েও প্রয়োজন ছিল এবং তাই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগতে মাতৃভাবের যে প্রকাশ করেছেন, তার প্রয়োজন—আগেই বলেছি—জগৎকে বাঁচাবার জন্য।

মা ঠাকুরানীর সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে বলা চলে। আরতির ঘণ্টা পড়ে গেছে। কেবলমাত্র সূত্রমুখে কতকগুলি জিনিস উপস্থাপিত করলুম। আপনারা এইগুলি নিয়ে একটু চিন্তা করুন। চিন্তা করে নিজের জীবনকে তৈরি করুন। শুধু বক্তৃতা শুনলে বা বই পড়লে হবে না। তাতে অনেক তর্ক উঠবে, মা-ঠাকুরানীর সম্পর্কেও তর্ক উঠবে—ঠাকুরের সম্পর্কেও তর্ক উঠবে, উঠছেও। কেবলমাত্র এইটুকু মনে রাখতে হবে যে, তর্ক করে কিছু লাভ হবে না, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'—তর্কের দ্বারা কিছু প্রতিষ্ঠিত করা যায় না,—কোন মীমাংসায় আসা যায় না। জীবনকে তৈরি করতে হবে। তবেই সব সংশয়ের সব সন্দেহের অবসান হবে। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি:

'চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
　কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
　কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ 'পরে ঢেউ
　গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ
　হা হা করে আকুল পবন।
এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
　পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
　থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
　লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যেদিকে ফিরাবে তুমি দু'খানি নয়ন
　সেদিকে হেরিবে সবে পথ।'

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের ১৯৭২-৭৪-এর প্রকাশিত কার্য-বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শ্রীসারদা মঠের মূলকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে। শাখা-কেন্দ্র দুইটি : একটি মাদ্রাজে, অপরটি ত্রিচুরে। সকল কেন্দ্রেই ধর্মীয় আলোচনা, দৈনিক পূজা আরাত্রিক প্রার্থনাদি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিকৃত্য বিশেষ পূজা হোম ও সাধারণ সভাদির মাধ্যমে পালিত হয়। মাদ্রাজ মঠে ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট ৯০ দিন ধর্ম-প্রসঙ্গ করা হয় (দৈনিক গড় উপস্থিতি ৩৬) এবং প্রতি রবিবার স্বল্পবয়স্কা বালিকাদিগের জন্য গীতা উপনিষদ ও পৌরাণিক গল্পের ক্লাস হয়।

ত্রিচুর মঠে ধর্মীয় কৃত্যাদি ভিন্ন দুইটি ছাত্রী আবাস—'বালিকা গুরুকুলম্' ও 'শ্রীসারদা হোস্টেল', ১টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি নার্সারি বিদ্যালয়ও পরিচালিত হয়। বালিকা গুরুকুলমের ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ৯৯ (হরিজন ১৮, অনাথ ৭) এবং শ্রীসারদা হোস্টেলে কলেজের ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ৪০। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ১৯৭২-৭৩-এ ৭৮৮ এবং ১৯৭৩-৭৪-এ ৮৯৫ জন। নিঃশুল্ক নার্সারিতে উপস্থিতি ৪০। শিশুদের মধ্যাহ্নভোজন আশ্রম হইতেই দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশনেরও মূলকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে। শাখাকেন্দ্র ৮টি : ৫টি পশ্চিমবঙ্গে এবং নতুন দিল্লী, খোলসা (তিরাপ) ও ত্রিবান্দ্রমে ১টি করিয়া। ঐ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, ত্রাণ ও ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার হইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের মূলকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে নিম্নোদ্ধৃত সেবাকার্য পরিচালিত হয় :

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় : ১৯৭২-৭৩ সালে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ৮,২৯৩, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ৩,০৬৮ ; ১৯৭৩-৭৪ সালে উক্ত সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে ৮,৩৩৩ ও ৩,৮৯২।

বিদ্যালয় : বিনা বেতনে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ও বয়স্থা বালিকাদিগকে বাংলা, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয় এবং হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ২৫। স্থানীয় দরিদ্রঘরের বালক-বালিকাদের জন্য নিঃশুল্ক আর একটি বিদ্যালয় আছে। ১৯৭৪ এর মার্চের শেষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬০। তাহাদের বিনা পয়সায় বিদ্যালয়ের পোশাক শীতবস্ত্র এবং দৈনিক জলখাবার দেওয়া হয়। ৪র্থ মান পর্যন্ত বিদ্যালয়টি উন্নীত করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক খরচ চালাইবার জন্য সহৃদয় জন-সাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন।

রবিবাসরীয় বিদ্যালয় : ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালকবালিকাদিগের একত্রিত করিয়া প্রার্থনা ও স্তোত্রাদি শেখানো হয় এবং ইতিহাস ও পুরাণাদির গল্প বলা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে ইহাতে যোগদানকারী বালকবালিকার সংখ্যা ছিল ৫০।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার : আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৬৭৪ ও ৭৬৩। কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও রাখা হয়।

ইহা ছাড়া মিশন স্থানীয় কতিপয় শিক্ষার্থী ও দুঃস্থা রমণীকে আর্থিক সাহায্য দেয়। উক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ ৩,৮১৫ টাকা। দরিদ্রা রমণীদের এবং বালকবালিকাদের মধ্যে বস্ত্রাদিও বিতরিত হয়।

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্‌
নিবোধত

দিব্য বাণী

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥
জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈ র্ব্রহ্ম নির্গুণম্।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্মণা॥

—ভাগবত, ৩।২৫।১৯, ৩।৩২।২৮

যিনি অখিলের আত্মারূপেতে বিরাজিত মহিমায়,
তাঁহাতে ভক্তি-যোগের সমান পথ নাই শিবময়।
ব্রহ্মসিদ্ধি তরে তাই যোগী শুভ সেই পথ ধরে
সগুণ সাকার শরণ্য সবার পরেশে ভক্তি করে।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম গুণাতীত পরমার্থ সত্য হয় ;
তাঁহারেই জীব ভ্রমেতে পড়িয়া রূপ-রস-আদি-ময়
বিষয়রূপেতে প্রতি পদে পদে দেখিছে হইয়া অন্ধ—
অনাদি মায়ায় যুগযুগান্তেও কাটে না তাহার বন্ধ।
বহির্মুখ যত ইন্দ্রিয়নিচয় প্রতারিত করে তারে,
দৈবী মায়া যাঁর শরণেই তাঁর বিকার কাটিতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে

'নির্গুণ গুণময়'

'নেতি' 'নেতি' বলিয়া শ্রুতি যাঁহার স্বরূপের নির্দেশ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই অনির্দেশ্য নির্গুণ নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দই চরম তত্ত্ব। কিন্তু সাধারণ সাধকের পক্ষে ব্রহ্মের সেই নির্গুণ নিরাকার স্বরূপ ধারণা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন তীব্র বৈরাগ্যবান বিরলতম অধিকারীর পক্ষেই ওই তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। এইজন্য অদ্বৈতবাদীরা বলেন, সগুণ সাকার ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে, তবেই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা করার যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। মন লইয়া কথা। মনের শক্তি অসীম। কিন্তু যে-শক্তিতে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব, সাধারণ অবস্থায় মনের সেই শক্তি আচ্ছন্ন থাকে তিনটি দোষের দ্বারা। সেই তিনটি দোষ হইতেছে—মল বিক্ষেপ ও আবরণ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মনের মালিন্যদোষ অপসারিত হয়—স্বার্থশূন্যভাবে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে পরকল্যাণে কর্ম করিলে মন শুদ্ধ হয়, কিন্তু মনের বিক্ষেপ ও আবরণ, এই দুইটি দোষ তখনও থাকিয়াই যায়। বিক্ষেপদোষ দূর করিতে হইলে উপাসনার প্রয়োজন—সগুণ সাকার ঈশ্বরে মন স্থির করা অত্যাবশ্যক। এইভাবে কর্ম ও উপাসনার দ্বারা মন শুদ্ধ ও সমাহিত হইলে বেদান্তের মহাবাক্যাদির শ্রবণান্তর মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বৃত্তিতে মন নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইলে আবরণভঙ্গহেতু নিরাবরণ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়।

এইজন্য সুপ্রাচীন কাল হইতেই এই ভারতবর্ষে সগুণ সাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত। উপনিষদে আমরা ইহার পরিচয় পাই। তথাকথিত মূর্তিপূজা অর্থাৎ শিলাময়ী দারুময়ী ইত্যাদি মূর্তি গঠিত করিয়া তাহার সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনার প্রচলন না থাকিলেও মনোময়ী মূর্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা সে-যুগে প্রচলিত ছিল—'হিরণ্যশ্মশ্রু' 'হিরণ্যকেশ' ইত্যাদি শব্দ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই কারণে আচার্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও উপাসনার জন্য সগুণ ব্রহ্ম শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন [১] এবং ব্রহ্মের আকারবিশেষও উপাসনার জন্যই বিহিত হওয়ায় নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম ও সগুণ সাকার ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রুতিসমূহের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।[২]

চূড়ান্ত জ্ঞানের গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও দেখি বাল্মীকি-মুনি ভরদ্বাজ-ঋষিকে বলিতেছেন:

> সাকারং ভজ তাবৎ ত্বং যাবৎ সত্ত্বং প্রসীদতি।
> নিরাকারে পরে তত্ত্বে ততঃ স্থিতিরকৃত্রিমা॥

—(ভরদ্বাজ!) তুমি ততদিন সাকার উপাসনাই করো, যতদিন পর্যন্ত না তোমার মন সমাহিত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। তাহার পরই চরম যে নিরাকার তত্ত্ব, তাহাতে তোমার অকৃত্রিম

১ 'নির্গুণমপি সৎ ব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিশ্যতে।'—ব্রঃ সূঃ ১।২।১৪, ভাষ্য।

২ 'ব্রহ্মণঃ আকারবিশেষোপদেশঃ উপাসনার্থঃ ন বিরুধ্যতে।'—ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৫, ভাষ্য।

স্থিতি হইবে। তাৎপর্য এই যে, সাকার উপাসনার দ্বারা মনঃপ্রসাদ লাভ না হইলে শুরুতেই নিরাকার তত্ত্ব ধারণা করিতে চেষ্টা করিলে তাহা কৃত্রিম হইবে, ব্যর্থ হইবে।

নির্গুণ ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব—এই বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তে স্থিরনিশ্চয় হইলেও সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে, বোধির স্তরে ওই সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করা তাঁহার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে, তখন তিনি স্বভাবতই সগুণ সাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করেন। 'অদ্বৈতবীথিপথিক'-গণের উপাস্য মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় মহারথীও যখন 'অদ্বৈত-সিদ্ধি'-গ্রন্থেই 'পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখ', 'অরবিন্দনেত্র', 'অরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠ' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা গাহিয়াছেন, তখন সাধারণ সাধকের 'কা কথা'! অন্যত্রও তিনি লিখিয়াছেন: ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া যোগিগণ যদি সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমজ্যোতি দর্শন করিতে পারেন, তো তাঁহারা তাহাই করুন; আমাদের জন্য কিন্তু সেই কালিন্দীপুলিনবিহারী অত্যাশ্চর্য নীল জ্যোতিই চিরকাল নয়নানন্দকর হইয়া থাকুক।

ইহা নিঃসন্দেহ যে, মধুসূদনের ন্যায় প্রসিদ্ধ না হইলেও যুগে যুগে বহু অদ্বৈতবাদী সাধকই সগুণ সাকার ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছেন। ভক্তির মহান আচার্যগণের ঐকান্তিক অনুরাগপূর্ণ ঈশ্বর-আরাধনার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে অদ্বৈতবাদ তাঁহাদের নিকট অন্তরায়রূপে উপস্থিত হয় নাই। আচার্য রামানুজের সেই পদে পদে 'অসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণ-মহোদধি' বিশেষণ, নিম্বার্কদেবের সেই 'স্বভাবতঃ অপাস্ত-সমস্ত-দোষ', 'অশেষকল্যাণগুণৈকরাশি', 'কমলেক্ষণ' কৃষ্ণের কথা, মধ্বাচার্যের সেই প্রার্থনা: 'অগণিত-গুণগণময়-শরীর হে/বিগত-গুণেতর ভব মম শরণম্' —হে অগণিতগুণময়-বিগ্রহ, হে সর্বদোষলেশ-রহিত প্রভু, আপনি আমায় শরণ দিন— কত অদ্বৈতবাদীর হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং সগুণ সাকার ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া সোপান-আরোহণক্রমে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের অভিমুখে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের প্ররোচিত করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! আচার্য শঙ্করও এই বিষয়ে খুবই উদার। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে তিনি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে, তিনি অনন্যচিত্ত দ্বৈতবাদীদের তৈলধারাবৎ বিরামবিহীন ভগবদা-রাধনার খণ্ডন করিতেছেন না, কিন্তু জীবের উৎপত্তিবিষয়ক দার্শনিক মতবাদেরই খণ্ডন করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার 'যুক্তি ও ধর্ম'-বক্তৃতায় বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলেই যে ভক্তি প্রার্থনা ইত্যাদি উড়িয়া যাইবে, তাহা নহে; মাটির হাতি ও মাটির ইঁদুর — মাটি হিসাবে এক, কিন্তু হাতি ও ইঁদুর হিসাবে চিরকালই পৃথক্। স্বরূপের দিক দিয়া শুদ্ধ-চৈতন্যের দিক দিয়া ঈশ্বর ও আমরা এক, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা চিরদিনই সগুণ সাকার ঈশ্বরের দাস।

আরও কথা এই যে, সাধক সগুণ সাকার ঈশ্বরে মন প্রণিহিত করিতেছেন বলিয়া নিজেকে হীন মনে করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: 'যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ', 'যিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার'। সুতরাং সগুণ সাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে চেষ্টা করা চরম নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বেরই ধারণা করিবার প্রয়াস মাত্র, অদ্বৈতবাদী সাধকের ইহা মনে রাখা আবশ্যক। ভাগবতে আছে, রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গুণময় দয়িতরূপেই জানিতেন, নির্গুণ ব্রহ্মরূপে নহে, তথাপি তাঁহারা গুণাতীত হইলেন

কি করিয়া ? উত্তরে শুকদেব বলিয়াছিলেন, অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ ও গুণময় শ্রীভগবানের আবির্ভাব মানবগণের নিঃশ্রেয়সের জন্যই। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি শুধুই গুণময় হইতেন, তাহা হইলে গোপীদের নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অসম্ভাবিত ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শুধু গুণময় নহেন, তিনি নির্গুণও। সুতরাং তাঁহাকে অশেষকল্যাণগুণময় দয়িতরূপে ভাবনা করিয়াও গোপীগণের নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বন্দনা করিয়াছেন, 'নির্গুণ গুণময়' বলিয়া—'গুণজিৎ গুণেড্যঃ' বলিয়া। স্বামীজী বলিয়াছেন : 'ভক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি গচ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।'— শ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্গুণ হইয়াও অনন্ত গুণের আধার, ত্রিগুণাতীত হইয়াও গুণাঢ্য বলিয়াই গুণেড্য, অশেষগুণের জন্য বন্দনীয়; ভববন্ধননাশক ভজন, ভক্তি এবং ভক্তিসমুত্থ তেজই দুরধিগম্য সেই সুবিপুল নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনায়াস-প্রাপ্তির পর্যাপ্ত কারণ হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহাসমাধির প্রায় চারি-পাঁচ মাস পূর্বে স্বামীজী যখন কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভিঙ্গার রাজা বেদান্তপ্রচারের জন্য স্বামীজীকে পাঁচশত টাকার একখানি চেক প্রেরণ করেন। স্বামীজী স্বামী শিবানন্দকে ওই অর্থের দ্বারা কাশীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি মঠ স্থাপন করিতে নির্দেশ দেন। স্বামীজীর শেষ কীর্তি—'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম'—কাশীধামে স্থাপিত হয় ৪ঠা জুলাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে—সেই চিরস্মরণীয় দিনে, যেদিন স্বামীজী মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করিয়া স্বস্বরূপে লীন হন। প্রশ্ন হইতে পারে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম'— এই নামকরণের তাৎপর্য কি ? এইরূপ আশ্রম স্থাপনার দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তের প্রচার কিভাবে হইতে পারে ? আমরা ইতিপূর্বেই যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতেই ইহার উত্তর নিহিত আছে। ভারতের চিরন্তন ধারা অনুযায়ী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সাকার সগুণ ব্রহ্মের মাধ্যমেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের অভিমুখে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিতেন। দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে, গুণময় হইতে নির্গুণে—মুখ্যতঃ ইহাই ছিল তাঁহার নির্দেশিত সাধন-প্রণালী। বিরল অধিকারীকেই তিনি সরাসরি অদ্বৈততত্ত্বের উপদেশ করিতেন। সুতরাং নরদেহধারী সগুণ ব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—এই আদর্শের অনুসরণে আশ্রমটির স্থাপনা ও নামকরণে অযৌক্তিকতার কিছু নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যে যাহার চিন্তা করে, সে তাহার সত্তা পায়। তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী উক্ত বাণীর ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, যে যাঁহার চিন্তা করে সে তাঁহার গুণ প্রাপ্ত হয়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চিন্তা করার অর্থ তাঁহার গুণের কিয়দংশের অধিকারী হওয়া; তাঁহার প্রথম গুণ— প্রভুত্ব; দ্বিতীয় গুণ — সত্যসংকল্পত্ব; তৃতীয় গুণ— প্রেম। তাঁহাকে চিন্তা করিয়া যদি আমরা ইন্দ্রিয়-মনের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি, যাহা সংকল্প করিব তাহা যদি কার্যে পরিণত করিতে পারি এবং সকল জীবকে ভালবাসিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা ঠিক ঠিক তাঁহার চিন্তা করিতেছি বুঝিতে হইবে, নতুবা আমাদের উপাসনায় ত্রুটি আছে, সন্দেহ নাই।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি সমাগত-প্রায়। ভারতে তথা ভারতেতর বহু দেশে

এই উপলক্ষে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে বিশেষ পূজা পাঠ ও বক্তৃতাদির আয়োজন হইবে—কোথাও সাড়ম্বরে, কোথাও সাধারণভাবে—যাহার যেরূপ সামর্থ্য সেইভাবে এবং পরিস্থিতি অনুসারে। ইহা আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল উৎসবাদির সার্থকতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুণের আংশিক অধিকারী হওয়াতেই, যান্ত্রিক অনুবর্তনে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে নহে, ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার পুণ্য আবির্ভাব-তিথিতে আমরা প্রত্যেকেই যেন আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতে পারি—

'অগণিতগুণগণময়-শরীর হে
বিগত-গুণেতর ভব মম শরণম্।'

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা: ননু ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বং ন যুজ্যতে, বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কাংশ্চিৎ সুখিনঃ দেবাদীন্, কাংশ্চিৎ দুঃখিনঃ তির্যগাদীন্, কাংশ্চিৎ উভয়বতঃ মনুষ্যান্ চ সৃজন্ ঈশ্বরঃ বিষমঃ স্যাৎ। তথা প্রলয়কালে অবিশেষেণ সর্বান্ জীবান্ উপসংহরন্ নির্ঘৃণঃ চ স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য তৎপ্রাণ্যনুষ্ঠিত-কর্মাপেক্ষয়া এব ঈশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদৌ প্রবৃত্তেঃ ন বৈষম্যাদ্যাপত্তিঃ ইতি অভিপ্রেত্য আহ—যেন বিবুদ্ধম্ ইতি। **সুখদুঃখৈঃ** সুখং—পুত্রদারাদি-লাভাদি-জন্যা সত্ত্বপরিণামরূপানুকূল-চিত্তবৃত্তিঃ। দুঃখং—রোগাদি-জন্যা রজোবিকাররূপা প্রতিকূল-চিত্তবৃত্তিঃ। তদুভয়-বিশিষ্টং সকলং জগৎ, **যেন** স্বপ্রকাশ-চিদ্‌রূপেণ পরমাত্মনা বিবুদ্ধং প্রকাশিতম্ ইতি অর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (মু. উ. ২।২।১০) ইতি। তস্য সূর্যাদ্যবিষয়স্য ব্রহ্মণঃ ভাসা স্বরূপচৈতন্যেন ইতি অর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—'এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে। এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে' (কৌ. উ. ৩।৮)। এভ্যঃ লোকেভ্যঃ নরক-তির্যগাদি-লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, ঊর্ধ্বং গন্ধর্বাদি-ব্রহ্মান্তানাং পদং নেতুম্ ইচ্ছতি। অধঃ তির্যগাদি-স্থাবরান্তং নেতুম্ ইচ্ছতি ইতি শ্রুত্যা হি তৎ-তৎ-প্রাণ্যনুষ্ঠিত-কর্মাপেক্ষয়া তৎফল-প্রদাতৃত্বং বোধ্যতে।

ন চ পুণ্যে পাপে চ স্বেচ্ছয়া প্রবর্তয়তঃ ঈশ্বরস্যঃ পুনশ্চ* বৈষম্যাদ্যাপত্তিঃ ইতি

* টীকায় উল্লিখিত 'পুনশ্চ'-শব্দটি বর্তমান আলোচনার পক্ষে নিরর্থক বলিয়া অনুবাদে উহা বাদ দেওয়া হইল। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩২-৩৩ সূত্রে ঈশ্বরের জগৎকারণত্বের অনুপপত্তির একটি সমাধান করা হইয়াছে। ৩৪-৩৬ সূত্রে আর একটি অধিকরণেও পূর্বপক্ষের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। সুতরাং সেখানে 'পুনশ্চ'-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বিষয়ে আরও একটি আশঙ্কা বর্ণনা করিয়াছেন—'পুনশ্চ জগৎজন্মাদি হেতুত্বম্ ঈশ্বরস্য আক্ষিপ্যতে ...' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪, শাঙ্করভাষ্য)। টীকাকার ভাষ্যকারের উক্ত 'পুনশ্চ'-শব্দটি বিচারের প্রথমেই অকারণ গ্রহণ করিয়াছেন।

বাচ্যম্,—পূর্বপূর্বকর্মাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরস্মিন্ প্রবর্তয়তঃ তদাপত্ত্যভাবাৎ, সংসারস্য চ অনাদিত্বাৎ, সূত্রকারেণ চ তস্য বৈষম্যাদেঃ অভাবঃ সূচিতঃ—'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪), 'ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫)। ঈশ্বরস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সম্ভবতঃ, সৃষ্ট্যাদি-প্রাণিকর্মাপেক্ষত্বাৎ। তথাহি—এষ হ্যেব ইতি উক্তা শ্রুতিঃ দর্শয়তি ইতি প্রথম-সূত্রার্থঃ। নন্থু সৃষ্টেঃ পূর্বং কর্ম নাস্তি, তদা অবিভাগাৎ সর্বস্য ব্রহ্মমাত্রত্বাৎ ইতি চেৎ, ন, সংসারস্য অনাদিত্বাৎ, সূক্ষ্মতয়া প্রলয়ে স্থিতিসম্ভবাৎ চ ইতি দ্বিতীয়-সূত্রার্থঃ। তথা চ ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে ন কঃ অপি দোষঃ ইতি। ২।

অনুবাদ: (শঙ্কা): ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব যুক্তিযুক্ত হয় না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষদ্বয়ের প্রসঙ্গ হইবে। (কারণ) দেবাদি কোন কোন জীবকে সুখী, তির্যক্ (বক্রগামী পক্ষী, সরীসৃপ) আদি কোন কোন জীবকে দুঃখী এবং সুখদুঃখ উভয়ভাগী মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করাতে ঈশ্বর পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট হইবেন। আর প্রলয়কালে সকল জীবগণকেই নির্বিচারে সংহার করাতে তিনি নিষ্ঠুরতা-দোষ-দুষ্ট হইবেন— এই শঙ্কার উত্তরে আচার্য—দেবাদি প্রাণিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম অনুসারেই ঈশ্বরের সৃষ্টি আদি কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে বলিয়া বৈষম্যাদি-দোষের আপত্তি হয় না—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন] **যেন বিবুদ্ধম্** ইত্যাদি। **সুখদুঃখৈঃ**—পুত্র, স্ত্রী আদি লাভাদি জন্য সত্ত্বগুণের পরিণামরূপ অনুকূল চিত্তবৃত্তিবিশেষই সুখ। আর রোগাদিজনিত রজোগুণের পরিণামরূপ প্রতিকূল চিত্তবৃত্তিবিশেষই দুঃখ। সমস্ত জগৎই এই সুখদুঃখবিশিষ্ট। সেই জগৎ **যেন**—যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার দ্বারা **বিবুদ্ধম্**—প্রকাশিত, ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ; যথা—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—'তস্য ভাসা', ইহার অর্থ—সূর্যাদির (প্রকাশক পদার্থের) অবিষয় ব্রহ্মের জ্যোতিতে অর্থাৎ স্বরূপ-চৈতন্যের দ্বারা। এখানে ভাবার্থ এইরূপ—'এষ হি এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো··· নিনীষতে।' 'এভ্যো লোকেভ্যঃ'— নরক-তির্যগাদি এই সমস্ত লোক হইতে 'উন্নিনীষতে'—উর্ধ্ব গন্ধর্বাদি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পদ প্রাপ্ত করাইতে ইচ্ছা করেন। 'অধঃ'—তির্যগাদি স্থাবরান্ত পদ প্রাপ্ত করাইতে ইচ্ছা করেন; এই শ্রুতির দ্বারা সেই সেই প্রাণিগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্মের অপেক্ষাতেই (ঈশ্বরের) সেই সেই কর্মফল-প্রদাতৃত্ব বুঝা যায়।

[(জীবগণকে) পুণ্য ও পাপ কর্মে স্বেচ্ছাপূর্বক প্রবর্তনকারী ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ প্রাপ্তি ঘটিবে, ইহাও বলিতে পার না। কারণ (জীবের) পূর্বে পূর্ব (জন্মের) কর্মাপেক্ষায় (কর্মানুসারে) উত্তরোত্তর অর্থাৎ পরবর্তী পরবর্তী (জীবশরীর নির্মাণে) প্রবৃত্ত হন বলিয়া ঈশ্বরে বিষমতা ও নির্দয়তা দোষদ্বয় হয় না, (যদি বল সর্বপ্রথম সৃষ্টি জীবকর্ম-নিরপেক্ষ হইয়া করাতে উক্ত দোষদ্বয় হইবে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ) সংসারও অনাদি। সূত্রকারও ঈশ্বরের বৈষম্যাদির অভাব (তাঁহার রচিত সূত্রে) সূচিত করিয়াছেন; যথা—'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি', 'ন কর্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ'। —(অর্থ): ঈশ্বরের বিষমতা ও নির্দয়তা দোষদ্বয় সম্ভব হয় না, কারণ তিনি প্রাণীদিগের অনুষ্ঠিত কর্মের অপেক্ষাতেই (কর্মানুসারেই) (জগৎ-)সৃষ্টি আদি

কর্ম করিয়া থাকেন। 'তথাহি' —তাহাই 'এব হি এব'—এই পূর্বোক্ত শ্রুতি প্রদর্শন করে। ইহাই প্রথম সূত্রের অর্থ।

(দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ)—(শঙ্কা) : সৃষ্টির পূর্বে তো কর্মই নাই, কারণ তখন সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেরই (ব্রহ্মের সহিত) অবিভাগবশতঃ (অভিন্নতাবশতঃ) ব্রহ্মমাত্রই বিদ্যমান থাকেন।* (উত্তর) : না, তাহা নহে। কারণ, সংসার অনাদি, সুতরাং প্রলয়কালেও, (সংসার) সূক্ষ্মরূপে (প্রকৃতিতে) বিদ্যমান থাকে (সুতরাং, প্রলয়ে প্রকৃতিতে সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে বিদ্যমান পূর্ব সৃষ্টির জীবকেই তাহার কর্মানুসারে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকেন বলিয়া ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষদ্বয় হইতে পারে না।)। ইহাই দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ।

এইরূপে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব-বিষয়ে কোনও দোষ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল।]। ২।

* এখানে এই শ্রুতি স্মরণীয় : 'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্'—(ছা. উ. ৬।২।১)

শরণাগত

[বেহাগ—দাদরা]

শ্রীমাধুর্যময় মিত্র*

আমি শরণাগত চরণে
নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু তুঁহু
　　সদা যেন রয় স্মরণে ॥
অন্তবিহীন করুণা-পাথার
কৃপা বিতরিতে হয়েছো সাকার।
শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ-অবতার
　　কলি-কল্মষ-হরণে ॥
বহে অনুকূল কৃপা-সমীরণ।
পাল তুলে দিতে করিনে যতন।
কণ্টক-তৃণ-লালায়িত মন,
　　ভুলিয়া শোণিত-ক্ষরণে।
দীনের ভরসা হে মহাশরণ
রামকৃষ্ণ-নাম শঙ্কা-হরণ
সম্পদ তব অভয় চরণ
　　ভব গোষ্পদ-তরণে

* কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সহকারী প্রধান শিক্ষক।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তুতিঃ

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য*

গুণাতীতচিত্তং পরজ্ঞানবিত্তং, মহাযোগ-সাক্ষাৎকৃত-ব্রহ্মতত্ত্বম্।
মহিম্না দ্যুলোকপ্রসর্পন্মহত্ত্বং, ভজে রামকৃষ্ণং মহাশুদ্ধসত্ত্বম্॥ ১

বরেণ্যং শরণ্যং কৃপাপ্রাবৃষেণ্যং, জগন্মাতৃহস্তাম্বুজস্পর্শধন্যম্।
মহামোহনাশাভিলাষৈঃ প্রপন্নং, ভজে রামকৃষ্ণং সমাধিপ্রসন্নম্॥ ২

সমারাধ্যতন্ত্রৈর্মহাশক্তিমন্ত্রৈঃ, সমীপাগতায়া জগন্মাতুরঙ্কে।
লসদ্দিব্যকান্তিচ্ছটাভির্বিভান্তং, ভজে রামকৃষ্ণং ত্রিলোক্যাং মহান্তম্॥ ৩

নিরুদ্ধান্তরত্বাদনিস্পন্দকায়ং, পরজ্যোতিরুৎসাদিতোত্তুঙ্গমায়ম্।
স্থিতং নির্বিকল্পে সমাধৌ প্রশান্তং, ভজে রামকৃষ্ণং পরধ্যানবন্তম্॥ ৪

প্রশান্তং মহান্তং ত্রিতাপং হরন্তং, কৃতান্তং জয়ন্তং গিরীশং স্মরন্তম্।
চিদব্ধৌ নিমজ্জন্তমুগ্রং তপন্তং, ভজে রামকৃষ্ণং ভবানীং ভজন্তম্॥ ৫

যঃ কামিনীকাঞ্চনমোহমুক্তঃ, নিত্যে পরব্রহ্মণি নিত্যযুক্তঃ।
যোগীন্দ্রবৃন্দার্চিতপাদপদ্মং, তং নৌমি দেবং ভবরোগবৈদ্যম্॥ ৬

বিশ্বার্তিখণ্ডনবিভাবনবদ্ধচেতা-, স্তত্ত্বার্থনির্ণয়বিধৌ সমিতিপ্রমাতা।
দৃষ্ট্যা তৃণীকৃতজগদ্বিষয়াভিলাষং, তং নৌমি দুর্লভসমাগমমিষ্টভাষম্॥৭

যো মৃন্ময়ীং স্বতপসা কৃতচিন্ময়ীং তাং, মূর্তিং ব্যলোকয়দসম্মতিভাগিনোঽস্মিন্।
পুত্রীয়তি প্রতিপদং জগদেকমাতা, যং শাম্ভবী ক্ষিতিতলে মম সোঽস্তু পাতা॥৮

লীলার্থমীপ্সিত বিশুদ্ধবিবাহরঙ্গং, শক্ত্যা বিধিৎসিতমনোজবিলাসভঙ্গম্।
অঙ্গীকৃতানঘজিতেন্দ্রিয়সাধুসঙ্গং, তং নৌমি দুর্দমজগদ্বিষয়েষ্বসঙ্গম্॥ ৯

অতুলিতমহিমানং ব্রহ্মবিৎসু প্রধানং, ভগবদমৃতপানং তত্ত্ববোধৈকদানম্।
বিবুধনিকরশশ্বদ্ভক্তিপূজাপ্রদানং, কুমতিতিমিরহানং নৌমি বন্দ্যাভিমানম্॥ ১০

সগুণমিতি যদস্মিন্ নামরূপপ্রভিন্নং পুনরপগতভেদং নির্গুণং স্যাৎ তদেব।
নিজবিদিতরহস্যং সর্বতো ব্যাহরন্তং, ত্রিদিববসতিপূজ্যং নৌমি তং জ্ঞানবন্তম্॥১১

বলয়িতবিমলার্চির্বেষ্টিতং নিশ্চলাঙ্গং, শুচিললিতনিজাঙ্কে ন্যস্তহস্তাব্জযুগ্মম্।
মুকুলিতকমলাক্ষং পঞ্চবট্যাং নিষণ্ণং, সমধিগতসমাধিং নৌমি দেবং প্রসন্নম্॥১২

ভ্রমরবৃতসরোজশ্রীমুষাশ্মশ্রুলেন, শশিসিতরুচিভাজা ভ্রাজমানং মুখেন।
জগদঘনিকরান্তং বীক্ষণৈঃ কারয়ন্তং, পদকমলমুপেতান্ নৌমি নঃ পাবয়ন্তম্॥১৩

---

* সপ্ততীর্থ ; অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থকার।

ত্রিভুবনজনসারং সর্ববিদ্যাবিহারং
ঘনকুমতিবিদারং ব্রহ্মতত্ত্বপ্রচারম্।
তমিহ পরমহংসং ত্যাগিবর্যং সদারং
ক্ষয়িতত্নুরিতভারং নৌমি দিব্যাবতারম্॥ ১৪

বীজং মুক্তিতরো রনর্থভুজগীসন্দংশনিস্তারকং
ধাম প্রেমরসস্য মোহদুরিতাশুদ্ধাত্মনাং পাবকম্।
যৎ সাক্ষাজ্জনয়েদমন্দমনসাং চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যুদ্ভবং
ভূয়াৎ তচ্চরণং সদৈব শরণং শ্রীরামকৃষ্ণস্য নঃ॥১৫

অন্তর্জ্যোতিরবেক্ষণপ্রমুদিতাম্ভোজায়মানেক্ষণং
চেতোবৃত্তিনিরোধনিশ্চলতনুং নির্বীজযোগস্থিতম্।
প্রহ্লাদদ্যুতিসুন্দরোজ্জ্বলমুখং নির্বাতদীপোপমং
তং বন্দে যতিরাজমুন্নতকরং দণ্ডায়মানং গুরুম্॥ ১৬

নানাতত্ত্বময়ং গিরা সরলয়া গূঢ়ার্থবিজ্ঞাপকং
প্রেষ্ঠং যস্য কথামৃতং হৃদি নৃণাং সন্তাপসংহারকম্।
প্রজ্ঞাভাস্করদিব্যদীপ্তমহিমপ্রক্রান্তদিঙ্মণ্ডলং
তং বন্দে ভগবন্তমিষ্টশরণং শ্রীরামকৃষ্ণাহ্বয়ম্॥১৭

সর্বৈ র্ধর্মপথৈরনন্তমহিমা লব্ধব্য একেশ্বরঃ
যস্যৈতদ্‌বচনাশনি র্বিবদতাং মোহাদ্রিবিদ্রাবণম্।
শশ্বৎ সাধিতসর্বধর্মসরণিং তত্ত্বার্থিকল্পদ্রুমং
তং বন্দে ধৃতবিগ্রহামরবরং শ্রেষ্ঠাবতারং কলৌ॥১৮

নানামার্গপ্রভিন্না ধৃতগতিসরিতঃ সাগরং নির্বিকারং
গত্বা প্রভ্রষ্টভেদাঃ পরিগতসমতা অন্বিতাঃ স্যু র্যথাস্মিন্।
তদ্‌বদ্ যং সর্বভাবা বিষমমতিমতা জ্ঞাততত্ত্বৈকসারং
লব্ধ্বা নষ্টপ্রভেদা স্তমিহ যতিবরং রামকৃষ্ণং প্রবন্দে॥১৯

অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় দেবতাত্মনে।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় নিত্যচৈতন্যরূপিণে॥২০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

(ভূমিকা)

স্বামী ভূতেশানন্দ*

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভিতরে সমস্ত শাস্ত্রের সার পাওয়া যায়। আর তা ছাড়া, এমন সরল-ভাবে সকলের সহজবোধ্যরূপে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ আর কোথাও আছে কিনা আমরা জানি না। কাজেই 'কথামৃতে'র পাঠ ও অনুশীলন আমাদের সকলেরই পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

'কথামৃতে' একই কথা একাধিকবার বলা হয়েছে, আমরা দেখি। এই পুনরুক্তি কিন্তু দোষের নয়, বরং অশেষকল্যাণকর। আমাদের শাস্ত্রকে বলা হয় সনাতন। যেমন গীতায় বলেছেন ভগবান,

'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ
পুরাতনঃ' (৪।৩)

—'(হে অর্জুন!) সেই পুরাতন যোগই আমি আজ আবার তোমাকে বললুম।' প্রাচীন-কালে বহুবার যা বলা হয়ে গেছে, গীতায় তা-ই তিনি পুনরাবৃত্তি ক'রে অর্জুনকে বললেন। আর যুগে যুগে ধর্মের মূল তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি ভগবান নিজে আবির্ভূত হয়ে করেন। এই যে তিনি বারে বারে আবির্ভূত হয়ে একই সনাতন তত্ত্ব বলছেন, এতে পুনরুক্তি-দোষ হয় না। 'শাস্ত্রেষু ন জামিতা অস্তি' বলে। শাস্ত্রের আলস্য নেই। বার বার এক কথা বলতে শাস্ত্রের কোন আলস্য নেই। কেন? না, আমাদের এমন মন যে, বার বার শুনলে তবুও কিছু রেখাপাত হয় কিনা সন্দেহ। এই জন্য শাস্ত্র অনলসভাবে বার বার বলে যাচ্ছেন। যেমন মা সন্তানকে বার বার উপদেশ দেন ছেলের কল্যাণের জন্য। বার বার বলায় তাঁর বিরক্তি হয় না কারণ, তা ছেলের কল্যাণকর। ঠিক সেই রকম শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ যা, সার কথা যা, তা বার বার শাস্ত্র বহুভাবে বলেন। আমরা কথামৃতের ভিতরে তারই উল্লেখ দেখতে পাই। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় একবার বলেছিলেন—মামা, তুমি এক কথা বার বার করে বলো কেন? ঠাকুর বললেন—কেন বলবো না! ভাবটা হচ্ছে এই যে, বার বার ক'রে না বললে আমাদের মত বিক্ষিপ্ত মনের উপরে দাগ কি করে পড়বে। তাই বার বার ক'রে তাঁদের বলতে হয় এবং বার বার আমাদের শুনতে হয়। কাজেই শাস্ত্রে কখনও পুনরুক্তি-দোষ হয় না।

আর ভাগবতে ঋষিরা এক জায়গায় (১।১।১৯) বলছেন যে, ভগবানের কথা 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। যত শুনি তত তার ভিতরে রস আরো আস্বাদন করবার যেন নতুন নতুন শক্তি আসে আমাদের। প্রথম শুনে যতটুকু বুঝি, আরো যত দিন যায় যত শুনি আরো বেশী ক'রে বুঝতে পারি, আরো বেশী ক'রে তার ভিতর থেকে রস পাই। এই জন্যও বার বার শুনতে হয়।

সুতরাং যে অমৃত আমাদের মৃত্যু-সাগর থেকে উদ্ধার করবে, সেই কথামৃত আমরা অনুসরণ করবো এবং তা আস্বাদন করবার চেষ্টা করবো। তাঁর কৃপায় যদি কিছু এর মর্ম আমরা গ্রহণ করতে পারি, তা হ'লে আমাদের জীবন সার্থক হবে। অমৃতের কোন একটি বিন্দু যদি কোন রকম ক'রে আমরা গ্রহণ করি, আমরা অমর হবো। এইজন্য ঠাকুরের কথাকে 'অমৃত' বলা হয়েছে— মাষ্টারমশাই তুলনীয় আর কোন

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

জিনিস পাননি। তাই 'কথামৃত' নাম দিয়েছেন—ভাগবতকে অনুসরণ ক'রে। এই অমৃত পানে মানুষ অমর হবে যুগ যুগ ধরে। এই অমর বাণী মানুষের দরজায় দরজায় পৌছাবে, মানুষের প্রাণে প্রবেশ করবে এবং তাকে অমর করবে।

এই কথা-অমৃত পান করবার জন্য মানুষের বিশেষ কোন পূর্ব-ভূমিকা দরকার হয় না। শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পড়তে হ'লে বিশেষ একটা যোগ্যতা দরকার হয়। কিছু জ্ঞান অর্জন করে নিয়ে তারপরে মানুষের শাস্ত্র আলোচনা করবার অধিকার আসে। কিন্তু 'কথামৃত' এই রকম কোন অধিকার নিয়ে আলোচনা করবার দরকার হয় না। যে কিছু জানে না, তার পক্ষে 'কথামৃত' আরও সহজবোধ্য হবে। অনেক জ্ঞান মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মানুষের সংশয়কে বাড়িয়ে দেয়। আসলে একটি জ্ঞানই জ্ঞান। প্রথম দর্শনেই মাষ্টারমশাই শিখলেন ঠাকুরের কাছ থেকে যে, ভগবানকে জানার নাম জ্ঞান আর তাঁকে না জানার নাম অজ্ঞান।

এটি শেখবার কথা মাষ্টারমশায়ের কাছে কথাটি নতুন ঠেকেছিলো, যদিও তিনি যখন ঠাকুরের কাছে গেছেন তখন শুদ্ধ মন নিয়েই গেছেন —যেজন্য ঠাকুর প্রথম থেকেই তাঁকে আপনার ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং ঠাকুরের কথারূপ অমৃত জগতে পরিবেশন করার বিশেষ ভার তাঁর উপরে তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতসারে ঠাকুর দিয়েছেন। সেই শুদ্ধচিত্ত কৃতবিদ্য মাষ্টারমশাই ঠাকুরের কাছে গিয়েই প্রথমে যখন কথা উঠলো, জানলেন যে, ভগবানকে জানার নাম জ্ঞান, আর তাঁকে না জানার নাম অজ্ঞান। আমরা যদি দশটা বই পড়ি তাতে আমাদের বুদ্ধি একটু হয় বটে। কিন্তু যদি মন শুদ্ধ না হ তা হলে সেই বুদ্ধির মার্জনা আমাদের তত্ত্বজ্ঞান-লাভে বিশেষ কিছু সাহায্য করে না। 'পোথী পঢ়কে তোতা ভয়ো পণ্ডিত ন ভয়ো কোঈ।' শাস্ত্র পড়ে মানুষ তোতাপাখী হয়, পণ্ডিত হয় না। ঠাকুর বলছেন, পাখী 'রাধাকৃষ্ণ' আরও কত কি পড়ে, কিন্তু যখন বিড়ালে ধরে তখন ট্যাঁ ট্যাঁ করে। তখন আর 'রাধাকৃষ্ণ' বলে না। পাণ্ডিত্যের দ্বারা মানুষের বুদ্ধির প্রখরতা হয়, বাক্‌পটুতা হয়, লোককে কথা ব'লে মুগ্ধ করতে পারা যায়। কিন্তু তার দ্বারা সংশয় দূর হয় না। পাণ্ডিত্যের ভিতর দিয়ে মানুষ যে ভগবানকে জানতে পারে, তা নয়। ভগবানকে জানবার পথই হ'ল অন্য। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। উপনিষদ্ বলছেন, আত্মাকে বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা জানা যায় না—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' (মু. উ. ৩।২।৩)। বহু শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করলে যে মানুষ ভক্ত হ'ল বা জ্ঞানী হ'ল, তা নয়। বরং বহু অধ্যয়ন মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। 'নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ' (বৃহ. উ. ৪।৪।২১)—বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে না, কারণ তা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। অনেক পড়লে বুদ্ধি বিচলিত হয়। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করবার জন্য, প্রখর করবার জন্য, একাগ্র করবার জন্যই শাস্ত্র-অধ্যয়ন, কিন্তু শাস্ত্রই বলছেন যে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে উল্টে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পঞ্চদশী-টশী পড়েছ ?' সান্যাল মশায় উত্তরে বলেছিলেন, 'সে কার নাম, মশাই, আমি জানি না।' শুনেই ঠাকুর বললেন, 'বাঁচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐসব পড়ে আসে ; কিছু করবে না, অথচ আমার হাড় জ্বালায়।' কতকগুলো বই পড়ে তার বদহজম হওয়ায় মানুষ পণ্ডিতমূর্খ হয়। সে মনে করে পণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি সে যে মূর্খ, সে বোধ তার হয় না। এইজন্য শাস্ত্রই বার বার বলছেন, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে

তাঁকে জানা যায় না। একটু ধর্মভাব এলেই মানুষ গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্তের গ্রন্থ সব—পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পরিণাম কি হয়? পরিণাম এই হয় যে, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। তা হ'লে কি শাস্ত্র পড়বো না? এমন কথা ঠাকুর বলেন নি বা শাস্ত্রও এমন কথা বলেন না। পড়বো, কিন্তু তার জন্য যে বিবেক দরকার, যে শ্রদ্ধা দরকার সেই বিবেক, সেই শ্রদ্ধা অর্জন ক'রে তবে পড়বো। শাস্ত্র মানুষকে কতদূর বিভ্রান্ত করে তা শাস্ত্রের অসংখ্য মতবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারি। কেউ বলছে শাস্ত্র এই কথা বলছেন, কেউ বলছে, শাস্ত্র অন্য কথা বলছেন। এই নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হচ্ছে না। এবং মীমাংসা না হবার কারণ এই যে, সকলেই খোসা নিয়ে টানাটানি করছে। শাস্ত্রের ভিতরে যে সার বস্তু তাতে পৌঁছতে পারছে না। ঠাকুর বলেছেন, 'শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে, চিনিটুকু নেওয়া বড় কঠিন।' কাজেই শাস্ত্র আমরা সহজে বুঝতে পারি না। তাহলে উপায় কি? উপায় হচ্ছে, যাঁদের জীবনের দ্বারা শাস্ত্র প্রাণবন্ত হচ্ছে, তাঁদের জীবনালোকে শাস্ত্রকে দেখা। তা না হলে শাস্ত্র বোঝা যায় না। শাস্ত্র বুঝতে আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে চেষ্টা করি,—স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে—আমাদের সাধ্য নেই যে, তার মর্মকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। কারণ, সেক্ষেত্রে আমরা কথার মারপ্যাঁচই খালি দেখব আর বিভ্রান্ত হব, যেমন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভাষাবিদ হিসাবে শাস্ত্রের মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে কত যে বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা যে যন্ত্র দিয়ে শাস্ত্রকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সেই মনরূপ যন্ত্রটি শুদ্ধ হয় নি। অতএব তার ভিতর দিয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য কিছুতেই প্রতিভাত হয় নি। সুতরাং একমাত্র উপায় হল এই যে, যাঁরা তাঁদের জীবনালোকে শাস্ত্রকে উদ্ভাসিত করেছেন, যাঁরা নিজেদের প্রাণ দিয়ে শাস্ত্রকে প্রাণবন্ত করেছেন, তাঁদের জীবনালোকেই শাস্ত্রকে বুঝতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কথামৃত এই দিক দিয়ে আমাদের অব্যর্থ সহায় হবে। এর ভিতর দিয়ে আমরা সত্যকে এত সহজে জানতে পারব যে, অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। গোঁড়ামির কথা বলছি কিনা প্রশ্ন উঠবে। জানি না। তবে এইটুকু মনে হয় যে, জগতের আদিকাল থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, তার এত সুষ্ঠু, এত সহজ সমাধান আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ঠাকুর বলতেন, নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে না। বলতেন, আগে সাদাসিধে জ্বর হোত, সামান্য পাঁচন ইত্যাদিতে সেরে যেত; এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ডি. গুপ্ত ঔষধ। ভাব হচ্ছে এই যে, প্রাচীন পদ্ধতিতে নবীন সমস্যার সমাধান হয় না। যুগ বদলে গেছে, অনেক সমস্যা এসেছে যা আগে ছিল না। নবীন সমস্যার জন্য নবীন কোন আলোকের সন্ধান চাই, যার দ্বারা সমস্যার সমাধান হতে পারে। এবং ঠাকুরের জীবন এবং তাঁর 'কথামৃতে' এই নবীন সমস্যাগুলির অপূর্ব সমাধান আমরা পাই। কতভাবে যে তিনি আমাদের জীবনের সমস্যাগুলির সহজ সমাধান করে দিয়েছেন দেখে আশ্চর্য হতে হয়। বলেছেন, আগে লোকে যোগ যাগ তপস্যা করত; এখন কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, দুর্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হয়ে করলে সব সংসারব্যাধি দূর হয়। বলেছেন, ঋষিদের মতো কঠোর তপস্যা করবে তোমাদের সে সময় কোথায়! তোমরা অল্পায়ু, অন্নগত প্রাণ। সময় নেই। যাগ-যজ্ঞ অত বিরাট আড়ম্বর করে করা তোমাদের দরকার হবে না। কি দরকার হবে, তা নানানভাবে বলেছেন।

নারদীয়া ভক্তির কথা বলেছেন। নারদীয়া ভক্তির মানে বলে দিয়েছেন। সে-ভক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ভক্তি নয়। নারদীয়া ভক্তির অর্থ—শুদ্ধা ভক্তি, শরণাগতি সহকারে ভক্তি, যাতে ভক্ত ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কি কোরে করে ঠাকুর দেখিয়ে দিচ্ছেন: মা, আমি কিছু জানি না; তুমি আমাকে সব জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও। কেমন করে তোমাকে পেতে হয় তার সাধন ভজন আমি জানি না। যা করবার আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও। এই যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ, এরই নাম নারদীয়া ভক্তি। ভাবটা হচ্ছে এই যে, তাঁর কাছে কিছু চাই না। খালি তাঁকে চাই। ভগবানকে সেখানে উপায় বলে গ্রহণ করা হচ্ছে না। অর্থাৎ, তাঁকে ডাকছি তিনি আমার রোগ ভাল করে দিন, আমার সম্পদ বাড়িয়ে দিন, আমার আত্মীয়-পরিজন সকলকে সুখে রাখুন, সবাইকে দীর্ঘজীবী করুন, এই উদ্দেশ্যে নয়। এগুলি মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে ঠাকুর বারণ করছেন। কেন? বলছেন, রাজার কাছে গিয়ে কেউ কি লাউ কুমড়ো চায়? ভগবান এসব দেন। দিতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু তিনি আরও অনেক কিছু দেন। তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে যা চাই তাই যদি পাওয়া যায়, তাহলে ছোটখাট জিনিস চাইব কেন? একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসি না কেন! তাঁকেই যদি পাই, তা হলে আর কিছু অপ্রাপ্ত থাকে না। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' (গীতা, ৬।২২) —যাকে পেয়ে আর তার চেয়ে বড় লাভ কিছু কেউ মনে করে না। এর নাম নারদীয়া ভক্তি। ধ্রুবের জীবনের বর্ণনায় আছে যে, ধ্রুব বিমাতার কাছে অপমানিত হয়ে অতিশয় ক্ষুব্ধ মনে মায়ের আদেশে তপস্যা করতে গেলেন। কেন? —না, বাপের যে রাজ্য তার চেয়েও বড় রাজ্য চাই তাঁর। ছোট ছেলের যেমন মনে হয়। অভিমানে আঘাত লেগেছে ছেলের। বাবার যা রাজ্য তার চেয়েও বড় রাজ্য চাই। ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করছেন তিনি। শিশুর একান্ত প্রার্থনা ভগবানকে অস্থির করেছে। আবির্ভূত হয়েছেন সামনে। ধ্রুবকে বলছেন, 'কি বর চাও বল।' ধ্রুব বিপদে পড়ে গেলেন। বললেন, 'বর! বর ত কিছু চাই না।' 'সে কি ধ্রুব! তুমি মনে করে দেখ। কি যেন তুমি চাইছিলে যার জন্য তপস্যা করছ।' তখন ধ্রুবের মনে পড়ল। বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি স্থানাভিলাষী হয়ে একটা রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, বড় রাজ্য একটা চেয়ে তপস্যা আরম্ভ করেছিলুম। কিন্তু আমি যা চাইছিলুম তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস পেয়েছি। আমি কাঁচ চেয়ে কাঞ্চন পেয়েছি। কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে কাঞ্চন পেয়েছি। বহুমূল্য জিনিস পেয়েছি। "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে" (হরিভক্তিসুধোদয়, ৭।২৮) —হে প্রভু, আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি, আমি আর বর চাই না।' এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি— নিঃস্বার্থ ভক্তি— নারদীয়া ভক্তি। এ নারদীয়া ভক্তি বৈষ্ণবের হবে, শাক্তের হবে। হিন্দুদের শুধু নয়, অন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও হবে। এ না হলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয় না। এই সহজ কথাটি 'কথামৃতে' আমরা বার বার করে পাব।

সর্বোপরি আমরা দেখব ঠাকুরের জীবন। তাঁর কথাগুলি সমস্তই তাঁর জীবনের দ্বারা জীবন্ত — প্রাণবন্ত। সেগুলি কথার কথা নয়। তাঁর জীবনেই সেগুলি প্রতিফলিত। তাঁর বাণীর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে তাঁর জীবন। তাই তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা 'কথামৃত' সহজে বুঝতে পারি। যেন এই জন্যই তাঁর আবির্ভাব এই বর্তমান যুগে, এই

অনিশ্চয়তার যুগে, যাকে আমরা বলি ঘোর কলি। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দও এই কথা বলতেন যে, ঠাকুরের জন্ম থেকে সত্যযুগের আরম্ভ হয়েছে। আমরা এই সত্যযুগের আরম্ভে এসেছি। এটা বড় কম সৌভাগ্য নয়! এমন যুগে এসেছি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জলন্ত প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রবল শক্তির যেন একটা পুঞ্জীভূত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সূর্যের যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। অথচ এই সূর্য পোড়ায় না, স্নিগ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে ভীতিজনক কিছু নেই। তাঁর চরিত-কথার মাধ্যমে তাঁকে দেখলে ভয় হবে না। একটা ছোট ছেলেরও ভয় হবে না। চিমটে নেই, জটা নেই, ভস্ম নেই—কোন রকম বিকট হুঙ্কার নেই!

তাঁর উপদেশের ভিতরে এমন কোনো কঠিন কথা নেই, যা আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য। কত সোজা করে বলছেন, যাতে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি, যাতে আমাদের মন বিভ্রান্ত না হয়। ভগবানকে ভালবাসার প্রসঙ্গে বলছেন, কি রকম ভালবাসা? না, যেমন বাপ মাকে আমরা ভালবাসি। বলছেন, তিন টান একসঙ্গে হলে তাঁকে পাওয়া যায়—মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান। এই টানগুলি আমরা বুঝি, কারণ আমাদের সকলেরই জীবনে এগুলি অল্প-বিস্তর অনুভূত। বলছেন, এই রকম তিন টান একসঙ্গে হলে তাঁকে পাওয়া যায়। খুব বেশী শাস্ত্রজ্ঞান দরকার নেই এটুকু বুঝবার।

তাঁকে পাবার জন্য কোন একটা বিকট রকমের সাধনার কথা বলছেন না। সোজা কথা। ধ্যান করবো কোথায়? বলছেন: মনে, বনে, কোণে। বনে বলছেন—বনেতে সকলে পারব না যেতে। কোণে—বাড়ীর কোণে। ঘরের কোণে বসে তাঁকে ডাকলে তাতেও হবে। যদি এমন একটি কোণও না পাওয়া যায় যেখানে তাঁকে নির্জনে ভাবতে পারি, তা হ'লে মনে—পরিবেশ-নিরপেক্ষ হয়ে—করলেও হবে।

কেউ বলছেন, মশাই অত সাধনা টাধনা করবার সময় নেই। ঠাকুর বলছেন, দু'বেলা তাঁকে খুব দুটো করে প্রণাম করবে; করে বলবে, আমার ত সময় নেই তোমাকে চিন্তা করার—হে প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কৃপা করো। কত সহজ করে দিচ্ছেন—দুটি প্রণাম দু'বেলা!

গিরিশবাবুকে উপদেশ দেবার সময় আমরা জানি কি ভাবে বলছেন। বলছেন দেখ, সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো। গিরিশ-বাবু ভাবছেন, দিনে দুবার ভাববার সময় কোথায়। আমি কত কাজে ব্যস্ত থাকি! গিরিশবাবুকে নীরব দেখে তাঁর মনের ভাব বুঝে ঠাকুর বলছেন, খাবার বা শোবার আগে এক-বার স্মরণ ক'রে নিও। গিরিশবাবু তখনও নীরব—উত্তর দিতে পারছেন না। ভাবছেন, আমার তো খাওয়া-দাওয়ার সময়েরই ঠিক নেই—কোন দিন খাই বেলা দশটায়, কোন দিন বিকেল পাঁচটায়। মামলা-মোকদ্দমায় থাকি বিব্রত; সুতরাং, কথা দিই কি করে। আবার ঠাকুর এত সোজা কাজ করতে বলছেন, 'পারবো না' বলি কি করে! হতাশ হয়ে তিনি চুপ করে আছেন। গিরিশ-বাবুর মনের কথা বুঝে ঠাকুর বলছেন, "তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।" এমন করে, এত সহজ করে আমাদের জন্য ধর্ম কেউ বলেছেন কি? আবার একথা সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হয় যে, এত সহজ করে বলেছেন বলে তিনি যে ধর্মকে খেলো করে দিয়েছেন, তা নয়। এর ভিতরে কোন আপোস নেই। ভেজাল কিছু নেই। তা

গিরিশবাবু অনেক পরে—ঠাকুরের অদর্শনের পর—বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন, বকল্‌মা দেওয়ার ভেতর যে এত মানে আছে তা কি আমি তখন বুঝেছি! বকল্‌মা দিতে বলার পরে ঠাকুর গিরিশবাবুকে সেই ভাবের উপযোগী শিক্ষাও দিয়েছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গে আছে, একদিন গিরিশবাবু ঠাকুরের সামনে কোন একটি বিষয়ে 'আমি করবো' বলায় ঠাকুর বললেন, "ও কি গো! অমন ক'রে 'আমি করবো' বলো কেন? যদি না করতে পার? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করবো।" গিরিশবাবু বুঝলেন, সত্যিই ত! যদি তাঁর উপর বকল্‌মা দিয়ে থাকি—সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়ে থাকি, তা হ'লে তিনি যদি করতে দেন, তবেই তা করতে পারি। গিরিশবাবু পরে বলতেন, তখন ত বুঝি নি, এখন দেখছি, যে বকল্‌মা দিয়েছে তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় ভগবানের জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'-টার জোরে সেটি করলে।

সংসার ত্যাগ করতে হবে, একথা বলছেন না—সব ত্যাগ করে ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, একথা বলছেন না। কোন ব্রাহ্মভক্ত একদিন বললেন, উনি যাই বলুন না কেন এখন, পরে একদিন কুটুস করে কামড়াবেন। অর্থাৎ পরে একদিন এমন করে তিনি, যাকে বলে, জাত সাপের ছোবল মারবেন যে, আর ঘর-বাড়ী কিছু থাকবে না। ঠাকুর বললেন, তা কেন গো! আমি ত তোমাদের ঘর-বাড়ী ছাড়তে বলি না। আমি এইটুকু বলি যে, সংসার করো, কেবল তাঁর সংসার এটি—এই বুদ্ধি রেখে করো। তাঁকে ধরে সংসার করো, যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙে সেই রকম। আঠা লাগবে না। সংসারেতে থাক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তাঁকে ধরে থাক, তা হলে সংসারের দোষ তোমাকে স্পর্শ করবে না। এই হল ঠাকুরের উপদেশ। বলছেন, খুঁটি ধরে ঘোরো, পড়বে না; যেমন ভাগবতে আছে, কবি—নবযোগীন্দ্রের একজন—নিমিরাজকে বলছেন:

'যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে স্খলেন্ন পতেদিহ॥
(১১।২।৩৫)

যা (ভাগবত-ধর্ম) অবলম্বন করে মানুষ কখনো প্রমাদগ্রস্ত হয় না; সে যদি চোখ বুজে দৌড়োয়, তবু পড়ে না। ঠাকুরের কথা: যে ছেলেকে বাপ হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভয় নেই। সে হাততালি দিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। আর যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে যাচ্ছে, তার ভয় থাকে। কখনো অন্যমনস্ক হয়ে হাততালি দিলে হয়ত পড়ে যাবে। তাঁকে অবলম্বন করা, তাঁর উপর সমস্ত সমর্পণ করে দেওয়া, নিজের ভার তাঁর উপরে ছেড়ে দেওয়া কথামৃতের ভিতরে এই ভাবটি খুব প্রকটভাবে আমরা পাই।

ঠাকুর যেমন ভক্তির কথা বলেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কথা, চরম জ্ঞানের কথাও বলেছেন। বেদান্তী তাঁর বুদ্ধির সাহায্যে বেদান্তের যতদূর যেতে পারেন, তা ঠাকুরের কথাতেই আমরা পাই অতি সহজে। ঠাকুর বলছেন: তোমার বেদান্তে ত এই কথা আছে—অস্তি, ভাতি আর প্রিয়। এই অস্তি-ভাতি-প্রিয় নিয়ে তুমি বিচার করছ। তাৎপর্য ত এই, মোট কথা ত এই—তিনি আছেন, তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এবং তিনি প্রিয় আমাদের! এই কথাটুকু বুঝে নিলেই ত তোমার ঝুড়ি ঝুড়ি বেদান্তের কাজ হয়ে গেল। কথা ঠিক, কিন্তু তার দ্বারা ত আমাদের বুদ্ধিকে দেখান হয় না, বুদ্ধির demonstration করা হয় না। আমি কত বড়

পণ্ডিত এটা দেখাতে হলে আমায় পূর্বপক্ষ দেখাতে হবে, সিদ্ধান্ত দেখাতে হবে আবার উল্টে সিদ্ধান্তকে পূর্বপক্ষ করে, পূর্বপক্ষকে সিদ্ধান্ত করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হয়কে নয় করতে হবে, নয়কে হয় করতে হবে। এ না হলে পণ্ডিত! ঠাকুর বলছেন, ও তোমার দরকার কি! তোমার দরকার কোন রকম করে তোমার এই আমিটাকে নষ্ট করা। জ্ঞানী এ ছাড়া আর কি করে? 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' তাই এই আমিটাকে যে কোনরূপে পার নষ্ট কর। জ্ঞানের ভিতর দিয়ে হোক বা ভক্তির ভিতর দিয়ে হোক বা কর্মের ভিতর দিয়ে হোক বা সবগুলো দিয়ে হোক। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, স্যাকরারা সোনা গলাবার সময়ে উঠে পড়ে লাগে; এক হাতে হাপর, এক হাতে পাখা, মুখে চোঙ্গ—যতক্ষণ না আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সেই রকম ভগবানের জন্য যখন মানুষের প্রবল উৎকণ্ঠা আসে, তখন সে সব রকম করে এবং প্রাণপণে এগিয়ে যায় যতক্ষণ না সোনা গলে—অর্থাৎ বস্তুলাভ হয়। এই হল ঠাকুরের সাদা কথায় উপদেশ। এই যে কথাগুলি এর ভিতর দিয়ে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের কি অপূর্ব সামঞ্জস্য এনে দিচ্ছেন, এটি আমরা কথামৃতে লক্ষ্য করি। অপূর্ব সামঞ্জস্য—যা ঠাকুরের দৃষ্টি দিয়ে যদি না দেখতুম, তা হলে আমাদের চিরকাল সংসারের মধ্যে থাকতে হোতো। পণ্ডিতেরা কবে সেই আদিম যুগ থেকে দার্শনিক বিচার আরম্ভ করেছেন আর আজ পর্যন্ত সে-বিচারের শেষ হল না যে, তিনি অদ্বৈত না দ্বৈত না বিশিষ্টাদ্বৈত, তিনি এক না বহু, সগুণ না নির্গুণ, সাকার না নিরাকার, আর যদি সাকার হন, তাঁর চারটে হাত না দশটা হাত না হাজারটা হাত! সমস্যার আর শেষ নেই! কথামৃতে সাদা কথায় এই সব সমস্যার সুন্দর মীমাংসা আমরা পাই—এত সহজ সমাধান যে আমরা সকলেই বুঝতে পারি।

আমরা আজকাল সার্বজনীনতার কথা বলি। বলি, সকলের পক্ষে উপযোগী সব জিনিস দিতে হবে। ঠাকুরের উপদেশের মত এমন সার্বজনীন উপদেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর উপদেশ এক সঙ্গে পণ্ডিত এবং মূর্খ উভয়কে তৃপ্তি দেয়, ভক্ত জ্ঞানী কর্মী সকলকে সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করে—নাস্তিককে পর্যন্ত বাদ দেয় না। যদি কেউ নাস্তিক হয়, ঈশ্বর আছেন কিনা সংশয় হয়, ঠাকুর বলছেন, একান্তভাবে তুমি প্রার্থনা করো, তিনিই জানিয়ে দেবেন তিনি আছেন কি না। নাস্তিককে পর্যন্ত ঠাকুর বাদ দিচ্ছেন না—উপেক্ষা করছেন না।

তাঁর অভয় বাণী কথামৃতের ছত্রে ছত্রে আমরা পাই। দেখি তিনি কি করে আমাদের সব সময়ে সাহস দিচ্ছেন। আমাদের ভেতরে যত ত্রুটি, যত অপূর্ণতা এগুলি দেখেও তিনি আমাদের উপেক্ষা করছেন না এবং কি করে আমরা এগুলি থেকে মুক্ত হব তার সহজ সরল উপায় বলে দিচ্ছেন। একটি দৃষ্টান্ত: যোগানন্দ স্বামীজী (তখন যোগীন্দ্র-নাথ রায় চৌধুরী) ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাম যায় কি ক'রে। ঠাকুর বললেন, খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে। কথাটা যোগীনের একটুও মনের মত হল না। মনে হল, এ আবার একটা কি উপদেশ দিলেন!—উনি কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই যা হোক একটা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়!—তা হলে এত লোক ত করছে, যাচ্ছে না কেন? পরে ভাবলেন, ঠাকুর যখন বলছেন, তা করেই দেখি না কেন—কি হয়। এই ভেবে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলেন আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেলেন।

অনেক জায়গায় অধিকারিভেদে ঠাকুরের উপদেশে পার্থক্য দেখা যায়—যার জন্য যেটি দরকার সেটিই বলেছেন। কিন্তু কোন জায়গায় তিনি

উৎকট কিছু বলেন নি। উৎকটভাবে কিছু করা —কৃচ্ছ্র-সাধনা যাতে অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়, এমন কিছু বলেন নি। বরং বলেছেন অসাধারণত্ব কিছু রাখবে না, সরলভাবে থাকবে। এবং তিনি নিজে সহজ সরলতার দৃষ্টান্ত। জটা নেই, ভস্ম নেই, চিম্‌টে নেই, সাধুর বাহ্য চিহ্নগুলি যা তাকে সর্বসাধারণ থেকে ভিন্ন করে রাখে, এমন কিছুই নেই। কিন্তু যারা তাঁর কাছে আসছে, যত তাঁর কাছে এগুচ্ছে, দেখছে তিনি তত দূরে। যত তাঁর দিকে এগুচ্ছে, তত তাঁর ভিতরের বিশালতার পরিচয় পাচ্ছে। এই হল তাঁর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুর যেমন নিজে সহজ, তাঁর উপদেশগুলিও সেই রকম সহজ। এই সহজ উপদেশের ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের আকর্ষণ করছেন। ভগবানকে পাবার পথ তিনি সুগম করে দিয়েছেন, সরল করে দিয়েছেন। কথামৃতের ভিতরে এর আমরা অজস্র প্রমাণ পাই।

যে-গ্রন্থ আমরা পড়তে চাই, তার যা প্রতিপাদ্য বিষয় আগেই তা সংক্ষেপে জানতে হয়। এই বিষয়বস্তু জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। কথামৃতের বিষয়বস্তু কি? কথামৃতের বিষয়বস্তু হ'ল ভগবান এবং ভগবান লাভের উপায়। কি করে আমাদের ভববন্ধন মোচন হবে, কি করে আমরা এই সংসার-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবো, এই যে জন্মজন্মান্তর ধরে আমরা অন্ধকারে ঘুরছি, এই অন্ধকারের কি করে নিবৃত্তি হবে, আমাদের যত সংশয় সেগুলি কি করে দূর হবে, আমাদের সংসারে সমস্ত কাজকর্মের ভিতরেও কি করে আমরা জীবনকে ভগবন্মুখী করে অপার শান্তির অধিকারী হব—এই সব কথা। এগুলি সব ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে আমরা পাব এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা যে-রকমই হোক না কেন, আমরা জ্ঞান-প্রবণ হই বা ভক্তি-প্রবণ হই বা কর্মপ্রবণ হই, কথামৃতে আমরা সকলেই পথের নির্দেশ পাব— অপূর্ব প্রেরণা পাব।

কথামৃতের পরিচয় দিতে গিয়ে কথামৃতকার শ্রীম, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তথা মাষ্টারমশাই, ভাগবতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ভূমিকাতে আমরা সেটির আলোচনা করতে পারি। শ্লোকটি হল—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১০।৩১।৯

—তোমার এই যে কথারূপ অমৃত, এই কথারূপ অমৃত কি রকম? না, 'তপ্তজীবনম্'— সংসার-তাপে তপ্ত যে মানুষ, মৃতপ্রায় দগ্ধ যে মানুষ, পুড়ে মরছে যে মানুষ, তার কাছে জীবনস্বরূপ। তার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করে- তাকে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে, সংসারচক্র থেকে বাঁচায় এই কথারূপ অমৃত। তারপর বলছেন 'কবিভিরীড়িতম্'। কবি অর্থাৎ জ্ঞানী যাঁরা, শাস্ত্রমর্ম যাঁরা জানেন, তাঁরা এই কথামৃতের প্রশংসা করেন। তাঁরা সর্বদা এই কথামৃতের স্তুতি করেন এই বলে যে, এই কথামৃত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়—মানুষ যে মরণশীল নয়, এই জ্ঞান দেয়। আরও এই কথামৃত কিরূপ? না, 'কল্মষাপহম্'। —আমাদের সমস্ত কল্মষ, পাপ, কলুষ, কালিমা এই কথামৃত দূর করে দেয়। সংসারে আমরা অনেক কালি মেখেছি, কারো গায়ে যে কালি লাগেনি এমন কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। সুতরাং, এই কালিমা থেকে মুক্ত হবার উপায় কি? হয়তো অনেকের মনে অনুতাপ আসে যে, এই কালিমা থেকে মুক্তির আর কোন পথ নেই। তাই বলছেন, না, উপায় আছে —এই কথামৃত 'কল্মষাপহম্'। শুধু তাই নয়, পুরাণে বলে প্রসিদ্ধ অমৃত পান করেই অমরত্ব লাভ হয়। এ-অমৃত কিন্তু পানও করতে হয় না,

মাত্র শুনেই জীবের কল্যাণ হয়—'শ্রবণমঙ্গলম্'। তারপর যদি মনে হয়—আচ্ছা, শ্রবণেতে কল্যাণ হোক, কিন্তু আমার রুচি হবে কি না? তার উত্তরে বলছেন 'শ্রীমদ্'— সৌন্দর্যবিশিষ্ট, এ-কথার ভেতরে এমন সুষমা আছে যে, মানুষকে অনায়াসে আকর্ষণ করে, স্বাভাবিকভাবে। আর, এই কথামৃত এতটুকু নয় যে, ফুরিয়ে যাবে। তাই বলছেন, 'আততম্' – বিস্তৃত। বিস্তৃত বলতে অপার এবং সহজলভ্য। যেমন আকাশ চারিদিকে বিস্তৃত থাকে, তাকে খুঁজে বার করতে হয় না, যেমন বায়ু চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাকে অন্বেষণ করে আবিষ্কার করতে হয় না, সেই রকম এই কথারূপ অমৃত অপার এবং অনায়াসলভ্য। এই কথামৃত তা হলে আমরা সকলে পান করি না কেন? তার উত্তরে বলছেন, 'ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ' – যারা বহু দান করেছে অর্থাৎ বহু সুকৃতি সঞ্চয় করেছে, তাদের এই কথারূপ অমৃততে স্বাভাবিক রুচি হয়—তারাই এর স্তুতি করে, কীর্তন করে, আলোচনা করে। রুচি কারো হয়, কারো হয় না। তার কারণ— পূর্ব-জন্মকৃত কর্ম। পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত অনেক সুকৃতি যদি থাকে তাহলে মানুষ আবাল্য এই রুচি নিয়ে জন্মায়। সহজাত হয় তার এই রুচি। সুকৃতি যদি কম থাকে, তা হলে হয়তো আঘাত পেয়ে তারপরে এই কথায় রুচি হয়। এই রকম বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে। কিন্তু সকলেরই জন্য এই কথামৃত কল্যাণকর এবং এই কথামৃতের অনুশীলন করতে যে একটা খুব কষ্ট হবে তা নয়। রুচি থাকলেই এতে আনন্দ পাবে সকলে।

এই শ্লোকটি মাষ্টারমশাই কথামৃতের গোড়াতেই উদ্ধৃত করেছেন। বইটির নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথা-মৃত' কেন রাখলেন, তা যেন ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধার করেই জানিয়ে দিচ্ছেন। যিনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে জগতের কল্যাণের জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণরূপে বহুধা নানাভাবে জগতে উপদেশ দিয়েছেন, যার সার আমরা গীতা-ভাগবতে পাই। তিনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে সকলের সহজবোধ্য হয় এমন করে এই কথামৃত এখন বলছেন – এই কথাটুকু আমরা মাষ্টারমশায়ের এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দেওয়ার অভিপ্রায় বলে মনে করি।*

* ৬ই ও ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৫, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে 'কথামৃত'-আলোচনার ভূমিকা। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত। ১৩ই এপ্রিলের আলোচনার কিয়দংশ মাত্র ভূমিকায় আসিয়াছে, কারণ উহার পরবর্তী আলোচনা মূলগ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায় সম্পর্কিত।—সঃ

অর্থনীতি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীজহর শীল*

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বাক্যটি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। কাঞ্চনত্যাগ সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ আমরা জানি। অবশ্য 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' ব'লে গঙ্গার জলে টাকা ফেলে দিয়ে তিনি লক্ষ্মীদেবীকে অসন্তুষ্ট করলেন মনে ক'রে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। তাঁর বিছানার তলায় টাকা রেখে তাঁকে পরীক্ষার কথাও আমরা তাঁর জীবনীতে পড়েছি।

* অধ্যাপক, অর্থনীতি-বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাচুণা।

কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁর জ্ঞান আধুনিক অর্থনীতির একটি সূত্র সম্বন্ধে! অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদান (factors of production) চারটি : জমি (land), শ্রম (labour), মূলধন (capital) ও সংগঠন (organisation)। মূলধন ও সংগঠন অনেক সময়ে একটি উপাদানের মধ্যেই গণ্য করা হয়, কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে মূলধন সরবরাহকারী ও সংগঠক একই ব্যক্তি। অবশ্য আধুনিক. বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সে যাই হোক, কথামৃত ১ম ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি, একটি ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন—" 'রামের ইচ্ছা' গল্পটি কি ?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"কোন এক গ্রামে একটি তাঁতী থাকে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছা, সূতার দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছা, মেহনতের দাম চারি আনা, রামের ইচ্ছা, মুনাফা দুই আনা। কাপড়ের দাম, রামের ইচ্ছা, এক টাকা ছয় আনা। লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত।…"

অবশ্য গল্পটি বলার উদ্দেশ্য ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এছাড়া তাঁর এই বাক্যগুলি থেকে আমরা অন্য একটি জিনিসও আবিষ্কার করে অবাক হই। এক, কাপড় তৈরি করতে গেলে সূতা, মেহনত ও মূলধন-সংগঠন দরকার হয়। অর্থনীতিতে সূতা জমির মধ্যে পড়ে। মেহনত হচ্ছে শ্রম। মুনাফা মূলধন সরবরাহকারী ও সংগঠক উভয়েরই। যদিও আসলে মূলধন সরবরাহকারীর পাওয়ার কথা সুদ, কিন্তু যেক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী ও সংগঠক একই ব্যক্তি, সেক্ষেত্রে সুদের হিসাব সাধারণভাবে করা হয় না, মুনাফার মধ্যেই সেটা ধরা থাকে। হয়ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব গল্পটা ঐ রকমই শুনেছিলেন, কিন্তু বলার সময়ে আশ্চর্য রকমভাবে বলেছেন যাতে অর্থনীতি-জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির মনে জেগে উঠবে অর্থনীতির ঐ সূত্রটি। দুই, অর্থনীতিতে এ্যারিস্টটল থেকে শুরু ক'রে বর্তমানকাল পর্যন্ত একটা ধারণা (concept) প্রচলিত আছে, তার নাম—ন্যায্য মূল্য (Just Price)। ন্যায্য মুনাফা দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে ধরা থাকলে দ্রব্যের মূল্যটি সাধারণভাবে ন্যায্য মূল্য হয়। এই ব্যাপারটি উৎপাদক বা বিক্রেতার উপর নির্ভর করে। সে যদি ভাল হয়, বিবেচক হয়, তা হলে মুনাফা সে ন্যায্যভাবে ধরে (Profit Margin বা Mark-up)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-উক্ত গল্পের ক্ষেত্রে তাঁতী ন্যায্য মুনাফা নিয়েছে এবং সেইজন্য কাপড়ের মূল্যও ন্যায্য হয়েছে। "লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত।" অবশ্য লোকেরা তাকে ভালবাসত সে ভারী ভক্ত ও ধার্মিক বলে ঠিকই, তবু অর্থনীতির এই দ্বিতীয় সূত্রটি তার অর্থনৈতিক ব্যবহারের (Economic Behaviour) মধ্যে প্রকাশ পায়।

আধুনিক অর্থনীতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্ঞান নিয়ে আমরা তর্ক তুলছি না। তার প্রয়োজনও নেই। তাঁর কথার মধ্যে অর্থনীতিতে প্রচলিত কয়েকটি সূত্র কি রকম অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এই ভেবে অবাক হচ্ছি মাত্র।

বাংলার নারী-উন্নয়ন আন্দোলন

ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম পর্ব : নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে অন্যদের ভূমিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

(১)

বাংলার নারী-উন্নয়ন আন্দোলন শতাধিক বৎসর ধরে চলেছিল। লর্ড হেস্টিংস-এর কাছে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে আবেদনের তারিখ ছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ। তখন তার আরম্ভ। আইনগত অধিকারের দিক থেকে তার পরিসমাপ্তি ঘটে স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দুকোড পাশ হওয়ায়। এখানে হিন্দুর একটি ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম এই সম্প্রদায়-গুলিও হিন্দুর ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই সকল সম্প্রদায়ের নারীদের অধিকার আইনত এই কোডে স্বীকৃত হয়েছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আইনগত দিক হতে কোনও সমস্যা নাই। তবে মুসলমান সম্প্রদায় বাদ পড়ে গেছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষণশীলতার মনোভাব এখনও প্রবলভাবে সক্রিয়। তাই সরকার জোর করে তাদের ওপর কোনও সামাজিক সংস্কার আরোপ করতে চান নি। এই সম্প্রদায়ের মধ্য হতেই এ বিষয় যখন ইচ্ছা প্রকট হয়ে উঠবে তখনই এই সম্প্রদায়ের নারীদের পূর্ণ সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার প্রশ্ন উঠবে।

আমরা দেখব উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তি নারী-উন্নয়ন আন্দোলনকে নানাভাবে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। তাঁদের ভূমিকা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত বিরাট না হলেও নগণ্য ছিল না। আমরা দেখি ব্রাহ্মসমাজের দুই দিকপাল কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রীর এ আন্দোলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আমরা দেখব দুর্গামোহন দাশ ও তাঁর দুই কন্যা সরলা রায় ও অবলা বসু এই আন্দোলনকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবধি সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। আমরা দেখব স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভগিনী নিবেদিতা এদেশে এসে নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য দুটি শতাব্দীর সংযোগ-ক্ষণে কি কঠোর সাধনা করেছিলেন। আমরা আরও দেখব স্বল্পভাষী, প্রচারবিমুখ, মৃদু স্বভাবের মানুষ হয়েও আচার্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নারীজাতির কল্যাণ-সাধনে কিরূপ তন্ময় হয়ে কাজ করে-ছিলেন। বর্তমান ভাষণে এঁদের কীর্তি সম্বন্ধে একে একে পরিচয় দেওয়ার প্রস্তাব করি।

(২)

কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার এক বিখ্যাত বংশের সন্তান। অতি অল্পবয়সে তাঁর সমাজ-সংস্কারে তীব্র আগ্রহ ও অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কাজেই কেশবচন্দ্রকে কাছে টেনে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম আচার্যরূপে নিয়োগ করেন। তুলনায় মহর্ষি ছিলেন রক্ষণপন্থী; কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন বয়সে তরুণ এবং কঠোরভাবে সংস্কারপন্থী। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায়, কেশব-চন্দ্র মহর্ষির গোষ্ঠীকে ত্যাগ করে একটি নূতন গোষ্ঠী স্থাপন করেন। তার নাম দেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। তা পরে 'নববিধান সমাজ' নামে পরিচিত হয় এবং মহর্ষির গোষ্ঠী 'আদিসমাজ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্রের নারীপ্রগতি সম্পর্কিত কাজ

আদিসমাজের সহিত সংযুক্ত থাকার সময় হতেই সুরু হয়। সেকালে অবরোধপ্রথা এমন কঠোর ছিল যে স্বামীকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুর বাড়ীতেও যেতে দেওয়া হত না। কেশবচন্দ্র এই নিষেধ মানতে রাজী ছিলেন না। এই নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে তিনি সস্ত্রীক এক বন্ধুর বাড়ী যেতে গেলে সমাজের রক্ষণশীল দলের থেকে বাধা পান। তখন তিনি কলুতলা থানায় তাদের বাধা হতে তাঁকে মুক্ত করতে আবেদন জানান। ঘটনাটি বর্তমান কালে পরিহাসের বিষয় গণিত হবে। কিন্তু তা দেখায় নারীর সামান্য অধিকার আদায় করে নিতেও সেকালে কি কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হত

এই সময়ই কেশবচন্দ্র অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি ব্যবস্থা করেছিলেন। তার তাৎপর্য গভীর। তৎকালীন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনি অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সেকালে মেয়েদের অল্পবয়সে একরকম নিরক্ষর অবস্থায় বিবাহ হয়ে যেত এবং তারপর শ্বশুরবাড়ীতে অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে বাস করতে হত। বেথুন বিদ্যালয়ে মুষ্টিমেয় উদারপন্থী পরিবারের মেয়েরা যেতে পারতেন। সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

অন্তঃপুরে এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শকাব্দ চিহ্নিত সংখ্যায় (ইংরাজি ১৮৬৪) একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। তা হতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তা হতে জানা যায় যে, যে প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল তার নাম ছিল ব্রাহ্মবন্ধু সভা। যাঁরা এ ব্যবস্থার সুযোগ নিতেন তাঁদের পাঠ্যের বিষয় জানিয়ে দেওয়া হত এবং কে কতখানি পাঠ সমাপ্ত করেছেন তার বিবরণ বছরে একবার চেয়ে পাঠানো হত। বছরে দুবার পরীক্ষা নেওয়া হত এবং যাঁরা সাফল্য লাভ করতেন তাঁদের পারিতোষিক দেওয়া হত।

নববিধান সমাজ স্থাপনের পর কেশবচন্দ্রের বড় কীর্তি হল মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত করা। ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রীটে এই বিদ্যালয়টি খোলা হয় ১।২।১৮৭১ তারিখে। বিদ্যালয়টি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে বর্তমানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় তথা কলেজের মর্যাদা পেয়েছে। তার যেমন ঘন ঘন নাম বদলেছে তেমন স্থানও বদলেছে। প্রথমে নাম পরিবর্তনের কথা বলি। প্রথম যখন স্থাপিত হয় তখন বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হয় 'ফিমেল নর্মাল এণ্ড এডাল্ট স্কুল'। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'ইনস্টিটিউশন ফর দি হায়ার এডুকেশন অফ নেটিভ লেডিজ'। পর বৎসরই তার নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নূতন নাম হয় 'ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন'। বর্তমানে সেই নামেই তা পরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনও বহুবার হয়েছে। তা সূচিত করে কত ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুপ্রভা চৌধুরী যে বিবরণ দিয়েছেন, তা হতে দেখা যায় তার ভাগ্যে সাতবার স্থান পরিবর্তন ঘটেছিল। সেগুলির তালিকা দিয়ে শ্রোতাদের ধৈর্য পরীক্ষা করতে চাই না। শেষবারে তা বার বার স্থান পরিবর্তনের দুর্ভাগ্য হতে কেন মুক্তি পেল সেই কথা বলেই এই বিবরণ শেষ করব। কেশবচন্দ্র নিজে আপার সার্কুলার রোডে যে গৃহ নির্মাণ করেন তার নাম দিয়াছিলেন 'কমল কুটীর' বা 'লিলি কটেজ'। তাঁর মৃত্যুর পর সে বাড়ী পরিবারের হস্তচ্যুত হয়। তখন কেশবচন্দ্রের কন্যা কুচবিহারের

মহারাণী সুনীতি দেবী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তা কিনে নিয়ে বিদ্যালয়কে দান করেন। ফলে বিদ্যালয়টি স্থায়ী বাসস্থান পায়।

কেশবচন্দ্রের নারীশিক্ষার পরিকল্পনায় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি শুধু বালিকাদের শিক্ষা দিতে চান নি, যে অগণিত বিবাহিতা অন্তঃপুর-বাসিনী বয়স্কা মহিলারা ছিলেন, তাঁদের শিক্ষা দেবার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। সেটা তাঁর বিদ্যালয়ের প্রথম যে নামকরণ করেন, তা হতেই বোঝা যায়। এর নাম ছিল 'ফিমেল নর্মাল এণ্ড এডাল্ট স্কুল'। এতে বালিকাদের যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তেমন বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে নানা বিষয় তাঁদের বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা ছিল। উদ্দেশ্য, বয়স্কা মহিলারা সেই ভাষণগুলি শুনে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্যালয়টি প্রথম স্থাপিত হয় তখন তাতে ২৪ জন অবিবাহিতা বালিকা ছাত্রী ছিল, ১৭ জন বিবাহিতা ছাত্রী ছিল, ৩ জন বিধবা ও ৪ জন কুমারী বয়স্কা ছাত্রী ছিল। ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্নী শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী।

শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বিখ্যাত নাম। তিনি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে অবস্থিত মজিলপুর গ্রামের মানুষ। তাঁর জন্ম ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এণ্ট্রান্স ও এল এ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শাস্ত্রী উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

ছাত্রাবস্থা হতেই তিনি প্রগতিপন্থী ছিলেন। সেই সময় তাঁর বন্ধু উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত এক বিধবা মহিলার বিবাহ দেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয় সহায়তা করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থা হতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও আকৃষ্ট হন। তিনি কেশব সেনের নূতন সমাজ স্থাপিত হবার পর তার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করে উপবীত ত্যাগ করেন। পিতার আপত্তি ছিল; যখন পুত্র সে আপত্তি শুনলেন না, তখন তিনি পুত্রকে ত্যাগ করলেন। পুত্র একটি আদর্শ ধরে চলতেন এবং তার নির্দেশে যা করতেন, তা হতে কেহ তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। একই কারণে তিনি কেশবচন্দ্রের আচরণে অসঙ্গতি দেখে তাঁর সমাজ ত্যাগ করে আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলেন। ঠিক বলতে কি তিনিই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং জীবনের শেষের অংশ এই সমাজগঠন ও তার প্রচারকার্যে নিয়োগ করেন। এমন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ খুব কম দেখা যায়।

নারীজাতির উন্নয়নের প্রতি তাঁর অনুরাগের নানা ভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। তা তাঁর মূল লক্ষ্য না হলেও স্বাভাবিক মানবিকতাবোধ হেতু আনুষঙ্গিকভাবে এসে পড়েছিল। তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের উপাসনা সভায় মহিলাদের পর্দার ভিতরে বসানো হবে কি না, এই নিয়ে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। তা দেখায়, এই সমাজের প্রগতিশীল পরিবেশ সত্ত্বেও পর্দাপ্রথা সহজে বিলুপ্ত হয় নি। সেইদিক হতে কাহিনীটির তাৎপর্য আছে।

প্রথমে ব্যবস্থা ছিল উপাসনা সভায় মহিলারা পর্দার আড়ালে বসবেন। যাঁরা প্রগতিশীল, তাঁদের মধ্যে দুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন। তাঁরা দাবী তুললেন, মহিলাদের পর্দার বাহিরে বসতে দিতে হবে। একদিন ত অন্নদাচরণ খাস্তগির ও দুর্গামোহন

দাশ তাঁদের পরিবারের মেয়েদের নিয়ে পর্দার বাহিরে পুরুষদের সঙ্গে বসলেন। রক্ষণশীল দল ভীষণ আপত্তি করে বসলেন। তখন প্রগতিশীল দল সমাজে যাওয়া ত্যাগ করলেন এবং আলাদা উপাসনার ব্যবস্থা করলেন। সে উপাসনায় পর্দা থাকবে না। শিবনাথ শাস্ত্রী সেই উপাসনার আচার্য হলেন।

ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে দেখে কেশবচন্দ্র একটি আপোষের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন প্রগতিশীল দল ইচ্ছা করলে পর্দার বাহিরে বসতে পারবেন। তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলে দিয়ে আবার কেশবচন্দ্রের সমাজে ফিরে এলেন। ব্যাপারটি দেখায়, ব্রাহ্ম-সমাজের মত প্রগতিশীল সমাজেও কত ধীরে ধীরে মহিলাদের অবরোধপ্রথার লোপ সংঘটিত হয়েছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রামে ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্থানীয় ব্রাহ্ম-যুবকদের উপর তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। তাঁরা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ করতে এবং বিদ্যালয় পরিচালনা করতে স্থানীয় জমিদার ও সমাজনেতার তীব্র বাধার সম্মুখীন হন। তা দেখায় গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে কি গভীর প্রতিকূল মনোভাব সে কালে ছিল। সেই জন্য বিষয়টির একটি বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার প্রস্তাব করি।

বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ একখণ্ড জমি কিনে তার উপর বাড়ী নির্মাণের জন্য সালতি করে খুঁটি, বেড়ার কাঠ ইত্যাদি আনলেন, কিন্তু জমিদারের নির্দেশে নির্মাণের স্থানে সেগুলি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য মজুর পাওয়া গেল না। অগত্যা যুবকগণই তা বয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা ঘর নির্মাণের জন্য ঘরামি নিয়োগ করলেন; কিন্তু জমিদারের নির্দেশে ঘরামি কাজে হাত দিতে সাহস পেল না। তখন যুবকগণই ঘর তুলবেন ঠিক করলেন। এদিকে রাতারাতি জমিদারের প্ররোচনায় শুকুর মোল্লা নামে জমিদারের এক চাকর সেই জিনিসপত্র নিয়ে সেই জমিতেই ঘর তুলে দখল নিয়ে বসল। ব্রাহ্মযুবকেরা আদালতে নালিশ করায় তার জেল হয়ে গেল। জমিদার তাতেও হাল ছাড়লেন না। গ্রামের মানুষদের বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে নিষেধ করলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা কিন্তু সে নিষেধ মানেন নি; তাঁর দুই কন্যাকে ভর্তি করলেন। দুজন নিয়েই পড়ানো চলল।

১৮৮৮-র শেষে শিবনাথ বিলাত হতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সেখানে কিণ্ডারগার্টেন রীতিতে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মপাড়ায় ব্রাহ্মবালিকাদের শিক্ষার জন্য এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সর্বনিম্ন শ্রেণীতে তিনি নিজেই কিণ্ডারগার্টেন রীতিতে পড়ানোর ভার নিলেন। ক্রমে বিদ্যালয়টি বড় হয়ে উঠল এবং কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত প্রথায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের তা মনঃপূত হয় নি। তাই তার সংস্রব তিনি ত্যাগ করলেন। এ বিষয় তাঁর নিজের মন্তব্য শোনা যেতে পারে। তিনি বলেছেন:

"ক্রমে শিক্ষালয়টি বড় হইয়া উঠিল। ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ইহাতে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং তদনুরূপ আয়োজন করিতেছিলাম। কিন্তু সমাজের সভ্যগণ ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহালনবিশের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বোর্ডিংকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে এক প্রসিদ্ধ বালিকা বোর্ডিং স্কুল করিয়া তুলিলেন। পরে আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করিলাম।"

(আত্মজীবনী, আবার দক্ষিণ ভারতে)

(৩)

নিজের দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেন এমন মানুষ অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এক অজানিত জাতির কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদন করার কাহিনী অতি বিরল। ভগিনী নিবেদিতা তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। জাতিতে তিনি ছিলেন আইরিশ; পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। তাঁর পূর্ব-নাম ছিল মার্গারেট নোবল। জীবনে তিনি নানা দুঃখ পেয়েছেন। পিতা অল্পবয়সে মারা গেছেন। যৌবনে তিনি যাঁর কাছে বাগ্‌দত্তা হয়েছিলেন, তিনিও হঠাৎ মারা গেলেন। মার্গারেট সাহিত্য চর্চা করেন এবং লণ্ডনের নিকটবর্তী মিসেস লিউ-এর বিদ্যালয়ে জীবিকার জন্য শিক্ষকতা করেন।

এমন অবস্থায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লেডি মার্জেসন-এর গৃহে বিবেকানন্দের সহিত তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। দেখেই তিনি মুগ্ধ। এই দৃপ্ত তেজস্বী সন্ন্যাসীর প্রতি এবং তাঁর প্রচারিত বেদান্তদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ক্রমে পরিচয় হল। স্বামীজীও তাঁর গুণে প্রীত হলেন। কুমারী নোবল-এর মধ্যে এমন গুণ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যার জন্য তিনি মার্গারেটকে ভারতের অধঃপতিত নারী-সমাজের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন তিনি সোজাসুজি মার্গারেটকে বললেন:

"স্বদেশে নারীশিক্ষার একটি পরিকল্পনা করেছি। মনে হয় তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্যই পাব। হাজার হাজার মেয়ে ভারতবর্ষে অপেক্ষা করে আছে। তোমাদের দেশের কয়েকটি মেয়ে যদি সেখানে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একটু পথ বাৎলে দেয়, তবে তারাও বুঝি একটু মাথা তুলে সাড়া দিতে পারে।"*

মার্গারেট তাতে সাড়া দিলেন। তখন স্বামীজী তাঁকে ভারতবর্ষ হতে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এই কথাগুলি ছিল: "তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানবপ্রেম ও সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য তুমি ভারতবর্ষে এস। তোমার মমতা ও ক্ষমতার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস।"†

মার্গারেট ভারতবর্ষে এলেন। স্বামীজী তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাঁর ভূমিকার উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার কোনও ত্রুটি রাখেন নি। তিনি বলেছিলেন তাঁর চিন্তা, ভাবনা, প্রয়োজন— সবই হিন্দুভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। তাঁকে ভারতের সন্তান হতে হবে, ভারতবাসীকে আপনজন করে নিতে হবে। গুরুর উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে-ছিলেন। ২৫।৩।১৮৯৮ তারিখে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত ক'রে নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। সার্থক নামকরণ। আত্মনিবেদনের এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বোধ হয় নেই।

ভগিনী নিবেদিতা এদেশের মেয়েদের জন্য কি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য হতে। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি এই:

"এই সতী নিবেদিতা দিনের পর দিন যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন তার কঠোরতা অসহ্য ছিল। ক্ষুদ্র অপরিসর ঘরে বাতাসের অভাবে কঠোর গ্রীষ্মের তাপে রাত্রির পর রাত্রি তাঁর ঘুম আসে নাই। দিনের পর দিন অর্দ্ধাশনে অনশনে

* মূল গ্রন্থে (The Master as I saw Him) কেবলমাত্র এই কথাগুলিই আছে: "I have plans for the women of my own country in which you, I think, could be of great help to me."—সঃ

† মূল পত্রে আছে: "Your education, sincerity, purity, immense love, determination and above all, the Celtic blood make you just the woman wanted."—সঃ

আশৈশবের অভ্যাস ও সংস্কারকে সরাইয়া রাখিয়া যে হাসিমুখে ক্লেশবরণেও তাঁর সহিষ্ণুতার ক্ষয় হয় নাই তা শুধু ভারতের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রীতির জন্যই। জীবের মধ্যে শিবের পূজায় তিনি রত ছিলেন।"

১৮৯৮-এর কালীপূজার শুভদিনে ১৭ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় খুললেন।* তিনি একাই শিক্ষিকা। তেঁতুল বীচি নিয়ে গুণতে শেখাতেন, মাটি নিয়ে নানা জিনিষ তৈরী করতে শেখাতেন আর পড়াতেন। কিন্তু অর্থাভাব হল। আমাদের দুর্ভাগ্য, অর্থ দেশের মানুষের কাছ হতে এল না, বিদেশী সরকারের কাছ হতে ত তা পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং নিবেদিতা আমেরিকা গেলেন। সেখানে 'রামকৃষ্ণ সাহায্য সংস্থা' গঠিত হল। মিসেস ওলি বুল নামে এক বদান্য মহিলা হলেন সম্পাদিকা। এখান হতে সাহায্য এবং নিজের লিখিত বইয়ের রয়ালটি দিয়ে তিনি এবার বিদ্যালয় চালালেন।

এবার সঙ্গে আনলেন পারিবারিক পরিচারিকা বেটকে। ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইন এলেন সহকারী শিক্ষিকারূপে। এবার বিদ্যালয় ভালভাবে চলল। বালিকাদের তিনি নিজে শিক্ষা দিতেন অঙ্ক, ইতিহাস ও চিত্রাঙ্কন। নিবেদিতার শিক্ষা-পরিকল্পনা ব্যাপক ছিল। মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ হয়ে যেত বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। বয়স্কাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তিনি তাই অনুভব করেছিলেন। সুতরাং ১৬ নং বোসপাড়া লেনও ভাড়া নেওয়া হল।† সেখানে বয়স্কা মহিলাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তাঁদের জন্য কথকতা, রামায়ণ-মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা হল।

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষা সম্বন্ধে একটি নিজস্ব আদর্শ ছিল। তিনি শিক্ষার মধ্যে দুটি মূল বিষয়ের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। সে বিষয় তিনি তাঁর 'হিন্টস অন এডুকেশন' ‡ নামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত তিনি হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুরণের ওপর জোর দিয়েছেন। হৃদয়বৃত্তি পরিস্ফুট হলে ভাল কাজ করবার উচ্চ আদর্শকে জীবনে রূপায়ণ করবার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, এই তাঁর ধারণা ছিল। যা হৃদয় দিয়ে চাইব তার জন্য যতখানি সাধনা করতে মন প্রস্তুত, যা সাধারণভাবে চাইব তার সম্পর্কে তত প্রস্তুত থাকে না। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"শিক্ষার প্রথম কয়েক বৎসর এই কথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, হৃদয়বৃত্তিকে পরিস্ফুট করবার মত প্রয়োজনীয় বিষয় আর কিছু থাকতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি গঠন অপেক্ষা উচ্চ-ভাব অনুভব করা এবং উন্নত মন নিয়ে সৎভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারা হাজার গুণ বেশী প্রয়োজনীয়।"

দ্বিতীয় যে জিনিষটির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা হল শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "যে শিক্ষার সার্থকতা আছে, তার প্রথম কাজ হবে মুখ্যত চরিত্রকে গঠন করা এবং তারপর গৌণ ভাবে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনে নজর দেওয়া।"

ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক অবধি জীবিত ছিল। তিনি নিজে

* ১৬ নং বোসপাড়া লেনে ১৩ই নভেম্বর ১৮৯৮, রবিবার কালীপূজার দিনে শ্রীমা সারদাদেবী বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। পরদিন বিদ্যালয়টি খোলা হয়।—সঃ

† ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া নিবেদিতা ১৭ নং বোসপাড়া লেনে বাস করিতে থাকেন এবং বিদ্যালয়টিও সেইখানেই পুনরায় খোলা হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি ১৬ নং বোসপাড়া লেনে স্থানান্তরিত করা হয়—যে বাড়িতে স্কুলটি ১৮৯৮ সালে প্রথম খোলা হইয়াছিল এবং যেখানে নিবেদিতা ১৮৯৯-এর জুন পর্যন্ত ছিলেন।—সঃ

‡ Hints on National Education in India.—সঃ

ক্রমশ রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। তখন তাঁর সহকারিণী ক্রিষ্টিন গ্রীনস্টাইন-এর তত্ত্বাবধানে তা চলত। কিন্তু শেষে তিনি এই বিদ্যালয় ত্যাগ করে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। ভগিনী নিবেদিতা হতাশ হয়ে পড়লেন। তার অনতিকাল পরেই দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।*

* ভাষণের এই তৃতীয় অংশ প্রসঙ্গে সম্পাদকের পক্ষে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে—

১। মিস মার্গারেট ই. নোব্‌ল বাগ্‌দত্তা হইবার পূর্বেই তাঁহার প্রণয়ীর মৃত্যু ঘটে। (ক)

২। নিবেদিতা পরিচালিত বিদ্যালয়টির নাম ছিল: Ramakrishna School for Girls (রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়)। (খ) বলা বাহুল্য, নিবেদিতার দেহান্তের পরই উহা 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে অভিহিত হয়।

৩। নিবেদিতা ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন (প্রথমবার) ১৯০২-এর ফেব্রুআরিতে। ক্রিস্টিন ভারতে প্রথম আসেন ১৯০২-এর এপ্রিলের গোড়ার দিকে। (গ) তিনি স্কুলটিতে যোগ দেন ১৯০৩ সালে। (ঘ)

৪। নিবেদিতার বিদ্যালয়টি অদ্যাবধি জীবিত। শুধু জীবিতই নহে, উত্তরোত্তর শ্রীমণ্ডিত এবং নিবেদিতার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিতে দৃঢ়পদে অবিচলিত নিষ্ঠায় প্রাগ্রসর। (ঙ) নিবেদিতা অর্থসংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যে গমন করিলে স্কুলটি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়াছিল—জুন ১৮৯৯ হইতে ফেব্রুআরি ১৯০২ পর্যন্ত। ১৯০২-এ সরস্বতীপূজার পর স্কুলটি পুনরায় খোলা হয়। তদবধি এযাবৎ উহা কোন সময়েই বন্ধ হয় নাই। তবে ১৯৪১ সালে জাপান কর্তৃক বোমা বর্ষণের আশঙ্কায় কলিকাতার অনেক স্কুল-কলেজের ন্যায় নিবেদিতা স্কুলের ক্লাসও বন্ধ ছিল। (খ)

৫। ক্রিস্টিন ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করিয়াছিলেন কি না, তাহা গবেষণার বিষয়। তবে ম্যাকলাউডকে লিখিত নিবেদিতার ৩১।৮।১৯১১-এর পত্র হইতে মনে হয় সম্ভবতঃ তিনি যোগ দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র হইতে জানা যায়, তিনি এক বৎসরের জন্য ঐ বিদ্যালয়ে যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। যদি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগও দিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উহা ৪।৫ মাসের অধিক হইবে না, কারণ নিবেদিতার দেহান্তের তিন মাস পরেই তিনি নিবেদিতা স্কুলের ভার পুনরায় গ্রহণ করেন। (চ) 'নিবেদিতা লোকমাতা', (পৃ: ৭২৩-৪) হইতে ম্যাকলাউডকে লিখিত পত্রটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

'ক্রিস্টিন স্থির করেছে, সে ব্রাহ্মস্কুলে এক বছরের জন্য শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষাদানের কাজে যোগদান করবে, সেইসঙ্গে ছোট স্কুলের প্রধানও হবে। এইভাবে সে অর্থোপার্জন করতে পারবে, কিন্তু সেই কারণেই সে যায়নি, আরও পঞ্চাশটা কারণ রয়েছে। তার সিদ্ধান্তে আমি খুশী এর দ্বারা মনে হয় সে মনের প্রসার, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা লাভ করবে, যা তার পাওয়া খুবই দরকার। এখানেই তার বাসস্থান থাকবে: আমার বিশ্বাস আমরা একসঙ্গে শনি-রবিবার ও ছুটিগুলি কাটাব। অভিজ্ঞতালাভের পরে সে "ব্যক্তিত্ব" হয়ে উঠবে না, অপরপক্ষে ভবিষ্যতের কাজগুলিকে চালাবার পক্ষে যোগ্যতা অর্জন করবে।'

৬। মায়াবতীতে যে ১৯১১-এ ক্রিস্টিন, নিবেদিতার নিকট ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে যোগদানের প্রস্তাব করেন। ইহাতে নিবেদিতা হতাশ হন। (চ) হতাশ হইবার সাক্ষাৎ কারণ উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান নহে, পরন্তু নিজেদের পরিচালিত বিদ্যালয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এই আশঙ্কা। নিবেদিতা জানিতেন ক্রিস্টিন বিদ্যালয়টির প্রাণস্বরূপা ছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন, 'She is striving to organize a method of education that long after she is dead, can be maintained by Hindus themselves... I regard my American Sister, striving to solve the educational problem of a foreign people as standing in the ranks of the great Educators of the world.' (ঘ) নিবেদিতা বা ক্রিস্টিন কেহই মনে করিতেন না, ব্রাহ্মরা একটি ভিন্ন গোষ্ঠী। ব্রাহ্ম মহিলারা নিবেদিতা-ক্রিস্টিন পরিচালিত বিদ্যালয়েও শিক্ষাদান করিতেন এবং নিবেদিতাও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। সুতরাং নৈরাশ্য সেই দিক দিয়া নহে। আরও লক্ষণীয় যে, এই নৈরাশ্য সাময়িক মাত্র, কারণ ম্যাকলাউডকে লিখিত পূর্বোদ্ধৃত পত্রে নিবেদিতা আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন, নৈরাশ্য নহে।

(৪)

এবার আর একটি পরিবারের কথা উল্লেখ করা হবে যা নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে মহিলাদের দুর্দশা-মোচনের কাজে দেশকে অনেক কিছু দিয়েছিল। এই পরিবারের প্রধান হলেন দুর্গামোহন দাশ। তিনি যে পথ দেখিয়েছিলেন তার অনুসরণ করে তাঁর দুই কন্যা বিংশ শতাব্দীতে নারীপ্রগতি আন্দোলনে প্রচুর বলসঞ্চার করেছিলেন। প্রথমা কন্যার নাম সরলা। তাঁর সহিত আচার্য প্রসন্নকুমার রায়ের বিবাহ হয়। প্রসন্নকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ভারত সরকারের লণ্ডন আপিসে শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন। দ্বিতীয়া কন্যা অবলার বিবাহ হয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। জগদীশচন্দ্র স্বনামধন্য মানুষ। কাজেই তাঁর পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

দুর্গামোহন দাশ ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামের বিখ্যাত দাশবংশের মানুষ। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বরিশালে ওকালতি করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর পিতা বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক হয়ে এক অল্পবয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল পরে তরুণী অবস্থায় তাঁকে রেখে মারা যান।

দুর্গামোহন প্রগতিবাদী ছিলেন। তিনি তাঁর বিধবা বিমাতার বিবাহ দেন। বিধবাবিবাহ তখন আইনসিদ্ধ হলেও জনমত তখনও তার বিপক্ষে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষ করে মফঃস্বল অঞ্চলে এই প্রতিকূল মনোভাব অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। সুতরাং তার প্রতিক্রিয়া হল অত্যন্ত প্রতিকূল। স্থানীয় সমাজ তাঁকে একরকম একঘরে করে বসল। অগত্যা উপায় না দেখে তিনি বরিশাল ত্যাগ করে কলিকাতায় চলে এলেন। উকিল হিসাবে এখানেও তাঁর প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠল।

এখানে এসে তিনি কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। সে সময় তিনি সমাজের উপাসনা সভায় যে পর্দাপ্রথা ছিল, তার যে বিরোধিতা করেছিলেন, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কলিকাতায় এসে তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২২নং বেনেপুকুর লেনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার নাম দেওয়া হয় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়ের নাম পরে পরিবর্তিত করে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' রাখা হয়। এখানে তাঁর তিন কন্যা সরলা, অবলা ও শৈলবালাকে ভর্তি করে দেন। ব্রজকিশোর বসু তাঁর কন্যা কাদম্বিনীকেও এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রহণ করতে সম্মত হয়। ফলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দরজা তাদের নিকট

আকর-নির্দেশ:

(ক) প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা: ভগিনী নিবেদিতা (১৯৬৩), পৃঃ ১১

(খ) রেণুকা বসু: রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসর (১৯৫২), পৃঃ ৬. ৭, ৮, ২৩

(গ) শঙ্করীপ্রসাদ বসু: নিবেদিতা লোকমাতা (১৯৬৮), পৃঃ ২৩, ৭১৩-৪

(ঘ) Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School: Sister Nivedita's Lectures and Writings (1975), pp. 277, 282-3

(ঙ) Report of the Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School and Sarada Mandir (1973 to 1975).

ইহার সার-সংক্ষেপ উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৮২ সংখ্যায় পৃঃ ৬০৭-৮-এ দ্রষ্টব্য।

(চ) Pravrajika Atmaprana: Sister Nivedita (1961), pp. 282-3

— সঃ

উন্মুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে এই বছর বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। পরের বছর বিধুমুখী এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। সরলা তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের সহিত বিবাহ হয়ে যাওয়ায় তাঁর ভাগ্যে আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটে নি।

দুর্গামোহন পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। বৃদ্ধ কুলীনের সহিত বিবাহের উদ্যোগ হলে তিনি বাধা দিতেন এবং প্রয়োজন হলে বালিকাকে উদ্ধার করে আনতেন। এমন অনেক বালিকা দুর্গামোহনের আশ্রয়ে মানুষ হতেন।

একবার এই নিয়ে আদালতে মকদ্দমা হয়েছিল। বরদানাথ হালদারের ভাগিনেয়ী বিধুমুখীকে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হবার সময় বিবাহসভা হতে উদ্ধার করে আনেন। ফলে বরদানাথ তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করেন। তখন দুর্গামোহন দাশ ও ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আসামীদের সপক্ষে মকদ্দমা লড়েন। পরিশেষে তাঁরা খালাস পান। এর জন্য বিচারপতি আসামীপক্ষের আইনজীবীদের সুখ্যাতি করেন।

এহেন পিতার কন্যা ছিলেন সরলা রায় ও অবলা বসু। সুতরাং তাঁরাও যে পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নারীপ্রগতি আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। আমরা প্রথমে সরলা রায়ের কথা বলব।

সরলা রায় সুরুচিসম্পন্ন, ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট, উচ্চশিক্ষিত মহিলা ছিলেন। ফলে তাঁর বাড়ী একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। অনেক মনীষী তাঁর কাছে আসতেন। তিনি তাঁদের আপ্যায়ন করে, তাঁদের সহিত আলাপ-আলোচনা করে আনন্দ পেতেন এবং আনন্দ দিতেন। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল তাঁদের অন্যতম।

সরলা রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে নূতনত্ব ছিল। প্রথমত তিনি চেয়েছিলেন নারী-উন্নয়নের কাজে মহিলারা নিজেরাই এগিয়ে আসুন। তার জন্য তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমটি হল মহিলা সমিতি এবং দ্বিতীয়টি হল 'অল ইণ্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স', সংক্ষেপে 'এ আই ডব্লিউ সি'। তাঁর ধারণায় পুরুষরা মহিলাদের উন্নয়ন সাধনের জন্য অনেক করেছেন ; এখন হতে সে দায়িত্ব মহিলাদের নিজেদের নিতে হবে। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি তাঁর একটি প্রবন্ধে আছে :

"পুরুষরা আমাদিগের জন্য অনেক করিয়াছেন, এখন অগ্রসর হইয়া অন্তত আমাদের সম্ভবনীয় ও করণীয় কার্যগুলির ভার না লইলে তাঁহাদের প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে অথবা দেশের মঙ্গল কিছুই করিতে পারিব না।" (আমাদের দায়িত্ব)

দ্বিতীয়ত, কেবল সংকুচিত গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে মহিলাদের আবদ্ধ রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইতেন মহিলাদের সংসারের দায়িত্ব নিশ্চয় বহন করতে হবে, অতিরিক্তভাবে দেশের সেবাও করতে হবে। নিজেদের অক্ষমতার অজুহাত দিয়ে তা এড়িয়ে গেলে চলবে না। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি মহিলাসভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে পাওয়া যায়। সেটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"আমরা কি কেবল অন্তঃপুরে প্রাচীরে বদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি ? আমাদের ভিতরে কি কিছুমাত্রও পরোপকার করিবার বল—শক্তি নাই ? আমরা সকলে কেন একভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে এই নিরাশার কথা সকল সময় বলি, 'আমরা দুর্বল স্ত্রীলোক, আমরা আবার কাহার কি উপকার করিতে পারি ?' "

বাড়ীতে সংসার দেখা যে মহিলাদের বিশেষ দায়িত্ব সে বিষয় তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন।

তাই দেখি, তিনি এ বিষয় বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে এবং ভাষণে। সংসার যে সমাজের ভিত্তিভূমি এবং নারী যে তার প্রাণ-কেন্দ্র এ কথাটির ওপর তিনি জোর দিতেন। তাই তিনি মহিলাদের ভাল গৃহিণী হবার উপদেশ দিতেন। এ আই ডব্লিউ সি-এর মাদ্রাজের অধিবেশনে সভানেত্রীর ভাষণে তিনি এই বলেছিলেন :

"আমাদের ঘর-সংসারের প্রতি আমাদের সব থেকে বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারই হল সমাজের উপাদান। প্রায় সকল জাতিই এই ধারণা পোষণ করে যে মেয়েরা সমাজের প্রাণকেন্দ্র।"

মোটামুটি তাঁর আদর্শ ছিল মেয়েরা স্বাধীন পরিবেশে গড়ে উঠবে। তাদের জীবনের লক্ষ্য থাকবে দুটি। প্রথমত সুগৃহিণী হওয়া এবং অতিরিক্তভাবে দেশের সেবা করা। এই প্রসঙ্গে তিনি মহিলা সমিতির এক সভায় বলেছিলেন :

"আসুন মহিলা সমিতিটাকে ভাল করে জাঁকিয়ে তুলে আমরা ঘরোয়া কথা নিয়ে আলোচনা করি— ভিতরের জীবন, সংসারের কাজকর্ম, দেশের জন্য, পাঁচজনের জন্য সমবেত কাজের যে উদ্দেশ্য সকলে হাত দিয়েই সেগুলো ভাল করে করি।"

সুতরাং এই আদর্শে মেয়েদের গড়ে তোলবার জন্য একটি মনের মত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। ভাগ্যক্রমে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে এই ভাবে। তাঁর বন্ধু গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতায় চাঁদা তোলা হয় এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে, কিন্তু কোনও কাজ হয় না। কয়েক বছর অপেক্ষা করে তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহিলা সমিতির কাছে প্রস্তাব করলেন তাঁর স্মৃতিভাণ্ডারে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে তা দিয়ে কলিকাতায় তাঁর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হক। ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মত হলেন।

এরই ফলে ৮ই এপ্রিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপিত হল। শ্রীমতী সরলা রায় তার সম্পাদিকা হলেন। প্রথমে আনন্দ ব্যানার্জি লেনে একটি ভাড়া বাড়ীতে তা স্থাপিত হয়। পরে সরকারের কাছে প্রাপ্ত জমিতে তার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ হলে সেখানে তা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হয়।

শ্রীমতী রায়ের ইচ্ছা ছিল এই বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তার উদ্দেশ্য হবে : "শুধু সরকার পরিচালিত পরীক্ষাগুলিতে মুখস্থ করিয়ে ছাত্রীদের পাশ করানো নয়, অতিরিক্তভাবে তাদের চিন্তা ও আদর্শকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা এমন আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে যারা আদর্শ সংসার গড়ে তুলবে এবং বিবেক-সম্পন্ন দেশসেবিকা হবার শক্তি রাখবে।" সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে পরীক্ষার জন্য যে পাঠের ব্যবস্থা আছে তার অতিরিক্ত-ভাবে গৃহবিজ্ঞান, শিশুপালন বিদ্যা, সেলাই-এর কাজ, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প-শিক্ষণেরও ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

সরলা রায়ের ছোট বোন অবলা বসুর মহিলাদের উন্নয়নের চেষ্টায় ভূমিকা কিছু কম ছিল না। তিনি যেমন স্ত্রীশিক্ষায় জোর দিয়েছিলেন তেমন দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং আর্থিক দিক হতে স্বাবলম্বিনী হবার প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী। প্রথমত বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। অতিরিক্ত উদ্দেশ্য ছিল কুটীরশিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং তাকে সম্ভব

করতে কুটীরশিল্প শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের মধ্যে এই ধরণের শিক্ষা যাতে মহিলারাই দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হবে।

এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে শ্রীমতী অবলা বসু অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মহিলা শিল্পভবন স্থাপিত হয়। এখানে মহিলারাই কুটীরশিল্প গড়ে তুলবেন, এই উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্থাপিত হয়। এটিকে শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মহিলাদের শিক্ষার জন্য বাণীভবন শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্বাধীনতালাভের পর তার একটি শাখা ঝাড়গ্রামে স্থাপিত হয়। তার সঙ্গে প্রাক্-বুনিয়াদী শিশু বিদ্যালয় ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়।

বসু-দম্পতীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার খুব ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে এক প্রদর্শনীতে।* তার ফলে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তা ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুদিবস পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় সজীব ছিল। প্যারিস প্রদর্শনীর পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। তখন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর যে সেবা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। ফলে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এমন গভীর হয় যে, আচার্য জগদীশচন্দ্রকে নিবেদিতা 'খোকা'† বলে ডাকতেন এবং শ্রীমতী অবলা বসুকে ডাকতেন 'বো' বলে। অবশ্য তাঁর মেমসাহেবের মুখে তা পরিস্ফুটভাবে উচ্চারিত হত না, হত 'বো' বলে। ভগিনী নিবেদিতার দার্জিলিং-এ যখন মৃত্যু হয়, তিনি বসু-দম্পতীরই অতিথি ছিলেন।

সুতরাং অবলা বসুর কাছে নিবেদিতা একটি প্রিয় নাম। তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে অবলা বসু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করেন।‡ উদ্দেশ্য, এই ভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থ হতে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। এই শিক্ষণের অঙ্গ ছিল প্রাথমিক মান পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা-বিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, কুটীরশিল্প শিক্ষণ এবং সব্জী বাগান শিক্ষণ। বোঝা যায়, বয়স্কা মহিলাদের এমনভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল যাতে বিদ্যাচর্চা, সমাজসেবা এবং আর্থিক স্বাবলম্বিতা সবগুলিই একসঙ্গে আয়ত্ত করা যায়।

(৫)

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার হাবড়া থানার অন্তর্ভুক্ত খাঁটুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের পূর্ব-পুরুষ সকলেই উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতা ধরণীধর শিরোমণি সেকালের শ্রেষ্ঠ কথক বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর খুল্লতাত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অতি প্রিয়পাত্র

---

* প্যারিসে প্রদর্শনী হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। ডঃ বসুর সহিত নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হয় ভারতেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ৫৮০)। মিসেস বসুর সহিতও নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হয় ভারতেই প্রায় ওই সময়ে। (তদেব, পৃঃ ৫৮৩, ৫৮৯ ও ৭৩৮)।—সঃ

† ১২ই ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখে ডঃ বসুর অপারেশন হয়। ২২শে নভেম্বর ১৯০০ তারিখে ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার পত্রে ডঃ বসু 'খোকা' ('Bairn'—স্কচ্ শব্দ—অর্থ 'Child') বলিয়া উল্লেখিত। (তদেব, পৃঃ ৬০৮ ও ৬১১)।—সঃ

‡ "নিজ উইলে বসুদম্পতি নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা রাখেন, যা দিয়ে লেডী বসু তাঁদের স্থাপিত 'বাণীমন্দিরে' নিবেদিতা হল নির্মাণ করে দেন।" (নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ৭৩৭)।—সঃ

ছিলেন এবং প্রথম বিধবাবিবাহ করে সমাজ-সংস্কারের পথে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মুরলীধরের মাত্র দশ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। তিনি তারপর কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের সহিত সংযুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করলে সংস্কৃত কলেজ তাঁকে "বিদ্যারত্ন" উপাধি দেন। পরবৎসর তিনি কটকের র‍্যাভেন শ কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান হতে তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বদলী হন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে ১৯৩২ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। অবসর সময়ে তিনি সমাজসেবা করতেন।

মুরলীধর প্রচারবিমুখ স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। তাঁর বন্ধুরা তাই এই বলে উপহাস করতেন যে, তাঁর কথক পিতা সব কথাই বলে গেছেন বলে তিনি আর কথা বলেন না। এ হেন নিরুপদ্রব মানুষ যে প্রয়োজন হলে সমাজসংস্কার আন্দোলনে রীতিমত জড়িয়ে পড়তে পারেন তা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু তা-ই ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার অধ্যাপক অমলেন্দু দে বলেছেন:

"তাঁর মধ্যে যে একটি সজীব সমাজ-সচেতন মানুষ রয়েছে তার পরিচয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অনেকেই পান নি। সংস্কৃত পরিবেশে মানুষ হয়েও, সংস্কৃত শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেও মুরলীধর প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতি উদাসীন ছিলেন না।"

যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তাঁর সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকার সূত্রপাত হয় তা হল ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভি জি প্যাটেল উত্থাপিত ভারতীয় আইনসভায় হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণবিবাহ সমর্থনের আইনের প্রস্তাব।* এই বিল উত্থাপিত হলে দেশে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮ জন মহারাজা, ২২ জন রাজা, ৬ জন নাইট, ১৩ জন মহামহোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে সরকারের নিকট আবেদন করেন। যাঁরা এই প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মদনমোহন মালব্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক।

যিনি কথা বলতেন না তিনি এই প্রতিবাদের বহর দেখে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। কারণ, তাঁর বিবেচনায় 'মন্ত্র ও উপনিষদাত্মক শ্রুতি যে ধর্মের মূল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যাহার শাখা, গীতা, পুরাণ ও তন্ত্রে যাহার সমন্বয় তাহা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নহে।' তিনি এই প্রতিবাদের অযৌক্তিকতা খণ্ডন করে এবং বিলের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে 'সঞ্জীবনী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য হল জাতিভেদ-প্রথা সংকীর্ণ মনোবৃত্তি-প্রণোদিত। সুতরাং প্যাটেল বিল অভিনন্দনযোগ্য। 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত তাঁর এই মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

"এখন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে এই সমস্ত সংকীর্ণ প্রথা পরিবর্তিত করিতে হইবে। যাঁহারা বর্তমান যুগের অনুরূপ করিবার নিমিত্ত হিন্দুসমাজকে উন্নতিশীল করিতে চান, তাঁহাদিগকে কঠোর নিয়মের দ্বারা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া ইহারই মধ্যে স্থান দিতে হইবে।"

* Hindu Marriage Validity Bill

তিনি এই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেন, "পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপরই রাজনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভের যাঁরা বিরোধী, রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্য কোলাহল করা কেবল তাঁহাদের ছলনা মাত্র।"

তাঁর মধ্যে একজন শক্তিমান প্রবক্তা আবিষ্কার করে দেশের প্রগতিশীল কিছু মানুষ তাঁকে কেন্দ্র করে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গীয় সমাজসংস্কার সমিতি।' তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তারই উদ্যোগে বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা আলোচনার জন্য এক সভা আহ্বান করা হয় ৪ঠা এপ্রিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। এই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সামাজিক সভা'র অধিবেশন হয় মেদিনীপুরে তাঁকে সভাপতি করে। তাতে তিনি যে অভিভাষণ দেন তার মধ্যে একটি উদার সংগঠনমূলক সুর ধ্বনিত ছিল।

তার প্রতিক্রিয়া হয় বিচিত্র। একদিকে রক্ষণপন্থী দল তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। 'নায়কে'র সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেদিনীপুরে মুরলীধ্বনি' নামে ধারাবাহিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁকে নিয়ে পরিহাস করেন। অপরদিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তার জন্য তাঁর সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন, "পণ্ডিত মহোদয়ের সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও ও সৎসাহস অতীব প্রশংসনীয়। (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

তাঁর ভাষণে মুরলীধর সমাজসংস্কার বিষয়টির মূলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান হিন্দুসমাজের অধঃপতনের মূলে রয়েছে 'স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অবস্থাগত বৈষম্য'। তিনি বলেছেন, সমাজ দুটি পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একটি যদি পুরুষ হয়, অপরটি হল নারী। এখন একটি পা যদি পঙ্গু করে রাখা হয়, মানুষ চলতে পারে না। হিন্দুসমাজের সেই দশা হয়েছিল। মেয়েদের নানা শাসনের নিগড়ে বেঁধে, অন্তঃপুরের দাসী বানিয়ে আমরা সমাজের একটি পা-কে পঙ্গু করে ফেলেছি। সেই পা-টি সুস্থ না হলে আমরা খুঁড়িয়েই চলব।

এই কারণে তিনি নারীপ্রগতি এবং নারী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেন। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়াতেই তিনি 'নারীসমুন্নতি সমিতি' স্থাপন করেন। তার কাজ ছিল বিধবাবিবাহে, অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দেওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

যেখানে বিধবাবিবাহ দিতে বা অসবর্ণ বিবাহ দিতে পুরোহিত পাওয়া যেত না, সেখানে মুরলী-ধর নিজেই পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মতিলাল রায় তাঁর প্রবর্তক সংঘের আশ্রমে একটি অসবর্ণ বিবাহ দিতে তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সংখ্যায় দেখা যায় তিনি একটি বিধবার বিবাহ নিজে দিয়েছেন বলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সৎ-সাহসের প্রশংসা করেছেন।

নারীসমুন্নতি সমিতির পরিকল্পনা অনুসারেই মুরলীধর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমে কয়েক বছর উপযুক্ত জায়গার অভাবে তাঁর ১৮।১ নং ফার্ণ রোডের বাগানবাড়ীতে তা অবস্থিত ছিল। তারপর নানা জায়গা ঘুরে ৪ নং হিন্দুস্থান রোডে স্থায়ী ভাবে বসতে থাকে। তিনি আমরণ তার সম্পাদকের কাজ করে গেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ধীরে ধীরে তা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তা মহা-বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরে মহাবিদ্যালয় স্বতন্ত্র নিজস্ব গৃহে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তিত করে

মুরলীধরের নামের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ দক্ষিণ কলিকাতার প্রাচীনতম বালিকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

তারপর বর্তমান শতকের য় দশকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠার পর পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেল। একটি বড় বন্যার প্লাবন এলে যেমন সব আবর্জনা তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমন স্বাধীনতা আন্দোলন এমন সর্বাত্মক হয়ে উঠল যে মেয়েরাও বিনা বাধায় তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারল। মদের দোকানে পিকেট করতে মেয়েরা এগিয়ে এল, শোভাযাত্রায় মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলল। স্বাধীনতা যুদ্ধে— কি অহিংস রীতিতে, কি সহিংস রীতিতে—মেয়েরা কোথাও পিছিয়ে থাকেনি। সহিংস রীতিতে যেমন প্রীতিলতা ওয়াদেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, শান্তি ঘোষ, সুনীতি' চৌধুরী ছিলেন, অহিংস পথের সংগ্রামে তেমন অগণিত স্বাধীনতা-যোদ্ধা ছিলেন। অহিংস যুদ্ধে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ফলে পর্দা আপনি ভেঙে গেল, নারী-স্বাধীনতা আপনি প্রতিষ্ঠিত হল, বিধবা-বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে কুসংস্কার কোথায় ভেসে গেল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের আগে মহাত্মা গান্ধী ভাবী ভারতের যে মূর্তি কল্পনা করেছিলেন, তাতে নানা ইচ্ছার মধ্যে এই ইচ্ছাটি উচ্চারিত হয়েছিল যে তাঁর স্বপ্নের ভারতে পুরুষ-জাতি যেসকল অধিকার ভোগ করে, নারীজাতিও সেগুলি ভোগ করবে।* তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতবাসী এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত করবার অনুকূল মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছিল। ভারতের সংবিধান এবং হিন্দুকোড কেবল তাকে বিধিবদ্ধ রূপ দিয়েছে।

*'The women will enjoy the same rights as men.'

সমালোচনা

Sister Nivedita's Lectures and Writings : Edited by Pravrajika Atmaprana. Published by the Secretary, Ramakrishna Sarada Mission, Sister Nivedita Girls' School, 5 Nivedita Lane, Calcutta 700003, (1975), pp. ix + 426, price Rs 25.00.

নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, ১৯৬৭-৬৮ সালে, ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃক এই মহীয়সী মহিলার রচনাবলী পুস্তকাকারে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে অবশ্য তাঁর সকল রচনা সংগৃহীত হয়নি। ১৯৭৫ সনে—নিবেদিতার দেহাবসানের ৬৪ বছর পরে—বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে মুদ্রিত এবং সেইসঙ্গে অপ্রকাশিত কিছু নিবেদিতা-রচনার পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ এক অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। নিবেদিতার দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ, এই অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি, সুদীর্ঘকালের নিবেদিতাচর্চা এবং অপরিসীম নিষ্ঠা ও আয়াসের ফসল। পাঠকমাত্রেই এই দুর্লভ রত্নরাজি উপহার পেয়ে শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণাকে অশেষ সাধুবাদ জানাবেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত নিবেদিতার ভাষণ ও রচনাবলী বিষয়ানুসারে এভাবে ভাগ করা হয়েছে : ১৫টি 'শিক্ষা'-বিষয়ক, ২৩টি 'হিন্দু জীবনসাধনা ও ধর্ম' সম্পর্কে এবং ৩৪টি 'রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী'র ওপর। তাছাড়া, জীবনী-মূলক রচনা ও পুস্তক-পর্যালোচনা আছে ১৩টি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবেদিতার বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারের পুনর্মুদ্রণ ২২টি এবং স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার আগে নানান বিষয় নিয়ে লেখা ১৩টি নিবন্ধ।

শ্রীশ্রীমার কাছে 'নরেন্দ্রের নৈবেদ্য' বোলে বৃতা, স্বামীজীর শিষ্যা ও মানসকন্যা, গুরুপ্রদত্ত দিব্যশক্তির আধার এই তেজস্বিনী তীক্ষ্ণধী নারীর লেখা ও কথা যে কতো জোরালো ও তাঁর 'মগজটা' ছিল কতো 'ভারী ধারালো' (বিনয় সরকারী ভাষায়), এ দেশটার প্রতি তাঁর হৃদয়ের দরদ ছিল কি অপরিমেয় এবং তাঁর বিশ্লেষণীশক্তি, বিপ্লবী চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছিল কি প্রখর ও সত্যের প্রত্যয়-দৃপ্ত, তা নতুন করে বলা বাহুল্য। তাঁর 'অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপ্রাপ্ত; কবিগুরু বলেছিলেন : 'মা যেমন ছেলেকে স্পষ্ট করে জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা।' বর্তমান গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধ ও উক্তিতে নিবেদি-তার এই বহুমুখী ও বিচিত্র প্রতিভা-ভাস্বর কল্যাণ-ময়ী লোকজননীর মূর্তিটি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত সাধারণ সাময়িক প্রসঙ্গও তাঁর অসাধারণ মনীষায় ও প্রকাশের তেজোদ্দীপ্ত লাবণ্যে অনন্য চিরায়ত উচ্চারণে উত্তীর্ণ হয়েছে, বীর্য ও ভক্তির রসায়নে জারিত হয়ে বিপুল বৈভবে পরিণত হয়েছে। তপস্বিনী মহাশ্বেতার প্রশস্তিতে প্রগল্ভ বাক্‌চাতুরী ক্ষান্ত করে বরং বইখানির রত্নভাণ্ডার থেকে ইতস্তত আহৃত কিছু মণিমুক্তোর সঞ্চয়ন, তাঁর খরশান ইংরেজী ভাষার অতীব অক্ষম অনু-বাদ সত্ত্বেও, 'উদ্বোধনে'র পাঠকসমাজের কাছে পরিবেষণ করলে, আশা করি, তাঁরা তৃপ্ত হবেন :

দেশে শিক্ষার যেসব সুযোগ আছে তার পুরো-পুরি সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। তার জন্যে দরকার, প্রথমত, সুন্দর চরিত্র। রুচির উৎকর্ষ দিয়েই সুন্দর চরিত্রকে চেনা যায়।··· আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে ঘৃণা বা সংশয় করে নয়, তার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের ঝাঁপ দিতে হবে। কেমন করে উপাসনা করতে হয় তা আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের শিখিয়েছেন; তাঁদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা পেয়েছি সত্যনিষ্ঠা ও জ্ঞানপিপাসা। দর্শন যুক্তিবিদ্যা গণিত ও ব্যাকরণ চর্চায় তাঁরা যেমন কঠোর পরিশ্রম করতেন, বিজ্ঞান ইতিহাস নৃকুলবিদ্যা আয়ত্ত করতে আমরা কি তাঁদের চেয়ে কম প্রয়াসশীল হব? জ্ঞানের রাজ্যে তাঁরা কোন বাছবিচার করতেন না। তাঁরা সহজ পথ বেছে নেননি। যে-কোন কাজেই আমরা প্রবৃত্ত হই, আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রচণ্ড চালিকা-শক্তি হচ্ছে চরিত্রবল—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। (পৃঃ ৩১,৩৩)

আমাদের দেশবাসীরা সব সময়ে একটা ভুল করছেন : ব্যাপারটা সুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশের সংস্কৃতির স্থান সম্বন্ধে।·· তাঁরা মনে করেন, যেহেতু আমরা ভারতীয় রীতিনীতি, ভারতীয় শিল্পকলা বা ভারতীয় সাহিত্যের সমর্থক, আমরা তাই য়ুরোপীয়দের নিন্দার্হ মনে করি; যেহেতু আমরা প্রাচ্যের আদর্শ প্রচার করি, সেইজন্যে নাকি আমরা পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে অশ্রদ্ধা করি। একথা ঠিক নয়। যতোই অনুপযুক্ত ও স্খলিত-ভাবেই হোক না কেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের মহান্ নাম যারা মুখে উচ্চারণ

করেছে, তেমন আচরণ তাদের শোভা পায় না। মহত্তম আদর্শধারার আদানপ্রদান—একটিকে হেয় করতে তাদের তুলনা করা নয়—এই ছিল আমাদের মহান্ নেতার সারকথা।... ভারতীয় শিশুকে মহাভারতের কোলে মানুষ না করাটা পাপ; কিন্তু তাই বোলে বড়ো হয়ে উঠে সে যদি হোমারের কাব্যরস উপভোগ করতে অসমর্থ হয়, সেও হবে তার সংস্কৃতির দৈন্য। আমাদের নিজেদের আদর্শে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাই হলো সর্ববিধ রসবোধের একমাত্র প্রস্তুতি। (পৃঃ ৬৮,৬৯)

এখন আর পর্বতগুহায় সন্ন্যাস অন্বেষণ করা হয় না, সন্ন্যাসের স্থান এখন সংগ্রামক্ষেত্র, হয়তো বা কোন অভিশপ্ত নগরীর তোরণদ্বারে বা কোন প্লেগ-রোগাক্রান্ত শহরে গরীবদের অন্ধকার নোংরা বস্তির ভেতরে। প্রার্থনার চেয়ে আত্মদানকেই মহত্তর বোলে মনে হয়। মৃত্যুর আনন্দই বীরের উদ্দীপক অনুপ্রাণনা। যখন সে যন্ত্রণা বোধ করে তখন সে আরো, আরো যন্ত্রণার পুরস্কার যাচ্ঞা করে— এই হলো বীরের প্রকৃত শক্তি। ব্যথাকে আর ভয় করা নয়, তাকে সাদরে আলিঙ্গন করা— সব শক্তিই কি মূলত এই নয়?...মানুষ যখন অভীক্ হয়, রণভেরী শুনে যখন তার দু'চোখে আনন্দের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, যখন মরণের আহ্বানে সে ছুটে যায় সেই ভয়ালের সঙ্গে এক হয়ে মিলিয়ে যেতে, পশ্চাৎপদ হবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না, তখন—তখনই শুধু বীর্যের সাধনা তার সার্থক হয়। শুধু তখনই আমরা যে আত্মশক্তি থেকে উদ্ভূত সেই মূলীভূত শক্তির সন্তান হবার যোগ্য হয়ে উঠি। বন্দে মাতরম্। (পৃঃ ৮৯)

*

ঈশ্বরকে সম্বোধন করা হয় কখনও 'মধুরতম' বোলে, আবার কখনও বলা হয় 'ভীষণতম'। তিনি শুধু দয়াল, এমন মধুর স্বপ্ন ভারতীয় ভাবনায় বালকোচিত: যিনি দয়াল তিনি আবার ভয়ালও; যা আসে মঙ্গলময় রূপে তা অমঙ্গলের রূপ ধরেও আসবে। আসলে, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আমাদের নির্বোধ ধারণা-প্রসূত: আমাদের আপাতদৃষ্টিতে যা ভালমন্দ বোলে মনে হয়, সেই নিম্নস্তরের হীনবুদ্ধি থেকেই এইসব ধারণা জন্মায়। 'বহু'কে অতিক্রম করে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে সেই অদ্বয় 'একে'। (পৃঃ ৯৪)

ইন্দ্রিয়লোক থেকে যতোই আমরা নিজেদের সরিয়ে গুটিয়ে আনি, ততোই আমাদের জ্ঞানলাভের শক্তি কর্মশক্তি, সহ্যশক্তি, আনন্দলাভের শক্তি বাড়ে। জ্ঞান শক্তি ও শান্তির যা অনন্ত উৎস তা ইন্দ্রিয়লোকের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। একটা দিক থেকে যতোই আমরা দূরে চলে যাই, ততোই আমরা অন্য দিকটার কাছে এগিয়ে আসি। এরই নাম বৈরাগ্য—এইটাই অমৃত আনন্দের পথ। (পৃঃ ১০১-২)

*

মনের স্বভাবই হলো যে ইন্দ্রিয়লোক থেকে তাকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যদি না এ-সংসারের চেয়ে মহত্তর, এ-সংসারের চেয়ে সত্য প্রেয় কিছুর দিকে মনটাকে ফেরানো যায়, যদি না তাকে সেই সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরের অভিমুখী করা যায়। একমাত্র ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হলে আমরা জীবনযন্ত্রণার বিদ্ধ হই না; তখনই শুধু আমাদের কর্ম হয় পূজা, তখনই শুধু আমরা অপরের যথার্থ কল্যাণ সাধন করতে পারি। তাঁর আলোকে যখন আমরা আমাদের চেতনাকে ধুয়ে নিতে পারি, তখনই বহুরূপের মধ্যে শুধু তাঁর রূপটাই আমরা দেখতে পাই। কী করে তিনি আমাদের ধ্যানগম্য হবেন যদি না তাঁর প্রতি আমাদের হৃদয়ের আকুল আকর্ষণ থাকে, যদি না

তাঁকে আমরা ভালবাসি? তাই বলি, প্রকৃত কর্মযোগীকে হতে হবে পবিত্র ধ্যানমগ্ন ঈশ্বর-প্রেমিক। (পৃঃ ১০৪-৫)

*

ভারতভূমিতে চিরকাল ধর্মীয় অভ্যুত্থান জাতীয় জাগৃতির দিশারী হয়ে এসেছে। আচার্য শঙ্কর ছিলেন সারা দেশব্যাপী এক মহাতরঙ্গের পুরোধা, যে ভাবতরঙ্গের উচ্চচূড় ফলশ্রুতি বাঙলায় শ্রীচৈতন্য, পাঞ্জাবে শিখ গুরুগণ. মহারাষ্ট্রে শিবাজী এবং দক্ষিণ ভারতে রামানুজ ও মধ্বাচার্য। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়েই সেখানকার মানুষের আত্মবোধ জাতীয় উদ্দীপনা ঐক্যবোধ জেগে উঠেছিল। এক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই সকল নায়কদের মহাসমন্বয় ঘটেছে। অর্থাৎ, অতীতের সব আঞ্চলিক খণ্ড খণ্ড আন্দোলনগুলি রামকৃষ্ণদেবের যুগে একীভূত ও সংহত হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সমগ্রের সারস্বরূপ। যে অসীম তরঙ্গ আমাদের সকলকে সাগরাভিমুখী করতে সমর্থ তার একমাত্র ধারক ও বাহক তাঁর মহান্ অতি-চেতন জীবন। আমাদের পেছনে যে মহাশক্তি এবং সামনে যে ভবিষ্যৎ তার প্রমাণ তিনি। এমন মহা-আবির্ভাব বড়ো বড়ো ঘটনার সূচনা করে। বহু লোকের অগ্নি-পরীক্ষা হবে এবং দেখা যাবে অনেকেই খাঁটি সোনা; কিন্তু জয়-পরাজয় যাই ঘটুক না কেন, ·· এখনও জীবিত আছেন এমন মানুষদের দৃষ্টি-গোচর ও স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি যে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে জীবনধারণ করেছিলেন তাতেই প্রমাণ হয় যে ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।··· (পৃঃ ১৩২)

*

আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সাধারণত নিরাপত্তা ও আরামকে জড়িত করা হয়: সেটা সবচেয়ে ভ্রান্ত ধারণা। সেই ভুয়ো ধর্মবোধ যা দুঃখকষ্টকে ডরায়, যা একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে লালায়িত হয়, তার সম্বন্ধে, হে যুবশক্তি, তোমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। ঋষিগণ যে আধ্যাত্মিক আদর্শ তাঁদের জীবনে প্রোথিত করেছিলেন, তা অধম আরামের আদর্শ নয়, জীবন-সংগ্রাম থেকে ভীরুর মতো পশ্চাদপসরণ নয়। তাঁদের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন সম্বন্ধে অবহিত হলে এবিষয়ে আমাদের লেশমাত্র সন্দেহ থাকবে না। আধ্যাত্মিকতার ভেখ নিয়ে হীন আরামের আকাঙ্ক্ষা তোমরা পোষণ কোরো না, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ বিসর্জন দাও, জাতির জীবনে কল্যাণ সঞ্চারিত করতে একযোগে কাজ করে যাও।—তোমাদের কাছে এই আমার শেষ কথা। (পৃঃ ১৫২-৩)

ভাষান্তরে নিবেদিতার সুভাষিতাবলীর আরো নিদর্শন নিবেদন করার লোভ সংবরণ করলাম স্থানাভাবে। পওহারী বাবা স্বামী স্বরূপানন্দ আনন্দমোহন বসু রমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু সারা বুল ও সিষ্টার কৃষ্টিনের জীবনীর সংক্ষিপ্ত সমুজ্জ্বল রেখাচিত্রগুলি গ্রন্থটির প্রবল আকর্ষণ।

এক কথায় বইখানি সত্যিই রত্নখনি। পরিশেষে আবার বলি, বিলম্বে হলেও বহু যত্নে সংকলিত এই প্রকাশনখানির জন্যে মাননীয়া সম্পাদিকা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন। সেইসঙ্গে আর একটি কথাও বলতে হয়: নিবেদিতার দেদীপ্যমান রচনা ও বাণীর পুরোবর্তী প্রস্তাবনা ও পরিচায়িকাদি অতিশয় নিষ্প্রভ মনে হয়; শব্দ-সূচীটিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ; তাছাড়া, এমন একটি আকর গ্রন্থের যা অপরিহার্য অঙ্গ সেই তথ্যপঞ্জীর অভাব এবং বেশ কিছু ছাপার ভুলও চোখে লাগে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ ত্রুটিগুলি দূর করতে পারলে ভাল হয়। একাধিক নেতৃস্থানীয়

মনীষীর সহায়িকা ও সহকর্মী, বাঙ্ময়ী ভারত-ভগিনীর পত্রাবলী, হায়, এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়! তাছাড়া, মনে হয়, তাঁর কিছু কিছু লেখা এখনও এখানে-ওখানে ছড়ানো আছে। আশা করি, অচিরে সেগুলিও হদিস করে গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব হবে। **বকলম**

একাদশী (উপবাস) তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য : শ্রীগোস্বামী দাস রায়। প্রকাশক : শ্রীআশুতোষ কর, প্রজেক্ট প্রেস বিল্ডিংস্, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৭১৩২১৩। পৃঃ ৬৪+১২, মূল্য এক টাকা।

দেহের ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহারে সংযমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই সংযম নিয়মিত উপবাসের মাধ্যমে পালন করা সম্ভব। গ্রন্থকার সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে কাহিনী ও উদ্ধৃতি, ধর্মজগতের বিশিষ্ট আচার্যগণের উপদেশ এবং চিকিৎসা জগতের মনীষিগণের অভিমত প্রভৃতি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজ বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ধর্মপথের যাত্রী এবং সাধারণ স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি সকলেই এই পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। **শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ**

প্রাপ্তিস্বীকার

নিবেদিতা বিত্তালয় পত্রিকা, ১৩৮২। প্রকাশিকা : প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩।

পুষ্পাঞ্জলি, ১৩৮২। প্রকাশিকা : শ্রীশোভা দেবী, শ্রীসারদা আশ্রম, পি-৬১৫, ব্লক "ও", নিউ আলিপুর, কলিকাতা ৫৩।

অঞ্জলি, ১৩৮২। রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিত্তালয় পত্রিকা, সারগাছি. প্রকাশক : স্বামী অনাময়ানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ।

কিশোর বাংলা, ১৩৮২। প্রকাশক : স্বামী সোমানন্দ, সম্পাদক, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার. ৪০ শ্রীরামকৃষ্ণ রোড, পোঃ রিশড়া, হুগলী।

উত্তিষ্ঠ, ১৩৮২। রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম বহুমুখী বিদ্যালয়. রহড়া, প্রকাশক : স্বামী নিত্যানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া।

Vidyapith 1974. Ramakrishna Mission Vidyapith, Deoghar, Bihar. Published by: Swami Chandrananda, Secretary Ramakrishna Mission Vidyapith, Deoghar.

Vivek Jivan Annual number 1975. Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mahamandal, 6/1A Justice Manmatha Mukherjee Row, Calcutta 9.

Ramakrishna Sarada Mission Matri Bhavan 1950-1975 Silver Jubilee. Published by Secretary. Ramakrishna Sarada Mission Matri Bhaban, 7-A Sree Mohan Lane, Calcutta 26.

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে (বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠে) গত ৯ই পৌষ ১৩৮২, ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৫, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর ১২৩-তম জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন ভজন বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডী-পারায়ণ প্রসাদবিতরণ ও লীলাকীর্তনাদি হয়। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ভক্তগণের আগমনে ও পূজা পাঠ ভজন প্রার্থনায় এক দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমগ্র দিনে ফল মিষ্টি খিচুড়ি প্রসাদ প্রায় ৮,০০০ লোককে দেওয়া হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে নূতন বাড়ীর 'সারদানন্দ হলে' সকাল সাড়ে ছয়টা হইতে বেলা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ভজন, ইচ্ছাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন, 'বরাহনগর মায়ের খেলা' দলের লীলাকীর্তন, স্বামী তথাগতানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-পাঠ ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বালকাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক ভজন ও লীলাকীর্তন হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত 'রসরঙ্গ' কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বাটীর হলঘরেও ভজন কীর্তনাদি হয়।

কল্পতরু উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা জানুআরি, ১৯৭৬, এক দিব্য আনন্দময় পরিবেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ১লা, ৩রা ও ৪ঠা জানুআরি বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল।

১লা মঙ্গলারতি উষাকীর্তন পূজা হোম ও শ্রীভূপেন চক্রবর্তীর বেদগান হয় এবং শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরুলীলা সঙ্গীত ও কথকতার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। ভাগবত ব্যাখ্যা করেন স্বামী তীর্থানন্দ। সালিখা কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকর্তন, শ্রীপূর্ণদাসের বাউলগান ও শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদাবলীকীর্তন হয়। অপরাহ্ণে বিরাট জনসভার

সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ; অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী গীতানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। সন্ধ্যায় শ্রীবিজয়রাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ গান হয়। এইদিন লক্ষাধিক ভক্ত নরনারীর সমাগম হয় এবং ২০।২২ হাজার ব্যক্তি খিচুড়ি প্রসাদ পান।

৩রা শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ও কথকতায় মহাভারতের পর গীতা ব্যাখ্যা করেন স্বামী চিৎসুখানন্দ। অপরাহ্নে জনসমাবেশে ভাষণ দেন স্বামী স্বপ্রভানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ এবং সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দজী। সন্ধ্যায় হাওড়া কাসুন্দিয়া মায়ের মন্দির কর্তৃক চণ্ডীগীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

৪ঠা শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্টি পরিষদ কর্তৃক 'প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' পরিবেশিত হয়। স্বামী দেবানন্দের কথামৃত পাঠ ও আলোচনা, স্বামী উমানন্দের উপনিষদ্-ব্যাখ্যা এবং শ্রীসুকুমার মিত্র ও শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের ভক্তিগীতি হয়। সন্ধ্যায় সালিখা বীণাপাণি সমিতি কর্তৃক 'পাণ্ডব গৌরব' যাত্রাভিনয় হয়।

স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে (বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠে) গত ২২শে পৌষ ১৩৮২, ইং ৭ই জানুআরি ১৯৭৬, বুধবার, শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর শুভ জন্মতিথি মঙ্গলারতি পূজা হোম চণ্ডীপারায়ণ জীবনী-আলোচনা ও ভজনকীর্তনাদির মাধ্যমে পালিত হয়। পূর্বাহ্নে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০ জন সাধু ও ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। সমগ্র দিনে প্রায় ১০০০ দর্শনার্থীকে হাতে হাতে খিচুড়ি ফল মিষ্টি প্রভৃতি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন ভবনে সারদানন্দ হলে প্রায় দুই শতাধিক ভক্তের সমাবেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট স্বামী কৈলাসানন্দ মহারাজ পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন। সমাপ্তি-সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীভূপেন চক্রবর্তী।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১১৪তম জন্মতিথি গত ৯ই মাঘ, ১৩৮২ (২৩. ১. '৭৬) শুক্রবার বেলুড় মঠে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ পূজা হোম ভজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ কালীকীর্তন এবং আলোচনা-সভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রভাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্র ও ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া মঠের মন্দিরসমূহ পরিক্রমা করে। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত বিরাট ধর্মসভায় উদ্বোধন সঙ্গীত ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের স্বাগত ভাষণের পর শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী অসক্তানন্দ ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ (সভাপতি) সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।*

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—যদিও ঈশ্বর সর্বত্র রয়েছেন, তথাপি ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা। আজকের ভক্ত সমাবেশে, এই শুচি-শুভ্র বৈঠকখানায় আসতে পেরে আমরা পরম ভাগ্যবান।

পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে একবার স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে

* ভাষণ তিনটি শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত ও শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। অনুলিখিত ভাষণগুলি সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত। দ্বিতীয় ভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।—সঃ

আলাপ করতে এসেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন: 'আমার দেশের একটি কুকুরও যতদিন অভুক্ত থাকবে, ততদিন সেই কুকুরকে আহার্য প্রদান করাই আমার একমাত্র ধর্ম। আর সব-কিছুই অধর্ম।' পণ্ডিত সখারাম ও তাঁর বন্ধুদ্বয় স্বামীজীর অগাধ স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর হতে চলল ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন ক'রে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আজ মূল্যায়ন করার সময় এসেছে—আমরা স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম কিভাবে কতদূর গ্রহণ করতে পেরেছি। স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত-ভিত্তিক। নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল বিবেকানন্দের বাণীগুলি পড়ে, আত্মসাৎ ক'রে, স্বামীজীকে আত্মিক গুরুরূপে (Spiritual Father of Indian National Movement) গ্রহণ ক'রে। শ্রীঅরবিন্দও স্বামীজীকে ভারতীয় নবজাগরণের হোতা মন্ত্রদ্রষ্টা বলেছেন। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন: The Queen of his (Swamiji's) adoration was his Mother-land—স্বামীজীর আরাধনার রানী ছিলেন তাঁর জন্মভূমি। তাঁর প্রাণের সঙ্গীত ছিল স্বাধীনতা—দৈহিক, বৌদ্ধিক, অর্থনীতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। স্বামীজী সমগ্র জাতির সামনে মুক্তির এক সর্বাত্মক আদর্শ তুলে ধরলেন। বললেন, ধর্মই ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মূল সুর। এই আধ্যাত্মিক আদর্শকে শক্ত ক'রে ধরে থেকে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যার অগ্রগতির দিকে চলতে হবে। বেদান্তই পৃথিবীর সর্বজনীন ধর্ম। নিজে মানুষ হও, নিজের দেবত্বকে পরিস্ফুট কর এবং পরকে মানুষ করতে, পরের দেবত্বকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য কর। প্রত্যেকের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম রয়েছেন। স্বামীজী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, সমাজতন্ত্রের মূল কথা জোর গলায় বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বীর্য বা শক্তি, বৈশ্যের সহযোগিতা এবং শূদ্রের সাম্য বা সমবায়-নীতির একটা সমন্বয়-সাধন, তাহলেই ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন যথার্থরূপে সার্থক হবে। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী— শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় দুর্গতির সর্বরোগহর ঔষধ। শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে—নিরক্ষরকে সাক্ষর, অবনতকে উন্নত, নিদ্রিতকে জাগ্রত করতে হবে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। স্বামীজী চেয়েছিলেন সমস্ত দেশকে আগে আধ্যাত্মিকতায় প্লাবিত ক'রে দিতে, কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সবরকম শক্তি দেবে—দেবে আত্মবিশ্বাস অভয় ও সর্বজীবে প্রেম। কবির ভাষায় বার বার প্রার্থনা করি: 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।'

স্বামী অসক্তানন্দ বলেন: স্বামীজী এত বড় ছিলেন যে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে বড় কঠিন। যা হোক্, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো আমি বিভিন্ন সময়ে উক্ত স্বামীজীর বাণী উদ্ধার করে তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ পূজা নিবেদন করব। তাঁর বাণীগুলি আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতেও সত্য, আর সেই সঙ্গে বর্তমানের কোন কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবণতা যে প্রায় ৮৩ বৎসর পূর্বে উক্ত স্বামীজীর চিন্তাধারারই অনুরূপ—সে-সম্পর্কে কিছু বলব।

স্বামীজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর ভাষণের মাধ্যমে মানুষের সমগ্র চিন্তাজগতে এক দারুণ আলোড়ন এনে দিয়েছিলেন। ধর্মমহাসম্মেলনের পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক

মিঃ রাইট বলেন: স্বামীজী, আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ বিকিরণের কি অধিকার আছে জিজ্ঞেস করা একই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসার আগে নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলেন। এর ফলে তিনি সংশয়বাদী হয়ে পড়েছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠানাদির প্রতি তাঁর তেমন বিশ্বাস ছিল না বলা যায়। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান এবং একই সঙ্গে চাইতেন সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে। তিনি ঈশ্বর দর্শন বা আত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেই তিনি সত্যলাভ করেন, ঈশ্বর দর্শন করেন। তাঁর সর্বদা সমাধিতে ডুবে থাকার বাসনা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধিক্কার এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব-উক্ত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র তত্ত্ব তাঁকে যে নবীন জীবনাদর্শের ইঙ্গিত দিয়েছিল, উত্তরকালে তিনি সে-আদর্শই 'কর্মে পরিণত বেদান্তদর্শনে'র বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছেন: 'প্রথম পূজা বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের পূজা; এঁদের পূজা করতে হবে—"সেবা" নয়। সেবা বললে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাবে না; "পূজা" শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়।'—এই আদর্শেই স্বামীজী মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেবল স্কুল কলেজ হাসপাতাল খোলাই নয়, মূলতঃ কোন সামাজিক আন্দোলনও নয়—এটি ছিল একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। কারণ, এতে সাংসারিকতা কিছুমাত্র নেই—সর্বত্র আত্মদৃষ্টি—ঈশ্বরই সর্বময় হয়ে রয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্যই স্বামীজী তাঁর মিশন আরম্ভ করেছিলেন। একারণে, এই আদর্শ তিনি কেবল পাশ্চাত্যেই নয় প্রাচ্যেও প্রচার করেছেন: 'আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান— এদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এই-ই ধর্মের পূর্ণ রূপ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এর গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।'

আজকের দিনে সবচাইতে দুঃখের কথা এই যে, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও আমরা নিজেদের রক্ত-মাংসের একটি পিণ্ড বলে মনে করি। আমরা আত্মা—ব্রহ্ম স্বয়ং—এই-ই আমাদের সত্যকার পরিচয়। স্বামীজীর মতে 'আত্মা, মন ও শরীর—তিনটি পৃথক্ বস্তু নয়—একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলে প্রতীত হয়।'—যখন সেই এককে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখি, তখন দেহরূপে; যখন বুদ্ধির মাধ্যমে বোধ করি তখন মনরূপে; যখন আত্মার মাধ্যমে অনুভব করি, তখন ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করি। এই একত্বের তত্ত্বটি এবং সাংখ্যীয় প্রাকৃতিক ক্রমসংকোচ ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব বর্তমানের বিজ্ঞানিগণ নানাভাবে প্রকাশ করছেন। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর যে ঐক্যবোধ বেদান্তের মৌল তত্ত্ব—যা স্বামীজী ৮৩ বৎসর আগে বলেছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ তা স্বীকার করতে চলেছেন।

স্বামীজী বেদান্তের একত্বকেই আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে সূচিত করেছিলেন—বিশ্বভ্রাতৃত্ব নয়। কারণ, সবই যে এক আত্ম-সত্যে বিধৃত। আসুন, এই বিশ্বাসে আমরা দৃঢ়বদ্ধ হই যে, আমরা সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ এবং মানবজীবনের

উদ্দেশ্যই হল ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, যিনি শুধু স্বয়ংই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেননি, অন্যকেও ব্রহ্মাববোধে সহায়তা করেছেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীশঙ্কর ঘোষ বলেন:

স্বামীজী ধর্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে একটা নতুন জোয়ার এনেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে যাঁরা ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা শুধু ধর্মের মানুষ নন; সাধারণ মানুষ যাঁরা ধর্ম খুব ভাল জানেন না, খুব ভাল বোঝেন না, তাঁরাও স্বামীজীকে গ্রহণ করেন, স্বামীজীর পথ অনুসরণ করার কথা চিন্তা করেন। স্বামীজী সাধারণ মানুষের জন্য এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ যখন এসেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে এক অন্ধকারময় যুগ চলছিল। তখন বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষে রয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষ তার প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছিল। জাতি তখন এক মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছিল, ভারতের যা ঐশ্বর্য ছিল, তা তারা ভুলে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে ভারতবর্ষের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী চিকাগোতে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ঐশ্বর্যের কথা ঘোষণা করলেন। ফলে সারা পৃথিবী আলোড়িত হ'লো। আমেরিকার তখনকার সংবাদপত্রগুলি লিখল—আমরা এই ধর্মবীরের কথা শুনে বুঝতে পারছি, আমরা খৃষ্টানরা কত ভুল করি পাশ্চাত্য দেশ থেকে মিশনারী ভারতবর্ষে প্রেরণ ক'রে। স্বামীজী আমেরিকায় ও ইউরোপে ভারতবর্ষের বেদান্ত প্রচার ও ব্যাখ্যা করলেন। দেশে ফিরে এসে বীরোচিত সংবর্ধনা পেলেন, কিন্তু স্বামীজীকে ভারতবর্ষের মানুষ স্মরণ করে, কারণ তিনি সাধারণ মানুষের কথা বলেছিলেন—দীন দরিদ্র মানুষের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেননি,—ধর্ম এমন একটি জিনিস যা মন্দিরের ভিতরে স্থাণু। তিনি বলেননি—ধর্ম এমন একটি জিনিস যা মন্ত্রের ভিতরে শৃঙ্খলিত। তিনি বলেননি ধর্ম কোন একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেছিলেন, ধর্মে প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। প্রত্যেকের দেবত্ব স্বীকার করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। এইটি ভারতবর্ষের চিন্তা, এইটি ভারতবর্ষের ধারণা। মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবার কথাও স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। তিনি শূদ্রের জাগরণের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। তিনি বলতেন—খালিপেটে ধর্ম হয় না, অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকলে সুস্থ শরীরে ও মনে ভগবানের ঠিক ঠিক ধ্যান ধারণা হয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নিজের মুক্তির চেষ্টার চেয়ে অপরের কল্যাণ করা মহত্তর কাজ। জনসাধারণের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, অন্নের সংস্থান, এগুলি হচ্ছে ধর্মের বড় কাজ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা বলেছেন। আমাদের দেশে অনেক সমস্যা আছে। সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন দরকার। এই সব পরিবর্তন দেশের জনগণই করবে। তাই স্বামীজী বলেছেন, Man-making is my mission—মানুষ তৈরি করা আমার জীবনব্রত, আমার আদর্শ, আমার ধর্ম।

ভারতবর্ষ ধর্মের ক্ষেত্রে যে উচ্চতম চিন্তা করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তা হয়নি। কিন্তু ভারতের সমাজে যেসব গলদ আছে সেগুলি দূর করতে না পারলে আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে পারব না।

রামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা

গত ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৫ বৈকালে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর

সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। মঠের ট্রেনিং সেণ্টারের ব্রহ্মচারীদের মঙ্গলাচরণের পর স্বামী গীতানন্দ গত বৎসরের সভার বিবরণী পাঠ, স্বামী আত্মস্থানন্দ আলোচ্য বৎসরে পরলোকগত সভ্যদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গভর্নিং বডির ১৯৭৪-৭৫ সালের রিপোর্ট পাঠ করেন। সভার অন্যান্য কর্মসূচী সমাপনান্তে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও শ্রীকালীপদ সেন ভাষণ দিবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতির ভাষণ ও শ্রীমৃগেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সমাপ্তি-সঙ্গীতের মাধ্যমে সভা শেষ হয়। ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সভাপতির ভাষণে বলেন, "...গভর্নিং বডির রিপোর্ট থেকে আপনারা শুনলেন, গত বছর কাজ আমরা অনেক করেছি, কাজ অনেক বেড়েছে আগের চেয়ে। কিন্তু কাজের এই দিকটা নিয়ে আমাদের গৌরববোধ করার কিছু নেই। আমাদের কাজের অন্য একটা দিক আছে—কি ভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি—এবং সেইটাই হল আমাদের কাজের আসল দিক, আসল লক্ষ্য।...চাহিদা অনুযায়ী কাজ আমাদের এখনো বাড়ানো দরকার, কিন্তু লোকাভাবের জন্য তা হয়ে উঠছে না। সমাজ থেকে স্বামীজীর কাজ করার জন্য আরো বেশী ক'রে লোক আসা দরকার।...

"স্বামীজী বলে গেছেন, সারা ভারতকে আধ্যাত্মিকভাবে আগে প্লাবিত করতে হবে, বাকী সব পরে আপনি হবে। ত্রাণকার্যাদির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে লোকের ভেতর আধ্যাত্মিক ভাবের অনুপ্রবেশ করানোই তার চেয়ে বড় কাজ, আসল কাজ। স্বামীজী সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শানুগ ভাবেই তিনি ভারতকে জাগাবার জন্য, উন্নত করবার জন্য আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলে গেছেন। শুধু ভারত নয়, সারা জগৎই অবলম্বনের জন্য আজ একটি আদর্শ চাইছে; সে-চাহিদা মেটাতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ। আমরা যেন সে-আদর্শ নিজ জীবনে রূপায়িত ক'রে অপরকেও তাতে অনুপ্রাণিত করতে পারি—শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে এই প্রার্থনা করি।"

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন, "রিপোর্ট থেকে শুনলেন, আলোচ্য বছরে নরনারায়ণের সেবায় আমরা কত খরচ করেছি, কতভাবে সেবা করেছি—এতে আমাদের তৃপ্তি বোধ করার কারণ আছে। তবে কাজের পরিমাণ দিয়ে আমাদের কাজের মান নির্ণয় হয় না। কাজ করার সময় কতখানি আদর্শনিষ্ঠ হয়ে আমরা তা করতে পেরেছি, সেইটাই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পরিস্ফুট ও তৎকর্তৃক প্রচারিত বেদান্তের আদর্শই আমাদের আদর্শ। সারা জগতে ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের আদর্শ কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখিয়েছেন। সেই আদর্শেই আমরা চলছি, সেই আদর্শ রূপায়ণেরই চেষ্টা করছি—ভগবানজ্ঞানে মানুষের সেবা ক'রে। আমাদের সেবা নিজেদেরই সাধনা, নিছক সমাজসেবা নয়।

"আজ সারা জগতে, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্যে মানুষ উদ্দেশ্যবিহীন, আদর্শবিহীন হয়ে পড়েছে। যা কিছু অশান্তি, আমাদের দেশের যুব-অশান্তিও সেই কারণেই। রামকৃষ্ণ মিশনকে সে-আদর্শ দিতে হবে—যা বেদান্ত-ভিত্তিক বলে আধুনিক বিজ্ঞানের সামনেও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে। স্বামীজী বলেছেন—ভারত আধ্যাত্মিকতা দিয়ে জগৎ জয় করবে। ভারতকে তা-ই করতে হবে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন স্বামীজী আমাদের ওপর যে-কাজের ভার দিয়ে গেছেন, তা

সম্পূর্ণ হবে না। আমাদের অন্তরের বল যতদিন ঠিক থাকবে, ততদিন আমরা ঠিক থাকবো, স্বামীজীর কাজ সমাধা করার পথে এগিয়েই যাব।"

শ্রীকালীপদ সেন বলেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত থাকাই পরম সৌভাগ্য—যে-সৌভাগ্যের অধিকার স্বামীজীই আমাদের দিয়ে গেছেন। আপনারা শুনলেন আমাদের মিশনের কাজ বাড়াবার প্রয়োজন আছে—সমাজের বহু সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে, তা সমাধানের চেষ্টা আমাদের যথাসাধ্য করতে হবে।

"অনেকে মনে করেন ভারতে ও পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বাণীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে একথা যে কতখানি অর্থহীন তা আপনারা জানেন। স্বামীজী প্রাচীন এবং আধুনিক সর্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সর্ববিধ আধুনিক সমস্যার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন, সেগুলির সমাধানের পথও তিনি দেখিয়ে গেছেন। সেই পথই আধুনিক জগতের মানুষের যথার্থ উন্নতির পথ। তিনি আদর্শ মানুষের ওপর জোর দিয়েছেন, বলেছেন টাকার জন্য কাজ আটকাবে না। আজ প্রার্থনা করি—শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমরা যেন তাঁর কাজের যথার্থ যোগ্যতা লাভ ক'রে, তাঁর কাজ ক'রে ধন্য হতে পারি।"

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৪-৭৫ সালের কার্যবিবরণী

(২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৫, বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত **গভর্নিং বডির** প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ)

বন্ধুগণ, আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৪-৭৫-এ কৃত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের কাছে সবিনয়ে উপস্থাপিত করিতেছি। আমাদের প্রভু ও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তাঁহারই মিশনের যাত্রাপথে আমরা আরও একটি অগ্রগতির পথচিহ্নকে সাফল্যের সহিত অতিক্রম করিয়াছি এবং ইহা করিতে গিয়া আমাদিগকে বহুবিধ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আশীর্বাদ অভেদ্য বর্মের মত আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, মিশনের কর্মধারার সকল ক্ষেত্রেই সংহতি, অগ্রগতি ও উন্নতি হইয়াছে। নিরাপত্তামূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের কল্যাণকর পরিবর্তনকে সাধুবাদ জানাই যে, পূর্ব পূর্ব বৎসরে কর্তব্যনির্বাহের পথে আমাদিগকে যে সকল সঙ্কট ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা আলোচ্য বর্ষে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। অবশ্য, ইনস্টিটিউট অব কালচার ও পলিটেকনিকগুলির মত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কিছু অশান্তি ছিল, কিন্তু অতীত কয়েক বৎসরের তুলনায় ঐগুলি ছিল সেই সকল স্থানেই সীমাবদ্ধ।

রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবেশে এই কল্যাণকর পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের দেশে এবং আমাদের সমাজে যে বিরাট পরিবর্তন আসিতেছে তাহার সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। শিক্ষা ও দাতব্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সরকার-প্রবর্তিত অধিক নিয়ন্ত্রণ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিবিধ কর্মধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের বিষয় আমাদিগকে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সমস্যাগুলির সম্পর্কে আমরা অবহিত এবং আমরা জানি আমাদের কাজ নিঃস্বার্থপরতার উপরেই আধারিত। এবং এইভাবেই আমরা মানবসেবারূপ কর্ম চালাইয়া যাইতে পারিব, যদিও প্রয়োজন হইলে আমাদিগকে হয়ত কর্মের রূপ ও পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হইতে পারে।

বর্তমান বৎসরে, ১৯৭৫-৭৬ সালে, বাংলাদেশে

এক রাজনৈতিক আলোড়ন হইয়াছে। প্রথম কয়েকদিন আমাদের কেন্দ্রগুলির ভবিতব্যতার সম্পর্কে আমাদিগকে ভয়ানক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেখানে আমাদের কাজ অব্যাহতগতিতে চলিতে পারিবে জানিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এতৎ-সত্ত্বেও এক অনিশ্চয়তার ভাব সে-দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমাদের সবদিকে নজর রাখিয়া সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত ত্রাণকার্য ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী কাজ করিয়া যাইতেই হইবে। আমরা যেহেতু কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হইয়া কেবল সে-দেশের জনগণের মঙ্গলস্বার্থে তাহাদের সেবা করিতেছি, আমরা আশা করি যে, আমাদের কাজ নির্বিঘ্নে চলিতে থাকিবে। যে-কোন স্থানেই আমাদের রাখুন না কেন, প্রার্থনা করি, প্রভু যেন তাঁহার মিশন-কর্ম নির্বাহ করিতে আমাদের সাহস ও বিশ্বাস দেন।

সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ

আমাদের কর্মকে সংহত ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিষ্ঠানসমূহকে অপরিকল্পিত-ভাবে বাড়িয়া উঠিতে না দেওয়াই মিশনের নির্ধারিত নীতি। তৎসত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষে নিম্নে বর্ণিত নূতন কার্যাবলী হাতে লওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়:

মেদিনীপুরে একটি প্রার্থনা-কক্ষের উদ্বোধন করা হয় এবং কলিকাতা ইনস্টিটিউট অব কালচারের ইউনিভারসাল টেম্পলটি আবার খোলা হয়। নরোত্তমনগরের বিদ্যালয়-ভবনটির ভিত্তি স্থাপন এবং কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেবিকা-দিগের বাসভবনে ষষ্ঠতলটি সংযুক্ত করা হয়। ফিজি দ্বীপের Nadi-তে রজত জয়ন্তী স্মারক বাড়ীটির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সদস্য ও কর্মকর্তৃগণ

স্বামী গীতানন্দের অন্যতম সহকারী সম্পাদক-পদে নির্বাচন এবং স্বামী সমুদ্ধানন্দের দেহত্যাগ ব্যতীত পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ও কর্মকর্তৃগণ আলোচ্য বর্ষে অপরিবর্তিতই ছিলেন। দেহত্যাগ ও বার্ধক্যের জন্য ১৯৭৫-এর এপ্রিলে পরিচালক মণ্ডলীর কর্মকর্তৃগণের কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হইয়াছিল। স্বামী নির্বাণানন্দের অতিরিক্ত স্বামী ভূতেশানন্দ ও স্বামী কৈলাসানন্দ ভাইস-প্রেসিডেন্ট রূপে বৃত হন। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও স্বামী আত্মস্থানন্দ সহকারী সম্পাদক এবং স্বামী গীতানন্দ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত ১২ জন সন্ন্যাসী ও ৪ জন ভক্ত গৃহী সদস্যের দেহত্যাগ লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই বৎসরের শেষে মিশনের সন্ন্যাসী ও গৃহী সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ৩৫৮ ও ৩৭৩।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে বেলুড় মঠস্থিত প্রধান কার্যালয় ব্যতীত মিশনের ৭৫টি শাখাকেন্দ্র ছিল, তন্মধ্যে ৭টি বাংলাদেশে, ১টি করিয়া কেন্দ্র ছিল ব্রহ্মদেশ ফ্রান্স ফিজি সিঙ্গাপুর শ্রীলঙ্কা ও মরিসাসে এবং অবশিষ্ট ৬২টি ভারতে। লক্ষ্য করিতে হইবে, ভারতে ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত যে ৬৫টি কেন্দ্র আছে উহাদের বিস্তারিত কার্যাবলী এই বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক আচরিত ও উপস্থাপিত এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও স্বীয় জীবনে প্রদর্শিত বেদান্তভিত্তিক নিষ্কাম সেবাই মিশনের কর্মক্ষেত্র। এই সেবাপ্রচেষ্টাকে মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা যায়—(১) ত্রাণ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রচার এবং (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্য।

ত্রাণকার্য: বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজটি ১৯৭২ সালের ফেব্রুআরিতে আরম্ভ হইয়া

আলোচ্য বর্ষেও অব্যাহত থাকে। কাজের ধারা ছিল— বাড়ী তৈরি করানো, নলকূপ বসানো, খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি বিতরণ, চিকিৎসা-বিষয়ক সাহায্যদান ইত্যাদি। মিশন এই কার্যটি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, বরিশাল, দিনাজপুর, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ এবং বালিয়াটিতে অবস্থিত মঠ ও মিশনের কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্বাহ করে। সর্বমোট প্রায় ৭৭,৯২২টি পরিবারের ৩,০৯,৪৩০ জন নানাধরনের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে মোট খরচ হইয়াছে ৫,৯১,০৬৯'৪৮ টাকা। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৩২,৮১.৬০৫ টাকা মূল্যের নানাবিধ সামগ্রী অভাবগ্রস্ত লোকেদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

ভারতেও নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের যে-সকল ত্রাণকার্য শাখাকেন্দ্রগুলির সহায়তায় করা হয় তাহাতে ৮৩,৯০৭টি পরিবারের ২,১৭,৩০০ জন সাহায্য লাভ করে এবং মোট খরচ পড়ে ১৪,৩৭,৬২০'০৯ টাকা।

(ক) বন্যাত্রাণ—(১) কাঁথি সেবাশ্রম কর্তৃক মেদিনীপুরে, (২) রহড়া বালকাশ্রম কর্তৃক কুচবিহারে, (৩) সারদাপীঠ কর্তৃক পশ্চিম দিনাজপুরে, (৪) কাটিহার আশ্রম কর্তৃক মনিহারীতে, (৫) পাটনা আশ্রম কর্তৃক দ্বারভাঙ্গা ও লাহেরীসরাইতে এবং (৬) বেলুড় মঠ মূলকেন্দ্র কর্তৃক ধুবড়িতে।

(খ) খরা পীড়িতদের জন্য সরাইখানা—(১) বাঁকুড়া জয়রামবাটী এবং রামহরিপুর কেন্দ্র কর্তৃক বাঁকুড়া জেলায়, (২) রহড়া বালকাশ্রম কর্তৃক কুচবিহারে, (৩) জলপাইগুড়ি আশ্রম কর্তৃক জলপাইগুড়িতে, (৪) মনসাদ্বীপ আশ্রম, নরেন্দ্রপুর আশ্রম, সরিষা আশ্রম ও রহড়া বালকাশ্রম কর্তৃক ২৪ পরগণায়, (৫) কাঁথি সেবাশ্রম ও তমলুক সেবাশ্রম কর্তৃক মেদিনীপুরে এবং (৬) পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ কর্তৃক পুরুলিয়ায়।

(গ) খাদ্যাভাবত্রাণ—(১) বাঁকুড়া সেবাশ্রম কর্তৃক বাঁকুড়া জেলায়, (২) মনসাদ্বীপ আশ্রম কর্তৃক ২৪ পরগণায়, (৩) রায়পুর আশ্রম কর্তৃক রায়পুরে এবং (৪) রাজকোট মঠ-কেন্দ্র কর্তৃক গুজরাতে।

(ঘ) স্বল্পব্যয়ে খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র—(১) কাটিহার আশ্রম কর্তৃক কাটিহারে এবং (২) মালদহ আশ্রম কর্তৃক মালদহে।

(ঙ) অগ্নিত্রাণ—ভুবনেশ্বর আশ্রম কর্তৃক ওড়িশাতে।

(চ) কাজের বিনিময়ে ত্রাণ—রামহরিপুর আশ্রম কর্তৃক বাঁকুড়া জেলায়।

শাখাকেন্দ্রগুলি যে স্ব স্ব অঞ্চলে দরিদ্রদের নগদ অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া নিয়মিত সাহায্য করিয়াছে, এখানে সে-বিষয়ে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেলুড় মঠস্থিত প্রধান কার্যালয় হইতেও মূল্যবান কাজ করা হইয়াছে—৮০টি পরিবার ও ৩৩২ জন ছাত্র নিয়মিতভাবে এবং ২৪৭টি পরিবার ও ২১০ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। ইহাতে খরচ হইয়াছে মোট ৫৪,৫৮২'৫২ টাকা। মিশন অভাবগ্রস্তদের মধ্যে কিছু বস্ত্রাদিও বিতরণ করিয়াছে।

চিকিৎসা: ভারতের অধিকাংশ মিশনকেন্দ্রই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কতকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও আউটডোর ডিসপেন্সারি পরিচালনা করে। আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৮টি হাসপাতালে মোট ১,২৭৫টি শয্যায় ৩৩,৪৮০ জন এবং ৫৮টি আউটডোর ডিসপেন্সারিতে ৩১,৯০,৬২৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন। রাঁচি সেনাটোরিয়ামের ২৮০টি শয্যায় এবং নিউ দিল্লীস্থিত পর্যবেক্ষণ শয্যাগুলিতে কেবলমাত্র যক্ষ্মারোগীর পরিচর্যা করা হয়। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি শুশ্রূষা ও ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষণ শিক্ষালয় যথাপূর্ব পরিচালনা করিয়াছে। ইহাতে 'সাহায্যকারী'

ও 'সাধারণ'—এই দুই শাখাতে মোট শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ছিল ২০৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেবাপ্রতিষ্ঠানকে স্নাতক ডিপ্লোমা পাঠক্রম পর্যন্ত শিশুস্বাস্থ্য, স্ত্রীরোগবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা পড়াইবার স্বীকৃতি দিয়াছে।

মঠকেন্দ্রগুলির ৫টি হাসপাতালে ৩৩১টি শয্যায় মোট ১৩,০৮১ জন এবং ১৬টি আউটডোর ডিসপেন্সারিতে ৫,৫৪,৭৯৯ জন রোগী চিকিৎসিত হয়; তাহা ছাড়া প্রায় ৩০ জন নার্স শিক্ষিতা হন।

শিক্ষা: আলোচ্য বর্ষে মিশন পরিচালনা করিয়াছে: ৫টি সাধারণ কলেজ, ২টি বি. এড্. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক্ ট্রেনিং কলেজ, ৪টি জুনিয়র বেসিক্ ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট, ১টি বেসিক্ ট্রেনিং স্কুল, ১টি শারীরশিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি বিদ্যালয়, ৪টি পলিটেকনিক, ৮টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও শিল্প বিদ্যালয়, ৭৭টি বিদ্যার্থি-ভবন, ছাত্রাবাস ও অনাথাশ্রম, ১টি চতুষ্পাঠী, ৩৫টি বহুমুখী, মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৫টি অন্যান্য স্তরের বিদ্যালয়, ৩৮টি প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র বা কমিউনিটি সেণ্টার, ১টি অন্ধ বালকদের শিক্ষা-নিকেতন, ২টি বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১টি ভাষা শিক্ষা বিদ্যালয় এবং ১টি মানবিক ও আন্তঃ-সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৯,৫৭৭; তন্মধ্যে ৫০,০০০ জন ছাত্র ও ১৯,৫৭৭ জন ছাত্রী।

মঠ-কেন্দ্র পরিচালিত ২৬টি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫,৯৮২।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার:

এই বিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, নৈমিত্তিক প্রদর্শনী, সাধারণ উৎসব, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাস, বক্তৃতা ও সেমিনারগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকটি কেন্দ্রের প্রকাশন বিভাগও উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা ইনস্টিটিউট অব কালচার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বহুসংখ্যক বৃহৎ প্রকাশন-কেন্দ্র ও মন্দিরসমূহের পরিচালনা দ্বারা এবং বক্তৃতা ও আলোচনাদির ব্যবস্থা করিয়া মঠকেন্দ্রগুলি যে ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশনার কার্য করিতেছে আমরা এই স্থলে তাহা অন্তর্ভুক্ত করি নাই।

গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য:

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা অনুসারে মিশন তাহার সীমিত সঙ্গতি ও লোকবল লইয়া ভারতের বিভিন্ন অংশের গ্রামাঞ্চলে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলেও দরিদ্র ও অনুন্নতদের সেবাকার্য চালাইয়া আসিতেছে। মিশনের চিকিৎসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও অনগ্রসর লোকের সেবা করা হয়। একের পর আর ক্ষিপ্র-গতিতে পরিচালিত ত্রাণকার্যসমূহ দুঃস্থ ও অনুন্নত জনগণের সাহায্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হয়। এবং বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলি সহস্র সহস্র লোককে জীবনের উচ্চতর ভাব ও আদর্শসমূহের সংস্পর্শে আনে। গ্রামাঞ্চলে সেবার প্রসঙ্গে বলা যায়, কমপক্ষে দশটি বৃহৎ কেন্দ্র গ্রাম ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলেই অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলির এবং শহরাঞ্চলের অন্যান্য কেন্দ্রেরও মাধ্যমে গ্রামবাসী ও অনুন্নতদের স্বার্থে পরিচালিত হইয়াছে: ১৪৮টি বিদ্যালয়, তন্মধ্যে ৯টি বহুমুখী, ৪টি মাধ্যমিক, ৪৭টি সিনিয়ার বেসিক্, জুনিয়র বেসিক্, উচ্চ মাধ্যমিক এবং মধ্য ইংরাজী, ৪৫টি নিম্নতর প্রাথমিক, ৩৫টি প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাক্ষর ও কমিউনিটী কেন্দ্র, ১৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়; বহু-সংখ্যক গ্রন্থাগার তন্মধ্যে ৩টি ভ্রাম্যমাণ, ১০৮টি দুগ্ধ-বিতরণ-কেন্দ্র; ১০টি চলচ্চিত্র ইউনিট; ৬টি কারিগরি শিক্ষণ-কেন্দ্র; ১টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণ-কেন্দ্র ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ৫টি ভ্রাম্য-মাণ ডিসপেন্সারি ৯০, ২৩ জন রোগীর

চিকিৎসা করিয়াছে। রাঁচি আশ্রম-পরিচালিত আবাসিক যুব প্রতিষ্ঠান 'দিব্যায়ন' কৃষি, হাঁস-মুরগী-পালন, গো-পালন ইত্যাদি শিক্ষণ-প্রকল্পের মাধ্যমে এবং অন্যান্য নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে উপজাতিদের মধ্যে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে। গ্রামীণ যুবকদের আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য নরেন্দ্রপুরেও একটি কেন্দ্র আছে। শিলচর আশ্রম কুকী, মিজো ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে বহুবিধ জনহিতকর কার্য করিয়াছে। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি কেন্দ্র এবং অরুণাচল প্রদেশের আলং ও নরোত্তমনগর কেন্দ্রদ্বয় শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসা বিষয়ক কার্যাদি করিয়া আসিতেছে এবং এই কারণে উক্ত কেন্দ্রগুলি উপজাতীয় অধিবাসীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। এই স্থলে রায়পুরের পঞ্চায়তি রাজ শিক্ষণ-কেন্দ্র এবং নরেন্দ্রপুরের গ্রাম-পর্যায়ে কর্মি-শিক্ষণ-কেন্দ্রের (Village Level Workers' Training Centre) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদেশে কার্য

ব্রহ্মদেশ, ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিসাসের মিশন কেন্দ্রসমূহ যথাপূর্ব শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও অধ্যাত্মিক সেবাকার্য করিতেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ইংলণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডস্থিত ১৫টি মঠকেন্দ্রও অনুরূপ কার্য করিতেছে।

বাংলাদেশে ১০টি মঠ ও মিশন কেন্দ্র আছে। তন্মধ্যে ঢাকা, দিনাজপুর, বাগেরহাট ও শ্রীহট্ট কেন্দ্র নিয়মিত পূজা ও প্রচারকার্য ব্যতীত পাঠাগার, ছাত্রাবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও তাহাদের সামর্থ্যানুসারে জনহিতকর সেবাকার্য করিতেছে।

উপসংহার

উপরে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এটি একটি ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান—বৎসরে বৎসরে ইহার সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি হইতেছে। ইহা আপনাদের সকলের অকুণ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সহায়তায় এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের শাশ্বত আশীর্বাদের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। আমরা বিনম্র হৃদয়ে তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদিগকে তাঁহাদের সুযোগ্য যন্ত্র করিয়া লন, যাহাতে আমরা তাঁহাদের সঙ্ঘের সেবা ভবিষ্যতে আরো ভালভাবে করিতে পারি

বিবিধ সংবাদ

ভিত্তিস্থাপন

রাজারহাট বিষ্ণুপুর ঃ রামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে গত ২১শে অগস্ট ১৯৭৫, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ ঈশ্বরকোটি স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী গহনানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

ভজন, কথামৃতপাঠ, বিশেষ পূজা এবং ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী গহনানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় স্বামী চিৎসুখানন্দ, স্বামী স্বত্যানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ প্রভৃতি পূজ্যপাদ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন। সভায় মন্দির, সভাগৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয়, পুস্তকাগার, অতিথিভবন প্রভৃতি নির্মাণের জন্য দুই লক্ষ টাকার এক আবেদন জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হয়।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন

[১ম বর্ষ।]   ১লা আশ্বিন। (১৩০৬ সাল)   [১৭শ সংখ্যা।]

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

সুজন বলিল, তুমি যে কার্য্য আদেশ করিবে, তাহা বিনা অর্থে সাধন করিব। তুমি বল তোমার নূতন ভাবের কারণ কি?

সুরদাস প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার কোন ভুল হয় নাই, তুমি যথার্থই নরঘাতীর চিহ্ন আমার মুখে দেখিয়াছিলে, যথার্থই একজনের প্রাণবধের নিমিত্ত বঙ্কার অনুসন্ধানে যাই, এখন তাহারই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তোমায় অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু কেন? এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা আমি আপনি বুঝিতেছি না,—তোমায় বলিব কি? যদি বুঝিতে পার, বোঝ।—আমি তোমায় সরল কথা বলিলাম। ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র পিতৃবিয়োগে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নারী জীবনের সার বস্তু বুঝিয়াছিলাম। ঐ সময় পিঙ্গলা আমার চক্ষে পড়ে। পিঙ্গলাকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সে বঙ্কার অনুরাগিণী। অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অনুরাগ ঘুরাইতে পারিলাম না। অকস্মাৎ একদিন দেখি, পিঙ্গলা কোথা হইতে একটী রোগী কুড়াইয়া আনিয়াছে। রুগ্ন শয্যায় বসিয়া কাঁদে, শুশ্রূষা করে। বঙ্কার নামও আর মুখে আনে না। আমায় স্পষ্ট বলে, মিনতি করে যে, সে রোগীর পদে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। আশ্চর্য্য কথা, সে বলে, তাহাকে চায় না, কেবল সে প্রাণে বাঁচুক, এই মাত্র তাহার কামনা। আমায় যথেষ্ট আদর করে, যেরূপে আমার মনস্তুষ্টি করিতে পারে, তাহার চেষ্টা পায়। কিন্তু তাহা দিন দিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আজ আমার সঙ্কল্প ছিল, বঙ্কার ঈর্ষা উত্তেজনা করিয়া, বঙ্কার দ্বারায় রোগীর প্রাণবধ করিব। বঙ্কাকে না পাইয়া পিঙ্গলার ঘরে আসিয়া দেখি, বঙ্কা তাহার সঙ্গী অম্বা, আর একটী দেবী মূর্ত্তি রমণী, এই মাত্র ঘটনা। কিন্তু এখন আর রোগীর প্রাণবধ করিতে চাই না। রোগী যাহাতে আরাম হয়, তাহাই আমার চেষ্টা যদি তুমি আরাম করিতে পার, প্রচুর অর্থ দিব।"

কসাই বলিল, "আচ্ছা যাও, কাল বলিব। তোমার ত এইখানেই দেখা পাইব?" সুরদাস বলিল, "বলিতে পারি না, আর হেতা আসিব কি না, জানি না; আমার নাম সুরদাস, বড় চকের ধারে বাড়ী। তথায় জিজ্ঞাসা করিলেই, আমার বাড়ী সকলে বলিয়া দিবে।" সুরদাস চলিয়া গেল। সুজন একবার ভাবিল, এই নূতন সুন্দরী—যাহাকে দেখিয়াছে, তাহার রূপে আসক্ত

---

* ভাদ্র, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

হইয়াছে। আবার ভাবিল,—না,—চলিয়া গেল কেন? পূর্ব্ব প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ বাঁচাইতে চায় কেন? না,—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সুজন সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পিঙ্গলার বাড়ী হইতে অম্বা-বম্বার সহিত মীরা বাহিরে আসিলেন। সুজন দেখিল,—স্থিরনেত্রে মীরার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বম্বা বলিয়া উঠিল, "এই যে সুজন!" সুজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে ওরে তুই ত অনেক ঔষধ জানিস, একটা রোগী আরাম করিতে পারিবি?" সুজন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছে। বম্বা বলিল, "ওরে ওরে কথা কস্‌নে কেন?" চমকিয়া সুজন জিজ্ঞাসা করিল, "বম্বা, এ মাগী কে-রে?" বম্বা উত্তর করিল, "হরিবোলা মাগী, জানিস্ নি?" সুজন মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" মীরা উত্তর করিলেন, "আমি তোমার মা।" সুজন বলিল, "সত্যি" ?

মীরা। হঁ্যা।

সুজন। বম্বা কাকে আরাম করিতে বলে, আরাম করিব কি?

মীরা। যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, আরাম কর।

সুজন। তোর কি ইচ্ছা বল্?

মীরা। আমি তাঁর দাসী, আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই।

সুজন। আচ্ছা। বম্বা আয়, রোগী কোথা দেখাইবি চল।

বম্বার সহিত সুজন পিঙ্গলার গৃহে গেল। এদিকে সসম্ভ্রমে রাজদূত আসিয়া মীরাকে বলিল, "মহারাণা আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ, কৃপা করিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

মীরা বলিলেন, "অম্বা তুমি এখন যাও, আমি রাজদর্শনে চলিলাম।" অম্বা যাইতে চায় না। তাহার মহা ভয় উপস্থিত,—রাণা, মীরার প্রাণবধ করিবেন। মীরা আবার বলিলেন, "যাও, কৃষ্ণ আমার সঙ্গে আছেন।"

অম্বা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। রাজ-শিবিকা পশ্চাৎ আসিতে লাগিল, পদব্রজে মীরা চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসা-বিদ্যায় সুজন সুদক্ষ। সে পিঙ্গলার নিকট রোগীর যে বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে স্থির করিয়াছে, এমন বিকার, ঔষধে বিশেষ উপকার হইবে না। সকলকে রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে পাঠাইয়া রোগীকে বলিতে লাগিল, "যে কার্য্যের নিমিত্ত বৈরাগীর ভেক ধরিয়াছিলে, শ্বাপদপূর্ণ ঝালবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, মুমূর্ষু অবস্থায় বনে পতিত, বেশ্যা দ্বারা রক্ষিত, রুগ্ন শয্যায় মুমূর্ষু, চিররোগী হইয়া পড়িয়া থাকিলে কি সে কার্য্য উদ্ধার হইবে? উৎসাহ ব্যতীত কোন কার্য সম্পন্ন হয় না। সবল হইবার চেষ্টা কর। একটু একটু আহার কর, একটু একটু করিয়া বেড়াও, তোমার আর রোগ নাই, কেবল কাহিল আছ।"

উৎসাহবাক্যে বীরেন্দ্র সিংহ উৎসাহিত হইল। উৎসাহে উঠিতে যায়, সুজন ধরিল, বলিল, "অত নয়, ক্রমে! ক্ষীণদেহে অত সহিবে না, ক্রমে।"

ক্রমে সুজনের চিকিৎসায় বীরেন্দ্র সিংহ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। পর্ব্বতচ্যুত হইয়া বনমধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়াছিল, পিঙ্গলা গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে, বীরেন্দ্র এখন অবগত। পিঙ্গলার যত্নে প্রাণদান পাইয়াছে, তাহাও বুঝিয়াছে। পিঙ্গলাকে বলিল, "তুমি আমার জীবনদাত্রী, আমি রাজপুত্র, তুমি কি চাও?" পিঙ্গলা উত্তর করিল, "কিছু না, যদি আরোগ্য হইয়া থাক, স্বদেশে ফিরিয়া যাও।" বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কিছুই চাও না? শুনিয়াছি তুমি বেশ্যা, অর্থের নিমিত্ত দেহ বিক্রয় কর, যত অর্থ চাও দিব।" পিঙ্গলা বলিল, "কিছুই চাই না।"

সুরদাস বীরেন্দ্রের আরোগ্যের কথা সুজনের নিকট শুনিয়াছে। অর্থ দিতে চায়, সুজন গ্রহণ করে না। সুজনকে একটী অনুরোধ করিয়াছিল যে, সুজনকে বীরেন্দ্রের চিকিৎসায় সে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা পিঙ্গলা না জানে। অপিচ সুজন মীরার কথায় বীরেন্দ্রের চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। তথাপি সে পিঙ্গলাকে বলে যে, সুরদাসের অর্থপ্রত্যাশায় সে চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। পিঙ্গলা ভাবে, "এ কি! আমি সুরদাসের পায়ে ধরিয়াছিলাম। পা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সে অবধি আর আমার বাড়ীমুখো হয় নাই। বলিয়াছে, 'রোগী মরে ত আমার কি?' কিন্তু তাহারই অর্থে বীরেন্দ্রের প্রাণরক্ষা হইল।" প্রেমিকা বেশ্যা, প্রেমের যন্ত্রণা বুঝিয়াছে। হরিনামে মন নির্ম্মল হইয়াছে। ভাবিল, সুরদাস—মহাশয়! সুরদাসের সহিত যে সকল দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি তুষানলের ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। দিন দিন যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিদ্রিত অবস্থায়ও অনুতাপতাপের উপশম নাই। অহর্নিশি জাগিতে লাগিল, আহা! তাহাকে একদিনের নিমিত্ত সুখী করি নাই। কথার সঙ্গী নাই, ব্যথার ব্যথী নাই যন্ত্রণাময় জীবন বহিতে লাগিল।

এখনও বীরেন্দ্র সিংহ পিঙ্গলার বাটীতে আছে। দিবসে বাহির হয় না, কিন্তু সমস্ত রাত্রি কি কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। পিঙ্গলা ভাবে, কিশোরীর অনুসরণ করে। দিন দিন বীরেন্দ্র সিংহ পিঙ্গলার তিক্ত বোধ হইতে লাগিল, তাহাকে যত দেখে, ততই তার অনুতাপ বৃদ্ধি হয়। একদিন স্পষ্টই বলিল, "যদি এ সহরে আপনার কার্য্য থাকে, অপর স্থানে অবস্থান করুন, আমার বাটীতে আর আপনাকে স্থান দিতে পারিব না।" বীরেন্দ্র ভাবিয়াছিল যে, পিঙ্গলার বাড়ীতে থাকিলে, প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই নিমিত্তই তথায় থাকিতে চায়। বিস্তর অর্থ দিতে চাহিল, মিনতি করিল, কিন্তু পিঙ্গলা কোনরূপেই স্থান দিল না। বীরেন্দ্র পিঙ্গলার বাড়ী ত্যাগ করিল। রোষের উদ্রেক হইল। বিস্তর উপকারী—রোষ সংবরণ করিল; কিন্তু বেশ্যার ভাব কিছু বুঝিতে পারিল না। পিঙ্গলা বাড়ীর দোরে বসিয়া আছে, দেখে—বঙ্কা সেই পথে যাইতেছে। বঙ্কাও পিঙ্গলাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। পিঙ্গলাও বঙ্কাকে ডাকিল। পিঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "বঙ্কা তুই আমায় হরিনাম করিতে বলিয়াছিলি, কই হরিনামে ত কিছু হয় না, মনের যন্ত্রণা যায় না। তবে তুই কি বলিয়াছিলি?" বঙ্কা বলিল, "হ্যাঁরে, তোর এত যন্ত্রণা! হরিনামে যন্ত্রণা যায় না?"

পিঙ্গলা। না।

বঙ্কা। তাইত! কেমন হ'ল! আমি সে মাগীকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে তোকে বল্‌বো।

পিঙ্গলা। তিনি কোথায় থাকেন? তোর সঙ্গে তাঁর কবে দেখা হবে?

বঙ্কা। সেইখানেই যাইতেছি।

পিঙ্গলা। আমার যাবার যো আছে?

বঙ্কা। যে খুসী যাইতে পারে।

পিঙ্গলা। তবে দাঁড়া।

পিঙ্গলা বাড়ীর ভিতর গিয়া, একটী পোষা পাখী হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। বঙ্কা জিজ্ঞাসা করিল, "কই, দরজায় চাবি দিলি নি?" পিঙ্গলা বলিল,—"না, আমি আর ঘরে ফিরিব না।" বঙ্কা বলিল, "সে কি?" পিঙ্গলা উত্তর করিল, "এই।"

পিঙ্গলা বলিতে লাগিল,—"এ কার বাড়ী জানিস্ ত? সুরদাসের! জিনিষ পত্তর, খাট বিছানা; গহনা, আসবাব, অর্থ, ধন কড়ি সকলই সুরদাসের। সবই ত তুই জানিস্। আমি আর সুরদাসের বাড়ীতে থাকিব না। ঘরের ভিতর আমার যম-যন্ত্রণা বোধ হয়, তাহার দেওয়া শয্যায় শুইতে শয্যা-কণ্টকী হয়। তাহার জিনিষ পত্র কালসর্প জ্ঞান হয়। আমি আর হেতায় থাকিব না। আমি বাহিরে আসিয়াছি। আমার প্রাণে যেন শান্তি আসিতেছে।"

বঙ্কা কিছুই বলিল না, নীরবে আগে আগে চলিল। পিঙ্গলা পাখী পড়াইতে পড়াইতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর গিয়া, পিঙ্গলা বঙ্কাকে বলিল, "বঙ্কা, আমায় একটী ভিক্ষা দিবি?" বঙ্কা বলিল, "কি?"

পিঙ্গলা। তোর ঐ গায়ের চাদরখানা।

পিঙ্গলা নিজ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই চাদরখানা পরিল। বঙ্কা সবিস্ময়ে দেখিতেছে। পিঙ্গলা বলিল—"চল্।" [ক্রমশঃ ।]

কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ১২ই ভাদ্র যোগোদ্যানে মহাসমারোহে রামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত দলে দলে বহু সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সেবকমণ্ডলী সমস্ত দিবস অকাতরে আনন্দের সহিত প্রসাদ বিতরণে নিযুক্ত ছিলেন। সমাগত ব্যক্তিমাত্রই পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

ভগবদ্গীতা

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত ।)

[২য় অধ্যায়ের ২২ শ্লোকের ভাষ্য ও অনুবাদ হইতে ২৯ শ্লোকের ভাষ্য ও অনুবাদ পর্যন্ত ।
—বর্তমান সম্পাদক]

[১ম বর্ষ ।] ১৫ই আশ্বিন । (১৩০৬) [১৮শ সংখ্যা ।]

পরমহংসদেবের উপদেশ ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত ।)*

১ । গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হ'তে পারে । যার কাছে কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়, তাঁকেই উপগুরু বলা যেতে পারে । ভাগবতে আছে, অবধূত এইরূপে ২৪টী উপগুরু করেছিল ।

২ । একদিন মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখ্‌তে পেলে, সাম্‌নে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে খুব জাঁক যমক ক'রে একটী বর আস্‌ছে, আর একদিকে এক ব্যাধ একমনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে, এত জাঁক ক'রে যে বর আস্‌ছে, সেদিকে একবার চেয়েও দেখ্‌ছে না । অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার করে বল্লে, তুমি আমার গুরু । যখন আমি ভগবানের ধ্যানে বস্‌ব, তখন যেন তাঁর প্রতি ঐরূপ লক্ষ্য থাকে ।

৩ । একজন মাছ ধর্‌ছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, ভাই ! অমুক জায়গা কোন পথ দিয়ে যাব ? সে ব্যক্তির ফাৎনায় তখন মাছ খাচ্চে, সে তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে একমনে মাছের দিকে তাকিয়ে রইল, মাছ গেঁথে তখন পেছন ফিরে বল্লে, আপনি কি বল্‌ছেন ? অবধূত প্রণাম করে বল্লে, আপনি আমার গুরু, আমি যখন আপনার ইষ্টের ধ্যানে বস্‌ব, তখন যেন ঐরূপ কায শেষ না করে অন্য দিকে মন না দি ।

৪ । একটা চিল একটা মাছ মুখে করে আস্‌ছে, তাই দেখে শত শত কাক চিল তার পেছনে লাগ্‌ল, তাকে ঠুক্‌রে কাম্‌ড়ে বিরক্ত করে কেড়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ছে, সে যেখানে যায়, সব কাকচিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছনে যেতে আরম্ভ কর্‌লে ; শেষে সে বিরক্ত হয়ে মাছটা ফেলে দিলে ; আর একটা চিল যেমন এসে নিলে, সব কাকচিলগুলো প্রথম চিলটাকে ছেড়ে তার পেছনে যেতে লাগ্‌লো । প্রথম চিলটী নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক গাছের ডালে চুপ করে বসে রইলো । অবধূত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখে প্রণাম করে বল্লে, এ সংসারে উপাধি ফেলে দিতে পাল্লেই শান্তি, নতুবা মহা বিপদ ।

* কার্তিক, ১৩৮২ সংখ্যার পর ।—বর্তমান সঃ

আনন্দময়ীর আগমন*

মা আবার আমাদের দেখ্‌তে আস্‌ছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আস্‌ছেন।—স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভোরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী! প্রতি বৎসরেই আমাদিগকে না দেখ্‌তে এসে থাক্‌তে পারেন না। বেশী দিন ছেলেকে না দেখে কি থাক্‌তে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হ'লে কি এ সকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক ক'রে দিতে পারেন? মায়ের নিকট হ'তেই এত অবিরত ধারায় স্নেহ পাইয়া ত আমরা অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখ্‌তে শিখেছি।

মাকে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—কিছুই আশ্চর্য্য নয়; মা ছেলেকে কখনই ভুল্‌তে পারেন না। মা নিজে জানেন ছেলে কি বস্তু। ছেলে জানে না, "মা" কি বস্তু, মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মহিমা; যদি জানতুম, আজ আমাদের এরূপ অবস্থা কি হ'ত? মা নিজে ছেলেকে গর্ভে ধরেছেন, প্রসব করেছেন, কত ক'রে মানুষ ক'রেছেন; ছেলে কি বস্তু, মা খুবই জানেন। না থাক্‌তে পেরে, এত হামেশা ছেলেকে মা দেখ্‌তে আসেন! এসে ভালবেসে, কত ভক্তি বিশ্বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, কি অদ্ভুতরূপে অন্তরে অন্তরে শিখাইয়া যান। আহা! মায়ের সে ভালবাসার সে ক্ষমাশীলতার এক কণাও যদি পাই, মায়ের ছেলে ব'লে নিজেকে একদিনের তরেও সাধ মিটাইয়া পরিচয় দিই।

আমাদের মাকে ভাল ক'রে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত স্নেহে ভরা, জলে ছল ছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়ালেই যেন শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মা আসবেন,—কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব কর্‌ছেন; মাকে দেখবো,—কত লোকে সমস্ত কায কর্ম্ম ফেলে ঝেলে দেশ দেশান্তর হ'তে চ'লে আস্‌ছেন। মাকে প্রাণ ভ'রে পূজা ক'র্‌ব—কত লোকে কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ হ'তে সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছেন। আজ ঘরে মা আস্‌বেন—কতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত নূতন নূতন বেশ ভূষা, কতই পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ, কত প্রকারেরই আনন্দ-উল্লাস হ'তেছে। কত লোকে, ঘরের ময়লা, বস্ত্রের ময়লা, শরীরের ময়লা, মনের ময়লা সব দূর ক'রে দিতেছেন। মা আস্‌বেন;—দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হ'তেছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি স্নেহ। ধনীরও কথা যেমন শোনেন, গরীবের কথাও মা তেমনি শোনেন। গরীব, মায়ের কানে কানে ব'লে দিলেন, "মা, আবার আমার ঘরে এসো।" "আমার গরীব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই"—ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরীব খেতে পায় না; তত্রাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরীব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন কর্‌তে সমর্থ হন।

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন "আমাদের মা—এত ছোট মা নয়। আমাদের মা সর্ব্বব্যাপী। তাঁর আবার আগমন, আবাহন ও বিসর্জ্জন কি? তাঁর আবার চাল কলা দিয়া পূজা কি?"

*সূচীপত্র হইতে জানা যায়, লেখাটি উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের।—বর্তমান সঃ

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হতে পারেন। "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এ ছাড়া আর কত কি হতে পারেন, তা কে জানে?" তিনি অনন্ত, তাঁহার গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্ত-বৎসল। অপার তাঁর করুণা। যে ছেলে যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তার নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা ক'রে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হলে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জ্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হবে; তখন মা আমাদের নিকট তাঁর অত গম্ভীর ভাব অত উচ্চ অবাঙ্মনসোগোচর ভাব ধারণ করলে, কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু, এখন থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে। বাল্যকালে যাহা করা যায়, শুনা যায়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এদিকে, নানা প্রকারের পার্থিব অনিত্য ভাব সকলের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'তে লাগল; বড় হয়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জ্জনা এসে জুটেছে—সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজিয়ে দু'দণ্ড ধ্যান করতে গেলুম···এক প্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তিতে বালকের মত – এমন কি সেই নির্ম্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম—রহিলাম। আবার বালকের মত মা বলে যখন কিছু জিনিষ চোখে দেখ্‌তে, হাতে স্পর্শ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অনেক কষ্টে একটু উন্নতি বোধ করতে লাগলুম। ক্রমশঃ বুঝলুম মায়ের মূর্ত্তি-পূজা দুর্ব্বল মনকে কত সাহায্য করে; অল্পেই কত ফলপ্রদ হয়।

আমাদের মা ত খালি মাটির বা খেলা-ঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্ব্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিণী, সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। একটী সাধক গাহিয়াছিলেন—"আমার মা যদি কালো হ'ত, তবে কি ডাকিতাম এত; যার কাল তার কাল শ্যামা, আমার সে যে ভাল। যদি কালো, তবে কেন হৃদিপদ্ম করে আলো।" আমার মাকে ডেকে, আমার মাকে পুজে, আমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে—কি ক'রে অস্বীকার করি। মার কাছে যেটা জোর ক'রে অন্তরের সহিত বলি, সেটা যে খেটে যায়—কি করে তা না মানি। "জাননারে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।" মা কি আমার অমনি যে সে; আমি কি অমনি যাকে তাকে মা বলি।—

দেব্যুপনিষৎ বলছেন—

"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীম্ উপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি। সাব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী···।"

অর্থাৎ দেবীর নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাদেবি?" দেবী বলিলেন, "আমি ব্রহ্মস্বরূপা; আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন; আমি শূন্য অশূন্য, আনন্দ নিরানন্দ, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান; আমিই ব্রহ্মা অব্রহ্মা"; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৈদিক দেবীসূক্তে দেবী বলছেন—

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥···
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা ··· ॥

অর্থাৎ আমিই জগদীশ্বরী, সকলকে আমিই ধন দিয়া থাকি, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি, যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ; আমি সকল স্থানেই বাস করি—সকলের দেহেই অবস্থান করি; দেবগণ যেখানে যাহাই করুন, আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাৎ সকলের ভিতর আমার শক্তি থাকার দরুণই, সকলে আহারাদি করিতে পারে, দেখিতে শুনিতে পারে, আমারই শক্তির দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। আমাকে যিনি মানেন না তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন। আমিই কারণের কারণ। পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে চৈতন্য এবং মায়ারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি।

বহ্বৃচোপনিষৎ প্রচার করিতেছেন—

"তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ রুদ্রোঽজীজনৎ ··· সর্ব্বমজীজনৎ সর্ব্বং শাক্তমজীজনৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন।

এই শক্তিই

নিরাকার সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের হিতার্থে সাকার রূপ ধারণ করিতেছেন, যথা— সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বলিতেছেন "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্"—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বহু শোভমানা স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক 'উমা হৈমবতী' রূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মেধস্ ঋষি

সুরথ রাজাকে বলিতেছেন "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততং। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"—অর্থাৎ সেই জগন্মূর্ত্তি-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই ভক্তদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হন। যখন এইরূপ আবির্ভূত হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তাঁহাকে "উৎপন্ন" অথবা "অবতার" বলা যায়।

শিশু গর্ভধারিণীকে "মা" ব'লে ডাকে; 'মা যে কি বস্তু' তা কি বুঝিয়া ডাকে? "মা" ব'লে ডাকতে হয়,—ডাকে। জোর মেরে কেটে "মা" বলে ডাকলে, মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে, একরকম শান্তি পায়; তাই "মা" ব'লে ডাকে। যখন বড় হয় তখন "মা" যে কি বস্তু তা ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে বুঝতে পারে। তেমনি আমরাও আগে যখন দশভুজা আনন্দময়ীকে "মা" ব'লে ডাকতুম তখন তত মাকে বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনলুম 'সেই মা হচ্ছেন —মা দুর্গা, মা হচ্ছেন—ভগবতী ঈশ্বরী,— মাকে নমো করতে হয়, পুজো করতে হয়'। [ক্রমশঃ]

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

দিব্য বাণী

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

—শ্রীচৈতন্যদেব : শিক্ষাষ্টক, ২

(কালী দুর্গা শিব রাম হরি নারায়ণ
কৃষ্ণ আদি) বহু নাম করিলে সৃজন।
নামে নিজ সর্বশক্তি করেছ অর্পণ;
নিয়মিত কাল নাই করিতে স্মরণ—
(খাইতে শুইতে কিংবা করিতে ভ্রমণ
অনায়াসে হতে পারে নামের স্মরণ।)
এতই করুণা তবু নামেতে তোমার
কর্মদোষে অনুরাগ হ'ল না আমার।

কথাপ্রসঙ্গে

নাম অনুরাগ ও অপরাধ

১

শ্রীচৈতন্যদেব সংস্কৃতে ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি মিথিলার প্রখ্যাত নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত 'তত্ত্বচিন্তামণি' ন্যায়গ্রন্থের উপর একটি টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহপাঠী রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত গ্রন্থের উপর 'দীধিতি' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন, যাহা পরবর্তী কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কথাপ্রসঙ্গে একদিন চৈতন্যদেব রঘুনাথকে নিজ টীকা হইতে কিছু অংশ পড়িয়া শোনান। উহা শুনিয়া রঘুনাথ ম্লানমুখে অশ্রুমোচন করিতে থাকিলে চৈতন্যদেব যখন জানিলেন যে, তাঁহার রচিত টীকাটি সম্পূর্ণ হইলে দীধিতির সমাদর থাকিবে না, এই কারণেই রঘুনাথের বেদনাশ্রু, তখনই তিনি নিজের লেখাটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া বন্ধুপ্রীতির বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ইহার পর মাত্র ষোল বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব যখন টোল খুলিয়া কলাপ ব্যাকরণ পড়াইতে শুরু করেন, তখন তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে কেশব মিশ্র নামে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসেন। চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট গঙ্গার মহিমা সম্বন্ধে শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি একশত শ্লোকে গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেন। চৈতন্যদেব প্রথম শ্রেণীর শ্রুতিধর ছিলেন – যাহা একবার শুনিতেন, তাহা স্মরণ রাখিতে পারিতেন। তিনি ওই একশত শ্লোকের অন্তর্গত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিগ্বিজয়ীকে উহা ব্যাখ্যা করিতে বলেন। কেশব মিশ্র উহা ব্যাখ্যা করিলে চৈতন্যদেব ওই শ্লোকের দোষগুণ বিচার করিয়া কাব্য ও অলংকারেও তাঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া দিগ্বিজয়ীকে স্তম্ভিত করেন।

উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, ষড়্‌দর্শনে – বিশেষতঃ নব্য ন্যায় ও বেদান্তে – পরিনিষ্ণাত বাসুদেব সার্বভৌম ভাগবতের 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ'—ইত্যাদি শ্লোকটির নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, উহার অধিক অর্থ স্বয়ং বৃহস্পতিও করিতে পারিবেন না। চৈতন্যদেব উহা শুনিয়া সার্বভৌমের ওই নয় প্রকার অর্থ বাদ দিয়া আঠারো রকমে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলে সার্বভৌম ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুও তাঁহাকে ষড়্‌ভুজরূপে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন।

পরবর্তী কালে কাশীতে সনাতন গোস্বামী উক্ত আঠারো প্রকার ব্যাখ্যা মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে—

'(প্রভু কহে) আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলাপিতাম তারে নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে॥'

—এই বলিয়া কথাচ্ছলেই তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকটির একষট্টি রকম অর্থ করেন।

২

এহেন অলৌকিক প্রতিভাধর পণ্ডিত যে ব্রহ্মসূত্রের উপর সংস্কৃতে ভাষ্য লিখিয়া নিজ দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা অনায়াসেই করিতে পারিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই এই কারণে যে, তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষ্য বলিয়া

মনে করিতেন। তাঁহার সম্প্রদায়েও স্বাভাবিক-ভাবেই প্রত্যাশিতরূপে ভাগবত বিশুদ্ধ প্রমাণ-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে: 'শ্রীমদ্‌ভাগবতং প্রমাণম্ অমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্'— শ্রীমদ্‌ভাগবতই বিশুদ্ধ প্রমাণ, প্রেমই পরম পুরুষার্থ।

স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, শংকরাচার্য তাঁহার মহৎ জীবনে যে সকল বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে গীতার প্রচার অন্যতম। অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রচার শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অন্যতম গৌরবময় কীর্তি। ঈশ্বরের নাম ও নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেন, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতেই পাওয়া যায়। তবে তিনি ও তাঁহার পার্ষদগণ নিজ নিজ জীবনে আচরণের দ্বারা সেই সকল উপদেশ সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন

৩

ভাগবতের আদিতে মধ্যে ও অন্তে শ্রীভগবানের নামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। সর্বশেষ শ্লোকটি হইতেছে: নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপ-প্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনং তং নমামি হরিং পরম্॥ —যাঁহার নামসংকীর্তন সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে এবং যাঁহাকে প্রণাম করিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়, সেই পরমাত্মা হরিকে নমস্কার করি। গ্রন্থটির আদিতে এবং মধ্যে নামমাহাত্ম্য-সূচক এত শ্লোক আছে যে, তাহাদের উদ্ধৃতি দিয়া এই নিবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি করিতে চাহি না।

ভাগবতের অন্তিম স্কন্ধের দুইটি শ্লোকের[১] অনুসরণে শ্রীচৈতন্যদেব বলিতেন, 'নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়', 'নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর' ইত্যাদি। অনুরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বারংবার বলিয়া গিয়াছেন, 'কলিতে নারদীয়া ভক্তি'।

ওঙ্কারপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ সহস্রদ্বীপোদ্যানে বলিয়াছিলেন: 'ওঙ্কার একটি শব্দমাত্র নহে, উহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর।' ('It is not a word, it is God Himself.')। কথামৃতেও আছে, 'তিনি আর তাঁর নাম তফাত নয়।' জীবগোস্বামীর মতে নাম ও নামী যে অভিন্ন তাহা ঋগ্বেদেই উল্লেখিত—ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি ঋকে[২] নামকে চিৎস্বরূপ বলা হইয়াছে। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সুন্দর উপদেশটিতেও নাম ও নামীর অভেদত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: ঈশ্বরের নামের অসাধারণ শক্তি। উহা অবিদ্যা নাশ করে, কোমল বীজ যেরূপ কঠিন মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে। নামে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধকের আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করিতে হয় না। নামের প্রভাবে সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সচ্চিদানন্দ লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বর এক; কিন্তু তাঁহার নাম অনন্ত, রূপ অনন্ত, ভাব অনন্ত। যে নামে, যে রূপে ও যে ভাবেই হউক না কেন, এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দজ্ঞানে সাধন-

---

১ কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥
—ভাগবত, ১২।৩।৫১-৫২

২ আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। —ঋগ্বেদ, ১।১৫৬।৩
হে বিষ্ণো! তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপম্, অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাৎ অস্য নাম্নঃ আ ঈষৎ অপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তদ্‌বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। (ভগবৎসন্দর্ভ)।

ভজন করিলে সাধকের নিশ্চয়ই ঈশ্বরলাভ হইয়া থাকে।

৪

ঈশ্বরের নামের এত মহিমা বর্ণনা করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথাও বলিতেন যে, অনুরাগ না হইলে ঈশ্বরলাভ হয় না। বলিতেন, 'নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকিলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?... তাই নাম করো, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করো যাতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয় আর যে সব জিনিস দু'দিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ, তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়।'

অনুরাগের ঐশ্বর্যপ্রসঙ্গে বলিতেন: 'ঈশ্বরলাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতরে অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্চে, তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নেই। অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন, সত্য কথা—এই সব।... বাঘ যেমন কপ কপ ক'রে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি অনুরাগ-বাঘ কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।'

এখন প্রশ্ন হইতেছে—ঈশ্বরে অনুরাগ কি করিয়া হয়? শ্রীরূপগোস্বামী ইহার উত্তরে বলিতেছেন:

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥

—কৃষ্ণনাম-চরিতাদি মিছরির ন্যায় মিষ্ট হইলেও যাহার জিহ্বা অবিদ্যারূপ পিত্তরোগে ক্লিষ্ট, তাহার রুচিকর হয় না। তথাপি প্রত্যহ সযত্নে সেবিত হইলে উহা ক্রমশঃ অবিদ্যারোগ নির্মূল করিয়া স্বাদু হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, অনুরাগ একদিনে হয় না; প্রত্যহ ঈশ্বরকে ডাকিতে অভ্যাস করিলেই ক্রমে ব্যাকুলতা অর্থাৎ অনুরাগ হয়।

৫

উপরি-উক্ত স্বাভাবিক নিয়মেরও যদি ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়—যদি দীর্ঘকাল নামজপ করিয়াও উহা যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্রে পর্যবসিত হয়, অনুরাগের কোনও লক্ষণ দেখা না যায় তো বুঝিতে হইবে অনেক অপরাধ বিদ্যমান। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন:

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইলে অপরাধ যাহাতে দূরীভূত হয় তাহাই অবশ্য করণীয়। বৈষ্ণবগ্রন্থে অপরাধসমূহের দীর্ঘ তালিকা দৃষ্ট হয়। অবশ্য উহা সর্বাংশে সকল সাধকের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ না মানিলেই অপরাধ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজেরই খেয়ালমত চলে, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, ইহলোকে সুখী হয় না, পরলোকেও তাহার সদ্‌গতি হয় না। হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রের সার গীতাতেই নিহিত আছে। সুতরাং গীতোক্ত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলাই প্রকৃষ্ট পন্থা। উহা না করিলেই অপরাধ। অপরাধের বীজ আছে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতায়—মনের বহির্মুখীনতায়। তাই গীতায় বারংবার ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা বলা হইয়াছে, বিষয়াভিমুখী মনকে ভগবদভিমুখী করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অপরাধ হইতে বাঁচিবার দুইটি পথ আছে। একটি বিচার-পথ, অপরটি ভক্তিপথ। উপনিষদের যুগে বিচার-পথেরই প্রাধান্য দেখা যায়। বারবার আমরা 'ধীর'-শব্দটির প্রয়োগ পাই উপনিষদে। 'শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ'—মানুষ শ্রেয় এবং প্রেয়, এই দুইয়ের সম্মুখীন হয়; ধীর ব্যক্তি বিচার করিয়া দেখেন কোনটি তাঁহার শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণকর এবং কোনটি প্রেয় অর্থাৎ আপাততঃ প্রিয় হইলেও পরিণামে অকল্যাণকর।- 'কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্'—ধীর ব্যক্তি, বিবেকী ব্যক্তি অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্বক প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।

জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: 'আজ্ঞে, আগে বিচার ক'রে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে হয়?' শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দেন: 'ও এক পথ আছে। বিচার-পথ। ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়।···তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা সব পালিয়ে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রসিদ্ধ উপদেশ: 'হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম কোরো, তাহলে সব পাপতাপ চলে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ-গাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে পালায়।'

পূর্বে উল্লেখিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশসমূহ এই শেষোক্ত উপদেশের সহিত পাঠ করিলে নিষ্কর্ষ ইহাই দাঁড়ায় যে, নাম করিতে করিতেই অপরাধ দূর হয়, অনুরাগ জন্মে এবং ঈশ্বরলাভ হয়। কিন্তু অপরাধ থাকিলে যে ফল পাইতে বিলম্ব হয়—ইহা সহজেই বুঝা যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, আত্মবিশ্লেষণ করিয়া যিনি যত নিজের অপরাধ বা ত্রুটিগুলি আবিষ্কার করিয়া সেগুলি দূর করিতে পারিবেন, তিনি তত শীঘ্র সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

৬

উপনিষদের যুগ হইতে আজ এই বিংশ-শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ধর্মসাধনায় যে বিলক্ষণ বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপনিষদের যুগে 'কান্নাকাটি' বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ছিল একটি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সুর। নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তির কথা বীজাকারে থাকিলেও জ্ঞান ও যোগেরই প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী যুগে 'কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান'-এর জন্য শ্রীভগবান অবতাররূপে ও আচার্যরূপে যুগোপযোগী সুগম পন্থা—ভক্তিমার্গের—বিশেষভাবে প্রবর্তন ও প্রচার করেন। বিচার ও ভক্তি—এই উভয় পথের সমন্বয়ই উত্তম পদ্ধতি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়: 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর heart (হৃদয়বত্তা), সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।'

৭

নামমাহাত্ম্য প্রচার করিতে ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয় ৪৯০ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপধামে দোলপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে। সমাসন্ন সেই শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁহারই স্মরণে নিবেদিত এই দীন রচনা-অর্ঘ্য। এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—নাম অনুরাগ ও অপরাধ—তাঁহার সমস্ত উপদেশের সারসংগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজ

গোস্বামীর নিম্নোদ্ধৃত পয়ারগুলিতেই বিধৃত :

'কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলজ বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥'

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : ননু সুখদুঃখমোহাত্মকস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য জড়স্য সুখদুঃখমোহাত্মকং সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকং জড়ং প্রধানম্ এব কারণম্ অনুমীয়তে, চিন্মাত্রস্য তু ব্রহ্মণঃ তাদৃশ-জগৎকারণত্বানুপপত্তেঃ, কার্যকারণয়োঃ বৈলক্ষণ্যানুপপত্তেঃ। 'অজামেকাং লোহিতশুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্' * (শ্বে. উ. ৪.৫) ইতি শ্রুতেঃ। অজাম্ অজন্যাং, লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং রজঃসত্ত্বতমোরূপাং, সরূপাং স্বসমানরূপাং, বহ্বীং প্রজাং—প্রকর্ষেণ জায়তে ইতি প্রজা বিয়দাদিপ্রপঞ্চঃ, তাং (জনয়ন্তীম্) ইতি অর্থঃ, ইতি আশঙ্ক্য আহ—

মূলস্তোত্রম্ :

সর্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্বঃ সকলো যো
যশ্চানন্দোঽনন্তগুণো যো গুণধামা।
যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমস্তঃ সদসদ্ য-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩॥

সর্বজ্ঞঃ ইতি। যঃ **সর্বজ্ঞঃ**। অত্র শ্রুতিঃ—'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' (মু. উ. ১।১।৯) ইত্যাদি, সামান্যতঃ সর্বং জানাতি ইতি সর্বজ্ঞঃ। বিশেষেণ সর্বং বেত্তি ইতি সর্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। ন তু জীবানাম্ ইব কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপম্ ইতি শ্রুতেঃ অর্থঃ। প্রধানস্য জড়ত্বেন বিবিধকর্মফলরূপবিবিধবিন্যাসদেহাদিপ্রপঞ্চ-রচনানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ,—সুখাদেঃ বাহ্যঘটাদিধর্মত্বাসিদ্ধেঃ আন্তরস্য এব প্রতীতেঃ। অচেতনস্য স্বতঃ লোকে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ অজাম্-ইত্যাদি-মন্ত্রস্য লোহিতশুক্লকৃষ্ণগুণবৎ-

* উক্ত মন্ত্রটির পাঠ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এইরূপ পাওয়া যায় : 'বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।'

তোজোঽবয়কারণপরমাত্মাধ্যস্তাব্যাকৃতবিষয়ত্বাৎ ন প্রধানং জগৎকারণম্। বাদরায়ণেন অপি 'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্' (ব্র. সূ. ১।১।৫), 'রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্' (ব্র. সূ. ২।২।১) ইত্যাদিনা প্রধানস্য জগৎকারণত্বং প্রত্যষেধি। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (ছা. উ. ৬।২।৩) ইতি শ্রুত্যা জগৎকারণস্য সতঃ ঈক্ষতেঃ ঈক্ষণস্য শ্রবণাৎ অশব্দং শব্দাগম্যম্ অনুমানগম্যং প্রধানং ন কারণম্ ইতি প্রথম-সূত্রার্থঃ। অনুমীয়তে ইতি অনুমানং প্রধানং কারণং ন ভবতি। তস্য জড়ত্বেন রচনানুপপত্তেঃ দেহাদি-প্রপঞ্চ-কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ ইতি দ্বিতীয়-সূত্রার্থঃ। শ্রুতিসিদ্ধ-সর্বজ্ঞস্য তু ব্রহ্মণঃ তৎ সম্ভবতি ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ: (শঙ্কা:) সুখদুঃখমোহাত্মক (অর্থাৎ) সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণময় জড় (সাংখ্যোক্ত) প্রধানই (মূল প্রকৃতিই) সুখদুঃখমোহাত্মক, জড় আকাশাদি প্রপঞ্চের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের তাদৃশ (সুখদুঃখমোহাত্মক) জগৎকারণত্ব উপপন্ন হয় না; কার্য ও কারণের বৈলক্ষণ্য যুক্তিসিদ্ধ নহে।* এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে, যথা – 'অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্'— (এই শ্রুতির অর্থ:) 'অজাং'—অজন্মা (জন্মরহিত), 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং'—রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-স্বরূপা, 'সরূপাম্'—নিজের সমান রূপবিশিষ্টা, বহ্বীঃ'—বহু, 'প্রজাং'- যাহা উত্তমরূপে জাত হয়, তাহাই প্রজা (অর্থাৎ), আকাশাদি প্রপঞ্চ, তাহার উৎপাদিকা—ইহাই অর্থ। এই শঙ্কার উত্তরে (আচার্য শ্লোকরচনার দ্বারা) বলিতেছেন: (মূলস্তোত্র, শ্লোক ৩; পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য)।

অন্বয়: যঃ সর্বজ্ঞঃ, যঃ চ হি সর্বঃ, যঃ সকলঃ, যঃ চ আনন্দঃ, অনন্তগুণঃ যঃ গুণধামা, যঃ অব্যক্তঃ ব্যস্তসমস্তঃ চ, যঃ সদ্ অসদ্, সংসারধ্বান্তবিনাশং তং হরিম্ ঈড়ে। ৩।

অনুবাদ: যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বরূপ; যিনি জগতের অভিন্ন নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ, পরমানন্দস্বরূপ, অনন্তগুণাধার, শুদ্ধসত্ত্বমায়াগুণ-উপাধিক; যিনি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, ভোক্তৃভোগ্যাকারে বিভক্ত সর্বপ্রপঞ্চস্বরূপ; যিনি ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সর্ব প্রতীতির মূল আধার; সংসারের কারণীভূত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশকারী সেই হরিকে আমি বন্দনা করি। ৩।

টীকা: **'যঃ সর্বজ্ঞঃ'**—যিনি সর্বজ্ঞ। এ বিষয়ে শ্রুতি—যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' ইত্যাদি। সামান্যরূপে সর্ববস্তু জানেন, এইজন্য (তিনি) 'সর্বজ্ঞ'। বিশেষরূপে সর্ববস্তু জানেন, এইজন্য (তিনি) 'সর্ববিৎ'। 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'—যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময় (সত্ত্বপ্রধান

* উপাদান-কারণের সহিত কার্যের সমতা থাকে, ইহাই নিয়ম। মৃত্তিকা ও ঘট, সুবর্ণ ও সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কার—ইহার উদাহরণ। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ এবং চেতন। অথচ কার্য জগৎ অনিত্য, অশুদ্ধ এবং অচেতন। অতএব জগদ্রূপ কার্যের সহিত উপাদান-কারণরূপে স্বীকৃত ব্রহ্মের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য থাকায় ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। অপর দিকে জাগতিক প্রত্যেকটি বস্তু সুখদুঃখমোহাত্মক বলিয়া সুখদুঃখ-মোহাত্মক কোন বস্তুকেই উপাদান-কারণ বলা সমীচীন। ঐরূপ কারণ সাংখ্যোক্ত প্রধান—ইহাই আশঙ্কার তাৎপর্য। ব্রহ্মসূত্র ২।১।৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।

মায়ার জ্ঞানাখ্য বিকারে উপহিত হওয়াই অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বই যাঁহার তপস্যা। †), জীবদিগের ন্যায় কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যা তাঁহার নহে, ইহাই শ্রুতির অর্থ।

প্রধান জড় বলিয়া বিবিধ কর্মফলজনিত বিবিধ আকারবিশিষ্ট দেহাদি প্রপঞ্চের রচনা (সৃষ্টি) তাহার দ্বারা উপপন্ন হয় না। আরও দেখ—সুখাদির বাহ্য ঘটাদিগত ধর্মত্ব সিদ্ধ হয় না, (যেহেতু) উহা আন্তর (চেতনের)-রূপেই প্রতীত হয়। (সুতরাং সুখদুঃখমোহাত্মক জড় জগতের কারণ জড় প্রধান হইতে পারে না।) (আরও) জগতে অচেতনের স্বাভাবিক (চেতন-নিরপেক্ষ) প্রবৃত্তি দেখা যায় না (সুতরাং অচেতন জড় প্রধান কি করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবে?)। অতএব 'অজাম্ একাং…' এই উদাহৃত শ্রুতি লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ গুণবিশিষ্ট তেজ, জল ও অন্নের (পৃথিবীর) কারণ, পরমাত্মাতে অধ্যস্ত অব্যাকৃতবিষয়ক বলিয়া (স্বতন্ত্র প্রধানবিষয়ক নহে বলিয়া) (সাংখ্যোক্ত) প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না।

শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসও—'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্', 'রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্' ইত্যাদি সূত্ররচনা দ্বারা প্রধানের জগৎকারণত্ব নিষেধ করিয়াছেন। (প্রথম সূত্রের অর্থ:) 'তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তিনি সংকল্প করিলেন, আমি বহুরূপে উৎপন্ন হইব) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সৎস্বরূপ জগৎকারণের 'ঈক্ষতেঃ' ঈক্ষণ (সংকল্প করা) শ্রুত হওয়া যায় বলিয়া 'অশব্দম্'—শব্দ (শ্রুতি) দ্বারা অগম্য, কেবল অনুমানগম্য প্রধান 'ন'—জগৎকারণ নহে। ইহাই প্রথম সূত্রের অর্থ। (দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ:) যাহা অনুমিত হয় তাহাই 'অনুমানং' অর্থাৎ প্রধান। তাহা 'ন' অর্থাৎ (জগতের) কারণ নহে। তাহা (প্রধান) জড় বলিয়া 'রচনানুপপত্তেঃ'—দেহাদি-প্রপঞ্চের রচনা (সৃষ্টি)-কর্তৃত্ব তাহাতে (প্রধানে) যুক্তিযুক্ত হয় না। ইহাই দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ। শ্রুতিসিদ্ধ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব সম্ভব হয়, ইহাই ভাবার্থ।

† অক্ষর বা শুদ্ধ ব্রহ্ম সৃষ্টিবিষয়ে সংকল্প দ্বারা ('একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়') অঙ্কুরজনক বীজের ন্যায় স্ফীত হন। এইভাবেই সৃষ্টির ক্রম বলা হইয়াছে। ঐরূপ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জীবের সূক্ষ্মস্বরূপা প্রকৃতি অভিব্যক্ত হয়। এই প্রকৃতি বা মায়া হইতেই ব্যষ্টি-জগতের সমষ্টিরূপ জ্ঞানশক্তি- এবং ক্রিয়াশক্তি- বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ আবির্ভূত হন। সুতরাং সমস্ত জগতের পরিণামী মূল উপাদান শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া বা প্রকৃতিই হিরণ্যগর্ভের উৎপাদক ব্রহ্মের উপাধি। এই হিরণ্যগর্ভের কারণরূপেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়া সমষ্টিরূপে ব্রহ্মের উপাধি হইলেই তাদৃশ ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। ব্যষ্টিরূপ অবিদ্যা উপাধি উপহিত ব্রহ্মকে সর্ববিৎ বলা হয়। সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতেই হিরণ্যগর্ভ এবং সর্ববিৎ ব্রহ্ম হইতেই নাম রূপ এবং ব্রীহি-যবাদি অন্ন উৎপন্ন হয়। অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান মায়া বা প্রকৃতির সমষ্টিরূপ জ্ঞানের প্রাপ্তিকেই তাঁহার তপস্যা বলা হয়।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[সুরেশকুমার নাহাকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

The Ramakrishna Math
Belur P. O., Howrah
Dated, the 29. 7. 1923

শ্রীমান্ সুরেশকুমার,

কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। আমি মঠে ছিলাম না, সুতরাং উত্তর দেওয়া হয় নাই।

তোমার যে রূপ-দর্শন হয় তাহা ভাল। মন তোমার ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিবে প্রভুর কৃপায়। বায়ুর মত যাহা উঠে উহা স্থির হইলেই মনও স্থির হইবে। তুমি জপ যেমন করিতেছ তাঁর কৃপায় তেমনি করিতে থাক, মন স্থির হইবে, আনন্দ ও শান্তি পাইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে, মধ্যে ২ পত্র লিখিবে এবং উত্তরের জন্য পত্রের ভিতর একখানি করিয়া টিকিট (stamp) পাঠাইবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়, এ সময়টা মঠের স্বাস্থ্য তত ভাল থাকে না। আশা করি তুমি ভাল আছ। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

The Ramakrishna Math
Belur P. O., Howrah
Dated, the 29. 8. 1923

শ্রীমান্ সুরেশকুমার,

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন যে যতক্ষণ দেহ থাকিবে হাজার সাধন ভজন কর একটু অহংকার বা অহংবুদ্ধি থাকিবেই থাকিবে। সেইজন্য তিনি বলিতেন "…অহং যদি একান্তই না যাস্ তো দাস অহং হয়ে থাক্ ; আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত এইভাবে থাক্", "এ আমি পাকা আমি, কাঁচা আমি নই", "কাঁচা আমি হচ্ছে আমি অমুকের ছেলে বা অমুকের বাপ বা অমুকের স্বামী বা প্রভু, আমি অমুক বড় কুলে জন্মেছি, আমি বিদ্বান, আমি ধনী, আমার অনেক টাকা, আমি বড় চাকুরী করি", "এই সকল হচ্ছে কাঁচা আমি"। "আর আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁর কৃপাতেই আমি তাঁকে ডাকবার চেষ্টা করিতেছি, বিষয় কাযকর্ম্ম করিতেছি, এ আমি পাকা আমি, এ আমিতে দোষ হয় না" এইরূপ বিচার করিলে অভিমান অহংকার মনে অধিকক্ষণ থাকিবে না।

* শ্রীঅসিতকুমার নাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ

আবার অহংবুদ্ধি না থাকিলে কোন কাযই হয় না, ভজন সাধন করিতে গেলে একটা অহংবুদ্ধি থাকে, আমি তাঁর নাম করিব, আমি তাঁর ধ্যান করিব এ বুদ্ধি না থাকিলে তাহা হয় না; তবে সে ভক্তের আমি দাসের আমি। সেইরূপ সংসারের কাযেও সেইরূপ দাস আমি, ভক্ত আমি, তাঁর ইচ্ছায়ই আমি তাঁর সংসারে তাঁর দাস হইয়াই তাঁর কায করিতেছি এই বুদ্ধি রাখিয়া কায করিতে হইবে। সংসার কার, তাঁরই তো। সুতরাং যা করিতেছ সব তাঁরই কায করিতেছ, তিনি যতদিন তাঁর সংসারের কায করাবেন ততদিন তোমাকে করিতে হইবে। তবে তাঁর দাস হইয়া দাস বুদ্ধিতে কায কত্তে হবে, তাহলে অভিমান অহংকার মনে স্থান পাবে না বা বেশী আন্দোলিত কত্তে পারবে না। প্রভুর কৃপায় যত তাঁকে ডাকিবে, যত তাঁকে ভাবনা করিবে, ওরূপ অহংকার অভিমানে তোমায় বিচলিত করিতে পারিবে না। তোমার কোন চিন্তা নাই, প্রভু তোমায় ঠিক পথে চালাবেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে। আমার শরীরটা বর্ষা পড়া অবধি তত ভাল থাকিতেছে না। বর্ষাটা কমিলেই বোধ হয় তাঁর ইচ্ছায় ভাল হইবে। তুমি ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রভু তোমায় সর্ব্বতোভাবে কুশলে রাখুন ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা। তোমার প্রেরিত ১ প্যাকেট envelopes ও পাঁচটী টাকা পাইয়াছি। টাকা পাঠাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, তুমি সংসারে রহিয়াছ টাকার প্রয়োজন সেখানেইবেশী। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩)

The Ramakrishna Math
Belur P. O., Howrah
Dated, the 29. 9. 1923

শ্রীমান্ সুরেশ…,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমার খুবই জ্বর হইয়াছিল। ১২।১৩ দিন খুব কষ্ট পাইয়াছি। এতদিনে একটু বল পাইতাম। কিন্তু আমাশয় দেখা দিয়াছে। সেজন্য দুর্ব্বলতা আরও অধিক হইয়াছে। তবে ধীরে ধীরে প্রভুর কৃপায় শীঘ্রই বল পাইব আশা করি। রাঁচির স্বাস্থ্য এ সময়টা খুব ভাল বটে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব সুন্দর। যদি যাওয়া স্থিরই হয় তবে পূর্ব্বে তোমাকে জানাইব। Train-এর journey-কে একটু ভয় হয়। সমস্ত রাত shaking-এ শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া দেয়। যাহা হউক যেরূপ হয় তোমাকে লিখিব। অবশ্য আমি second class-এই travel করিয়া থাকি। যদি যাওয়া হয়, তবে আর একজন আমার সঙ্গে যাইবে। যাহা হয় পরে লিখিব। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ তুমি প্রভুর কৃপায় এখন [ভাল] আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি, তুমি আরও ভাল থাক।

(৪)

The Ramakrishna Math
Belur P. O., Howrah
Dated, the 18.12. 1923

শ্রীমান্ সুরেশকুমার,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। মানবজীবনে বহু জন্মার্জ্জিত সব সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে, দেবভাব ও পশুভাব দুই আছে। জীবের জীবনে যখন শুভক্ষণ উপস্থিত হয় তখন মনে দেবভাবের উদয় হইয়া সাধুসঙ্গের বাসনা উদয় হয় এবং সৎ গুরুর নিকট ভগবানের নাম গ্রহণ বা দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা হয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমার সে শুভক্ষণ জীবনে উদয় হইয়াছে। এখন নাম লইতে ২ তাঁর শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে ২ কাতরে তাঁর কাছে প্রার্থনা করিতে ২ পশুভাব (জীবের সংস্কারবশতঃ) যদি কখন মনে উদয় হয় দেবভাবের উত্থাপন করিয়া অর্থাৎ তাঁর নাম জপ ধ্যান প্রার্থনাদি দ্বারা উহাকে দমন করিতে হইবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার হৃদয়ের দেবভাবের খুব জোর হউক এবং তুমি মনের পশুভাব দমন করিতে সক্ষম হও। তুমি যখন ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ তখন তুমি মুক্তির অধিকারী হইয়াছ। অধিক আর কি লিখিব, তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমার শরীর এখন তত খারাপ নয়। অন্যান্য সাধুগণ এক-প্রকার ভাল আছেন প্রভুর কৃপায়। তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনীয়। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Sri Hathiramji Mutt
Ootacamund (Madras)
7. 6. 26

শ্রীমান্ সুরেশকুমার,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমি ৩রা মে মঠ ছাড়িয়া ভুবনেশ্বরমঠ, ৺পুরী ও Waltair হইয়া ১১ মে মাদ্রাজ মঠে আসি। সেখানকার কায সারিয়া গত ৪ জুন এখানে আসিয়াছি। মাদ্রাজ ভয়ঙ্কর গরম। এস্থান চমৎকার শীতল ও সুদৃশ্য। আমরা (উপরোক্ত) যে বাড়ীতে আছি অতি নির্জ্জন। ইহা দাক্ষিণাত্যের মহাতীর্থস্থান তিরুপতির মোহন্ত মহারাজের বাটী। সম্ভবতঃ মাস খানিক এখানে থাকিতে পারি। ইহা প্রায় 7500 ft above the mean sea-level। মঠ হইতে খপর পাইয়াছি তোমার প্রেরিত ২৲ সেখানে পৌছিয়াছে। যদি অসুবিধা না হয় কিছু টাকা এখানে পাঠাইও। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। শরীর আমার এখানে অনেক ভাল আছে। ঠাকুরের ইচ্ছায় এখানেও একটি ছোটখাট মঠ নির্ম্মাণ হইতেছে। কতকগুলি গৃহস্থ ভক্ত এবিষয়ে খুব উদ্যোগী হইয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুরের ইচ্ছায় এই site acquire হয়। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে এক ধোপা ভক্ত দুই একর জায়গা দান করেন। আমি তখন এখানে এবং

ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি foundation stone lay করি। বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি আবার এবার মঠ open করিয়া যাইব। রাঁচির ভক্তদের এ সংবাদটা দিও, তারা খুব খুসী হবে এবং ঠাকুরকে শত ২ ধন্যবাদ দিবে। ইতি

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Ashrama
Ootacamund, S. India
11. 10. 26

শ্রীমান্ সুরেশকুমার,

আজ তোমার প্রেরিত ৩৲ পাইলাম। এখানকার মঠ ভক্তেরা গত ২৪ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা ঠাকুর স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমার প্রতিমূর্ত্তি মাথায় করিয়া Godavari House হইতে লইয়া গিয়া বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে বেদগান করিতে ২ নূতন মন্দিরে নূতন সিংহাসনোপরি বসাইয়া পরে পূজা ভোগ হোমাদি করিয়া মহানন্দে সকলে প্রসাদাদি পাওয়া হয়। শ্রীরামনাম-কীর্ত্তন ও ভজন হয় এবং ভক্তদের Committee-র President-এর Report পড়া হয়। তারপর মাদ্রাজ ও বাংলোর হইতে আগত স্বামীজীদের lecture হয়। সমস্ত দিন সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত খুব আনন্দে ভক্তেরা সকলে কাটান। তারপর দুদিন সহরে lectures হয়। Godavari House হইতে মঠ কেবল পাঁচ মিনিটের রাস্তা। সহরের অনেক উপরে। মঠও অতি নির্জন, view অতি মনোরম। আমরা সকলে তাঁর কৃপায় ভাল আছি। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। এ সংবাদটা ওখানকার ভক্তদের দিও। এইবার আমরা বোধ হয় ১৯।২০ অক্টোবর নাগাদ বাংলোর আশ্রমে যাইতে পারি। তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মায়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক সন্তানের মুখে শুনিয়াছি, তিনি দীক্ষালাভের জন্য আগ্রহান্বিত তো ছিলেনই না, বরং ঐ কথা চিন্তাও করেন নাই। পূর্ব সুকৃতিবলে উদ্বোধনে মায়ের দর্শন লাভ করেন এবং মায়ের অপর একজন সন্তান দয়া করিয়া দীক্ষা বিষয়ে তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়া সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দেন। মা তাঁহাকে অহেতুক কৃপা করেন এবং তৎপরেই তাঁহার জীবনে পরিবর্তন আসে। মায়ের স্নেহ-কৃপা লাভ করিবার পর হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিয়া অন্য সব কামনা-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক মাকেই ইহ-পরকালের

অবলম্বন জ্ঞানে তাঁহার সেবা ও চিন্তাকে জীবনের ব্রত করেন। উপযুক্ত অধিকারী বুঝিলে মা করুণাতে স্বতই সন্তানের অন্তরে জ্ঞানভক্তির বীজ বপন করিয়া স্নেহাদরে পুষ্ট করিতেন, অন্য কিছুর অপেক্ষা করিতেন না।

জনৈক সন্তান অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু হইয়া এক আশ্রমে যোগদান করেন। আশ্রমে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। খাওয়া-থাকার কষ্ট, তদুপরি আশ্রমাধ্যক্ষ সময় সময় প্রবল পীড়নও করিতেন। তথাপি তিনি আশ্রমাধ্যক্ষকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন বলিয়া নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াও অনেকদিন আশ্রমে কাটাইলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে আশ্রমের কাজকর্ম নিয়ম কানুন অসহ্য বোধ হওয়ায় কাশী যাওয়া স্থির করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যান। তিনি ছোটবেলা হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভক্তিমান। সেজন্য কাশী যাওয়ার পথে বর্ধমানে নামিয়া ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর-দর্শনে গমন করিলেন এবং সেখান হইতে জয়রামবাটী গিয়া শ্রীশ্রীমার দর্শন পাইলেন। মাকে পাইয়া তাঁহার অপার স্নেহ-মমতা লাভ করিয়া দুঃখী বালকের হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া নিবেদন করিলেন তাঁহার দুঃখের কাহিনী। সন্তানের দুঃখে মায়েরও চক্ষে অশ্রু ঝরিল, তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া অভয় দিলেন এবং অযাচিত কৃপা প্রদর্শন-পূর্বক দীক্ষা দিয়া চিরকালের জন্য বদ্ধ করিলেন অক্ষয় স্নেহপাশে। মায়ের অশেষ স্নেহ-কৃপার অধিকারী হইয়া ঐ অঞ্চলেই দীর্ঘকাল বাস করিয়া তিনি সদাসর্বদা মাতৃচরণ দর্শন, সেবাধিকার ও স্নেহমাধুর্যরস-আস্বাদনে স্বীয় জন্ম সার্থক করেন।

ঠাকুরের জন্মস্থান হইতে অল্পদূরবর্তী একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও তাঁহার সহকারিগণ কেহ কেহ মায়ের শ্রীচরণাশ্রিত। তাঁহারা সময় সময় জয়রামবাটী আসেন মাকে দর্শন করিতে। ইহা তাঁহাদের অনেক ছাত্রই জানে। সংস্কারবশে একটি বালকের অন্তরে মাষ্টার মহাশয়গণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-ভাবের বীজও অঙ্কুরিত হইয়াছে। সে মাষ্টার মহাশয় কোথায় কাহার কাছে যান, অনুসন্ধান করিয়া সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ক্রমে শ্রীশ্রীমায়ের কথাও জানিতে পারিল। কিন্তু হেডমাষ্টার মহাশয় ভারি কড়া লোক, তিনি ছোট ছোট ছেলেদের কিছু না বুঝিয়া শুনিয়া কেবল দেখাদেখি ধর্মকর্ম করা পছন্দ করিতেন না। ছেলেটি তাই গোপনে গোপনে ঠাকুর-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা করিত। নবাসন আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারীকে সে বলিয়া-ছিল, 'আমার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি রাখার জো নাই, তাই আশ্রমে ঠাকুরকে দেখে দেখে অন্তরে এমন করে নিয়েছি, যখনই মনে করি দেখতে পাই।' সৌভাগ্যবশে মায়ের কৃপাপাত্র জনৈক সাধুর সঙ্গে তাহার আলোচনাদি হয় ও হৃদ্যতা জন্মে। সাধুদের সঙ্গে সে একদিন গোপনে গিয়া মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে ভক্তিমান ছেলেকে দেখিয়া মা প্রীতি লাভ করিয়া তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তাঁহারই আশ্রিত সন্তানের ছাত্র জানিয়া মা বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিলেন এবং স্নেহাদর প্রদর্শনপূর্বক প্রসাদ খাইতে দিলেন। ছেলেটির মনে কিন্তু হর্ষের সঙ্গে একটু শঙ্কাও উপস্থিত। সে ভাবিল, যদি তাহার মাষ্টার মহাশয় মাতাঠাকুরাণীর কাছে আসিয়া তাহার আগমনের কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন নিশ্চয়। তাহার ভাবনা সঙ্গী সাধুগণের নিকট প্রকাশ করিলে তাঁহারা মাকে সবিনয় নিবেদন করিলেন, তাহার

মাষ্টার মহাশয়ের কাছে যেন কখনও কথাপ্রসঙ্গে তাহার আগমনবার্তা প্রকাশ না পায়। মা মৃদুহাস্যে অভয় দিলে তাহার মন নিশ্চিন্ত হইল। মায়ের স্নেহমমতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ তাহার যাতায়াত বাড়িয়া চলিল এবং অচিরে সে মায়ের কৃপাও প্রাপ্ত হইল। তাহার মধুর চরিত্র, ব্যবহার ও কর্মতৎপরতায় শীঘ্রই জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ীতে সকলের সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল, মায়ের বিশেষ স্নেহ-প্রীতিও বাড়িল। পরে মাষ্টার মহাশয় যখন মায়ের প্রতি তাহার ভক্তি ও তাহার প্রতি মায়ের বিশেষ স্নেহ-মমতার কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনিও অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

ঐ অঞ্চলেরই জনৈক প্রৌঢ়বয়স্ক প্রাচীন ভক্ত একদিন অপরাহ্ণে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি সম্ভ্রান্ত সম্মানিত ব্যক্তি হইলেও মায়ের ঘরের ভিতর নীচে বসিয়াছেন একখানা আসনের উপর; মা নিজের বিছানার উপরে বসিয়া। ভদ্রলোক ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন, তাহা মাকে নিভৃতে শুনাইতেছেন, মা-ও মধ্যে মধ্যে মন্তব্যাদি করিয়া নানা বিষয় বলিতেছেন, বুঝাইতেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র। ছেলেটি খুব ভাল, ভক্তিমান; সেও পিতার কাছে বসিয়া উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনিতেছিল। মা তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে, পিতা পুত্রের চরিত্র ও ধর্মভাবের প্রশংসা করিয়া তাহার প্রতি মায়ের স্নেহাশীর্বাদ ও কৃপা প্রার্থনা করিলেন। মায়ের মন ছেলের প্রতি অনুকম্পায় পরিপূর্ণ। তখনই সেই অবস্থায় তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া দীক্ষা দিলেন। কি করিলেন, কি বলিলেন তিনিই জানেন; অন্যেরা দেখিল, ভক্তিগদ্গদচিত্তে বালক তাঁহার পদে লুটাইতেছে, তাহার পিতাও প্রেমাশ্রুপূর্ণ-লোচনে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া!

আর একটি অপরূপ ঘটনা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি। জয়রামবাটীতে মায়ের একজন বাল্য-সখী ছিলেন। দুইজনে খুব ভাব; একদিন তাঁহারা একসঙ্গে একবিছানায় শুইয়াছিলেন। বাল্য-সখীর অন্তরে মায়ের কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় তৎক্ষণাৎ মা তাঁহাকে সেই শায়িত অবস্থাতেই দীক্ষা দিয়া ধন্যা করিয়াছিলেন।

একটি রোগা ছেলে দূরদেশাগত; ঠাকুরের জন্মতিথি দিনে উপস্থিত হইয়া মায়ের কৃপা প্রার্থনা করিলে অপর সকলের আপত্তিসত্ত্বেও মা তাহাকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করেন। ঠাকুরের জন্মতিথি দিনে মা সাধারণতঃ দীক্ষা দিতেন না এবং সেই সময় তাঁহার শরীরও তেমন সুস্থ না থাকায় সকলে আপত্তি করিয়াছিল। মা অপরকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'কত কষ্ট করে এসেছে বহু দূর থেকে অসুস্থ শরীর, পরে কি হয় বলা যায় না, নিরাশ করতে পারলুম না, তাই আজই দীক্ষা দিলুম। ঠাকুরের কৃপায় তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।'

মা কোয়ালপাড়ায় একজন পুলিশের নজরবন্দী যুবককে তাড়াতাড়ি আসনের অভাবে তৃণাসনে খড়ের উপর বসাইয়া এবং নিজেও সেভাবে বসিয়া দীক্ষাদান করিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার সেখানে একবেলাও খাইবার উপায় ছিল না। মায়ের দীক্ষাপ্রণালী—যেন কোন অভিজ্ঞ লোকের পথহারা ক্লান্ত পথিককে ডাকিয়া কাছে আনিয়া সুমধুর বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া গন্তব্য স্থান দেখাইয়া দেওয়া—'ভয় নাই, এই সোজা পথে চলে যাও, বেশী দূর নয়, দেখা যায়!' এই তো ব্যাপার! এইজন্য আর ঘটার কি প্রয়োজন? ঠিকানা যাহাদের জানা নাই, আন্দাজে অনুমানে শুনা কথায় পথ ও লক্ষ্যস্থল দেখাইতে হয়, তাহাদেরই বাগ্‌বাহুল্য

অধিক! মা ছেলেকে যাহা বলিবার সোজা কথাতেই বলেন, বাক্যচ্ছটার বিস্তার করেন না। মায়ের স্নেহের স্বর, মিঠা বুলি আর হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টিই সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট।

মঠে একদিন অপরাহ্নে মায়ের মন্দিরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন প্রৌঢ়া ভক্তিমতী মহিলা অনিমেষ নয়নে মায়ের চিত্রমূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার শিশুকন্যাও তাঁহাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া মায়ের চিত্র দেখিতেছিল। একটু পরেই সে একবার চিত্রের দিকে তাকায়, একবার নিজ জননীর মুখের দিকে! তৎপরে অতীব উদ্গ্রীব হইয়া জননীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'মা, এ ফটো তোমার কি না বলো, ঠিক করে বলো, এ ফটো তোমার কি না?' জননী বালিকার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন, হাঁ না কিছুই বলিতে পারিলেন না। নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তির মনে হইল শিশুর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সত্যই সত্য উদ্ভাসিত—এই মা-ই ত সকল মায়ের অন্তরে। মায়ের স্নেহ-দৃষ্টিতে কি ছিল, কে জানে—যাহার দিকে চাহিয়াছেন, সেই বশীভূত হইয়াছে। সন্তানের মতো এখনও দেখিতেছি তাঁহার চিত্রপটের দিকে চাহিয়া, ঐ দৃষ্টির সম্মুখে মানুষ আত্মহারা হইয়া পড়ে নিজ জননীর প্রতিচ্ছবি দেখিয়া!

অনেক ভাগ্যবান মায়ের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারেও বিশেষ কোন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতে দেখা যাইত না। মা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াই সন্তানদিগকে ঐ সকল মহাব্রতে দীক্ষিত করিতেন—ব্রহ্মচারিগণকে সাদা ডোর-কৌপীন বহির্বাস ও সন্ন্যাসিগণকে গেরুয়া বস্ত্রাদি দিয়া। অবশ্য, সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছুগণকে পূর্বে মুণ্ডন করিতে হইত। জয়রামবাটীতে জনৈক সন্তান ব্রহ্মচর্যগ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতদিন এ ব্রত ধারণ করিতে হইবে?' মা তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'যতদিন দেহ আছে।'

জনৈক সন্তান সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ ও উপদেশ প্রার্থনা করিলে মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'বিশ্বাস নিষ্ঠাই আসল জিনিস, বিশ্বাস আর নিষ্ঠা থাকলেই সব কিছু লাভ হয়।'

জনৈক বিবাহিত গৃহস্থ সন্তান একদিন মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। তিনি ত্যাগীর জীবন যাপন করিয়া সন্ন্যাসীর মতোই ছিলেন। মা সব কথা জানিতেন এবং তাঁহাকে বিশেষ স্নেহাদরও করিতেন। মা বলিলেন, 'তুমি একমাত্র পুত্র, তোমার গর্ভধারিণীর অন্তরে আমি ব্যথা দিতে পারব না।' তিনি খুব অনুনয় বিনয় করিলে মা জানাইলেন, তাঁহার মা যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন, তবেই হইতে পারে, নতুবা নয়। তাঁহার গর্ভধারিণীও শ্রীশ্রীমায়ের পদাশ্রিতা পরমভক্তিমতী এবং ত্যাগবৈরাগ্যপূর্ণা। তিনি পুত্রের উন্নতির পথে বিঘ্ন হইলেন না, স্বহস্তে বস্ত্র গৈরিকে রঞ্জিত করিয়া সানন্দে অনুমতি দিলেন। পুত্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। মায়ের শ্রীহস্ত হইতে তিনি গৈরিক বস্ত্র এবং তাঁহারই অনুমতি অনুসারে মঠে পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট বিরজাহোম ও যোগপট্ট লাভ করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, হাঁপানী রোগী, সময় সময় প্রাণসঙ্কট দেখা যাইত। গর্ভধারিণী পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেও শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন পুত্রকে রাখিয়াই দেহত্যাগ করিতে পারেন, পুত্রশোক ভোগ করিতে না হয়। মা কৃপা করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, পুত্রের দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বেই তিনিও দেহত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত লোকে গমন করিয়াছিলেন।

আর একটি সন্তান মায়ের নিকট হইতে গৈরিক

ধারণ করিয়া মায়ের বাড়ী ত্যাগ করিতে না করিতেই তাঁহার গর্ভধারিণী আসিয়া মাকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহার পুত্র যাহাতে সংসারে ফিরিয়া যায়। তিনি খুব কাতর হইয়া কাঁদিলেন, প্রার্থনা করিলেন এবং অনুযোগও করিলেন। তাঁহার এই পুত্রের উপরই সংসারের ভরসা, খুব রোজগারী ছেলে, যুবতী স্ত্রী ও সন্তান আছে। তাহারই উপর সকলের জীবিকা নির্ভর করে। মা সব শুনিলেন, সহানুভূতি করিলেন, কিন্তু নূতন সন্ন্যাসীকে গৃহে ফিরাইয়া দিবার কথায় সায় দিলেন না। দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'সে ত ভাল পথেই গিয়েছে, আর তোমাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থাও করেছে, দেখবারও লোক আছে, শুনেছি। কাজেই আমি তাকে আবার ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে পারব না।' জননী পুত্রকে গৃহে ফিরাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহাশীর্বাদে তাঁহার হৃদয় অনেকটা শীতল হইল এবং খুব আশাভরসা লইয়াই তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও, যতদিন গর্ভধারিণী জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত মাতাঠাকুরাণীর অভিপ্রায়ানুসারে পুত্র জননীর সহিত শ্রদ্ধাভক্তির সম্পর্ক ও জননীর স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন

মায়ের অপর একটি সন্তান সুশিক্ষিত, সদ্বংশজাত, ভাল চাকরী করেন, বিবাহিত। ঘরে যুবতী স্ত্রী, প্রথম সন্তান-সম্ভবা। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত। সন্তানের অন্তরে সন্ন্যাসগ্রহণের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় চাকরী ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকট জয়রামবাটী আসিয়া উপস্থিত। মায়ের নিকট তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়া তিনি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় নিকটবর্তী নবাসন আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মায়ের নিকট সদা সর্বদা যাতায়াতকারী তাঁহার বয়স্ক গৃহস্থসন্তান কেহ কেহ ঘোর আপত্তি তুলিলেন—'এইরূপ ব্যক্তির সন্ন্যাসগ্রহণ অনুচিত।' শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা তাঁহাদের মনোভাব মায়ের নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে সন্ন্যাস না দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেও ত্রুটি করিলেন না। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, উনি যে কাজ করিতেন—উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা—তাহা এই দিকেই যোগাড় করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি সেই কাজ করিলে বহু ছেলে মানুষ হইবে, সমাজের ও দেশের উপকার হইবে। বাড়ীতে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য কিছু টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, আর ঘরে ফিরিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সন্ন্যাসের ব্যাপার লইয়া আলোচনা আন্দোলন চলিল; এরূপ ব্যক্তিকে সন্ন্যাস দিলে সমাজের ভাল না হইয়া মন্দ হইবে; এরূপ কাজ হইতে দেওয়া উচিত নহে— বাধা দেওয়াই কর্তব্য। এই সব কথা শুনিয়া মায়ের উক্ত সন্তানটির মনে ভীষণ উদ্বেগ উপস্থিত। নিরুপায় হইয়া কাতর অন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর-মার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিলেন না। সেই নির্জন আশ্রমের পর্ণকুটীরে কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়া আশা-নিরাশার উদ্বেগেই তাঁহার দিন কটিতেছে। মধ্যে মধ্যে সেই আশ্রমের জনৈক সাধু, যিনি প্রায়ই মার বাড়ীতে যাতায়াত করেন, তাঁহার নিকট মনোভিলাষ ব্যক্ত করেন ও মায়ের নিকট তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে বলেন। মা কয়েকদিন শুনিলেন, কিছুই বলিলেন না। যখন বাধা-প্রদানকারীদের আলোচনা আর নাই, সব চুপ চাপ, তখন একদিন সেই সাধুর নিকট খবর দিলেন তাঁহাকে আসিবার জন্য। তিনি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে আসিলেন, কি হয় না হয়! কিন্তু স্নেহময়ী জননী প্রিয় সন্তানের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিলেন না, তাঁহাকে গৈরিক বস্ত্র দিয়া স্বহস্তে সন্ন্যাসী সাজাইলেন। সেই মহাভাগ্যবান্ সন্ন্যাসী পরে

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সুদীর্ঘ জীবনযাপন করিয়া ঠাকুর-মার মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন বহু জিজ্ঞাসুর নিকটে, অনেক তাপিত প্রাণ সুশীতল করিয়াছিলেন।

জয়রামবাটীতে স্বহস্তে গেরুয়া দিয়া মা অনেক ছেলেকে সন্ন্যাসী সাজান দেখিয়া মেয়েদের হৃদয়ে আতঙ্ক, শোকের সঞ্চার হয়— মা হাসেন উৎফুল্ল হৃদয়ে—তাঁহার একটি সন্তান সংসারের দারুণ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইল!! সংসারী ছেলেদের অর্থোপার্জন, বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবনযাপনে নিরুৎসাহ না করিলেও মা ত্যাগী সন্তানকে ত্যাগের পথ দেখাইয়া দিতেন পরম উল্লাসে।

সংসারের বোঝা, দায় মা কিরূপ ভয়াবহ মনে করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। জয়রামবাটীর উত্তর দিকে আমোদর নদ পার হইলে বিখ্যাত দেশড়া গ্রাম। সেখানে যথার্থ ঘোষ নামে এক সঙ্গতিশালী গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে কিছুকাল কোন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিলেন, পরে স্বগ্রামে বাস করিয়া ডাক্তারি করিতেন। তখনকার দিনে ম্যালেরিয়া কবলিত পাঁড়াগায়ে কুইনাইন মিকশ্চার, জোলাপের ঔষধ, টনিক, আর ফোড়া-ঘায়ের ঔষধ জানিলেই মস্ত ডাক্তার। যথার্থবাবু ডাক্তারিতে বেশ রোজগার করিয়াছিলেন, চাষবাস, জমিজমা ভালই ছিল। তাহা ছাড়া সেই দেশে একটি প্রাচীন শিল্পব্যবসায়— সাধারণ বালি-কাগজে বিশেষ প্রকারে প্রস্তুত মণ্ড বিলেপন করিয়া মূল্যবান নক্সা তৈরীর কাগজ প্রস্তুত করিয়াও বেশ রোজগার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কোন সন্তান ছিল না, তাঁহার স্ত্রী নিজের একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে মানুষ করেন এবং সে বড় ও যোগ্য হইয়া সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করে। যথার্থবাবু ও তাঁহার স্ত্রী স্বীয় অঙ্গজ পুত্রের মতোই সেই ছেলেটিকে দেখিতেন এবং সেও তাঁহাদিগকে নিজের পিতামাতাই মনে করিত। যথার্থবাবু যোগ্য পালিত পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দেই কাল কাটাইতেছিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে—বার্ধক্য দেখা দিয়াছে, তবে বেশ শক্ত আছেন এখনও, চলাফেরা করিতে পারেন, মায়ের বাড়ীতে প্রায়ই আসেন। মা তাঁহাকে স্নেহ করেন। গ্রাম সম্পর্কে তিনি মায়ের মামা, কাজেই তাঁহার সন্তানদের দাদা। দাদা নাতিগণের সহিত মজলিশ করিতে আসেন সদা সর্বদা। মাকে প্রণাম ও কুশলসংবাদ গ্রহণানন্তর দাদা মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া খোস গল্প করেন। সংসারের ভাবনা নাই—ছেলেই দেখে, নিজে খান-দান-বেড়ান। আর একটু আধটু ডাক্তারীও করেন। তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল—রোগীর ঔষধ প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেই দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়া দিতেন, গরীব লোক দাম সঙ্গে সঙ্গে দিতে না পারিলেও পরে দিলেও চলিত। এইভাবে ডাক্তারবাবু শেষ জীবনে নিশ্চিন্ত হইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটাইতেন। কয়েকদিন তাঁহার দেখা নাই। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা আসিয়াই সটান বাড়ীতে ঢুকিয়া মায়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। মা তখন ঠাকুরকে তুলিয়া ঘর ঝাড়ু দিতেছেন।

মা নিজেই স্বীয় ঘর দরজা নিত্য ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করেন, করিবার লোক নাই বলিয়া নহে, তিনি নিজে কাজ করিতে ভালবাসেন, নিজের কাজ যতদূর সম্ভব নিজেই করেন ও ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজে সহায়তা করেন। এই সব কাজে, বিশেষ করিয়া রোজ বিকালে অনেকক্ষণ বসিয়া টিপিয়া টিপিয়া আস্তে আস্তে জল মিশাইয়া খুব মোলায়েম করিয়া আটা মাখিতে

দেখিয়া একদিন একটি সন্তান বৃদ্ধবয়সে এত কষ্ট না করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, মা তাঁহাকে স্নেহার্দ্র স্বরে বলিয়াছিলেন, 'বাবা! কাজ করাই ভাল। আশীর্বাদ কর যেন কাজ ক'রে ক'রেই যেতে পারি।' মা নিত্যকার মতো ঘর ঝাড়ু দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার যথার্থ-মামা দরজার সম্মুখে নত মস্তকে প্রণামান্তর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, '—মারা গিয়াছে গত পরশু।' মায়ের হাতের ঝাড়ু পড়িয়া গেল। এলোথেলো হইয়া সেখানেই ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত, বদনমণ্ডল বিষণ্ণ, বাক্‌রোধ হইল।

বৃদ্ধ অবিরল অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সব কথা বলিয়া মর্মবেদনা লাঘব করিতে লাগিলেন। মা-ও নীরবে সব কথা শুনিতেছেন—মাত্র মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বিলাপধ্বনি, শোকের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। বৃদ্ধ বলিলেন, 'স্ত্রী শোকে উন্মাদপ্রায়। নিজের পেটের সন্তান নাই, ভাইপোকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, বিবাহ দিয়াছে, সুখের সংসার গড়িয়াছে, কত আশা-ভরসা! ছেলেটিও যোগ্য হইয়াছিল, সব কাজ গুছাইয়া খুব ভালভাবে সংসার চালাইতেছিল। তিনি নিজেও তাহার উপর সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে সুখে কাল কাটাইতেছিলেন, কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না। হঠাৎ অসুখ হইয়া জোয়ান ছেলে মারা গেল, এখন তাঁহার উপর আবার সকল বোঝা, সংসারের দায় পড়িল।' হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ উপশম করিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, 'তাই ছুটে এলাম আপনার কাছে, ভাবলাম মায়ের কাছে গেলেই শান্তি পাব, জ্বালা কিছুটা জুড়াবে।' সত্যসত্যই বৃদ্ধের হৃদয় হাল্‌কা বোধ হইল, মা নিজে যেন সেই শোক-বহ্নি টানিয়া নিয়াছেন। মা শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'বেশ ছিলে, সংসারের কোন বোঝা উপরে ছিল না, নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে খেয়ে বেড়িয়ে দিন কাটাচ্ছিলে, এখন আবার সব ঘাড়ে পড়ল।' বৃদ্ধও হা-হুতাশ করিয়া বলিলেন, 'একদিকে পরিবারও শোকে পাগল, আবার সেই ছেলের অল্পবয়স্কা বিধবা স্ত্রী, কাচ্চা-বাচ্চা, তার উপর সংসারের বোঝা, বাড়ীঘর, গরুবাছুর, চাষবাস – সব কিছু এখন আমাকেই দেখতে হবে। যা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, সেই সংসার আবার ঘাড়ে পড়ল।' মাও খুব সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, 'তাইত! বুড়ো বয়সে আবার সংসার ঘাড়ে চাপলো।' যথার্থবাবু অনেকটা শোকের জ্বালা কমাইয়া হাল্‌কা হৃদয়ে প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। মা তখনও সেই ভাবেই স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন – হাতের ঝাড়ুখানা পাশেই পড়িয়া, মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে। মাটিতে পা মেলিয়া, একটু কাত হইয়া, বামহস্ত মাটিতে ভর দেওয়ার মতো, তাহার উপর ঘাড় ন্যস্ত – ডান হাত কোলের উপর রাখিয়া বিমনা হইয়া বসিয়া আছেন! কি ভাবিতেছেন! খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বয়সে যথার্থের ঘাড়ে সংসার পড়লো!' একটি সন্তান দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আরও এক-দু'বার একটু থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বুড়ো বয়সে যথার্থর ঘাড়ে সংসার পড়লো!' সংসারচাপে মায়ের এই গভীর নিরাশাব্যঞ্জক ভাব ও বৃদ্ধের উপর সহানুভূতি দেখিয়া সন্তানটির মনে প্রশ্ন হইল, পুত্রের মৃত্যুশোক অপেক্ষাও সংসারের বোঝা বহন করা কি কঠিন? অল্প বয়স তাহার, সংসারের বোঝা কি—কিছুই বুঝিতে পারেন নাই বটে, তবে মায়ের চিন্তা দেখিয়া মনে হইয়াছিল উহা নিশ্চয়ই দুঃসহ।

তাই মায়ের খুব আনন্দ হয় তাঁহার কোন সন্তানের সংসার-বন্ধন কাটিতে পারিলে! "ঘুড়ি

লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।" সংসার-ত্যাগীদের প্রতি মায়ের অন্তরের কিরূপ টান তাহা দেখিয়াছিলাম নিম্নোক্ত ঘটনায়। মায়ের এক খুড়তুতো বোনের ছেলে বাঁকু (বঙ্কিম) অতিশয় সুকণ্ঠ, ছোট বেলা হইতে গানবাজনায় প্রীতি। একটু বড় হইলে পর বাঁকু চেষ্টা করিয়া গান শিখিয়া রামায়ণ গাহিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে নিজেই এক রামায়ণ দল গঠন করিয়া পেশাদার কীর্তনীয়াদের মতো টাকা লইয়া গাহিতে লাগিল। সুকণ্ঠ ভাবুক বাঁকু চামর দুলাইয়া নূপুর পরিয়া নাচিয়া নাচিয়া সুললিত স্বরে যখন শ্রীরামনাম গান ও লীলাকীর্তন করিত, তখন শ্রোতাদের মনপ্রাণ মোহিত হইত। ভাল রামায়ণগায়ক বলিয়া অল্পদিনেই বাঁকুর নাম চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। বাঁকুর জন্মস্থান জয়রামবাটীর ক্রোশখানেক দক্ষিণ-পূর্বে পুকুরে গ্রামে। ছোটবেলা হইতেই মাতুলালয় জয়রামবাটীতে আসে যায়। তাহার মায়ের আপন ভাই নাই, আছেন বাঁকুর মাসীমা ও দিদিমা এবং মায়ের জ্ঞাতি ভাই-ভগিনী, অনেক মামা-মামী। মাতাঠাকুরাণী তাহার সম্পর্কে মাসীমা। মা-মরা বাঁকু শিশুকাল হইতেই মায়ের বিশেষ স্নেহভাজন এবং তাহার সুকণ্ঠের সঙ্গীতও মা ভালবাসেন। মায়ের বাড়ীতেও বাঁকুর রামায়ণগান হইয়াছে।

জয়রামবাটীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র স্নেহভাজন বাঁকু সদাসর্বদা যাতায়াত করে। তাহার রামায়ণগানের যখন বেশ পসার প্রতিপত্তি জমিয়া উঠিল তখন বাঁকু সব ছাড়িয়া উধাও। অনেকদিন কেহ তাহার কোন খোঁজ-খবর পায় নাই। একদিন প্রভাতে জয়রামবাটী ক্ষুদ্রপল্লী হঠাৎ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে সতীশ বিশ্বাসের বাঁকুলে (ভিতর বাটীতে)। কি ব্যাপার। খোঁজ করিয়া শুনা গেল সতীশ বিশ্বাস ভোরে শৌচাদির জন্য নদীর দিকে গিয়াছিলেন, সেখানে বাঁকুকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া কহিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া আসিয়াছেন। বাঁকু এখন সাধু! মাতাঠাকুরাণীও এই খবর শুনিবামাত্রই সতীশ বিশ্বাসের ঘরে চলিলেন। মাকে কখনও মামাদের বাড়ী ভিন্ন অপর কাহারও বাড়ীতে যাইতে দেখা যাইত না। আজ তাঁহাকে সতীশ বিশ্বাসের ঘরে চলিতে দেখিয়া জনৈক সন্তানও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পিছনে চলিলেন। সন্তানটির বাঁকুর সঙ্গে পূর্বে হৃদ্যতা ছিল। অনেক দিন পরে তাহার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনায় অন্তরে খুশীও হইলেন। সতীশ বিশ্বাসের বাড়ীর ভিতর উঠান পাড়ার লোকে ভরতি, পূজনীয়া ভানি পিসীও সেখানে ছিলেন। সতীশ তাঁহার ভাইপো এবং তিনি পৃথক বাড়ীতে থাকিলেও সতীশের ঘরেই খাইতেন। মাকে দেখিয়া পিসী উল্লসিত হৃদয়ে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'সতীশ, ওরে সতীশ! আজ তোর সৌভাগ্যের দিন, মা নিজে এসেছেন তোর ঘরে! শীগ্‌গির আশন দে, শীগ্‌গির আসন দে, প্রণাম ক'রে বসা।'

সতীশের স্ত্রী ঘরের দুয়ারে লাতা (ন্যাতা) দিতেছিলেন, উঁচু বারান্দা সবে লেপা হইয়াছে। সুদক্ষ গৃহিণীদের পাকা হাতে মাটি গোবর দিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পদ্মদলের মতো একটির পর একটি সুবিন্যস্ত পোঁছ সুলেপিত কাঁচা ভিটা-বাড়ীর প্রাতঃকালের শোভা, শুচিশুদ্ধতা অন্তরে কি নির্মল পবিত্র ভাবের উদয় করে, তাহা পাড়াগাঁয়ে যাঁহারা বাস করিয়াছেন, ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বিশ্বাসের স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া হাত ধুইয়া অতি সুন্দর একখানি গালিচাসন আনিয়া বিছাইয়া দিলেন বারান্দায়। দম্পতি

প্রসন্ন হৃদয়ে জোড়হস্তে আবাহন করিয়া মাকে আসনে বসাইয়া দিয়া ভক্তিভরে পদতলে প্রণত হইয়া শুভাশীর্বাদ লাভ করিলেন। মা গোময়-লিপ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঁচু বারান্দায় পূর্বমুখী হইয়া বসিয়াছেন। বারান্দার কিনারায় বসিয়াছেন, নীচে পা ঝুলিতেছে কোলের উপর হাত-দুখানি, পরিধানে লাল সরুপাড় শুভ্রবস্ত্র, ঈষৎ ঘোমটা টানা, প্রসন্ন মুখমণ্ডল, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশরাশি বক্ষের দক্ষিণ পাশ হইয়া নীচে ঝুলিতেছে। মা বসিয়াছেন এমনই ভাবে, দেখিলে মনে হয় যেন মা লক্ষ্মী স্বয়ং ভাগ্যবান গৃহস্থের দরজায় উপবিষ্টা, পাশেই ধান্যপূর্ণ মরাই (ভাণ্ডার) শোভা বিস্তার করিয়া তাঁহার শুভাগমন সূচনা করিতেছে।

এখানে আর একদিনের একটি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য চিত্তপটে প্রকাশ পাইতেছে। হেমন্তকাল, মা ভোরে বাহিরে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া শিশিরার্দ্র চরণে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, শুষ্ক ধূলিকণা পদতলে লিপ্ত হইয়া আছে। ক্ষণিক পূর্বে মায়ের বাড়ীর প্রাচীন ঝি, আমাদের শশী মাসী, আসিয়া লাচ (নাচ--নাচদুয়ার) অর্থাৎ বাড়ীর ভিতরের প্রবেশদ্বার নিত্যকার নিয়মে পরিপাটি-রূপে লেপিয়া দিয়া গিয়াছে মাত্র। মা দরজায় আসিয়া যুগলপদ একত্র করিয়া দাঁড়াইয়াছেন দরজা খুলিবার জন্য। ঠেলিলেন, দরজা খুলিল, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঈষৎ আর্দ্র, সদ্য লিপ্ত সেই দ্বারতলভূমিতে তাঁহার ধূসর-ধূলিরঞ্জিত শ্রীচরণযুগলের এমন সুন্দর ছাপ পড়িয়াছে যে, সে অতুলনীয় শোভা দেখিয়া মনে হয়, স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী এইমাত্র গৃহাভ্যন্তরে শুভ প্রবেশ করিয়াছেন।

বাল্যকালে লক্ষ্মীপূজা দিবসে গৃহদ্বারে পিষ্ট তরল তণ্ডুলচূর্ণযোগে আলিম্পন ও পাশে পাশে দেবীর গৃহপ্রবেশের পরিচায়ক শুভ পদচিহ্ন-অঙ্কন দেখিয়াছিলাম, অদ্যকার এই শ্রীপদচিহ্ন তো ঠিক তাহারই ন্যায়! তবে সে-সকল ভক্তহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার কল্পনাচিত্র, আর ইহা তো সত্যবস্তু। সেই চিত্তমন-বিমোহন পদচিত্র নয়নযুগল আকর্ষণ করিয়া রাখিল—হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করিল। গোপীরা যমুনাতটে এই পদচিহ্ন দেখিয়াই তো অনুভব করিয়াছিলেন ধরণীর পুলক-শিহরণ। ভাগ্যবতি ধরণি! সত্যই তুমি বসুমতী! দেখিতে দেখিতে পুলক বিষাদে পরিণত হইল। হায়! মুহূর্ত পরেই এই ধরণীশোভা বিলীন হইয়া যাইবে মহামায়ার গর্ভাকাশে, আর তো উহা ক্ষুদ্র জীবের স্থূল চক্ষের গোচর হইবে না! কি করা যায়, উহাকে রক্ষা করার কি কোন উপায় নাই! না, কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বিষণ্ণ হৃদয়ে পদরজ শির-বক্ষে ধারণ করিয়া মন একটু শান্তি পাইল, প্রফুল্ল হইল। তখন অন্তরে বিদ্যুতের মতো প্রকাশ পাইল, আশ্রিত-ভক্ত-হৃদয়ে চিরমুদ্রিত করেন লীলাময়ী তাঁহার লীলাসুন্দর কমল-চরণ। 'শতকোটি শশী হাসে চরণ-নখরে, আলো করে কালো রূপ হৃদয়-কন্দরে।'

সতীশ বিশ্বাসের গৃহদ্বারে মা উপবিষ্টা। সম্মুখে আসিয়া বাঁকু ভক্তিভরে পদতলে প্রণাম করিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইল। মা খুব প্রসন্ন, বাঁকুকে দেখিয়া স্নেহাশীর্বাদ করিয়া সহর্ষে বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'বাঁকু সাধু হয়েছে, বেশ করেছে; সাধু হয়েছে, বেশ করেছে'। বাঁকু মৌন, মাথায় লম্বিত দীর্ঘকেশ, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে খড়ম, একহাতে একটি পিতলের কমণ্ডলু, অপর হাতে একটি যোগদণ্ড। পাড়ার বালকবালিকার দল তাহাকে চারিপাশে ঘেরিয়া গোলমাল করিতেছিল। মা আসিতেই তাহাদের একটু সরাইয়া দেওয়া হইল। বাঁকুর আপন মাসী (আমাদের ভাবী মাসী) ভাবিনী দেবী, নিঃসন্তান বালবিধবা, পুত্রতুল্য বাঁকুর এই বেশ দেখিয়া কাঁদিতেছেন। পাড়ার অনেক মেয়েরাই জড়

হইয়াছেন, তাঁহারাও অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে তাহাকে দেখিতেছেন আর শোকের উচ্ছ্বাস তুলিতেছেন। পুরুষেরাও অনেকে আসিয়াছেন—নানা জনের নানা মত, কিন্তু এমন সুন্দর পেশা রামায়ণগান ছাড়িয়া বাঁকুর এই বাউল বেশ ও সাধুগিরি কাহারও পছন্দ হয় নাই। একমাত্র মা-ই তাহাকে প্রশংসা করিতেছেন। মা বলিতেছেন, 'সাধু হয়েছে, খুব ভাল কাজ করেছে! কি আছে এই হাড়মাসের খাঁচাটায়! এই ত দেখনা—বাতে ভুগে মরছি! এই দেহটাতে আছে কি? কিসের জন্য এত মায়া! দু'দিন পরেই ত শেষ হয়ে যাবে। তখন পুড়ালে হবে দেড়সের ছাই! ওই দেড়সের ছাই বইত নয়! বাঁকু সাধু হয়েছে, ভগবানের পথে গিয়েছে, বেশ করেছে, বেশ করেছে।' মা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বাঁকুর প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। উপস্থিত সকলে নীরব গম্ভীর হইয়া শুনিতেছেন। একটু পরে মা বাঁকুকে নিজের আবাসে আহ্বান করিয়া গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। সঙ্গী সন্তানকে বলিলেন, 'বাঁকুকে নিয়ে চল।' তাঁহারা দুই বন্ধু বহুকাল পরে সাক্ষাতে বিশেষ আনন্দিত, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া মায়ের পিছনে পিছনে চলিলেন।

ঘরে আসিয়াই মা স্বহস্তে ফল কাটিয়া সাজাইয়া পাত্রটি সন্তানের হাতে দিয়া বাঁকুর জল খাবার পাঠাইয়া দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাওয়ার কালে তাহাকে যতদিন ইচ্ছা এখানেই (মায়ের বাড়ীতেই) থাকা-খাওয়ার জন্য বলিলেন। বাঁকুর শরীর খারাপ হইয়াছিল। মায়ের যত্নে ভাল হইতে লাগিল। মায়ের স্নেহে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিতেছে। মৌনী হইলেও অন্তরালে সময়ে সময়ে মায়ের সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলে এবং তাহার পূর্ববন্ধুর সঙ্গেও কদাচিৎ দু'-একটি কথা বলিত অন্যের অসাক্ষাতে। বাঁকু চুপচাপ থাকে আপনার ভাবে, সকালে সন্ধ্যায় তাহার সুমধুর স্বরে গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করে, কিন্তু সে কেবল বাউলদের মধ্যে প্রচলিত গানই গায়। শরীর একটু ভাল হইয়াছে। সকলেই ভাবিতেছেন, এখন এখানেই থাকিবে, কিন্তু হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন ভোরে সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ জানিল না।

বাঁকুর অবস্থানকালে মায়ের বাড়ীতে একজন গায়ক ভক্ত আসিয়াছিলেন। একদিন বিকালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে গান গাহিলেন - সবই ঠাকুরের মহিমাপূর্ণ গান। গায়কের ও অপরের অনুরোধে বাঁকুও গাহিল—তাহার নিজের ভাবে। মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া গান শুনিতেছেন, বাঁকুর গান তাঁহার খুব হৃদয়গ্রাহী হইতেছে বুঝা গেল তাঁহার কথায়। পার্শ্ববর্তী সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বাঁকু খুব গায়—সব আত্মতত্ত্বের গান।' বাহিরের ভাসা ভাসা ভাব—কথার চটক মায়ের হৃদয় বিশেষ স্পর্শ করিত না। তিনি অন্তরের টান ও বস্তুর মূলে দৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ দেখিলে অধিকতর আনন্দ পাইতেন।

সাধুভক্তি সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন সন্ধ্যার পরে একটি সন্তান মাকে পত্রাদি পড়িয়া শুনাইতেছেন। মেঝেতে আসনের উপর মা বসিয়াছেন পা মেলিয়া। সম্মুখে হ্যারিকেন লণ্ঠন। ছেলেটি মায়ের পাশেই বসিয়া মাথা নীচু করিয়া পত্রাদি পড়িতেছেন। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল, অল্প দূরে একটি মস্ত বড় তেঁতুলে বিছা (চেলা) মায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিবামাত্রই সন্তানের মনে হইল মাকে কামড়াবে না তো! তৎক্ষণাৎ এক লাথি মারিয়া তাহাকে পিষিয়া ফেলিলেন। তাঁহার

লাঠি বা অন্য কিছু দেখিবার সময় ছিল না— সর্বনাশ, যদি মাকে কামড় দেয়! যেই দেখা, অমনি সজোরে লাথি। মা মৃত জীবটির দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সাধুর পায়ের আঘাতে প্রাণ গেল!' এমন ভাবে বলিলেন, যেন তাহার সদ্‌গতি হইল! সন্তান নিজের সাধুত্ব কতটুকু ভালই জানেন; তবে মায়ের কৃপাদৃষ্টি ও শুভ ইচ্ছাতে ইহার সদ্‌গতি যে নিশ্চয় হইবে, ভাল করিয়াই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। আরও ভাবিতে লাগিলেন, সাধুত্বের প্রতি মায়ের কি শ্রদ্ধা বিশ্বাস!

অপর এক সময়ে, মা বাড়ীতে নাই, দুই জন হিন্দুস্থানী সাধু ভিক্ষার্থ আসিয়াছেন। একজন সন্তান তাঁহাদের ভাল করিয়া সিধা দিয়া বিদায় করিলেন। উপস্থিত কেহ কেহ বলিলেন, উহারা সাধু নহে, পেশাদার ভিক্ষুক, সাধুর পোশাক গেরুয়া পরিয়া লোক ঠকায়। একজন বলিলেন, "'শেয়ালমারা', দিনে সাধু সেজে ভিক্ষা করে, রাত্রে শেয়াল মেরে খায়।" এরূপ শেয়ালমারা সত্যই আছে, হিন্দুস্থানে দেখা যায়। সন্তান বলিলেন, 'যেই হউক মায়ের বাড়ীতে এসেছে আশা ক'রে, শুধু হাতে ফিরিয়ে দেয়া ভাল নয়।' তাঁহারা যথেষ্ট জিনিস পাইয়া খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন! দিন কয়েক পরে, মায়ের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি সিধে দেওয়ার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'বাবা! যেই হোক, সাধুর পোশাকে এসেছে ত? তাদের দিয়ে সাধুসেবাই করা হলো।'

মা কামারপুকুরে থাকাকালে একজন উড়িয়া সাধুর জন্য স্বয়ং কুটির করাইয়া দেন এবং অসুস্থ হইলে তাঁহার ভিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থা নিজেই করিয়াছিলেন। কাশী তীর্থযাত্রাকালে সেখানকার প্রাচীন সাধু তোতাপুরীর গুরুভাই চামেলীপুরীকে শীতের সময় কম্বল দিয়াছিলেন। মা নিজেও যেমন সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন, তেমনই তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদিগকেও সাধুভক্তি শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা যাহাতে সাধুদের সহিত শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ ব্যবহার করেন, কাজে কথায় কোনপ্রকার অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ না পায়, মায়ের সর্বদা সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকিত। সামান্য ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ শোধরাইয়া দিতেন। রাধু প্রভৃতিকে বলিয়া দিতেন সাধুদিগকে ভক্তিভাবে প্রণামাদি করিতে। বাহ্যিক ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তির ভাব রাখিয়া চলিবার জন্য মা শিক্ষা দিতেন, অন্তরে ত্যাগী নিষ্ঠাবান গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতিও ঠিক সেইরূপই শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিতেন সকল সন্তানকে। মা জয়রামবাটীতে সাধু ও ভক্তগণের সেবার জন্যই জমি খরিদের কথা বলিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, জয়রামবাটীতে এবং উদ্বোধনে ভিক্ষার্থী সাধু বৈষ্ণব ফকিরগণের প্রতিও তাঁহার মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার বিস্ময় উৎপাদন করিত। এমন কি, গরীব দুঃখী আতুর অন্ধ ভিখারীদের প্রতিও তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আচরণ ও সহানুভূতি দেখিবার শিখিবার বিষয় ছিল।

হিন্দুদের দেবদেবীগণের ন্যায় অপরধর্মাবলম্বীদের দেবস্থানের প্রতিও তাঁহার বিশ্বাস ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চিৎপুর ব্রিজের নীচে রাস্তার পাশেই ভূতসাহেবের দরগা বড় জাগ্রত স্থান বলিয়া পরিচিত। উদ্বোধন ও পাশের বাড়ীর মেয়েরা দর্শনে যাইবেন, মা তাঁহার একটি রোগা ছেলেকে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। দরগা দর্শন করিয়া, সেখানে পূজা সিন্নি দিয়া প্রণামানন্তর বাবা ভূতসাহেবের প্রসাদ রজঃ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে ছেলেটি মার হাতে সেই রজঃ প্রসাদ দিল। মা একস্থানে উপবেশন করতঃ অতি ভক্তি সহকারে সেই রজঃ মস্তকে স্বয়ং ধারণ করিয়া পাশে দণ্ডায়মান ছেলের হাতে অতি সন্তর্পণে দিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, 'বাবা ভূতসাহেবের প্রসাদী ধূলি গায়ে মাথায় মাখ, দেহ সুস্থ হবে, বড় জাগ্রত।' মায়ের ভক্তিভাব দেখিয়া বিস্মিত সন্তান, তাঁহার মনে তত আস্থা না থাকিলেও মাথায় ও দেহে নাভির উপর ভক্তি-ভয়েই মাখিলেন। মা ততক্ষণ অতীব কাতর-ভাবে প্রার্থনা করিলেন, 'বাবা ভূতসাহেব! আমার ছেলেকে ভাল কর, বাবা!' [ক্রমশঃ]

মৃত্যু

বনফুল

অনিত্যকে নিত্য-মূল্য দিয়া
অসত্যকে সত্য নির্ধারিয়া
মরি মোরা বার বার
বহু-মৃত্যু কপালে সবার।

বহু-মৃত্যু পার হ'য়ে আসল মৃত্যুর
মুখোমুখি হইব যেদিন
হয়তো সেদিন
দেখিব সে মৃত্যু নয়
নব-মঞ্চে নব-বেশে তা-ও অভিনয়
অজানা নূতন লোকে
নূতন নাটকে
নূতন দর্শক সেথা, নূতন বিষয়
নূতন বিস্ময়।

মা

শ্রীমতী অপর্ণা রায় *

যে ভালবাসা কাঁদায়, আর
যে ভালবাসা হাসায়,
সাধ্য কি তা' ফুটিয়ে তুলি
শুধুই মুখের ভাষায়।

সারাদিনের কাজের ফাঁকে
মা যে ছুটীর আলো,
যেন সন্ধ্যাতারা জেগে আছে,
আকাশ গভীর কালো।

ধূপের গন্ধ বাতাসেতে
মিশে থাকে যেমন
নিঃশ্বাসেতে ধরা দিয়ে
ভরিয়ে রাখে মন,
দেখার মধ্যে অদেখা মা
তেমনি করে থাকে—
স্নেহের সৌরভে আমার
প্রাণকে ভরে রাখে।

কঠিন মাটি কঠিন ভুবন,
মা রয়েছেন, ভয় কিরে মন,
এপার ওপার তুই পারেতেই,
তাঁর যে আশীর্বাদ
রচে আমায় ঘিরে শক্ত দেওয়াল
মাথার উপর ছাদ।

মা যে অসীম ভালবাসা
আছে ভুবন ভরে
আমার ভাললাগায়, আছে
চার দেয়ালের ঘরে—
এতই সহজ, এতই সোজা
বুঝেও সব যায় না বোঝা,
তাই কি তাঁহার কোমল দুটি
রাঙ্গাপায়ের পাশে
জলপদ্ম স্থলপদ্ম
একই সঙ্গে হাসে।

* এম. এ. (কলিকাতা), এম. এ. (লণ্ডন), অধ্যাপিকা, লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ, কলিকাতা

আত্মারামো ভবতি

শ্রীশিবশম্ভু সরকার*

তোমার সৃষ্টি বিলসন মাঝে
সুর কাটে থাকি থাকি —
আলোকে আঁধারে লীলা বিভ্রমে
চেয়ে চেয়ে দেখে আঁখি।
রয়েছে সত্য ব্যাপ্ত নিহিত
বেদনার বাণে হয় উপচিত
দৃপ্ত-জ্ঞানের লহরিত সুধা
দিনে দিনে বাড়ে মানসের ক্ষুধা
সকল নিখিল করে অনাবিল
ফটিক জলের পাখী—
ক্ষুদ্র, সান্ত, তুচ্ছ জীবন
মহাকাশে উঠে ডাকি !

আনন্দ কই ? কি তার স্বরূপ ?
কোথা হোতে আসে জ্যোতি ?
কার নয়নের ইশারায় হাসে
বৈরাগ, ত্যাগ, যতী ?
কেন ঝেড়ে ফেলে ভোগের ভুবন
রূপ ক'রে আসে অরূপে তরণ
আছে, আছে সব—তবু কিছু নাই
পাহাড়-সীমানা অণু হোয়ে যায়
ঝালার সেতার সুরধুনী তার
তরঙ্গে আসে গতি—
রসের পাথার উলসে সাঁতার
শিব বুকে জাগে সতী !

---

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ), কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী হেমবরণী মুখোপাধ্যায়

মা সারদামণি ত্রিগুণধারিণী
মন্দিরে তুমি শ্যামা,
তাপিতে তরাতে সেজেছ ধরাতে
ভক্ত-হৃদয়ে শ্রী-মা।

জনকনন্দিনী রামের ঘরণী
তুমি যে দুঃখিনী সীতা,
রামকৃষ্ণপাশে নবরূপে এসে
হয়েছ সারদা মাতা।

অজ্ঞাননাশিনী জ্ঞানপ্রদায়িনী
তুমি মা সরস্বতী
লুকায়ে আসিলে বালিকা সাজিলে
গদাধর হল পতি।

কখনো শঙ্করী বামা ক্ষেমঙ্করী
বৈকুণ্ঠপুরেতে রমা
এ ভবসংসারে ভক্তের অন্তরে
শ্রী-মা রূপে তুমি, শ্যামা!

অবোধ সন্তানে জানিবে কেমনে
মহিমা তোমার কত ;
পদে দিও ঠাঁই শুধু এই চাই
চরণে শরণাগত।

সমর্পণ

শ্রীমতী মানসী বরাট

কেঁদেছি হে যত জীবন ভরিয়া,
যত আঁখিজল পড়েছে ঝরিয়া,
তোমারে ডাকি,
তুমি ছাড়া আর কেবা বেশী জানে,
রহিয়া গিয়েছে তার মাঝখানে
বিশাল ফাঁকি!

সরল ভক্তি-পুণ্যতোয়াতে
তোমার চরণ-কমল ধোয়াতে
তোমারে ভুলি,
খুঁজিয়া ফিরেছি নিজের সুবিধা—
সারহীন উপকরণের সিধা
নিয়াছি তুলি।

যখনি তোমারে শুনায়েছি গান,
দিই নাই যে গো সবখানি প্রাণ,
তাহারি কিছু—
সুরঝঙ্কারে আপনারে ছলি,
অন্ধ মোহেতে ছুটেছে কেবলি
বাসনা পিছু।
যাহা আছে বাকি, তাই একান্তে,
সমর্পিতেছি চরণ-প্রান্তে—
এবার তুমি,
সিঞ্চন করি কৃপা-সুধা-ধারা,
সিক্ত কর হে এ মরু-সাহারা
হৃদয়-ভূমি।

'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবারে রামকৃষ্ণ'

শ্রীঅমিত বসু

রাজগৃহে, প্রাসাদে বা অতুল বৈভবে নয়
এবার ভূমিষ্ঠ রাম ঢেঁকিশালে দরিদ্র-কুটিরে,
ধরার ধূলির 'পরে অবতীর্ণ পূর্ণ জ্যোতির্ময়—
অযোধ্যা ও বৃন্দাবন একতীর্থ কামারপুকুরে।

জয়রামবাটী গ্রামে মিথিলার মতো আলো ক'রে
জন্মালেন জ্ঞানরূপা সারদা, স্বয়ং নারায়ণী—
মায়ার সংসারে এলো মহামায়া মানুষ-শরীরে
যোগীর তদ্গত-চিত্ত ধ্যানে যিনি জগৎজননী।

নয় রাজপুত্র রাম—পিতৃসত্যে যিনি বনবাসী—
গোদাবরীতীর আর গঙ্গাতীর অনেক যোজন—
অদ্ভুত গৃহস্থরূপে আজ তিনি অদ্ভুত সন্ন্যাসী!
পঞ্চবটী আজ তাই চৈতন্যোদয়ের তপোবন।

এবারও সংশয়পূর্ণ সংসার-বিবর
ধর্মের সংকটে তাই দেব গদাধর
পূর্ণ করিলেন দীন ব্রাহ্মণের ঘর!
আতুরের অনাথের বন্ধু যে ঈশ্বর!

এবারও সংশয় সনে রণ-পূর্বে সেই যোগীশ্বর
যুগ-পার্থে দেখালেন অখণ্ড সত্তাকে!
তাঁর ভাবময় ছবি আঁকিবে বা কোন্ চিত্রকর
'যত মত, পথ' যাঁর কণ্ঠে মণিহার সম, তাঁকে
কোন্ বেদব্যাস কোন্ স্তবস্তুতি দেবে উপহার?
যে স্পর্শমণির স্পর্শে জ্ঞানযোগী পেল মহাজ্ঞান,
ভক্ত পেল প্রেমের যমুনা, গঙ্গা গোদাবরী যাঁর
পাদস্পর্শে পূত হয়, কথা যাঁর অমৃতসমান,
সেই দিব্য পুরুষেই অধিষ্ঠিত বাল্মীকির রাম,
সেই চিত্ত কৃষ্ণময়, আজ তাঁর রামকৃষ্ণ নাম।

সেবা

ব্রহ্মচারী সুখময়

একদিন গৌর কীর্তন ক'রে গম্ভীরা মাঝে এসে,
শয়ন করিল শ্রান্তদেহেতে আনন্দে রসাবেশে.
গোলাপের মত অরুণ অধর, নাসা তিল ফুল জিনি,
নয়নকমল কিবা মনোহর, ভুবন-আকর্ষণী।
অঙ্গ-লাবণি সোনার মতন, গলে শোভে বনমালা,
বেতসের মত পেলব দু'বাহু, রূপে ত্রিভুবন আলা।
প্রভুর সেবক গোবিন্দ দেখে গম্ভীরা-দ্বারে আসি,
সোনার গৌর শুয়ে আছে, মুখে প্রিয়-মিলনের হাসি,
দেখে গোবিন্দ সব কিছু ভুলে চেয়ে থাকে মুখপানে,
নয়নানন্দে ভাসে আর কাঁদে, বিরাম নাহিক মানে,
ভাবে 'কোন ভাবে ঘরে প্রবেশিয়া প্রভুর করিব সেবা
শুয়ে আছে প্রভু দ্বারের কাছেতে কি উপায়ে প্রবেশি বা ?'
অনেক ভাবিয়া ডিঙ্গায়ে প্রভুরে গোবিন্দ ঢুকে ঘরে,
শ্রীপদ দু'খানি বুকেতে করিয়া আনন্দে সেবা করে।
নয়নজলেতে ভাসে গোবিন্দ শ্রীচরণ বুকে ধরি,
সযতনে সেবা করে সে প্রভুর পুলকে আবেশে ভরি।
বহুখন পরে প্রভু চেয়ে দেখে গোবিন্দ কাছে বসে
পদসেবা করে পরমানন্দে, হুঁশ নেই ভাবাবেশে।
প্রভু ডেকে বলে, 'কি হে গোবিন্দ খাও নি এখনও ভাই ?'
গোবিন্দ বলে, 'আহার নিদ্রা জানি তোমার সেবাই।
জনমে জনমে আসি যেন প্রভু তব পদসেবা লাগি,
কভু যেন ভুলে না যাই তোমারে এই শুধু বর মাগি।
তোমারে ডিঙ্গায়ে এসেছি তোমার সেবার তরে, হে প্রভু !
নিজ সেবা লাগি যেতে নাহি পারি ডিঙায়ে তোমারে কভু ;
তোমারে সেবিতে অপরাধ হলে নরকে হউক গতি,
সহস্র-কোটি নরক ভ্রমণে হউক সে আমার মতি।'

তুষারতীর্থ অমরনাথ

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

পুণ্যভূমি ভারত। যুগে যুগে আর্ত মানবের কাতর আহ্বানে করুণায় বিগলিত হয়ে বারবার অবতরণ করেছেন অবতার পুরুষগণ এই দেবভূমিতে। কত মহামানবের, কত সাধকের পূত পদরজঃস্পর্শে ধন্য হয়েছে ভারতভূমি। সুবিশাল এই উপমহাদেশের বক্ষ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগণন তীর্থরাজি। প্রতিটি তীর্থই অনন্যতার স্বকীয়তায়,—'স্বে মহিম্নি' দেদীপ্যমান,—তবু তারই মধ্যে পথের দুর্গমতায়, প্রাকৃতিক শোভার বৈচিত্র্যে এবং শিবমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে একটি অনন্যসাধারণ দুর্লভত্ব অর্জন করেছে যে পুণ্যক্ষেত্রটি ;—তার নাম 'অমরনাথ'।

ভারতের উত্তরসীমান্তে 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীর। অত্যুক্তি নয়,—বাস্তবিকই স্বর্গতুল্য শোভার আকর এই জনপদটি। একই সঙ্গে মেঘ-রোদ্দ্রের, আলোছায়ার এমন খেলা, তুষারবিমণ্ডিত পর্বতমালার সঙ্গে শ্যামলা ধরণীর এমন মিলন, এমন সুন্দর করে সাজানো বৃক্ষরাজির অপরূপ সমাবেশ,—ক্ষণে ক্ষণে জলে স্থলে নভোমণ্ডলে এত পরিবর্তন,—এ বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না।

আবার সমগ্র কাশ্মীরের মধ্যে পহলগাম থেকে অমরনাথ—এই ত্রিশমাইলব্যাপী পথটির তুলনা নেই। ভারতের দুর্গমতম তীর্থক্ষেত্রগুলির মধ্যে অমরনাথ অন্যতম,—একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র দুর্গম বললে সত্যের অপলাপ হয়,—যেমন দুর্গম তেমনই সুন্দর,—বিশাল, ভয়াল অথচ নয়নলোভন মনোমোহন অপূর্ব শোভার আধার,—'রুদ্রমধুরে অপরূপ' অনুপম এই যাত্রাপথটি।

কথিত আছে যে, শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে প্রথম মানবনয়নগোচর হন তুষারলিঙ্গ শ্রীঅমরনাথজী। তদবধি এই বিশেষ তিথিটিই ৺অমরনাথজী দর্শনের প্রকৃষ্টতম সময় বলে বিবেচিত হয়। ঐ বিশেষ দিনটিতে দশসহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয় এখানে। দর্শনার্থীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বপ্রকার সুব্যবস্থাও করেন কাশ্মীর সরকার। শ্রাবণী পূর্ণিমায় দর্শনের একটিমাত্র অসুবিধা—অত্যধিক জনসমাগম। শ্রাবণী পূর্ণিমার মাসাধিক কাল পূর্ব হতেই শ্রীশ্রীঅমরনাথ দর্শনে যাত্রা করা চলে। তবে সে সময় সরকারী কোনো ব্যবস্থাই না থাকায় যাত্রীদের সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই যাতায়াত করতে হয়। বিপদের সম্ভাবনাও বেশী থাকে। প্রধানতঃ সাধু-সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অধিবাসিগণই এই সময় দর্শনে যান।

ব্যাসপূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমায় ৺অমরনাথদর্শনমানসে ১৩ই জুলাই (১৯৭৫ সাল) কোলকাতা থেকে জম্মু এক্সপ্রেসে রওনা হলাম আমরা। জম্মু থেকে বাসযোগে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর হতে বাসযোগে পহলগাম পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারপর পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা ডাণ্ডীবাহিত হয়ে অতিক্রম করতে হয় বাকী পথটুকু।

বন্যাবৃষ্টি-কবলিত হয়ে নানা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৮ই জুলাই এসে পৌছালাম পহলগামে। পহলগামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শুনেছিলাম পূর্বেই, কিন্তু সত্যই যে এত সুন্দর তা ধারণা ছিল না।

চারিদিকে তুষারবিমণ্ডিত গিরিশিখর, তারই

মাঝে শ্যামবনানীশোভিত গিরিরাজির পাদদেশে শ্যামল উপত্যকাভূমি—শেষনাগ ও লীডার নদীর সঙ্গমস্থল। সুদক্ষ চিত্রকরের নিপুণ তুলির টানে আঁকা একখানি অনুপম ছবি!

সমুদ্রতল থেকে পহলগামের উচ্চতা মাত্র ৭২০০ ফুট। অতীব মনোরম আবহাওয়া। স্বাস্থ্যকর স্থান। যাতায়াতও খুব কষ্টসাধ্য নয়। অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনের এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শীতের ক'মাস বাদে সারাটি বছরই এখানে জনসমাগম হয় প্রচুর। প্রয়োজনের তাগিদে তাই গড়ে উঠেছে দোকান-বাজার হোটেল-রেস্তোঁরা টুরিষ্ট লজ ইস্কুল ডাকঘর হাসপাতাল। ছোটোখাটো একটি শহর বলা চলে। ফলে স্বাভাবিক নির্জন পরিবেশের শান্তিও ব্যাহত হয়েছে কিছুটা।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল পহলগাম শহর থেকে মাইল খানেক নীচে একটি নির্জন উপত্যকাভূমিতে তাঁবু ফেলে। জায়গাটির নাম 'মুনবান'। খুবই সুন্দর স্থানটি। চারদিকে তুষারাবৃত গিরিচূড়া। চিরহরিৎবৃক্ষ-মেখলা পর্বতরাজি। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। পাশ দিয়ে অশ্রান্তগতিতে বয়ে চলেছে লীডার ও শেষনাগের মিলিত স্রোতোধারা। প্রতিটি তরঙ্গভঙ্গে তার তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে একটিই তান—'হর! হর! হর!!'

পদব্রজেই সম্পূর্ণ পথটি অতিক্রম করার ইচ্ছা সকলেরই। কিন্তু শোনা গেল বহুবৎসর বাদে এবার প্রচণ্ড তুষারপাত হয়েছে, ধস নেমেছে যাত্রাপথে। আমাদের পূর্ববর্তী যাত্রীদলের অনেকেই অসুস্থ হয়ে এবং নানা দুর্যোগে পড়ে দর্শন না করেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাত-আট জন আবার আমাদের সঙ্গে যাবেন। এই দুর্যোগের জন্য ঘোড়া নিয়ে যেতে হবে প্রত্যেককেই। শেষপর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি মিলবে কি না তাও সন্দেহ। যেতে হলে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। আশা-আশঙ্কায় এবং যাত্রার আয়োজনে কাটল একটি দিন। প্রায় ত্রিশজনের দল। মুনবান যৌগিক ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের দলের তত্ত্বাবধায়ক; তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি সস্নেহ নির্দেশ এবং সর্বপ্রকারে অকুণ্ঠ সহায়তার কথা কখনোই ভুলতে পারবো না। তাঁর সাহায্য ছাড়া এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না কোনোপ্রকারেই, যাত্রাশেষে তাই আনন্দপরিপূর্ণ চিত্তে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণতি জানাই বারবার।

২০শে জুলাই সকাল ৯টা নাগাদ মুনবান থেকে যাত্রা সুরু হল অমরনাথের পথে। শেষনাগ নদের তীর ধরে চলেছে পথ। পাহাড়ের গা বেয়ে পাক খেয়ে খেয়ে রাস্তা উঠেছে উপরে, দুপাশে পাহাড়ের গায়ে চির-হরিৎ চীড়-পাইনের শ্যামসমারোহ। সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত, স্তরে স্তরে সাজানো গাছগুলিকে দেখে মনে হয় মহাদেবের মন্দিরের প্রবেশ-পথটি কেউ যেন নিপুণহাতে সযতনে সাজিয়ে রেখেছেন গাছের 'কেয়ারী' দিয়ে। এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই কোথাও। মানুষের কৃত্রিম সজ্জা কোথায় লাগে এর কাছে! মাঝে মাঝে সতর্ক গম্ভীর প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে আখরোট 'বরত' আর বিশাল 'চীনার' গাছ। ক'দিন বৃষ্টির পর মেঘমুক্ত আকাশ আজ নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল। রবিকরোজ্জ্বল তুষারবিমণ্ডিত গিরিচূড়াগুলি দেখে মনে হচ্ছে যেন দেবাদিদেব প্রসন্নহাস্যে অভয় দিচ্ছেন তাঁর দর্শনাভিলাষী যাত্রীদের,—নীচে—বহু নীচে ছুটে চলেছে কলস্বনা পার্বত্য স্রোতস্বিনী।

বেলা দেড়টা নাগাদ 'চন্দনবাড়ী'-তে পৌঁছালাম। চারদিকে পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট

একটুকরো উপত্যকাভূমি। উচ্চতা—৯০০০ ফুট। চা ও খাবারের কয়েকটি দোকান চোখে পড়ল। এর পর এ পথে আর কোথাও দোকান বাজার কিছুই নেই। যাত্রীদের সুবিধার জন্য ...ীর সরকার পথিমধ্যে নানাস্থানে পান্থশালা নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন। তারই একটিতে আশ্রয় নেওয়া হল। আশ্রয়স্থলটির ঠিক পিছনেই ছোট্ট একটি হিমবাহ। হাতের নাগালের মধ্যে বরফ !! শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলে কেউ কেউ তক্ষুনি ছুটলেন তুহিন-স্পর্শের আনন্দ-অনুভবে।

তবে একটু নীচে নামলেই শেষনাগ নদ—শ্যামাভ জল বয়ে চলেছে অশ্রান্ত গতিতে। শেষনাগের জল শ্যামাভ বলে কেউ কেউ একে নীলগঙ্গাও বলে থাকেন। 'শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনী' গঙ্গা—ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র। গঙ্গাহীন দেশের এ-নদীর নাম তাই বোধ হয় নীলগঙ্গা, অমরগঙ্গা। তীব্র স্রোত—হিমশীতল জল। সকালে লীডারের ঠাণ্ডা কনকনে জলে স্নানাদি সেরেই রওনা হয়েছিলাম, তবু সুযোগ পেয়ে আরেকবার স্নান করা গেল। পথশ্রান্ত রৌদ্রতপ্ত শরীরটি স্নিগ্ধ হল নদীমায়ের স্নেহ-শীতল স্পর্শে।

স্নান সেরে বেশ অনেকক্ষণ বসে রইলাম নদীতীরে।

হর-চরণ-পরশনের আনন্দে উছল হয়ে উদ্বেলিত ফেনিল জলরাশি বয়ে সব বাধা-বিঘ্নকে দলিত মথিত বিচূর্ণিত করে ভীমগর্জনে ছুটে চলেছে শেষনাগ। মূক নদীও বুঝি আজ আনন্দে মুখর। নদীর 'কুলুকুলু' রব এখানে অবাস্তব কথা মাত্র।

'মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উছলি উছলি ধায়'

—সাধক কবির অনুভবলব্ধ এ কথা যে কতখানি সত্য তা' উপলব্ধি করা যায় এই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী-তীরে কিছুক্ষণ বসলে।

মনে পড়ল স্বামীজীর উদাত্ত কণ্ঠের বাণী—'The rolling river be thou ever, Sannyasin bold!' অনেকবারই পড়েছি, শুনেছি কথাটি কিন্তু আজ যেন নতুন ক'রে হৃদয়ঙ্গম হল এর প্রকৃত অর্থটি। কাঠের টুকরো, গাছের ডাল, ঝরা পাতা আরও কত জিনিসই না এসে পড়ছে সদাবীচিবিক্ষুব্ধ বেগবতী এই স্রোতস্বতীর বক্ষে। কিন্তু সততপ্রবহমানা সদাতরঙ্গায়িতা এই নদী মুহূর্তে তার সব মালিন্য, সব বিক্ষোভকে দূর ক'রে,—সব বাধাবিঘ্নকে হেলায় তুচ্ছ করে সুনির্মল পবিত্র জলরাশি বয়ে একাগ্রচিত্তে ছুটে চলেছে তার লক্ষ্যাভিমুখে। আমাদের জীবনও তো এমনই হওয়া উচিত। আবর্ত-পঙ্কিল যেন না হয় সে জীবন-ধারা,—গতিপ্রবাহ রুদ্ধ না হয় তার, আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন না হয় সে জীবন।

রাত্রি সাড়ে-আটটায় এখানে নামে সন্ধ্যার ছায়া। খাওয়া-দাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ বাইরে থাকার সুযোগ মিলল তাই। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

২১শে জুলাই সকালে চা পাঁউরুটি-মাখন জলযোগান্তে আবার যাত্রা সুরু। 'পিশুচড়াই' নামে বিখ্যাত, দুরারোহ আর বিপজ্জনক চড়াইটি পার হতে হবে আজ। একটি ছোট্ট তুষারক্ষেত্র পেরিয়ে সুরু হল চড়াই-ওঠা।

'পিশু' নামটি নাকি এসেছে 'পিষ্ট' বা 'পেষণ' শব্দটি থেকে। প্রবাদ আছে যে পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে একবার এই স্থানটিতেই দেবগণ পরাভূত করেছিলেন দানবকুলকে। নিহত দৈত্যদের অস্থিগুলিই কালক্রমে প্রস্তরীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এই দুর্গম পথটির। মৃত্যুর পরও যতখানি সম্ভব অনিষ্ট করতে ছাড়েনি তারা—সাধে কি আর বলে 'স্বভাব যায় না মলে'!

অবশ্য কেউ কেউ বলেন—'পিসর' শব্দটির

অর্থ পিচ্ছিল, দুর্গমতার জন্তই নাম পিসর বা পিশু। আবার কারো মতে এ পথে অতীতকালে পিশু ('পিস্সু') কীটের উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশী—তাই পিশুচড়াই নামে বিখ্যাত হয়েছে পথটি। যাহোক, নামকরণের কারণ নিয়ে 'নানা মুনির নানা মত' হলেও পথটি যে দুরারোহ—এ বিষয়ে কিন্তু সকলেই একমত। পিশুর উচ্চতা ১১০০০ ফুট। মাইল দুয়েক ধরে খাড়া চড়াই উপরে উঠে গেছে ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মত সহস্র পাক খেয়ে। অনেকখানি ইংরাজী z অক্ষরের মত সর্পিল রাস্তাটি। দুমাইলে উঠতে হবে দুহাজার ফুট। একদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতরাজি দাঁড়িয়ে আছেন রুদ্ররূপে ভ্রূকুটি-কুটিল লোচনে। ক্ষুদ্র মানবের স্পর্ধা আর সাহস দেখে বুঝি বিস্ময়ে স্তব্ধ গিরিরাজ! অন্যদিকে গভীর খাদ—আর তার মাঝে পিতার অবাধ্য সন্তানের মত নগাধিরাজের সব শাসন-তর্জনকে অগ্রাহ্য ক'রে পাহাড়ের গা বেয়ে এবড়োখেবড়ো পাথরে-ভরা আঁকা-বাঁকা অতি সঙ্কীর্ণ পথরেখাটি চলে গেছে উপরে—দূরে—বহুদূরে। ঘোড়াগুলি কোনোরকমে চলছে পাথর টপকিয়ে। আলগা পাথর গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও এ পথে আছে।

ভারতবাসী সত্যই তীর্থপ্রাণ। দেখলাম ৺অমরনাথজীর দর্শনমানসে এই দুর্গম পথও পদব্রজে অতিক্রম করে চলেছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে যেমন আছে প্রাণচঞ্চল তরুণ কিশোর, তেমনই আছেন যষ্টিনির্ভর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। নগ্নপদ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী চলেছেন কম্বল-কমণ্ডলু হাতে, নিঃসহায় খঞ্জ ব্যক্তি চলেছেন 'ক্র্যাচে' ভর দিয়ে, একজনের দুটি পা-ই নেই, তবু সবার পিছনে ধীরে ধীরে কোনোরকমে তিনিও চলেছেন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে।

অশ্বপৃষ্ঠারোহী আমাদেরই চলতে চলতে হাঁফ ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে উঠছি তো উঠছিই—এ ওঠার যেন শেষ নাই! আর এঁরা চলেছেন পদব্রজে। ক্লান্তদেহ, শ্রান্তচরণ—তবু দেখা হলেই হাসিমুখে বলছেন— জয় অমরনাথজীকী জয়! শ্রান্ত হলে পথের ধারেই পাথরে হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে আবার চলছেন ধীরে ধীরে। কি অসীম মনোবল আর দেবদর্শনের কি আকুল আগ্রহ! দেখে অভিভূত হয়ে যাই।

যাই হোক—সব কষ্টেরই অবসান আছে। পিশুঘাঁটির চড়াইও শেষ হল একসময়। ঠিক মাথার উপর উঠে সকলেই একটু বিশ্রাম ক'রে নিলেন। ৺অমরনাথজীকে স্মরণ করে এখান থেকে আমিও পদব্রজে যাত্রা সুরু করলাম। অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরে মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে।

পথের ধারে কোথাও প্রায়-বৃক্ষলতাবিহীন তুষারমৌলি গিরিরাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পরম গাম্ভীর্যে। পিতার আদরিণী নন্দিনীর মতই নৃত্যচপল ছন্দে গিরিগাত্র বেয়ে নীচে নেমে আসছে জলপ্রপাত সহস্রধারে – জলকণার উপর সূর্যের স্বর্ণরশ্মি পড়ে সৃষ্টি করেছে অপূর্ব শোভার। নীচের পথ জলে জলময়। কোথাও বা পথের পাশেই বরফের গুহা। বরফ গলে গুহার ছাদ বেয়ে জল ঝরছে বিন্দু বিন্দু, হিমশীতল জলে পিছল হয়ে উঠছে পথ। অন্যদিকে নীচে—বহু নীচে তুষারগলা জলধারা বয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে শেষনাগ নদ। একটু অসতর্ক হলেই বোধ হয় চিরবিশ্রাম নিতে হবে তারই শীতল ক্রোড়ে। কোথাও বা অনেকখানি পথ জুড়ে খালি বরফ আর বরফ। দূরে শুভ্রতুষারাবৃত গিরিচূড়া ঝক ঝক করছে প্রভাত-রবির উজ্জ্বল আলোকস্পর্শে। মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টিও হল।

নয়নলোভন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে দুপুর নাগাদ এসে পৌছালাম শেষনাগ হ্রদের তীরে। পিশুঘাঁটির পর থেকে শেষনাগ

হ্রদ পর্যন্ত পথটুকুর একদিকের পাহাড় প্রায় বৃক্ষলতাবিহীন, ফার্ণজাতীয় ছোট্ট ছোট্ট গাছ কিছু কিছু দেখা যায়—স্থানীয় ভাষায় তার নাম 'ইঠরু'। আর নদীর অপর তীরে দেখা যায় ভূর্জবন। শেষনাগের পর বড় গাছ আর চোখেই পড়ে না।

রাস্তা থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে শেষনাগ হ্রদ—শেষনাগ নদের উৎস। তিনদিকে পাহাড়-ঘেরা হ্রদটিকে দেখে সত্যই মনে হয় এ যেন সুরলোকবাসী কোনো নিপুণ চিত্রকরের আঁকা, ফ্রেমে আটকানো একখানি অতুলন ছবি! পান্নার মত সবুজ, স্থির জল। সেই শান্ত স্থির জলে ছায়া পড়েছে তুষারমৌলি গিরিশিখরের, শষ্পাবৃত গিরিগাত্রের, ভূর্জবৃক্ষের। মহাদেবের শ্বেতশুভ্র জটারাশির মতই তুষারধারা নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে—তারও প্রতিবিম্ব পড়েছে হ্রদের অচঞ্চল জলে। হ্রদের কিছুটা অংশ তখনও জমাট বরফ। জলের মাঝে এখানে-ওখানে সাদা ধবধবে বরফের ছোট্ট ছোট্ট স্তূপ—হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি শ্বেতশুভ্র রাজহংসের দল বিশ্রামরত।

একদিকে হিমবাহের তুষার-গলা জলধারা নিঃশব্দ চরণে এসে পড়ছে হ্রদের বুকে, অন্যদিকে গিরিগাত্র ভেদ করে হ্রদের জলরাশি শেষনাগ নদ-রূপে ছুটে চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গে,—আর এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে স্থির শুব্ধ অচঞ্চল শ্যামাভ জলরাশি—একটু কম্পনও নেই কোথাও তার। মহাশিল্পীর আপন হাতে আঁকা এ অপরূপ চিত্রপটের তুলনা মেলে না। অবাক হয়ে শুধু দেখি আর দেখি, তবু আশ মেটে না। এমন সুন্দরের স্রষ্টা যিনি, সেই মহাসুন্দরের চরণে প্রণতি জানিয়ে আবার চলা সুরু করি। বেশী দেরী হলে উদ্বিগ্ন হবেন সকলে।

একটি হিমবাহের পাশ কাটিয়ে শেষনাগ হ্রদ পার হয়ে পৌঁছালাম আজকের বিশ্রামস্থলে। স্থানটির নাম বায়ুজান—কেউ বা বলে ওয়াবজান। কাশ্মীরি ভাষায় নাকি বায়ুকে বলে 'ওয়াব'। এখানে মাঝে মাঝে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া চলে, তাই নাম ওয়াবজান। আবার কারও মতে এই স্থানটির পৌরাণিক নাম নাকি বায়ুবর্জন বা বায়ুব্যজন। পুরাকালে এক মহাবল দৈত্য এখানে প্রায়শঃই আত্মপ্রকাশ করত প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যারূপে। বহুদূর-বর্তী জনপদসমূহও বিধ্বস্ত হত তার অত্যাচারে। উপায়ান্তর না দেখে আর্ত মানুষ শরণ নিল শ্রীহরির। নরদুঃখে বিচলিত হলেন নারায়ণ। তাঁর নির্দেশে মহাসর্প শেষনাগ এখানে উপস্থিত হন এবং স্বয়ং এখানকার সমস্ত বায়ু শোষণ করে বিনষ্ট করেন দুরাচারী দৈত্যকে। তদবধি নাম হয় বায়ুবর্জন। কালক্রমে সেটি রূপান্তরিত হয়েছে বায়ুজান বা ওয়াবজানে। নাগলোক পাতালে—শেষনাগ হ্রদের মূল উৎসও নাকি হ্রদতলস্থ প্রস্রবণ।

শেষনাগের উচ্চতা ১২,২০০ ফুট। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। মাথার উপর মার্তণ্ডদেব বিরাজমান। কিন্তু শিবসান্নিধ্যে বোধ হয় তিনিও সন্ত্রস্ত। তাই সংবরণ করেছেন নিজের তেজকে। কেদারনাথের মত চটি এ পথে নেই। তবে কাশ্মীর সরকারের সুব্যবস্থায় আশ্রয়স্থল সর্বত্রই রয়েছে দেখলাম। সাধারণ যাত্রীদের জন্য রয়েছে সরাইখানা বা পান্থশালা। বেশ সুপ্রশস্ত লম্বা লম্বা ঘর। ছাদগুলি গুদামঘরের মত দুপাশে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, না হলে তুষারপাতে ধ্বংস হবার সম্ভাবনা বেশী। এ ছাড়া বন-বিভাগের বাংলো, P.W.D.-র বাংলো ইত্যাদিও আছে। সেগুলিতে স্নানাগারাদির খুব সুন্দর ব্যবস্থা আছে। চন্দনবাড়ী ছাড়া সর্বত্রই P.W.D.-র বাংলোয় ওঠার সুযোগ পাওয়ায় কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি আমাদের।

হ্রদ পেরিয়ে ডাকবাংলোর কাছে আসতে না আসতেই বৃষ্টি আরম্ভ হল ঝিরঝিরিয়ে। একে

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তায় আবার বর্ষণ! হাত-পা জমে যাওয়ার অবস্থা প্রায়। ভাগ্যক্রমে অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি থামল। ইতিমধ্যে চা-হালুয়া খেয়ে চাঙ্গা হয়েছে সবাই। রান্নার তোড়জোড় আরম্ভ হল। অবশ্য রান্না মানে ডাল ভাত নয়,—প্রচুর ঘি-আলু-কড়াইশুঁটি ও কাঁচালঙ্কাদি সহযোগে খিচুড়ি এবং ঘি-ভাতের এক মিশ্রিত সংস্করণ। চাল এত উঁচুতে সিদ্ধ হয় না। শরীরের পক্ষেও উপযুক্ত নয়।

ঘরের মধ্যে কেউ কেউ গল্পগুজবে মশগুল, কেউ বা বিছানাপত্রগুলি খুলে একেবারে কম্বলের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন—কেউ বা স্তবপাঠ করছেন। বাংলোর দুপাশেই বেশ চওড়া বারান্দা, পিছনের বারান্দায় এসে বসলাম চুপচাপ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ১৫।২০ বছরের কয়েকটি কাশ্মীরী তরুণ এসে বারান্দাতেই আশ্রয় নিল। বেচারীরা জায়গা পায়নি কোথাও। শুনলাম পনেরো-ষোলো বছর বয়স হলেই একবার অমরনাথ দর্শন করবে—এই তাদের প্রথা। নিজেদের বোঝা নিজেরাই বইছে। শীতবস্ত্র এবং খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্র দুই-ই যৎসামান্য নিয়ে চলেছে। বেশ ভজন গাইল আপন মনে। তারপর চা খেয়ে কম্বল বিছিয়ে ঐ খোলা বারান্দাতেই শুয়ে পড়ল কম্বল মুড়ি দিয়ে। এদের স্বাবলম্বন কঠোরতা আর দেবদর্শনানুরাগ দেখে খুব ভালো লাগলো। এ রকম আরও কয়েকজনের সঙ্গেই পরে দেখা হয়েছে পথে।

আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সূর্য-কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল চতুর্দিকের তুষারাচ্ছাদিত শুভ্র নিথর গিরিশৃঙ্গরাজি দেখে মনে হচ্ছে বাস্তবিকই 'মহাধ্যানে যোগাসনে মগ্ন' হয়ে আছেন দেবাদিদেব 'বিভূতিভূষাঙ্গ' 'কর্পূরগৌর' 'রজতগিরিনিভ' মহাদেবের 'গঙ্গাফেনসিতা জটা'র মতই গিরিগাত্র বেয়ে নেমেছে অগণিত তুষারধারা প্রকৃতই শিবক্ষেত্র—শিবময় চতুর্দিক!!

কিছুক্ষণ থেকেই একটু একটু করে মেঘ জমছিল শেষনাগের বুকে, পাহাড়ের গায়ে। সমতলভূমির মানুষ আমরা, আকাশে মেঘ দেখতেই অভ্যস্ত। অবাক হয়ে দেখছি প্রকৃতি-রাণীর এ নূতন খেলা। হঠাৎ এক সময় চারদিক থেকে মেঘ এসে ঢেকে ফেলল সব। ঝকঝকে বরফ কার অদৃশ্য তর্জনীসংকেতে নিমেষে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। চারদিকে শুধু মেঘ আর মেঘ। কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না ভাল-ভাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কোন যাদুকরের মন্ত্রবলে মেঘ কেটে গেল—হেসে উঠল নীল নভোমণ্ডল, অস্তগামী শেষ সূর্যের আলোয় নব বর্ণে রঞ্জিত হয়ে তুষারাবৃত গিরিচূড়াগুলি সৃষ্টি করেছে এক অপার্থিব সৌন্দর্য-সুষমার। মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে রইলাম।

কাছেই ছিল ছোট্ট একটি টিলা। সেই টিলার উপর উঠে 'দিবসের শেষ ক্ষণে' আবার দেখলাম 'শেষনাগ'কে। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এই রূপ-পরিবর্তন, কিন্তু 'শেষনাগের' কোনো পরিবর্তন, কোনো চাঞ্চল্য নেই। স্থির, অকম্প, অচঞ্চল জলরাশি তেমনই টলটল করছে,—যেন শবরূপী মহাকাল নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রয়েছেন রঙ্গময়ী মা ভবানীর পদতলে। শীত এখানে বেশ। আবার ষ্টোভ খারাপ হয়ে যাওয়ায় রান্না হতেও বেশ দেরী হল। কিন্তু আনন্দময়ের রাজ্যে তাতেও আনন্দ। আধসিদ্ধ খিচুড়িই পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেলেন সকলে। তারপরই শয়ন। নিস্তব্ধ রাত্রি—বহুদূর থেকে ঝরণার একটানা কুলকুল শব্দ কানে আসছে, কাঁচের জানলা দিয়ে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকিত রাত্রির মায়াময় শোভা দেখা যাচ্ছে—ঘুম আসে না চোখে। শেষরাত্রির দিকে বেশ জোর বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির

একটানা ঝরঝর শব্দের একটা মাধুর্য আছে। শুনতে ভালোও লাগছে আবার ভয়ও হচ্ছে—যাত্রা বন্ধ হবে না তো বৃষ্টির জন্ম!

সকাল ছ'টা নাগাদ বৃষ্টি থামল স্বরু হল যাত্রার প্রস্তুতি। শেষনাগ হ্রদ অনেক নীচে—নদীও নেই কাছাকাছি কোথাও। অগত্যা স্নানাগারেই স্নানাদি সারতে হল। জল-কল সংেই খুব স্বন্দর ব্যবস্থা। যথারীতি জলযোগান্তে আবার যাত্রা স্বরু হল সকাল সাতটা নাগাদ। আজ মহাগুণাম শিখরে আরোহণ— উচ্চতা ১৪,২৫০ ফুট। অমরনাথ যাত্রাপথের সর্বোচ্চ স্থান এইটিই। মাঝে মাঝে দু-একটা ফার্ণজাতীয় গাছ আর ছোট্ট ছোট্ট হলুদ ও বেগুনী রংয়ের ফুলগাছ ছাড়া পাহাড়ের গায়ে আর গাছপালা বিশেষ চোখে পড়ে না। তার পরই স্বরু হল বরফের রাজ্য। এতক্ষণ দূরে দেখেছি তুষারকিরীটী গিরিশৃঙ্গ, পাশে দেখেছি হিমবাহ, তুষারাচ্ছাদিত পথও অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক জায়গায়, কিন্তু এখন যে দিকে তাকাই শুধু চোখে পড়ে সীমাহীন শ্বেতশুভ্র তুষাররাশি। উপরে-নীচে, আশে-পাশে সর্বত্রই শুধু বরফ আর বরফ। মাইলের পর মাইল সাদা ধবধবে জমি—সবুজের রেখামাত্র নাই। সাদায় সাদা চারদিক! মাথার উপর ঝকঝক করছে স্বনীল অম্বর—সত্যই স্বগভীর নীল সে রঙ।

পাহাড়ের একেবারে মাথার উপর উঠে প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপগৌরব দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। বর্ণনাতীত সে সৌন্দর্য। এ বিপুল বিরাটের মাঝে নিজের ক্ষুদ্র সত্তাও যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে যায়। চতুর্দিক নীরব নিথর। ধ্যান-মৌন অপূর্ব এক প্রশান্তিতে ভরা পরিবেশ। জগতের মাঝে জগদতীত স্থান! এ যেন সত্যই দেবলোক!!

মনে হল—এ পথ শুধু মাত্র তীর্থযাত্রাপথ—ভ্রমণের পথ নয়,—পথই দেবালয়। জগৎস্রষ্টার আপনহাতে গড়া অতুলন এই দেব-দেবালয়, যেখানে প্রতিমুহূর্তে চিরসাথী সেই বিশ্বরাজ্যের চেতন আনন্দঘন অস্তিত্ব অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করে ধন্ম হয়, কৃতকৃতার্থ হয় ক্ষুদ্র মানব। অপূর্ব ভাবময় এ রাজ্য! সীমিত ভাষার সাধ্য কি বর্ণনা করে সেই অপরূপ রূপগরিমার!!

উৎরাই পথে আবার বেশ কিছুটা নেমে শেষ হল তুষার-রাজ্য। স্বরু হল আবার পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ-পথ। ছোটো ছোটো ফুলে ভরা গাছ ঘাসে ঢাকা জমিও চোখে পড়ল। এখানেও হলুদ এবং বেগুনী রংয়ের ফুলেরই প্রাচুর্য—সাদা এবং নীল রংয়ের ফুলও সামান্ম দেখা যায়। ক্যাকটাস জাতীয় একধরনের খুব স্বন্দর গাছ দেখলাম- যার পাতাটিই ফুল, রং হাল্কা সবুজ। পথের মাঝে কোথাও আবার জলস্রোত বয়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে। নদীর উপর কাঠের সেতু। আবার কোথাও রাস্তা এমনই কর্দমাক্ত যেন মনে হয় বাংলাদেশের অখ্যাত কোনো পল্লী-অঞ্চলের পথে চলেছি বুঝি। বেশ কয়েকটি জলধারা, ছোটোখাটো কয়েকটি চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে পাহাড়-ঘেরা একটি শ্যামল উপত্যকা-ভূমিতে এসে পৌছালাম। জায়গাটির নাম পঞ্চতরণী— উচ্চতা ১১,০০০ ফুট। নামটি যেমন মধুর, স্থানটি তেমনই স্বন্দর। পর্বত-পরিবেষ্টিত শ্যামশষ্পাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নানা বর্ণের রাশি রাশি পুষ্পের সমারোহ চারদিকে। ঘাস আর ফুলে ছাওয়া উঁচু-নীচু প্রান্তরটির মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে পাঁচটি ধারা, যেন পরমদেবতার পূজোর জন্ম জলপূর্ণ ঘট আর ফুলের ডালি নিয়ে অপেক্ষা করছেন প্রকৃতি দেবী। মনে পড়ল স্বামীজীর কথা। তীর্থযাত্রার সব বিধি-নিয়ম ঠিক ঠিক পালন ক'রে ভিজে কাপড়ে পঞ্চতরণীর পাঁচটি ধারায় পরপর স্নান ক'রে ৺অমরনাথ

দর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। রোগাক্রান্ত দুর্বল দেহে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও পথশ্রম সহ্য ক'রে শুধু একটিমাত্র ধারায় নয়--পরপর পাঁচটি ধারায় স্নান! সাধারণ মানবের পক্ষে কল্পনাতীত।

এখন অবশ্য ধারাগুলির মধ্যে মাত্র একটি বাদে আর কোনটিতেই জল বিশেষ নেই। উপত্যকাভূমির শেষ প্রান্তে একটি ছোট্ট চড়াই পার হয়ে P. W. D.-র ডাকবাংলো—আজকের বিশ্রামস্থল

উচ্চতা কম হওয়ায় ঠাণ্ডাও পূর্বাপেক্ষা কম এখানে। কিন্তু সারাটা দুপুর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েই রইল। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে মাঝে মাঝে। চারদিকে স্যাঁৎসেতে ভিজে ভিজে ভাব। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হল। এখানে বিকেল মানে কোলকাতার সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টা। চারদিক আলোয় আলোময়। পঞ্চতরণীর একটি ধারার তীরে বসে কাটল অনেকক্ষণ। শান্ত-স্তব্ধ-নির্জন নদীতীর। দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়। যেন স্বয়ং মহাদেব বিরাজমান। পদতলে পূজার অর্ঘ্যের মতই নদী ঘাস আর ফুলে ভরা পঞ্চতরণী। আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল দিনের আলো। স্নিগ্ধ কমনীয় মায়াময় চন্দ্রালোকে ভরে উঠলো সমগ্র উপত্যকাটি সে সৌন্দর্যসুধা পান করে যেন তৃপ্তি হয় না বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে না চোখে। আগামী কাল সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত, বহুবাঞ্ছিত অমরনাথজীর দুর্লভ দর্শন লাভ করব। আধোঘুমে আধোজাগরণে কোনোরকমে প্রায় বিনিদ্র রজনীটি কাটল। আশা-আশঙ্কায় দোদুল্যমান চিত্ত। 'দর্শনলাভের পুণ্যলগ্ন সমাগত'— তাই আনন্দের আর সীমা নেই আবার ভয় হচ্ছে—কি জানি শেষ পর্যন্ত যেতে পারব তো? দর্শনলাভে কোন বিঘ্ন ঘটবে না তো? চিন্তার আর শেষ নাই।

২৩শে জুলাই—বুধবার গুরুপূর্ণিমা। সত্যই "সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন—"। আজ অমরনাথজীর পুণ্য দর্শনলাভে ধন্য হবে এ জীবন। ভোরবেলা উঠেই সবাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত। আজ আর সকালে খাবার তাড়া নেই। দর্শনপিয়াসী সকলেই। ক্ষুৎপিপাসার কথা ভুলে সবাই আজ একটিমাত্র চিন্তায় মগ্ন--'কখন তাঁর দর্শনলাভ করব?' এদিকে ভোর না হতেই টিপটিপিয়ে সুরু হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল সেজন্য। মাইল চারেক মাত্র দূরত্ব। প্রথমে মাইল দু-তিন খাড়া চড়াই। প্রথমদিকে পাহাড়ের রাস্তা কোথাও কাদায় ভরা, কোথাও জলধারা বয়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে পথের উপর দিয়ে, কোথাও পথ তুষারাচ্ছাদিত। চারপাশে তুষার-বিমণ্ডিত পর্বতরাজি। পথের একপাশে বয়ে চলেছে নদী। নদী আছে সত্যি, কিন্তু 'বয়ে চলেছে'—বললে ভুল হবে! কোথায় উচ্ছল গতিভঙ্গী তার? পাছে দেবাদিদেবের ধ্যানভঙ্গ হয়, তাই বুঝি চপলা তটিনীও আজ শান্ত স্তব্ধ! জলের রেখামাত্রও দেখা যায় না। নদীর আকারে আকারিত জমাট তুষাররাশি!

মাঝে মাঝে যাত্রীদের দেখা যায়। দর্শন-ব্যাকুল হৃদয়ে কেউ বা চলেছেন এগিয়ে, কেউ বা ফিরছেন দর্শনান্তে আনন্দ-পরিপূর্ণ চিত্তে। সবার মুখেই উচ্চারিত হচ্ছে একটি মাত্র ধ্বনি—জয় অমরনাথ! জয় অমরনাথ!

দূরে দেখা যায় গুহা। গুহার অনতিদূরে পথের অল্প নীচেই বইছেন অমরগঙ্গা। বরফ-গলা জলধারা—বেশ স্রোত। কিছুদূর গিয়েই আবার এই ধারাটি লুপ্ত হয়েছে তুষারাচ্ছন্ন নদীর বুকে। জল খুব কম, কিন্তু হাড়-জমানো ঠাণ্ডা। এদিকে বৃষ্টিও পড়তে সুরু করেছে বড় বড় ফোঁটায়। কোনোরকমে স্নান সারা হল। আবার চলা সুরু হল বরফের উপর দিয়ে।

ঐ তো দেখা যায় সুবিশাল গুহামুখ, শোনা যায় গম্ভীর ঘন্টাধ্বান। আনন্দ, উত্তেজনা, পথের শ্রান্তি সব মিলিয়ে এমন অভিভূত অবস্থা হয়েছে যে, মনে হচ্ছে পা যেন আর চলে না। কোনোরকমে সেই পথটুকু পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম উপরে।

আশৈশবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল আজ। এতদিন যা ছিল আমার মানসলোকে, চিন্তারাজ্যে—কল্পনা ও ধ্যানের বস্তু হয়ে—আজ তাই মূর্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে। প্রসন্ন সহাস জ্যোতির্ঘন তুষার-লিঙ্গরূপে সম্মুখে বিরাজমান শ্রীশ্রীঅমরনাথজী। নীলাভ স্বচ্ছ সুবিশাল জ্যোতির্ময় তুষার-লিঙ্গ!* নীচে শ্বেতশুভ্র তুষারময় সুবিস্তৃত গৌরীপট, দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ ১০।১২ ফুট, প্রস্থেও ৫।৬ ফুটের কম নয়। ভূতনাথের অশেষ কৃপায় পূর্ণমূর্তি দর্শন হল। অবশ্য 'মূর্তি' বললেও ভুল হয়। মূর্ত হয়েও অমূর্ত, সাকার অথচ নিরাকার, স্নিগ্ধ-গম্ভীর নয়নাভিরাম মহামহিমময় এ রূপমাধুরী সত্যই বর্ণনাতীত। দর্শনে তৃপ্ত হয় নয়ন, স্পর্শনে জুড়িয়ে যায় দেহ-মন—অননুভূতপূর্ব এক অব্যক্ত আনন্দে অনুরণিত হয়ে উঠল হৃদয়বীণার প্রতিটি তন্ত্রী। কি অপরূপ রূপাতীত রূপ!!! যাঁর স্তব করতে গিয়ে পরমভক্ত গন্ধর্বরাজ শ্রীপুষ্পদন্ত বলেছেন—

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।

—ক্ষুদ্র মানবের তুচ্ছ লেখনীমুখে তাঁর মহিমা কীর্তন করার প্রয়াসটুকুও বাতুলতা—বালসুলভ চপলতা মাত্র।

অমরনাথজীর অনতিদূরেই রয়েছেন গণপতি। ইনিও স্বয়ংসৃষ্ট তুষারমূর্তি। তবে এই বরফ নীলাভ নয়—কাঁচের মত স্বচ্ছ। মুখটি, বিশেষ করে গজাননের শুঁড়টি, দেখে অবাক হতে হয়—এত সুন্দর। গুহার অপর প্রান্তে বেশ কিছুটা অংশ সম্পূর্ণ তুষার-সমাচ্ছন্ন—দেবীস্থান নামে খ্যাত। শুনলাম বিষ্ণুচক্রছিন্ন সতীর কণ্ঠদেশের কিয়দংশ নাকি এখানে পড়েছিল।

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেবের এই মন্দিরটিও মানুষের হাতে গড়া নয়। ১৮,০০০ ফুট উচ্চ একটি পর্বতগাত্রে অবস্থিত বিরাট বিশাল এক প্রাকৃতিক গুহায় প্রতিবৎসর স্বয়ং প্রকাশ হন দেবাদিদেব। সমুদ্রতল থেকে স্থানটির উচ্চতা ১৩,০০০ ফুট। গুহা যে এত বড় হতে পারে দেখলে তা' ধারণাই করা যায় না, দৈর্ঘ্যে শতাধিক ফুট, প্রস্থেও ৫০।৬০ ফুটের কম নয়। মানুষের হাতে তৈরী মন্দির যেমন মণিবেদী, গর্ভমন্দির, নাটমন্দির, বহিঃপ্রাঙ্গণ ইত্যাদি নানা ভাগে বিভক্ত, গুহাটিও তেমনই স্তরে স্তরে বিভক্ত যেন কোন স্থাপত্যবিশারদ সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করেছেন এই দেব-মন্দিরটি।

কি এক মহাপবিত্র গুরুগম্ভীর ভাব বিরাজমান গুহাটির মধ্যে! সকলেই নির্বাক, নিস্তব্ধ। মন ধ্যানমৌন প্রশান্তিতে ভরা—প্রাণ শিবময়। এই অসীমের—বিরাটের সামনে লুপ্ত হয়ে গেছে মর্ত্য-মানবের ক্ষুদ্র সত্তা। আনন্দময়ের অপার কৃপায় আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়-মন-প্রাণ।

পার্বতীনাথের অশেষ করুণায় সমাপ্ত হল দুর্গম তীর্থযাত্রা। এবার ফেরার পালা। শিবলোকতুল্য এই দিব্যস্থান ছেড়ে আসতে মন চায় না—তবু ফিরতেই হবে।

এ জীবনে এই মহাপবিত্র স্থানে আর কখনো আসা হবে কি না জানি না। মাইল-ক্রোশের

* এবারে উচ্চতা ১২ ফুট, মতান্তরে ১৪ ফুট।

দূরত্বে, মানুষের পরিমাপে—হিসাব করলে এখান থেকে বহুদূরে চলে যাব আবার, বাইরে চর্মচক্ষে আর তাঁর দিব্যদর্শন হয়তো পাব না, কিন্তু আমার হৃদয়-দেউল আলোকিত করে রইলেন অমরনাথজী, এই পুণ্যময় আনন্দময় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনির্বচনীয় স্মৃতিটুকু চিরন্তন হয়ে রইলো মনের মণিকোঠায়।

অসীম কৃপাবারিবর্ষণে অভিসিঞ্চিত করে অযোগ্য এই দীন সন্তানের মন-প্রাণ আনন্দ-পরিপূর্ণ করে তুলেছেন যিনি, সেই পরমদেবতার চরণে নিবেদন করি প্রাণের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য, অবলুণ্ঠিত প্রণতি জানাই বার বার—

"নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্বায় চ নমঃ॥"

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥"

সমালোচনা

ছোটদের সারদাদেবী ঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রকাশক: স্বামী তন্ময়ানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯। পৃঃ ৮৮, (১৯৭৫), মূল্য চার টাকা।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে (১৯৭৫) প্রকাশিত। আধ্যাত্মিক ভারতের বর্তমান যুগের এক মহীয়সী নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, ছোটদের জন্যে লেখা। এতে মুক্তি-দাবি-অধিকারের কোন কথা নেই। যা আছে তাকে বোধহয় মাত্র দু'টি শব্দে বিবৃত করা যায়—'ত্যাগ' ও 'সেবা', বা আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, আত্মত্যাগ ও পরপালন। যথাযোগ্য ভাষায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সারদাদেবীর জীবনবেদের এই মূল সুরটি যাদের জন্যে লেখা তাদের কাছে অতি সুন্দর, স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরেছেন।

ছোটদের মনকে যা আকর্ষণ করে তা হ'লো গল্প। সারদাদেবীর জীবনী ঘটনাবহুল হয়ত নয়, তবে এর থেকে বলার মত গল্প অনেকই পাওয়া যায়--যেমন ডাকাত-বাবা ও মায়ের গল্প। ঘটনাটি মনীষী রোমাঁ রোলাঁও তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীতে (Prophets of the New India) লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের কৃতিত্ব হ'লো যে ঘটনাটি থেকে সারদাদেবীর চরিত্রালেখ্যের ওপর প্রয়োজনীয় রং চড়ানো এবং সেইদিকে ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ। ছোটরা রং দেখেই ভোলে।

সারদাদেবীর প্রতিকৃতির সঙ্গে ছোটবড় সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। পথেঘাটে ঘরেঘরে ঐ প্রতিকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে (কোন কোন ক্ষেত্রে ভবতারিণী বা স্বামী বিবেকানন্দও সঙ্গে আছেন) শোভা পাচ্ছে। পূজোও যে হয়না তাও নয়। কামারপুকুরের সঙ্গে জয়রামবাটি যাওয়ারও কামাই নেই। কিন্তু সারদাদেবীর জীবনীর সঙ্গে, বাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা কতজন আর হবে? ছোটদের কথা না হয় বাদই দিলাম। সারদাদেবী লাল-পাড় শাড়ী এবং হাতে দু'গাছি চুড়িও পরতেন। কেন? স্বামী বিবেকানন্দের 'বিশ্বজয়ের' পশ্চাতে সারদাদেবীর ভূমিকা কতখানি?—বইটিতে এই সব জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হবে সহজেই। এইদিক দিয়ে—অর্থাৎ প্রথম পাঠ হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছোটদের জন্যে লেখা হলেও বড়দের প্রয়োজন অনেকখানি মেটাবে।

আবার বড়রা পড়লে তবেই ছোটদের শেখাতে পারবেন : "কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। ...কেউ পর নয়, সবাই ...আপন। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ।" —ইত্যাদি। সারদাদেবীর এইসব উপদেশ কি লোকোত্তর জীবনজ্যোতির দ্যোতক নয় ?

পরিশেষে, শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর রেখায় যেভাবে লেখার সঙ্গে তাল রেখেছেন তার উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রুফ দেখার ব্যাপারে কিন্তু আরও একটু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। তবে এ-ত্রুটি নিশ্চয়ই পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়া হবে।

—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

ভারতপথিক রামমোহন ও রাধানগর : কল্যাণ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : রামমোহন প্রচার সভা, ৬বি, রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৫। (১৯৭৪), পৃষ্ঠা ৯৩, মূল্য দশ টাকা।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা সারাজীবন বহন ক'রে চলি। যে অঞ্চলে আমাদের জন্ম, তার পরিবেশ, নিসর্গরূপ, আকর্ষণের প্রধান বিন্দু প্রভৃতি স্মৃতিজড়িত হয়ে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করে। মহাপুরুষরা দূরদর্শী, স্বকালের তুলনায় অগ্রবর্তী। কিন্তু তাঁরাও এই নিয়মের বহির্ভূত নন। পরিবার ও আঞ্চলিক পরিবেশ থেকে অল্প বয়সে যে আহরণ তাঁদের, তারই পরিপূর্ণ বিকাশ বাকি জীবনের সাধনায়। জগজ্জনের কাছে তাঁদের বাণী বিপুল সমাদর লাভ করলেও, নাড়ির যোগে স্বদেশবাসীরা তাঁদের আরো নিবিড়ভাবে বোঝেন। এবং বোঝাতে চান। রামমোহন প্রচার সভা কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থে জন্মস্থল রাধানগরের সঙ্গে রামমোহনের সারা জীবনব্যাপী সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই চেষ্টাই লক্ষ্য করা গেল।

রামমোহনের জীবনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক চিন্তাধারার যে সংমিশ্রণ আমাদের শ্রদ্ধা জাগায়, তার উৎসমুখ তাঁর পূর্বপুরুষদের আচরণেই পরিলক্ষিত। গ্রন্থকার সে-সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেন নি। তাঁর লক্ষ্য অবশ্য ছিল কিভাবে রাধানগরকে—তাঁর ভাষাতেই বলি —'একটি তীর্থ ও পর্যটন-কেন্দ্রে পরিণত করা যায়...।' একারণে রাধানগরেরই যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি—নানা আলোকচিত্র-সম্ভারে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ ক'রে। তবে গ্রন্থের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে রামমোহনের জীবন সম্পর্কে অনুপুঙ্খ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। লেখক অবশ্য রামমোহন সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর উক্তির সঙ্কলন দিয়ে সে-অভাব কিছুটা দূর করেছেন। যে উদ্দেশ্যে তাঁর গ্রন্থ রচনা, তার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সাধু উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

—অধ্যাপক শ্রীনিখিলেশ গুহ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে গত ১৯শে ফাল্গুন ১৩৮২, ৩রা মার্চ ১৯৭৬, বুধবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪১তম জন্মতিথি আনন্দময় ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহাসমারোহে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিক বেদপাঠ ও উষাকীর্তন এবং পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপারায়ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা কালীকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে শোভাযাত্রা কীর্তন ও জয়ধ্বনি সহকারে মঠ প্রদক্ষিণ করে। রহড়া বালকাশ্রমের বালকগণ বিভিন্ন ধর্মের ইষ্টদেবতার প্রতিকৃতিসহ তত্তৎ ধর্মোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সর্বধর্ম-সত্য-রূপ মহান ভাবের প্রতীক এক অনুপম শোভাযাত্রা সহকারে মঠ-প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। সারদাপীঠ ও নরেন্দ্রপুর কেন্দ্র হইতেও ছাত্রদল সমবেত হইয়া সঙ্গীতাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩৫,০০০ নর-নারায়ণ হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৭ই মার্চ সাধারণ উৎসবে প্রায় ৪০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

৩রা মার্চ অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ভাষণ দেন।*

শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন :

যাঁর অচিন্ত্য আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে আমরা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হই, সেই অনন্ত লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলা খুবই কঠিন। আমার সীমিত সামর্থ্য সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সজাগ। তবে যাঁর অপার করুণায় আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের অমেয় ভাণ্ডারের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি আমার অন্তরে আছে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সুগভীর শ্রদ্ধা।

বিশ বছর আগে একজন জার্মান বুদ্ধিজীবী ভারতে এসেছিলেন এবং এদেশ সম্পর্কে তাঁর অভিমত একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ করেন। বইটি এখনও ইংরেজীতে অনূদিত হয় নি। তিনি লিখেছেন, তাঁর ভারতীয় বন্ধুরা তাঁকে শিল্পোন্নত ভারত দেখিয়ে গর্ব অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তিনি তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণে বর্তমান ভারতের কারিগরির উন্নয়ন দেখতে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের অনুসন্ধানে। তাই শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্গুরু শংকরাচার্যকে দর্শন ক'রে তিনি তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। তারপর বইটির শেষের দিকে তিনি লিখেছেন, তাঁর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসই ভারতাত্মার মহত্তম বিগ্রহ।

বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু যে তাঁর প্রাতিস্বিক তুরীয়ানুভূতিরই পরিচয় দিয়ে গেছেন তা নয়, ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অবিনশ্বর মহিমাকেও নিরাবরণ করে গেছেন। তিনি যে তথাকথিত পণ্ডিত ছিলেন না, প্রায়-নিরক্ষরই ছিলেন—এই

* ভাষণ তিনটি শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত ও শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। অনুলিখিত ভাষণগুলি সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত। প্রথম ভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে ভাষান্তরিত।—সঃ

ঘটনাটি তাঁর জীবন ও বাণীর গুরুত্ব অসম্ভব রকমে বাড়িয়ে দিয়েছে। মজার কথা এই, তিনি 'লেকচার' এই ইংরেজী শব্দটি ব্যবহার করতেন এবং ওই নিয়ে হাসিঠাট্টাও করতেন। এর পেছনে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। তা হ'ল এই যে, মহান ধর্মনেতারা ঈশ্বর-প্রেরিত হয়েই, 'চাপরাস' পেয়েই ধর্ম প্রচার করে থাকেন - স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নয়। এইজন্যই যাঁরা যথার্থ সাধক, তাঁদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের এত বিস্ময়কর প্রভাব। শুধু সাধকরাই নন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি ভক্ত ছিলেন না, ঈশ্বর সম্পর্কে যাঁর কোন আগ্রহই ছিল না, তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

একদিন বিদ্যাসাগর মশায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন: আপনি কি বলতে চান, ঈশ্বর কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ জবাব দেন: তা দিয়েছেন বই কি। শক্তি কম বেশী না হ'লে তোমার এত নাম হবে কেন? তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নি!

এই ঘটনাটি থেকেই আমরা তথাকথিত পণ্ডিত আর গীতা-ভাগবতে যাঁকে পণ্ডিত বলা হয়েছে—তাঁদের পার্থক্য বুঝতে পারি। বিদ্যাসাগর মশায় এত বড় পণ্ডিত হয়েও এটা বোঝেন নি যে, ঈশ্বরের সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান থাকার অর্থ এই নয় যে, মানুষে মানুষে শক্তির তারতম্য থাকবে না। তাই তিনি অমন কাঁচা কথা বলে ফেলেছিলেন

গীতায় একাধিক জায়গায় 'পণ্ডিত' শব্দটির প্রয়োগ আছে - সর্বত্রই তত্ত্বদর্শীর অর্থে, পুঁথিপড়া পণ্ডিতের অর্থে নয়। ভাগবতেও বলা হয়েছে, যিনি বন্ধন ও মুক্তির তত্ত্ব জানেন, তিনিই পণ্ডিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই গীতা-ভাগবতের অর্থেই পণ্ডিত ছিলেন।

গীতায় জ্ঞানীকে তত্ত্বদর্শী বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অর্থেই জ্ঞানী ছিলেন। কথাটি হয়তো একটু অভিনব মনে হতে পারে। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তির ওপর খুব জোর দিয়েছেন এবং ভক্তরূপে লীলা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-ভক্তির কথা বলেছেন, তা বড় কঠিন জিনিস। সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা মন থেকে বিদায় না নিলে, মন পবিত্র না হ'লে, চিত্তশুদ্ধি না হলে সে-ভক্তি আসতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন দেখে আমরা বুঝি পরম জ্ঞান আর পরা ভক্তি একই জিনিস। গীতাতেও সেই কথা বলা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অব্যভিচারিণী ভক্তিকে জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণ বলেছেন।

আমি এ পর্যন্ত যেটুকু বলেছি, তা দিয়ে বোধ হয় কিছুটা পরিস্ফুট করতে পেরেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনে ও বাণীতে আমরা যা পাই তার সমর্থন রয়েছে ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ঐতিহ্যে এবং এই ঐতিহ্যে যা রয়েছে তারও সমর্থন রয়েছে তাঁরই জীবন ও বাণীতে। তবে লক্ষণীয় এই যে, তাঁর জীবন ও বাণী শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত বা প্রমাণিত হবার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু পাশ্চাত্য-প্রভাবিত বর্তমান যুগে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির প্রয়োজন—বিশেষ প্রয়োজন—হয়ে পড়েছিল একটি জীবনের দ্বারা সমর্থিত বা প্রমাণিত হবার। ভারতবর্ষে কোন দিন শাস্ত্রের টীকা-ভাষ্যকারদের অভাব হয় নি—যুগ যুগ ধরে প্রতিভাধর ব্যক্তিরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে এসেছেন। কিন্তু এযুগে কোন ব্যাখ্যার—তা সে ব্যাখ্যা যতই অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত হোক না কেন—প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের—জীবন দিয়ে দেখানোর।

এবং সে-প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে জ্ঞান ও ভক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করেছি। তিনি যে-ভক্তির কথা বলতেন, তা ভাবের উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা নয়— গঠন তার কঠিনতর উপাদান দিয়ে। তিনি বিবেক-বৈরাগ্যের ওপর খুবই জোর দিতেন। আমরা জানি সাধারণতঃ জ্ঞান-মার্গের প্রসঙ্গেই বিবেক-বৈরাগ্যের কথা বলা হয়। কিন্তু তাঁর মতে কোন আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয় বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে। তাই এ দুটি না থাকলে তিনি পণ্ডিতদের খড়কুটো বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ভক্তি হতেই পারে না, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে। তিনি বলতেন, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ আর তা হতেই পারে না, যদি চরম লক্ষ্য থেকে যা কিছু আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সে সব নির্মম-ভাবে আমরা পরিহার না করি।

এই বৈরাগ্য, যার অন্য নাম তীব্র অনুরাগ— পরম একাগ্রতা—তার সাধন খুবই কঠিন কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন দেখলে মুণ্ডক উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্রের কথা মনে পড়ে যায়:

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

—যাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণ মন গ্রথিত, তাঁকেই আত্মা বলে জানো, অন্য কথা ছাড়ো—এই হ'লো অমৃতত্বের সেতু।

এই 'অন্য কথা ছাড়া'—এই পরম একাগ্রতা —এই তীব্র বৈরাগ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। সে-জীবন—তাঁর দিব্য-বাণী আর সর্বোপরি তাঁর করুণা আমাদের এই অতি কঠিন কাজকেও সহজ ক'রে দেবে, সন্দেহ নেই।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন:

আজ একটা বিশেষ দিনে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। কেন বিশেষ দিন তা আমরা সবাই জানি। আজ যখন মন্দিরে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম শ্রীশ্রীঠাকুর কি সুন্দর সেজেছেন, কি সুন্দর কাপড় পরেছেন, কি সুন্দর উত্তরীয় গায়ে দিয়েছেন, কি সুন্দর ফুলের মালা তিনি গলায় পরে বসে আছেন! আমাদের সবার দিকে চেয়ে আছেন। মনে হল খুব প্রসন্ন। আমাদের দিকে চেয়ে একটু একটু হাসছেন। শিশু কিনা! ভগবান ত শিশু! জন্মদিন, কাজেই খুবই আনন্দ দিচ্ছেন, আনন্দ করছেন। হাসির মধ্যে আবার একটু একটু দুষ্টুমির ভাবও ফুটে উঠেছে। দুষ্টুমির ভাবটা এই জন্যে যেন বলছেন, আমাকে আর তোরা কি সাজাবি! আমি গলায় পরেছি জগৎচন্দ্রহার! এই জগৎ— এই চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ—বিশ্বচরাচর, এ তো আমার ভূষণ, আমার চন্দ্রহার! আমি গলায় পরে বসে আছি। আমাকে তোরা আর কি সাজাবি!

এই কথা বলেছিলেন আর একবার শ্রীশ্রীঠাকুর —যখন সুরেন্দ্রের বাড়ীতে গিছলেন। খুব স্নেহ করতেন সুরেন্দ্রকে। সুরেন্দ্রের বড় আকাঙ্ক্ষা শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাড়ীতে আসবেন। দিন ঠিক হল। সুরেন্দ্র অনেক আগে থেকে প্রস্তুত হচ্ছেন। সমস্ত ভক্ত বন্ধুদের ডেকেছেন। কত ফুলের মালা এনেছেন, কত খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন! শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাড়ীতে আসছেন। এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত সমভিব্যাহারে। খুব বড় একটা মালা, সুন্দর মালা অনেক খরচ ক'রে তৈরী রেখেছিলেন সুরেন্দ্র। সেটি ঠাকুরকে দিতে গেলেন। ঠাকুর হাতে নিলেন, গলায় পরলেন

না, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। খুব অভিমান হল সুরেন্দ্রের, কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে বাইরে অন্য বন্ধুদের কাছে বললেন : 'হাজার হোক, রাঢ় দেশের বামুন কিনা, এসব জিনিসের মর্যাদা বুঝবেন কোথা থেকে?' খুব অভিমান হয়েছে, তাই ঐরকম বলছেন। আবার কিছু পরে বলছেন : 'আমার অহঙ্কার হয়েছিল, টাকার অহঙ্কার হয়েছিল, বুঝতে পারছি আমার অপরাধ —আমি অহংকারী, আমার পুজো কেন নেবেন? আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই।' এই ব'লে কাঁদতে লাগলেন। আশ্চর্য এই যে, ঠাকুর গান গাচ্ছেন, নাচ্ছেন, কিন্তু কিছু পরে নাচতে নাচতে ঐ ফুলের মালাটিই তুলে নিয়ে গলায় পরলেন! সুরেন্দ্র আনন্দে বিভোর হলেন, বুঝলেন ভগবান দর্পহারী, কিন্তু অকিঞ্চনের ধন। ভক্ত তার ভুল বুঝতে পেরেছে, তাই ভগবান ক্ষমা করলেন। গাইতে গাইতে [illegible] দিলেন :

'ভূষণ বাকি কি আছে রে !
জগৎ-চন্দ্রহার পরেছি !'

দর্পহারী রামকৃষ্ণদেবের আর এক নাম হচ্ছে গদাধর। আমি মনে মনে ভাবি তাঁর গদা কোথায়। গদা ছিল হাতে, দেখতে পায়নি লোকে। পরে সেই গদার বিক্রম কিছু কিছু দেখতে পেয়েছে লোকে, দেখতে পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো দেখতে পাবে। দর্পহারী মধুসূদন গদার আঘাতে দর্প চূর্ণ করেন। আজ আমাদের সভ্যতার অহংকারের অন্ত নেই। আমরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে অনেক এগিয়ে গেছি, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছি, প্রাচুর্য এনেছি, আরো আনবো। দারিদ্র্য থাকবে না আমাদের, স্বাস্থ্যহীনতা থাকবে না, প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করবো আমরা—সব ঠিক, কিন্তু এ সভ্যতার উদ্দেশ্য কি, এ সভ্যতার লক্ষ্য কি? কোথায় থাকবো আমরা, কোথায় যাচ্ছি আমরা, কোন দিকে যাচ্ছি আমরা? রামকৃষ্ণদেব আমাদের পথের সন্ধান করে দিয়েছেন। জীবনের কি লক্ষ্য, তা তিনি নির্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এ-ই সব নয়। এর পরেও আছে, আরও, আরও, আরও আছে। আজকে এই বাইরের জগৎ, বাইরের প্রকৃতিকে মানুষ জয় করে ফেলেছে। চন্দ্রলোকে যাচ্ছে। অসম্ভবকে সম্ভব করছে বিজ্ঞানের সহায়তায়। স্বামীজী বলতেন, কিন্তু আমাদের সেই বিজ্ঞান দরকার যে বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের নিজেদের আন্তর প্রকৃতিকে, মনকে জয় করতে পারি। সেই বিজ্ঞান হচ্ছে ধর্ম, যে ধর্ম মানুষকে সংযম শেখায়, সভ্যতা শেখায়, যা মানুষকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তরের দিকে, মহৎ থেকে মহত্তরের দিকে যেতে আহ্বান করে। রামকৃষ্ণদেব মানুষ-জাতিকে আহ্বান করে বলছেন : 'তোমার ভবিষ্যৎ মনে রেখো এইটুকু নয় যে, তুমি খুব ভাল খাবে, ভাল থাকবে, ভাল পরবে, অনেক প্রাচুর্যে থাকবে; বাইরের ঐশ্বর্য সব নয়, ভিতরের ঐশ্বর্য থাকা চাই।' আজ এই সভ্যতা বিপন্ন— এই কথা সবাই বলছে। যে সভ্যতা আজ আমরা পাশ্চাত্যে দেখতে পাচ্ছি, যার অনুকরণ আমরা ভারতবর্ষেও করছি, যে সভ্যতা আত্মিক শক্তিকে স্বীকার করে না, পবিত্রতার মূল্য দেয় না, সংযমের মূল্য দেয় না, যে সভ্যতা মনে করে যা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার অস্তিত্ব নেই, তাকে স্বীকার করি না, তাকে মানি না— সে সভ্যতা থাকতে পারে না, থাকবে না। আমি বলছিলাম গদাধর সেখানে গদার আঘাতে সেই সভ্যতাকে চূর্ণ করবেন।

আমি ভাবি আজকে আমরা এই দিনটা এই-ভাবে উদ্‌যাপন করছি, কিন্তু এক হাজার বছর পরে কিভাবে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হবে। আমার ধারণা ততদিনে মানুষ তার নিজের ব্যর্থতা বুঝতে পারবে। সে বুঝবে, আমি যে বাইরে

খুঁজছিলাম সত্যকে—আমি ভুল করেছি—সে সত্য বাইরে নয়, ভিতরে—আমার নিজেরই ভিতরে। সে নিজের দিকে তাকাবে তখন। সে তখন আত্মিক শক্তিকে স্বীকার করবে। সে বুঝবে যে, তার শান্তি, তার আনন্দ, তার জীবনের সার্থকতা সব ভিতরে। ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করবে সে। মাস্তলে-বসা পাখীর কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আমরা বাইরে অনেক দৌড়াদৌড়ি ক'রে শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে ফিরে আসবো, মাস্তলে ফিরে আসবো, আমরা আত্মস্থ হবো, নিজের মধ্যে ডুবে যাবো। তখনি আমরা শান্তি পাবো। আর এক হাজার বছর পরে যে মানুষ এ পৃথিবীতে বাস করবে, তারা ততদিনে এই সভ্যতার ব্যর্থতা ভাল করে বুঝতে পারবে। তারা তখন আরো বিনয়ী হবে, আরো চিন্তাশীল হবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আরো বেশী স্পষ্ট করে দেখতে পাবে। তাঁর যে সব কথা আজ আমাদের কাছে অর্থহীন বা অর্থবহ হলেও পুরোপুরি অর্থবহ নয়, তারা সেগুলি বেশী বুঝবে। আঘাত পেয়ে মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাবে, তাঁর শরণাগত হবে। তাদের দৃষ্টিতে তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্ররূপ আরো উজ্জ্বল, আরো স্পষ্ট হবে। তিনি যে বলেছিলেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' সে কথার অর্থ আরো বেশী তখন স্পষ্ট হবে। আজ আমরা ভাবি যে, কেন একথা তিনি বলেছিলেন, টাকা ছাড়া ত চলে না। কিন্তু কেন বলেছিলেন তখন মানুষ বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে কেন বলেছিলেন, 'মন মুখ এক করো'। বুঝবে —এই যে সভ্যতা, এ সভ্যতা শুধু চাতুরীর সভ্যতা। চাতুরীর উপরে দাঁড়িয়ে আছে এ সভ্যতা। এ সভ্যতা টিকতে পারে না। গদাধর তাঁর গদার আঘাতে এই সভ্যতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করবেন। মানুষ তখন 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', 'মন মুখ এক করা', 'মানুষ—মান-হুঁশ' এই সব কথার তাৎপর্য আরো বেশী করে বুঝতে পারবে। তখন আরো ব্যাপকভাবে, আরো গভীরভাবে, আরো আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করবে। আর তাঁর আবির্ভাব-তিথির পুণ্য দিনটিতে তারা আরো বেশী আনন্দ করবে।

সভাপতির অভিভাষণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বলেন:

আজ এই পুণ্যতিথিতে আমরা স্মরণ করছি সেই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে, যাঁর আবির্ভাবে নূতন এক যুগের সূচনা হয়েছে। উষার অরুণিমায় দাঁড়িয়ে আমরা মধ্যাহ্ন সূর্যের বিরাট তেজ, মহিমময়ী দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ধীরে ধীরে অন্ধকার সরে যাচ্ছে, নূতন সঞ্চরমাণ দিন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি [illegible] অত্যন্ত আয়াসসাধ্য, কারণ সে-জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ আমাদের চোখের সামনে [illegible]—অধিকাংশই আমাদের চোখের অন্তরালে। তাই তাঁর জীবনের তাৎপর্য, তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্য অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু তবু আমরা বুঝতে চাই, আমাদের প্রাণে রয়েছে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা; আমরা আমাদের বর্তমান পরিবেশে সন্তুষ্ট নই। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট নই, আরও পেতে চাই—উপনিষদের ঋষি যেমন বলেছেন: 'নাল্পে সুখম্ অস্তি, ভূমৈব সুখম্'—অল্পে সুখ নেই, ভূমাই সুখ। তাই ভূমাকে, বিপুলকে ধরবার জন্য আমরা বাহু আস্তৃত করি। কিন্তু বাহু আস্তৃত ক'রে ধরতে গেলেও, সেই কালিদাসের ভাষায়: 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদ্ উদ্বাহুরিব বামনঃ।' দীর্ঘকায় লোকের দ্বারা যে-ফল পাড়া যায় গাছ থেকে, সেই ফলের লোভে বামন যদি হাত বাড়ায়, তাহলে সে উপহাসের পাত্র হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে আমিও সেইরকম

উপহাসের পাত্র হ'ব, যদি আমার নিজের বিচার-বুদ্ধির রঙে রঙিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলতে যাই। আমি সেটা করতে যাচ্ছি না। আমাদের একটা সুবিধা রয়েছে এই যে, বিরাট পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ মণিবেধকসূচীর মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনমণিতে একটি ছিদ্র করেছেন, সেই পথে সূত্রের মতো আমরাও ধীরে ধীরে প্রবেশ ক'রতে পারি—কালিদাস যেমন বলেছেন: 'মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেইটুকু আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে বোঝাও অত্যন্ত কঠিন। তিনি অল্পকথায় বিরাট ভাবগাম্ভীর্য ও ভাবমাধুর্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সেইজন্য তাঁর কথা বুঝতে হলেও পৃথিবীর ইতিহাস জানতে হবে, ভারতের ঐতিহ্যকে চিনতে হবে।

যে সুপ্রাচীনকালে ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের সভ্যতায় দেহটাকেই শাশ্বত মানুষ ব'লে মনে ক'রে তাকে চিরন্তন ক'রে রাখার চেষ্টা চলেছে, সেই কালেই ভারতবর্ষে অন্য এক ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল। সে-ধ্বনি বলেছিল:

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥'

—'...... আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'

এই আত্মতত্ত্বের কথা রয়েছে বেদের সংহিতা-ভাগে, ব্রাহ্মণভাগে এবং বিশেষতঃ উপনিষদে। কিন্তু এই বৈদিক ভাবধারা পরিপুষ্টি লাভ করল তখনই, যখন সূত্রযুগে ব্রহ্মসূত্র, পাতঞ্জলদর্শন-সূত্র ইত্যাদি সূত্রগ্রন্থ রচিত হ'ল। তখন বৈদিক ভাবধারা সুসজ্জিত সুসংহত এবং সু-সমন্বিত হ'ল এবং দেখা গেল এর ভিতর দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং তত্ত্ব আছে। সেই দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং তত্ত্ব নিয়ে নানারূপ বাদানুবাদ আরম্ভ হ'ল, যার ফলে প্রাক্-শঙ্কর যুগে পর্যন্ত বহু ভাষ্য ও টীকার উদ্ভব ঘটেছিল। সে সমস্তের ভিতর দিয়ে এই একটি তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়েছিল যে, সমস্ত বেদের ভিতর কতকগুলি সত্য আছে, যা চিরন্তন এবং যা উপলব্ধি করলে মানুষ অপার শান্তির অধিকারী হয়।

কিন্তু বেদের দার্শনিক তত্ত্ব সহজবোধ্য নয়। অথচ মানুষকে সে-তত্ত্ব যেভাবেই হোক পরিবেশন করতেই হবে। তাই আর একটি ধারার প্রবর্তন ঘটলো ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যে। সে-চিন্তাধারার সূচনা বোধ হয় প্রাক্‌বৈদিক যুগেই। সেটি তন্ত্রের ধারা। তন্ত্র বললেন: 'একোঽহং বহু স্যাম্'—এক আমি, বহু হব—বেদের একথাটি ঠিক, কিন্তু 'এক' কিভাবে 'বহু' হ'ল? কোথায় সে শক্তি যা এক-কে বহুরূপে প্রকাশিত করছে? কাজেই সেই একবস্তুকে 'পরব্রহ্ম' বলো, 'পরমশিব' বলো, যাই বলো না কেন, তার পিছনে আর একটি জিনিসের প্রয়োজন হচ্ছে—সে জিনিসটি হ'ল শক্তি। এইভাবে শক্তির তত্ত্ব এলো। এবং আপনারা জানেন সপ্তশতী গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল কিভাবে। বলা হয়েছে, যখন দৈত্যদের দ্বারা নির্জিত হয়ে দেবতারা 'ভুবি বিচরন্তি যথা মর্ত্যাঃ'—মানুষের মত যখন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন এবং ব্রহ্মাকে পুরোগামী ক'রে উপস্থিত হলেন যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ'—যেখানে ভগবান শিব এবং বিষ্ণু ব'সে ছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দুঃখ নিবেদন করলেন। শুনে ক্রুদ্ধ বিষ্ণু শিব এবং অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকে সুবিপুল তেজ

নির্গত হয়ে একটি সমষ্টিরূপ পরিগ্রহ করলো—নারীরূপ। সেই নারী হচ্ছেন শক্তি, মহামায়া, ভগবতী, 'যয়া সম্মোহিতং জগৎ'—যাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ সম্মোহিত। তিনি তখন দেবতাদের অভয় দিয়ে মহিষাসুর বধ করলেন। এই শক্তিই জীবের ভোগাপবর্গদায়িনী—এই হ'ল তন্ত্রের ধারা।

কিন্তু এছাড়াও আর একটি চিন্তাধারা আমরা দেখতে পাই। সেটি পৌরাণিক ধারা এবং তা বৈদিক চিন্তাধারায় বীজাকারে রয়েছে। বৈদিক চিন্তাধারায় বলা হয়েছে, কতকগুলি লোক আত্মাকে জানেন, কিন্তু অনেকেই আত্মাকে জানতে পারে না, কারণ তারা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। কিন্তু যাঁরা আত্মাকে জানেন, তাঁদের মধ্যেও বিশেষ অধিকার নিয়ে কেউ কেউ এই পৃথিবীতে আসেন। এঁদেরই বলা হয়েছে—আধিকারিক পুরুষ। এঁরা মানুষের কল্যাণ সাধন করতেই দেহধারণ করেন। এই ভাবধারাটি গীতায় রূপ-পরিগ্রহ করেছে অবতার-তত্ত্বে। গীতার এই অবতারবাদ সম্বন্ধে আপনারা সকলেই জানেন। ভগবান শঙ্করাচার্য, যিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, যাঁর মতে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই'—তিনিও তাঁর গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে এই অবতারবাদ স্বীকার করেছেন।

বেদের ধারা, তন্ত্রের ধারা আর পুরাণের ধারা, এই তিন ধারার মিলনে—এই ত্রিবেণীসঙ্গমে—ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের ইতিহাস সৃষ্ট হয়েছে। এবং আমরা দেখছি, এই তিন ধারার মধ্য দিয়ে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য় ভারত এগিয়ে চলেছে। বহুবার ভারতের অধঃপতন ঘটেছে। কিন্তু ভগবান বারংবার নব কলেবর ধারণ ক'রে আমাদের সামনে এসে ভারতের দুঃখ দৈন্য দুর্দশা দূর করেছেন। কিন্তু এবারের যে পতন, গত ঊনবিংশ শতকের যে পতন—স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—তার চেয়ে গভীরতম পতন আর কখনও ঘটেনি। এবং স্বামী বিবেকানন্দ একথাও বলেছেন যে, এবারের উত্থান এত বড় হবে যে, সেরকম উত্থান আর কখনও হয় নি। তার কারণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন চিন্তাধারা—যে চিন্তাধারা বেদের ভিতর দিয়ে, তন্ত্রের ভিতর দিয়ে, পুরাণের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে এসেছে, তার পরিপূর্ণ একটি রূপ আমরা এই যুগে দেখতে পাচ্ছি। একথা

বিবেকানন্দ বলেছেন— আমার কথা নয় সেইজন্য এই যে পরিপূর্ণরূপ শ্রীভগবান তাঁকে তিনি বলেছেন, 'অবতারবরিষ্ঠ'— সকলের চেয়ে বড় অবতার। এটা শিষ্যের গুরুর প্রতি কেবলমাত্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়। অনেক চিন্তা করেই একথা বলা হয়েছে। কারণ তিনি আর একটি সংস্কৃত শ্লোকেও এই কথাই বলেছেন :

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥

স্বামীজী বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমরা পেয়েছি কি ক'রে? না, অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন ক'রে। অর্থাৎ বেদের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা—সবই সু-সমন্বিত বিগ্রহ লাভ করেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবে। আর এই নরবিগ্রহ সৃষ্টি করেছেন কারা? না, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতারা—ঠিক যেমন তাঁরা নিজ নিজ তেজ দিয়ে মহাশক্তি মহামায়া ভগবতীর বিগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, যে কথার আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তারপর যাঁরা 'ভৌমনারায়ণ'—এই পৃথিবীতে যাঁরা নারায়ণ অর্থাৎ অবতার পুরুষগণ, তাঁদের প্রাণের নির্যাস দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ। কেন একথা বললেন? না, সাধারণতঃ অবতারপুরুষদের আবির্ভাব হয় যুগের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। ভগবান বুদ্ধ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সেই সেই যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে

দিয়েছিলেন। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে দেখা যায় তিনি যুগের প্রয়োজন তো মিটিয়ে ছিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে ততদিন পর্যন্ত ভারতের মানসক্ষেত্রে যত চিন্তার উদয় হয়েছিল, সে সমস্ত চিন্তারাশি আত্মসাৎ ক'রে একটা সমন্বয়ের ভাব প্রকাশ করেছিলেন গীতামুখে। তাই ভাগবতকার বলেছেন: 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—অন্যান্য অবতাররা সেই বিরাট পুরুষের অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান তারপর অতীতে অনেকবার ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনা আর সংঘটিত হয় নি। বর্তমান যুগে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, ভাবরাশিও অনেক বেড়েছে, ধর্মের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। এই কলকাকলির মাঝখানে এসে সমস্ত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেবার জন্যে আবির্ভূত হলেন একজন, যাঁর জীবনে সমস্ত ধর্ম প্রমাণিত হয়েছে, যিনি সমস্ত ধর্মকে, সমস্ত মতকে, সমস্ত পথকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। এই বিরাট সমন্বয়, গীতামুখে যে সমন্বয় তার চেয়ে অনেক বড়। এই বিরাট সমন্বয়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে। তাই স্বামীজী বলেছেন, সব অবতারদের প্রাণের নির্যাস নিয়ে তিনি পূর্ণ হয়েছেন।

তাঁর আবির্ভাবে সূচনা হয়েছে নূতন যুগের। যেকথা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলছিলেন—আগামী দিনে মানুষের ঈর্ষাদ্বেষ চলে যাবে, মানুষের ভেতরে যে ভগবদ্ভাব আছে, তা প্রস্ফুরিত হবে। উনি স্বামী বিবেকানন্দের কথাই বলছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন যে, এমন একটা যুগ সামনে আসছে, যখন মানুষ যোগবিভূতিতে বিভূষিত হয়েই জন্ম-গ্রহণ করবে, যখন রোগ-শোক আর মানুষের শরীর-মনকে আক্রমণ করতে পারবে না, যখন মানুষের সব কাজের প্রেরয়িতা হবে প্রেম—একমাত্র প্রেম।

সেই নূতন যুগ আসছে—সেই নূতন যুগের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। পুরাতনের দিকে এখন আর ফিরে তাকাবার দরকার নেই। ভবিষ্যৎ আমাদের আরও বড়, আরও উজ্জ্বল। সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, তাকে ধ্রুবতারার মতো ক'রে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এই নির্দেশই দিয়েছেন:

"...অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর।"

অন্যান্য সংবাদ

বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমের জনৈক ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি. এস্‌সি (Hons.) পরীক্ষায় ভূবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের দুইজন ছাত্র গত ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে গৃহীত জুনিয়র ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় তৃতীয় ও সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

মাদ্রাজ বয়েজ হাই স্কুল (উত্তর)-এর স্কুল ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি গত ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন। তদুপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তামিল নাড়ুর রাজ্যপাল শ্রী কে. কে. শা।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী অসীমানন্দ (নলিনী মহারাজ) গত ১২ই জানুআরি সকাল ৭-৩৫ মিনিটে 'করোনারি থ্রম্বসিস'-রোগে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ৯৩ বৎসর বয়সে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না এবং চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে অনেকবার কাশী সেবাশ্রমে ভর্তি করা হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন; ১৯০৯ সালে রমাপুরায় অবস্থিত কাশী সেবাশ্রমে যোগ দেন এবং ১৯২১ সালে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। বারাণসীতে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়। কিছুকাল তিনি কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ও গভার্ণিং বডির সদস্যপদে বৃত ছিলেন কিছুকাল। কয়েক বৎসর তিনি মঠ ও মিশনের হিসাবরক্ষকের কাজও করেন এবং সেই সময়ে বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবসর জীবন যাপন করেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সকলেই তাঁহার মধুর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়াছেন।

স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দ (বিপ্রদাস মহারাজ) গত ১৬ই জানুআরি ভোর ৫টায় হৃৎপিণ্ডের গতিরোধজনিত ব্যাধিতে (Cardiac arrest) ৭৮ বৎসর বয়সে নাগপুর আশ্রমে দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন; ১৯২২ সালে ভুবনেশ্বর মঠে যোগ দেন এবং স্বীয় দীক্ষাগুরুর নিকট হইতেই ১৯২৩ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে তিনি নানাভাবে সেবাকার্যে ব্রতী ছিলেন। ১৯২৮ সালে নাগপুর আশ্রমের সূচনা হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং মারাঠী ও হিন্দী ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বহু সংস্করণ ও মাসিক পত্রিকা, 'জীবন বিকাশ' প্রকাশ করেন। তিনি সুবক্তা, সুপণ্ডিত ও সাধুসুলভ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

মাতৃভবনে রজত-জয়ন্তী উৎসব

কলিকাতা (৭এ শ্রীমোহন লেনস্থ) রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবনের রজত-জয়ন্তী গত ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ১৭ই উৎসবের শুভারম্ভ হয় বেদমন্ত্র পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং খিচুড়ি ও মিষ্টান্নাদি প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে। প্রায় ৬০০ জন প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে আয়োজিত মহিলা-সভায় শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণার উদ্বোধনী ভাষণের পর বক্তৃতা দেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা।

১৮ই 'কর্মী দিবস' পালিত হয়। হাসপাতালের কর্মীরা পূজামণ্ডপে শাড়ি ধুতি ফল ও

ফুল নিবেদন করেন। মধ্যাহ্নে তাঁহাদের বিশেষ ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা সভানেত্রী প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও প্রধান অতিথি মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার ব্যানার্জি। হাসপাতালের কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ১২০ জন ব্যক্তিকে প্রায় ১৭,০০০ টাকা ব্যয়ে সভানেত্রী পুরস্কার ও নগদ টাকা পারিতোষিক দেন।

১৭শে 'শিশু দিবস'-এ পূর্বাহ্নে মাতৃভবনে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন সভাপতি ডাঃ আশিসকুমার চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথি ডাঃ দেবব্রত চ্যাটার্জি। সভায় ২০০ জন শিশুকে নূতন পোশাক ও বেবী ক্লিনিকের ২০ জন শিশুকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া মাতৃভবনে জাত প্রায় ৬০০ শিশুকে জলযোগ করানো হয়। অপরাহ্নে রবীন্দ্র সরোবর হলে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন সভানেত্রী মুক্তিপ্রাণা ও প্রধান অতিথি ডাঃ এন. কে. গুহ। সভায় মাতৃভবনে জাত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নৃত্য গীত ও অভিনয়াদি হয়।

২০শে সি. এল. টি. হলে আয়োজিত সাধারণ সভায় ভাষণ দেন সভানেত্রী শ্রীমতী জোয়ান ডায়াস, প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী এ. কে. পাঁজা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন্ ডঃ এ. কে. বসু, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা। শ্রীমতী ডায়াস মিশনের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন ও হাসপাতালের জন্য ১,০০০ টাকা দান করেন। শ্রীপাঁজা হাসপাতালের জন্য ৫০,০০০ টাকার অ্যাড হক গ্রাণ্ট মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করেন।

২১শে পূর্বাহ্নে হাসপাতালের ৬০ জন আয়াকে নূতন শাড়ি উপহার দেওয়া হয় ও তাঁহাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। অপরাহ্নে 'রবীন্দ্র সদন' হলে হাসপাতালের সাহায্যার্থে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ শ্রোতার উপস্থিতিতে সংগীত পরিবেশন করেন সুপ্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পী সর্বশ্রী সুচিত্রা মিত্র অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় শিশিরকণা ধর চৌধুরী এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। টিকিট বিক্রয়লব্ধ প্রায় ১৫,০০০ টাকা হাসপাতালের রজত-জয়ন্তী তহবিলে জমা দেওয়া হয়। শিল্পিগণ কোনও দক্ষিণা গ্রহণ করেন না।

২২শে সমাপ্তি দিবসে ত্যাগরাজ হলে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন সভানেত্রী প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ও শ্রীমতী রাখী সরকার। বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়। শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী ও শ্রীমতী আরতি চক্রবর্তী ভক্তিমূলক সঙ্গীত করেন। কলামণ্ডলের শিশু-শিল্পীরা রামায়ণ ও মহাভারতের অংশবিশেষ কথাকলি নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে প্রায় ৭৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাভবনের প্রায় ৮০ জন ছাত্রীকে জলযোগ করানো হয়।

রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বহুচিত্রশোভিত সুমুদ্রিত এবং বিশেষ আকর্ষণীয় প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন-সম্ভারে সমৃদ্ধ একটি মনোরম স্মরণিকা মাতৃভবন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

পরলোকে শশীকুমার পাল

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৫, বৈকাল ৫-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত শশীকুমার পাল সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৪ই পৌষ ১৩২৫ প্রাতে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে তিনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া ধন্য হন।

কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত নবীনগর মুন্সেফি আদালতে তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর ওকালতি করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই আশ্বিন। (১৩০৬ সাল) [১৮শ সংখ্যা।]

আনন্দময়ীর আগমন

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

আরো একটু বড় হলুম, জানলুম—সেই দশভুজা মা আমাদের দুঃখ মোচন করেন, বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন, অন্তরের সহিত ডাকলে কথা শোনেন। এখন একটু জ্ঞান হয়েছে;—সেই দশভুজা দুর্গা সম্বন্ধে বুঝছি "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী। সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী॥ কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী"॥ আরও যখন বুড়ো হবো তখন হয় ত এও উপলব্ধি করতে পারব—

"যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।

তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তুমি ত্রিলোকব্যাপিনী"॥

আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটীর মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি। মা সর্বব্যাপী;—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইট কাঠের ভিতরে এমন কি সেই ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনই হতে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করে; মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি—প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়,—নিশ্চয়ই বলছি—মা আসবেনই আসবেন; এই মাটীর প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে ব'লব সেইখানেই আস্‌বেন। যেমন ক'রে হ'লে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি ক'রেই তিনি আমার কাছে আস্‌বেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আস্‌বেনই আস্‌বেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্বশক্তিমতী; আমার ক্ষুদ্র আধারের মত হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন।

"এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ-পুতলি গো।

হৃদয় আসনে একবার হও মা আসীন নিরখি তোমায় গো॥

জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে,

(তাত জান গো।)

একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ' তাহে আনন্দময়ী গো"॥

---

* ফাল্গুন, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

গোলকোণ্ডা জাহাজ।

ঝড় ঝাপট্ হলেই ডেকযাত্রীর বড় কষ্ট, আর কতক কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরের "হরিকেন" ডেক ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেকযাত্রীদের একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলিকাতা হতে সুয়েজ পর্য্যন্ত এবং গরমের দিনে ইউরোপেও, ডেকে রাত্রে বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা, তাঁদের সাজান গুজানো কামরার মধ্যে গরমের চোটে, তরলমূর্ত্তি ধরবার চেষ্টা কর্‌ছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী এসব জাহাজের বড়ই খারাপ। কেবল এক নূতন জর্ম্মান লয়েড কোম্পানি হয়েছে; জর্ম্মানির বের্গেন নামক সহর হতে অষ্ট্রেলিয়ায় যায়; তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বড় সুন্দর; এমন কি হরিকেন ডেকে পর্য্যন্ত ঘর আছে এবং খাওয়া দাওয়া প্রায় গোলকোণ্ডার প্রথম শ্রেণীর মত। সে লাইন কলম্বো ছুঁয়ে যায়। এ গোলকোণ্ডা জাহাজে হরিকেন ডেকের উপর কেবল দুটী ঘর আছে; একটী এ পাশে একটী ও পাশে। একটীতে থাকেন ডাক্তার আর একটী আমাদের দিয়েছিলো। কিন্তু সে গরমের ভয়ে আমরা নীচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটী জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হ'লেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের; ওপর নীচে সে কাঠের দেয়ালে অনেকগুলি বায়ুসঞ্চারের জন্য ছিদ্র থাকে। দেয়ালগুলিতে "আইভরি পেণ্ট" লাগান; এক একটী ঘরে তার জন্য প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড খরচ পড়েছে। ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা। দেলের গায় দুটী খুরোহীন লোহার খাটিয়া এঁটে দেওয়া; একটীর উপর আর একটী। ওপারে ঐ রকম একখানি "সোফা"। দরজার ঠিক উল্টা পারে মুখ হাত দোবার জায়গা, তার উপর একখান আরসি, দুটো বোতল—খাবার জলের, দুটো গ্লাস। ফি বিছানার গায়ের দিকে একটী ক'রে জাল্‌তি পেতলের ফ্রেমে লাগান। ঐ জালটী ফ্রেম সহিত দেয়ালের গায়ে লেগে যায় বা টান্‌লে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘড়ি প্রভৃতি বা অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র তাইতে রেখে শোয়। নীচের বিছানার নীচে সিন্দুক প্যাঁটরা রাখবার জায়গা। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাব ঐ, তবে স্থান সংকীর্ণ ও জিনিষপত্র খেলো। জাহাজি কারবারটা প্রায় ইংরেজের এক চেটে। এবং সে জন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেছে, তাতেও ইংরাজ-যাত্রী অনেক ব'লে, খাওয়া দাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মত কর্ত্তে হয়। সময়ও ইংরাজিরকম ক'রে আন্‌তে হয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মনিতে, রুসিয়াতে খাওয়া দাওয়ায় এবং সময়ে, অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে বাঙ্গালায় হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রে গুজরাতে মান্দ্রাজে তফাৎ। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজেতে অল্প দেখা যায়। ইংরাজিভাষীযাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরেজিঢঙ্গে সব গড়ে যাচ্ছে।

---

* অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

জাহাজের কর্মচারীগণ ও আচার ব্যবহার।

বাষ্পপোতে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হচ্ছেন "কাপ্তেন"। পূর্ব্বে "হাই সিতে" কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব করতেন; কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধ'রে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই; তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে। তাঁর নীচে চারজন "অফিসার" বা দিশি নাম "মালিম"। চার পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়র। তাদের যে "চিফ্" তার পদ অফিসরের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে যেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন "সুকানি" যারা হাল ধ'রে থাকে পালাক্রমে। এরাও ইউরোপী। বাকী সমস্ত চাকর বাকর, খালাসি, কয়লাওয়ালা,—হচ্ছে দেশী লোক। সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে। চাকররা এবং খালাসিরা কলকাতার; কয়লাওয়ালারা পূর্ব্ব বঙ্গের; রাঁাঁধুনিরাও পূর্ব্ববঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। আর আছে চারজন মেথর। কামরা হ'তে ময়লা জল সাফ্ প্রভৃতি মেথররা করে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আর পাইখানা প্রভৃতি দুরস্ত রাখে। মুসলমান চাকর, খালাসিরা, ক্রিশ্চানের রান্না খায় না; তাতে আবার জাহাজে প্রত্যহ শোর ত আছেই। তবে অনেকটা আড়াল দিয়ে কায সারে। জাহাজের রান্নাঘরে তৈয়ারি রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায়। যে সকল কলকেত্তাই চাকর নয়া রোস্‌নি পেয়েছে, তারা আড়ালে খাওয়া দাওয়া বিচার করে না। লোকজনদের তিনটা "মেস" আছে। একটা চাকরদের, একটা খালাসিদের, একটা কয়লাওলাদের। একজন ক'রে "ভাণ্ডারী" অর্থাৎ রাঁধুনি আর একটা চাকর কোম্পানি ফি মেসকে দেয়। ফি মেসের একটা রাঁধবার স্থান আছে। কল্‌কাতা থেকে জন কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বোয় যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘরে চাকরদের রান্না হয়ে গেলে রেঁধে খেতো। চাকর বাকররা জলও নিজেরা তুলে খায়। ফি ডেকে দেয়ালের গায় দুপাশে দুটি "পম্প"; একটি নোনা, একটি মিঠে জলের। সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, তাদের খাওয়া দাওয়ার সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা করে। এই সকল জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওয়া অত্যন্ত সোজা। রান্নাঘর পাওয়া যায়, কারুর ছোঁয়া জল খেতে হয় না, স্নানের পর্য্যন্ত জল অন্য কোন জাতের ছোঁবার আবশ্যক নাই; চাল, ডাল, শাকপাত, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, সমস্তই জাহাজে পাওয়া যায়; বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কায করে ব'লে ডাল, চাল, মুলো, কপি, আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদের বার করে দিতে হয়। এক কথা—"পয়সা"। পয়সা থাকলে একলাই সম্পূর্ণ আচার রক্ষা করে যাওয়া যায়।

এই সকল বাঙ্গালী লোকজন—প্রায় আজ কাল সব জাহাজে যেগুলি কল্‌কাতা হতে ইউরোপে যায়। এদের ক্রমে একটা জাত সৃষ্টি হচ্ছে; কতকগুলি জাহাজী পারিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্ছে। কাপ্তেনকে এরা বলে—"বাড়ীওয়ালা", আফিসর—"মালিম", মাস্তুল—"ডোল", পাল—"সড়", নামাও—"আরিয়া", ওঠাও—"হাবিস" heave ইত্যাদি।

খালাসিদের এবং কয়লাওলাদের একজন করে সরদার আছে, তার নাম "সারঙ্গ"; তার নীচে দুই তিন জন "টিণ্ডাল"; তারপর খালাসি বা কয়লাওয়ালা।

খানসামা "boy"দের কর্ত্তার নাম "বটলার" butler; তার ওপর একজন গোরা—ষ্টুয়ার্ট। খালাসিরা জাহাজ ধোওয়া পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামান ওঠান, পাল তোলা পাল

নামান (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয়) ইত্যাদি কায করে। সারঙ্গ ও টিণ্ডেলরা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, এবং কায করছে। কয়লাওয়ালারা এঞ্জিন ঘরে আগুন ঠিক রাখ্‌ছে; তাদের কায দিন রাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর এঞ্জিন ধুয়ে পুঁছে সাফ্ রাখা। সে বিরাট এঞ্জিন, আর তার শাখা প্রশাখা সাফ্ রাখা কি সোজা কায? "সারঙ্গ" এবং তার "ভাই" আসিস্‌টাণ্ট সারঙ্গ কল্‌কাতার লোক, বাঙ্গালা কয়, অনেকটা ভদ্রলোকের মত; লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে; স্কুলে পড়েছিল; ইংরাজিও কয়—কায চালান। সারেঙ্গের তের বছরের ছেলে কাপ্তেনের চাকর-দরজায় থাকে—আরদালি। এই সকল বাঙ্গালী খালাসি, কয়লাওয়ালা, খানসামা, প্রভৃতির কায দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আস্‌ছে, কেমন সবল শরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত। সে নেটিভি পা চাটা ভাব মেথরগুলোরও নেই,—কি পরিবর্ত্তন!

দেশী মাল্লারা কায করে ভাল, মুখে কথাটী নাই, আবার সিকিখানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ, অনেক গোরার অন্ন যাচ্ছে দেখে, খুসী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গাম তোলে। আর ত কিছু বলবার নেই; কাযে গোরার চেয়ে চটপটে। তবে বলে, ঝড় ঝাপ্‌টা হলে, জাহাজ বিপদে পড়্‌লে, এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাযে দেখা যাচ্ছে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসী এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্য্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায় নাই। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? তবে নেতা চাই। জেনেরল ষ্ট্রঙ্‌ নামক এক ইংরাজ বন্ধু সিপাহীর হাঙ্গামার সময় এদেশে ছিলেন। তিনি গদরের গল্প অনেক কর্‌তেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন ক'রে হেরে মলো কেন? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সে গুলো অনেক পেছন থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" করে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যু মুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাযেই এই। "শির্‌দার ত সরদার"; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত।

আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্‌ম্‌" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" ব'লে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" তোমরা। তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউসিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখলেও বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমরা; ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট্‌ সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখছি বলে, যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের

তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ্‌, লুপ্‌। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, দেরি কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীনকঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিসে যাচ্ছ না? হুঁ তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্ন পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই, এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাসার কুটীর ভেদ করে; জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিনরাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়!—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে; অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অম্‌নি শুন্‌বে কোটীজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ্‌ গুরু কি ফতে"। [ক্রমশঃ]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

আর এক পরিচ্ছেদ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

আবার চড়াই উৎরাই। এবারে স্থানে স্থানে একটু বেশী খাড়া চড়াই, আর পথ যেন ক্রমশঃ বৃক্ষলতাদিশূন্য বোধ হইতে লাগিল, লোকজনও বড় নাই। ক্রমশঃ বৈকালে এক ফাঁকা মাঠে আসিয়া হাজির। মাঝে একটী ছোট ঘর, উহাই ধর্ম্মশালা, আমাদের ধনিরাম পাধানের নির্ম্মিত। ঘরখানির একধার পড়িয়া গিয়াছে, তাহার একখানি কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। পাধান

* পৌষ, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

সেইখানিই আমাদের জন্য চিরিয়া দিতে তাহাদের লোকজনকে হুকুম করিল, আমাদের ধুনি ও রন্ধনের কাষ্ঠ তাহাই হইল। পাধান নিজের তিন মাস খরচের জন্য ঘোটক বক্রাদির পৃষ্ঠে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। আমাদের রুটি, শাক ভাজা ও চা খাওয়া হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরে পাধানের অনেক লোকজন সব শয়ন করিল। সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র তাঁবু, তাহাতে পাধান শয়ন করিল। রাত্রে বৃষ্টি হইতে লাগিল। ধর্ম্মশালার ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাথায় ছাতা দিয়া একরূপে রাত কাটাইয়া দিলাম। শুনিলাম, তারপর দিন বরফ পাইব। এবারে নাকি অন্য বারের মত বরফ পড়ে নাই।

এবারে আর পথ বাস্তবিক নাই। বক্রাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম— গাছপালা কিছু নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা মস্ত চড়াই করিতে হইল। শুনিলাম, উৎরায়ের সময় বরফ পাইব।

খানিক বাদে চতুর্দ্দিকে বরফের পাহাড় সব দেখা যাইতে লাগিল। সুকবির বর্ণনার যোগ্য বটে। আমি কেবল চাহিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিলাম। খানিকটা খানিকটা যেন তুলা বিছান। এইবারে একটা উৎরায়ে পায়ের কাছে বরফ আসিল। বরফের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। উতার বলিয়া, আর অসাবধানে চলাতে, আমি ত বার বার পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। বরফ পড়িয়া থাকে—যেন খোবা খোবা—একেবারে জমাট বাঁধিয়া সমতল হইয়া থাকে না। বরফ অতি সামান্য দূর পর্য্যন্তই ছিল। পড়িয়া যাওয়ায় হাত অতিশয় শীতল হইয়া গেল—যেন অসাড়—জামার পকেটে হাত রাখিয়াও কোন মতে গরম হইতেছে না। মঙ্গলপুরী আমাদের হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—সে বরফে পিছলাইয়া প্রায় ২০ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "আমার হাত পা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছিল"।

আমাদের আলেখিয়াদ্বয় এই অসময়ের জন্য গাঁজা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। একটু একটু নেকড়া ধরাইয়া তামাক খাইয়া নিজের শরীরকে গরম করিতে লাগিল। রাস্তার এক জায়গায় থামিয়া গুড়-পাপড়ি খাওয়া গেল। ইতিমধ্যে গুড়-পাপড়ি অল্প অল্প খাওয়া গিয়াছিল, আজ হইতে রীতিমত গুড়-পাপড়ি সুরু হইল।

ক্রমশঃ উৎরাই করিতে করিতে অনেক দূর আসিয়া দেখিলাম—পাধানের দলবল, পাধান সব সমবেত। কাযেই আমরাও তথায় থামিলাম। পাধান বলিয়াছিল, এই স্থানে তিব্বতীয় চৌকীদার থাকে, আজ সে নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং আজ আমরা তাক্‌লা কোটে (যেখানে তিব্বতীয় গবর্ণর ঝঙপঙের নিবাস) পঁহুছিব। আমরা সেই আশায় ছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না। তিব্বতীয় চর এখানে হাজির—দীর্ঘকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। আমরা তিব্বতীয় ভাষা কিছু বুঝি না, পাধানের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। পাধান আমাদিগকে হিন্দীতে বুঝাইয়া দিতে লাগিল, এ ব্যক্তি বলিতেছে, এখান হইতে ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী তাক্‌লা কোটে এখনি যাইয়া ঝঙপঙের সহিত দেখা করিবে। দেখা করিয়া আপনাদের কথা বলিবে। আপনাদিগকে আজ রাত্রি এবং কাল সমস্ত দিন ও রাত এখানে থাকিতে হইবে। আমি কিন্তু কাল প্রাতেই চলিয়া যাইব।

কোন্ স্থানে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, শুনুন। চতুর্দ্দিকে বরফের পাহাড়। অতিশয় ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। যে স্থানটীতে আমরা আশ্রয় লইয়াছি, তাহা কেবল প্রস্তরের খানিকটা পাঁচিল দিয়া ঘেরা মাত্র। তাহাও অনেক স্থলে অতি নীচু। ছাদাদি ত নাইই। তার উপর গুঁড়ি

গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে। আমরা ত পাধানকে বলিলাম, উহাকে বুঝাইয়া বল, যাহাতে কাল আমরা তোমার সঙ্গেই যাইতে পারি। তাহা না হইলে আমরা মারা পড়িব। এই আজ রাত্রে কিরূপে থাকিব, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শীতবস্ত্র সকলের তাদৃশ নাই। যাহা আছে, তাহা চারিজনে বাঁটিয়া লইয়াছি। তাহাতে শীত কোন মতে যাইতেছে না। তাহাতে রাত্রে ফাঁকা শয়ন করিতে হইবে। পাধান বুঝাইয়া বলিল, সৌভাগ্যক্রমে তিব্বতীয় প্রহরী বুঝিল। স্থির হইল, কাল সকালে তাক্‌লা কোটে যাওয়া হইবে। তারপর যাহা হয়, তাহা হইবে। এইবারে আহারের চেষ্টা। আমাদের কাছে কিছু ছাতু ছিল, তাই নুন ও লঙ্কা যোগে, এবং কিছু কিছু গুড়-পাপড়ি ভোজন হইল, পাধান আমাদিগকে একটু একটু গুড় দিল। পাধানের অবশ্য রুটি প্রস্তুত হইল। তাহার অল্প পরিমাণ কাষ্ঠ আছে, অত্য আমরা আর তাহার কাষ্ঠে ভাগ বসাইতে চাহিলাম না। পাধানও কিছু বলিল না। পাধান একখানি হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণ দিল। আমরা তাহাই পাঠ করিতে লাগিলাম। উহাতে তুলসীদাসের জীবনচরিত একটু পড়িলাম। পাধানকেও বুঝাইয়া দিলাম। একটী ছোকরার হাতে তাহার পূর্ব্ব দিকে একখানি ইংরাজি ডাক্তারী মাসিক পত্রিকা দেখিয়াছিলাম। অনেকদিন পরে ইংরাজী পুস্তক দেখিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম। এদিকে পাধানের ক্ষুদ্র তাঁবু খাটান হইয়াছে। তাঁবুর ভিতর সব জিনিষপত্র সব বস্তা জড় করা। পাধান আর এক আধজন উহার ভিতর থাকিবে। পাধানের বড় তাঁবু তাক্‌লা কোটে রহিয়াছে। এ একটী ছোট তাঁবু সামনে খোলা। পাধান ও তাহার সঙ্গীরা তাস খেলিতে বসিল। আমরা কেহ পাধানের তাঁবুতে কেহ বা বাহিরে কাপড় চোপড় মুড়ি দিয়া রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন সমুদয় বক্‌রাকে সেই পাঁচিলের ভিতরে দলবদ্ধ করা হইল। সৌভাগ্যক্রমে পাধান আমাদিগকে তাহার তাঁবুতে শয়ন করিতে অনুমতি করিল। আমরা যেন ধড়ে কতকটা প্রাণ পাইলাম। ইতিমধ্যে এই বরফ ও বরফের পাহাড় দেখিয়া আমাদের ক্রমশঃ উদ্যম ও অধ্যবসায় মন্দীভূত হইয়াছে। আমরা একরূপ স্থির করিলাম—এখান হইতে তাক্‌লা কোটে যাই, ঐখান হইতে মানসসরোবরে না গিয়া ইংরাজরাজ্যের ভিতরের পথ (কালাপানির পথ) দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব। মহেশ্বরপুরী আমাদের মতে মত দিল, মঙ্গলপুরী দিল না। আমরা পাধানের নিকট আমাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিলাম। পাধান উদাসীনভাবে বলিল, যাহা আপনাদের ইচ্ছা। রাত্রে আরো ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। পা হাঁটু পর্য্যন্ত এবং হাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে লাগিল। নিদ্রা ভাল হইল না।

ভোরে উঠিলাম। পাধানকে বলিলাম, আমাদের তিনজনের কালাপানি পর্য্যন্ত যাইবার জন্য তিনটী ঘোড়া ভাড়া করিয়া রাখিবে। সে বলিল, আচ্ছা। এখানে ঘোড়া ও ঝুপ্পু নামক এক প্রকার গোসদৃশ জন্তু বাহনস্বরূপ পাওয়া যায়। পাধান ভোরে ঘোড়ায় তাক্‌লা কোটে রওনা হইল।

হিমালয়ের অপর পারে আসিয়াছি। এইবারে তিব্বতের plateau বা tableland। এতদিন পরে অপেক্ষাকৃত সমতল পথ পাইয়া মহা আনন্দের সহিত চলিতে লাগিলাম। রাস্তায় মঙ্গলপুরী আমাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, এতদূর আসিয়া আর কিয়দ্দূরমাত্র থাকিতে মানসসরোবর

দর্শন না করা পাপীর লক্ষণ। আমরা তাহার কথা তখন বুঝিলাম না। যাহা হউক ক্রমশঃ পথে চলিতে লাগিলাম। পথে চলিতে চলিতে চমরী গো দেখিলাম। ইহার পুচ্ছে চামর হয়। তিব্বতীয়েরা ইহার দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করে, ইহার মাংসও ভক্ষণ করে। ক্রমশঃ খানিকটা উতার আসিল। এই উতারের পর বেশ খানিকটা সমতল জমি ও চাস বাস দেখিতে পাইলাম। এস্থান দেখিয়া ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশের কথা মনে উদয় হইল। তারপর একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর উঠিলাম, উঠিয়াই দেখি—রাশীকৃত তাঁবু পড়িয়াছে। বুঝিলাম, আমরা তাকলা কোটে আমাদের অভিলষিত স্থানে পঁহুছিয়াছি। আমাদিগকে ধনিরামের তাঁবু খুঁজিয়া লইতে বড় কষ্ট হইল না।

তখন তাহার তাঁবু খাটান হইতেছে। ধনিরাম নাই। সে ঝঙপঙের কাছে গিয়াছে। আমরা বসিয়া ধনিরামের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমরা যেখানে বসিয়া, তথা হইতে একটী উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় ঝঙপঙের বাটী দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমরা সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে ধনিরামের ঘোড়া দেখা গেল। ধনিরাম ক্রমশঃ থামিয়া আসিল।

আসিতেই আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—কি খবর? ধনিরাম বলিল, আমি ঝঙপঙের কাছে বলিলাম, ৪ জন সাধু আমার সহিত আসিয়াছেন, তাঁহাদের মানসসরোবর দর্শন করিতে ইচ্ছা। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, মানসসরোবর পর্য্যন্ত উহারা যাইতে পারেন। তবে তাঁহারা অধিক দূর যেন না যান। আর যে পথ দিয়া যাইতেছেন, সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তোমার জরিমানা করিব।

আমরা তখন একরূপ যাইবই না, স্থির করিয়াছি, এক্ষণে মঙ্গলপুরী আবার উত্তেজনা করিতে লাগিল। আবার স্থানটি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও বেশ রৌদ্র হওয়ায় আমরা পূর্ব্ব রাত্রের কষ্ট ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সঙ্কল্পের মত স্থির হইল—মানসসরোবর পর্য্যন্ত যাওয়া। [ক্রমশঃ]

মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম

(প্রেরিত পত্র—২৩।৮।৯৯।)

"মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের হিতকল্পে কলিকাতা ইটালীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ দেব মহাশয় সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। তিনি ইটালী অঞ্চল হইতে গত এপ্রেল মাস হইতে মাসিক ১৬৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় করিতেছেন। উপেন্দ্র বাবু ও কলিকাতার ইটালীবাসীগণ অনাথাশ্রমের প্রতি যে দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপেন্দ্র বাবু নীরবে অনাথাশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। উপেন্দ্র বাবুর দ্বারা ইটালীবাসীগণের নিকট হইতে আমরা গত এপ্রেল হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত অনাথাশ্রমের মাসিক চাঁদাস্বরূপ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮৷৷০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। [ক্রমশঃ]

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

দিব্য বাণী

তত্ত্ববিদ্ যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্ত্তেত তদা বহিঃ।
প্রবর্ত্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোঽস্য প্রবর্ত্তনে ॥
সমাধিমথ কর্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥
নৈষ্কর্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্বাসনং মনঃ ॥
তদিত্থং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাৎ।
জ্ঞানিনাচরিতুং শক্যং সম্যগ্‌রাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥

—পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ, ৯৮, ১০২-৩, ১১৪

জ্ঞানী যদি অন্তর্মুখে ধ্যানে নাহি র'বে
বাহ্য-ব্যবহারে তবে প্রবৃত্ত হইবে।
হউন স্বচ্ছন্দে তিনি, বাধা কিবা তা'য় ?
সমাধিস্থ থাকিলে বা কর্ম-অবস্থায়—
হৃদয়-সংস্কার সব দূরীভূত তাই
নির্মল অন্তর হেতু মুক্ত সর্বদাই।
কর্মে বা নৈষ্কর্ম্যে কিংবা জপে সমাধিতে
প্রয়োজন কিবা যাঁর নির্বাসনা চিত্তে ?
দশেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সক্রিয় তাঁহার
রাজ্যাদি লৌকিক কর্মে বাধা কোথা আর !
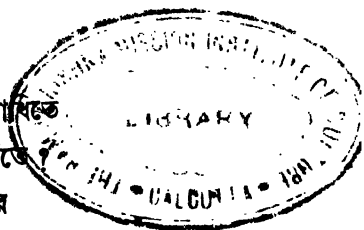
কথাপ্রসঙ্গে

শংকরাচার্য ও কর্মত্যাগ

শংকরাচার্যের বিরুদ্ধে যে সকল তীব্র সমালোচনা শোনা যায়, তাহাদের অন্যতম আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা ইহাই যে, তিনি তাঁহার রচনাবলীতে কর্মত্যাগের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন; তাঁহার প্রচারিত নৈষ্কর্ম্যের আদর্শ জীবনমুখী নহে; উহা জাতিকে কর্মবিমুখ হইতে প্রশ্রয় দিয়া দেশের সমূহ ক্ষতি-সাধন করিয়াছে। কারণ, প্রবল কর্মের দ্বারাই জাতির সমৃদ্ধি ঘটিতে পারে—কর্মকুণ্ঠ নিরুৎসাহ নিরুদ্যম ব্যক্তিদের দ্বারা কোনও কালে কোনও জাতির শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

সমালোচকদের ভাবটা মনে হয় ইহাই যে, শংকরাচার্য যেন দুনিয়াসুদ্ধ লোককে কর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। শংকরাচার্য অবশ্যই কর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু কাহাকে? তাহাই দেখা যাক।

ভারত-ভূখণ্ডের বহির্ভূত এই বিশাল পৃথিবীর কোনও ব্যক্তিকে শংকরাচার্য আদৌ কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। ভারতবর্ষের মধ্যেও বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান ইসলামধর্মাবলম্বী প্রভৃতি অহিন্দুদের তিনি কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ আছে। শংকরাচার্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যাঁহারা নিয়মিত সাধারণ ধারায় ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরও তিনি কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ণাশ্রমব্যবস্থায় নিয়মিত সাধারণ ধারায় যাঁহারা জীবনের শেষ-ভাগে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিতেন, তাঁহাদের বেদাভ্যাসাদি কিছু কিছু নিত্য কর্ম থাকিত এবং মহর্ষি মনুর মতে তাঁহারা 'পুত্রৈশ্বর্যে'-ও প্রাণধারণ করিতে পারিতেন। দেহান্তে ইঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হইত। ইঁহারা 'আশ্রমসন্ন্যাসী' নামে অভিহিত হইতেন। শংকরাচার্য এই সকল আশ্রমসন্ন্যাসীদেরও কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই।[1] আবার যাঁহারা পূর্ণজ্ঞানী, তাঁহারা তো সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত। শংকরাচার্যের মতে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কর্ম করিতে পারেন।[2]

তাহা হইলে শংকরাচার্য কর্মত্যাগ করিতে বলিলেন কাহাকে?

শংকরাচার্য কর্মত্যাগ করিতে বলিলেন সেই ব্রাহ্মণকে[3] যিনি বিবিদিষু অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে জানিতে যাঁহার অন্তরে প্রবল জাগিয়াছে, যিনি তীব্র বৈরাগ্যবান এবং চিত্তের

১ 'অস্তি আশ্রমরূপং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মলোকাদিফলপ্রাপ্তিসাধনং যদ্‌বিষয়ং যজ্ঞোপবীতাদি সাধনবিধানং লিঙ্গবিধানং চ।'—বৃহ. উ. ৩।৫।১, ভাষ্য।

২ 'যস্য···বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানম্ উৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়ম্ একম্ এব ইদং সর্বং ব্রহ্ম অকর্তৃ চ ইতি, তস্য কর্মণি কর্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তে অপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্বং···প্রবৃত্তিঃ .. যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রকর্ম চেষ্টিতম্।'—গীতা, ২য় অধ্যায়, অবতরণিকাভাষ্য।

৩ 'ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণানাম্ এব অধিকারো ব্যুত্থানে অতঃ ব্রাহ্মণগ্রহণম্।'—বৃহ. উ. ৩।৫।১. ভাষ্য।
'ন হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ পারিব্রাজ্যপ্রতিপত্তিঃ অস্তি।'—বৃহ. উ. ৪।৫।১৫, ভাষ্য।

প্রত্যক্‌প্রবণতা অর্থাৎ অন্তর্মুখীনতার ফলে সমস্ত কর্ম ছাড়িয়া দিলেও যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার সামর্থ্য রাখেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই হিসাবমতে শংকরাচার্য লক্ষের মধ্যে একজনকেও বোধ হয় কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। অতএব সমালোচকদের উল্লিখিত অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অপরের শূন্যগর্ভ কথার দ্বারা পরিচালিত না হইয়া গড্ডলিকাস্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া যাঁহারাই আচার্যদেবের মূল গ্রন্থাবলীর ভিতর প্রবেশ করিবেন, তাঁহাদের নিকট এই ধরনের সমালোচনার অন্তঃসারশূন্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবেই

শংকরাচার্য তো হিন্দুদের শাস্ত্রের কথাই বলিয়াছেন, স্বকপোলকল্পিত তো কিছুই বলেন নাই! উপনিষদই বলিতেছেন: 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যখনই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; 'ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা'—ব্রহ্মচর্য-আশ্রম হইতেই সন্ন্যাসী হইবে অথবা গার্হস্থ্য-আশ্রম হইতে অথবা বানপ্রস্থ-আশ্রম হইতে। সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়মিত সাধারণ ধারায় যে সকলকেই আশ্রমসন্ন্যাসী হইতে হইবে এবং পুত্রৈশ্বর্যে জীবনধারণ করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। শাস্ত্রই বিবিদিষা-সন্ন্যাসের বিধান দিয়াছেন এবং সেই বিধান অনুযায়ীই শংকরাচার্য বিবিদিষু সন্ন্যাসীকে সমস্ত কর্ম হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, যাহাতে তিনি আত্মদর্শন করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

এখন বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন, বিবিদিষু সন্ন্যাসীই বা একেবারে কর্মত্যাগ করিবেন কেন?—কিছু কিছু লৌকিক বা যজ্ঞ-দানাদি বৈধ শাস্ত্রীয় কর্ম তিনি করুন না কেন? ইহার উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গীতায় দিয়াছেন:

আরুরুক্ষো র্মুনে র্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

—যিনি ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ ধ্যানযোগে অনারূঢ়, ধ্যানযোগে অবস্থান করিতে অশক্ত, তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম কর্মই সাধন। সেই নিষ্কাম কর্মীই যখন ধ্যানযোগে আরূঢ় হন, তখন সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্তিই তাঁহার সাধন হয়।

উল্লিখিত শ্লোকে শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন এবং গীতার অন্যত্রও তিনি ধ্যান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার শংকরাচার্য-কৃত ব্যাখ্যার নিষ্কর্ষ ইহাই যে, কর্মযোগ হইতেছে ধ্যানযোগের সাধন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না ধ্যানের পূর্ণ অধিকারী হওয়া যায়, ততক্ষণ কর্ম করিতেই হইবে। কিন্তু ধ্যানের অধিকারী হইলে আর লৌকিক বা যজ্ঞ-দানাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, ধ্যান হইতেছে আত্মদর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন—নির্বিকল্পসমাধিশুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারাই আত্মদর্শন হইয়া থাকে; সুতরাং ধ্যানী ব্যক্তি যদি কর্ম করিতে থাকেন, তাহা হইলে ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে; ফলে নির্বিকল্পসমাধিসহায়ে আত্মদর্শন ঘটিবে না। 'ধ্যানযোগ'-শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিয়া শংকরাচার্য লিখিয়াছেন: 'ধ্যানম্ আত্মস্বরূপচিন্তনং, যোগঃ আত্মবিষয়ে এব একাগ্রীকরণম্।'—ধ্যানের অর্থ আত্মস্বরূপের চিন্তা করা এবং যোগের অর্থ মনকে আত্মবিষয়েই একাগ্র করা। যে ব্যক্তি এইরূপ ধ্যানযোগকে পরম অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে লৌকিক বা উপরি-উক্ত শাস্ত্রীয় কোনও কর্ম নাই—তিনি নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ, এই কারণে মন্দিরপ্রদক্ষিণ, মন্ত্রজপাদি পর্যন্ত তাঁহার কর্তব্য হিসাবে বিহিত হইতে পারে না।

এইরূপ নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ ব্যক্তি অচিরেই নির্বিকল্পসমাধিসহায়ে আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসচ্চিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
বিলীয়তে যস্য মনঃপ্রচারঃ॥

—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অপার সুখসাগরে যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিলীন হয়, তিনি স্বীয় জননীকে কৃতার্থা, নিজ কুলকে পবিত্র এবং সমগ্র পৃথিবীকে পুণ্যবতী করেন।

নির্বিকল্প সমাধির ফলে এইরূপ পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির ধ্যান বা সমাধির প্রতি আর আকর্ষণ থাকে না। তাঁহার সফল জীবনে উহাদের কোনও প্রয়োজনীয়তাও থাকে না। তখন তিনি 'বহুজন-হিতায়' প্রবল কর্ম করিতে পারেন। গীতায় 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে', 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ', ইত্যাদি বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীর কর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং আচার্য শংকরও অনুরূপভাবেই উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারাও ইহা সমর্থিত হয়, কারণ কর্ম ধ্যানীর ধ্যানের প্রতিবন্ধক—জ্ঞানীর জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে।

অতএব দেখা গেল, বিশেষ অধিকারীর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কেই শংকরাচার্য কর্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন। শুধু শংকরাচার্য নহেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সেদিন পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর ধারক ও বাহক তদীয় সন্তানগণের দ্বারা ওই একই কথা উচ্চারিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: 'Those who want to go to the highest, must avoid all company, good or bad.'—যাঁহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে সৎ বা অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। স্বামীজী সর্বপ্রকার লোকসঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিতেছেন—ইহাকেই অন্য কথায় কর্মত্যাগ বলা যায়। সর্বপ্রকার লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, লোকব্যবহারে বিরত হইয়া অর্থাৎ কর্মত্যাগ করিয়া সে-ব্যক্তি কী করিবে? ধ্যানসহায়ে নির্বিকল্পসমাধিভূমিতে আরূঢ় হইয়া আত্মদর্শন করিবে—ইহাই অর্থ। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিয়াছিলেন: 'একটা সময় আসে যখন সব ছেড়ে শুধু জপধ্যান নিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, তখন কাজ অমনি ছুটে যায়। মন যখন জাগ্রত হয়, তখনই এটা হয়।' একটি পত্রেও তিনি লিখিয়াছিলেন: যাহারা শুধু সাধনভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের অন্ততঃ ১৫।১৬ ঘণ্টা ধ্যানজপ করা উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে।' স্বামী শিবানন্দজীর কথাতেও পাওয়া যায়: 'কাজকর্ম ভাল কিন্তু যারা ঈশ্বরলাভ করতে চায়, তাদের প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই চারটে stage পেরুতে হবেই।'

এইরূপ উচ্চাধিকারী জগতে চিরকালই দুর্লভ এইজন্য বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অবতারগণ বা আচার্যগণ কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। বাস্তবপক্ষে আচার্য শংকরও কর্মেরই উপর জোর দিয়াছেন—কর্মত্যাগের উপর নহে। কারণ, অধিকাংশ লোকেরই ধ্যানের সামর্থ্য নাই। 'সাধনপঞ্চকম্'-এর প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন: নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে, বেদোক্ত কর্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান করিবে এবং উহার দ্বারাই ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। 'অপরোক্ষানুভূতি' গ্রন্থেরও প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন: নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম নির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান, তপস্যা ও শ্রীহরির তুষ্টিবিধানের দ্বারাই—নিত্য ও অনিত্য পদার্থের বিবেক, ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত সুখভোগে বিরাগ, শম দম তিতিক্ষা উপরতি

শ্রদ্ধা ও চিত্তের একাগ্রতা, এই ছয়টি সম্পত্তি এবং মুক্তির ইচ্ছা—জ্ঞানের এই সাধন-চতুষ্টয়ের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শংকরাচার্যের স্থির সিদ্ধান্ত ইহাই যে শুধু ইহজন্মে নহে, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অনুষ্ঠিত বহু শুভ কর্মের ফলেই মানুষের বিবিদিষা উৎপন্ন হয় এবং কর্মত্যাগের অধিকার অর্জিত হয়। এই-জন্য গীতাভাষ্যে তিনি কর্মযোগকে 'মোক্ষমার্গ' বলিয়া স্পষ্ট অভিহিত করিয়াছেন।

আমরা শংকরাচার্যের জ্ঞানের দিকটাই সাধারণতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকি— তাঁহার রচনাবলীতে জ্ঞানের মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত হওয়ার ফলে। তাঁহার জীবনে কর্মের দিকটি উপেক্ষিত থাকিয়া যায়। পূর্ণজ্ঞানী হইয়াও তিনি যে কত বড় কর্মবীর ছিলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। বর্তমানযুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে সুদূর পাশ্চাত্যেও অদ্বৈতবেদান্তের বাণী প্রচারিত হইতেছে ভারতীয় সন্ন্যাসিবৃন্দের দ্বারা—বিমানে এদেশ হইতে ওদেশে যাতায়াত এত সহজসাধ্য হইয়াছে। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবেদান্ত-প্রচার ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তখন ট্রেন ছিল না, মোটরগাড়ী ছিল না, বিমান ছিল না। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাতায়াত কত কষ্টসাধ্য ছিল। জীবনের ষোল হইতে বত্রিশ বৎসর পর্যন্ত শংকরাচার্য পদব্রজে ভারতের দুর্গম তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার করিয়াছেন, লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধার করিয়া দেববিগ্রহাদির সংস্কার ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ভারতের চারিটি প্রান্তে সন্ন্যাসীদের চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসিসম্প্রদায়কে সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া-ছেন। তাঁহার বারো হইতে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য-রচনার কাল। মাত্র আট বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাহার পর তিন বৎসর তাঁহার সাধনাকাল। সুতরাং তাঁহার বত্রিশ বৎসরের জীবনে লৌকিক বা সমাজমুখী কর্মত্যাগ যে মাত্র তিন বৎসরের জন্য এবং সে-কর্মত্যাগও যে একটি বিরাট কর্ম-যজ্ঞের প্রস্তুতিরূপেই অবশ্য স্বীকরণীয়, ইহাও বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্বে বৈশাখের এক শুক্লা পঞ্চমী[৪] তিথিতে দক্ষিণ ভারতের কালাডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহামানব জ্ঞানের দীপ্তিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত করিয়াছেন, যাঁহার কৈশোরের রচনাবলী বিশ্বের জ্ঞানতপস্বীদের বিস্ময় ও সমাদরের বস্তু, সেই জগদ্গুরু শংকরাচার্যের আবির্ভাব-তিথির পুণ্যাবসরে তাঁহার নিঃসীম জ্ঞান ও লোকবিস্ময়কর কর্মের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

৪ মতান্তরে তৃতীয়া।

"বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎসতা দেখা দিল, তাহা বর্ণনা করিবার সময় আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই।...কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি আসিয়া থাকি', তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। এবার তাঁহার আবির্ভাব হইল দাক্ষিণাত্যে। সেই ব্রাহ্মণযুবক, যাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ষোড়শ বর্ষে তিনি তাঁহার সকল গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত প্রতিভা-শালী শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতে এক বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্ময়জনক!" —স্বামী বিবেকানন্দ

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : যদুক্তং বিলক্ষণয়োঃ ন কার্যকারণতা ইতি তৎ ন,—উর্ণনাভেঃ তন্তোঃ, গোময়াৎ বৃশ্চিকাদেঃ, পুরুষাৎ কেশলোমাদেঃ চ দর্শনাৎ ইতি অভিপ্রেত্য আহ— **যশ্চ হি সর্বঃ** ইতি। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা. উ. ৩।১৪।১), 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' (বৃ. উ. ২।৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ঘটঃ সন্ ঘটঃ স্ফুরতি ইতি সর্বস্য প্রপঞ্চস্য সত্ত্বেন স্ফুরণত্বেন চ ব্রহ্ম-সালক্ষণ্যানুভবাৎ। 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ / যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি / তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥' (মু. উ. ১।১।৭) ইত্যাদি শ্রুত্যা বিলক্ষণকারণত্বে দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনাৎ চ ইতি ভাবঃ।

ননু অচেতনস্য প্রধানস্য স্বতঃ সৃষ্ট্যাদি প্রবৃত্ত্যসম্ভবে অপি ঈশ্বরাধিষ্ঠিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যা কারণত্বং ভবতি ইতি যোগানাং সেশ্বর-সাংখ্যানাং বা মতম্ আশঙ্ক্য আহ - **সকলো যঃ** ইতি। সকলঃ প্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা চ, স এব ইতি অর্থঃ। 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈ. উ. ২।৬) ইতি স্বস্য এব বহুভবন-কামনা-দর্শনাৎ 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' (তৈ. উ. ২।৭) ইতি স্বাত্মনঃ জগদ্রূপেণ কারণত্বশ্রবণাৎ। 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' (মু. উ. ১।১।৩), 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' (ছা. উ. ৬।১।৩), 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে ইদং সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' (বৃ. উ. ৪।৫।৬) ইত্যাদি শ্রুতেঃ একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রোর্ভেদে প্রকৃতি-জ্ঞানেন অধিষ্ঠাতৃ-জ্ঞানাভাবেন উপরোধপ্রসঙ্গাৎ। শ্রুতিসিদ্ধপ্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপস্য ঈশ্বরস্য তটস্থত্বমাত্রত্বস্য লোকদৃষ্টসামান্য-প্রসাধকেন অনুমানেন সিদ্ধ্যসম্ভবাৎ চ স এব প্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা চ। সূত্রকারঃ অপি—'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্র. সূ. ১।৪।২৩), 'সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ' (ব্র. সূ. ১।৪।২৫), 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (ব্র. সূ. ১।৪।২৬), 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' (ব্র. সূ. ২।২।৩৭) ইতি ঈশ্বরস্য প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপত্বং নিমিত্তমাত্রেশ্বরস্য অভাবং চ আহ। সূত্রাণাম্ অয়ম্ অর্থঃ—প্রকৃতিঃ উপাদানং, চকারাৎ অধিষ্ঠাতা চ ঈশ্বরঃ। এবং সতি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োঃ অনুপরোধাৎ, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ। যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ইতি প্রকৃতি-বিষয়-দৃষ্টান্তস্য চ অনুপরোধাৎ, উপপত্তেঃ ইতি, সাক্ষাৎ মুখতঃ এব 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈ. উ. ২।৬, ছা. উ. ৬।২।৩) ইতি উভয়াম্নানাৎ, প্রকৃতিত্বস্য অধিষ্ঠাতৃত্বস্য চ আম্নানাৎ ইতি। 'আত্মকৃতেঃ',—'তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত' ইতি আত্মনঃ এব জগদাকারেণ কারণত্বশ্রবণাৎ। কথং কর্তৃত্বেন পূর্বসিদ্ধস্য ক্রিয়মাণত্বং তত্র আহ,—'পরিণামাৎ' ইতি

পূর্বসিদ্ধস্য অপি বিকারাত্মনা স্বাত্মনঃ পরিণাময়িতৃত্বাৎ। পত্যুঃ নিমিত্তমাত্রভূতেশ্বরস্য অসামঞ্জস্যাৎ অনুপপত্তেঃ ইতি। লোকদৃষ্ট-সামান্যেন অনুমিতস্য লোকবৎ এব রাগ-দ্বেষাদি-প্রসক্ত্যা ঈশ্বরত্বানুপপত্তেঃ ইতি। ততঃ চ ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতং প্রধানম্ অপি কারণম্ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ*: আর যে বলা হইয়াছে, দুইটি বিলক্ষণ (ভিন্নস্বভাববিশিষ্ট বস্তুর কার্যকারণভাব হয় না, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ – উর্ণনাভি হইতে তন্তু, গোময় হইতে বৃশ্চিকাদি এবং জীবিত পুরুষ হইতে কেশলোমাদির উৎপত্তি দেখা যায় (অতএব বিরুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের কার্যকারণভাব হইতে পারে না, তাহা নহে) – এই অভিপ্রায়ে (আচার্য শ্লোকে) বলিতেছেন— **'যশ্চ হি সর্বঃ'**—যিনি সর্বরূপ। 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম', 'ইদং সর্বং যদয়ম্ আত্মা'—পরিদৃশ্যমান সব কিছুই বস্তুতঃ ব্রহ্ম, যাহা দৃশ্যমান (সেই) সমস্তই সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ – ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা (ইহাই জানা যায় যে, সর্বরূপে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতীত হইতেছেন।))। কারণ 'ঘট আছে', 'ঘট স্ফুরিত হইতেছে (প্রকাশ পাইতেছে)', এইরূপে সর্বপ্রপঞ্চে সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মের সাদৃশ্য অনুভূত হয়। (এইরূপে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাহাদের কার্যকারণভাব হইতে পারে, ইহা বলা হইল।); আর 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ…বিশ্বম্' – যেমন উর্ণনাভি আপনা হইতে তন্তু সৃষ্টি করে ও আপনাতেই বিলীন করিয়া লয়, পৃথিবীতে যেমন ওষধি আদি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, জীবিত পুরুষ হইতে যেরূপ কেশ লোম উদ্গত হয়, অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও তদ্রূপ এই সমগ্র বিশ্ব নির্গত হইয়া থাকে – ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নস্বভাববিশিষ্ট বস্তুও কারণ হইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। (অতএব বিলক্ষণ পদার্থের মধ্যেও কার্যকারণভাব হওয়া সম্ভব।) । (এক্ষণে যোগমত উত্থাপন করা হইতেছে –) । (শঙ্কা): অচেতন প্রধানের স্বভাবতঃ (জগৎ-) সৃষ্টি প্রভৃতি (কার্যে) প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রধানই জগৎকারণ—এইরূপ যোগ বা সেশ্বর সাংখ্যগণের মত আশঙ্কা করিয়া (আচার্য শ্লোকে উত্তর) বলিতেছেন— **'সকলো যঃ'** ইতি। ব্রহ্মই সকল অর্থাৎ (জগতের) উপাদানকারণ এবং অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, ইহাই অর্থ। কারণ 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' – অর্থাৎ তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব—এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহার নিজেরই বহুরূপ ধারণের কামনা দেখা যায় এবং 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—অর্থাৎ তিনি নিজেকেই নিজে (জগদ্রূপে) নির্মাণ করিয়াছিলেন —এই শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব শুনা যায়। (আরও দেখ) 'কস্মিন্…ভবতি'—অর্থাৎ হে ভগবন্! কোন্ বস্তু বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে এই সব কিছুই বিজ্ঞাত হইয়া যায়?, '(যাঁহাকে জানিলে) অশ্রুত বস্তুও শ্রুত হয়।', 'অয়ি মৈত্রেয়ি! আত্মাকে জানিলেই দৃশ্যমান সব কিছুই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।'—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে;

* অনুবাদের ভিতর মূল স্তোত্রের অংশ স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে এবং অব্যবহিত পরেই উহার যথাসম্ভব আক্ষরিক অর্থ দেওয়া হইতেছে। এই কারণে গত চৈত্র সংখ্যা হইতে তৃতীয় বন্ধনীর প্রয়োগ বর্জন করা হইয়াছে। —সঃ

উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ ভিন্ন হইলে, উপাদান-কারণের জ্ঞান দ্বারা নিমিত্ত-কারণের জ্ঞান হয় না (এবং নিমিত্ত-কারণের জ্ঞান দ্বারাও উপাদান-কারণের জ্ঞান হয় না) বলিয়া পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত ঘটে।

ঈশ্বরের (জগতের) উপাদান-কারণত্ব ও নিমিত্ত-কারণত্ব শ্রুতিসিদ্ধ। (সুতরাং) লোক-প্রসিদ্ধ সামান্য অনুমানের দ্বারা (যাহা কার্য, তাহা কর্তৃনিষ্পাদ্য ; সুতরাং জগৎ কার্য বলিয়া তাহারও একজন কর্তা আছেন—এইরূপ অনুমানের দ্বারা) (ঈশ্বরের) কেবল নিমিত্ত-কারণত্ব সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তিনিই (জগতের) উপাদান- ও নিমিত্ত-কারণ।

(ভগবান) সূত্রকারও 'প্রকৃতিশ্চ…অসামঞ্জস্যাৎ'—এই সকল সূত্রে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণই নহেন, পরন্তু তিনি নিমিত্ত-ও উপাদান-উভয়বিধ কারণই বটেন, এই কথাই বলিয়াছেন। (উদ্ধৃত) সূত্রসমূহের অর্থ এই : ( ) 'প্রকৃতি'-শব্দের অর্থ উপাদান। (সূত্রস্থিত) 'চ'-কারের দ্বারা ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণও তিনি। (অতএব ঈশ্বরই উপাদান-এবং নিমিত্ত-কারণ—ইহাই বলা হইল)। (কারণ) এইরূপ স্বীকার করিলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অর্থে কোন সংকোচ হয় না। (কেন সংকোচ হয় না, তাহা বলা হইতেছে--) একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান হয়, ইহাই প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞার এবং 'হে সৌম্য (প্রিয়দর্শন)! যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে মৃন্ময় সর্ব বস্তুর জ্ঞান হয়, এই উপাদানবিষয়ক দৃষ্টান্তের অর্থে কোন সংকোচ হয় না ; সুতরাং পরমাত্মাই (জগতের) অভিন্ন নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয়। (২) আর শ্রুতি সাক্ষাৎ নিজ মুখেও 'আমি বহু হইব এবং প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব'—এইরূপ উভয়বিধ ঘোষণা করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন।[১] (৩) 'আত্মকৃতেঃ'—আত্মবিষয়ক প্রযত্নবশতঃ অর্থাৎ 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—তিনি নিজেই নিজেকে জগদাকার করিয়াছিলেন—এই শ্রুতিও পরমাত্মাই জগদাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনিই জগৎকারণ, এই কথাই বলিতেছেন।[২] কর্তারূপে পূর্বসিদ্ধ আত্মা (জগদ্রূপে) ক্রিয়মাণ কি প্রকারে হইতে পারেন [৩] তাহাই বলা হইতেছে, 'পরিণামাৎ', এই শব্দ দ্বারা। কারণ পূর্ব-

---

১ 'বহু স্যাং প্রজায়েয়'—এই শ্রুতির 'বহু স্যাং' এই অংশের দ্বারা উপাদান-কারণ এবং 'প্রজায়েয়' এই অংশের দ্বারা নিমিত্ত-কারণ সূচিত হইয়াছে। কূটস্থ নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বভাবতঃ কোন কারণই হইতে পারেন না। কেবলমাত্র মায়াবশতই ব্রহ্ম কারণ হন। মায়ার দুইটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। বিক্ষেপশক্তির ফলে ব্রহ্ম বিবর্ত-উপাদান-কারণ এবং আবরণশক্তির ফলে ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ হন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।২।৩ এবং ৬।৩।২-এর শাংকরভাষ্য ও আনন্দগিরিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

২ উদ্ধৃত শ্রুতিতে 'আত্মানম্' অর্থাৎ 'নিজেকে'—এই অংশের দ্বারা ব্রহ্মের কর্মত্ব অর্থাৎ উপাদান কারণত্ব এবং 'অকুরুত' অর্থাৎ 'করিয়াছিলেন'—এই অংশের দ্বারা ব্রহ্মের কর্তৃত্ব অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' সূত্রটির তাৎপর্য।

৩ উৎপত্তির পূর্বে কার্যের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না—ইহাই অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িকগণের মত। এই মত অনুসরণ করিয়া এখানে পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে। আত্মা কর্তা, সুতরাং কার্যের উৎপত্তির পূর্বেও বিদ্যমান। অতএব উৎপত্তির পূর্বে অবিদ্যমান কার্য তিনি নিজেই হইতে পারেন না। উৎপত্তির পূর্বেও কার্য অসৎ নহে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত—এই সৎকার্যবাদ পক্ষ আশ্রয় করিয়া পূর্বপক্ষের মতের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

সিদ্ধ আত্মাও বিকাররূপে নিজের পরিণাম[৪] করিয়া থাকেন। (৪) 'পত্যুঃ'—ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র বলিলে তাহা অসমঞ্জস (অসঙ্গত) হয় বলিয়া তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।[৫] (কেন যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা বলিতেছেন—) কারণ, লোকদৃষ্ট সাদৃশ্যাদির দ্বারা অনুমিত ঈশ্বরের তাহা হইলে সাধারণ লোকের ন্যায় রাগদ্বেষাদি-প্রাপ্তিবশতঃ ঈশ্বরত্বই উপপন্ন হইবে না।[৬]

এই কারণসমূহবশতঃ (যোগমতের) ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রধানও জগৎকারণ হইতে পারে না —ইহাই তাৎপর্য।

৪ বিদ্যমান বস্তুর পূর্বাবস্থার নিবৃত্তি হইয়া আরেকটি অবস্থার উৎপত্তিকেই পরিণাম বলে, যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল ইত্যাদি। সুতরাং আত্মা পূর্বে কারণাবস্থায় ছিলেন, তাঁহার পরিবর্তন হইয়া কার্যাবস্থার আবির্ভাব হইল, ইহাই পরিণাম এবং আত্মা নিজেই এই পরিণামের কর্তা।

৫ বেদান্তমতে ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মা উপাদান এবং নিমিত্ত—এই দ্বিবিধ কারণ। কিন্তু কোন কোন দার্শনিক ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ বলেন। ব্রহ্মসূত্রকার সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

৬ জগতের কর্তারূপে ঈশ্বরের অনুমান এইরূপ হইবে : ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং, কার্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ— অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি কোন একজন কর্তার দ্বারা উৎপন্ন, যেহেতু ইহারা কার্য; ইহার দৃষ্টান্ত ঘট প্রভৃতি। ঘট একটি কার্যবস্তু, তাহার কর্তা কুম্ভকার—এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, পৃথিবী প্রভৃতি কার্য বলিয়াই তাহাদের একজন কর্তা আছে। এই কর্তাই ঈশ্বর। কিন্তু দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য না হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকভাব সিদ্ধ হয় না। অতএব এখানে ঘটের কর্তা কুম্ভকার দৃষ্টান্ত হওয়ায় কুম্ভকারের দোষগুণ প্রভৃতিও দার্ষ্টান্তিক ঈশ্বরে থাকিবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু ঈশ্বরের রাগদ্বেষ প্রভৃতি স্বীকার করিলে তাঁহার ঈশ্বরত্বই সিদ্ধ হইবে না। ইহাই টীকাকারের বক্তব্য।

ব্রহ্মসূত্রের (২।৩।৪১) ভাষ্যে আচার্য শংকর বলিয়াছেন যে, লৌকিক যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, কিন্তু শ্রুতি ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন বলিয়া লৌকিক যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও শ্রৌতসিদ্ধান্ত হিসাবে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[সুরেশকুমার নাহাকে লিখিত]

(১)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২৫।১১।২৩

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইলাম। আমার শরীর সেই রকমই প্রায় আছে। তবে শীত বেশ পড়িয়াছে। ২ দিন যাবৎ এখন একটু ভাল বোধ হইতেছে। ভুবনেশ্বরে যাওয়া কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ ভাল বোধ হয়, শীঘ্রই যাইতে পারি।

* শ্রীঅসিতকুমার নাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ

মন মাঝে ২ চঞ্চল হয় লিখিয়াছ, ইহা প্রায়--প্রায় কেন—সকল সাধকেরই হয়। কিন্তু ভগবৎকৃপায় আবার স্থির হয় এবং সবল হয়। Steady হইয়া থাকিবে, সাধন নিয়মিতরূপে করিবে, মন স্থিরই হউক বা কখন চঞ্চল হউক। তাঁর দ্বারে পড়িয়া থাকিলে তাঁর কৃপা হবেই হবে। ঠাকুর পরম দয়াল, তাঁর কাছে কাতরে প্রার্থনা করিলেই তিনি দয়া করিয়া তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রেম দিবেন। প্রেম যেন আঠার স্বরূপ, প্রেম হইলেই মন তাঁতে লেগে যাবে। প্রকৃতির গতি wave-like, কখন rise কখনও fall – fall এর পরেই rise, rise এর পরেই fall – এইরূপ হতে ২ যখন মন neutral point অর্থাৎ ব্রহ্মে পৌঁছিবে তখন মনের fall বা rise-এ তোমাকে affect করিবে না। তাঁর কৃপায় ঠিক হইয়া যাইবে, কখনই হতাশ হইবে না। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার মন স্থির হউক, তোমার শান্তি হউক, প্রভু তোমায় কৃপা করুন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ ভরসা

Sri Ramakrishna Ashrama, Basavangudi, P. O.
Bull Temple Road, Bangalore City
18. 8. 24

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আজ তোমার প্রেরিত ৫৲ পাইলাম। তুমি ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি তুমি সর্ব্ব প্রকারে খুব ভাল থাক; আমি ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছি, আর ২ সকলেও ভাল আছেন। মধ্যে ২ কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিও। এখানে খুব সম্ভব October পর্যন্ত থাকিতে পারি। দক্ষিণ ভারতে এবার ভীষণ বন্যায় একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এদেশে কখনো এরূপ বিপদ হয় নাই। মা জানেন। ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়, কত প্রাণী যে অনাহারে পীড়ায় আশ্রয়হীন বস্ত্রহীন হইয়া মারা যাবে তার ইয়ত্তা নাই, প্রভুই জানেন; অবস্থা ভয়ানক। ইতি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ ভরসা

R. K. Ashrama
Basavangudi, Bangalore
19. 11. 24

শ্রীমান সুরেশ নাহা

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি তুমি সর্ব্বতোভাবে কুশলে থাক। আমি ও আশ্রমস্থ সকলে ভাল আছি

ও আছেন। আমি ঠাকুরের ইচ্ছায় সম্ভবতঃ ১ বা ২ সপ্তাহের মধ্যে মাদ্রাজ যাইব। সেখানে অল্পদিন থাকিয়া ৺ভুবনেশ্বর হইয়া মঠে যাইব। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। তোমার পরম কল্যাণ করুন ঠাকুর। এখানে শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৪)

মঠ বেলুড়, হাওড়া

১৬।৬।২৫

শ্রীমান সুরেশ

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি বাড়ীর সকলে আরোগ্য হউক। চিন্তা নাই, ঠাকুর মঙ্গলময়। মঠের স্বাস্থ্য এইবার খারাপ হইবার খুব সম্ভাবনা, তবে তাঁর ইচ্ছায় বিশেষ কিছু হয় নাই। আমার ও মঠের সাধুদের শরীর এখনও পর্য্যন্ত একরূপ মন্দ নাই। তুমি ও বাড়ীর সকলে ও রাঁচির ভক্তেরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,

বেলুড়, হাওড়া

১২।৩।২৬

শ্রীমান সুরেশ

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভুর কৃপায় তাঁর উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহাতে আরো আনন্দ হইল। এসব তাঁর কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়—প্রত্যক্ষ কৃপা, ইহা আনুমানিক নয়। ধন্য প্রভু, তোমারই জয়। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। মঠেরও সব তাঁর ইচ্ছায় এক প্রকার কুশল। আমার শরীরও তত মন্দ নয়।

এইরূপেই ভগবান ভক্তদের বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি আরো দৃঢ় করিয়া দেন। তোমরা তাঁর খুব গুণ গান কর আর বল, জয় প্রভু জয়, ধন্য তোমার কৃপা, আমাদের বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দাও, আমাদের সংসারে আসক্তি কাটিয়ে দাও, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাইয়া লও এবং তোমার শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়া ভক্তি দাও, মানব [জীবন] ধন্য হউক। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ এখানেও ১২।১৩ দিন ধরিয়া বৃষ্টি ও ঝড় খুব হইয়া গিয়াছে। গত কাল হইতে একটু পরিষ্কার হইয়াছে। এরূপ এখানে প্রায় হয় না, ইহা অস্বাভাবিক।

(৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

বেলুড়
৬।৪।২৬

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার প্রেরিত ২৲ টাকার money order পাইলাম। আমার শরীর মন্দ নয়। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও এবং অন্যান্য সকলকে দিও। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ এখন Convention এর জন্য আমরা সকলে বড় ব্যস্ত আছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

[১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৫, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে স্বামী ভূতেশানন্দজী 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া উহার অন্তর্গত "বেদান্তবাদী কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা। কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে।"— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথাগুলির যে বিশদ, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করেন, তাহা সংক্ষেপিত আকারে এখানে মুদ্রিত হইল। টেপ রেকর্ডিং ও অনুলিখনের জন্য শ্রীসমীরকুমার রায় ধন্যবাদার্হ।—সঃ]

এই পরিচ্ছেদের প্রথমে মাষ্টার মশাই দক্ষিণেশ্বরের একটি অতি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতিরিক্ত মহাপুরুষের সান্নিধ্য থাকায় জড় সৌন্দর্যের ভেতরে যেন একটি দিব্যচেতনার সঞ্চার হয়েছে। পূতসলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার বর্ণনা ক'রে মাষ্টার মশাই বলছেন, খরস্রোতা গঙ্গা যেন সাগরসঙ্গমে পৌঁছবার জন্য কত ব্যস্ত! ভাবটা হচ্ছে এই যে, এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যাঁরা আসছেন, তাঁরাও তাঁদের গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য, অর্থাৎ তাঁদের ইষ্টের সঙ্গে মিলনের জন্য যেন সেইরকম ব্যস্ত।

তারপর মণি মল্লিকের কথা উঠলো। তিনি কাশীতে দেখে এসেছেন একজন সাধুকে। সাধুটি বলেছেন, "ইন্দ্রিয়সংযম না হলে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি হবে?" ঠাকুর বলছেন, "এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই। শম, দম, তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—বড় কঠিন পথ।"

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট)।

এরপরই ঠাকুর দর্শনের একটি সূক্ষ্ম কথা বলছেন, "জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।" এই কথাটির আলোচনা হয়েছে অনেক শাস্ত্রে। জ্ঞানী বলেন, 'জগৎ মিথ্যা'। কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' মানে যে অবস্থায় আমরা রয়েছি, সেই অবস্থায় মিথ্যাত্ব আসছে না। যতক্ষণ আমাদের 'আমি' ব'লে বোধ রয়েছে, 'আমি'র অনুভূতি রয়েছে, ততক্ষণ জগৎটাকে মিথ্যা, স্বপ্নবৎ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। জগতের সমস্ত জিনিসেরই আমাদের দরকার হচ্ছে, লোক-ব্যবহার সর্বসাধারণে যেমন করে, তা-ই করছি, আর মুখে বলছি, 'জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ'—এতে কথায় এবং কাজে কোন মিল থাকে না। তাই ঠাকুর বলছেন যে, যদি জগৎ মিথ্যা হয়, তাহলে ওকথা যে বলছে সেও মিথ্যা, তার কথাটাও মিথ্যা।

এই 'মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব' নিয়ে বেদান্তে আলোচনা আছে খুব। অতি সূক্ষ্ম আলোচনা। সে আলোচনা এখানে আমাদের করবার প্রয়োজন নেই। সূক্ষ্মভাবে শাস্ত্রচর্চা সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তবে ঠাকুরের কথার তাৎপর্য আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো। ঠাকুর বলছেন, যে 'জগৎ মিথ্যা' বলছে, সে কি জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়? যদি সে জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেও মিথ্যা। আর সে যদি মিথ্যা হয়, তার সব কথাও মিথ্যা। সুতরাং তার কথা 'জগৎ মিথ্যা', এই কথাটাও মিথ্যা হল। কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' কথাটা তো মিথ্যা নয়। অতএব 'জগৎ মিথ্যা' ওরকম করে বলা যায় না। তবে বেদান্ত যে বলেন, 'জগৎ মিথ্যা', তার কারণ একটি উচ্চতর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে নিম্নের ভূমিকাকে মিথ্যা বলা যায়। যতক্ষণ আ ম 'রজ্জুসর্প' দেখছি—দড়িটাকে সাপ বলে দেখছি—ততক্ষণ সত্য-সাপ দেখলে যেরকম অনুভব হয়, ঠিক সেরকমই অনুভব হচ্ছে। সাপ দেখলে যেরকম ভয় হয়, সেরকম ভয় হচ্ছে। সুতরাং সেই অবস্থাতে সাপটা মিথ্যা হচ্ছে না। সাপটা যদি মিথ্যা হোত, তাহলে ভয় হোত না। মিথ্যা সাপ দেখলে ভয় হয় না। সাপের চিত্র দেখলে ভয় হয় না। কিন্তু এখানে রীতিমত ভয় হচ্ছে দেখে। ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। হৃৎকম্প হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় সাপটি একান্ত সত্য এই সত্যকে আমরা মিথ্যা বলে এড়াতে পারি না। কিন্তু যখন আমাদের রজ্জুর জ্ঞান হয়, যখন দড়িটাকে জানতে পারি, তখন বলি যে, ওটা দড়ি—সাপ নয়। তাহলে দড়ির জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঐ সাপটি মিথ্যা হয় না। এইটি বিশেষরূপে জানবার জিনিস। অর্থাৎ **ব্রহ্মকে না জানা পর্যন্ত জগৎ মিথ্যা হয় না।**

যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগতে আমরা রয়েছি, ব্যবহার করছি, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করছি এবং সাধারণ লোকের মত আগ্রহ করেই গ্রহণ করছি, ততক্ষণ এই জগৎকে মিথ্যা বলা প্রহসন মাত্র। এতে কথায় এবং কাজে একেবারেই মিল থাকে না। জগৎটাকে মিথ্যা বলতে পারি তখনই, যখন আমাদের এই জগতের প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ থাকবে না। একটা জায়গায় কি একটা চকচক করছে। তাকে যদি জানি যে, ওটা ঝিনুকের খোলা, রূপো নয়, যদিও রূপোরই মত চকচক করছে, তাহলে আমরা সেই রূপোর পেছনে ছুটবো না, সেটি পেতে চেষ্টা করবো না। কিন্তু যখন রূপো বলে মনে করছি এবং নেবার জন্য ছুটছি, তখন আর ওটা 'রূপো নয়, ঝিনুকের খোলা' একথাটা বলা সাজে না।

আমাদের শাস্ত্র বলছেন, জগৎটা ব্যবহারকাল মাত্র স্থায়ী। যেমন ঐ দড়িতে সাপটা। যে সাপটাকে দড়িতে দেখছি ভুল করে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমার কাছে সত্য।

আমার কাছে সত্য—অর্থাৎ যে অবস্থাতে আমি দ্রষ্টা, সেই অবস্থাতে আমার কাছে সাপটি সত্য। কিন্তু সাপটি নিরপেক্ষ সত্য নয়, অর্থাৎ আমার পরিবর্তে আর কেউ যদি ওটাকে ভিন্ন রূপে দেখে বা আমি যদি আলো নিয়ে এসে ওটাকে দড়ি বলে দেখি, তা হলে সাপটা আর সত্য থাকে না। সুতরাং, অবস্থার পরিবর্তন হলে তার সত্যত্বের লোপ হয়। তখনই বলা যায় সাপটা মিথ্যা, তার আগে নয়। যতক্ষণ আমাদের ব্রহ্মানুভূতি না হচ্ছে, ততক্ষণ জগৎটা আমাদের কাছে অবশ্যই সত্য বলে গৃহীত হবে এবং সেই সত্যের নাম আমরা দিয়েছি—'ব্যবহারিক সত্য'। 'ব্যবহারিক সত্য' বলতে যাবৎ ব্যবহারকাল স্থায়ী। যতদিন এই ব্যবহারের রাজ্যে, এই দ্বৈতের রাজ্যে আমরা আছি, এক কথায় যতদিন আমার আমিত্ব আছে, ততদিন জগৎ আছে। সুতরাং সেই অবস্থায় 'জগৎ মিথ্যা' বলবার আমার অধিকার নেই। যদি আমি কোন কালে আমার আমিত্বকে বর্জন করতে পারি, যদি কোন কালে আমার ব্যবহারিক ভূমিকাকে অতিক্রম করে পারমার্থিক ভূমিকাতে যেতে পারি—পারমার্থিক তত্ত্বেতে পৌছতে পারি, তখনই মাত্র জগৎটা আমার কাছে মিথ্যা হবে, তার আগে নয়।

পরমার্থ সত্যকে—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Absolute Truth—সেই সর্ব-অবস্থা-নিরপেক্ষ সত্যকে যতক্ষণ আমরা অনুভব না করছি, ততক্ষণ এই জগৎটাকে সত্য বলে মানতেই হবে, এবং এই ভাবে মানতে হয় বলেই আমরা বলি যে, পরমার্থ সত্যে পৌছবার জন্য আমাদের সাধনের প্রয়োজন। যদি জগৎ মিথ্যা হয়, যদি দ্বৈতবুদ্ধি মিথ্যা হয়, তাকে দূর করবার জন্ত এত প্রয়োজন কি আছে সাধনের? যখন আমরা জগৎটাকে মিথ্যা বলছি, তখন কোন সাধনের প্রয়োজন নেই, কারণ সাধনও মিথ্যা। এই কথাটি শাস্ত্রকাররা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, আমি যদি না থাকি, তা হলে কার জন্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের উপদেশ? কিন্তু শাস্ত্র বলছেন যে, এই আত্মতত্ত্বকে জানতে হবে, জানবার জন্ত শুনতে হবে। শুনে মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই যে 'করতে হবে' বলা হচ্ছে, কার জন্ত বলা হচ্ছে? কে করবে? যদি ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকে, তা হলে আর উপদেশ কার জন্ত? কে বা উপদেশ করছে, কার জন্তই বা উপদেশ? সুতরাং এই ভাবে জগৎটাকে কখনো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জগৎটাকে সত্য বলে মেনে নিলেই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সঙ্গত হয়। 'এটা করবে, ওটা করবে না' 'এটা ভাল, ওটা মন্দ'—এসব কথা তখনই অর্থবহ হয়। গীতা বলছেন,

'হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে'
(১৮।১৭)

—জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যা করলেও তিনি হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না। কারণ তাঁর কোন কর্ম নেই—তিনি পারমার্থিক সত্যকে জেনেছেন, নিজেকে শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় আত্মা বলে অনুভব করেছেন। এই যে কথাটি বলা হল, এই কথাটি অবলম্বন করে তা হলে আমরা কি যেমন খুশী ব্যবহার করবো? তা হলে তার পরিণাম কি হবে?—না, নীতি ধর্ম এগুলি সব বৃথা হয়ে যাবে। এদের কোন প্রয়োজন, কোন অর্থ থাকবে না। তাই শাস্ত্র বলছেন, যতক্ষণ 'তুমি' আছ, তোমার ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে, ততক্ষণ এগুলি সত্য। বন্ধন তোমার কাছে সত্য ব'লে তোমার এই সত্য বন্ধন থেকে মুক্তির জন্ত সাধনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং সাধনও সত্য। শাস্ত্রপাঠ করা তোমার প্রয়োজন, কারণ শাস্ত্র তোমাকে এই বন্ধন-মুক্তির উপায় বলে

দিচ্ছেন। যদি তুমি জীবন্মুক্ত হও, তা হলে এসবে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। বেদান্ত বলছেন, 'অত্র…বেদা অবেদাঃ।' (বৃহ. উ. ৪।৩।২২) সেই জীবন্মুক্তির অবস্থায় বেদ অবেদ হয়ে যায়, অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ তখন আর বেদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কার জন্য বেদ? কে পড়বে? বলবে কাকে? এক আত্মাই যখন আছেন, অন্য কোন তত্ত্বই যখন নেই, তখন কোন ব্যবহারই নেই, শাস্ত্রেরও না।

এইজন্য আচার্য শঙ্কর বলেছেন, 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য…নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' (ব্রঃ সূঃ, অধ্যাসভাষ্য)— এই জগতের সমস্ত ব্যবহার, সত্য এবং মিথ্যাকে মিশিয়ে। সমস্ত ব্যবহার, লৌকিক ব্যবহার এবং বৈদিক ব্যবহার দুইই—'লৌকিকা বৈদিকাশ্চ ‥সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি'। (অধ্যাসভাষ্য) অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি যা কিছু বৈদিক ব্যবহার, খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ইত্যাদি যা কিছু লৌকিক ব্যবহার এবং সমস্ত বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র পর্যন্ত —সবই হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যা. এ দুটিকে মিশিয়ে। 'সত্য' মানে যেটি অপরিবর্তনশীল আর 'মিথ্যা' মানে সেই সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে যে পরিবর্তনশীল পরিণামী বস্তু। এ দুটিকে এক ক'রে, অর্থাৎ অভিন্ন ক'রে, তাদের পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে আমরা লৌকিক বৈদিক সমস্ত ব্যবহারই করে থাকি।

সেই পরমার্থ সত্যকে— অপরিবর্তনশীল তত্ত্বকে—লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, 'ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥' (মাণ্ডূক্যকারিকা, ২।৩২) —পরমার্থ সত্য হল এই যে, নিরোধ অর্থাৎ প্রলয় নেই, উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম নেই, বদ্ধ অর্থাৎ সংসারী জীব নেই, সাধক নেই, মুক্তিকামী নেই, মুক্ত বলেও কেউ নেই। এই পরমার্থ সত্যকে ব্যবহারভূমিতে টেনে নাবিয়ে আনা ভ্রান্তিকর। তাতে নানান রকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ঠাকুরের কথাঃ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে একজন বেদান্তী থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধে লোকে নানান রকম অপযশ রটনা করেছেন। শুনে ঠাকুর ব্যথিত হয়ে তাঁকে বললেন, তুমি যে বেদান্তী গো, তোমার নামে এসব কি শোনা যাচ্ছে? সাধুটি বললেন, মহারাজ, বেদান্ত বলছে এই জগৎটা তিন কালে মিথ্যা। সুতরাং আমার সম্বন্ধে যা শুনছেন, তাও সব মিথ্যা। শুনে ঠাকুর যে ভাষায় ঐ বেদান্তের সপিণ্ডীকরণ করলেন, তা আপনারা পড়েছেন। নিষিদ্ধ কর্মও করা হচ্ছে অথচ মুখে বেদান্তের লম্বা লম্বা বুলি—ঠাকুর এর অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। কারণ, এই ধরনের বেদান্ত মানুষকে শুধু যে কোনও কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না, তাই নয়, তার সর্বনাশ পর্যন্ত ঘটায়, কারণ তার 'আমি ব্রহ্ম' বলায়—'আমি'কে সমস্ত বাঁধনের বাইরে বলায়—তার নিরঙ্কুশ ব্যবহার তাকে অধোগামী করে।

তাই বেদান্তের 'আমি ব্রহ্ম' বা 'তুমিই সেই' কথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে হবে। এইজন্য শাস্ত্রে আছে 'তৎ-ত্বম্-পদার্থবিচার'-এর কথা। 'তৎ পদার্থ' অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম, আর 'ত্বম্ পদার্থ' অর্থাৎ তুমি। এই যে 'তৎ' আর 'ত্বম্', তিনি আর তুমি, এ সম্বন্ধে বিচার করতে হয়, বিচার করে করে এদের শোধন করতে হয়। অর্থাৎ যে দৃষ্টিতে আমরা এদের বুঝি, সেই দৃষ্টিতে দেখলে হবে না। এর পেছনে আরো তত্ত্ব আছে, সেগুলি বিচার করে ঐ শব্দ দু'টির অর্থ ঠিক করতে হয়। 'ত্বং' বা 'তুমি' মানে এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-অভিমানী জীব। যার অমুক সময় জন্ম হয়েছে, যে এখন যুবা বা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, সে কিছুদিন পরে মরবে। সেই ব্যক্তি কখনো ব্রহ্ম হোতে

পারে না। ব্রহ্ম সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এই রকম জন্ম-মৃত্যু-জরাগ্রস্ত যে, সে কখনো অব্যয় অপরিণামী কূটস্থ ব্রহ্ম হোতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র যখন বলছেন, 'তৎ ত্বম্ অসি'—'তুমিই সেই'—তখন বুঝতে হবে 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি। 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এইসব দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট বলে যাকে বলছি, তার যে পরিবর্তনশীল অংশগুলি, সেগুলিকে বাদ দিলে তার ভেতরে যে অপরিণামী সত্তা খুঁজে পাওয়া যায়, সেই সত্তাটি। আর 'তিনি' বললে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তার কর্তৃত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কর্মের উপরে নির্ভর করে। তা না হলে তাঁর কর্তৃত্ব কি করে আসে? কিন্তু যিনি কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট, তিনি পরিণামী হয়ে যান। কর্তা হলেই তাকে পরিণামী বলে। সুতরাং যখন 'তৎ' বা 'তিনি' বলছি, তার মানে ঈশ্বর পর্যন্ত নয়। এর পেছনে, এর পটভূমিকায় কোন একটি অপরিণামী সত্তা আছে যিনি কিছুই করছেন না—সৃষ্টি স্থিতি লয় কোন কাজই যিনি করছেন না। তাঁকেই 'তৎ' বা 'তিনি' বলে লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং 'তৎ' পদ এবং 'ত্বম্' পদ, 'তিনি' আর 'তুমি', এই দুটি পদকে বিশ্লেষণ করে আমরা যখন এদের পেছনে যে এক অদ্বিতীয় অপরিবর্তনশীল, অপরিণামী সত্তা আছে, তাতে পৌঁছচ্ছি, তখন আর ভেদের কারণ কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি থেকে আর একটিকে পৃথক্ করবার মত কোন ধর্ম সেখানে আর থাকে না। তাই এই দুইটিকে এক বলা হয়েছে, দুটি ভিন্ন নয় বলা হয়েছে।

এই যে অভেদ জ্ঞানের কথা বলেছে, সেই অভেদ কখনো এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রেতে হোতে পারে না, একথা শাস্ত্র বার বার বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই অভেদত্ব মানলে বেদান্তের অপব্যবহার হয়, যার নিন্দা ঠাকুর করেছেন। যারা বেদান্তের অপব্যবহার করে, তাদের 'হঠবেদান্তী' বলে—জোর করে বেদান্তী হওয়া। শাস্ত্র মানুষকে সাবধান করে দিচ্ছেন,—তোমরা যেন এই রকম 'হঠবেদান্তী' হয়ো না। ঠাকুর বলছেন তার চেয়ে পার্থক্য থাকা ভাল। বলছেন, তার চেয়ে তিনি আর আমি ভিন্ন, আমি দাস তিনি প্রভু, আমি তাঁর সন্তান তিনি আমার পিতা, মাতা—এই রকম বুদ্ধিতে পার্থক্য রেখে মানুষ এগোতে পারে।

শাস্ত্র যখন অভেদ-জ্ঞান করতে বলেছেন, তখন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যা ভেদ, সেগুলিকে অস্বীকার করে নয়। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, সোনার যা কিছু, তা সবই সোনা। যেমন সোনার ঘটি, সোনার বাটি, সোনার হাতী,—এগুলি সব সোনা। কিন্তু সোনার ঘটি আর সোনার হাতী দুটো এক হয় না কখনো। পঞ্চভূত দিয়ে সবই হয়েছে; বালিও হয়েছে, তিলও হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা তেল বার করবার জন্য চেষ্টা করি, তখন বালি পিষে তেল বার করতে পারি না, তিলকে পিষে তেল বার করি। যদি সবই ব্রহ্ম হয়, তাহলে বালিও ব্রহ্ম, তিলও ব্রহ্ম অর্থাৎ বালিও যা তিলও তা। অতএব বালি পিষলে তেল বেরুবে। কিন্তু তা তো কখনো হয় না! ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য আছে সেটি রাখতেই হয়। আমরা ব্যবহারকে কখনো ঐ ভাবে নস্যাৎ করতে পারি না। যাঁরা বলেন সবই ব্রহ্ম, তাঁদের কাউকে খাবার সময় যদি ঐরকম এক রাশ বালি পাতে দেওয়া যায় এই ব'লে যে, তুমিও ব্রহ্ম, যা খাচ্ছ তাও ব্রহ্ম, সুতরাং এক থালা বালি দিলুম, খাও তুমি এখন, তা হলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়! সুতরাং যখন আমরা সবই ব্রহ্ম বলি, তার তাৎপর্য

ব্যবহারেতে কখনো নয়। ব্যবহারের পেছনে যে তত্ত্ব রয়েছে অব্যবহার্য, ব্যবহারের অতীত, যা সমস্ত বিক্রিয়ারহিত, যা কখনও কোনরকম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, সেই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়েই আমরা সব ব্রহ্ম বলি, ব্রহ্ম আর জীব অভেদ বলি। তা না হলে জীব—যে জীবকে আমরা অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান দেখি, আর ঈশ্বর যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান — সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, এ দুটি কখনো অভিন্ন হয় না। যদি অভিন্ন হোত, তা হলে জীবই জগৎ সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু জীব তা কখনো পারে না। কারণ, সে ক্ষুদ্র জীব। জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছেন, 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ…।' (শ্বেতা. উ. ৫।৯) জীব কি রকম ?—না, একটি চুল, তাকে একশ ভাগ ক'রে তার একটি ভাগ নিয়ে তাকে আবার একশ ভাগ করলে যেটি হয়, সেটি যেন একটি জীব। সুতরাং এই বিরাট জগতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব কতটুকু ? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর চেয়েও অণু। সেই জীব যদি বলে, 'আমি ব্রহ্ম', তা হলে একেবারে উন্মত্তের প্রলাপের মত হয় কথাটা।

সুতরাং এই ভাবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' হয় না। আমার পেছনে যে অবিকারী সত্তা রয়েছে, যে সত্তা থাকার জন্য আমার সমস্ত ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে, যাকে অবলম্বন করে আমি-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট—আমি রয়েছি, আমি অনুভব করছি, আমার প্রকাশ হচ্ছে, আমার জ্ঞান হচ্ছে, সেই তত্ত্বটিই পরমার্থতঃ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। পরমার্থতঃ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন যে তত্ত্বটি, সেই তত্ত্বটির আমাদের কোন ধারণা হচ্ছে না, অথচ বলছি, 'আমি ব্রহ্ম'। অযথা মুখে আমরা বলি 'আমি ব্রহ্ম'। ঠাকুর বলেছেন, "কাঁটা নেই, খোঁচা নেই, মুখে বল্লে কি হবে! কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' ক'রে উঠতে হয়।" আমি শরীর নই, দেহধারী জীব নই, এরকম মুখে বলছি। কিন্তু প্রতি পদে আমাদের অনুভব করিয়ে দিচ্ছে—আমি দেহধারী, আমি জরা-মরণগ্রস্ত, সর্বপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ। সেই আমিকে নিয়ে বলছি, আমি এসব বন্ধনাদি থেকে মুক্ত। একথা বলা পাগলের মত বলা, যেমন একজন পাগলকে দেখেছি সে বলছে, সে অমুক রাজ্যের মহারাজা আর এক টুকরো কাগজে লিখে এক ব্যক্তিকে বলছে, এই তোমাকে একটা চার লাখ টাকার চেক দিলুম, ভাঙিয়ে নাও। অথচ ব্যাঙ্কে তার কিছুই নেই। একেই বলে পাগল। যে কেবলই আবোল-তাবোল কথা বলে, যার কথার সঙ্গে বাস্তবের কোন সঙ্গতি নেই, তাকে বলে পাগল। সুতরাং তত্ত্বের উপলব্ধির ঘরে যদি আমাদের শূন্য থাকে, অথচ আমরা মুখে বলি, 'আমি ব্রহ্ম' সেটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মর্মে মর্মে বুঝি আমি দেহধারী জীব, দুদিন আগে জন্মেছি, দুদিন পরে মরবো আর সারা জীবন সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ অথচ মুখে বলছি, 'আমি ব্রহ্ম'—এটা পাগলের কথা। ঠাকুর বার বার বলেছেন, এরকম মিথ্যা অভিমান ভাল নয়। কেন ?—না, তা হলে তার উন্নতির আর কোন পথ রইল না। যে উন্নতিটাকে পাগলামির দরুন আমরা মিথ্যা বলছি, তার জন্য চেষ্টা থাকে না। মিথ্যা বস্তুর প্রাপ্তির জন্য কখনো আকাঙ্ক্ষা হয় না মানুষের। সুতরাং ব্রহ্মানুভূতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

আমরা স্বপ্নকে মিথ্যা বলি। কখন বলি ? জেগে উঠে বলি। স্বপ্নের অন্তর্বর্তী থেকে, স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নকে মিথ্যা বোধ করি না। সেটাকে একেবারে একান্ত সত্য বলে বোধ করি। ঘুম ভেঙ্গে উঠে আমরা স্বপ্নটাকে মিথ্যা বলি। কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্নের ভেতরে আছি, স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুগুলি—জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুগুলির মতই

সত্য মনে হয়। তার চেয়ে কম নয়। জেগে উঠলেই স্বপ্নের জিনিসগুলি মিথ্যা বলে জানতে পারা যায়। তখন স্বপ্নাবস্থাকে 'মিথ্যা' বলা যায়। ঠিক সেই রকম জাগ্রৎ অবস্থাকে 'মিথ্যা' বলতে হলে আমাদের জাগ্রতের চেয়ে আরো একটি উচ্চতর অবস্থায় উঠতে হবে। তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে জাগ্রৎ অবস্থাটাও মিথ্যা এবং তখনই তাকে 'মিথ্যা' বলার অধিকার হবে। যতক্ষণ আমরা এই জাগ্রতের ভেতরে রয়েছি, জাগ্রৎকে মিথ্যা বলবার কোন অধিকার নেই আমাদের। তবে শাস্ত্র বা আচার্যেরা 'জগৎ মিথ্যা' বলছেন কেন?—বলছেন এই জন্য যে, জগতের অতীত তত্ত্বে আরোহণ করবার জন্য আমাদের পক্ষে এই উপদেশটি প্রয়োজন। বোবায় ধরলে ঘুমন্ত লোককে ডেকে জাগিয়ে দিতে হয়, ঠিক সেই রকম শাস্ত্র আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় নাড়া দিয়ে বলেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। তোমরা ঘুমোচ্ছ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছ, তোমরা 'ওঠো জাগো। শাস্ত্র বা আচার্যেরা বলছেন না, 'তুমি কল্পনা করো জগৎটা মিথ্যা।' এই কল্পনা কোন দিন আমাদের জগৎটাকে মিথ্যা বলে বোধ করাতে পারবে না। জগতের অতীত তত্ত্বেতে না পৌঁছোনো পর্যন্ত, ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত, এই জগৎটা এখন যেমন সত্য, আজ যেমন সত্য, কাল তেমনি সত্য থাকবে। সুতরাং জগৎটাকে ব্যবহারভূমিতে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই ঠাকুর বলছেন, যে ঐ ভাবে উড়িয়ে দেয় তার কথাটাও উড়িয়ে দেবার মত হয়। অতএব ঐ ধরনের বেদান্তবুলির ঠাকুর নিন্দা করছেন।

তারপর ঠাকুর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। দৃষ্টান্তটিও খুব সুন্দর। বলছেন, "কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে।" 'কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না', অর্থাৎ ভাব হচ্ছে এই যে, আমাদের উপাধিগুলি, আবরণগুলি সরাতে সরাতে কি বাকী থাকে শেষ পর্যন্ত? ঠাকুর বলছেন, কিছুই বাকী থাকে না। কিছুই বাকী থাকে না মানে কি? শূন্য হয়ে যায়? ঠিক তা নয়। আমাদের এই যে 'আমি', যে 'আমি'কে নিয়ে সর্বদা ব্যবহার করছি, সেই 'আমি'র ভেতরে পরিণামী বস্তু যেগুলি, যেগুলি বদলে বদলে যাচ্ছে, সেগুলিকে এক এক করে সরিয়ে দিয়ে, যেমন শরীরকে সরিয়ে দিয়ে, ইন্দ্রিয়দের সরিয়ে দিয়ে, মনকে সরিয়ে দিয়ে, এই রকম সরিয়ে সরিয়ে বাকী কি থাকে? বাকী থাকে একটি জিনিস। বাকী থাকে সে নিজে, যে সরিয়ে দিল। আমি উপাধিগুলোকে এক এক করে সরালুম, কিন্তু আমাকে আমি কি করে সরাব? এক এক করে আমি আমার উপরে যত আবরণ সব সরালুম, কিন্তু একটি তত্ত্ব রইল সে তত্ত্বকে আর সরাবার কেউ রইল না। ভাব হচ্ছে এই যে, জীব যখন সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ব্রহ্মের মত অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় হয়—ব্রহ্মস্বরূপ হয়। তখন আর তার জীবত্বের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীজী এই কথাটি বলেছেন- বেদান্তেরই কথা —তাঁর ভাষায়: "'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।" 'এ নয়' 'এ নয়' ক'রে চলতে চলতে শেষে যেখানে এসে মানুষ থেমে যায়, সেখানে অবশিষ্ট থাকে 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কাল-হীন, দেশহীন, সর্বহীন' তত্ত্ব, যাকে ব্রহ্ম বলা হয়, যা জীবের স্বরূপ।

এই যে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে এক এক ক'রে সরানো একে বলে অপবাদ—'অধ্যারোপের অপবাদ'—আমার উপরে যা কিছু আরোপিত হয়েছে, যে সব আবরণ এসে পড়েছে, সেই সব আবরণ বা আরোপিত বস্তু সরিয়ে দেওয়া। যেন আত্মার উপরে কতগুলি খোলস চাপা দেওয়া

হয়েছে, সেই খোলসগুলিকে এক এক ক'রে সরিয়ে দিতে হয়। তারপর সরাতে সরাতে আর যখন সরাবার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, তখন যা রইল তা-ই থাকে। কিছু রইল না, একথা বলা যায় না। নানান দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বহু জায়গায় এই জিনিসটি— বেদান্তের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি— বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই বাকী থাকে না, এই কথা বলেছেন। সেই রকম উপাধিগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, যা ছাড়ান যায়। কিছু অবশিষ্ট থাকে না মানে হচ্ছে এই, এমন কিছু থাকে না যা সরান যায়। 'এটা আমি নয়', 'এটা আমি নয়' বলতে বলতে, যেখানে আর নিষেধ করবার কিছু বাকী থাকে না—নিষেধের শেষ যেখানে, সেখানে আর কোন শব্দাদির দ্বারা ব্যবহার সম্ভব নয়। তাকে শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা যায় না। তাকে বর্ণনা করা যায় না। কে বর্ণনা করবে? ঠাকুর বলেছেন: নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, যেয়ে সমুদ্রে গলে গেল। সমুদ্র কেমন—আর কে খবর দেবে? নুনের পুতুল —শব্দটি লক্ষ্য করবার মত—মানে নুনটি পুতুলের স্বরূপ। নুনই তার সব, কেবল একটা আকার আছে। সমুদ্র, তারও স্বরূপ নুন। নুনের পুতুল সমুদ্রে নাবলো সমুদ্রকে মাপবে ব'লে। কত জল, ভেতরে কি আছে দেখবে ব'লে। কিন্তু মাপতে যেয়ে সে গলে গেল। সমুদ্রের সঙ্গে তার আকারগত যে একটা পার্থক্য ছিল, সেই পার্থক্যটি দূর হয়ে গেল। আর খবর দেবে কে? জীব যখন ব্রহ্মের অনুসন্ধান করতে করতে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নতা বোঝাবার মত তার যে ধর্মগুলি ছিল, যে রূপগুলি ছিল, যে বিশেষণগুলি ছিল, সেগুলি থেকে এক এক ক'রে মুক্ত হয়ে গেল, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ আর কে বলবে?

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥'

(কঠ উ. ২।১।১৫)

—যেমন একবিন্দু শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলরাশির ভেতরে পড়ে সেই জলরাশির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, তদ্রূপ হয়ে যায়, সেই রকম জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মাও ব্রহ্মাভিন্ন হয়ে যায়—ব্রহ্মরূপ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর আর সেই ব্রহ্মবস্তু থেকে পৃথক্ করবার মত কোন ধর্ম অবশিষ্ট থাকে না। তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান।

এই অভিন্নতা কিন্তু অর্জিত নয়। আবরণগুলি সরানো হয় ব'লে, পোশাক ছাড়ার মতো আরোপিত বস্তুগুলি এক এক ক'রে সরাতে হয় ব'লে— এ কথা বলা চলে না যে, জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা ক্রিয়ার দ্বারা অর্জন করে। যেমন দৃষ্টান্ত আছে: কলসী সমুদ্রে ডোবান আছে। সমুদ্রের ভেতরে কলসীটি সম্পূর্ণ ডোবান আছে। আমরা বলি বটে সমুদ্রের জল আর কলসীর জল। আসলে কলসীতে যে জল সমুদ্রেও সেই জল। কলসীর যে আকারটা, তা যেন সমুদ্রের জলটাকে কলসীরূপেতে আকারিত করছে। কলসীটাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তা হলে ঐ কলসীর জলটার কি হয়? সমুদ্রে মিশে যায়? সে তো মিশেই ছিল! সে তো কোন দিন সমুদ্রের জল থেকে পৃথক্ ছিল না।—সমুদ্রের জল আর কলসীর জল তো সর্বদাই এক হয়ে ছিল। আমরা কেবল তার আবরণের জন্য তাকে পৃথক্ বলে মনে করছিলুম। বিচারের দ্বারা আমাদের সেই পার্থক্যবোধটা দূর হয়ে যায়। জীবেরও ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদপ্রাপ্তি মানে যে পার্থক্যবোধটা তার মনে রয়েছে, যার ফলে তার 'আমি' দানা বেঁধেছে, সেই পার্থক্যবোধটার লোপ হওয়া— কিছু অর্জন করা নয়। তখন যা ছিল তা-ই থাকে।

মনের খবর

বনফুল

খবর কোনও পাই নি
এখনও তাই খুঁজছি
আশ খুঁজছি পাশ খুঁজছি
নিকট এবং দূর খুঁজছি
সুর খুঁজছি
লাল খুঁজছি, নীল খুঁজছি
তাল খুঁজছি, তিল খুঁজছি
মিল খুঁজছি—
পাই নি।

স্বামীজী প্রণাম

[কেদারা—চৌতাল]

কথা, সুর ও স্বরলিপি :
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য*

নমো নমো নমো, পুরুষোত্তম
নমো নমো নমো স্বামীজী।
বিশ্বভুবন স্মরণে তোমায়
প্রণতি জানায় আজি ॥
শত নিরাশার আঁধার বিদারি'
নব ভারতের তুমি যে দিশারী ;
দিকে দিকে তব অভীক মন্ত্র
আজিও উঠিছে বাজি ॥
নব কলেবরে তুমি যে শঙ্কর,
সোঽহং রূপে চির ভাস্বর।
নরঋষি তুমি লীলার সহায়
করুণায় এলে ধরার ধুলায়
তব মহিমার পুণ্য আলোকে
ধরণী উঠিছে সাজি ॥

---

* 'সঙ্গীত-গুণাকর'। 'অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স' প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে সম্মানিত।

+		০		২		০		৩		৪	
সা	সমা	মা	মপা	পা	পা	জ্ঞা	পা	জ্ঞপা	ধপা	মা	মা
ন	মো০	ন	মো০	ন	মো	পূ	র্ণ	যো০	০০	ত্ত	ম
মা	গা	পা	পা	ধা	পা	মা	গা	মা	রা	—	সা
ন	মো	ন	মো	ন	মো	স্বা	০	মী	জী	০	০
সা	মা	গা	পা	পা	পা	জ্ঞা	পা	ধর্সা	র্সধা	ধা	পা
বি	০	শ্ব	ভু	ব	ন	স্ম	র	ণে০	তো০	মা	য়
মা	মগা	পা	পজ্ঞা	ধা	পা	মা	গা	মা	রা		সা
প্র	ণ০	তি	জা০	না	য়	আ	০	০	জি		
পা	ধা	পা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্রা	র্সা	র্সা	র্সা
শ	ত	নি	রা	শা	র	আঁ	ধা	র	বি	দা	রি'
ন	র	ঋ	ষি	তু	মি	লী	লা	র	স	হা	য়
র্সা	র্সধা	র্সা	র্সা	র্রা	র্রা	র্সা	র্সা	র্সধা	ধা	ধা	পা
ন	ব০	ভা	র	তে	র	তু	মি	যে০	দি	শা	রী
ক	রু০	ণা	য়	এ	লে	ধ	রা০	র০	ধূ	লা	য়
পা	র্মা	র্মর্রা	র্রা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সধা	ধা	পা
দি	কে	দি০	কে	ত	ব	অ	ভী	ক	ম০	০	ন্ত্র
ত	ব	ম০	হি	মা	র	পু	০	ণ্য	আ০	লো	কে
জ্ঞা	পা	ধর্সা	র্সধা	ধা	পা	মা	গা	মা	রা	—	সা
আ	জি	ও০	উ০	ঠি	ছে	বা	০	০	জি	০	০
ধ	র	ণী০	উ০	ঠি	ছে	সা	০	০	জি	০	০
সা	সা	মা	মগা	পা	পা	পা	পা	ধপা	ধপা	মা	মা
ন	ব	ক	লে০	ব	রে	তু	মি	যে০	শ০	ঙ্ক	র
মা	গা	পা	জ্ঞা	ধা	পা	মা	গা	মা	মরা	রা	সা
সো	হ	হ	ং	রূ	পে	চি	র	০	ভা০	স্ব	র

চির প্রশ্ন

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

প্রভু! কত কাল আর, কত কাল পরে,
কাছে তুমি মোরে টান্‌বে?
কত কাল আর এ ব্যাকুল হিয়া
তোমারি আশায় থাক্‌বে?
অযুত-লক্ষ বাসনার বশে
তৃষিত এ মন ঘুরিছে অবশে,
তোমারে পেলে যে, "সব পাওয়া" হয়,
একথা সে কবে জান্‌বে?
মোর শ্রান্ত এ প্রাণ তোমারি চরণে,
কবে এসে ওগো থাম্‌বে?

পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

তুমি আছ 'হেথা হেথা' 'সেথা সেথা' নয়—
মিছে আমি ভ্রমিতেছি সারা বিশ্বময়
তোমার সন্ধানে। কভু অরণ্য গহনে
তোমারে চাহিয়া আমি মুদিত নয়নে
রহিয়াছি ধ্যানমগ্ন। কভু আর্তি নিয়া
দেবতাত্মা হিমালয়ে গিয়াছি ছুটিয়া।
মন্দিরে মন্দিরে কভু, কভু দেশে দেশে
সহিয়া অশেষ ক্লেশ তোমার উদ্দেশে
করিয়াছি পরিক্রমা।
শুধু একবার
নয়ন মেলিয়া দেখা হয়নি আমার
আপন অন্তরখানি। আপন নাভিতে
গন্ধের উৎসটি আছে তবু চারিভিতে
কস্তুরী-মৃগের মতো মোহ-অন্ধ আমি
অবিরত ছুটিতেছি, ওগো অন্তর্যামী।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ-প্রসঙ্গে

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত*

প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ

বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটি ফাটানো হয়েছিল আমেরিকাতে। ১৯৪৫ সালের জুলাই-এর এক নিশীথে আমেরিকার নিউ-মেক্সিকোর এক বিজন প্রান্তরের একটি পরিত্যক্ত খামার বাড়ীতে অত্যন্ত গোপন আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটিকে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করার জন্য জুড়ে তোলা হচ্ছিল। সোমবার ১৬ই জুলাই, ১৯৪৫ সালের শেষ রাত্রিতে সেটিকে আলামগার্দোর বিজন মরুভূমির বুকে ফাটানো হয়। মরুভূমির মধ্যে বড়সড় পাথরের একটি টিলার উপর নিরেট লোহার তৈরী মঞ্চ—তাতেই বসানো হয়েছে এ্যাটম্ বোমাটিকে—মঞ্চের সাংকেতিক নাম—"পয়েন্ট জিরো"। সেখান হতে মাইল দশেক দূরে মূল নিয়ন্ত্রণ শিবির—সেখানে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত, মুখে এবং শরীরের অন্যান্য উন্মুক্ত অংশে থকথকে ক্রিম লাগানো অবস্থায়, চোখে গাঢ় রঙের বিশেষ চশমা পরে বৈজ্ঞানিকের দল উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। দূরের মঞ্চের দিকে সকলের দৃষ্টি—সকলের বুকের মধ্যে ঘা পড়ছে। অদ্ভুত এক আশা-নিরাশার দোলায় সবাই দুলছেন। সারারাত্রি ধরে প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে—চরম মুহূর্তের জন্য।

মাইকে ঘোষকের গলা শোনা যাচ্ছে—চার-তিন-দুই—তারপর লাল কমলা সবুজ নীল বেগুনী আলোকের সে কি অবর্ণনীয় ঝলকানির সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো অতি দীর্ঘস্থায়ী অমানুষিক এক শব্দলহরী! আগ্নেয়গিরির লাভার মত গলিত মৃত্তিকা পাথর আর ধাতব খনিজের রূপালি গলিত স্রোত তথা উজ্জ্বল রক্তবর্ণের ধূমায়িত ভস্মরাশি ব্যাঙের ছাতার আকারে উপরের দিকে উঠে চলেছে—ধীরে ধীরে। এক সময়ে সেই ব্যাঙের ছাতার উচ্চতা দাঁড়ালো সাত মাইলেরও বেশী। এত সব কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল—অনেকেই পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রথম ঝলকানিটা দেখতেই পেলো না—তবে দূরের পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়া উজ্জ্বল আলোর ছটা যা চোখে পড়লো—চিরকালের মত চোখের দ্যুতি ছিনিয়ে নিতে সে আলোই যথেষ্ট। উত্তেজনায় অনেকেই চোখের চশমা খুলে একবার খালি চোখে সেই "দিব্য" আলোক দেখতে চাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা অন্ধ হয়ে রইলেন। হায় নিয়তি! এতগুলি বছর ধরে পরমাণু বোমার যে দিব্য আলোক ঝলকানি প্রত্যক্ষ করবার জন্য তাঁরা সযত্নে অপেক্ষা করেছেন—আজ তাঁরা এই চরম মুহূর্তের বিশেষ ক্ষণটিতে এসেও সেই দিব্য দ্যুতি দেখতে পেলেন না।

পরমাণু বোমার পিতা—ওপেনহাইমার নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের একটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নবজাতকের অস্তিত্বের ক্রন্দন এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণটিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন—অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে হঠাৎ ঝলসে উঠলো আলো—তীব্র আলোকচ্ছটায়

---

* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি.। স্পেকট্রোস্কপি সম্পর্কে ইঁহার উচ্চতর গবেষণা দেশে ও বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ফরেনসিক সায়েন্স গবেষণাগারে' পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে গবেষণায় নিরত।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর চোখ মুখ—হয়ত হৃদয়ও। ওপেনহাইমারের হৃদয় আজ বিহ্বল—শান্তকণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শন-যোগের একটি শ্লোক :[১-২]

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

(১১।১২)

—যদি কখনও আকাশে একসঙ্গে সহস্র সূর্যের প্রভা উদিত হয়, তা হলে সেই দীপ্তি পরমাত্মার প্রভার কিঞ্চিৎ তুলনাযোগ্য হলেও হতে পারে।

বাতাসে বারুদের গন্ধ—মৃত্যুর গন্ধ চারদিকে। মৃত্যুর এই চরম ক্ষমতাধর ব্রহ্মাস্ত্রটি তৈরী হয়েছে তাঁর হাত দিয়েই। পরমাণু বোমার ভয়াবহতায় ওপেনহাইমারের হৃদয় অস্থির—তিনি সান্ত্বনা খুঁজছেন। কিন্তু তাঁর জন্য কি সান্ত্বনাই বা আছে! ওপেনহাইমার হয়ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শেষ সান্ত্বনা চাইছেন—বিড়বিড় করে তিনি পুনরায় আবৃত্তি করলেন গীতার একাদশ অধ্যায়ের আর একটি শ্লোক :

শ্রীভগবানুবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২

—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, বর্তমানে লোকসংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন, তাঁরা কেউ আর বেঁচে থাকবেন না।

ওপেনহাইমার একটু আশ্বস্ত হলেন—তিনি তা হলে উপলক্ষ মাত্র, এ কাজ তিনি না করলে ভগবান অন্য কারুকে দিয়ে করাতেন!

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। হিটলারের ফ্যাসীবাদী জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে—জাপান আত্মসমর্পণ করার মুখে। এমন সময় হঠাৎ ১৯৪৫ সালের ৬ই অগষ্ট সকাল ৮-১৫ মিনিটে জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন সমগ্র আকাশ জুড়ে তীব্র নীল-বেগুনি আলোর অতি উজ্জ্বল ঝলক আর সেই সঙ্গে শুনলেন কান-বধির-হওয়া একটানা প্রচণ্ড শব্দলহরী—বিশ্বের দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হল হিরোসিমায়। তার কয়েকদিন বাদে তৃতীয়টিও অনুরূপ আলোক এবং শব্দের বন্যার মধ্যে প্রকটিত হল নাগাসাকিতে। জাপানের মাথার উপরে অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ঘন বাষ্পের ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠল প্রায় চার মাইল উঁচু হয়ে। এই অদ্ভুত এবং বিকটদর্শন ব্যাঙের ছাতা (Mushroom cloud from Atomic Explosion) পরমাণু বোমার প্রতীকরূপে আজ চিহ্নিত। ক'য়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'লক্ষ মানুষ মারা গেলেন—প্রায় দশ লক্ষ মানুষ হলেন বীভৎস রকমের বিকলাঙ্গ। চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। হাজার হাজার মানুষ দিশাহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে—সেই ব্যাপক অগ্নিকুণ্ড হতে বের হবার আশায়। তাদের কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছেন আবার কারুর দেহ দুমড়ে মুচড়ে একেবারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কারুর চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কারুর গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে লোল হয়ে গায়েই ঝুলছে। কাছাকাছি পাহাড়গুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে—মহাসাগরের বুকে

১ J. Robert Oppenheimer and the Atomic Story by Kugelmass, J. Alvin.

২ Brighter than Thousand Suns by Jungk, R.

লেগেছে প্রচণ্ড ধাক্কা আর তার উত্তাল জল হয়ে পড়ছে উত্তপ্ত। ক্রন্দন আর আর্তনাদে সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর শারদ প্রভাত মুখরিত হয়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুতে যা চিরসিক্ত, তাদের মর্মান্তিক বেদনায় যা ভারাক্রান্ত—এমন কোন করুণ দৃশ্যের বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়।

কি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব যে হয়েছিল, তার কিছুটা হয়ত বোঝা যাবে যাঁরা সেদিন ঐ অবস্থার মধ্যেও বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁদের ক'জনের মুখ হতে শোনা যাক্ সেদিনের বর্ণনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকোশ ইতো সেদিন ছিলেন একজন স্কুলের বিদ্যার্থী। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল "প্রফেসর ইতো, কি দেখেছিলেন আপনি, মনে আছে কিছু?"

একটুখানি ভেবে নিয়ে অধ্যাপক বললেন— "মনে না থাকার কিছু নেই—স্পষ্টই মনে আছে সব কিছু। আগুন জ্বলছে, যেদিকে তাকানো যায়—শুধু আগুন। সেই অগ্নিকুণ্ডের ভেতর হতে বেরিয়ে আসার সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! বোমার আঘাতে গলে গিয়ে সব কিছু জেলি হয়ে গেছে। একটা আশ্চর্য জিনিস—বিশ্বাস করুন প্রথম দিকে কিন্তু কোন সরগোল ছিল না। কিন্তু ক'য়েক মিনিট বাদে—উঠল এক তুমুল আর্তনাদ —যে চিৎকারের কোন তুলনাই হয় না।"

একজন শ্রমিক বল্লেন--"রাত্রে এবং সকালে একটি কারখানায় কাজ করি। কারখানায় সকালের ভোঁ বেজে গেছে। হঠাৎ বেগুনি আলোর ঝলক দেখে সবাই চমকে উঠলাম। যেখানটিতে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো, তার তিন মাইলের মধ্যেই ছিল আমার কারখানা। ছুটে গেলাম কারখানার গেটের দিকে—কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই বাতাসের ঝটকা এসে আমার সামনের সব কিছু ভূমিসাৎ করে দিল। ক'য়েক শত শ্রমিক কারখানা বাড়ীর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো—দেয়াল ধসে পড়লো আর তা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ধরনের ছাই হয়ে উড়ে গেল। ঝড় বইছে তখন সাইক্লোনের মত। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে রক্তবর্ণ লেলিহান অগ্নিশিখা। ওদিকে শহরের মধ্য হতে রক্তবর্ণ বাষ্পপুঞ্জ পৃথিবী হতে সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। তার দিকে তাকায় কার সাধ্য!"[৩]

ঠিক তখন পরমাণু বোমার স্রষ্টারা কি করছিলেন, কি ভাবছিলেন? সেদিন তাঁদের মাথার উপরের আকাশ অতি অবশ্যই নিরাপদ ছিল, কোন তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি তো সেদিন তাঁদের মাথায় ঝরে পড়ছিলো না। সুতরাং হয়তো ধরে নেওয়া হবে সেদিন তাঁরা ছিলেন একেবারেই নিশ্চিন্ত অথবা এই মহান সৃষ্টির উল্লাসে কিঞ্চিৎ দিশেহারা। কিন্তু—না, তাঁরা সেদিন কোন বিজয়-উল্লাসে ফেটে পড়েন নি। বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল সর্বদা ভেবেছেন—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁরা একি বেইমানি করে ফেল্লেন—তীব্র ধিক্কার তাঁদের অন্তর জর্জরিত করছিল প্রতি মুহূর্তে। পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মনীষী— বিজ্ঞানী-সমাজের 'পোপ', মহান আইনস্টাইন তখন আমেরিকার প্রিন্সটনে, 'সেন্টার অব এ্যাড্‌ভান্সড্ স্টাডিজে' গবেষণায় রত—শোনা যায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের দিনটিতে তিনি বেদনায় নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে কপালের শিরা চেপে ধরে বসেছিলেন নির্জনে একাকী। সেদিনটিকে বলা যায় আইনস্টাইনের 'কৃষ্ণ দিবস'—পরমাণু গবেষণার প্রথম দিকেই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন— 'পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গন ঘটিয়ে মানুষের

Atom for Peace by Danin, D.

কতটা মঙ্গল করা সম্ভব, তা আগে হতে চিন্তা করা গেলেও—এর দ্বারা যে মানুষের কত অকল্যাণ হতে পারে; তা চিন্তাও করা যায় না।[৪]

আলবার্ট আইনস্টাইনের "কৃষ্ণ দিবসে"র কথা সত্য হোক আর নাই হোক— তবু একটা কথা অন্তত আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, সেদিন তাঁর হয়ত মনে হয়েছিল তাঁরই আবিষ্কৃত পদার্থ-বিদ্যার সেই বিশেষ সূত্রটির কথা— তাঁর সেই সুবিদিত "শক্তি-ভর-সমীকরণে"র কথা, যাতে বলা হয়েছে পদার্থের মধ্যে যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে, তার পরিমাণ পদার্থের ভরের সঙ্গে আলোকের গতির বর্গ গুণ করলে যত হয় তার সমান। এ সূত্রের এমন ভয়ঙ্কর সমর্থন গবেষণাগারে অথবা বিমূর্ত শূন্যে না ঘটিয়ে ঘটানো হল হিরোসিমা এবং নাগাসাকির নিতান্ত করুণ এক মানবিক পরিবেশের মধ্যে—হয়ত এই বিষাদটাই তাঁকে ধিক্কার জানাচ্ছিল বেশী করে— এবং সেটাই আমাদের কাছে তাঁর "কৃষ্ণ দিবস"। তাঁর দুঃখ আর হতাশার হয়ত আর একটি কারণও ছিল—তা হল তাঁর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে লেখা সেই ঐতিহাসিক চিঠি; যাতে তিনি প্রেসিডেণ্টকে পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

নিউক্লিয়ার তথা পরমাণু পদার্থবিজ্ঞান কোন একক মহান বৈজ্ঞানিকের মানসপুত্র নয়। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম করা যেতে পারে, যাঁরা এই বিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশ্বের প্রায় সকল জাতির লোক এর উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। সবার নাম করতে গেলে একটা who's who ধরনের বই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু— মহান আইনস্টাইন এবং পরমাণু বোমার পিতা রবার্ট ওপেনহাইমার ছাড়াও নিজেদের কীর্তিতে যাঁরা দুঃখবোধ করছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না—এঁরা পরমাণু পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলেই প্রায় সমান বিখ্যাত: বৃটেনের পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডিরাক, লর্ড ব্লাকেট, স্যার জেমস্ চ্যাডউইক, ডেনমার্কের নেলস্ হেনরিক বোর, তাঁর ছেলে এ্যাগে বোর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল অ্যাণ্ডারসন, হানস্ বেথে, গ্লীন সীবর্গ, ইভা নোডাক, অ্যালিসন, রিচার্ড ফাইনম্যান, জন নিউম্যান, রোসেনবার্গ, আর্থার হোলি কম্পটন, আর্নেষ্ট অরল্যাণ্ডো লরেন্স, হুইলার, হ্যারল্ড উরে; জার্মানীর অটো হান, ফ্রাইট্জ ট্রাসম্যান, অটো ফ্রিশ, ওয়ারনার হাইসেনবার্গ; ইতালীর এনরিকো ফেরমি, এ্যামিলেও সেঁগ্রে; হাঙ্গেরির লিও সেলার্দ, ইউগেনী ভিগনার, এডওয়ার্ড টেলর; রাশিয়ার পিটার কাপিৎজা, লেভ লেণ্ডাউ, কুর্চাতভ, সাখারভ, তামম্, চেরেনকভ; স্পেনের আলভারেজ; অষ্ট্রিয়ার এরউইন শ্রদিনজার, উলফগাঙ পাউলি, কুমারী লিজা মাইটনার; ভারতবর্ষের সত্যেন্দ্রনাথ বসু; ফ্রান্সের দ্য ব্রয়েগলী, জুলিয়েট-কুরী দম্পতি; জাপানের হিদাকী ইউকোওয়া, জোশিও নিশিনা; হল্যাণ্ডের ভন-ডু-গ্রাআফ; মেক্সিকোর ভাল্লার্তা • প্রভৃতি কীর্তিমান বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর দল। এইসব শান্তিকামী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা সযত্নে আমেরিকার সদর সমর দপ্তর পেণ্টাগনের সমর-বিশারদদের হাতে এই ব্রহ্মাস্ত্রটি তুলে দিয়েছিলেন তাঁরা সেদিন যা কিছু করেছিলেন, তা দেশের স্বার্থে, আবিষ্কারের উদগ্র নেশায় এবং সর্বোপরি পরমাণু বোমার ব্যাপারটি সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে। পরমাণু বোমার মর্মান্তিব

৪ Men and Women Behind the Atom by Reedman, Sarah.

তাৎপর্য এতদিন কিছুটা উপলব্ধি করে তাঁরা প্রায় সবাই নিজেদের কীর্তির ভয়াবহতায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আর সেই পরমাণু বোমার পিতা, বিচক্ষণ প্রশাসক, স্বচ্ছন্দ কবি, দার্শনিক, বহুভাষাবিদ্, গীতা-বিশারদ এবং সর্বোপরি প্রখর বুদ্ধিমান পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার, যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পাওয়া গেল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মারণাস্ত্রটি, সেই ওপেনহাইমারও সেদিন ক্ষুণ্ণমনে ভাবছিলেন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নিহত আর পঙ্গু করে নগরকে নগর উড়িয়ে দিয়ে মাইলের পর মাইল শস্যশ্যামল উর্বর কৃষিক্ষেত্রকে বন্ধ্যা করে কার লাভ হল? এর কি সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল? বিজ্ঞান কি শুধুই অশুভ আর মৃত্যুর হাহাকারের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে এখন হতে? দুঃখ হয়েছিল হয়ত ওপেনহাইমারেরই সবচেয়ে বেশী, কারণ নাৎসী তথা হিটলার-বিরোধীরা তাঁকে দিয়েই এই চরম বিয়োগ-ভারাক্রান্ত-অধ্যায়টি রচনা করিয়েছিলো। কিছুদিন আগেও তিনি বলতেন—"অত ন্যায় নীতির কি আছে? আমরা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ভাঙন ধরিয়েছি, হাজার হোক এ্যাটম বম্ ব্যাপারটা তো আর অনবদ্য ফিজিক্স ছাড়া আর কিছু নয়!" অথচ আজ সেই তিনিই ন্যায় নীতি ধর্মীয় অনুভূতি সব কিছু মিলিয়ে অদ্ভুত এক আত্মিক পীড়ায় জর্জরিত। কিন্তু হায়! এসব দুঃখ বেদনা আজকের মানুষের কাছে প্রায় মূল্যহীন প্রতিপন্ন হতে চলেছে—কারণ যে বিয়োগ-নাট্যের শুরু তাঁরা করে গেছেন সেই নাটক আজও 'হাউস ফুল' হয়ে চলছে।

জাপান যখন ধুঁকছে—জাপানের পরাজয় যখন সুনিশ্চিত—তখন এ ধরনের মারণাস্ত্র সেখানে ফেলার কোন প্রয়োজন ছিলো কি? এই নিয়ে সেদিনও তুমুল তর্ক বেঁধেছিল এ্যাটম বোমার পিতার এবং পেন্টাগনের সমর-কর্তাদের মধ্যে। মোট দেড়শ জন প্রধান প্রধান বিজ্ঞানী এবং সামরিক অফিসার এই প্রাথমিক প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক শুরু করলেন। শেষকালে শুরু হল ভোট—"যে পারমাণবিক অস্ত্রটি আমরা তৈরী করেছি, তা জাপানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে কিভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত? নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে আপনার পছন্দ কোনটি?"

(ক) যাতে আমেরিকার সেনাবাহিনী সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাপান দ্রুত আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়, সেই উদ্দেশ্যে মিলিটারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবচেয়ে কার্যকরী হয় এমনভাবে এই মারাত্মক অস্ত্রটিকে ব্যবহার করা হোক।

(খ) জাপানে এই অস্ত্রের একটি প্রদর্শনী বিস্ফোরণ ঘটানো হোক—তারপর এর আসল ব্যবহারের আগে জাপানকে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দেওয়া হোক।

(গ) জাপানের প্রতিনিধিদের সামনে আমেরিকাতেই একটি প্রদর্শনী বিস্ফোরণ ঘটানো হোক। তারপর আসল ব্যবহারের আগে জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হোক।

(ঘ) এটিকে যুদ্ধে আদৌ ব্যবহার না করে আমেরিকার পরমাণু বোমার গবেষণার অগ্রগতির খবর যতদূর সম্ভব গোপন রাখা হোক।

উপরের চারটি প্রস্তাবের মধ্যে (ক) নম্বরের পক্ষে ভোট দেন তেইশ জন অর্থাৎ শতকরা পনেরো জন, (খ) নম্বরের পক্ষে উনসত্তর জন অর্থাৎ শতকরা ছেচল্লিশ জন, (গ) নম্বরের পক্ষে ভোট পড়ে উনচল্লিশটি অর্থাৎ শতকরা ছাব্বিশ এবং (ঘ) নম্বরের পক্ষে ভোট দেন তিন জন

Atomic Energy in War and Peace by Gessner, G. and Leifson, S.
The Open Mind by Oppenheimer, J. R.

অর্থাৎ শতকরা দু'জন। কিন্তু না, ভোট মানবতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি তখন পেন্টাগনের কালো ছায়ার তলায় ঢাকা প'ড়ে গেছে। খবরের কাগজগুলো উন্মাদের মত শুধুই আগুন ছড়াচ্ছে, অসহায় জনমত সেই সব বিবৃতি প্রচার ইত্যাদি পড়ে বিশেষ কিছুই না বুঝে বিভ্রান্ত হয়ে চিৎকার করছে। এরই মধ্যে শুরু হলো মিলিটারির ভারী বুটের দাপাদাপি এবং দেখা যেতে লাগলো চারিদিকে সৈনিকের হেলমেট। সুতরাং অগস্টের ছ' তারিখের উষাগমে একটি বিশাল বিমান ডানার আড়ালে সযত্নে রাখা এ্যাটম বোমাটি লুকিয়ে রেখে হ্যাঙ্গারের বাইরে এসে দাঁড়ালো। নীল চোখ, সোনালী চুলের এক উজ্জ্বল চেহারার তরুণ বৈমানিক অপেক্ষা করছিলো সেখানে—মুখের উপর মুখোস টেনে নিয়ে সে লাফিয়ে উঠে পড়লো বিমানের ককপিটে। বিমান নিয়ে সে উড়ে গেল সেই দিকে—জাপানের দিকে যেখানে সূর্যদেব তাঁর প্রথম কিরণের মুকুটখানি পরিয়ে দিয়ে মুছিয়ে দেন রাত্রির কালিমা। ক'য়েক লক্ষ মানবহত্যার কাজে ব্যবহৃত হল বিশ্বের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরমাণু মারণাস্ত্রটি।

১৯৪৫ সালের যুদ্ধের কাজে পরমাণু বোমার প্রথম ব্যবহার হয়েছিল এবং তারপর হতে আজ পর্যন্ত আমেরিকা, সোভিয়েৎ রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং চীন অনেক বার পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মহাসাগরের নির্জন দ্বীপে, ভূগর্ভে অথবা বিমূর্ত শূন্যে এই সব বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ

ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের (BARC) জন্ম হয়েছিল আজ হতে আটাশ বছর আগে—১৯৪৮ সালে। অনেক পরিশ্রম ও বৈজ্ঞানিক সফল (অসফলও) সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে আজ সেখানে গড়ে উঠেছে চার-চারটি রিয়্যাক্টর। বাস্তবে সেগুলির কাজ যাই হোক না কেন—তাদের নামগুলি যথেষ্ট কাব্যময়।[৭] ভারতবর্ষের প্রথম পরমাণু বোমা তৈরীর ব্যাপারে ইম্‌প্লোশন (Implosion) বা অন্তর্মুখী বিস্ফোরণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ইম্‌প্লোশন পদ্ধতিতে প্লুটোনিয়ম—২৩৯ দ্বারা নির্মিত একটি গোলককে ৩৮টি টুকরোয় বিভক্ত করা থাকে। টুকরোগুলিকে এমন ভাবে সাজিয়ে রাখা হয় যেন বাইরে হতে চাপ দিলেই সেগুলি একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ গোলকে পরিণত হয়ে যেতে পারে এবং একত্রিত হওয়ার ফলে প্লুটোনিয়মের ভর তার ক্রান্তিমাত্রিক ভরের (Critical mass) চেয়ে

৭ ভারতবর্ষের চারটি রিয়্যাক্টরের নাম হল—অপ্সরা, জারলিনা, সাইরাস এবং পূর্ণিমা। রিয়্যাক্টরগুলিকে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর আইসোটোপ তৈরী করার কারখানা বলা যেতে পারে। এগুলির সাহায্যে ইউরোনিয়ম—২৩৮ পরমাণু হতে প্লুটোনিয়ম—২৩৯ পরমাণু তৈরী করা হয়। অপ্সরা হ'ল ভারতের প্রথম রিয়্যাক্টর এবং এটিকে ১৯১৬ সালে কার্যক্ষম করে তোলা হয়। দ্বিতীয় রিয়্যাক্টর জারলিনাকে পুরোপুরি প্লুটোনিয়ম—২৩৯ তৈরী করার কারখানা বলা চলে। তৃতীয় রিয়্যাক্টর সাইরাস—তৈরী করে থাকে অর্ডার মাফিক বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এই আইসোটোপগুলিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে, কৃষিগবেষণা এবং নিউট্রন ও ফিসন পদার্থবিদ্যার গবেষণার কাজে লাগানো হয়। চতুর্থ রিয়্যাক্টর পূর্ণিমাও একটি অতি উন্নত শ্রেণীর প্লুটোনিয়ম রিয়্যাক্টর। এখানে প্লুটোনিয়ম অক্সাইড (PuO_2) জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয়। নতুন একটি "ফাস্ট-ব্রিডার রিয়্যাক্টর" (Fast-Breeder Reactor) নারোরাতে বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। ফাস্ট-ব্রিডার রিয়্যাক্টর তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের থাকলেও তার কারিগরির জ্ঞান যথেষ্ট জটিল। এই বিশেষ ধরনের রিয়্যাক্টরে অতি শীতল তরল-সোডিয়ামের প্রয়োজন হয়। নারোরার ব্রিডার রিয়্যাক্টরটির তৈরীর কাজ শেষ হলে সেটি হবে ভারতবর্ষের পঞ্চম রিয়্যাক্টর।

একটু বেশী হয়ে যায়— ফলে সেটি সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর ভাবে বিস্ফোরিত হয়।

প্রথমে টুকরোগুলিকে কেন্দ্র থেকে একটু দূরে পরপর সাজিয়ে রাখা হয়। কেন্দ্র হ'ল নিউট্রনের উৎসস্থল—সেখানে রাখা হয় রেডিয়মমিশ্রিত বেরেলিয়ম। প্লুটোনিয়মের প্রতিটি টুকরোর বাইরের দিকে খানিকটা করে সাধারণ বিস্ফোরক পদার্থ রাখা থাকে—যেগুলির সাহায্যে একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়—বিস্ফোরণের ফলে যে ধাক্কার সৃষ্টি হয় তার ফলে টুকরোগুলি প্রচণ্ডবেগে কেন্দ্রের দিকে ছুটে যায় এবং ঐ ৩৬টি টুকরো একত্রিত হয়ে যায়। এদিকে নিউট্রনের সাহায্যে যাতে তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খল ক্রিয়া (Chain reaction) শুরু হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পরমাণু বোমাটির কেন্দ্রস্থলে নিউট্রনের উৎস হিসাবে আগে হতেই রেডিয়মমিশ্রিত বেরেলিয়ম রেখে দেওয়া হয়। এই ধরনের ইমপ্লোশন বিস্ফোরণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শৃঙ্খল বিক্রিয়া গড়ে তোলা সম্ভবপর বলে বিভাজনক্ষম পদার্থটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার আগেই তা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়

রিয়্যাক্টরে যখন প্লুটোনিয়ম তৈরী করা হয়, তখন সেখানে Pu-২৩৯ ছাড়াও Pu-২৪০ নামের একটি আইসোটোপ সৃষ্টি হয়। এই প্লুটোনিয়ম—২৪০ আইসোটোপটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 'ফিসন'-ক্ষম (Spontaneous Fission)—অর্থাৎ সেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্লুটোনিয়ম—২৩৯ পরমাণু বোমাতে যদি Pu—২৪০ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তবে সেটি যেকোন সময় হঠাৎ ফেটে যেতে পারে। বোমাটির প্রকৃত বিস্ফোরণের আগেই Pu-২৪০ তার শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু করে দেবে, ফলে বোমাটি তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিস্ফারিত হতে পারবে না—যেখানে বোমা হতে শক্তি পাওয়া সম্ভব হত পনের হাজার টন T.N.T. র সমান, সে জায়গায় হয়ত পাওয়া যাবে আধ কিংবা এক হাজার টন T.N.T. র সমান শক্তি। এই ব্যাপারটির প্রতিকার একটি কারিগরি চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

১৭ই মে ১৯৭৪ তারিখে পরমাণু বোমার গহ্বরটিকে বালি দিয়ে ভর্তি করা হয়। একটি ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনে বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র হতে সব লক্ষ্য করছেন অতি মনোযোগ সহকারে। বাইরে তখন তাপমাত্রা ৪২-৪৪° সেন্টিগ্রেড এবং আর্দ্রতা ১০০%। আর্দ্রতা ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তিত করে রেখেছিল। সেদিন রাত্রে নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রের কেউ ঘুমুতে পারেননি। অবশেষে এল ১৮ই মে। সকাল হতেই বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত তৎপর। সবকিছু ঠিক চলছে। বাতাস তখন দক্ষিণমুখী হয়ে বইছে এটাও লক্ষণীয়, কারণ তেজস্ক্রিয় ছাই কোন দিকে উড়ে যাবে তা চিন্তার ব্যাপার।

সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে ভারত তার প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ষষ্ঠ পরমাণু-শক্তিধর রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হ'ল। বিস্ফোরণটি ঘটানো হল রাজস্থানের মরু-অঞ্চলের একটি স্থানে ভূগর্ভে একশত মিটার গভীরে। মরুভূমির ঐ বিশেষ স্থানটির সাংকেতিক নামকরণ করা হয়েছিল —"গ্রাউণ্ড জিরো।" রাজস্থানের জয়সলমীর শহর হতে তেইশ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্ব কোণে পোখরণ নামক জায়গাটিকে বিজ্ঞানীরা অনেক বিবেচনার পর মনোনীত করেন। বিস্ফোরণের ক্ষমতা দশ হতে পনের হাজার টন T.N.T. র সমান। বিস্ফোরণ যদিও ঘটানো হয়েছিল পৃথিবীর একশত মিটার গভীরে, তবু কোন তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি অথবা অন্যান্য কোন প্রকার পারমাণবিক আবর্জনা বাইরে আসতে দেওয়া হয়নি। ব্যাপরটা খুব একটা আশ্চর্যজনক মনে না হলেও আসলে এটি কিন্তু যথেষ্ট উন্নত কারিগরি জ্ঞানের নিদর্শন। "গ্রাউণ্ড জিরো" হতে চার

কিলোমিটার দূরে মূল নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র, যেখানে বিজ্ঞানীদের বসার স্থান। একশ মিটার গভীরে প্লুটোনিয়ম বোমাটিকে একটি লোহার টুলে রেখে তার উপর বালির বস্তা এবং বালি চাপা দিয়ে সম্পূর্ণ গভীরতাকে বন্ধ করা হয়েছিল। মাটির উপর ছিল কতকগুলি লোহার কাঠামো এবং একটি (ইংরাজী A-অক্ষরের মত দেখতে) লোহার বিশেষ ধরনের ফ্রেম। এগুলি খননকার্যে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং বোমা বিস্ফোরণ করার সময় সেগুলিকে সেখান হতে সরানো হয়নি। বিস্ফোরণের পর সেখানে সেগুলির কোন অস্তিত্ব আর দেখা যায়নি—বোমার আঘাতে সেগুলি ছাই হয়ে গিয়েছিল।

বিস্ফোরণের ঠিক এক ঘণ্টা পরে একটি হেলিকপ্টারে করে বিস্ফোরণ কেন্দ্রটি ঘুরে দেখা হয়—এবং একটি নবনির্মিত পাহাড়কে লক্ষ্য করা যায়—এটির বয়স মাত্র একঘণ্টা এবং জন্ম দিয়েছে পরমাণু বোমাটি। হেলিকপ্টার হতে বিজ্ঞানীরা নেমে—পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকেন "গ্রাউণ্ড জিরোর" দিকে। তাঁরা ঐ স্থান হতে মাত্র ২৫০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু পরীক্ষা করেন—কিন্তু সামান্যতম তেজস্ক্রিয়তাও তাঁরা লক্ষ্য করেননি। তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলে তাঁরা আনন্দিত। আনন্দিত আমরাও—বিজ্ঞানের হাতে হাত রেখে তার পায়ের তালে পা ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছি বলে। আনন্দিত এবং গর্বিত আমরা একারণেও যে, ভারতবর্ষই বিশ্বের প্রথম পরমাণু-শক্তিধর রাষ্ট্র যে তার পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা তথা পারমাণবিক শক্তিকে শান্তির কাজেই নিয়োজিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। [ক্রমশঃ]

জীবন ও মৃত্যুর অনবদ্য ভাষ্যকার: রবীন্দ্রনাথ

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" ও "মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান" একই ব্যক্তির লেখনী-নিঃসৃত দুই বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা, আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এবং বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের চেতনা ও শিক্ষায় পরিশীলিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন যে, ঐরূপ ঋজু বলিষ্ঠ ও প্রাজ্ঞ চিন্তাশীলতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভবপর। তাঁহার সুগভীর তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুকে তিনি পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত করেন নাই; তাই জীবনকেও যেরূপ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকেও তেমনি বরণ করিয়াছিলেন অত্যন্ত সমাদরে।

আমাদের দৃষ্টিভ্রম এবং অজ্ঞতাহেতু আমরা জন্মকেই জীবনের আরম্ভ এবং মৃত্যুকেই জীবনের পরিসমাপ্তি মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবন ও মৃত্যু দুইটি ক্রম ছাড়া আর কিছুই নহে। অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তকাল পর্যন্ত আত্মা অবিরাম গতিতে জীবন ও মৃত্যুর ক্রম অতিক্রম করিতেছে এবং পরমাত্মায় বিলীন না হওয়া পর্যন্ত এই যাত্রাপথ যতিহীন। পৃথিবীর বক্ষে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ তাই সুদুর্লভ। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে অসত্য হইতে সত্যে, তমসা হইতে জ্যোতিতে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে উত্তরণের দ্বারা মানুষ তাহার পরম কাম্য, চির-প্রশান্তির ধাম

পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। পৃথিবীর বক্ষে জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণের ঈশ্বরাভিপ্রেত উদ্দেশ্য উহাই, এই প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় ছিল বলিয়াই তাঁহার কণ্ঠ হইতে ঘোষিত হইয়াছিল :

"যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাই নি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ ব'লে যা চাই নি তাই মোরে দাও॥"

মৃত্যু যে জীবনকে মহীয়ান করে, বরণীয় করে, তাহাকে সর্বোত্তম পথে চালিত করে ব্যর্থহীন ভাষায় তাহা ঘোষিত হইয়াছে কবির সরব কণ্ঠে :

"জীবনে যা প্রতিদিন　　ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি　　তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি—
হেথা যারে মনে হয়　　শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে　　অপূর্ব্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল,
চিরকাল এই-সব　　রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর—
জন্মান্তের নবপ্রাতে　　সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর॥"

জীবন-নাট্যে যে ভূমিকা দিয়া ঈশ্বর মানুষকে প্রেরণ করেন তাহা সমাপ্ত হইবার পর মৃত্যুর শীতলধারায় অবগাহন করিবার অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে কবির অমর লেখনীতে :—

"যা হবার তাই হোক,　　ঘুচে যাক সর্ব শোক
সর্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন　　পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্তজন্মশিখা।
সব তর্ক হোক শেষ—　　সব রাগ, সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি,　　দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই॥"

মানুষ অজ্ঞতাহেতু ভীত কম্পমান বক্ষে মরণকে দূরে সরাইয়া রাখিবার হাস্যকর প্রচেষ্টা করে। মানুষকে সেই অজ্ঞতার গ্রাস হইতে ত্রাণ করিবার জন্য বিশ্বকবি মৃত্যুকে আহ্বান জানাইয়াছেন :

যদি কাজে থাকি আমি গৃহ-মাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ—
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধো-জাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ—
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥"

মৃত্যু না থাকিলে জীবন একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িত, গড্ডলিকাপ্রবাহে চলিত জীবনের ধারা। এই ভয়াবহ অবস্থার পরিত্রাতা মৃত্যুকে বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের পথিকৃৎ কল্পনা করিয়া কবিগুরুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে :

"কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"

এই নিখিল বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া পরম তত্ত্বে যখন তিনি অবগাহন করিলেন তখন অজ্ঞ মানুষের মত মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া মৃত্যু সম্পর্কে অভিজ্ঞ 'সাহসবিস্তৃত-বক্ষপট' কবি তাঁহার "জন্মদিন" কবিতায় জীবন ও মৃত্যুকে একাসনে বসাইয়া করিলেন অভ্যর্থনা :

"জন্মোৎসবে এই-যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত॥
আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে;
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম;
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম—
একমন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা॥"

জীবন ও মৃত্যু একই বৃন্তে দুটি ফুল, একই পাতার এপিঠ ওপিঠ। জন্মেই যেমন জীবনের শুরু হয় না, মৃত্যুতেও তেমনি তাহার ছেদ ঘটে না—জীবাত্মার অস্তিত্ব জন্মের পূর্বেও ছিল, পরেও থাকিবে। পৃথিবীতে তাই কিছুই হারায় না; সবই পূর্ণ থাকে—অখণ্ড অব্যয় চিরশাশ্বত

সনাতন বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি শুধু কালচক্রে আবর্তিত হইতেছে মাত্র। জীবন যেমন জন্ম হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে, কৈশোর হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্ধক্যে ক্রমশঃ স্তর পরিবর্তন করিতেছে, মৃত্যুতেও তাহাই। বিশ্বকবি তাঁহার প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টির জ্যোতির্ময় আলোকে তাই মানবশিশুকে জননীর এক স্তন হইতে আরেক স্তনে যাওয়ার মধ্য দিয়া প্রকৃতিরাজ্যের জন্ম ও মৃত্যুর গূঢ় রহস্যকে পরিষ্কারভাবে উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন :

"ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে! মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়॥

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥"

এইরূপ অপূর্ব উপলব্ধির দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যময় যবনিকা উত্তোলন করিয়া মানবজাতিকে আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত না হইয়া নিজের বিরাট ও মহান স্বরূপকে জানার দ্বারা মনুষ্যজন্মের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে স্থির ও অবিচলিত থাকার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন কবিগুরু। বিধাতার অভিপ্রায় কী—তাহা সবিশেষ অবগত ছিলেন বলিয়াই এই স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষি জাগতিক সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না—আশা-নিরাশাকে শত হস্ত দূরে সরাইয়া বিপুল বিক্রমে ও অমিত তেজে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যু, স্নেহময় পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু, প্রিয় কন্যার মৃত্যু এবং অগণিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের লোকান্তর-যাত্রা—যাহা সাধারণ মানুষকে শোক দুঃখ হতাশায় উন্মাদ করিয়া তুলিত, তাহা বিশ্বকবিকে কিছুমাত্র বিচলিত না করিয়া এবং তপস্যার আসন হইতে বিন্দুমাত্র না টলাইয়া সমস্ত কর্তব্য নির্বিকারচিত্তে সুসংবদ্ধরূপে সমগ্র জীবনব্যাপী চালাইয়া যাইতে অসাধারণ প্রেরণা দিয়াছে। দিগন্তের ওপার হইতে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের বিভূতি এই ধরণীর ক্রোড়ে আসিয়া 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' করার অভীকমন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের সুদুর্লভ সৌভাগ্য।

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য – (প্রথম খণ্ড): ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক : শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন. কলিকাতা ৯। (আশ্বিন, ১৩৮২), পৃষ্ঠা ২৯২, মূল্য কুড়ি টাকা।

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য' – ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষের এই গবেষণা গ্রন্থখানি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে এক নূতন সার্থক সংযোজন। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব সাহিত্যপ্রতিভার আবিষ্কার। দেশ-বিদেশের বুধমণ্ডলী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় বিশ্বের নানা জটিল প্রশ্নের সহজ ও সরল উত্তর ও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন, তখন শিশু গদাধর যে ভাষায় প্রথম 'মা' ব'লে ডেকেছিল – সেই বাংলাভাষা যে শ্রীরামকৃষ্ণের সুললিত কণ্ঠস্বরের সুধাস্পর্শে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে সে খবর কেউ রাখেনি। বিশেষ করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা, অধিকাংশই এ বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন বলেই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিভার এই দিকটির দিকে নজর দেননি। কোন কোন লেখকের চোখে পড়লেও – স্পষ্টভাবে দৃঢ়-প্রত্যয়ে এমন করে তাঁদের বক্তব্য এর আগে কেউ সুধীসমাজে উপস্থাপিত করেননি।

সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে, নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।" লেখক যেন স্বামীজীর এই উক্তিরই পূর্ণ ব্যাখ্যা সারা পুস্তক ধরে করেছেন। ডঃ ঘোষের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চায় অবদান "বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য" (এই পুস্তক লিখেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন) "ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ" ও "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য"—এই তিনটি গ্রন্থ সুধীসমাজে সুপরিচিত। এখন তাঁর এই চতুর্থ নিবেদন—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মনীষার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য'— এই প্রথম অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যা নিজস্ব সৃষ্টি, তাঁর কথার শিল্পগুণ, তাকেই আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য' বলতে চাই, যদিচ বিস্তৃত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণবিষয়ক যাবতীয় সাহিত্যকীর্তিই এই অভিধা লাভ করতে পারে।" (পৃঃ ৬)

'বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব' – এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর প্রতিপাদ্য "শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় নিঃশব্দে কয়েক হাজার বছরের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা এক নিজস্ব ভঙ্গিমায় নিতান্ত ঘরোয়া অথচ নিগূঢ় উপলব্ধির স্পর্শ নিয়ে দেখা দিয়েছে।" (পৃঃ ৫০)

'শ্রীরামকৃষ্ণ : কবিসত্তা' – এই তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে, "এমন এক কবিকে অন্তত আমরা পেয়েছি, যাঁকে কবিতা লেখার প্রয়াস করতে হয় নি, যাঁর মুখের কথা আপনিই কবিতা হয়ে উঠেছে।"

(পৃঃ ৭২)

'শ্রীরামকৃষ্ণমনীষা ও বাংলা সাহিত্য'— এই চতুর্থ অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য, "কল্পনাপ্রধান ও বিচারপ্রধান—দুটি সত্তা হিসাবে আমরা কবি ও

মনীষী শব্দ দুটিকে গ্রহণ করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ কবি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মনীষী"। (পৃঃ ৭৩)

ঈশ্বর-সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ' - এই পঞ্চম অধ্যায়ে দেখান হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মনীষার প্রেরণা বা উৎসস্থল স্বয়ং জগজ্জননী। এই জগজ্জননীই আবার অদ্বয়রূপা ব্রহ্মস্বরূপিণী।

'জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ' এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক মন্তব্য করেছেন, "সব শিল্পের উপর জীবন-শিল্প। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন জীবনের সিদ্ধশিল্পী··· আর শ্রীরামকৃষ্ণের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে রূপায়িত হয়েছে—গিরিশচন্দ্র, নাগমহাশয়, বিবেকানন্দের মতো বিচিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কতো না জীবন।··· মানবমানসের বহুবিচিত্র লীলার প্রতিটি সূক্ষ্ম কম্পন অনুধাবন করে তাকে অনন্তের দিকে মোড় ফিরিয়ে" দেওয়াই ত মহাশিল্পীর কাজ।

(পৃঃ ১২৩—১২৫)

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ—এই অধ্যায়-চতুষ্টয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "তারাপ্রসাদ খৈতান" বক্তৃতামালা হিসাবে ১৯৭১ সালে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব্ কালচারের বিদ্বৎসভায় পঠিত। 'কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ' এই সপ্তম অধ্যায়ে লোক-প্রচলিত ও অপ্রচলিত (কিছু হয়ত তাঁর মৌলিক সৃষ্টি) নানা কথা, কাহিনী, গল্পকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের ভাষায় সহজ উদাহরণরূপে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা অন্তে লেখক বলেছেন, "মাঝে মাঝে এমন এক একটি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব প্রয়োজন, যাঁদের দিব্যদৃষ্টি আমাদের যুগযুগান্তসৃষ্ট সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে সত্যের আলোকে জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাসাহিত্য, জীবন ও সাহিত্য —দুদিক থেকেই আমাদের চিরন্তন প্রেরণা (পৃঃ ১৭৫)

'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে' —এই অষ্টম অধ্যায়ে উপনিষদ, বেদান্তদর্শন, সাংখ্যদর্শন, গীতা, বৌদ্ধজাতক, ভাগবত, শংকর-গ্রন্থাবলী, যোগবাশিষ্ঠ, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভারতসংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উদাহরণ আহরণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। লেখক বলেছেন, "বহু সাধনার দেশ এই ভারতবর্ষ, লোককথারও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আকাশোপম উপলব্ধির অন্তহীন বিস্তারে এই সব গল্পের নক্ষত্রকণা মাঝে মাঝে ঘনীভূত আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ···যাঁরা উৎসের কথা না ভেবে নির্ঝরে বা নদীতে পরিতৃপ্ত, তাঁরাও শেষ অবধি দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসসমুদ্রে, 'রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে অগাধ জলে (পৃঃ ২১৮)

'বাঙ্গালীর মনন, বাঙ্গালীর ভাষা : রাজা রাম-মোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ'— এই নবম অধ্যায়ে লেখক উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা ও সেই চিন্তার ভাষারূপের বিবর্তনের দিক থেকে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অনন্য ভূমিকার কথা আলোচনা করে দেখিয়েছেন, "বাস্তবিকপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথার মধ্য দিয়েই বাংলা চলতি গদ্যের নবজন্ম" (পৃঃ ২৫৯)। স্বামী বিবেকানন্দের চলতি গদ্যের সপক্ষে আন্দোলনের মূল প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা।

দশম ও শেষ অধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজীভাষা।' এই অধ্যায়ে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত হবে এই দেখে যে আপাতনিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিভাবে তাঁর কথার মাঝে মাঝে নিপুণভাবে নানা ইংরেজী শব্দ—ইংলিশম্যান, ইয়ং বেঙ্গল, লেকচার, ফ্যালাজফি (ফিলজফি), থ্যাঙ্ক য়্যু, কুইন, ফিভার মিক্শচার, কেয়ার, সায়েন্স প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন।

ডঃ ঘোষের এই পুস্তক পড়ে পাঠকের

নিঃসন্দেহে মনে হবে লেখকের মনের দিগন্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণবাণীকে কেন্দ্র করে এক বিশাল ভাব ও রূপের মহাসমুদ্র আভাসে ইঙ্গিতে' ধরা দিয়েছে। মনে হবে এখনও কত সম্পদ ও কত বক্তব্য রয়ে গেছে, কেবল একটি খণ্ড নয়—এরূপ হয়ত আরও কয়েকটি খণ্ডে তা সম্পূর্ণ করতে হবে। লেখক অবশ্য সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কবিসত্তা কিভাবে তাঁর বাণীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার বোধ হয় আরও কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'—শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মধ্যে এর প্রকাশ আরও স্পষ্ট করতে পারলে ভাল হয়।

'ভাষা ভাবের বাহন'—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা বর্তমান যুগের নানা চিন্তা ও ধারণার প্রচণ্ড প্রতিবাদ; আবার মানবের কল্যাণমূলক চিন্তার সুন্দরতম উদাহরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শকে অবলম্বন করে যদিও গ্রন্থের নানা স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর ব্যাখ্যা লেখক করেছেন, তবুও বর্তমান যুগসমস্যার জটিল দিকগুলি একত্রিত করে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রজ্ঞা কিভাবে সাহিত্যরসের মাধ্যমে এইগুলির সমাধান করেছে, তা দেখালে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর একটি পূর্ণাঙ্গরূপ বুঝতে পাঠকের বোধ হয় আরও সুবিধা হত।

এই গ্রন্থটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিভার সাহিত্যিক দিকটি লেখক অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেজন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল মনের খোরাক জোগাবে।

ঝরঝরে ছাপা ও উত্তম বাঁধাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপনের শ্রীম-কৃত দিনলিপির অবিকল প্রতিচিত্রটি গ্রন্থের মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ। ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারে এই পুস্তক সম্পদ-বিশেষ। —স্বামী উমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ: স্বামী ওঁকারানন্দ। **প্রকাশক**: শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, ৪ নস্করপাড়া লেন, হাওড়া ১। (১৯৭৪), পৃষ্ঠা ২৭২, মূল্য আট টাকা।

কোন কোন গ্রন্থ হাতে নিয়ে সমালোচক একই সঙ্গে নিবিড় আনন্দ এবং গভীর অস্বস্তি অনুভব করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাক্তন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজের (১৮৯৪-১৯৭৩) রচনা ও আলাপের সঙ্কলন 'শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ' এমনই একটি গ্রন্থ। এর কারণ, এটি বইয়ের চেয়ে বেশি। এ যেন ওঁকারানন্দজীর (অনঙ্গ মহারাজের) ব্যক্তিত্বেরই সম্মুখীন হওয়া। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা এই সমালোচকের অবস্থা অনুমান করতে পারবেন। যাঁরা তাঁকে দেখেন নি তাঁরা এই বইটি পড়লে সেকথা বুঝবেন। আনন্দ পাবেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দময় একটি মানুষকে কাছ থেকে দেখে। অস্বস্তি বোধ করবেন—সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শ জীবনে বরণে ও রূপায়ণে নিজের যোগ্যতা ও অঙ্গীকারের অভাব দেখে। অথচ পূজনীয় অনঙ্গ মহারাজ এই অঙ্গীকার ছাড়া আর কিছুই চান না।

কাজেই সমালোচনা থাক। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের পক্ষ থেকে এই অমূল্য গ্রন্থটির প্রকাশক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া এবং এর অনামী সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি এবং এই গ্রন্থটি কেন মূল্যবান তার কারণগুলি উল্লেখ করি।

প্রথমত, গ্রন্থটির পরম্পরা মূল্য। এই গ্রন্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটি মহান ধারার অন্তর্গত, যে ধারার গোমুখী কথামৃত। কথামৃত স্বয়ং বেদতুল্য মর্যাদার অধিকারী শুধু নন, কথামৃতই আমাদের সচেতন করেছেন রামকৃষ্ণ

সন্তানদের এবং পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ-সংঘ-নেতাদের বাণী-সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে। ফলে আমরা পেয়েছি 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' থেকে শুরু করে 'পরমার্থ-প্রসঙ্গ' 'সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়। স্বামী ওঁকারানন্দের রচনা ও কথালাপ যথাসাধ্য রক্ষার প্রয়াসের মূলে নিঃসন্দেহে সেই পরম্পরা-চেতনা কাজ করেছে এবং তার ফলও হয়েছে পূর্ববর্তী সোনালী ফসলের অনুরূপ।

দ্বিতীয়ত, গ্রন্থটির তাত্ত্বিক মূল্য। স্বামী শিবানন্দ বলতেন, 'ঠাকুর হচ্ছেন বেদ আর স্বামীজী তাঁর ভাষ্য।' এই বেদ ও ভাষ্য পড়তে-শিখতে-বুঝতে হলে রামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সাধুদের কাছে আসতেই হবে। প্রতি যুগে সেই যুগের উপযোগী করে ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী বুঝে নেওয়ার এবং তা জীবনে ফলিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে হবে। পূজনীয় অনঙ্গ মহারাজ সারা জীবন ধরে সেই কাজ নিজে করেছেন এবং অন্যদের করতে সাহায্য করেছেন। সেই কাজের সারাৎসার, ঠাকুরের কৃপায়, এই গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে। এখনকার কালে যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিয়ে যে-কোন ক্ষেত্রে চর্চা করছেন তাঁরা এই গ্রন্থ থেকে নীতি-নির্দেশ পাবেন। বিশেষ করে, ব্রহ্ম ও শক্তি, নিত্য ও লীলা এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে তত্ত্ব ও তথ্য এতে আছে তা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-পথযাত্রীদের ধ্রুবতারার মতো পথ দেখাবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে ওঁকারানন্দজীর উক্তি-গুলি একটি মৌল তত্ত্ব হিসাবে বারংবার পাঠ ও মননের দ্বারা আত্মস্থ করার যোগ্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের কর্মীদের কাজে এটি একটি অপরিহার্য হাতিয়ারও বটে।

তৃতীয়ত, এর সম্পাদনামূল্য। এই গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী অত্যন্ত শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। স্বামী ওঁকারানন্দের লেখা ও বলা কথাগুলি তাঁরা যতটা সম্ভব সংগ্রহ করেছেন, সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন, গ্রন্থারম্ভে যুক্ত করেছেন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর একটি ভূমিকা, পরিশিষ্টে যোগ করেছেন অনঙ্গ মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, তাঁকে লেখা তিনজন রামকৃষ্ণ-সন্তানের কয়েকটি পত্র, তাঁর সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-সংঘের কয়েকজন প্রবীণ সাধুর স্মৃতিচারণ এবং তাঁর একটি আলোক-চিত্র। সম্পাদনা এক্ষেত্রে পূজায় পরিণত হয়েছে।

স্বামী ওঁকারানন্দকে দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, এই গ্রন্থ তাঁদের কাছে একটি মূল্যবান স্মারক। যাঁরা দেখেন নি তাঁদের কাছে এবং অনাগতকালের সাধু-ভক্ত-গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থ একটি আধ্যাত্মিক তথা ঐতিহাসিক দলিল।

আরম্ভ করেছিলাম এই গ্রন্থ আলোচনায় আমাদের অযোগ্যতার উল্লেখ করে। শেষ করছি এই প্রার্থনা দিয়ে যে, এই গ্রন্থ আমাদের তাঁর যোগ্য করে নিন। সাধু ও সদ্‌গ্রন্থ যেন জ্বলন্ত আগুন, যার স্পর্শে আমাদের সব অঙ্গার উজ্জ্বল হয়ে যায়। আর এক্ষেত্রে সেই সাধু স্বামী ওঁকারানন্দ আর সেই পাবক-অগ্নি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বসংবেদন (দ্বিতীয় খণ্ড): মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক: শ্রীজগদীশ্বর পাল, ১০ গ্যালিফ্ স্ট্রীট, স্যুইট নং ১৩, ব্লক নং ১, কলিকাতা ৩, (১৩৮১), পৃষ্ঠা ১২৩, মূল্য ৬·০০ টাকা।

মনীষী শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মানস-লোকে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিভিন্ন দিনে যে-সকল তাত্ত্বিক চিন্তা স্ফুরিত হইয়াছে, আলোচ্য

গ্রন্থে তাহাই বিধৃত। ৪।১।১৯২৫ তারিখ হইতে ১৬।১।১৯৩৬ তারিখ অবধি কালানুক্রমে কতকটা দিনপঞ্জীর আকারে নিজ চিন্তাসমূহ কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে তারিখগুলির মধ্যে ৫ মাস, ১০ মাস এমনকি ২২ মাসেরও ব্যবধান দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ উক্ত ব্যবধানকালে কোনও চিন্তা নথিভুক্ত করা হয় নাই। জাগ্রৎ অথবা স্বপ্নাবস্থায় উপলব্ধ তত্ত্ব, কখনও দিনে কখনও বা রাত্রে, তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন। অশেষ গুণগ্রাহী শ্রীজগদীশ্বর পাল মহাশয় কাশীধাম হইতে কবিরাজ মহাশয়ের এই ডায়েরী বা খাতাটি উদ্ধার করিয়া আনেন এবং বিদ্বজ্জনমহলে ইহার প্রচারকল্পে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডও তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশকের আন্তরিকতা নিষ্ঠা আগ্রহ উৎসাহ ও উদ্যম প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত 'নিবেদন' হইতে জানা যায় যে, 'স্বসংবেদন' গ্রন্থটি আরও খণ্ডে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হইবে এবং বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত, আলোচিত বিষয়সমূহের একটি সংকলনও প্রকাশিত হইবে। ইহা আনন্দের সংবাদ। আমরা আশা করিব ওই সময়ে গ্রন্থনিবদ্ধ জটিল তত্ত্বসমূহের উপর একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হইতেও পাঠকবর্গ বঞ্চিত হইবেন না, কারণ দুর্বোধ্য তত্ত্বসম্বন্ধীয় একান্ত প্রাতিস্বিক চিন্তারাজির তাৎপর্য নির্ণয় করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর পাল মহাশয় মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'বিজিজ্ঞাসা' গ্রন্থটিও প্রকাশিত করিয়াছেন। এইভাবে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হইলে, তাঁহার চিন্তাধারার সহিত পাঠককুল পরিচিত হইবেন এবং তাহার ফলে আলোচিত তত্ত্বসমূহ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তথাপি উল্লেখিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কবিরাজ মহাশয়ের কোনও সুযোগ্য অন্তেবাসী এই কার্যে অগ্রণী হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

বলা বাহুল্য, গ্রন্থটি সর্বসাধারণের জন্য নহে। যাঁহারা বিদগ্ধ লেখকের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত তাঁহারই ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া যাঁহারা গবেষণায় নিরত, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। সমস্ত পাঠাগারেই এই জাতীয় পুস্তক সাদরে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।

গ্রন্থটির মুদ্রণ-পরিপাটি প্রশংসনীয়। ছাপার ভুল নাই বলিলেই চলে। গ্রন্থটি সাগ্রহে পড়িবার ইহাও অন্যতম কারণ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রায়পুর কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

গত ২রা ফেব্রুআরি (১৯৭৬) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ মধ্যপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র কেন্দ্র, রায়পুর আশ্রমে আনুমানিক পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত নূতন মন্দিরে সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগত ৫৮ জন সাধুব্রহ্মচারী ও প্রায় ৩,০০০ ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উৎসব আরম্ভ হয় ২৩শে জানুআরি, স্বামী

বিবেকানন্দের তিথিপূজা দিবসে পুরাতন মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হবনের মাধ্যমে। ২৪শে হইতে ৩১শে জানুআরি অবধি বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নয়টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৭শে জানুআরি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এস্. সি. শুক্ল নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির দর্শন করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

১লা ফেব্রুআরি প্রাতে পুরোহিতগণ সুসজ্জিত যজ্ঞমণ্ডপে পুণ্যাহবচনান্তে মণ্ডপ-পূজা ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় কৃত্যাদি সম্পাদন করেন। সন্ধ্যায় মর্মর-মূর্তি সম্পর্কিত প্রাথমিক আবাহন-ক্রিয়া যথাশাস্ত্র নিষ্পন্ন হয়। ২রা ফেব্রুআরি উষায় পুরাতন মন্দিরে মঙ্গলারতি, সংকীর্তন ও ভজনের পর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অপূর্বানন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণের, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ শ্রীমা সারদাদেবীর এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি বহন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে নবনির্মিত মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন। গৈরিকপতাকাধারী সন্ন্যাসি-বৃন্দ, বেদগানরত ব্রহ্মচারিগণ, জলপূর্ণ কুম্ভ, সবৎসা গাভী, সংকীর্তন-দল, বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত পাঁচশতাধিক ভক্ত, দুই হাজার স্থানীয় ভক্ত. মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনিনাদ ও হুলু-ধ্বনি প্রভৃতির সমাবেশে শোভাযাত্রায় এক অপূর্ব ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনবার নবনির্মিত মন্দিরটি পরিক্রমা করা হয়। তৃতীয় পরিক্রমাকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শোভা-যাত্রায় যোগ দেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া যে বেদীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত বিগ্রহ রাখা হইয়াছিল, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিটি স্থাপন করেন। তাহার পর তিনি শ্রীসারদাদেবীর ও স্বামী বিবেকা-নন্দের প্রতিকৃতিদ্বয় কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনে স্থাপন করিলে বিশেষ পূজা, গীতা- ও চণ্ডী-পাঠ আরম্ভ হয়। যজ্ঞমণ্ডপেও বাস্তুযাগাদি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। বেলা প্রায় আড়াইটায় নবনির্মিত মন্দিরটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উৎসর্গ করা হয়।

পূজাসমাপনান্তে তিন হাজারেরও অধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরাত্রিকের পর বাহিরে বিরাট মণ্ডপে হিন্দীতে 'গীতরামায়ণ' সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শিল্পী ডঃ এ. কে. সেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত তাঁহার হিন্দী রচনার দ্বারা উহার উদ্বোধন করেন। রাত্রিতে কালীপূজা হয়।

৩রা ফেব্রুআরি প্রাতে স্বামী ব্যোমানন্দ হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দের সভাপতিত্বে আয়োজিত জনসভায় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলেন :

"ছ বছর আগে এই শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আনন্দ লাভ করেছিলাম। মন্দির তখন ছিল একটি পরিকল্পনা মাত্র, বলতে পারেন একটা স্বপ্ন, কিন্তু আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। গতকাল নবনির্মিত মন্দিরের উৎসর্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। এখন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ করছেন।

এ-সব মন্দির প্রত্যেক সভ্যতার একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের তাগিদেই দেবায়তনগুলি গড়ে উঠেছে। অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে মানুষ ধারণা করতে ইচ্ছা করে সসীম সান্ত মূর্ত রূপে এবং মানুষ চায় কোনো স্থান যেখানে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে। গৃহস্থ-

বাড়ির 'ঠাকুর ঘর' এবং সর্বসাধারণের উপাসনা-স্থান—মন্দির গির্জা ও মসজিদগুলির অস্তিত্বের পেছনে রয়েছে এসব ভাব। মানুষের মনের চাহিদা মেটাবার জন্যই দেবমন্দিরগুলির উদ্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন, দু রকমের মন্দির আছে—কিছু মন্দির জগন্নাথাদি দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, অন্যগুলি শ্রীরামাদি অবতারপুরুষ, মুনি-ঋষি প্রভৃতির উদ্দেশে অর্পিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মন্দির দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতাররূপে' গ্রহণ করতে কারো কারো মনে দ্বিধা থাকতে পারে। তাঁদের আমি অনুরোধ করব তাঁরা যেন শ্রীরামকৃষ্ণকে বর্তমান যুগের এক মহান ঋষি ব'লে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভাগবতে আরও বলেছেন, 'যারা মুনি-ঋষিদের সকামভাবে অর্চনা করবে, তাদের কামনা পূর্ণ হবে। আর যারা নিষ্কামভাবে ভজনা করবে, তাদের মোক্ষলাভ হবে।' অতএব এখানে আপনারা সকলেই বর্তমান কালের মহান ঋষি—যদি তিনি 'অবতার' নাও হন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অর্চনা করতে পারবেন, যা-ই কামনা করবেন তা-ই নিশ্চয় লাভ করবেন, আপনাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। নিষ্কামভাবে প্রার্থনা করলে অবশ্যই মুক্তিলাভ হবে। অতএব এখানে যে-কেউ আসতে পারেন এবং 'চতুর্বর্গ' অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভ করতে পারেন; সকামভাবে অর্চনা করলে ধর্ম অর্থ কাম এবং নিষ্কামভাবে ভজনা করলে মোক্ষপ্রাপ্তি হবে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে শুধু একজন ঋষি ছিলেন, তা নয়; তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ—অনন্য মহাপুরুষ। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনার ভেতর দিয়ে স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন—সব ধর্মই শেষ পর্যন্ত একই সত্যে পৌঁছিয়ে দেয়। সুতরাং তিনি অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা জানতে পেরেছেন—সব ধর্মই সত্য এবং একই লক্ষ্যে নিয়ে যায় এবং ঘোষণা করেছেন—'যত মত, তত পথ'—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতগুলি ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ। অতএব আমরা বলতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের এবং মনুষ্য জাতির অভিন্নতার প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছেন—একই আত্মা সর্বজীবে রয়েছেন জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে, ব্রাহ্মণ হ'তে চণ্ডাল, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন সকলেরই মধ্যে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, আমরা যে ভেদ, যে পার্থক্য দেখছি গায়ের রঙে, জাতিতে-জাতিতে, সামাজিক পদমর্যাদায়, এসব আমাদের অজ্ঞান-প্রসূত; কিন্তু আসলে মনুষ্যজাতি এক ও অভিন্ন। তিনি হিন্দী শ্লোকে নিহিত এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন: 'যো রাম দশরথ কা বেটা। ওহী রাম ঘট ঘট মেঁ লেটা।'—যে রাম দশরথের পুত্র, সেই রামই ঘটে ঘটে বিরাজিত। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করতেন না। সুতরাং তাঁর এই মন্দির প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জন্যই উন্মুক্ত, তিনি যে-জাতি বা যে-দেশেরই হোন না কেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় চণ্ডাল প্রভৃতি যে বর্ণেরই হোন না কেন, ধনী বা দরিদ্র পণ্ডিত বা মূর্খ—যাই হোন না কেন। এমন কি ভিন্নধর্মাবলম্বীদের জন্যও এই মন্দির উন্মুক্ত, তাঁরা সকলেই দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আপন জন, যেহেতু তিনি বিভিন্ন ধর্ম আচরণ ক'রে চরম সত্য ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। এই মন্দির একটি সর্বজনীন দেবায়তন ব'লে এখানে মানুষ মাত্রেই ঐক্যবদ্ধ হবেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশের পক্ষে বর্তমান সঙ্কটকালে এই ঐক্যের আদর্শ একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ভারত শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের ভাবরূপ। অতএব আপনারা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাতলে ঐক্যসূত্রে মিলিত হবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদের সকলকে এই সব মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে আশীর্বাদ করুন, যাতে ধর্মের ঐক্য ও মনুষ্যজাতির ঐক্য—এ দু'টি ঐক্যের ভাব সারা দেশে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে; নিজেদের মুক্তি ও জগতের কল্যাণের জন্য—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

স্বামী আত্মানন্দ ভাষণটি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বলেন। স্বামী ব্যোমরূপানন্দ সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। সভাপতির অভিভাষণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন: "রায়পুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের বিশেষ সার্থকতা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, 'তুই আমাকে যেখানে নিয়ে রাখবি আমি সেখানেই থাকব।' তাই এই মন্দিরটি একটি 'মহাতীর্থ'। নরেন্দ্রনাথের দীর্ঘ দুইবৎসরব্যাপী অবস্থান রায়পুরকে এক পুণ্যভূমিতে পরিণত করেছে, এবং এখানে তাঁর বাসের স্মারকরূপেই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা।" সভায় চার হাজারেরও বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

৪ঠা ফেব্রুআরি প্রাতে স্বামী ব্যোমরূপানন্দ হিন্দীতে গীতা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে আয়োজিত ধর্মসভায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ হিন্দুধর্ম, ইহুদীধর্ম, জৈনধর্ম, জরাথুস্ত্রীয় ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও ইসলামধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতির অভিভাষণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিসত্তা অনন্ত। সর্বধর্মসমন্বয়ের তিনি মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও খৃষ্টধর্মে সাধনা ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সমস্ত ধর্মই সত্য—সমস্ত ধর্মই সেই এক ঈশ্বরের নিকট পৌছবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। যথার্থই তিনি 'সর্বধর্মস্বরূপ' ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, এই নবনির্মিত মন্দিরটিও তাই সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক।" স্বামী আত্মানন্দ হিন্দীতে বক্তৃতাটির সারসংক্ষেপ করেন।

৫ই ফেব্রুআরি সান্ধ্য সভায় গুজরাটের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্রীমন্নারায়ণ নবনির্মিত মন্দিরের উৎসর্গানুষ্ঠান উপলক্ষে রায়পুর আশ্রম কর্তৃক মুদ্রিত স্মরণিকা-গ্রন্থটি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন।

৬ই ফেব্রুআরি হইতে ১৫ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত পণ্ডিত রামকিঙ্কর উপাধ্যায় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। ১৬ই হইতে ২৫শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত বৃন্দাবনের শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ২৬শে হইতে অনুষ্ঠানের সমাপ্তিদিবস ২৯শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত কুমারী সরোজবালা ও শ্রীবিষ্ণু অরোরা ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। উৎসবের বিভিন্ন ধর্মসভায় প্রত্যহ প্রায় দশ সহস্রেরও অধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য

বাংলাদেশে বাগেরহাট, বরিশাল, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ ও শ্রীহট্ট কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসার অতিরিক্ত স্থানীয় দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশুখাদ্য ও বস্ত্রাদি বিতরণ অব্যাহত আছে।

ভারতে সেবাকার্য

পাটনা শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে পাটনা শহরে ও শহরতলিতে মিশনের বন্যাত্রাণকার্যের প্রথম পর্যায়ে ধুতি, শাড়ি, তুলোর কম্বল ও পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হয়। মানেরে বন্যাত্রাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহ-নির্মাণকার্য অব্যাহত আছে।

পুরী মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ওড়িশার বালেশ্বরের বাউথে (Bauth) বন্যাপীড়িত

ব্যক্তিদের মধ্যে মিশন গত নভেম্বর মাসে (১৯৭৫) শাড়ি, পুরাতন বস্ত্রাদি ও বাসনপত্র বিতরণ করে।

রাজকোট শাখাকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত সৌরাষ্ট্রের ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণকার্যে দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কম্বল, ধুতি, লংক্লথ ইত্যাদি বিতরিত হয় এবং লিমডিতে দুগ্ধবিতরণকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮।৯।৭৫ হইতে ২৯।২।৭৬ অবধি ১২,৭৮১ জন বালক-বালিকা ও স্তন্যদাত্রী জননীগণের মধ্যে দুগ্ধ বিতরিত হয়।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৭৫) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বেলুড় মঠে সংঘস্থ সাধুদের জন্য নির্মিত আরোগ্য ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

গত ২০শে ফেব্রুআরি (১৯৭৬) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের জনৈক ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বৎসরের বি. এসসি. (রসায়নে অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন **সারদাপীঠ** শিল্পায়তনের দুইজন ছাত্র এপ্রিল ১৯৭৫-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জুনিয়র ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ২য় ও ৯ম স্থান অধিকার করে।

ত্রিচুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র নিউ দিল্লীতে গত প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে 'রাইফেল শুটিং'-এ প্রথম স্থান অধিকার করে।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, **স্বামী অর্কজ্ঞানন্দ** (পঞ্চানন মহারাজ) গত ২রা মার্চ (১৯৭৬) সকাল ৮'৫০ মিনিটে শ্বাস- ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতাহেতু ৬৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল এবং তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন; ১৯৩২ সালে কনখল সেবাশ্রমে যোগ দেন এবং ১৯৪২ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কনখল সেবাশ্রমের অতিরিক্ত কাটিহার শ্রীলঙ্কা পাটনা বৃন্দাবন রাঁচি (স্যানাটোরিয়ম) দেওঘর পুরুলিয়া এবং বাগবাজার (উদ্বোধন কার্যালয়) কেন্দ্রের কর্মিরূপে তিনি সংঘসেবা করেন। ১৯৪৪ সালে মেদিনীপুর ও পূর্ববঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ত্রাণকার্যেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে জানুআরি ১৯৬৩ সালে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে দশ খণ্ডে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র মুদ্রণসংক্রান্ত প্রকাশন-কার্যে তাঁহার প্রশংসনীয় উৎসাহ, উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

আঁটপুর রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম কর্তৃক গত ১২ই ডিসেম্বর (১৯৭৫) স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব এবং ২৪শে হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ ও তদীয় অষ্টজন গুরুভ্রাতার সন্ন্যাসের সঙ্কল্পগ্রহণের স্মৃতি-উৎসব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে।

উষাকীর্তন, পূজাপাঠ, হোম, ভজন-কীর্তন, ধুনি-প্রজ্বালন, ধর্মসভা, যাত্রাগান, তীর্থ-পরিক্রমা, চলচ্চিত্রপ্রদর্শন ইত্যাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী তথাগতানন্দ ও স্বামী চিৎসুখানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দ, অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সবিতা দেবী, শ্রীঅমর কুমার ঘোষ প্রমুখ শিল্পিগণ এবং কৃষ্ণনগরের "রামকৃষ্ণ রাগ রঙ্গম" ও হাওড়ার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সভ্যগণ বিভিন্ন দিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই বৎসরে অন্ততঃ ১৫।১৬ হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে একটি নাতিবৃহৎ 'রামকৃষ্ণলীলা' প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছিল। নবনির্মিত 'সারদা ভবনের' উদ্বোধন এবং ধুনি স্থানটিতে 'ধুনি মণ্ডপ'-এর ভিত্তিস্থাপনও এই বৎসরের উৎসবের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

বারাসত রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১২০তম জন্মোৎসব গত ১২ই পৌষ, ১৩৮২ হইতে ১৯শে পৌষ পর্যন্ত আট দিন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক বিবিধ আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

প্রথম দিন জন্মতিথিতে পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী, শিবমহিম্নঃস্তোত্র ও উপনিষদ্ পাঠ হয়। বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্য-দান ও বক্তৃতা করেন স্বামী চিৎসুখানন্দ; বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের ভজনগানে এক শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত মহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে উৎসবের উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন। মধ্যাহ্নে সমবেত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বিদ্যার্থীদের শ্রীশ্রীরামনামসংকীর্তন এবং শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও সহশিল্পিগণের শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতির পর ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী চিৎসুখানন্দ ও স্বামী শিবময়ানন্দ শ্রীমহাপুরুষজীর অধ্যাত্মজীবন ও উপদেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম কর্তৃক 'নদের পাগল' যাত্রা অভিনীত হয়।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং সর্বশ্রী যামিনী চট্টোপাধ্যায়, অমিয় দত্ত চৌধুরী ও পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে শ্রীঅভয়চরণ রায়ের গ্রন্থনায় ও শ্রীঅখিল রায়ের পরিচালনায় বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য গীত হয়। সন্ধ্যায় রসরাজ শ্রীসারদামাতা-লীলাগীতি কথায় ও গানে

পরিবেশন করেন। চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতাপস মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় সঙ্গীতসহ তরণীসেন বধ কথকতা করেন। সন্ধ্যায় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীবীরেন্দ্র সারখেল ও শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চম দিন অপরাহ্ণে মধ্যমগ্রাম ভারতী সঙ্গীতায়তনের শ্রীঅখিল রায় পরিচালনা করেন মীরাবাঈ গীতি-আলেখ্য। সন্ধ্যায় নবাবগঞ্জ সুরশ্রী সঙ্গীত-শিক্ষাকেন্দ্র মাতৃলীলা গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় রাণী রাসমণি ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক। সপ্তম দিন অপরাহ্ণে সুরে 'কথামৃত' পরিবেশন করেন সর্বশ্রী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দত্ত চৌধুরী ও যামিনী চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, সঙ্গীতসুধাকর রামায়ণ কীর্তন করেন।

অষ্টম দিন পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদা-দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারিখানি বৃহদায়তন সুসজ্জিত সিংহাসনে স্থাপিত প্রতিকৃতি সহ অগণিত ভক্ত নরনারী এক বিরাট শোভাযাত্রা ভজন-সঙ্গীত ও সংকীর্তন গাহিতে গাহিতে বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। মানিকতলা মিলনসংঘ, দোহাড়িয়া রামকৃষ্ণ ভজন সংঘ, বারাসত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ছাত্র সংঘ প্রভৃতি পরিক্রমায় যোগদান করে। পরে আশ্রমে প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীকিরণ চন্দ্র ঘোষাল 'কথামৃত' এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মহিষমর্দিনী কথকতার পর সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর দিব্য জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সম্পাদক শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য ধন্যবাদ দেন।

রাউরকেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক গত ২৫শে ডিসেম্বর '৭৫ শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব, ১লা জানুআরি '৭৬ কল্পতরু উৎসব এবং ২৩শে জানুআরি '৭৬ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। পূজা, পাঠ, আলোচনা, ভজন, ভাষণ ও প্রসাদবিতরণ উৎসবগুলির অঙ্গ ছিল। প্রথম এবং তৃতীয় দিনে প্রায় তিনশত ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ পান। দ্বিতীয় দিনে বক্তৃতা দেন স্বামী অকামানন্দ।

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি আশ্রমে গত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি স্মরণে বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" বহুসংখ্যক ভক্তের উপস্থিতিতে পাঠ করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভোগারতির পর চারি-শতাধিক ভক্ত ফল- ও অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ভাগলপুর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র" আয়োজিত শ্রীশ্রীমা সারদামণির শুভ জন্মতিথি উৎসব গত ৯ই মাঘ, ১৩৮২ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, ভোগ ও আরতি হয়। সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সহশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক স্তব-স্তোত্র পাঠ, ভজন, কালীকীর্তন, গীতা, কথামৃত ও পুঁথি পাঠের পর সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীক্ষীরোদেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ সাহা ও ডক্টর মৃণালিনী ঘোষ। নামকীর্তন ও প্রসাদবিতরণান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি কর্তৃক বিগত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব পূজার্চনা, ভোগরাগাদি, ভজন-সঙ্গীত, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" পাঠ ও আলোচনা এবং প্রসাদবিতরণের মাধ্যমে অভূতপূর্ব আনন্দের

সহিত উদ্‌যাপিত হয় হাফলং শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করেন।

আলিপুরদুয়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে ও ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমাতা সারদাদেবীর জন্মতিথি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। ১ম দিন সকালে মঙ্গলাচরণ, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও মাতৃসঙ্গীত হয়। সন্ধ্যায় সারদালীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সমাজ। পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ। প্রায় দুই হাজার নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ১৮ই জানুআরি '৭৬ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ আবির্ভাব-উৎসব স্তব, প্রার্থনা, পাঠ, সংগীত ও ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা ও সংগীতে অংশগ্রহণ করেন বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের পাঠচক্র বিভাগের ছাত্রগণ এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনী আলোচনা করেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ এবং ভক্তি-মূলক সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

খিদিরপুর সুরবিতান কর্তৃক নিম্নলিখিত আবির্ভাব-উৎসবগুলি সংস্থার শিল্পিবৃন্দের সঙ্গীতানুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসুর বক্তৃতার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়:

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৫—শ্রীমা সারদাদেবীর ও ভগবান যীশুর জন্মোৎসব

২৩শে জানুআরি ১৯৭৬—স্বামী বিবেকানন্দের ও নেতাজীর জন্মোৎসব।

২রা ফেব্রুআরি ১৯৭৬—স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব।

৩রা মার্চ ১৯৭৬—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব।

ঘাটশীলা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক গত ২৫.১২.৭৫ তারিখে শ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ভক্ত মহিলাগণ ভজন ও কীর্তন করেন এবং শ্রীতামস-রঞ্জন রায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী পাঠ করেন।

কসবা দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়। স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ মায়ের জীবনী আলোচনা করেন এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রায় ১৫০ জন ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

চাঁদপুর (বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১লা হইতে ৫ই জানুআরি (১৯৭৬) পর্যন্ত 'কল্পতরু' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১লা হইতে ৩রা জানুআরি যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর বিশেষ পূজা, হোম এবং অপরাহ্নে আলোচনা-সভা হয়। সভায় প্রত্যহ স্বামী অক্ষরানন্দ সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী পরদেবানন্দ, শ্রীযুত রাসমোহন চক্রবর্তী, স্বামী শিবরামানন্দ, শ্রীরণজিৎকুমার চক্রবর্তী, বৌদ্ধভিক্ষু ধর্মরক্ষিত, অধ্যাপক মোহাম্মদ সলিলুর রহমান ও শ্রীঅরুণ কুমার দেবনাথ ভাষণ দেন। ১লা জানুআরি আশ্রমে একটি স্থায়ী চিত্রশালার উদ্বোধন করা হয়: এই চিত্রশালায় প্রাগৈতি-হাসিক যুগ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পর্যন্ত হিন্দুধর্মের ইতিহাস-সংক্রান্ত ৭১টি তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে। চিত্রশালাটি অতীব জনপ্রিয়

হইয়াছে। প্রত্যহ সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৪ঠা এবং ৫ই জানুআরি সন্ধ্যায় যথাক্রমে 'ধ্রুব' এবং 'রাবণ বধ' পালা-কীর্তন হয়।

হুগলী জেলা বিবেকানন্দ সংঘ কর্তৃক গত ২৫. ১২. ৭৫ হইতে ৪. ১. ৭৬ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন দিনে বাঁশ-বেড়িয়া, কোলা, ভোঁপুর, শক্তিগড়, ত্রিবেণী-টাউন শিপ ও চেড়াগ্রাম কেন্দ্রে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ৭৬ তারিখে বাঁশবেড়িয়া কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ধর্মসভায় প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা (সভানেত্রী), শ্রীমতী অঞ্জলি চক্রবর্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ কুমার ভাষণ দেন। সভায় প্রায় ৫০০ ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হয়। সভাশেষে প্রসাদ বিতরিত হয়।

খুলনা (বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নবনির্মিত মন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১৫ই জানুআরি হইতে ১৮ই জানুআরি ১৯৭৬ পর্যন্ত উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৫ই প্রাতে স্বামী অক্ষরানন্দ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা পাঠ এবং আলোচনা হয়। উৎসবের প্রথম দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারা অবলম্বনে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী অক্ষরানন্দ, ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত, শ্রীবিমল চন্দ্র চন্দ্র, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, শ্রীবিনোদবিহারী সেন, শ্রীমতী প্রতিভারানী বসু, ব্রহ্মচারী বিনয়, ব্রহ্মচারী আশীষ, শ্রীসত্যগোপাল ঘোষ এবং স্থানীয় যুবকবৃন্দ। উৎসবের চতুর্থ দিনে দরিদ্র-নারায়ণসেবা হয়। উৎসবের তৃতীয় ও চতুর্থ দিন রামায়ণগান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খুলনা রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিবৃত্ত পাঠ করেন উৎসব ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা সমিতির সভাপতি স্বামী পরদেবানন্দ।

পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক গত ২৩শে জানুআরি ১৯৭৬ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তি-মূলক সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী স্বায়ম্ভবানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। প্রায় ৭০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান।

গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২১শে মার্চ ১৯৭৬ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। কথামৃতপাঠের শেষে বহু ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া মহোৎসাহে প্রায় তিন মাইল নগর-পরিক্রমায় বাহির হন। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার ভক্তকে আশ্রমে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালে স্বামী শরণ্যানন্দের সভাপতিত্বে আশ্রমে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী সর্বাত্মানন্দ। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরের দুই দিন বাউল গান, কীর্তন ও 'স্বামী বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ভাগলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠ-চক্র কর্তৃক গত ২৩. ১. ৭৬ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ভজন, কীর্তন, পূজা, হোম, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী ক্ষীরোদেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ রাহা, হিমাংশু মৈত্র ও শ্রীমতী বিনোদবালা দেবী ভাষণ দেন। শ্রীবিলাসকুমার মিত্র স্বরচিত 'স্বামীজী-প্রণাম' কবিতা পাঠ করেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ৩রা এবং ৬, ৭, ৮ ও ৯ই মার্চ (১৯৭৬) তিথিপূজা, অষ্টপ্রহর হরিনাম-সংকীর্তন, রামায়ণগান এবং ধর্মসভাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সভায় স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ও স্বামী সংশুদ্ধানন্দ ভাষণ দেন।

রাজারহাট বিষ্ণুপুর রামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হইয়াছে গত ৮ই ফেব্রুআরি '৭৬। তীর্থ-পরিক্রমা, পূজা, হোম, নারায়ণ-সেবা, ভগবৎ-প্রসঙ্গ, কীর্তন ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ব্রহ্মচারী দেবদাস গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং কামুন্দিয়া মায়ের মন্দির 'ভগবান যুগে যুগে'-লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন। দ্বিসহস্রাধিক ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ পান। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী উমানাথানন্দ, প্রধান অতিথি শ্রীযশোদাকান্ত রায় ও শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন।

এতদুপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ ও পরিচ্ছন্ন স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পরলোকে

বিগত ২০শে কার্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৮২ (ইং ৬ই নভেম্বর, ১৯৭৫) অপরাহ্ণ ৪-৪৫ মিঃ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা **প্রফুল্লমুখী দেবী** (মুখোপাধ্যায়) আনুমানিক ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বারাণসীস্থিত বাটীতে সাধনোচিতধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

২৭ নং বোসপাড়া লেনে পিত্রালয়ে তাঁহার জন্ম। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের দর্শন ও স্নেহ লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

জননীসমা ভগিনী নিবেদিতার অসীম স্নেহধন্যা বালবিধবা প্রফুল্লমুখী ১৭ নং বোসপাড়া লেনে তাঁহারই নিকটে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ভগিনী ক্রীষ্টীনেরও বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন তিনি। রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা হইলেও নিবেদিতার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একসময় তিনিও প্রায় দেড় বৎসরকাল কুমিল্লার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের (বাগবাজার) সহিত তাঁহার আত্মিক যোগ ছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে বিদ্যালয়ের বিবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া তিনি সকলের আনন্দ বর্ধন করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতার মহৎ হৃদয়ের কথা বলিতে গিয়া তিনি আনন্দে অভিভূতা হইয়া পড়িতেন। তাঁহার ঈশ্বরপরায়ণতা, সরল অনাড়ম্বর ও আনন্দময় জীবন সকলকে আকৃষ্ট করিত।

বিগত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭৫, সকাল ৭.৫০ মিনিটে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা **কিরণময়ী দেবী** ৯৭ বৎসর বয়সে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রখ্যাত চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এই ভক্তিমতী মহিলার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কিরণময়ী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আদর্শ ধর্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন এবং নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন।

তাঁহার জীবনের আর একটি দিক ছিল নিরক্ষরতা-দূরীকরণে প্রয়াস। উহাও তিনি ধর্মের অঙ্গরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিগত ১১।১।৭৬ তারিখে বেলা ১১-৪০ মিনিটে শ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত **অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়** ৮০ বৎসর বয়সে বেলঘরিয়ায় সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী প্রেমানন্দজী এবং বিশেষ করিয়া স্বামী শিবানন্দজীর স্মৃতি-কথা 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় ৫০তম বর্ষ হইতে ৭২তম বর্ষ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থাকারেও তাঁহার স্মৃতিচারণা প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার অনুরাগী বহু ভক্ত তাঁহার নিকট ওই সকল স্মৃতিকথা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন পর্যন্ত স্মৃতিচারণার দ্বারা তিনি ভক্তগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

বিগত ১৬ই অক্টোবর, ১৯৭৫, পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য হাওড়ানিবাসী **সত্যেন্দ্রমোহন দাস** ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভক্ত ও সেবাপরায়ণ চিরকুমার সত্যেন্দ্রবাবু বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বারাসত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তিনি উহার বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সাধু-ভক্তদের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট অফিসে তিনি চাকুরী করিতেন।

প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভূতপূর্ব কর্মসচিব **পঞ্চানন মাইতি** ৮২ বৎসর বয়সে গত ২৩শে অক্টোবর সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে ৺পুরীতীর্থের হরিদাস সমাধি মঠে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। ১৯৪০ হইতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি মেদিনীপুর আশ্রমের সম্পাদকের কার্যাদি করিয়াছিলেন।

পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সহধর্মিণী **মায়া চক্রবর্তী** বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮২, (৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫) প্রাতে থ্রম্বসিস্ রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মায়াদেবী শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তাঁহার ৬৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

বিগত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৫, বেলা দেড়টায় **বিশ্বরঞ্জন সান্যাল** মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ বৎসর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল পাবনা জেলায়।

কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার **লাবণ্য কুমার রায়** গত ৬ই জানুআরি (১৯৭৬) বেলা ১০ ঘটিকায় তাঁহার কসবাস্থিত বাসভবনে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম করিতে করিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ভক্ত পরোপকারী দানশীল ও আগ্রহী কর্মী, তিনি কিশোরগঞ্জের রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ঐ আশ্রমের সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করেন। পুরাতন রোগের চিকিৎসায় তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবচ্চরণে চির-শান্তি লাভ করুক।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই আশ্বিন। (১৩০৬ সাল) [১৮শ সংখ্যা।]

মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম।

(প্রেরিত পত্র—২৩।৮।৯৯।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

উপেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতার এজেণ্ট হইয়া অনাথাশ্রমের কার্য্য করিতেছেন। আমরা উপেন্দ্র বাবুকে নিঃশব্দে ইটালী অঞ্চলে এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনাথাশ্রমের হিতকল্পে এইরূপ চেষ্টা করিতে দেখিয়া বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছি। গত জানুয়ারী মাস হইতে অনাথাশ্রমে প্রতিমাসে বাবু ধন্নলাল আগরওয়ালা (কলিকাতা) ২৲ হিসাবে ও বাবু রামলাল বোস (কলিকাতা) ১৲ হিসাবে সাহায্য করিতেছেন। গত জুন হইতে বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা) ১৲ বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল (দার্জ্জিলিং) ২৲ ও বাবু হরেন্দ্রকুমার বোস (কলিকাতা) ১৲ হিসাবে মাসিক সাহায্য করিতেছেন। উক্ত মাসিক সাহায্যকারিগণকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহকারে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সম্প্রতি কতিপয় মহানুভব, অনাথাশ্রমের সাধারণ ব্যয়ের নিমিত্ত এককালীন এইরূপ সাহায্য করিয়াছেন। যথা,—

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড় মঠ, ১০৲ এবং ১২ খানি বস্ত্রের চাদর; বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হাবড়া, সাতরাগাছী ১০৲; জনৈক ভদ্রমহিলা, কলিকাতা ৫৲; জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১০৲; বাবু নবগোপাল ঘোষ, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া, ৫৲; ডাক্তার রামলাল ঘোষ, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া, ২৲; জনৈক বন্ধু ১০৲; ডাক্তার নিতাইচরণ হালদার, কলিকাতা, ১৪৲; বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র বোস, কলিকাতা, ২৲; বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৲; বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৲; বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোস, কলিকাতা, ২৲; বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৲; বাবু রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৲; বাবু মণিলাল সেন, কলিকাতা, ৪৲; বাবু নিমাই চরণ ঘোষ, কলিকাতা, ২৲; বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা ৫৲; বাবু উপেন্দ্রনাথ আঢ্য, কলিকাতা, ৮৲; বাবু প্রিয়নাথ সেন, কলিকাতা, ৫৲; বাবু প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা, ২৲; ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, কলিকাতা, ২৲। এতদ্ব্যতীত বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্বপ্রণীত একখানি বড় ভূমণ্ডলের ম্যাপ, এক অ্যাট্‌লাস ও দুইখানি ভূগোলপ্রকাশ ও ভূগোলপরিচয় দিয়া অনাথাশ্রমের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বকৃত দুইখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। বাবু তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা,

* চৈত্র, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

এক বাক্স ও কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং এক পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার কিণ্ডার গারটেন্ বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকখানি চিত্র ও পাঠশালার উপযোগী আরও কয়েকটী সামগ্রী দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অনাথাশ্রমের এই আরম্ভ সময়ে যে উদারচিত্ত মহাশয় ও মহাশয়াগণ সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন্ তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃতই আশ্রমের জীবনদাতাস্বরূপ জ্ঞান করি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহের সহিত মানবজাতির হিতসাধনে তৎপর হউন।" —(স্বাক্ষর) অখণ্ডানন্দ।

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি বীরেন্দ্র সিংহ কিশোরীর অনুসন্ধানে ভ্রমণ করে। রাণা কোথায় আছে, কিরূপে আছে, তাহার সন্ধান নেয়। কিরূপে রাণার প্রাণবধ করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। রাণার প্রাণবধ করিয়া, মৃত্যু-সংবাদ কিশোরীকে দিবেন এই তাঁহার কামনা। জীবনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, তারপর যা হয়। কিশোরীকে গ্রহণ করিবেন না, এ দৃঢ় ধারণা। যার জন্য এত সহ্য করিয়াছেন, যার জন্য মুমূর্ষু হইয়াছিলেন, সেই তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। রাণার পাটরাণী হইবে বাসনা। হা ধিক! রমণীচরিত্রে ধিক! যে রমণীকে ভালবাসে, তাকে ধিক! তাহার জীবনে শত ধিক! কিন্তু প্রতিহিংসা! যুদ্ধে জয় আশা নাই, বারবার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তবে কিরূপে রাণার প্রাণবধ করিব? স্বহস্তে বধ করিতে হইবে। সেই প্রাণঘাতী ছুরী কিশোরীকে দেখাইতে হইবে। ছদ্মবেশে রাণার রক্ষকপদে নিযুক্ত হইতে পারিলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু প্রথমতঃ দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে,—এ অতি অসহ্য। কি করি, এ ব্যতীত ত আর উপায় নাই। পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত ত কেহ রাণার রক্ষকপদ পায় না; বিশ্বস্ত ও পরিচিত কিরূপে হইব! তিনি শ্রুত ছিলেন, রাজ্যের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত গুপ্তভাবে রাণা সহর পর্য্যটন করেন। সে এক সুযোগ বটে। কিন্তু কই! নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, রাণার ত দেখা পান না। ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন রজনীযোগে হটাৎ ধন্নুর সহিত সাক্ষাৎ। ধন্নু এতদিন বীরেন্দ্র সিংহের কোন তত্ত্ব পায় নাই। কুলাঙ্গার রাণাপুত্র উদা'র সহিত জুটিয়াছে। উদা'র কামনা—পিতাকে বধ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করে। ধন্নুর নিকট অবগত হইলেন যে, উদা এক্ষণে দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। পাঠান-জাতীয় বিলোলী লোদী তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তৎকালে দিল্লীর অধিকার অতি সংকীর্ণ, রাজ্যবিস্তারের নিমিত্ত জোয়ানপুরের সহিত দিল্লীর বিবাদ উদা জানিত, পিতার বিরোধে কার্য্য করিলে স্বজাতিরা বিরোধী হইবে। দিল্লীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে বিরোধে তাঁহার ক্ষতি হইবে না। এই নিমিত্ত মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করিতে পাঠান-শিবিরে গিয়াছেন। পিতার প্রাণবধ করা তাঁহার সঙ্কল্প। সংবাদ শুনিয়া বীরেন্দ্র সিংহের আপাদ-মস্ত

* ফাল্গুন, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন, দুনিয়া অতি আশ্চর্য্য স্থান, হেতা আত্মসুখই প্রবল! আত্মসুখের জন্য পিতৃহন্তা হইবে নরাধম! নরাধম—তিনিই বা কি করিতেছেন। তিনিই বা রাণার প্রতিবাদী কেন? কিশোরীর প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসার কারণ কি? অন্য কিছুই না,—তাঁহার আত্মসুখে ব্যাঘাত পড়িয়াছে। ধন্নু বলিতে লাগিল, আমাদিগের উত্তম সুযোগ উপস্থিত। যখন ঘরভেদী শত্রু পিতা পুত্রে বিবাদ—তখন রাণার অপকার করা অতি সহজ। উদা প্রত্যাগমন করিলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে. কিন্তু এ সকল উৎসাহবাক্যে বীরেন্দ্র সিংহ কোন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ধন্নু জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বলিতেছ না কেন?" বীরেন্দ্র সিংহ উত্তর করিলেন, "কি বলিব, যখন কার্য্যে সফল হইব, তখন বুঝিব। বার বার আশা করিয়া প্রতারিত হইয়াছি। আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে।" ধন্নু নানা প্রকার উত্তেজনা করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র শুনিলেন মাত্র। ধন্নু চলিয়া গেলে তিনি ইতি-কর্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। কিশোরীর আশায় জীবনের বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা ফুরাইয়াছে। তারপর জিঘাংসা উদয় হয়। আপাততঃ অন্তরে ভাবের পরিবর্ত্তন উপস্থিত। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল. সংসারে আর তাঁহার কোন কার্য্য নাই। জীবন লক্ষ্য-শূন্য, আশা ক্ষোভবর্জ্জিত! কি করিবেন, কোথায় যাইবেন,—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ তাঁহার মানসনেত্রে মীরার রূপ উদয় হইল। একবার ভাবিলেন, মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিন্তু মনে মনে লজ্জা হইল। মীরার নিকট বৈষ্ণবের ভান করিয়াছিলেন, সামান্য রমণীদর্শনমানসে সাধুর ভান! ভাল. বৈষ্ণব কি? মীরার হরিসংকীর্ত্তনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, তিনি আলৌকিক শক্তিশালিনী। কিন্তু একি,—যে সে ব্যক্তি ত তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে! তিনি কি যথার্থ প্রতারিত হন বা তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি বৈষ্ণবের ভেক পর্য্যন্তও উপাসনা করিয়া থাকে? বৈষ্ণব কি, যাহার ভেকের এত মান? এই কথা তাঁর মনে অনবরত তোলাপাড়া হইতে লাগিল। অন্যমনে দ্রুতপদ সঞ্চালনে চলিলেন। দিবা অবসানে একটি কুটীরের নিকট উপস্থিত। তথায় দেখেন, তাঁহার চিকিৎসক আর দুই ব্যক্তি—ইহারা অক্কা বক্কা। পীড়িত অবস্থায় উভয়কে দেখিয়াছেন. কিন্তু স্মরণ হইল না। তাঁহার বৈদ্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কোথায় যাইতেছ? বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "জানি না।" সুজন বলিল, "এই খানে ব'স, উপবাসী আছ, কিছু আহার কর। তারপর ইচ্ছা হয় সমস্ত রাত্রি ঘুরিও। একটী কথার উত্তর দিবে কি? তোমার কি আর প্রতিহিংসার ইচ্ছা নাই?" বীরেন্দ্র বলিল, "না।" সুজন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ভোজবাজি—ভোজবাজি!" বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ভোজবাজি কি?" সুজন, অক্কা বক্কাকে দেখাইয়া পরিচয় দিল। ইহারা দুজন ডাকাত আর আমি কসাই—মানুষ, গরু মারা আমার ব্যবসা। কিন্তু এরা বলে, আর ডাকাতী করিব না। আমিও বলি, আর মানুষ, গরু মারিব না। তোমারও দেখিতে পাই সংকল্প ফিরিয়াছে; ভোজবাজি নয়ত কি বলিব?

রাজকুমার বীরেন্দ্রের ঐ কুৎসিৎপ্রকৃতি দস্যুদ্বয় ও কসাইকে পূর্ব্ব বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল, যে চ্যাটায় বসিতে দিয়াছে, তাহা সিংহাসন অপেক্ষা শুভকর, মোটা রুটী লবণহীন বিচুটি পাতার ঘণ্ট উপাদেয়, জ্ঞান হইতে লাগিল। ভোজনান্তে আকাশতলে বসিয়া চারিজন পরস্পর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধা বলিতে লাগিল, "আমার গৃহস্থের ঘরে জন্ম—মধ্যম সন্তান। ছোট ভাইকে মা আদর করিতেন। দাদাকে বাবা যত্ন করিতেন; কিন্তু আমি পিতা-মাতার কাহারও বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলাম না। বাল্যকালে মনে মনে রিষ হইত। কিন্তু একটী ভগ্নী ছিল—আমার ছোট। বাপ মা উভয়েই জানিতেন, সে আমাকে দেখিতে পারে না। কিন্তু আমি তার প্রাণের স্বরূপ ছিলাম। আমারও দুর্ম্মতির অভাব ছিল না। সৃষ্টির লোকের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতাম, বেত খাইতাম, অনাহারে ঘরে বন্ধ থাকিতাম। অনাহারে রাখিয়া পিতামাতা ও অন্য দুই ভাই সুখে নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু অনেক রাত্রে বোনটী চুপি চুপি আসিয়া জানালা ঠেলিত, দেখিতাম, তাহার আহারের সামগ্রী হইতে চুরি করিয়া, কিঞ্চিৎ সরাইয়া রাখিয়াছে, সেই খাবার আমার জানালা গলাইয়া দিত। দেখিতাম—তাহার চক্ষে জল পড়িতেছে। মধুরভাষিণী বলিত, "তুই কেন অকর্ম্ম করিস্? আহা কত মার খাইয়াছিস্! একদিন কি মারা পড়িবি?"—বলিতে বলিতে তাহার বুক ভাসিয়া যাইত! কিন্তু আমার যত তর্জ্জন গর্জ্জন তাহারই উপর ছিল! "তোর কি, আমি খাব না, খুন করিব" এইরূপ কথাই সর্বদা প্রয়োগ করিতাম। এইরূপে কতক দিন যায়। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর। সেই ভগ্নীটীর বিবাহের কথা উত্থাপন হইল। কুলীন—যোগ্য ঘর মিলে না, যদি মিলে ত পনের খাঁই বেশী। তার উপর আমার বাবা বড় তেজী। জামাতার জানু স্পর্শ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে,—এই চিন্তা তাঁহার মর্ম্মান্তিক হইত। দিন দিন ভগ্নীটী অরক্ষণী হইয়া উঠিল—জাতি ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম। পল্লীর লোকে বিদ্রূপ করে, পিতার দুঃখের সীমা নাই। পিতার দুঃখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম দুঃখিত। একদিন বাপ বেটায় কথা হইতেছে। শুনিলাম,—পিতা কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছেন, কন্যাটী মরুক! জ্যেষ্ঠ ভাই বাবাকে সলা দিতেছেন—"মেরে ফেলিলেই ত আপদ চুকে।" বাবা বলেন, "সেও কি হয়?" ভাই বলেন "কেন? তোমার কোন কোথায় থাকিবার কায নাই।" কথা শুনিবামাত্র আমার মস্তিষ্ক বিকল হইল, ক্রোধে অধীর হইলাম! আমি ভাইকে গালি দিয়া বলিলাম, "নিষ্ঠুর দস্যু! তোরে আমি বধ করিব!" জ্যেষ্ঠ ভাই বলবান্, আমায় আক্রমণ করিল, নির্দ্দয় করিয়া মারিতে লাগিল। প্রাণ ওষ্ঠাগত—তবু ছাড়ে না। কোনরূপে হাত ছাড়াইয়া, একটী কুঠার তথায় ছিল, সেই কুঠার দ্বারা আঘাত করিলাম,—এক ঘায়েই পঞ্চত্ব! আমি ভয়ে পলায়ন করিলাম। কোন নিভৃত স্থানে গাছে উঠিয়া রহিলাম; কিন্তু আপনার ভাবনা যত হোক না হোক, আমার ভগ্নীর নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইলাম। রজনী-যোগে চোরের ন্যায় গৃহ প্রবেশ করিলাম। পুত্রবিয়োগে কাতর পিতা মাতা আমার ভগ্নীটীকে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া শোকের কতকটা শান্তি করিয়াছেন। যে ঘর আমার বন্দীগৃহ ছিল, সেই ঘরে তাহাকে বন্দী করিয়াছেন,—পিপাসায় জল পর্য্যন্ত পায় নাই! ভগ্নী আমার সাড়া পাইয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল, "অন্ধা, তুই পালা, আমার জন্য ভাবিস্ না, আমি যে মার খাইয়াছি, তাতে আর আমি বাঁচিব না। তোকে ধরিতে পারিলে মারিয়া ফেলিবে। তুই যেথা হয় পলাইয়া যা! আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না। পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক! বোধ হয় আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই—তুই পালা!" আমি কাপড় ভিজাইয়া আনিলাম, কিন্তু আর তাহার সাড়া পাইলাম না। বুঝিলাম, ভগ্নীটী মরিয়াছে! সে সময়ে হৃদয়ের ভাব যে কি হইয়াছিল, তাহা

এখন আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না। একেবারে মমতাবর্জ্জিত হইলাম। দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই—চলিতেছি! অকস্মাৎ দুই তিনজন আমাকে ধরিল। তাহারা দস্যু। নরবলির প্রয়োজন, তাই আমাকে ধরিয়াছে। সর্দ্দারের কাছে লইয়া গেল, আমি হঠাৎ সর্দ্দারকে বলিলাম, "যদি নরবলি দিতে চাও, অনেক নর পাইবে, কিন্তু আমার ন্যায় ডাকাত কোথাও পাইবে না"। ক্রমশঃ]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

ভাষ্য-মূল।—অথবা যুক্ত এবাত্র তদ্ধিতার্থঃ যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু।

লোকে তাবৎ অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ ইত্যুচ্যতে। ভক্ষ্যং চ নাম ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে, শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তুং, তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইদং ভক্ষ্যমিদমভক্ষ্যমিতি। তথা খেদাৎ স্ত্রীষু প্রবৃত্তির্ভবতি। সমানশ্চ খেদবিগমো গম্যায়াং চাগম্যায়াঞ্চ, তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইয়ং গম্যা ইয়মগম্যেতি। বেদে খল্বপি। পয়োব্রতো ব্রাহ্মণো যবাগূব্রতো রাজন্য আমিক্ষাব্রতো বৈশ্য ইত্যুচ্যতে। ব্রতং চ নামাভ্যবহারার্থম্ উপাদীয়তে। শক্যং চানেন শালিমাংসাদীন্যপি ব্রতয়িতুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে। তথা বৈল্বঃ খাদিরো বা যূপঃ স্যাদিত্যুচ্যতে। যূপশ্চ নাম পশ্বনুবন্ধার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন যৎকিঞ্চিদেব কাষ্ঠমুচ্ছ্রিত্যানুচ্ছ্রিত্য বা পশুরনুবন্ধুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে। তথা অগ্নৌ কপালান্যধিশ্রিত্যাভিমন্ত্রয়তে। "ভৃগূনাম্ অঙ্গিরসাম্ ঘর্ম্মস্য তপসা তপ্যধ্বম্ ইতি। অন্তরেণাপি মন্ত্রমগ্নির্দহনকর্ম্মা কপালানি সন্তাপয়তি। তত্র চ নিয়মঃ ক্রিয়তে। এবং ক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভবতীতি।†

বঙ্গানুবাদ।—অথবা তদ্ধিতার্থ এইস্থলে যুক্তই হইয়াছে, যেমন লৌকিক ও বৈদিক বিষয়েতে (১)। লোকে ইহা উক্ত হয় যে, গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য, গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য; ভক্ষ্য দ্রব্যকে ক্ষুধাবিনাশের নিমিত্ত গ্রহণ করা হয়। কুক্কুরমাংসাদি দ্বারাও ক্ষুধাবিনাশ করিতে পারা যায়, সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন, ইহা ভক্ষ্য এবং ইহা অভক্ষ্য; তদ্রূপ খেদ অর্থাৎ রাগবশতঃই স্ত্রীসংসর্গে প্রবৃত্তি হয়, গম্যা এবং অগম্যা স্ত্রীতে খেদ (রাগ) সমানই, তথাপি নিয়ম করিতেছেন, এই স্ত্রী গম্যা এই স্ত্রী অগম্যা। বেদেও ব্রাহ্মণ পয়ঃ অর্থাৎ জল বা দুগ্ধ দ্বারা ব্রত করিবেন, ক্ষত্রিয় যবাগু অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্যবিশেষ দ্বারা ব্রত করিবেন, এবং বৈশ্য আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা

* চৈত্র, ১৩৮১ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

† ইহার অব্যবহিত পরবর্তী ভাষ্যের দুইটি বাক্য পরিত্যক্ত দৃষ্ট হয়।—বর্তমান সঃ

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন "লৌকিকঃ স্মৃত্যুপনিবদ্ধঃ, বৈদিকঃ শ্রুত্যুপনিবদ্ধঃ"—স্মৃতিশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ বিষয় লৌকিক বিষয় এবং শ্রুতিশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ বিষয়ই বৈদিক বিষয়।

দ্বারা ব্রত করিবেন, এইরূপ উক্ত আছে। ব্রত অভ্যবহার অর্থাৎ ভোজনের নিমিত্তই গৃহীত হয়. ইহাও পারা যায়,—অন্ন-মাংসাদি দ্বারাও ব্রত করিতে পারা যায়। সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন। তদ্রূপ যূপ 'বৈল্ব' অর্থাৎ বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিত অথবা খাদির অর্থাৎ খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে, ইহা উক্ত আছে। যূপ পশুবন্ধনের নিমিত্তই গৃহীত হয়। ইহাও পারা যায়—যে কোন একটী কাষ্ঠকে উন্নত করিয়া বা উন্নত না করিয়া পশু বন্ধন করিতে পারা যায়। সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন। তদ্রূপ অগ্নিতে কপাল অর্থাৎ সরাবাদি আরোপিত করিয়া মন্ত্রপাঠ করা হয়। "ভৃগূণাম্ অঙ্গিরসাং ঘর্ম্মস্য তপসা তপ্যধ্বম্" ভৃগুগণের ও অঙ্গিরঃসমূহের তেজের উত্তাপ দ্বারায় উত্তপ্ত হও। অগ্নি দাহকারীমন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকেও কপালসমূহকে সন্তাপিত করেন। সেই বিষয়েও নিয়ম করিতেছেন, এইরূপ করা হইলে তাহা মঙ্গলকারী হয়।

ভাষ্য-মূল।— অস্ত্যপ্রযুক্তঃ। সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ। তদ্‌যথা,—"ঊষ" "তেরু" "চক্র" "পেচ" ইতি। কিমতো যৎ সন্ত্যপ্রযুক্তাঃ। প্রয়োগাদ্ধি ভবান্ শব্দানাং সাধুত্বমধ্যবস্যতি। য ইদানীমপ্রযুক্তা নামী সাধবঃ স্যুঃ। ইদং তাবৎ বিপ্রতিষিদ্ধং যদুচ্যতে সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। যদি সন্তি নাপ্রযুক্তা। অথাপ্রযুক্তা ন সন্তি। সন্তি চাপ্রযুক্তাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্ প্রযুঞ্জান এব খলু ভবানাহ—সন্তি শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাৎ। নৈতদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্। সন্তীতি তাবৎ ব্রূমঃ। যদেতান্ শাস্ত্রবিদঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে। অপ্রযুক্তা ইতি ব্রূমঃ। যল্লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অপ্রযুক্ত আছে। অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। যেমন, "ঊষ" "তেরু" "চক্র" "পেচ" ইত্যাদি। ইহা হইতে কি হয়, যে অপ্রযুক্ত শব্দ আছে? (অর্থাৎ অপ্রযুক্ত শব্দ আছে ইহাতে ক্ষতি কি?) প্রয়োগ অবলম্বন করিয়াই আপনি শব্দসমূহের সাধুত্ব স্থির করিতেছেন। যে শব্দসকল এক্ষণে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ এক্ষণে যাহাদিগের প্রয়োগ হয় না) তাহারা সাধু শব্দ নহে। ইহা অতি বিপরীত কথা, আপনি যে বলিতেছেন, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। যদি অপ্রযুক্ত না থাকে তবে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ প্রয়োগের অযোগ্য) শব্দই থাকিতে পারে না। আছে, কিন্তু অপ্রযুক্ত ইহা বিপরীত কথা। আপনিই প্রয়োগ করিতেছেন, আপনিই বলিতেছেন, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। এক্ষণে আপনার ন্যায় অপর কোন ব্যক্তি শব্দসমূহের প্রয়োগে সাধু হইতে পারেন। ইহা বিরুদ্ধ কথা নহে, (অপ্রযুক্ত শব্দ) আছে ইহা বলিব। যেহেতু, এই অপ্রযুক্ত শব্দসকলকে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। যে সকল শব্দ লোকে অপ্রযুক্ত, (অর্থাৎ প্রয়োগ হয় না) তাহাদিগকেই অপ্রযুক্ত বলিতেছি।

ভাষ্য-মূল।—যদপ্যুচ্যতে— কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাদিতি। ন ব্রুমোঽস্মাভিরপ্রযুক্তা ইতি। কিং তর্হি? লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি। নন্বু চ ভবানপ্যভ্যন্তরো লোকে। অভ্যন্তরোঽহং লোকে ন ত্বহং লোকঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যাহা বলা হইল,—"এক্ষণে আপনার ন্যায় অপর কোন ব্যক্তি শব্দসমূহের প্রয়োগে সাধু হইতে পারেন" ইহা বলিতেছি না,—আমাদিগ কর্ত্তৃক অপ্রযুক্ত। তবে কি, যাহা লোকে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ আমরা প্রয়োগ না করিলেই অপ্রযুক্ত হয় না, কিন্তু লোকে যাহা প্রয়োগ

করে না। তাহাই অপ্রযুক্ত শব্দ)। যদি বলেন, তুমিও লোকের অভ্যন্তর। আমি লোকের অভ্যন্তর বটে, কিন্তু, আমি লোক নহি (১)।

ভাষ্য-মূল।—অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ* (২)। অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেৎ, তন্ন। কিং কারণম্? অর্থে শব্দপ্রয়োগাৎ। অর্থে শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। সন্তি চৈষাং শব্দানামর্থা যেষ্বর্থেষু প্রযুজ্যন্তে।

বঙ্গানুবাদ।—অপ্রযুক্ত আছে, ইহা যদি বল, তাহা নহে; অর্থে শব্দ প্রয়োগ হয়।

যদি বল, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে তাহা নাই; কি কারণে নাই? অর্থে শব্দ প্রয়োগ হয় এই কারণবশতঃ নাই। অর্থে শব্দ প্রয়োগ হয়। এই সকল শব্দের অর্থ আছে, যে সকল অর্থে ইহাদের প্রয়োগ করা হয়।

ভাষ্য-মূল।—অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ*।

অপ্রয়োগঃ খল্বপ্যেষাং শব্দানাং ন্যায্যঃ। কুতঃ? প্রয়োগান্যত্বাৎ। যদেতেষাং শব্দানামর্থে অন্যান্ শব্দান্ প্রযুঞ্জ্যন্তে। তদ্‌যথা,—উষেত্যস্য শব্দস্যার্থে ক যূয়মুষিতাঃ, তেরেত্যস্যার্থে ক যূয়ং তীর্ণাঃ, চক্রেত্যস্যার্থে ক যূয়ং কৃতবন্তঃ, পেচেত্যস্যার্থে ক যূয়ং পক্কবন্ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অপর অর্থে প্রয়োগ করা হয়; অতএব অপ্রয়োগ (অর্থাৎ প্রয়োগ না হওয়াই) উচিত।

এই সকল শব্দের প্রয়োগ না হওয়াই ন্যায্য। কি হেতু? অপর অর্থে প্রয়োগ হয়, এই হেতু। যেহেতু, এই সকল শব্দের অর্থে অপর শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন, "উষ" এই শব্দের অর্থে "ক যূয়মুষিতাঃ" অর্থাৎ "কোথায় তোমরা বাস করিয়াছ," "তের" এই শব্দের অর্থে "ক যূয়ং তীর্ণাঃ" "কোথায় তোমরা তীর্ণ হইয়াছ," "চক্র" এই শব্দের অর্থে "ক যূয়ং পক্কবন্তঃ" "কোথায় তোমরা পাক করিয়াছ" ইত্যাদি।

ভাষ্য-মূল—অপ্রযুক্তে দীর্ঘসত্রবৎ *।

যদ্যপ্যপ্রযুক্তা অবশ্যং দীর্ঘসত্রবল্লক্ষণেনানুবিধেয়াঃ। তদ্‌যথা, দীর্ঘসত্রাণি বার্ষশতিকানি বার্ষসহস্রিকানি চ, ন চাদ্যত্বে কশ্চিদপি ব্যবহরতি। কেবলমৃষিসম্প্রদায়ো ধর্ম ইতি কৃত্বা যাজ্ঞিকাঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে।

বঙ্গানুবাদ।—অপ্রযুক্তবিষয়ে দীর্ঘসত্রের ন্যায়।

যদিও এই সকল শব্দ অপ্রযুক্ত, তথাপি অবশ্যই দীর্ঘসত্রের ন্যায় (অর্থাৎ দীর্ঘকাল-সম্পাদ্য যজ্ঞের ন্যায়) লক্ষণ দ্বারা স্থির করিতে হইবে। যেমন,—দীর্ঘসত্রসকল শতবর্ষ-সম্পাদ্য ও সহস্রবর্ষ-সম্পাদ্য; এক্ষণে কেহই তাহা অনুষ্ঠান করে না। কেবল ঋষি-সম্প্রদায়-প্রচলিত (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে প্রচলিত) ধর্ম্ম, এই নিমিত্তই যাজ্ঞিকগণ শাস্ত্র দ্বারা অনুবিধান করেন (অর্থাৎ এই দীর্ঘসত্র এক্ষণে কেবল বেদেই পঠিত হয়)।

ভাষ্য-মূল।— সর্ব্বে দেশান্তরে *।

(১) 'ভুবন' এই অর্থেও লোকশব্দের প্রয়োগ হয়। "লোকস্তু ভুবনে জনে" (লোকশব্দে অর্থ—ভুবন ও জন) ইত্যমরঃ।

(২) কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকের পরে * এই তারকা চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

সর্ব্বে খল্বপ্যেতে শব্দা দেশান্তরেষু প্রযুজ্যন্তে। নচৈবোপলভ্যন্তে। উপলব্ধৌ যত্নঃ ক্রিয়তাম্। মহান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্তদ্বীপা বসুমতী, ত্রয়ো লোকাঃ, চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যাঃ বহুধা ভিন্নাঃ—একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ, সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ, একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং, নবধাথর্ব্বণোবেদঃ বাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং বৈদ্যকমিত্যেতাবান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। এতাবন্তং শব্দস্য প্রয়োগবিষয়মননুনিশম্য সন্ত্যপ্রযুক্তা ইতি বচনং কেবলং সাহসমাত্রমেব। এতস্মিংশ্চাতিমহতি শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ে তে তে শব্দাস্তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা,—শবতির্গতিকর্ম্মা কম্বোজেষেব ভাষিতো ভবতি, বিকার এনমার্য্যা ভাষন্তে শব ইতি। হম্মতিঃ সুরাষ্ট্রেষু, রংহতি প্রাচ্যমধ্যেষু, গমিমেব ত্বার্য্যাঃ প্রযুঞ্জতে। দাতির্লবণার্থে প্রাচ্যেষু, দাত্রমুদীচ্যেষু। যে চাপ্যেতে ভবতোঽপ্রযুক্তা অভিমতাঃ শব্দা এতেষামপি প্রয়োগো দৃশ্যতে। ক? বেদে। তদ্‌ যথা,—"সপ্তাস্যে রেবতীরেবদূষ, যদ্বোরেবতী রেবত্যাং তমূষ, যস্মে নরঃ শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র, যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্" ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—সকলেই দেশান্তরে প্রযুক্ত হয়।

এই সকল শব্দই ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে না। উপলব্ধি বিষয়ে যত্ন কর। শব্দের প্রয়োগের বিষয় মহান্ (অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক)। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টী অঙ্গের সহিত ও রহস্যের সহিত সাম, যজুঃ, ঋক্ ও অথর্ব এই চারিবেদ, বহু প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন; অধ্বর্য্যুর (অর্থাৎ যজুর্বেদের) শাখা একশত, সামবেদের শাখা সহস্র, বাহ্বৃচ্য (অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ) একবিংশতি প্রকার, অথর্ব্ববেদ নয় প্রকার, বাকোবাক্য (১) ইতিহাস (২), পুরাণ ও বৈদ্যক (অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র) এতগুলি শব্দের প্রয়োগের বিষয়। এতগুলি শব্দের প্রয়োগবিষয়ে শিক্ষালাভ না করিয়া অপ্রযুক্ত শব্দ আছে, ইহা বলা কেবল সাহসমাত্রই। এই অত্যধিক শব্দের প্রয়োগবিষয়ে সেই শব্দসকল সেই সকল শাস্ত্রে নিয়তবিষয় হইয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—'শব' ধাতু গতিকর্ম্মক (অর্থাৎ গমনার্থক) ইহা কম্বোজ দেশেই পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু আর্য্যগণ ইহাকে বিকারার্থই কহিয়া থাকেন, যথা,—শব (মৃতদেহ)। সুরাষ্ট্রদেশে 'হম্ম' ধাতু ও প্রাচ্য মধ্যদেশে 'রংহ' ধাতু ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আর্য্যগণ এই স্থলে 'গম্' ধাতুরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রাচ্যদেশে 'দা' (অদাদি-গণীয়) ছেদনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উদীচ্যদেশেও 'দাত্র' প্রয়োগ হইয়া থাকে। আপনার অভিমতে এই যে সকল শব্দ অপ্রযুক্ত ইহাদিগেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কোথায়? বেদে।

তদ্ যথা,—"সপ্তাস্তে রেবতীরেবদূষ, যদ্বোরেবতী রেবত্যাং তমূষ, যস্মে নরঃ শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র, যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্" ইতি এই মন্ত্রে উষ ও চক্র এই দুইটী প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহারা অপ্রযুক্ত নহে। [ক্রমশঃ]

---

(১) "বাকোবাক্যশব্দেনোক্তিপ্রত্যুক্তিরূপোগ্রন্থ উচ্যতে" ইতি কৈয়টঃ। উক্তিপ্রত্যুক্তি-রূপগ্রন্থকে বাকোবাক্য কহে।

(২) "পূর্ব্বচরিতসঙ্কীর্ত্তনমিতিহাসঃ।" পূর্ব্বতন লোকের চরিত্রবর্ণনাকে ইতিহাস কহে।

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

দিব্য বাণী

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥
নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা ॥
তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্ ॥

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।৫, ১১, ১২

যাহা কিছু দেখি শুনি, যাহা কিছু আছে বিশ্ব-মাঝে
অন্তর বাহির তার সব জুড়ি নারায়ণ রাজে।
নীল জলদের গায়ে বিজলীর রেখা সম ভাতি,
নীবার-শিষের সম পীতবর্ণ অণু-পরিমিতি—
সেই (আত্ম-) শিখা মাঝে পরমাত্মা পরম স্বরাট ;
তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব, হরি, ইন্দ্র—অক্ষর বিরাট।

কথাপ্রসঙ্গে

রামানুজীয় মতবাদের উৎসসন্ধানে

যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা এবং শংকরাচার্যের ভাষ্যাদির সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন স্বামীজী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইলেও উপনিষদের ব্যাখ্যায় সর্বত্র আচার্য শংকরকে অনুসরণ করেন নাই। মাদ্রাজে একবার এক ব্যক্তি স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন যে, স্বামীজী যে-কথা বলিলেন, তাহা শংকরানুগ নহে। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিলেন: 'শংকরাচার্যও একজন মানুষ ছিলেন, তুমিও মানুষ, সুতরাং নিজেই চিন্তা করিয়া দেখিতে পার।' টীকা-ভাষ্যের একদেশী ভাবধারার দ্বারা পূর্ব-প্রভাবিত না হইয়া স্বাধীনভাবে মূল উপনিষদ ব্রহ্মসূত্র আদি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িতে স্বামীজী বিদ্যোৎসাহীদের অনুপ্রাণিত করিতেন, কারণ তাঁহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ইহাই ছিল যে, উপনিষদসমূহে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা বিদ্যমান, কিন্তু পূর্বাচার্যগণ নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ঐ সত্যটিকে উপেক্ষা করিয়া উপনিষদগুলি যে একই মতবাদের পোষক এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তদনুযায়ী ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন।

ইহা অতীব সত্য যে, টীকা-ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র স্বপ্রযত্নে দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদের মর্মোদ্ধার করা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। প্রাচীন মনস্বী ব্যাখ্যাকারদের সাহায্য আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু, নিজেদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়া নহে। মহান চিন্তানায়ক ও মানুষের স্বাধীন চিন্তার পরিপূর্ণ মর্যাদাদায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পন্থায় উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে কোন্‌টিতে অদ্বৈতবাদ, কোন্‌টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কোন্‌টিতে ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি বিদ্যমান, তাহা নিজস্ব মননের আলোকে আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাওয়াই সমীচীন পন্থা। এবং এই পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর হইলে আমরা দেখিব, শুধু যে বিভিন্ন উপনিষদেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা বিদ্যমান তাহা নহে, এমন কি একই উপনিষদ বিভিন্ন মতবাদের উৎসস্বরূপ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে আমরা অদ্বৈতবাদের একটি নিখুঁত চিত্র পাই। সমস্ত দার্শনিক মতবাদের শীর্ষস্থানীয় অদ্বৈতবাদের এই সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্রটি যাহাতে কোনও প্রকারে কালবশে বিলুপ্ত না হয়, মনে হয়, সেই উদ্দেশ্যে শ্রুতিসমূহের ধারক মহান স্মৃতিধরগণও ঐ সংবাদটিকে বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুইবার উপস্থাপিত না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ফলতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত ঐ সংবাদটি চতুর্থ অধ্যায়েও পুনরাবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের শেষাংশে বলা হইয়াছে, 'যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি…'—যেখানে দ্বৈতের ন্যায় হয়, সেখানে একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু, যখন আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সমস্তই আত্মা হইয়া গেল, তখন কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে,

কে কি দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কি দিয়া কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কি দিয়া কাহাকে বলিবে ইত্যাদি। এখানে উল্লিখিত 'ইব'-শব্দটির লক্ষণীয় প্রয়োগের দ্বারা পরিষ্কার বোঝান হইয়াছে যে, দ্বৈতব্যবহার সমস্তই মিথ্যা—পারমার্থিক সত্য নহে। এক আত্মাই পারমার্থিক সত্য। সুতরাং এই যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদটিকে আচার্য শংকরের মতবাদের ভিত্তিস্থানীয় বলা যাইতে পারে।

এই বৃহদারণ্যক উপনিষদেরই তৃতীয় অধ্যায়ের 'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত সপ্তম ব্রাহ্মণের উল্লেখ আচার্য রামানুজের রচনাবলীতে আমরা বারংবার পাই। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ'—যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তঃস্থলে অবস্থিত, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া উহাকে নিয়মন করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা।

ইহার পর ঐ একই বাক্যে শুধু 'পৃথিবী' শব্দটির পরিবর্তে একের পর আর—'অপ্', 'অগ্নি' ইত্যাদি আরও ২৩টি পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। ২৪-তম পদার্থটি আত্মা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই উপনিষদের দুই প্রকার পাঠ আছে—কাণ্ব শাখার পাঠ ও মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ। আচার্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে কাণ্ব শাখার পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই শাখায় মাধ্যন্দিন শাখায় উক্ত ২৪-তম পদার্থ 'আত্মা'র উল্লেখ নাই। ইহাতে ভাষ্যকার শংকরাচার্যকে ব্যাখ্যা করিতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। আচার্য রামানুজ মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই পাঠের ২৪-তম বাক্যে সর্বশেষ পদার্থরূপে 'আত্মা'র উল্লেখ থাকায় নিজ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার খুবই সুবিধা হইয়াছে। যদিও তিনি কোনও উপনিষদেরই ভাষ্য রচনা করেন নাই, তথাপি তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যে, গীতাভাষ্যে ও অন্যান্য রচনাবলীতে মাধ্যন্দিন শাখার উল্লিখিত অন্তিম বাক্যটি তিনি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আচার্য রামানুজ কর্তৃক গৃহীত বৃহদারণ্যক উপনিষদের মাধ্যন্দিন শাখার এই অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা পাই: পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি যাবতীয় অচেতন পদার্থে এবং চেতন আত্মাতেও পরমাত্মা বিরাজ-মান; এই সকল অচিৎ বা জড় বস্তু এবং চিৎ বা চেতন আত্মা পরমাত্মাকে জানিতে পারে না, ইহারা সকলেই পরমাত্মার শরীর, পরমাত্মা ইহাদের অন্তর্যামী এবং নিয়মন-কর্তা; ফলতঃ পরমাত্মা চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থে অনুস্যূত থাকিলেও সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্। নিষ্কর্ষ ইহাই যে, তিনি সমস্ত জীবের আরাধ্য।

আমরা অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের পূর্বোক্ত প্রথম বাক্যটিতে যে 'আত্মা'-শব্দটি পাই, রামানুজ তাহার অর্থ করিয়াছেন 'পরমাত্মা'। এবং পরবর্তী প্রত্যেকটি বাক্যেই ঐ একই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মাধ্যন্দিন পাঠ অনুযায়ী ইহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে, কারণ ঐ পাঠের সর্বশেষে আছে—যাহার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি - 'যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনঃ অন্তরঃ, যম্ আত্মা ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরম্, যঃ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি, স তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।'—যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তঃস্থলে অবস্থিত, যাঁহাকে আত্মা জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া উহাকে নিয়মন করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ

আত্মা। এই বাক্যটির কোনই অর্থ হয় না, যদি না আমরা শেষোক্ত 'আত্মা'-শব্দটিকে 'পরমাত্মা' অর্থে গ্রহণ করি।

আচার্য রামানুজ তাঁহার মতবাদের সমর্থনে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের এই মাধ্যন্দিন পাঠের অতিরিক্ত অন্যান্য উপনিষদ হইতেও বিস্তর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে উহার কয়েকটি উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:

"'ভোক্তা' অর্থাৎ জীবাত্মা, 'ভোগ্য' অর্থাৎ অচেতন পদার্থসমূহ এবং 'প্রেরিতা' অর্থাৎ নিয়ন্তা পরমাত্মা—জ্ঞানিগণের কথিত এই ত্রিরূপ ব্রহ্মকে অন্তর্যামিরূপে নিজ আত্মায় নিত্য অবস্থিত জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না।"[১]

"আত্মাকে পৃথক্ এবং প্রেরক পরমাত্মাকে পৃথক্ জানিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে।"[২]

"যিনি অচেতন প্রকৃতির এবং চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের পতি সেই গুণেশ্বর সংসার হইতে মুক্তির কারণ ও সংসারে স্থিতিরূপ বন্ধনেরও কারণ।"[৩]

আচার্য রামানুজ তাঁহার মতবাদের সপক্ষে গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ হইতেও বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই সকল উদ্ধৃতিতে পরমাত্মা যে জড় ও চেতনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাদের নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহা পরিষ্কার বলা হইয়াছে। কিন্তু রামানুজীয় মতবাদের একটি বিশেষ কথা—যাবতীয় জড় পদার্থ ও চেতন আত্মাসমূহ পরমাত্মার 'শরীর'—ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ ঐ সকল উদ্ধৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষান্তরে 'শরীর'-কথাটি ২৪ বার বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের মাধ্যন্দিন শাখাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণকেই রামানুজীয় মতবাদের মূল উৎস বলা যাইতে পারে।

সুবাল উপনিষদে অবশ্য 'শরীর'-কথাটির উল্লেখ আছে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের বাচন-শৈলীরও কিছুটা অনুবর্তন সেখানে পরিলক্ষিত হয়[৪], কিন্তু যেভাবে অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে 'শরীর'-কথাটি ২৪ বার ব্যবহৃত হইয়া আমাদের মনের মধ্যে রামানুজীয় মতবাদকে—জীবজগৎ ও পরমাত্মার শরীর-শরীরী সম্বন্ধকে—বদ্ধমূল করে, এইরূপ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং রামানুজীয় মতবাদের উৎসসন্ধানে যাত্রা শুরু করিয়া প্রাচীনতম উপনিষদগুলির অন্যতম বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণেই আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হই, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

---

১ এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং/নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা/সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ (১।১২)

২ পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা/জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ (১।৬)

৩ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি র্গুণেশঃ/সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ (৬।১৬)

৪ 'অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়াম্ অজঃ একঃ নিত্যঃ যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তরে সংচরন্, যং পৃথিবী ন বেদ।' ইত্যাদি—সুবাল উপনিষৎ, ৭ম খণ্ড।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : ননু স্বপ্রয়োজনরহিতে জগৎসর্জনাদৌ প্রবৃত্তস্য ঈশ্বরস্য উন্মত্তবৎ প্রেক্ষাকারিত্বাভাব-প্রসঙ্গাৎ স্বপ্রয়োজনোদ্দেশেন চ প্রবৃত্তস্য নিত্যতৃপ্তত্বব্যাহতেঃ চ ন ঈশ্বরঃ জগৎস্রষ্টা ইতি আশঙ্ক্য আহ—**যশ্চানন্দ** ইতি। নিরন্তর-ভাসমানানবচ্ছিন্ন-পরমানন্দস্বরূপঃ। 'আনন্দো ব্রহ্ম' (তৈ. উ ৩।৬), 'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম' (বৃ. উ. ৩।৯।২৮), 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' (বৃ. উ. ৪।৩।৩২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ আপ্তকামস্য ঈশ্বরস্য প্রাপ্তব্য-বস্ত্বভাবাৎ ন নিত্যতৃপ্তত্ব-হানিঃ ইতি অর্থঃ। লোকে সার্বভৌমাদেঃ প্রেক্ষাকারিণঃ প্রয়োজনোদ্দেশং বিনা অপি মৃগয়াদৌ প্রবৃত্তস্য উন্মত্তত্বাদর্শনাৎ প্রাণিকর্মানুরোধেন জগৎ-সর্জনাদৌ প্রবৃত্তেঃ ঈশ্বরস্য স্বভাবত্বাৎ স্বভাবে চ পর্যনুযোগাভাবাৎ ন উন্মত্তঃ ঈশ্বরঃ।

বাদরায়ণঃ অপি 'ন প্রয়োজনবত্ত্বাদিতি (ব্র. সূ. ২।১।৩২), অনেন সূত্রেণ প্রবৃত্তেঃ চ লোকে প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ঈশ্বরস্য চ তদভাবাৎ ন স্রষ্টা ইতি আশঙ্ক্য 'লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্' (ব্র. সূ. ২।১।৩৩) ইতি অনেন লোকে রাজাদিবৎ ঈশ্বরস্য অপি লীলায়াঃ জগৎ-সর্জনাদি-রূপায়াঃ কৈবল্যং প্রয়োজনরাহিত্যম্ উপপদ্যতে ইতি সমাদধে। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ স্রষ্টা এব ইতি ভাবঃ।

ননু লোকে কুলালাদেঃ স্রষ্টুঃ শরীরযুক্তস্য ঘটাদি-প্রয়োজন-পরিজ্ঞানিনঃ বাহ্য-মৃদাদ্যুপসংহার-পূর্বকম্ এব সর্জনে প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ ব্রহ্মণঃ চ নির্বিকল্পস্য অশরীরস্য অত এব অসমর্থস্য সৃষ্টি-প্রয়োজনাপরিজ্ঞানিনঃ স্বব্যতিরিক্ত-পদার্থাভাবেন বাহ্য-সাধন-রহিতস্য কথং স্রষ্টৃত্বম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ—**অনন্তগুণ** ইতি। অনন্তাঃ অসংখ্যাতাঃ সর্বশক্তিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদয়ঃ গুণাঃ ধর্মাঃ যস্য সঃ। তত্র হেতুম্ আহ—**গুণধামা** ইতি। শুদ্ধসত্ত্বরূপা মায়া গুণধাম গৃহম্ উপাধিঃ যস্য সঃ ইতি অর্থঃ।

অনুবাদ : (শঙ্কা) নিজের প্রয়োজনরহিত জগৎ-সৃষ্টি আদি কার্যে ঈশ্বর প্রবৃত্ত হন, একথা বলিলে উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় তাঁহার বিচারপূর্বক কর্ম-সম্পাদনের অভাবের প্রসঙ্গ হয়; পক্ষান্তরে নিজের কোন প্রয়োজনবশতই যদি তিনি (জগৎ-সৃষ্টি আদি কার্যে) প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিত্যতৃপ্তত্ব ব্যাহত হইবে। অতএব ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা নহেন—এই আশঙ্কার উত্তরে আচার্য বলিতেছেন—**যশ্চানন্দঃ**। তিনি পরমানন্দস্বরূপ— যে পরমানন্দ নিরন্তর প্রকাশমান ও অপরিচ্ছিন্ন। 'আনন্দো ব্রহ্ম···উপজীবন্তি'—'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ', 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', 'এই আনন্দেরই অংশমাত্র সমস্ত জীব উপভোগ করিয়া থাকে'—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আপ্তকাম ঈশ্বরের কোন প্রাপ্তব্য বস্তুই নাই, সুতরাং (জগৎ-সৃষ্টি আদি করিলেও) তাঁহার

নিত্যতৃপ্তত্বের কোন হানি হয় না, ইহাই অর্থ। লৌকিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, বিচারবুদ্ধিপূর্বক কর্মানুষ্ঠানকারী সার্বভৌম অর্থাৎ সম্রাট বিনা প্রয়োজনেও মৃগয়াদিতে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে তাঁহার উন্মত্তত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সেইরূপ প্রাণিকর্মানুরোধে (জীবগণের কর্মানুসারে) জগৎ-সৃষ্টি আদি কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া ঈশ্বরের স্বভাব। যাহা স্বভাব তদ্বিষয়ে দূষণার্থক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর উন্মত্ত নহেন (অর্থাৎ সৃষ্টি আদি কর্মে তাঁহার প্রবৃত্তি উন্মত্তের প্রবৃত্তি নহে)।

(এই বিষয়ে) বাদরায়ণও—'ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ'[১] অর্থাৎ লৌকিক জগতে প্রবৃত্তির প্রতি প্রয়োজনীয়তাই কারণ; ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই, সুতরাং তিনি স্রষ্টা নহেন, সূত্রটির দ্বারা (প্রথমে) এইরূপ আশঙ্কা করিয়া (তাহার পরিহারের নিমিত্ত) 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'[২] অর্থাৎ লৌকিক ক্ষেত্রে রাজা প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরেরও জগৎ-সৃষ্টি আদি লীলা বিনা প্রয়োজনেই উপপন্ন হয়, এই সূত্রের দ্বারা—সমাধান করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরই জগৎস্রষ্টা, ইহাই ভাবার্থ।

(শঙ্কা) লৌকিক ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায় যে, ঘটাদি (নির্মাণে) প্রয়োজন অনুভবকারী শরীরধারী স্রষ্টা কুম্ভকার প্রভৃতি বাহ্য (ঘট নির্মাণ-উপযোগী) মৃত্তিকাদি বস্তু সংগ্রহ করিয়াই নির্মাণকার্যে প্রবৃত্ত হয়; (কিন্তু) ব্রহ্ম নির্বিকল্প (সর্বসংকল্প-বিকল্পরহিত) এবং অশরীরী বলিয়াই সৃষ্টিবিষয়ক-প্রয়োজন-জ্ঞানশূন্য এবং অসমর্থ; (বিশেষতঃ) নিজের অতিরিক্ত (ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া) পদার্থ না থাকায় বাহ্যকরণশূন্য হওয়ায় কেমন করিয়া তাঁহার স্রষ্টৃত্ব সম্ভব ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া (তাহার সমাধানকল্পে আচার্য) বলিতেছেন : **অনন্তগুণঃ**। (অর্থাৎ) সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অনন্ত অর্থাৎ সংখ্যাতীত গুণ যাঁহার, তিনি (ঈশ্বর)। তাহার কারণ বলিতেছেন : **গুণধামা**। শুদ্ধসত্ত্বরূপা মায়া গুণধাম অর্থাৎ গৃহ অর্থাৎ উপাধি যাঁহার, তিনি—ইহাই অর্থ।[৩]

১। ইহা পূর্বপক্ষ-সূত্র। ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। কারণ বিচারশীল ব্যক্তি প্রয়োজনবশতই কর্মে প্রবৃত্ত হন। নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন না থাকায় তাঁহার পক্ষে সৃষ্টিকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। ইহাই সূত্রার্থ।

২। সূত্রস্থ 'তু'-শব্দটি পূর্বপক্ষের পরিহারসূচক। যেমন লৌকিক জগতে রাজা প্রভৃতির ফলের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীতই ক্রীড়া বিলাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তেমনই ব্রহ্মেরও এই বিচিত্র (জগদ্রূপ-) কার্যরচনা কেবল স্বভাবসিদ্ধ লীলামাত্র। ইহাই সূত্রার্থ।

৩। 'গুণধামা'-শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাকার যে সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত তাৎপর্য অপরিস্ফুট থাকে। কারণ নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞত্ব আদি অনন্তগুণযুক্ত কি করিয়া হইবেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই 'গুণধামা'-পদটি স্তোত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব মায়া উপাধি হইলেই ব্রহ্মকে 'ঈশ্বর' বলা হয়। শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই মায়া সর্বজ্ঞত্ব আদি গুণের কারণ। অতএব এইরূপ মায়োপহিত বলিয়াই ব্রহ্ম অনন্তগুণযুক্ত অর্থাৎ 'ঈশ্বর', ইহাই বক্তব্য। সুতরাং 'গুণধামা' এই বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন-পদটির মধ্যে 'গুণ'-শব্দের অর্থ মায়া এবং 'ধাম'-শব্দের অর্থ উপাধি। টীকার ভাষা নিম্নরূপ হইলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয় : গুণঃ মায়া সা এব ধাম উপাধিঃ যস্য সঃ।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[সুরেশকুমার নাহাকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

Sri Hathiramjee Mutt
Ootacamund, S. India
9. 7. 26

শ্রীমান সুরেশচন্দ্র

আজ তোমার প্রীতি প্রেরিত ৩৲ পাইলাম। আমার মনে হয় টাকা দিতে তোমার কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্ট না হয়। কারণ ভক্তদের কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা হয় এরূপ কাজ করা আমাদের মনের ইচ্ছা নয়, বরং সুখ ও আনন্দ যাহাতে তাঁদের আমরা দিতে পারি ঠাকুর দয়া করিয়া আমাদের সেই ক্ষমতা দিন ইহাই তাঁর শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা। প্রার্থনা করি তোমার ও তোমাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি জ্ঞান দিন ২ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং সংসারের কায করিয়া যেন তোমাদের আসক্তি না হয়। অনাসক্ত হইয়া থাক, ঠাকুরের নাম জপ ধ্যান যথাসাধ্য নিয়মিতরূপে করিয়া শান্তিতে থাক। এখানে খুব বৃষ্টি ও সঙ্গে ২ খুব জোর South-West wind দিনরাত বহিতেছে। এই হচ্চে এখানকার S. W. monsoon। এসময় এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়। তবে খুব ঠাণ্ডা আর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার মহা কষ্ট। এত ঠাণ্ডা যে রাত্রে chimney জ্বালতে হয়, যদিও আমরা এখনও জ্বালি নাই তবে শীঘ্রই জ্বালতে হবে বুঝিতেছি। আমাদের শরীর ভাল, তবে আমার বৃদ্ধ শরীর, সর্দ্দি বাত একটু ২ প্রায় লেগেই আছে. তবে ঠাকুরের কৃপায় কষ্টদায়ক নয়। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ জানিবে, ইন্দু, যতীন, শ্রীশ প্রভৃতি সব ভক্তদের জানাবে। সম্ভবত এখানকার ঠাকুরের মঠ ৪ঠা আগষ্টে প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। যেরূপ বর্ষা ও ঝড় হইতেছে তাহাতে মনে হয় হয়তো বিলম্ব হইতেও পারে। আজকাল তো মিস্ত্রির কায কয়দিন থেকে বন্ধ রয়েছে ঝড় বৃষ্টির জন্য। ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা হউক। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

Sri Hathiramjee Mutt
Ootacamund (Madras)
26. 7. 26

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার 20/7 তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার

*শ্রীঅসিতকুমার নাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ

বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি দিন ২ দৃঢ় দৃঢ়তর হইতে থাকুক এবং অনাসক্ত হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য করিয়া যাও। যথাসাধ্য নিত্য নিয়মিতরূপে তাঁর নাম জপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর কাছে প্রার্থনা, নিত্যানিত্য বিচার এসব করিলে আর কখনই সংসারে আসক্তি হইবে না, তাঁর কৃপায় ইহা নিশ্চয় জানিবে। ঠাকুর বড় দয়াল অহৈতুকী কৃপাময়, জীবকে অহৈতুকী দয়া করিবেন বলিয়াই সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার হইয়াছেন, যেমন যুগে ২ আসেন। ইহা নিশ্চয়, ধ্রুব নিশ্চয়। তোমাদের পরম কল্যাণ হইবে, আমি বলিতেছি।

এখানে monsoon এবার কিছু weak, তবে বৃষ্টি হইতেছে, হাওয়াও খুব জোর। স্বাস্থ্য এখানকার এখন ভাল। আমার সর্দ্দি বাত কিছু ২ আছে, তবে তাঁর কৃপায় খুব কষ্টদায়ক নয়। মোটের উপর শরীর ভাল। আর ২ সকলে বেশ ভাল আছেন। ঠাণ্ডা খুব এখানে, তবে **pleasant**। প্রার্থনা, তোমরা সকলে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। ভক্তদের সকলকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। তুমি ও বাড়ীর সকলে জানিও। মঠের কাজ এখনও চলিতেছে, বৃষ্টির জন্য দেরী হইতেছে। যা হোক ঠাকুরের ইচ্ছায় August-এর ভিতরেই সব মায় প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত হইয়া যাইবে, সকলেই আশা করিতেছেন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

Sri Hathiramjee Mutt,
Ootacamund (Madras)
11. 8. 26

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। আমি জানি তুমি প্রভুর কৃপায় নিশ্চয়ই শান্তি অনুভব করিবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার মন ক্রমে উন্নত হউক। এবং আসক্তিশূন্য হইয়া সাংসারিক কর্তব্য পালন করিয়া যাও। তোমরা সকলে ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আরো অধিক ভাল থাক। আমি ও আমরা সকলে ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছি। এখানকার মঠের কায অতিশয় বৃষ্টি হওয়ার জন্য কিছুদিন বন্ধ আছে, এখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাঁর ইচ্ছায় শীঘ্রই হইবে। একটু বৃষ্টি থামিয়া ২।৪ দিন রৌদ্র হইলেই আবার কায আরম্ভ হবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে, বাড়ীতে দিবে এবং ইন্দু ইত্যাদি সমস্ত ভক্তদের দিবে। যতীন, ঘটক প্রভৃতি সকলকে দিও। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

Godavari House, Ootacamund

7. 9. 26

শ্রীমান সুরেশকুমার

আজ তোমার প্রেরিত ৩৲ টাকা পাইয়া আনন্দ হইল। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, বিবেক-বিচার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক। এবং সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া তাঁকে স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক।

এখানকার ভক্তেরা যে ঠাকুরের মঠটী করিতেছেন তাহার নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁরা গৃহপ্রবেশ যজ্ঞাদি সামান্যভাবে করিবেন। আমরা অক্টোবরের প্রথমেই বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে বাংলোর মঠে যাইতে পারি। অবশ্য সংবাদ পাইবে। ওখানকার ভক্তদের ইন্দু প্রভৃতি সকলকে আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানাবে। তোমরাও পুনরায় জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা

স্বামী বুধানন্দ

প্রথম পর্যায়

এক

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এলেন নরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথের জীবনে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—একে অন্যের অন্বেষণে এক নিগূঢ় মরমিয়া আকর্ষণে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল প্রকারের ঈশ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে। যে ষোড়শী পূজা করে তিনি তাঁর সাধক জীবনের পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন, তা-ও হয়ে গেছে প্রায় আট বছর আগে। ভবতারিণীর আদেশে এখন তিনি ভাবমুখে আছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ও ইন্দ্রিয়াতীত ভূমায় অবলীলায় 'লীলাখেল' অভিনব অবস্থিতি।

সর্ব-সাধনে সিদ্ধ হয়ে ঠাকুরের যে কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক পুরুষ, তাঁর সাধন-ভজন অন্যের জন্য সাধিত হয়েছে।[১]

যোগারূঢ় অবস্থায় নিজ দেহরক্ষার কালও বহু পূর্বে জানতে পেরেছিলেন।[২]

সাধারণ সাধক সিদ্ধিলাভের পর হয় শান্ত, সমাহিত, উদাসীনবৎ-আসীন, আনন্দ-বিহ্বল ইত্যাদি।

কিন্তু অন্যের পরমার্থ-সম্পদ আহরণ করে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৩৭৭), ২।৩৭৫-৬

২ তদেব, ২।৩৭৭

সাধন শেষে পুনরায় ঠাকুর কেন যে অধীর হলেন, কেন যে বেদনা-বিধুর অশান্ত হলেন, তার কারণ সহজেই অনুমেয়। জেনেছেন যে, তিনি ঈশ্বরাবতার ও তাঁর সকল সাধন জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য সাধিত হয়েছে। আর এও জেনেছেন যে, এ মর জগতে তাঁর দেহ ধারণ আর বেশী দিনের জন্য নয়। তাই প্রাণের প্রেরণায় ও আর্তিতে কুঠির ওপর থেকে ধ্বনিত হল সেই 'ভবসাগর-তারণ-কারণে'র প্রেম-আহ্বান: 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয়রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না।'[৩]

যে প্রেমের উদ্দাম গঙ্গা এককালে উজান বয়ে ভগবানের সব পীঠগুলি ভাসিয়ে নিয়ে তাঁতেই নিমজ্জিত করেছিল, আজ আবার সেই প্রবল প্রেম-প্রবাহ মানুষ-মুখী ফিরল। এত অধীর হলেন ভগবৎ-সন্ধানী মানুষের আসার পথ চেয়ে চেয়ে যে, ভবতারিণীকে বার বার সান্ত্বনা দিতে হল: একটু রসো বাবা, এই ওরা এল বলে।

যে অমোঘ দুর্নিবার প্রেম-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল অন্তরীক্ষে তা গিয়ে আঘাত করল সাধন-সাধা প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। ক্রমে আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভিড় জমতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে—এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গৃহস্থ-ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের গভীরতর প্রদেশে একটি কান্না অনুরণিত হতে থাকল: কোথায় আমার শুদ্ধ-আধার 'ছোকরারা' 'যাদের কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করে নাই', যারা যেন 'খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়।'[৪]

ক্রমে এমন 'ছোকরারা'ও আসতে আরম্ভ করলেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও কিছু আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের নিগূঢ় ক্রন্দন থামল না। বরং তা সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে বিশ্বময় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল। সে ক্রন্দনের ভাষা এই: কোথায় তুই, এ বেলা আয়, সময় যে বয়ে যায়। সব কথা যে এখনো রয়েছে না-বলা। কত কাজ যে এখনো রয়েছে বাকি তোর পথ চেয়ে। ওরে এ বেলা আয়!

অন্যে না জানুক নিজে তো ভোলেন নি সেই দিব্য জ্যোতির্ঘনতনু সমাধিলীন পুরুষকে, যাঁকে অখণ্ডের ঘর থেকে এই ধূলির ধরায় নেমে আসতে আনন্দ-আহ্বান জনিয়ে এসেছিলেন।

আর তিনিও তো সমাধি-ব্যুত্থিত অর্ধ-নিমীলিত প্রেমপূর্ণ নয়নে আসবার সম্মতি জানিয়েছিলেন। আর যে বেশী দিন নেই লীলা-সাঙ্গ হবার—তিনি না এলে কে নিয়ে যাবে এ প্রেম-সম্ভার জীবের অন্তরের দুয়ারে দুয়ারে!

এদিকে দক্ষিণেশ্বরের অনতিদূরে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র সতের বছরের অনন্য-সাধারণ বহুমুখী প্রতিভাবান তরুণ নরেন্দ্রনাথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এমন একজনকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবানকে।

বাইরে থেকে দেখতে নরেন্দ্র ছিলেন বলিষ্ঠ-পেশী, বেপরোয়া, বয়স্যপ্রিয়, তর্ককুশলী, মেধাবী, হাস্যরসিক—কিন্তু অন্তরে সত্যনিষ্ঠ, পবিত্রহৃদয়, ধ্যানতন্ময়, ভগবৎ-সন্ধানী।

হৃদয়ে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেমের আকুতি, কিন্তু মস্তিষ্কে পরস্পর-বিরোধী অধীত বিদ্যার মল্লযুদ্ধ। অজ্ঞাবাদী দার্শনিকদের লিখিত পুস্তক পড়ে একটা অসহনীয় একক-প্রশ্ন তাঁর তরুণ-মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল: সত্যি সত্যি ভগবান আছেন কি?

অন্যে বুঝুক—না-বুঝুক নরেন্দ্রের জীবনে

৩ তদেব, ২।৩৮৪

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৭।৪

ঐটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর মথিত হৃদয়ের নিগূঢ়তম ক্রন্দন। কারণ ভগবান যদি না থেকে থাকেন, তবে জীবনধারা চলবে এক খাতে, আর যদি থেকে থাকেন, তাঁকে ছাড়া কি করে জীবন চলবে ?

ভগবদ্-অস্তিত্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁকে প্রত্যক্ষ করায়। তাই নরেন্দ্র সরাসরি একটি প্রশ্ন করে বেড়াতে লাগলেন ধর্মনেতাদের : 'মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন ?'

কোন প্রসিদ্ধ ধর্মনেতাই তাঁকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না এই প্রশ্নের। তাই তাঁর প্রাণের গভীরে একটি ক্রন্দন জমে উঠল। তার ভাবা এই : ওগো, এমন তুমি কোথায় আছ, যে আমায় বলবে যে, তুমি ভগবানকে দেখেছ ?

একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অমেয় পারমার্থিক ঐশ্বর্য গুটিয়ে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন পথ চেয়ে কখন সে আসবে যে নিয়ে যাবে তাঁর প্রেম-প্রবাহ বিশ্বময় মানুষের মাঝে।

অন্যদিকে নরেন্দ্র খুঁজছিলেন এমন একজন ঈশ্বরজানিত পুরুষকে যিনি বলতে পারেন : আমি ঈশ্বরকে দেখেছি।

দুই

মানুষের ইতিহাসের এক মহা-মুহূর্তে উভয়ের সাক্ষাৎ হল দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে। এর পূর্বে যে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল সুরেন্দ্রের বাড়ীতে সে দেখা ছিল অনেকটা পূর্বাভাসের মত—সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্ব গগনে রক্তিমাভা। সত্যি অন্তরঙ্গ দেখা হয় দক্ষিণেশ্বরেই।

দেখেই কিন্তু ঠাকুর চিনতে পেরেছিলেন সেই অখণ্ডের ঘর থেকে নাবিয়ে আনা চৈতন্য-পুরুষকে এই কলকাতার কলেজে পড়ুয়া তরুণ নরেন্দ্রের ভেতরে।

নরেন্দ্রকে জনান্তিকে নিয়ে দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে পূর্ব-পরিচিতের ন্যায় পরমস্নেহে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন :

'এতদিন পরে আসতে হয় ? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করে রয়েছি তা কি একবার ভাবতে নেই ? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে কান ঝলসে যাবার উপক্রম হয়েছে; প্রাণের কথা কাউকে বলতে না পেয়ে আমার পেট ফুলে রয়েছে।'[৫]

পরক্ষণে নরেন্দ্রকে দেবতার সম্মান প্রদর্শন করে করজোড়ে বললেন : 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীরধারণ করেছ।'[৬]

নরেন্দ্র একেবারে নির্বাক—স্তম্ভিত। হবার-ই কথা। এ যে এক উন্মাদের কাছে আসা গেছে। কিন্তু ঐ 'উন্মাদের' কাছেই তিনি সেদিন প্রথম শুনলেন : 'তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা বলছি, এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁর সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু ঐরূপ করতে চায় কে ?'[৭]

নরেন্দ্র জানলেন যে তিনি অবশেষে পেয়েছেন এক ঈশ্বরজানিত পুরুষকে। জানলেন না কিন্তু প্রথমে যে তিনি পেয়েছেন এই উন্মাদের মাঝে অবতীর্ণ ভগবানকেই। এ রহস্য-কোরক স্বামীজীর আন্তর জীবনে বহুদিন স্ফুটোন্মুখ হয়ে রইল। তিনি সেদিন জানুন-না-জানুন, সত্যি সত্যি পেয়েছিলেন কিন্তু শুধু একজন ঈশ্বরজানিত পুরুষকে নয়—ঈশ্বরকেই। আজ যে আমরা এ কথা বিশেষ ভাবেই জানি তা আমরা জানি

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (১৩৭৯), ৫।৬৯ ৬ তদেব, ৫।৬৯ ৭ তদেব, ৫।৭০

নিজেদের সাধনবলে নয়, স্বামীজীর নিজ জীবনের অতন্দ্র সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে।

আমাদের এক মহাসৌভাগ্য যে স্বামীজী প্রথম দিনেই ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলে জানেন নি! অনেক সাধন করে জানতে হয়েছিল। আর সেই সাধনার ফল পেলুম আমাদের আঙিনায় বসা সরল সহজ আভরণহীন আবরণহীন অবতার-বরিষ্ঠ রামকৃষ্ণকে।

স্বামীজী অনেক বাজিয়ে অনেক পরখ করে তবে ঠাকুরকে নিয়েছিলেন—জাগ্রত শাণিত বুদ্ধির পরীক্ষাগারে অনেক নিরীক্ষা করে। তবেই জগৎময় রামকৃষ্ণ হয়েছেন সত্য-'বস্তু' রূপে এত সহজলভ্য। স্বামীজীর কাছে তাই মানুষের অশেষ ঋণ।

তিন

ঠাকুরের অমৃত কথায় আছে :

'নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক,—যেমন অরণি কাষ্ঠ, একটু ঘসলেই আগুন,—আবার না ঘসলেও হয়, একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায়।

'তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল।' ৮

নরেন্দ্র সাধন না করেই যেন ভগবানকে পেলেন—নিত্যসিদ্ধ কি না! কিন্তু অনেক সাধন করে তবে জানতে হয়েছিল যে, যাঁকে পেয়েছিলেন তিনিই অবতীর্ণ ভগবান।

আর এমনটি হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। স্বামীজীর দ্বারা নির্মম বৈজ্ঞানিক ভাবে ঠাকুর পরীক্ষিত হয়েছেন সানন্দে। জানতেন : বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ 'বিড়ে' নেবার অধিকার ছাড়বে না—তিনি নিজে যেমন না দেখে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বই নেন নি। আর এমন না ছাড়াতেই কল্যাণ—কারণ এতে সত্যে কায়েমী প্রতিষ্ঠা দৃঢ়, সু-সমঞ্জস ও সহজ হয়। স্বামীজী ঠাকুরকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাজিয়ে না নিলে এ যুগের সাধনহীন সন্দেহ-চঞ্চল মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন কিন্তুহীন সহজ নিবিড়তায় গ্রহণ করতে পারত না। বলা যেতে পারে এক হিসেবে অবতীর্ণ ভগবানের ধর্ম-সংস্থাপনের যন্ত্র-রূপেই স্বামীজী অমনটি করেছিলেন।

স্বামীজীর সদাজাগ্রত বৈজ্ঞানিক মনীষাকে ঠাকুর সশ্রদ্ধভাবে সদা উজ্জীবিত করেছিলেন বলেই অক্ষত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ স্বামীজীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, নয়ত ঐ পাগল পূজারীর পাদমূলে আত্মদান স্বামীজীর পক্ষে অসম্ভব হত।

স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-সাধনাকে ঠাকুর নিজেই বুঝিবা বৈজ্ঞানিক ছাঁচে ঢেলেছিলেন। যোগ যে 'কর্মসু কৌশলম্'[৯] শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় আমরা পেয়েছি। ভাষ্যবহির্ভূত প্রলম্বিত এক অর্থে বলা চলে : তবে হয়ত এ "কৌশল" সাধকের দিক থেকে যেমন, সাধ্যের দিক থেকেও তেমনি অবলম্বিত হয়। কালের বৌদ্ধিক বাতাবরণে সত্যধর্মের পরিপোষক যা কিছু থাকে, তা অবতীর্ণ ভগবান যে মেনে নেন, তার প্রমাণ শাস্ত্রে যেমন আছে, আছে তেমনি ঠাকুরের দিব্য জীবনে ও শিক্ষায়। স্বামীজীকে যে বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্মসংস্থাপনের যন্ত্র হতে হবে, এ কথা যে ঠাকুর কখনো ভোলেন নি, তার প্রমাণ ঠাকুরের নরেন্দ্র-সাধনার ইতিবৃত্তে যথেষ্ট রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপারে স্বামীজীর সাধন-জীবনে 'আগে ফল পরে ফুল' যে হল, তিনি ভগবানকে লাভ করার পরে যে সাধন করলেন,

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১।৪

৯ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২।৫০

এতে এ যুগের সত্যধর্মকে পরীক্ষাগার থেকে নিক্রান্ত অবস্তু-থেকে-পৃথক্কৃত পরিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য 'বস্তু'রূপে পাওয়া গেল। আর ভগবান এলেন আমাদের প্রাণের অঙ্গনে আত্মীয়ের বহু-চেনা বেশে স্বর্গলোকের চোখ-ঝলসানো বহুমূল্য মণি-খচিত রাজবেশ ফেলে রেখে দ্যুলোকে। তাই তিনি এমন অবলীলায় হয়েছেন জনগণমনের অধীশ্বর।

চার

স্বামীজীর সাধকজীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতির অনেক তথ্যই আমাদের অজ্ঞাত। কারণ এ বিষয়ে বাগ্মী বিবেকানন্দ ছিলেন আত্যন্তিক কথনো কথনো নিজের অজ্ঞাতে যেন কিছু প্রকাশ করে ফেলেছেন। লীলাপ্রসঙ্গ, কথামৃত ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রেও কিছু কিছু তথ্য জানা গেছে। এখন যে সব তথ্য ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত, তাতে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি— পর্যায়ের দিক থেকে এক আশ্চর্যজনক বিকাশের কাহিনী :

(১) ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রের জ্যোতিদর্শনাদি বাল্যাবস্থা থেকেই হত। এ দর্শন এত সহজাত ছিল যে, অনেকদিন অবধি তাঁর ধারণা ছিল যে, সকলেরই ওরূপ হয়ে থাকে!

(২) তারপর ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখা হল যেন ছদ্মবেশে আসা রাজাকে দেখা ও দেখে চিনতে না পারা। ঠাকুর জানছেন : নরেন্দ্র কাকে দেখছে; নরেন্দ্র তখনো জানছেন না, মানছেন না যে, ঠাকুর অবতীর্ণ ভগবান।

(৩) দ্বিতীয়বার যখন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে একাকী আসেন, সেদিনই ঠাকুর শাম্ভবী দীক্ষাসহায়ে স্বামীজীকে এককালে সমাধিস্থ করে ব্রহ্মপদবীতে আরূঢ় করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন।[১০] ঠাকুর সহসা নরেন্দ্রের অঙ্গে তাঁর দক্ষিণ পদ রাখতে নরেন্দ্রের এক অপূর্ব অনুভূতি হল। তিনি খোলা চোখে দেখতে লাগলেন যে. দৃশ্যমান সব কিছু কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁর 'আমিত্ব'ও এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হতে ছুটে চলেছে। আমিত্বের লোপভয়ে নরেন্দ্র চীৎকার করে উঠলেন। 'ওগো' তুমি আমায় একি করলে, আমার যে মা-বাবা আছেন![১১] অদ্ভুত পাগল ঐ কথা শুনে খল খল করে হেসে উঠে তাঁর হস্তস্পর্শে নরেন্দ্রকে পুনরায় 'স্বাভাবিক' অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, দর্শন অদৃশ্য হয়ে গেল।[১২] কিন্তু এ ঘটনা তাঁর অন্তরে আনলে ভাবের যুগান্তর।

(৪) যদু মল্লিকের উদ্যানে সমাধিস্থ ঠাকুরের স্পর্শে নরেন্দ্রের বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়। কিন্তু সে সময় তাঁর কি অনুভূতি হয়েছিল তা তিনি প্রকাশ করেন নি। তবে ঠাকুর প্রকাশ করেছিলেন যে, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসিত নানা প্রশ্নের উত্তরে নরেন্দ্র যা বলেছিলেন : কে সে, কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কতদিন থাকবে এ পৃথিবীতে ইত্যাদি—তাতে ঠাকুর নরেন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর দিব্য দর্শনের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছিলেন।[১৩]

(৫) নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মোপাসক নরেন্দ্র একদিকে যেমন দেব-দেবী মানতেন না অন্যদিকে তেমনি অদ্বৈততত্ত্বও স্বীকার করতেন না। কিন্তু ঠাকুর যেহেতু জানতেন নরেন্দ্রের 'অখণ্ডের ঘর', সেহেতু তাঁকে অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রথম থেকেই চেষ্টিত ছিলেন। একদিন জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে অনেক কথা

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৩৭৯) ৫।১১৫-৬
১১ তদেব, ৫।৯৯
১২ তদেব, ৫।১০০
১৩ তদেব, ৫।১০৩-৫

বললেন নরেনকে। নরেন্দ্র সব শুনলেন, কিন্তু মনে মনে মেনে নিলেন না—কারণ প্রমাণের অভাব।

মেনে তো নিলেনই না বরং বারান্দায় এসে হাজরার তামাকের আসরে পরিহাস করতে লাগলেন: 'এ কি কখনো হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি সব ঈশ্বর!' উচ্চ হাসির রোল উঠল। হাসির রোলে আকৃষ্ট হয়ে অর্ধবাহ্যদশায় পরিধানের কাপড়খানি বগলে নিয়ে ঠাকুর বাইরে এসে হাসতে হাসতে 'তোরা কি বলছিস রে' বলে নরেন্দ্রকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হলেন। সেদিন ঠাকুরের অলৌকিক স্পর্শে নরেন্দ্র সত্য সত্য প্রত্যক্ষ করলেন যে: 'ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নেই।'[১৪] এ অবস্থায় নরেন্দ্র বেশ কিছু দিন কাটাবার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছিলেন: '... ... তদবধি অদ্বৈততত্ত্বের উপরে আর কখনো সন্দিহান হতে পারি নি।'[১৫]

(৬) সত্য বটে, বিষয়বাসনাবর্জিত নরেন্দ্রনাথ শুকনো অরণি কাঠ ছিলেন বলেই সহজেই তাতে আগুন ধরে যেত। কিন্তু তীক্ষ্ণধী নরেন্দ্র অচিরেই বুঝতে-ভাবতে আরম্ভ করলেন: এই অত্যাশ্চর্য পুরুষ কে, যিনি স্পর্শমাত্রে শরণাগত ব্যক্তির সংস্কার মোচনপূর্বক ভক্তি, সমাধি, দিব্যানন্দ দিয়ে জীবনগতি এরূপভাবে আধ্যাত্মিক পথে প্রবর্তিত করতে পারেন যে, অচিরে সে দর্শনলাভ করে চিরকৃতার্থ হয়?

এ বিষয়ে নিজ মর্ম-কথা অন্তরঙ্গ শশী ও শরৎকে আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন একটি সদ্য গাওয়া গানের রেশ টেনে: "সত্যি সত্যি বলাচ্ছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাকে যা ইচ্ছে তাই বিলাচ্ছেন! কি অদ্ভুত শক্তি! রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন—শরীরের ভেতর যেটা আছে সেটাকে; পরে কত কথা, কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরতে দিলেন! সব করতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করতে পারেন।"[১৬]

(৭) নরেন্দ্র ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির বহু পরিচয় নিজ আন্তর জীবনে পেতে থাকলেও ঠাকুরকে তাঁর জাগ্রত বুদ্ধির দীপ্তিতে 'বিড়ে' দেখতে থাকলেন। ঠাকুরও তদ্রূপ নরেন্দ্রকে 'বিড়ে' দেখছিলেন। যে ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখবা-মাত্র ছুটে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতেন, এমন এক সময় এল যখন সে ঠাকুর, নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এলে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাতে লাগলেন। নরেন্দ্র কিন্তু নির্বিকার ভাবে সব সয়ে-বয়ে যাচ্ছিলেন। আর না থাকতে পেরে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন: আচ্ছা আমি তো তোর সঙ্গে একটা কথাও কই না। তবু তুই এখানে কি করতে আসিস্ বল্ দেখি? নরেন্দ্র বললেন: আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছা করে, তাই এসে থাকি। এখানে দেখা গেল নরেন্দ্রের রামকৃষ্ণ-সাধনার ভিত দৃঢ়ভাবে জমেছে।

ঠাকুর বিশেষ প্রসন্ন হয়ে বললেন: আমি তোকে বিড়ে দেখ্ছিলাম—আদর যত্ন না পেলে পালাস্ কিনা; তোর মত আধারই এতটা সহ্য করতে পারে—অপরে কোন কালে পালিয়ে যেত—এদিক আর মাড়াত না।[১৭]

ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রের এই যে প্রেম, যা

১৪ তদেব, ৫।১৬১
১৫ তদেব, ৫।১৬৫
১৬ তদেব, ৫।১৬৩
১৭ তদেব, ৫।২১৩

বিড়ে নিয়ে ঠাকুর প্রসন্ন হলেন, এ প্রেম উত্তরোত্তর বেড়েই চলল তাঁর অন্য সকল সাধনার অন্তরালে।

নরেন্দ্রের আর এক কথায় ঠাকুর বড় আনন্দ পেয়েছিলেন। তপস্যাপ্রভাবে প্রাপ্ত অনিমাদি বিভূতি যা পড়েছিল তাঁর 'চিন্তামণির নাচ দুয়ারে' ঠাকুর সে সব অত্যাশ্চর্য শক্তিগুলি নরেন্দ্রকে দিতে চাইলেন। জাগ্রত পুরুষ নরেন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করলেন—কারণ এসব শক্তির ব্যবহার ঈশ্বরলাভের তো সহায়ক হবেই না বরং পরিপন্থী হবে। ঠাকুর বড় তুষ্ট হলেন শিষ্যের ভাস্বর ত্যাগ-প্রতিভা দেখে।

তারপর স্বামীজীর জীবনে এল নিদারুণ পরীক্ষার অগ্নি-দিনগুলি।

(৮) নরেন্দ্র যখন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে অশেষ ভগবৎ-কৃপায় ভরপুর হচ্ছিলেন, তখন হল তাঁর পিতৃবিয়োগ। গৃহে সাংসারিক অবস্থার হল শোচনীয় পরিবর্তন। নগ্ন দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন সংসারের বৈরীরূপ। দয়ালু ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস টলে উঠল। এমন কি কেউ কেউ রটনা করল নরেন্দ্রের চরিত্রদুষ্টির কথা। অনেকে দুঃখের সঙ্গে এ কথা বিশ্বাস করলেন। অভিমানী নরেন্দ্র বেপরোয়া। কারো নিকট নিজের দোষহীনতা প্রমাণ করতে চেষ্টিত হলেন না। কিন্তু যখন শুনলেন যে ঠাকুর উত্তেজিতভাবে ঐ সব কুৎসা প্রত্যাখ্যান করে দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে: 'চুপ কর শালারা, মা বলেছেন সে কখনো এরূপ হতে পারে না; আর কখনো আমাকে ঐসব কথা বললে তোদের মুখ দেখতে পারব না।'[১৮] তখন নরেন্দ্র সত্যি সত্যি স্তম্ভিত হলেন। তাঁর রামকৃষ্ণ-সাধনার গোড়া পত্তন কায়েমী হল। এই ভিতের উপর দাঁড়িয়েই পরবর্তিকালের নরেন্দ্র তাঁর সকল রামকৃষ্ণ-সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছিলেন।

এখানে স্মরণীয় যে অত্যাশ্চর্যা ঠাকুরের এই নেপথ্যবাসিনী মা-টি! কোত্থেকে ধরে আনলেন তোতাকে বেদান্ত-গুরুর যখন প্রয়োজন হল। ঠাকুরের বেদান্ত সাধন-সাঙ্গের পর তাঁকে আর এক উদার অনুভূতিতে পূর্ণতর করে মুক্ত পক্ষে উড়িয়ে দিলেন দিগন্তে। নরেন্দ্র যখন এলেন তাঁর অঙ্গনে ঠাকুরের লীলাসহচর হতে, অতন্দ্র কল্যাণ-দৃষ্টি রাখলেন তাঁর উপর। প্রমাণ? ঐ যে 'মা বলেছেন সে কখনো এরূপ হতে পারে না'। নরেন্দ্রের কালী মানার পর্বের বহু পূর্ব থেকে, কালী নরেন্দ্রকে লালন করে চলেছিলেন এ কথা নরেন্দ্র নিজে অনেক পরে জেনেছিলেন।

(৯) আত্যন্তিক কষ্টে পড়ে নরেন্দ্রের দার্শনিক মন চিরকালের দ্বন্দ্ব-সমস্যার মুখোমুখি হল যখন, তখন একদিন অবসন্ন দেহ-মন নিয়ে পড়েছিলেন রাস্তার পাশে এক রকে। তখন তিনি সহসা উপলব্ধি করলেন যে কোন এক দৈব-শক্তি প্রভাবে একের পর অন্য ভেতরের সকল পর্দা যেন উত্তোলিত হল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরায়ণতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করতে না পেরে তাঁর মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হয়েছিল, সে সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখতে পেলেন। দেহের সকল গ্লানি অবসাদ একেবারে দূর হয়ে গিয়ে অন্তর অমিত বল ও আনন্দে পূর্ণ হল।

সেদিন অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে সকল দ্বন্দ্ব-সমস্যার মীমাংসা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই অল্পদিন পরেই স্বামীজীর পক্ষে কালীকে মানা

১৮ তদেব, ৫।২৩৯

সম্ভব হয়েছিল, যদিও বাইরের দিক থেকেও ভাগ্যের তাড়না তাঁকে এদিকে প্রভাবিত করেছিল।

(১০) অখণ্ডের ঘর থেকে নাবিয়ে আনা নরেন্দ্র যেন ছিলেন গৃহছাড়া—মাতৃহারা। কারণ কালীর সঙ্গে ছিল তাঁর যেন আড়ি! কিছুতেই কালী মানবেন না। কিন্তু ঠাকুর বিশেষভাবে জানতেন যে, যে পর্যন্ত নরেন্দ্র কালী-ব্রহ্ম অভেদ-তত্ত্ব না অনুভব করছেন ততদিন তাঁর সাধনা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না—আর সেজন্যই ততদিন তিনি হতে পারবেন না তাঁর ভাবের ও প্রেমের আধিকারিক সংবাহক।

তাই যেদিন সংসারে অভাবের গঞ্জনায় নরেন্দ্র এসে ঠাকুরকে ধরলেন, মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণ করতে তাঁকে জানাতে হবে ভবতারিণীকে, সেদিন নিজে মধ্যস্থতা না করে নরেন্দ্রকে পাঠালেন মায়ের সুমুখে তাঁর নিজের চাওয়া নিজে চেয়ে নিতে মায়ের কাছ থেকে। মা তো পর্দার আড়াল থেকে সবটা কৌতুকই সব সময়েই দেখছিলেন!

স্বামীজী যে ত্যাগীশ্বরের হাতে গড়া মহামানব এতেই প্রমাণিত হল যে বার বার তিনবার চেষ্টা করেও স্বামীজী মায়ের কাছে কিছুতেই পারলেন না চাইতে ব্যবহারিক কোন ভোজ্য-ভোগ্য সামগ্রী।

চাইলেন জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য। দুবার তো চাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গিছলেন। তৃতীয়বার ভোলেন নি, কিন্তু লজ্জায় মায়ের কাছে কিছুতেই পারলেন না তুচ্ছ জগতের কোন অবস্তু চাইতে।

কেন পারলেন না? বুঝতে হবে। কারণ যে মাকে এতদিন পরিহার করে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রবাসে, তেপান্তরে, তাঁর কাছে এসে দেখলেন তিনি যে সত্যি সত্যি চৈতন্যময়ী জগদীশ্বরী যদিও পেলেন না তাঁর বরদ হাতের দেওয়া ভোগ্য সামগ্রী, পেলেন কিন্তু জগতের মাকে নিজের চিরকালের মা-রূপে।

আর এ মহাপ্রাপ্তি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে আনল এক আন্তর বিপ্লব।

নরেন্দ্র কালী মানলেন। ঠাকুর রুদ্ধশ্বাসে মহানন্দে সব নিরীক্ষণ করে আনন্দে আত্মহারা ও নিশ্চিন্ত হলেন। কেন? অজ্ঞেয়-প্রবাসী নরেন্দ্র সব-হওয়া মায়ের ঘরে ফিরে এসেছেন। জগতের মানুষের এ বড় এক শুভ দিন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে চেয়ে নিয়ে মায়ের গান শিখলেন। আর সমস্ত রাত 'ত্বং হি তারা…পরাৎ পরা' গানটি গাইলেন।

পরবর্তিকালের বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "কালী ও কালীর সর্বপ্রকার কার্য-কলাপকে আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার ছ' বছরের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল এই যে, আমি তাঁহাকে মানিতাম না। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস যে, সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। তবু আমি কতদিনই না তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। ……সে সময় আমার খুবই ভাগ্য-বিপর্যয় চলিতেছিল।……ইহা আমার জীবনে এক সুযোগ হিসাবে আসিয়াছিল। মা (কালী) আমাকে তাঁহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন। এই কথাই বলিয়াছিলাম, 'আমি তোমার দাস।' রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার!"[১১]

[১১] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, (১৩৬৯) পৃঃ ২৮৭-৮

মহামায়ার সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবার পর, একদিকে ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রাণের সম্পর্ক যেমন নিবিড়তর হ'ল অন্যদিকে তাঁর জীবনে এল অধিকতর পূর্ণতা।

একদিকে সংসারের অভাবের নিষ্পেষণ, অন্য দিকে আলোক-ভাস্বর অধ্যাত্ম রাজ্যে উত্তরণ—সে এক দুঃসহ শুভলগ্ন স্বামীজীর জীবনে।

(১১) দক্ষিণেশ্বরের আনন্দের হাট উঠে গেছে। ঠাকুর কাশীপুরে রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়ে জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে লীলা সংবরণের পূর্বে তাঁর সব দেওয়ার সাধনায় অতন্দ্র।

অন্তরঙ্গ বাছাই হয়ে গেছে। বিবেক-বৈরাগ্যে বহ্নিমান, জ্ঞান-ভক্তিতে উদ্দীপ্ত তরুণ সাধক-গোষ্ঠী সেবিত ঠাকুর ভূ-ভারতে ধর্ম-সংস্থাপনের এক নবায়ন রচনা করে চলেছেন অবলীলায়।

অবতীর্ণ ভগবান আগত-অনাগত কালের জন্যে তাঁর কল্যাণ-যোগ যোজনা করছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। একটি নব ধর্ম-সংঘ গড়ে উঠছিল সনাতন ভিতের উপর, পাশ্চাত্য ভাব-ভার-পর্যুদস্ত কলকাতার উপকণ্ঠে।

সকলের সহায়ক ঠাকুর নরেনকে গড়ে তুলছিলেন বিশেষভাবে তাঁর সকল প্রজ্ঞা ও প্রেম দিয়ে। জানতেন তাঁকে কত ভার বইতে হবে।

ঠাকুরের সেবা, সাধন ও সংসারের ঝঞ্ঝাট পোয়ান সব চলতে থাকল একসঙ্গে। নরেন্দ্রকে ঠাকুর ইতিমধ্যে সকল শিষ্যদের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ শিষ্যদের অন্তরে বৈরাগ্যের হোম-শিখা প্রোজ্জ্বল হতে থাকে।

(১২) নরেন্দ্রের ওজস্বী অন্তরে নির্বিকল্প সমাধির জন্য তীব্র তৃষ্ণা। জানতেন ঠাকুর ইচ্ছামাত্রে সব করে দিতে পারেন। ঠাকুরের কাছে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করাতে, ঠাকুর তাঁকে দিলেন অতি-অপ্রত্যাশিত এক যুগান্তরকারী ধিক্কার: 'ছি! ছি! তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এতো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, এত ছোট নজর করিসনি!'[২০]

একদিন ঠাকুরের জীব-শিব মন্ত্র শুনে নরেন্দ্র উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন ধর্মদর্শনের এক নবীন সম্ভাবনার গভীরতা অনুভব করে। সে মন্ত্র তাঁর ভাবরাজ্যে বিপ্লব এনেছিল। আজ যখন ঠাকুরের অশনি-ধিক্কারে শুনলেন যে, নিজের মোক্ষ ইচ্ছা এক 'অতি তুচ্ছ হীন কথা', সে প্রচণ্ড আঘাতের সবটা নিতে হল তাঁকে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার কুক্ষিতে, ভাবের রাজ্যে হল এক নবসূর্যোদয়। তার উদার আভায় দেখলেন ধর্মের চির নূতন মুখখানি, অতি পরিচিত অথচ অজ্ঞাত। মন যত এগিয়ে চলল, হাসি-উদার চক্রবাল পিছিয়ে যেতে থাকল: ওরে এগিয়ে আয়, আরো আছে!

(১৩) তারপর অকস্মাৎ একদিন নরেন্দ্রের হলো নির্বিকল্প সমাধি। সকল কল্পলোকের নিমজ্জন হলো সেই অনুভূতিতে যেখানে সকল চক্রবাল মিলিয়ে গিয়ে হলো একাকার। নরেন্দ্রের 'আমি' হারিয়ে গেল ভূমায়।

কৌতুকময় ঠাকুর তাঁর কিছুই-না-রাখা হাতের মুষ্টিতে বায়ুবদ্ধ করে বললেন: 'কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।'[২১]

লক্ষণীয়, নেপথ্যবাসিনী মা কেমন করে

২০ স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১৩৭৩), ১।১৮৩　　২১ তদেব, ১।১৮৫

নরেন্দ্রের জীবনে অনুপ্রবেশ করে তাঁকে আত্মসাৎ করছেন।

আরও লক্ষণীয় যে, একদিকে 'মা' নরেন্দ্রকে সব দেখালেন, অথচ চাবি রইল 'আমার হাতে', 'যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব'। 'ঠাকুরের' দিন ফুরিয়ে আসছে, তাই মা-তে আর 'আমি'-তে ব্যবহারিক পার্থক্যও রাখা যাচ্ছে না, সব গুলিয়ে একাকার হয়ে আসছে।

(১৪) প্রবল বৈরাগ্যের প্রেরণায় কাশীপুর থেকে নরেন হঠাৎ বুদ্ধগয়ায় গেলেন—কালী ও তারক সঙ্গে। সেখানে বুদ্ধদেবের বজ্রাসনে বসে নরেন ধ্যান-নিমগ্ন হলেন। বুদ্ধ-হৃদয় তাঁকে সব সময়ে অভিভূত করেছে – তাঁর প্রথম দিব্য-দর্শনে বুদ্ধই তাঁর নিকটে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর ধারণা। কিন্তু সাধন তাঁর বুদ্ধ-বত্মে নয়। কালীর অনামিকার রক্ত তিলক যে পড়েছে তাঁর ললাটে!

কাশীপুর থেকে নিরুদ্দিষ্ট নরেনদের জন্যে সকলে উদ্বিগ্ন বোধ করলেও ঠাকুর ছিলেন একান্ত নিশ্চিন্ত। মৃদুহাস্যে বলেছিলেন: 'সে কোথাও যাবে না। তাকে এখানে আসতেই হবে'।[২২] এলেনও তাই।

নরেন্দ্রের অবস্থা তখন এরূপ— 'যেন খাপ খোলা তলোয়ার নিয়ে বেড়াচ্ছেন'। তীব্র জ্ঞানের কথা বলেন: "আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না;—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্।"[২৩]

যে ঠাকুর এককালে নরেন্দ্রকে জ্ঞানমার্গে উত্তীর্ণ করতে যত্নপর ছিলেন, জ্ঞানীকে তিনিই এখন শেখালেন 'মায়াবাদ শুকনো'। নরেন্দ্রের হাত মুখ স্পর্শ করে নিজের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তাঁর স্বরূপের পরিচয় দিয়ে বললেন: 'এ সব ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ—মুখ চেহারা শুকনো হয়।'[২৪]

সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। নরেন্দ্রের গুরুলাভ হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-লাভ এখনো হয়নি। গানে আছে: 'তুমি না জানালে পরে কে তোমাকে জানতে পারে?' শেষ পর্যায়ে ঠাকুর ঝুলি ঝেড়ে সব দিতে চেয়েও নেবার লোক খুব বেশী পাননি। একদিন কুণ্ঠিতভাবে নরেন্দ্রকে বললেন: 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে...'। তেজস্বী নরেন্দ্র তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না দিয়েই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জোরের সঙ্গে বললেন: 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে বোধ না হয়, ততক্ষণ বলব না।'[২৫] ঠাকুর চেয়ে রইলেন নরেন্দ্রের স্ব-স্বরূপের সে মুখের দিকে, যে মুখখানি এখনো পূর্ণ বিকশিত হয়নি।

(১৫) কাশীপুরে একদিন রোগযন্ত্রণার মধ্যে ঠাকুর কাগজে লিখলেন: 'নরেন শিক্ষে দিবে।'[২৬] চাপরাস না থাকলে লোকে মানে না। আদেশ না পেলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। তাই অবতীর্ণ ভগবান লিখিত চাপরাস—আদেশ দিলেন নরেনকে।

এদিকে কটিতে বস্ত্রটি থাকে না অথচ নিজের কাজ গুছানো ব্যাপারে কি পরিপাটি! নরেন্দ্রকে দেওয়া হল একেবারে লিখিত পরোয়ানা।

এ আদেশ যে বিশ্ব-বিধাতার হৃদয় থেকে ব্যথিত হচ্ছে নরেন্দ্র সেদিন বোঝেন নি। তাই জবাবে বলেছিলেন: 'আমি ওসব পারব না।' 'তোর হাড় করবে'[২৭] বললেন ঠাকুর নিজের অমোঘ শক্তির তর্কাতীত নির্ঘোষে। অনেকদিন পরে অনেক সাধনায় বিদগ্ধ নরেন জেনেছিলেন

২২ তদেব, ১।১৮৯ ২৩ তদেব, ১।১৯০ ২৪ তদেব, ১।১৯০
২৫ তদেব, ১।১৯০ ২৬ তদেব, ১।১৯৯ ২৭ তদেব, ১।১৯৯

যন্ত্রের উপর যন্ত্রীর বজ্রমুষ্টি কত সুদৃঢ় অথচ কত প্রেম-দ্রব। তাই তাঁর হাত থেকে নিজের হাত ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাই করেন নি।

(১৬) ঠাকুর নরেন্দ্রকে শিষ্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন দিতেন। কেন দিতেন একদিন অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রমাণিত হল।

জীবোদ্ধারের কর্মে রত হয়ে ঠাকুরকে কারো কারো পাপ আকর্ষণ করে নিতে হয়েছিল নিজ শরীরে। তাতে হল গলার রোগ। রোগ ক্যান্‌সার বলে বিজ্ঞাপিত হওয়াতে ভক্তদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হলো। ক্যান্‌সার ছোঁয়াচে নয় একথা তখন জানা ছিল না। কাজেই 'আপনা বাঁচা'-ভাব, যখন প্রায় ছড়িয়ে পড়ছিল ভক্তদের মধ্যে, তখন একদিন নব-নীলকণ্ঠ নরেন্দ্র ঠাকুরের পথ্য গ্রহণের পর তাঁর নিষ্ঠীবন-মিশ্রিত পথ্যাবশেষ অম্লান বদনে পান করলেন। সেদিন থেকে সকলের সন্দেহ ঘুচল। নিজের সম্বন্ধে কোন ভাব-কৌতুক-ঘন উক্তিতে শ্রীমা বলেছিলেন: "কেন গো ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসে-ছিলেন?" [২৮]

শ্রীমা নিজে বা ঠাকুরের কোন লীলা-সহচরই 'শুধু রসগোল্লা খেতে' আসেন নি। বিশেষ করে নরেন্দ্র তো নন-ই।

এই রক্ত-পুঁজ যেখান ঠাকুরের পথ্যাবশেষ পান করলেন জলন্ত হুতাশন নব-নীলকণ্ঠ। এতে যে শুধু তাঁর গুরুভক্তি মহিমান্বিত হয়েছিল তা নয়। ঠাকুর এতে জেনেছিলেন নরেন্দ্র তাঁর জীবন দিতে তৈরী। একদিন নরেনকে বলেছিলেন: 'তোর এখনো হয় নাই।' [২৯] আজ দেখলেন—নরেন্দ্র তৈরী।

কাশীপুরে নরেন্দ্রের সদাজাগ্রত ও সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত গুরুসেবা তাঁকে দ্রুত একের পর এক মহাপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

(১৭) ঠাকুরের মহাসমাধির আর কয়েক দিন মাত্র বাকি। নরেন্দ্রকে একেলা শয্যাপাশে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে উপদেশ দিতে থাকলেন। ঐ সব দিনে নরেন্দ্রকে ঠাকুর কি বলেছিলেন তার অধিকাংশই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু শিষ্যের পরবর্তী জীবনে তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কর্মে ও শিক্ষায়।

দেহাবসানের তিনচার দিন পূর্বে শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট নরেন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। নরেন্দ্র বোধ করলেন ঠাকুরের দেহ থেকে তড়িৎকম্পনের মতো একটি সূক্ষ্ম তেজোরশ্মি তাঁর শরীরে প্রবেশ করছে। ক্রমে তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। যখন তাঁর চৈতন্য ফিরে এলো দেখলেন সমাধি-ব্যুত্থিত ঠাকুর অশ্রু বিসর্জন করছেন। কারণ জানতে চাইলে বললেন: 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।' [৩০]

নরেন্দ্র বালকের ন্যায় কাঁদতে লাগলেন। ভাবাবেগে কণ্ঠরোধ হওয়ায় বাক্যস্ফূর্তি হল না।

ঠাকুর তাঁর কাছেই যথাসর্বস্ব দিলেন যিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে 'জগতের কাজ' করবেন, এত দিনের এত সাধনা-সিদ্ধি—সব কিছু সূক্ষ্ম তড়িৎ-প্রবাহের মতো চালিত করে। যে আধার পাঁচ বছরের অতন্দ্র সাধনায় তৈরী করেছিলেন তাতে সব শক্তি সঞ্চারিত করলেন। উদ্দেশ্য: 'জগতের কাজ' যে জন্যে আসা হয়েছিল। সে ভাব-কাজ ঠাকুর নিগূঢ় এক আধ্যাত্মিক ভাব-স্তরে প্রবাহিত করে রেখে গেলেন।

২৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন, ১ম ভাগ (১৩৭১) পৃ: ১৭৮
২৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ (১৩৭৪), পৃ: ২৭৬
৩০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড (১৩৭৩) পৃ: ২০০

নরেন্দ্র আচম্বিতে এক দুঃসহ মহাশক্তির অধিকারী হলেন।

যে অবতীর্ণ ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের মধ্যে পঞ্চাশ বছর ধরে নিজ কাজ করে চলেছিলেন, তিনি রূপান্তরিত হয়ে তড়িৎপ্রবাহবৎ নরেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলেন। কত বড় শক্তিধর হলে এ শক্তি বহন করা সম্ভব হয়েছিল তা সহজে অনুমেয়। 'এটাও-আমি,=ওটাও—আমি' না হলে এরূপ হতে পারত না।

সব দেওয়ার দু-একদিন পরে তিনি নরেন্দ্রকে বললেন: 'দেখ্, নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।' [৩১]

জগতের অধীশ্বর গড়ছেন সন্ন্যাসী সংঘ, অথচ সব উপাদান শুদ্ধ ঘরোয়া। প্রেমে তিনি সকলের জাগ্রত চেতনাকে করেছেন যোগবর্ত্মে চালিত। এই ধারাটিকে তিনি মানুষের সভ্যতাতে কায়েমী করার জন্যে নরেন্দ্রে দিলেন তরুণ ত্যাগীদের ভার। এটি তাঁর ধর্ম-সংস্থাপনের শৈলী।

এক হিসেবে সব ভার নিজের ওপরই রইল, কিন্তু—'ওটাও আমি'-তে!

(১৮) 'ফকির' ঠাকুর শয্যালীন। রোগ-যন্ত্রণার শেষ নেই। মহাসমাধির দুদিন মাত্র বাকি। নরেন্দ্র ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান, যেন মহানিশায় শয্যাপ্রান্তে উদয়োন্মুখ দিবাকর। ঠাকুরকে নরেন্দ্রের 'বিড়ে' নেওয়া এখনো শেষ হয় নি। তাই তাঁর বিচারপ্রবণ সত্যানুসন্ধিৎসু মনে ফুটল একটি প্রশ্ন: এই জরাজীর্ণ দেহে শয্যালীন অধিবাসী সত্যিই কি জগতের অধীশ্বর! অনেক-বার তিনি নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এ সময়ে যদি তিনি বলতে পারেন 'আমি ভগবান', তবেই বিশ্বাস করি'[৩২]

যেই এই চিন্তা উদিত হওয়া, নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে ঠাকুর চোখ মেলে চাইলেন নরেন্দ্রের উদ্‌গ্রীব মুখের দিকে। বেদনা-বিধুর ঠাকুর স্পষ্ট বললেন: 'এখনও তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ— তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।'[৩৩]

ঠাকুরের অতি সুস্পষ্ট নিরাবরণ আত্মপ্রকাশে নরেন্দ্রনাথ তিরস্কৃত, লজ্জিত ও স্তম্ভিত হলেন। তাঁর সকল সূক্ষ্ম সন্দেহের অবসান ঘটল। অবতীর্ণ ভগবান কি নিদারুণ তপস্যা করে 'মৃত্যুর' দ্বারে দাঁড়িয়ে নিজেকে দিতে পারলেন— এ এক ধ্যানের বস্তু।

আজ স্বামীজী তাঁর সব মন নিয়ে মানলেন: রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ ভগবান, জানলেন: ঐ যে ১৮৮১ সালের শেষের দিকে ঈশ্বর-জানিত যে পুরুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল—তিনিই ঈশ্বর।

পাঁচ বছর ধরে যাঁর সঙ্গে 'বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু' এত অন্তরঙ্গ মেলামেশা, তাঁর মহাপ্রস্থান-পথের শেষ মোড়ে বিদায়োন্মুখ চূর্ণ মুহূর্তে হল সম্যক্ পরিচয়।

পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন গুরুরূপে। আজ জানলেন, বুঝলেন, মানলেন তিনিই 'জ্বস্থিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগ-সহায়'।

দুদিন পরে হল ঠাকুরের তিরোধান।

এক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপানুভূতি স্বামীজীর জীবনে সব চেয়ে মূল্যবান অনুভূতি যা

৩১ তদেব, ১।২০০

৩২ তদেব, ১।২০১

৩৩ তদেব, ১।২০১

তিনি তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের আধারে ধারণ করে জগৎকে দিয়েছেন এক অক্ষয় দিব্য-ধর্ম দানরূপে। তাঁর এই অনুভূতির আলোকে জগতের আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন ভাবে পেয়েছেন, তেমনটি পেতেন না যদি না স্বামীজী তাঁর প্রায় শেষদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন নির্মম ভাবে পরীক্ষা করে এমন সম্যক্ ভাবে না পেতেন ও দিতেন।

অদ্বৈত-নিষ্ঠ স্বামীজী যে উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার-বরিষ্ঠ বলে স্তুতি করতে দ্বিধা করেন নি তার কারণ—প্রত্যক্ষ অনুভূতি। দেখছি-বস্তুর আবার বিচার কি?[৩৪] তাঁর গুরুর কথা। এতে কোন দর্শন-তত্ত্বের যদি কোন অসুবিধা হয়, তাতে কার কি যায় আসে?

প্রত্যক্ষ-প্রত্যয়-ভাস্বর এই অভিজ্ঞতাটিকে স্বামীজী যে তাঁর অদ্বৈততত্ত্ব-নিষ্ঠার আবরণে ঢেকে রাখেন নি, বরং গম্ভীর জলদ-মন্দ্রে জগতে ঘোষণা করে গেছেন, সেজন্যে পরবর্তী কালের সকল সাধক তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

এই হল স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-সাধনার প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে তাঁর সকল সাধনার অন্তরালে ফল্গুর মত প্রবহমান শ্রীরামকৃষ্ণ। [ক্রমশঃ]

৩৪ তদেব, ১।১৩১ দ্রঃ

পারমাণবিক বিস্ফোরণ-প্রসঙ্গে

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরমাণু বোমার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও গঠন-প্রণালী

'এ্যাটম্ বম্' বা 'পরমাণু বোমা' কথাটির মধ্যে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ আর বিস্ময় মিশে আছে। এর ব্যবহারিক প্রয়োগের বিভীষিকার কথা এখনও আমাদের হৃদয়ে শিহরণ জাগায়। বিশ্বের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে এক সীমাহীন ভীতি, হতাশা, ক্ষোভ ও ঘৃণা সঞ্চিত হয়ে আছে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগকারী সমর-বিশারদদের নিষ্ঠুরতার জন্য। কিন্তু পরমাণু বোমার তত্ত্ব উদ্ভাবন তথা তার গঠন-প্রণালীর আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে শত শত বিজ্ঞানীর অনবদ্য বিজ্ঞান-পিপাসা এবং মহান আত্মত্যাগের কাহিনী—মানবতাবাদী নিঃস্বার্থপর আত্মভোলা বিজ্ঞানীদের সুকঠোর তপস্যার কথা।

পরমাণু বোমা কি ভাবে তৈরী হয় আজ সে এক সামরিক গুপ্তত্থ্যবিশেষ। পরমাণু-শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি কেউ কাউকে তাদের এই অতি গোপনীয় তত্ত্ব বিশদ বিবৃত করতে রাজী নন্। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সব পরমাণু গবেষণাগারগুলিতে আজ সামরিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়েছে। সেখানে বিজ্ঞানীদের চেয়ে সামরিক অফিসারদের গুরুত্ব আজ কম নয়।

পরমাণু বোমার গঠন-প্রণালী সম্পর্কে আলোচনকালে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তা হলো সামরিক দিক হতে এর সূক্ষ্ম গঠন-প্রণালী যেমন গোপনীয়, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী দিক হতে সেটি তেমনি জটিল।

পরমাণু বোমার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তার গঠন-প্রণালী নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো।

ভর এবং শক্তিকে সৃষ্টি অথবা ধ্বংস করা যায় না, যদিও আমাদের মনে হয় যেন পদার্থ প্রতি-নিয়তই সৃষ্ট ও ধ্বংস হচ্ছে। জল ফোটালে তা

বাষ্প হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। কেরোসিন, পেট্রোল অথবা স্পিরিট পোড়ালে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। মোমবাতি পোড়ালেও কিছুক্ষণের মধ্যেই মোমবাতির মোম এবং সুতো অদৃশ্য হয়ে যায় পুড়ে গিয়ে। অন্যদিকে এক টুকরো লোহাকে কিছুদিন বাতাসে ফেলে রাখলে তার গায়ে মরচে পড়ে। একখণ্ড ম্যাগনেসিয়াম তার আগুনে পোড়ালে সেটি অতি উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে জ্বলে। মরচে যুক্ত লোহার টুকরোটির ওজন অথবা ম্যাগনেসিয়ামের সাদা ভস্মরাশির ওজন তাদের পূর্বের ওজনের চেয়ে বেশী। উপরের ঘটনাগুলি হতে স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে: পদার্থের কি সত্যসত্যই ধ্বংস অথবা সৃষ্টি হচ্ছে না? উত্তর কিন্তু না, ধ্বংস এবং সৃষ্টি কিছুই হচ্ছে না। বৈজ্ঞানিকগণ নানাভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে পদার্থের ধ্বংস এবং সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু তা মোটেই হয় না। আমরা যেগুলিকে পদার্থের ধ্বংস বা সৃষ্টি বলে মনে করছি প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পদার্থের অবস্থার রূপান্তর মাত্র।

জল ফোটালে বাষ্পের উদ্ভব হয় অর্থাৎ জলের অবস্থান্তর ঘটে। আবার মোমবাতি পোড়ালে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া হয়ে জলীয় বাষ্প এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এই দু'টি অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে লোহায় মরচে ধরায় অথবা ম্যাগনেসিয়াম তারের দহনের ফলে ওজনের যে বৃদ্ধি হয়, তার কারণ বাতাসে থাকা অক্সিজেন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে লোহার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়—এবং "লোহা-অক্সাইড" যৌগের সৃষ্টি হয়। এই যৌগটিকেই আমরা লোহার মরচে বলি। বাতাসের অক্সিজেন লোহার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় লোহার টুকরোটির ওজন বৃদ্ধি হয় এবং ম্যাগনেসিয়াম তারটি পুড়বার সময় বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ম্যাগনেসিয়াম তার দহনকালে যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে, বায়ু ঠিক ততখানি অক্সিজেন হারায়। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কোন ঘটনার ক্ষেত্রেই পদার্থের ধ্বংস অথবা সৃষ্টি হচ্ছে না—পদার্থের রূপান্তর হচ্ছে মাত্র। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় বিক্রিয়ার আগে এবং পরে মোট পদার্থের পরিমাণ একই থাকে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী এন্টনী লাউরেন্ট ল্যাভয়সিয়র পদার্থের অবিনশ্বরতা ধর্মটির কথা বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যালোচনার দ্বারা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন "শূন্য ভর হতে পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে না। আবার ভরকে ধ্বংস করে শূন্যে মিলিয়ে দেওয়াও যায় না। অর্থাৎ ভর অবিনশ্বর।" এই নিয়মকে ভরের অবিনশ্বরতা বা নিত্যতাবাদ সূত্র বলে।

ভরের মত শক্তিকেও সৃষ্টি অথবা ধ্বংস করা যায় না। শক্তি যখন একরূপ হতে অন্য কোন রূপে পরিবর্তিত হয় তখন শক্তির কোন ক্ষয় হয় না। কোন একটি বস্তু যে পরিমাণ শক্তি হারাবে, অন্য কোন বস্তু ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি লাভ করবে। অর্থাৎ বিশ্বের সামগ্রিক শক্তি-ভাণ্ডারের কোন তারতম্য হবে না। বিশ্বের সৃষ্টির দিন হতে আজ পর্যন্ত শক্তির নানান খেলা বিশ্বপ্রকৃতিতে সংঘটিত হলেও পৃথিবীতে সেদিন যে পরিমাণ শক্তি ছিল, আজও সেই একই পরিমাণ শক্তিই আছে। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় এবং নির্দিষ্ট। এই নিয়মকে শক্তির অবিনশ্বরতা বা নিত্যতাবাদ সূত্র বলে।

এতদিন পর্যন্ত মানুষের কাছে এ তত্ত্বই সত্য ছিল—হঠাৎ এই শতকের প্রথম দিকে দু'চারটি করে বিস্ময়কর গবেষণার ফলাফল আঘাত করতে লাগলো এতদিনের পুরানো এবং ঠিক-বলে-জানা ধ্যান-ধারণাকে। ক্রমশ তিরিশ এবং চল্লিশের

দশকে এল রাশি রাশি হতবাক-করা তথ্যের প্লাবন, যে প্লাবনে কার্যতঃ সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ল সনাতনী বিজ্ঞানের অনেকগুলি বিজয়-তোরণ। জানা গেল ভরকে ধ্বংস করে শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া যায়, অর্থাৎ ভর অবিনশ্বর কথাটি বিশেষক্ষেত্রে সত্য নয়। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রবর্তিত আপেক্ষিকতা-তত্ত্বে (Theory of Relativity) শক্তি ও ভরের সমতার কথা আলোচনা করা হল। ঐ তত্ত্বে বলা হল ভরকে ধ্বংস[1] করে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। আইনস্টাইন বলেছিলেন, যদি বস্তুর একটি কণিকাকেও ধ্বংস করা সম্ভব হয় তবে তা থেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। তাঁর মতে বস্তুকে শক্তিতে (অথবা কি শক্তিকে বস্তুতেও ?[2]) রূপান্তরিত করা সম্ভব। তাঁর সেই বিখ্যাত সমীকরণটি হল :

$$E = mc^2$$

যেখানে, E = রূপান্তরিত শক্তি (Energy) ; m = ভর (mass) ; c = আলোকের বেগ (velocity of light)।

C-এর মান সর্বদা স্থির অর্থাৎ এটি একটি ধ্রুবক রাশি, যার মান হল ৩ × ১০[১০] সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। উপরের এই সমীকরণ অনুযায়ী মাত্র এক গ্রাম ভর থেকে ৯ × ১০[২০] আর্গ শক্তি পাওয়া যাবে। এর অর্থ হল এই পরিমাণ শক্তি দিয়ে তিরিশ লক্ষ টন ওজনকে ভূপৃষ্ঠ হতে এক হাজার ফুট উঁচুতে তোলা যাবে।[3] যে কোন বস্তুকে ধ্বংস করেই এ ধরনের ভয়ানক শক্তির হদিশ পাওয়া সম্ভব, যদিও কাজটা বাস্তবায়িত করা যথেষ্ট কঠিন। তাই বিজ্ঞানীরা খুঁজলেন কোন্ বস্তুগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজে ধ্বংস করা যায়। কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে ধারণা করবার জন্য এই সমীকরণটি সাহায্য করলেও আইনস্টাইনের সমীকরণ হাতে পাওয়া মাত্র বিজ্ঞানীরা যে পরমাণু বোমা তৈরীর পরিকল্পনা করেছিলেন তা কিন্তু নয়।

পরমাণুর কেন্দ্রকের অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে শক্তির উদ্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রকের কিছুটা ভর শূন্যে মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ এ পর্যন্ত যতগুলি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তার ফলে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর কিছুটা ভর চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৩৪ সালে এনরিকো ফেরমি ইউরেনিয়মের[4] ওপর নিউট্রন[5] রশ্মির প্রক্ষেপ করে দেখতে লাগলেন

১ ভর এবং শক্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি তত্ত্ব বা 'রাশি' বলে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, এইজন্য ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হলে ভরের ধ্বংস (Annihilation) হয়েছে, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন।

২ ভরকে ধ্বংস করে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হলেও এখনও পর্যন্ত শক্তিকে ভরে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি—যদিও তত্ত্বগত দিক হতে ব্যাপারটি হওয়া সম্ভবপর।

৩ ব্যবহারিক এককে ঐ শক্তিকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় এক গ্রাম তেজস্ক্রিয় পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে, তা দশ হাজার লিটার পেট্রোলের অথবা আশি টন ট্রাই নাইট্রো টলুইন (T. N. T.) নামক তীব্র বিস্ফোরকের সঙ্গে সমান।

৪ প্রকৃতিতে পাওয়া ৯২ তম মৌলিক তেজস্ক্রিয় ধাতুটির নাম ইউরেনিয়ম। প্রকৃতিতে সাধারণত দুই ধরনের ইউরেনিয়ম পরমাণু দেখা যায়। ইউরেনিয়ম—২৩৮ (U-২৩৮) এবং ইউরেনিয়ম—২৩৫ (U-২৩৫)। প্রকৃতিতে পাওয়া ১৪০ ভাগ U-২৩৮ এর মধ্যে মাত্র এক ভাগ U-২৩৫ পরমাণু পাওয়া যায় ফেরমি তথা অপরাপর বিজ্ঞানীরা U-২৩৫ এর নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করেন এবং বেরিয়ম—১৩৭·৩৬ এবং ক্রিপ্টন—৮৩·৭০ পান। ২৩৫-একক ভর ভেঙে পাওয়া যাচ্ছে ১৩৭·৩৬+৮৩·৭০=২২১·০৬ একক ভর। সুতরাং ২৩৫—২২১·০৬= ১৩·৯৪ একক ভরের কিছুটা পারমাণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৫ নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রকে থাকা মৌল কণা। এর ভর এক একক কিন্তু কোন প্রকার চার্জ নেই।

ইউরেনিয়ম অপেক্ষা অধিক ভরবিশিষ্ট কোন নতুন পরমাণুর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, কোন বৈজ্ঞানিকই তাঁর পরীক্ষাসমূহ কখনো এলোমেলো ভাবে চালান না—বৈজ্ঞানিক অন্তত তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূর্ব হতেই স্থির করে রাখেন। ফের্মি বার বার পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন ইউরেনিয়ম-৯২ নিউক্লিয়াসের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘাতের ফলে উৎপন্ন পদার্থটি সত্যই ইউরেনিয়মের চেয়ে বেশী ভারী অর্থাৎ ৯৩-তড়িৎ চার্জের কোন মৌলিক পরমাণু কিনা; কিন্তু গভীর হতাশার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন অল্প কিছু পরিমাণ ৯৩-তড়িৎ চার্জের ইউরেনিয়ম উত্তর উপাদানের চিহ্ন পাওয়া গেলেও—মূল উপাদান হিসেবে যেগুলিকে পাওয়া গেল তারা হল বেরিয়ম, ল্যানথানিয়ম, টেলারিয়ম, ক্রিপ্টন প্রভৃতি বহু মাঝারি ভারের মৌলিক পরমাণু। প্রশ্ন জাগলো এই মাঝারি ধরনের পরমাণুগুলির আইসোটোপগুলি এলো কোথা হতে? ইউরেনিয়মের সঙ্গে তারা তো পরীক্ষার আগে ছিল না—তাহলে পরীক্ষার পর তাদের পাওয়া যাচ্ছে কেন? এইটেই সবচেয়ে অবাক করেছিল ফেরমি তথা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের।[৬-৭]

ফেরমির প্রথম পরীক্ষার পাঁচ বছর পরে ১৯৩৯ সালে বার্লিনের কাইজার ভিলহেল্‌ম গবেষণাগারে, অটো হান ও ফ্রাইট্জ স্ট্রাসম্যান এবং ডেনমার্কে নির্বাসিত ফ্যাসিবিরোধী পদার্থবিদ লিজে মাইটনার এবং অটো ফ্রিশ সেই পরীক্ষার যে পরীক্ষামূলক ও তত্ত্বগত ব্যাখ্যা করেন তা বোঝবার মত বিচক্ষণতা তখন খুব কম লোকেরই ছিল। অটো হান এবং স্ট্রাসম্যান ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াসের ভাঙন ঘটালেও তার পুরো তাৎপর্য তখনো তাঁদের কাছে ধরা পড়েনি। এটা যে বিপুল শক্তি-ভাণ্ডার উন্মোচন করার নতুন একটা চাবিকাঠি তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি প্রথমটা—তাই অকপটে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের গবেষণার ফলাফল ছেপে প্রচার করা হল। প্রকৃতপক্ষে লিজে মাইটনার এবং তস্য ভাগিনেয় ফ্রিশ এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পরীক্ষাটির যে তত্ত্বগত ব্যাখ্যা করলেন তাতেই পদার্থবিদগণ সবাই উত্তেজিত হলেন এবং ক্রমশ ক্রমশ এই ব্যাপারটি তাঁদের কাছে চিন্তার বিষয় বলে মনে হল। এই ঘটনার মাত্র নয় দিন পরে ফেরমি বার্লিনের পরীক্ষাটির অনুরূপ পরীক্ষা পুনরায় করে দেখলেন—এবং বুঝলেন আসলে ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াসটি ভেঙে গেছে, যার জন্য তিনি ঐ একই পরীক্ষা ১৯৩৪ সালে করার সময় পেয়েছিলেন বেরিয়ম, ল্যানথানিয়ম প্রভৃতি মাঝারি সাইজের পরমাণুগুলির আইসোটোপ-গুলিকে। একই সময়ে স্বাধীনভাবে প্যারিসে ফ্রেডারিক জোলিও কুরি ইউরেনিয়মের নিউ-ক্লিয়াসের ওপর নিউট্রনের "বম্বার্ডমেন্ট" ঘটিয়ে একই ফল পান। নিউক্লিয়াসের ভাঙন—"ফিসন" (fission) কথাটি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন লিজে মাইটনার ও ফ্রিশ। এই অদ্ভুত পরীক্ষার যে ব্যাখ্যা লিজে দিলেন তা সুন্দর এবং কার্যকরী হলেও পূর্ণাঙ্গ একটি তত্ত্বের অভাবে সবকিছু বুঝেও যেন কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না—নীলস বোর এবং তরুণ পদার্থবিদ হুইলার আমেরিকার প্রিন্সটনের —'সেণ্টার অব এ্যাডভান্সড্ স্টাডিসে' তাই প্রয়াস চালালেন ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াসের ভাঙন তথা ফিসনের একটা তত্ত্ব প্রণয়ন করার জন্য।

৬ Atoms in the Family by Fermi, Laura

৭ My Life with Enrico Fermi by Fermi, Laura

তার ফলশ্রুতি হল বোর-হুইলারের—"তরল বিন্দু মডেল" (liquid drop model)। গাছের পাতা হতে এক বিন্দু জল ঝরে পড়ার চিত্রটা কল্পনা করা যাক্। জলবিন্দু কিন্তু গোটাগুটি ঝরে পড়ে না—প্রথমে সেটির পেট সরু হয়ে একটা বোতলের মতো বা ডামবেলের মতো আকৃতি নেয়। তারপর ক'য়েক মুহূর্ত টান টান হয়ে হঠাৎ এক সময় নীচের অংশটা ভারি হওয়ায় তা ছিঁড়ে পড়ে। আরেকটা ছবির কথা কল্পনা করা যাক্—এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ত রেলিঙে ঝুলছে—সেটিকে আঘাত করলেই তা সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি বিন্দুতে ভেঙ্গে যাবে। বিন্দুগুলি কিন্তু একই জলের নতুন কতকগুলি ফোঁটা। ইউরেনিয়মের নিউক্লিয়াসে আঘাতের ফলে অনুরূপভাবেই কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কেন্দ্রক পাওয়া যায়—যদিও তাদের গঠন উপাদান একই।[৮]

ইউরেনিয়ম-২৩৫ আইসোটোপের নিউক্লিয়াসের উপর নিউট্রন নামক অত্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি মৌলিক কণিকার সাহায্যে বম্বার্ডমেণ্ট অথবা আঘাত করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরেনিয়মের ভারী নিউক্লিয়াস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে গেল—আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ আবার ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কি আছে ? সবই তো বেশ পরিষ্কার। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে এগুতে চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে—ব্যাপারটা পরিষ্কার তো নয়ই বরং যথেষ্ট অস্বাভাবিক। প্রথমেই ধরা যাক্ ইউরেনিয়ম পরমাণু ও নিউট্রন এই দুইটির তুলনামূলক আকৃতির কথা। ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াসের তুলনায় একটি নিউট্রন ২৪০ ভাগ ছোট। বড়সড় একটি তরমুজকে একটি পাতিলেবু দিয়ে আঘাত করলে দেখা যাবে পাতিলেবুটি ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। তবে নিউট্রনটি যদি অত্যন্ত দ্রুতগতি হয় তাহলে নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হলেও হতে পারে—কারণ হয়ত এক্ষেত্রে ভরবেগ (momentum) ব্যাপারটির গুরুত্ব হিসেবের মধ্যে অবশ্যই আনতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও দেখা গেল আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিপত্তি। বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করলেন ইউরেনিয়ম-২৩৫ পরমাণুকে ভাঙতে হলে যে "নিউট্রন বুলেট" প্রয়োগ করতে হয় তা দ্রুতগতি তো নয়ই বরং যথেষ্ট ধীরগতিই বলা চলে। তাপ-তরঙ্গের গতিতে ধাবমান ধীরগতি এই নিউট্রনগুলির বৈজ্ঞানিক নাম "থার্মাল নিউট্রন"। এই "থার্মাল নিউট্রন" গুলি ইউরেনিয়ম কেন্দ্রকের কাছাকাছি পৌঁছানো মাত্র কেন্দ্রকের প্রোটন এবং নিউট্রনগুলি যে বন্ধন-শক্তির (Binding Energy) দ্বারা গ্রথিত থাকে, তা সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং সেই শক্তিই কার্যতঃ ঐ থার্মাল নিউট্রনগুলিকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে টেনে নেয়। স্বভাবতই নিউট্রন বুলেট যদি দ্রুতগতি হত, তবে নিউক্লিয়াসে তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যেত। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থার্মাল নিউট্রনটি যে সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় সেটি এক সেকেণ্ডের অতি তুচ্ছ এক ভগ্নাংশ। ঘটনাটি ঘটে এক সেকেণ্ডের লক্ষ কোটি ভাগেরও একশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে। সময়টা গণিতের সাহায্যে হিসেব করা গেলেও— তার সম্পর্কে ধারণা করা কিন্তু অসম্ভব। তাই বলে হতাশ হবার কিছু নেই—পদার্থবিজ্ঞানের সব সময়গুলিই যে এ ধরনের "অকল্পনীয়" তা বলা যায় না। যেমন "ফিসন" অর্থাৎ কেন্দ্রক-বিভাজন ক্রিয়াটি ঘটে আগের সময়টির চেয়ে একশ কোটি

৮ Great Experiments in Physics by Shamos, M.

গুণ বেশী সময় নিয়ে। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে "মাত্র" লক্ষ কোটি কেন্দ্রক-বিভাজন হওয়া সম্ভব।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিউট্রনের আঘাতে যখন U-২৩৫ এর কেন্দ্রক ভেঙে যায়, তখন তা হতে জন্ম নেয় দুটি দ্রুতগতি নিউট্রন। এই নবজাত নিউট্রন দুটি আরও দুটি কেন্দ্রককে আঘাত করে তাদের ভেঙে ফেলে – ফলে এবার নিউট্রনের সংখ্যা হয় চার। এমনি করে চক্রবৃদ্ধি হারে নিউট্রনের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। হিসেব করলে দেখা যাবে আশি-তম ভাঙনের ক্ষেত্রে নির্গত নিউট্রনের সংখ্যা হবে ১০^২৪। হিসেব করে দেখা গেছে প্রতিটি বিভাজনে ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (200 Mev) শক্তি নির্গত হয়—এই অবস্থায় ৮০-তম বিভাজন স্তরে প্রাপ্ত মোট শক্তির পরিমাণ হয় ৪ × ১০^২৬ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (4×10^{26} Mev) অথবা ২ × ১০^১৩ ক্যালরি তাপ। ইউরেনিয়ম কেন্দ্রকের এ ধরনের বিভাজনকে "শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া" (Chain Reaction) বলা হয়। শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খলকে যদি অব্যাহতভাবে চলতে দেওয়া হয় তবে ৮০-তম বিভাজন স্তর অতিক্রম করতে সময় লাগবে মাত্র ১০^-৬ সেকেণ্ড। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই U-২৩৫ এর সবটা বিভাজিত হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড শক্তি মুক্তি পাবে সেখান হতে। প্রতিটি বিভাজনের ক্ষেত্রে U-২৩৫ কেন্দ্রক দুটি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে —এবং পরস্পর থেকে তারা ছিটকে যায় যে গতিতে সেটা সেকেণ্ডে ৬,০০০ মাইলেরও বেশী।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—খানিকটা বিভাজনক্ষম পদার্থ থাকলেই যে তার বিস্ফোরণ হবে তা নয়। ইউরেনিয়ম যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে বিভাজনকালে নিঃসৃত নিউট্রনগুলি ইউরেনিয়মে ধাক্কা না খেয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সোজা কথায় বলা যেতে পারে ইউরেনিয়মের "স্তূপটির" (pile) আয়তন এত বড় হওয়া দরকার যাতে ফসকে যাওয়া নিউট্রনের সব ক্ষতিপূরণ হয়ে নিউট্রনের পুনরুৎপাদন সম্ভব হবে। পদার্থবিজ্ঞানীগণ এই পরিমাণ ইউরেনিয়ম স্তূপের নাম দিয়েছেন "ক্রান্তিমাত্রিক ভর" (Critical mass)। হিসাব করে দেখা গেছে U-২৩৫-এর ভর যদি দুই পাউণ্ডের চেয়ে কম হয়, তাহলে তা বিস্ফোরিত হয় না। দুই পাউণ্ডের চেয়ে বেশী থাকলে তবেই তা বিস্ফোরিত হবে—এবং তার ফলে নির্গত হবে কুড়ি হাজার টি. এন. টি. বিস্ফোরকের তেজের সমান শক্তি।

প্রকৃতিতে U-২৩৮এর পরিমাণ হলো শতকরা ৯৯·৩ ভাগ এবং U-২৩৫ এর পরিমাণ হলো মাত্র শতকরা ০·৭ ভাগ। এই দুই ধরনের ইউরেনিয়ম মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে এবং U-২৩৫ অত্যন্ত কম পরিমাণে প্রকৃতিতে থাকায় এবং সর্বোপরি ফিসন তথা কেন্দ্রক বিভাজনের জন্য U-২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রকের প্রয়োজন একান্ত বলে ইউরেনিয়ম-২৩৫ কে প্রকৃতি হতে আলাদা করতে হয়। সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে U-২৩৮ হতে U-২৩৫ কে পৃথক্ করার জন্য।

প্রথম পদ্ধতিতে – ইউরেনিয়মের কণাগুলিকে তীব্র গতিতে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের (Electric Field) মধ্যে দিয়ে চালানো হয়। U-২৩৮ কণিকাগুলি ভারী হওয়ায় সেগুলি সোজা চলে যাবে, কিন্তু U-২৩৫ কণিকাগুলি হাল্কা হওয়ায় সেগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে বেঁকে গিয়ে ক্ষেত্রের (Field) ধারে ধারে জমে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ইউরেনিয়মকে ইউরেনিয়ম হেক্সা ফ্লোরাইড্ (UF_6) নামক একটা বিষাক্ত সবুজাভ গ্যাসে পরিণত করা হয়। এই গ্যাসকে পাম্প করে ঢোকানো হয় একটি কক্ষে, তার মাঝে

থাকে একটি ছাঁকনি। চাপের ফলে গ্যাস এই ছাঁকনি দিয়ে ওপাশের শূন্যকক্ষে প্রবেশ করে। গুরু ইউরেনিয়মের চেয়ে লঘু ইউরেনিয়মের ওজন ৩-ইউনিট কম বলে লঘু-ইউরেনিয়মের অণুর গতি গুরু ইউরেনিয়মের অণুর গতির চেয়ে দ্রুততর। ফলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখা যাবে এই শেষের কক্ষের গ্যাসে লঘু-ইউরেনিয়ম অণুর অনুপাত অনেক বেড়ে গেছে। এইভাবে বহু ছাঁকনির মধ্য দিয়ে গ্যাসকে চালিয়ে শেষ পর্যন্ত একসময় শুধু U-২৩৫ অণু পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতির নাম "ছাঁকনি পদ্ধতি"(diffusion method)। আমেরিকার ওক-রিজের ইউরেনিয়ম পৃথক্ করার কারখানায় এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। ছাঁকনি দেওয়া কক্ষের সংখ্যা সেখানে চার হাজার। সব ছাঁকনির মোট সছিদ্র আয়তন দাঁড়াবে ৪৯.৫ একর—ছাঁকনিতে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে আছে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র।

অবশ্য পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে সর্বদা একেবারে বিশুদ্ধ U-২৩৫ পরমাণুর প্রয়োজন হয় না। সাধারণত U-২৩৫ পরমাণু একটু বেশী থাকলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু লঘু ইউরেনিয়মের পরিমাণ ১/১৪০ ভাগ থেকে ১/২০ ভাগে তুলতে গেলেও ইউরেনিয়ম আইসোটোপ পৃথক্করণের প্রায় একই কারিগরী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এভাবে লঘু এবং গুরু ইউরেনিয়ম আলাদা করা যায় বটে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা পরিমাণে কম বলে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে লাগলেন—কোনভাবে প্রকৃতিতে বেশী পরিমাণে থাকা U-২৩৮ থেকেও পরমাণু বোমা তৈরী করার কোন মশলা তৈরী করা যায় কিনা। ফেরমি লক্ষ্য করলেন যে নিউট্রন দিয়ে ২৩৮-ইউরেনিয়ম কেন্দ্রককে আঘাত করলে তা ঐ কেন্দ্রকের সঙ্গে মিশে যায়, এবং উৎপন্ন হয় ইউরেনিয়ম-২৩৯ নামক নতুন একটি আইসোটোপ। U-২৩৯ এর কেন্দ্রক হতে একটি বিটা কণিকা (β-particle) বেরিয়ে যায়; ফলে পাওয়া যায় অপর একটি নতুন মৌলিক পরমাণু নেপচুনিয়ম।[৯] পুনরায় নেপচুনিয়ম হতে যখন আরেকটি বিটা-কণিকা বেরিয়ে যায়, তখন পাওয়া যায় প্লুটোনিয়ম-২৩৯ (Pu-২৩৯)। পরীক্ষা করে দেখা গেল U-২৩৮ হতে পাওয়া প্লুটোনিয়মকে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করলে সেটির ফিসন হয় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। যেহেতু প্লুটোনিয়ম অনায়াস-লব্ধ U-২৩৮ হতে পাওয়া যায় এবং তা যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ীও বটে—সেহেতু পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মশলার সমস্যাটির সমাধান অনেকাংশে হয়ে গেল বলা চলে।[১০]

হিরোসিমার বোমায় U-২৩৫ দ্বারা নির্মিত একটি পুরুচাদরের বাটিকে টার্গেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং U-২৩৫ নির্মিত একটি নিরেট বলকে ব্যবহার করা হয়েছিল বুলেট হিসাবে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে টার্গেট অথবা বুলেটের ভর ক্রান্তিমাত্রিক ভর (critical mass) অপেক্ষা কম। যান্ত্রিক উপায়ে দ্বিতীয় টুকরোটিতে ফায়ার করে প্রথমটির গর্তে প্রবেশ করানো মাত্র—ঐ

---

৯ বিটা-কণিকা হলো পরমাণুর খোলসে থাকা ইলেকট্রন—এর ভর অত্যন্ত কম, সেজন্য গাণিতিক সমতার সময় এর ভর শূন্য ধরা হয়। এটি এক একক ঋণাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট।

১০ U-২৩৮ হতে প্লুটোনিয়ম কি ভাবে পাওয়া যায় তার বিক্রিয়া দেখানো হল:

(i) $_{92}U^{238} + {}_{0}n^{1} \rightarrow {}_{93}Np^{239} + \beta^{-}$; (ii) $_{93}Np^{239} \rightarrow {}_{94}Pu^{239} + \beta^{-}$
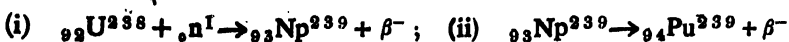
দু'টির যুক্ত ভর ক্রান্তিমাত্রিক ভরের চেয়ে সামান্য বেশী হয়ে যায় এবং তা সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছিল।

নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা প্লুটোনিয়ম-২৩৯ (Pu-২৩৯) দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। প্লুটোনিয়মের কতকগুলি টুকরোকে একটি গোলাকার পাত্রে রেখে তার চারদিকে ডিনামাইট জাতীয় সাধারণ বিস্ফোরক দিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল। ডিনামাইট বিস্ফোরিত হলে, সেই বিস্ফোরণের শক্তি পাত্রের ভিতরের দিকে চাপ দেয়; ফলে প্লুটোনিয়ম-২৩৯ টুকরো-গুলির আয়তন হ্রাস তথা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে প্লুটোনিয়মের ভর তার ক্রান্তিমাত্রিক ভর অপেক্ষা সামান্য একটু বৃদ্ধি পায়, ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে মূল পরমাণু বোমাটির।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উপর মানুষের জয়-লাভের ইতিহাসটা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হলেও—এর শুরুটি সত্যিই রঙিন। বৈজ্ঞানিকগণ যে প্রাকৃতিক সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন সেটা তাঁদের কিছু নিজস্ব সম্পত্তি নয়। আর কুমতলবেও কোন বিজ্ঞানী কোন সূত্র আবিষ্কার করেন না। উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে সে ঢিল নির্ঘাত মাটিতেই ফিরে আসবে—এটি একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র। কিন্তু সে ঢিল জুতসই ভাবে ছুঁড়লে কারুর মাথাতে আঘাত করলে তার জন্য নিশ্চয়ই নিউটনকে অর্থাৎ তাঁর আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ সূত্রকে দোষী করা সঙ্গত হবে না। মানবতাবাদী প্রতিটি বিজ্ঞানীর তাই আজ এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক—"কে কাজে লাগাবে আমার এই আবিষ্কার—দেব না দানব?"

"শান্তির জন্য পরমাণু" এই বাক্যাংশটির অর্থ যেদিন পৃথিবীর সবার কাছে আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে, সেদিন আসবে সত্যকারের আনন্দের দিন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, কৃষি-গবেষণা, বিদ্যুৎ-শক্তি, যানবাহন-সমস্যা, জ্বালানী-সমস্যা ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে ঐ একরত্তি পরমাণু—আর তার কেন্দ্রকে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাগুলি। বিজ্ঞান থেমে থাকতে জানে না—চলাই তার মূলমন্ত্র। মানুষ চেয়ে আছে বিজ্ঞানের মুখের দিকে—কি উপহার দেবে সে আমাদের? অফুরন্ত স্বাচ্ছন্দ্য নাকি এক দমকে দশ লক্ষ মানুষকে কি ভাবে মারতে হয় তার জন্য নিত্য নতুন ব্রহ্মাস্ত্র? মানুষের শুভ বুদ্ধির জয় অনিবার্য—সেই শুভ বুদ্ধিই আমাদের নতুন কোন স্বর্গে উত্তীর্ণ করুক—আর সেই স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে বেঁচে থাক পরমাণু— সৃষ্টির বীজ-কণিকা, মহাশক্তিধর পরমাণু।

'প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে···
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্বগুণভেদ,
একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্তমান।
আমি হই বিকাশ আবার।···
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

বুঝিয়ে দাও

বনফুল

তোমার দয়া তোমার দয়া সব
পারছি না যে করতে অনুভব।
উনুনেতে জ্বলছে হু হু আঁচ
তপ্ত তেলে লাফাচ্ছে কই মাছ
তোমার দয়া তোমার দয়া সব
পারছি না যে করতে অনুভব।

কাটা ঘায়ে পড়ছে নুনের ছিটে
অবিচারের চাবুক পড়ছে পিঠে
গান থেমেছে, উঠছে চারিভিতে
হাহাকারের রব
তোমার দয়া তোমার দয়া সব
পারছি না যে করতে অনুভব।

হে মহানুভব,
হয়তো মোরা বুদ্ধিহীন সব।
তোমার করুণাটি
মাপতে পারি, হাতে মোদের
নাই সে মাপকাঠি
নিজের সুখ দুঃখ নিয়ে
করছি ফাটাফাটি
করছি কলরব
তোমার দয়া তোমার দয়া সব
পাচ্ছি না তাই করতে অনুভব।
স্বার্থপর অভাগাদের ভারটি তুমি নাও
তোমায় বোঝার শক্তি তাদের দাও
সুখ দুঃখ মোদের সৃষ্টি, তোমার দান নয়
বুঝিয়ে দাও এই কথাটি, হে করুণাময়!

প্রার্থনা

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী*

আমি মা তোর কাঙাল ছেলে
কোলে তুলে নে মা তোর,
কাঁদছি আমি আকুল হ'য়ে
ডাকছি তোরে জীবন ভোর

মোক্ষ মুক্তি জ্ঞান ভক্তি
সব আছে মা তোরই হাতে,
ডুবাসনে মা আর আমারে
ফেলে নানা ছলনাতে।

রামকৃষ্ণগত-প্রাণা
তুই যে গো মা সারদা
ছ'হাত ভরে কৃপা বিলাস
সর্বশক্তিমূলাধারা (তুই) বরদা।

কৃপা করে তোর পায়ে মা
দে মা আমায় স্থান করে
ছ'হাত তুলে নাচি আমি
মা-মা আরাব মুখে ধরে।

ভোগবাসনার নরককুণ্ডে
দিস্ না আর আমায় ফেলে
কোলে তুলে নে মা আমায়
আমি যে তোর ছঃখী ছেলে।

রক্তরাঙা

শ্রীমতী আরতি বসু†

সন্ধ্যাকাশের রাঙা আলো
কেন এমন লাগল ভালো
কেন আমার মনের আকাশ
এমন করে রাঙিয়ে গেল।

পশ্চিমের ঐ গগন কোণে
রক্তরাঙা ফুলের বনে
কৃষ্ণচূড়ার রং-এর সাথে
রাঙিয়ে ওঠে পরাণ মম।

কোথায় বসে মনের কোণে
কে যেন গো আপন মনে
বিশ্বপ্রেমের রং-এর তুলি
বুলিয়ে দিল আমার প্রাণে।

কোন্ সে রসিক চিত্রকরে
রামধনুটির রংটি ধরে
কত রং-এর জাল বুনেছে
আমার প্রাণের অন্ধকারে।

ভুবনখানি আজ আমি তাই
রঙীন দেখি যেদিক তাকাই
রক্তরঙে চিত্ত আমায়
বারে বারে কেবল রাঙাই॥

* এম. এ., সাহিত্যবিশারদ। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়া দেবী কলেজ; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ: গ্রন্থকার।

† অধ্যাপিকা, সঙ্গীত ভবন, শান্তিনিকেতন।

রাত

বকলম

'সে এক শুভরাত্রি—
আমি ছিলাম অচেনা পথের যাত্রী ;
বেরিয়েছিলাম গোপনে, সকলের অসাক্ষাতে—
কোন বাতি ছিল না আমার হাতে ;
শুধু মনের মধ্যে জ্বলছিল একটি আলো,
সেই আলোই আমাকে পথ দেখালো ;
আমাকে নিয়ে গেল তার খুব কাছে—
যে, আমি জানতাম, আমার পথ চেয়ে আছে।
এও আমি বরাবর জানি—
সেখানে থাকবে না আর কোন প্রাণী।
আমার দিশারী যে ছিল সে কি ও ?
আহা, আঁধার, আমার আঁধার—ভোরের চেয়ে প্রিয় !'

যে আঁধার এতো প্রিয় সেণ্ট জনের
তা প্রেয় হয় ক'জনের ?
আত্মার আঁধার যামিনী—
বুঝবে না কেউ যে অত দূরে যায়নি।

মানুষ যখন ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি আসে
তখনই সে পড়ে আঁধারের গ্রাসে ;
অবসাদ-বিষাদের অতল গহ্বরে,
শীতার্ত গাছের মতো, সে শুকিয়ে মরে।
তার খবর কি রাখে—
ঈশ্বর থেকে আরামের দূরত্বে যে থাকে ?
সে-অন্ধকারে হৃদয় হয় ভালবাসা-রিক্ত,
এমন কি, প্রার্থনা করাটাও মনে হয় তিক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণকে

শ্রীঅলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

তোমার দুটি চোখ
যতবার দেখেছি, বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে গেছি,
ভেবেছি ও-চোখে কিসের ঝিলিক—
ভূমানন্দের ? ব্রহ্মস্বাদের ? —জানি না।
আমার মনে হয়েছে ও-চোখে ছবি রয়েছে
মায়ের করুণার!
বাংলা মায়ের শ্যামল কোমল শান্তি,
তার স্তব্ধ দীঘির টলটলে জল আর আমবাগানের ছায়া···
তার মেঘ-কাজল আকাশের নিবিড় নীলিমা
আর বিশাল ক্ষেতের সরল ঔদাস্য···
যেন হাতছানি দিচ্ছে তোমার মুখে,
তোমার দু'টি চোখে!

ও দু'টি চোখ বিশ্বের অনেক আত্মাকে আলো দেয় শুনেছি,
বাংলার গাঁয়ের 'মূর্খ' ছেলেটিকে অনেকে
ভগবান বলে পূজো করে জেনেছি···
কেন করে জানি না, তবে বুঝেছি,—
জীবনের যা পরম প্রাপ্তি তা তারা খুঁজে পেয়েছে ও দু'টি চোখে।

আজ সভ্য মধ্যাহ্নের আলো-ঝলসানো পথে
জীবনও ঝলসে গেছে আমাদের,···
দেখে করুণায় ভরে উঠেছে তোমার দু'টি চোখ!
আজ এই দেউলিয়া বিশ্বাসের যুগে
আবার ও দু'টি চোখের আলো থেকেই বিশ্বাসের দীপ জ্বেলে নিতে হবে,
যে চোখের অহেতুক করুণার স্পর্শের প্রশান্তি—
সন্ন্যাসের মাঠ থেকে সংসারের চোরাগলিতে পালালেও
মায়ের মতো পরম নির্ভরতা দিয়ে মুখে ধরবে সুধাপাত্র!
আজকের এই রোদে-পোড়া হতাশ্বাস দিনে
তোমার দু'টি চোখের দিকেই আবার তাকাচ্ছি—
ও দু'টি চোখ ছাড়া
কে আনবে আমাদের জীবনে পঞ্চবটীর ছায়া!

নমো লীলাবতারায়

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

'আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।'

লীলা ভগবানের বিলাস। ভক্তের সঙ্গে লীলা করিয়া তিনি আনন্দলাভ করেন। যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহার যে লীলা-প্রবাহ চলিতেছে, তাহার কতটুকুই বা মানব-বুদ্ধির গোচর? মাঝে মাঝে তাঁহার অনন্তলীলার যে সামান্য অংশমাত্র আমাদের নয়নগোচর হয় তাহাতেই আমরা মুগ্ধ হই—বিস্মিত হই

ভক্তি ভগবানের বড় প্রিয় বস্তু। মনোমোহনের বৈঠকখানায় ঠাকুর বলিতেছেন --"যে অকিঞ্চন, যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিস। খোল-মাখানো জাব যেমন গরুর প্রিয়! দুর্যোধন অত টাকা, অত ঐশ্বর্য দেখাতে লাগল; কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। তিনি বিদুরের বাটী গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বৎসের পাছে যেমন গাভী ধায় সেইরূপ তিনি পাছে পাছে যান।"

ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শক্তি-প্রভাবে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কিছুদিনের মধ্যেই একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রবাবু সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভব, কৃতবিদ্য ও অতি মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সওদাগরী অফিসে কাজ করিতেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'সুরেন্দর' বলিয়া ডাকিতেন। এই সহৃদয় ভক্তকে ঠাকুর তাঁহার অর্ধেক রসদ্দার বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই ভক্তপ্রবর ঠাকুরের সঙ্গলাভমানসে প্রায় প্রত্যেক রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাঁহার পূতসঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন,—"লোকে বাঁদরছানা হইতে চায় কেন? বিড়ালছানা হইলে তো ভাল হয়। বাঁদরছানার স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরে, তখন মাতা তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। কিন্তু বিড়ালছানার স্বভাব সেরূপ নহে, তাহার মাতা তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সে সেই স্থানে পড়িয়া ম্যাও ম্যাও করিতে থাকে।" —এই অমূল্য উপদেশটি সুরেন্দ্রের হৃদয়ে মূলমন্ত্রবৎ কার্য করিয়াছিল। তাহার হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—

'জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম
এমন ধন আর নাহি যে তোমাসম।'

ঠাকুরের 'সুরেন্দর' যে কেবলমাত্র উদার ভক্ত ছিলেন তাহাই নহে, তিনি প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুরের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভাবটি তিনিই প্রথম বুঝিয়া একখানি ছবি প্রস্তুত করিয়া তাহা ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। ছবিখানি দেখিয়া কেশববাবু একপত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"যাহা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য।"

সর্বোপরি সুরেন্দ্র ছিলেন অতি সরল, অকপট। তিনি ভক্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন। মন্দিরে দেবীর সম্মুখে যখন তিনি 'মা, মা' রবে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিতেন, তখন অতি পাষণ্ডের হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হইত। এই পরমভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন—'তোমাকে একদিন দেবীপুত্র দেখেছিলাম। তোমার দুই-ই আছে, যোগ আর ভোগ। না

হ'লে তোমার চেহারা শুষ্ক হ'ত। দেবীভক্ত ধর্ম মোক্ষ দুই-ই পায়।'

ভক্তপ্রবর 'সুরেন্দ্রের' সঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মালা লইয়া যে লীলা-বিলাস হইয়াছিল তাহার মনোরম চিত্রগুলি কথামৃতের স্থানে স্থানে বিধৃত রহিয়াছে। ছড়ানো চিত্রগুলিকে কুড়াইয়া একত্র করিলে যে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি হয়, তাহা নয়নাভিরাম।

প্রথম চিত্রটি উদ্ঘাটিত হয় সুরেন্দ্রের বাটীতে। অন্য চিত্রগুলি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। অঙ্গহানির ভয়ে চিত্রগুলি যথাযথ তুলিয়া ধরিতেছি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের কোন আসন্ন এক সন্ধ্যায় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গোস্বামী, ভোলানাথ পাল প্রভৃতি প্রতিবেশিগণ এবং ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল ও আরও অনেক ব্রাহ্মভক্ত সমবেত হইয়াছেন।

"সুরেন্দ্র মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে আসিলেন। তিনি মালা হাতে লইলেন—কিন্তু দূরে নিক্ষেপ করিয়া একপাশে রাখিয়া দিলেন।

"সুরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে পশ্চিমের বারাণ্ডায় গিয়া বসিলেন; সঙ্গে রাম ও মনোমোহন প্রভৃতি। সুরেন্দ্র অভিমানে বলিতেছেন;—আমার রাগ হয়েছে; রাঢ় দেশের বামুন এসব জিনিসের মর্যাদা কি জানে! অনেক টাকা খরচ করে এই মালা; ক্রোধে বললাম সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ; ভগবান পয়সার কেউ নয়; অহংকারেরও কেউ নয়! আমি অহংকারী, আমার পূজা কেন লবেন! আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই। বলিতে বলিতে অশ্রুধারা গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল ও বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

"এদিকে ত্রৈলোক্য ঘরের মধ্যে গান গাহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। যে মালা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই মালা তুলিয়া গলায় পরিলেন। এক হাতে মালা ধরিয়া, অপর হাতে দোলাতে দোলাতে গান ও নৃত্য করিতেছেন।

হৃদয় পরশমণি আমার—

আখর দিতেছেন—

(ভূষণ বাকি কি আছেরে!)

(জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি !)

সুরেন্দ্র আনন্দে বিভোর—ঠাকুর গলায় সেই মালা পরিয়া নাচিতেছেন! মনে মনে বলিতেছেন, ভগবান দর্পহারী! কিন্তু কাঙ্গালের অকিঞ্চনের ধন।"

ভক্তহৃদয়ে যখনই অহংকার অভিমানের উদয় হয় তখনই তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান নিষ্ঠুর হন, দূরে সরিয়া দাঁড়ান। কিন্তু যিনি একবার পরমকরুণাঘন ভগবানের আনন্দ-সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অহংকার অভিমান হয় বড়ই ক্ষণিকের। অনুতাপ-অশ্রুতে তাঁহার চিত্ত অতি সত্বর নির্মল হয় এবং বিশুদ্ধসত্ত্ব সেই ভক্ত পুনরায় বাঞ্ছিত ধনকে হৃদয়ে লাভ করিয়া শাশ্বত শান্তি লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয়ের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

কেশবের সংস্পর্শে গোপবধূগণ ভাগবতী তনু লাভ করিলেন ও তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ভগবানের নিকট হইতে এইরূপ মান লাভ করিয়া তাঁহারা বড়ই মানিনী হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদিগের এই অহংকার অভিমান দূর করিবার নিমিত্ত সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তখন কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহাদের হৃদয়

দ্রবীভূত হইলে দর্পহারী ভগবান পুনরায় তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

'অভিমান অহংকারে ঘটায় উৎপাত।
গগনবিভেদী গিরিবর ভূমিসাৎ॥
সমুন্নত সাধকেরও নাই অব্যাহতি।
ক্ষুরের ধারের ন্যায় ধরমের গতি॥'

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ন্যায় সমুন্নত সাধিকাও এই দুর্বার অভিমান অহংকারের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। লীলাপ্রসঙ্গকার এই সাধিকার কথায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুপদে ভাগ্যক্রমে বৃত হইয়া 'তিনি সর্বাপেক্ষা বড়, তাঁহার কথা সকলে সর্বদা মানিয়া চলুক, না চলিলে তাহাদের কল্যাণ নাই'—এই প্রকার ভাবসমূহও তাঁহার মনে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে যে কখন কখন শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহাতেও তিনি ঈর্ষান্বিতা হইতেন। ...যাহা হউক, পরিশেষে ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণী তাঁহার মনের এই দুর্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।" চৈতন্যোদয়ে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন যে—

'আপনি শ্রীভগবান গৌরাঙ্গাবতার।
ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ বাহ্যে ভাব শ্রীরাধার॥
সেই সে ঠাকুর এবে রামকৃষ্ণ নামে।
মূর্তিমান নরলোকে লীলার কারণে॥'

ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার মনের মলিনতা দূর হইলে, তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভমানসে দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া তীর্থপর্যটনে যাত্রা করিলেন।

মাল্য-লীলায় দ্বিতীয় চিত্রটির স্থান কাশীপুর উদ্যানবাটী। ঠাকুর অসুস্থ। ত্যাগী ভক্তেরা সর্বক্ষণ থাকিয়া ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষা করেন আর গৃহী ভক্তেরা প্রায় সর্বদাই আসিয়া খোঁজ খবর করেন। সুরেন্দ্র গৃহী ভক্ত।

"রাত্রি আটটা। ঠাকুর শয্যাতে বসিয়া আছেন, দু'একটি ভক্তও সম্মুখে বসিয়া। সুরেন্দ্র অফিসের কার্য সারিয়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, হাতে চারটি কমলালেবু ও দুই ছড়া ফুলের মালা। সুরেন্দ্র ভক্তের দিকে এক একবার ও ঠাকুরের দিকে এক একবার তাকাইতেছেন; আর হৃদয়ের কথা সমস্ত বলিতেছেন।

"সুরেন্দ্র (মণি প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া)—অফিসের কাজ সব সেরে এলাম। ভাবলাম দুই নৌকায় পা দিয়ে কি হবে, কাজ সেরে আসাই ভাল। আজ ১লা বৈশাখ (১৩।৪।১৮৮৬), আবার মঙ্গলবার; কালীঘাটে যাওয়া হলো না। ভাবলাম যিনি কালী—যিনি কালী ঠিক চিনেছেন,—তাঁকে দর্শন করলেই হবে।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

"সুরেন্দ্র—গুরুদর্শনে, সাধুদর্শনে, শুনেছি ফুল ফল নিয়ে আসতে হয়। তাই এইগুলি আনলাম। আপনার জন্য টাকা খরচ, তা ভগবান মন দেখেন। কেউ একটা পয়সা দিতে কাতর, আবার কেউ বা হাজার টাকা খরচ করতে কিছুই বোধ করে না। ভগবান মনের ভক্তি দেখেন তবে গ্রহণ করেন।

"ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, 'তুমি ঠিক বলছো।'

সুরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, 'কাল আসতে পারি নাই, সংক্রান্তি। আপনার ছবিকে ফুল দিয়ে সাজালুম।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, 'আহা কি ভক্তি!'

"সুরেন্দ্র—আসছিলাম, এই দু'গাছা মালা আনলাম, চার আনা দাম।"

নববর্ষের দিন সুরেন্দ্র কালীঘাটে যান নাই। 'যিনি কালী—যিনি কালীকে ঠিক চিনেছেন—

সেই জীবন্ত জাগ্রত নরদেহধারী কালীর গলায় মালা পরাইবার জন্য দু'ছড়া মালা লইয়া কাশীপুর আসিয়াছেন। তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইলেন।

ঠাকুর ও ভক্তদের জন্য সুরেন্দ্র অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দান-ধর্ম সম্বন্ধে ঠাকুর কথাচ্ছলে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন,—'তোমায় বলছি কেন? তোমার হৌস এর (House, সদাগরের বাড়ীর) কাজ; আর অনেক কাজ করতে হয়; তাই বল্‌ছি।'

'তুমি অফিসে মিথ্যা কথা কও, তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার যে দান ধ্যান আছে; তোমার যা আয় তার চেয়ে বেশী দান কর; বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।'

সুরেন্দ্রের মনের ভক্তি দেখিয়াই ঠাকুর তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর দশ হাজার টাকা তিনি গ্রহণ করেন নাই। দরিদ্র বিধবা রমণীর দেওয়া দুই খণ্ড মুদ্রা (যাহার পরিমাণ ১ ফার্দিং মাত্র) সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া যীশু তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। ধনীদের দেয় অর্থের তুলনায় ঐ অর্থের পরিমাণ যত সামান্যই হউক না কেন—উহা দাতার হৃদয়বত্তা ও মনের ভক্তির জন্য অসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। পরিমাণ দ্বারা ভক্তির বিচার হয় না।

গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন:

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

নববর্ষের ঘটনার মাত্র আট-নয় দিন পরেই মাল্যলীলার শেষ দুইখানি চিত্র পরপর দুইদিন সংঘটিত হয়। গ্রীষ্মকাল। সারা দিন দুঃসহ উত্তাপ। সুরেন্দ্র খস্‌খস্ কিনিয়া ঠাকুরের ঘরে টানাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা গরম যখন কমিতে থাকে তখন ভক্তেরা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন।

"রাত্রি নয়টা হইল। সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে পুষ্পমালা আনিয়া নিবেদন করিয়াছেন। ঘরে বাবুরাম, সুরেন্দ্র, লাটু, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন।

"ঠাকুর সুরেন্দ্রের মালা নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন, সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাঁহারই পূজা করিতেছেন!

"হঠাৎ সুরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। সুরেন্দ্র শয্যার কাছে আসিলে প্রসাদীমালা (যে মালা নিজে পরিয়াছিলেন) লইয়া নিজে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন!

"সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আবার তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন। সুরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা করিলেন

'এ দয়া যে পেয়েছে, তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।'

পরদিনই সন্ধ্যাবেলা সুরেন্দ্র আবার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। "ভক্তেরা ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর প্রত্যহ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক একটি করিয়া গলায় ধারণ করেন। সুরেন্দ্র নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুইগাছি মালা দিলেন। সুরেন্দ্রও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গলায় পরিলেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত সঙ্গে সুরেন্দ্রের হৃদয়ে ভক্তির ক্ষুদ্র বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার অহংকার, অভিমান, অবিশ্বাস সমস্তই কালক্রমে শূন্যে বিলীন হইয়া একমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপ সচ্চিদানন্দ হৃদয়ে বিরাজিত রহিল। সুরেন্দ্ররূপ কাঁচা-সোনাকে পাকা করিবার জন্যই দর্পহারী ভগবান তাঁহার দেওয়া মালা একদা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সমস্ত মালিন্য দূরীভূত হইলে, সেই বিগত-অহংকার পাকা-সুরেন্দ্রের গলায় তিনি স্বহস্তে প্রসাদী মালা পরাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

নমো লীলাবতারায়।

ব্লাড প্রেসার

ডক্টর জলধি কুমার সরকার*

'ব্লাড প্রেসার' (Blood pressure) কথাটা এখন প্রায় বাংলা কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি শিশুর মুখেও শুনা যায় "বাবার ব্লাড প্রেসার হয়েছে"। এই ইংরাজী কথা দুটির শব্দার্থ হচ্ছে 'রক্তের চাপ'। অবশ্য আমরা ব্যবহার করি রক্তের 'অত্যধিক' চাপ অর্থে, কারণ রক্তের খানিকটা চাপ সকলের শরীরে থাকে এবং তা না থাকলে চলে না। ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

রক্ত-সংবহন (Blood circulation)

আমাদের শরীরের সকল অংশ—ত্বক্, মাংসপেশী, মেদ, মস্তিষ্ক, অস্থি প্রভৃতি অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও এরা জীবন্ত এবং এদের পুষ্টির জন্য অক্সিজেন (oxygen) বা অন্য যা কিছু দরকার তা রক্ত হতে আসে; আবার কোষের মধ্যে কার্বন ডায়োক্সাইড (carbon dioxide) বা অন্য যা কিছু আবর্জনা জন্মে, তা আবার তারা রক্তেতেই ছেড়ে দেয়; কাজেকাজেই রক্তের চলাচল হওয়া দরকার। আমাদের দেহে রক্ত-চলাচল হয় একটি বদ্ধ-প্রণালীর (closed system) মধ্যে। এই প্রণালীতে আছে হৃৎপিণ্ড, ধমনী (artery), ক্ষুদ্র ধমনী (arteriole), ক্যাপিলারি (capillary) ও শিরা (vein)। গর্ভে থাকাকালীন অবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত হৃৎপিণ্ড অবিরাম সঙ্কোচন-প্রসারণ (contraction and dilatation) করে চলেছে। হৃৎপিণ্ড মিনিটে প্রায় ৭২বার সঙ্কোচন ক'রে রক্তকে সজোরে ধমনীতে পাঠিয়ে দেয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন অবস্থাকে ইংরাজীতে 'সিস্টোল' (systole) বলে; দুইবার সিস্টোলের অন্তর্বর্তী অবস্থাকে 'ডায়াস্টোল' (diastole) বলে, যে সময় শিরা হতে রক্ত ঢুকে হৃৎপিণ্ডকে ভরে দেয়। সুস্থ সবল দেহে প্রায় ছয় লিটার রক্ত আছে এবং হৃৎপিণ্ডও প্রতি সঙ্কোচনে প্রায় পাঁচ আউন্স ($\frac{1}{7}$ লিটার) রক্ত ধমনীতে পাঠাচ্ছে। সিস্টোলের সময় যখন রক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে, তখন ধমনী প্রথমে কিছুটা প্রসারিত হয়, তার পরেই সামান্য সঙ্কুচিত হয়ে রক্তকে সামনে ঠেলে দেয়। সেই জন্য শরীরের যে কোন অংশে কোন ধমনীর উপর হাত রাখলে আমরা প্রতি সিস্টোলের সময় একটা ধাক্কা অনুভব করি। রক্তস্রোত ধমনী হ'তে ক্ষুদ্র ধমনীতে (arteriole-এ) যায়, এবং সেখান হতে ক্যাপিলারিতে ঢোকে। ক্যাপিলারিগুলি এত সূক্ষ্ম যে, তাদের মধ্যে রক্তের গতিবেগ অনেক কমে যায়। কিন্তু সেই কমার ফলে রক্ত এবং ক্যাপিলারির চারিপাশের জীবকোষগুলির মধ্যে আদানপ্রদানের কাজ (খাবার নেওয়া, আবর্জনা ফেলে দেওয়া, অক্সিজেন নেওয়া ও কার্বন ডায়োক্সাইডকে ছেড়ে দেওয়া) চলতে পারে। ক্যাপিলারি হ'তে শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে যাবার পথে ফুসফুসের মধ্যে কার্বন ডায়োক্সাইড ছেড়ে অক্সিজেন নেয়। আবার অন্য পথে অন্ত্রনালীর মধ্যে হজম হওয়া খাদ্যের সারাংশ শিরার রক্তের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে আসে। এদিকে বৃক্কের (kidney-র) ক্যাপিলারির মধ্যে রক্ত-চলাচলের সময় রক্তের

*কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

মধ্যে যে সব দূষিত পদার্থ জমা হয়ে থাকে তা চুঁইয়ে (filtered হয়ে) মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়। সে যাই হোক রক্তকে পায়ে বা মস্তিষ্কে যাওয়া আসা করতে হ'লে বেশ খানিকটা চাপ (pressure) থাকা দরকার। সেই চাপ সৃষ্টি করে মুখ্যতঃ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও গৌণতঃ ধমনীর গায়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশী আছে, তাদের সঙ্কোচন, এবং শরীরের অন্যত্র যে সব মাংসপেশী আছে, তাদের শিরা এবং ক্যাপিলারির উপর ধীরে ধীরে সঙ্কোচন। হৃৎপিণ্ডের কাছে ধমনীর মধ্যে রক্তের চাপ খুব বেশী এবং শিরা ও ক্যাপিলারির মধ্যে চাপ খুব কম। কিন্তু উপরি-উক্ত তিন প্রকার চাপের ফলে, বিশেষতঃ আর্টিরিয়োলের গায়ের মাংসপেশীর সক্রিয়তায়,—ক্যাপিলারির মধ্যে রক্তের চাপ প্রায় একই রকমের থাকে। এর ফলে জীবকোষগুলির লেনদেন-কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়।

রক্তের চাপ কি করিয়া মাপা হয়

যদিও রক্তনালীর যে কোন অংশে রক্তের চাপ মাপা সম্ভব, সুবিধার জন্য বাহুর মাংসপেশীর মধ্যে যে ধমনী আছে, সেইখানেই ইহা মাপা হয়। প্রত্যেক ধমনীর মধ্যে আবার সিস্টোল ও ডায়া-স্টোলে চাপের তারতম্য হয়। সিস্টোলের সময় চাপ বাড়ে এবং শরীরের যেকোন অংশে ধমনীর উপরে স্টেথোসকোপ (stethoscope) বসালে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের একটি শব্দ শোনা যায়। যে যন্ত্রটি দিয়ে রক্তের চাপ মাপা হয় তার নাম স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটার (sphygmomanometer)। বাহুর উপরাংশে একটি কাপড়ের চ্যাপটা থলি বেঁধে তার মধ্যে হাওয়া ঢুকিয়ে এমন চাপ দেওয়া হয় যাতে বাহুর মধ্যদেশে ধমনীর উপরে স্টেথোস-কোপ বসালে হৃৎপিণ্ডের সিস্টোলের কোন শব্দ শুনা যায় না। এদিকে থলির মধ্যে কতটা চাপ দেওয়া হয়েছে তা মাপা যায় যন্ত্রে পারার (mercury) মাত্রা কতটা (অর্থাৎ কত মিলি-মিটার) উঠেছে, তা হ'তে। তারপরে আস্তে আস্তে হাওয়া ছেড়ে দিয়ে দেখা হয় কখন ধমনীর উপরে হৃৎপিণ্ডে সিস্টোলের শব্দ প্রথম শোনা যাচ্ছে— সেই সময়ে যন্ত্রে যে চাপ দেখা যায় তাকেই সিস্টোলের চাপ (systolic pressure) বলে। হাওয়া আরও ছেড়ে দিলে সিস্টোলের শব্দ আস্তে আস্তে কমে যায়, পরে আর শুনা যায় না। সেই সময়কার চাপকে ডায়াস্টোলের চাপ বলে। রক্তের চাপ জানাতে হলে, সিস্টোল চাপ/ডায়াস্টোল চাপ—এইভাবে বলা হয়; অর্থাৎ সিস্টোল চাপে পারাকে কত মিলিমিটার তুলতে পেরেছে, এবং ডায়াস্টোল চাপে কতটা তুলতে পেরেছে।

রক্তের চাপ সৃষ্টি করে শুধু যে আগের বলা তিনটি কারণ, তা নয়। অন্যান্য কারণেও রক্তের চাপ বাড়তে কমতে পারে, যেমন বৃক্ক হ'তে নির্গত রেনিন (renin) নামক বস্তু, শরীরে অন্যান্য গ্রন্থির রস (glandular secretion), আর্টিরিয়োলের মাংসপেশীর উপর স্নায়ুর প্রভাব ইত্যাদি।

সুস্থ লোকের রক্তের চাপমাত্রা

শরীরের সর্বাংশে রক্তের চাপ সমান হয় না। দাঁড়ান অবস্থায় মস্তিষ্কে চাপ কম এবং পায়ের নীচের দিকে রক্তের ভারে চাপ বেশী হয়। ক্যাপিলারিতে রক্তের চাপের যে সমতা রক্ষার কথা আগে বলেছি, আর্টিরিয়োলগুলির সঙ্কোচন এ ব্যাপারে খুব সাহায্য করে।

সিস্টোলিক চাপ জন্মের পর ও শৈশবে ৯০ হ'তে ১১০ থাকে এবং যৌবনোদ্গমে ১১০-১২০ হয় (অর্থাৎ পারদকে ১১০-১২০ মিলিমিটার ঠেলে তুলতে পারে)। ডায়াস্টোলিক চাপ শৈশবের কয়েক বৎসর ৬০ এবং তারপরে ৮০ হয়। যৌবনোত্তর বয়সে রক্তের চাপ একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ৩০।৪০ বৎসর পর্যন্ত সুস্থ

লোকের স্বাভাবিক চাপ ১২০/৮০ এবং তারপরে ১৪০/৮৫ বা কাছাকাছি হয়। সিস্টোলিক চাপ পরিশ্রমকালে, মানসিক দুশ্চিন্তায়, নিদ্রার সময় এবং আহারের সময় কিছু কিছু বাড়ে কমে, কিন্তু ডায়াস্টোলিক চাপের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। শেষোক্ত চাপ আর্টিরিয়োলের সুস্থ থাকার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

রক্তের চাপবৃদ্ধি

ইংরাজীতে এর নাম হাইপারটেনসন (hypertension)। যখন বারবার পরীক্ষায় চাপ ১৫০/৯০ বা ১৬০/১০০-এর বেশী পাওয়া যায় তখন বর্দ্ধিত চাপ বলে ধরতে হবে—তা যেকোন বয়সেই হোক না কেন। এই অসুখটি দুইভাগে ভাগ করতে পারা যায়: (১) প্রাইমারি বা এসেনসিয়েল হাইপারটেনসন (primary or essential hypertension), যখন কোন কারণ পাওয়া যায় না। (২) সেকেণ্ডারি হাইপারটেনসন (secondary hypertension), যখন বৃক্ক (kidney) বা শরীরের অন্য কোন গ্রন্থির (gland) অসুখের জন্য রক্তের চাপ বাড়ে। প্রাইমারি চাপবৃদ্ধিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়: বিনাইন (benign) বা অ-মারাত্মক এবং ম্যালিগন্যান্ট (malignant) বা মারাত্মক। শেষোক্ত রোগীদের রক্তের চাপ ২৬০/১৫০ বা তার কাছাকাছি হয় এবং এতে আর্টিরিয়োলের গায়ে ঘা হয় ও শেষে বৃক্কের অসুখ হয়ে ছয় মাস হ'তে দুই বৎসরের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হ'তে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এরকম রোগীর সংখ্যা খুব বেশী নয়।

সাধারণতঃ যে চাপবৃদ্ধি-অসুখ দেখা যায়, তা অ-মারাত্মক ধরনের; অতএব তার কথা একটু বেশী করে বলা দরকার। এই রোগের গোড়ার দিকে রক্তের চাপ থাকে ২১০/১০০। রোগী বেঁচে থাকে কয়েক বৎসর হ'তে ২০ বৎসর পর্যন্ত। শেষের দিকে হৃৎপিণ্ডের বা বৃক্কের অসুখ হয়ে, অথবা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়।

এই রোগে আর্টিরিয়োলগুলির অস্বাভাবিক সঙ্কোচন দেখা যায়। এই রোগের কারণ হ'তে পারে— স্নায়ুর প্রভাবে আর্টিরিয়োলের মাংসপেশীর অস্বাভাবিক সঙ্কোচন, অথবা এ্যাড্রিন্যাল (adrenal) বা শরীরের অন্য কোন গ্রন্থি হ'তে বহুলপরিমাণে নির্গত রস। বৃক্কে নেফ্রাইটিস (nephritis) রোগ থাকলে সেখান হ'তে নির্গত 'রেনিন' (renin) নামক পদার্থ রক্তের চাপকে আরও বাড়াতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধির আর একটি কারণ আর্টিরিও-স্কেরোসিস (arterio-sclerosis)। কথাটির অর্থ ধমনীর গা পুরু হয়ে যাওয়া, যার ফলে ভিতরের নালীপথ সরু হয়ে যাওয়ার জন্য রক্ত চলাচল কমে যায়। এর একটি প্রকার ভেদ হচ্ছে এ্যাথিরোস্কেরোসিস (atherosclerosis) যখন ধমনীর ভিতরের গায়ে ঘা হয়ে সেখানে চর্বিজাতীয় দ্রব্য জমে যায়। আজকাল সকল সভ্যদেশে বিশেষত আমেরিকায় অকাল মৃত্যুর এইটাই প্রধান কারণ। হৃৎপিণ্ডের গায়ে যে ধমনী আছে, তার মধ্যে এই প্রকার পরিবর্তন হয়ে করোনারি (coronary) অসুখ হয়। অবশ্য রক্তের চাপ বৃদ্ধি না হয়েও 'করোনারি' অসুখ হতে পারে।

অনেক সময় কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন রোগের জন্য প্রস্রাব-পরীক্ষা বা অন্য কোন পরীক্ষা করার সময় রক্তের বর্ধিত চাপ ধরা পড়ে। কিন্তু এই রোগ হ'লে যে সব কারণে রোগী চিকিৎসকের কাছে যায়, সেগুলি হচ্ছে— ঘুম হ'তে ওঠার পরে মাথাধরা বা মাথার পিছন দিকে যন্ত্রণা হওয়া, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, নাক মুখ হ'তে বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। কোন কোন বংশে এই রোগ বেশী দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোন কোন সমীক্ষায় পঞ্চাশোর্ধ বয়সের সুস্থ লোকের মধ্যে শতকরা দশ জনের

রক্তের চাপ বৃদ্ধি দেখা গেছে।

এই রোগে ডায়াস্টোলিক চাপ যদি ১১৫-র বেশী হয়, তা হ'লে রোগীর আয়ু কম হবার সম্ভাবনা। দেখা গেছে এই রোগ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের এবং শ্বেতকায় জাতি অপেক্ষা কৃষ্ণকায় জাতির পক্ষে বেশী ক্ষতিকারক। যদি হৃৎপিণ্ড আকারে না বাড়ে এবং রক্তের চাপ কমাবার ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করা হয়, তা হলে রোগী দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে।

প্রতিকার

এই রোগে করণীয় কি? চিকিৎসকেরা যে সব ওষুধ দেন, তাদের কোনটি স্নায়ুর উপর কাজ করে, কোনটি আর্টিরিয়োলের সঙ্কোচনকে প্রশমিত করে, কোনটি আবার প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ায়। ওষুধের ব্যাপারটি চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাধারণভাবে আমরা কয়েকটি কথা বলতে পারি। প্রথমে মনকে যতটা সম্ভব প্রফুল্ল রাখতে হবে, কোনরূপ উত্তেজনা হ'তে বিরত হ'তে হবে, বিশ্রামের মাত্রা বাড়াতে হবে, সুনিদ্রার জন্য দরকার হ'লে ওষুধ খেতে হবে এবং ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করতে হবে। যাঁদের শরীরের ওজন বেশী, পরিমিত আহারের দ্বারা তাঁদের ওজন কমাতে হবে। কয়েক প্রকার চর্বিজাতীয় খাদ্য (ঘি, ঘি-এর উদ্ভিদ্-জাত বিকল্প প্রভৃতি) যতটা সম্ভব বন্ধ করতে হবে। তার বদলে সরষের তেল, নারকেল তেল বা বাদাম তেল ব্যবহার করতে পারা যায়। লবণের ব্যবহার কমান ভাল, তবে একেবারে বন্ধ করবার দরকার নাই। যদি প্রস্রাব বাড়ানর ওষুধ ব্যবহৃত হয়, তাহলে দৈনিক চার গ্রাম পর্যন্ত লবণ খাওয়া যায়।

'লো ব্লাড প্রেসার'

এখানে আর একটি অসুখের কথা বলা বোধ হয়—অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেটা হচ্ছে 'লো ব্লাড প্রেসার' (low blood pressure), বা রক্তের চাপের অল্পতা, যার আর একটি ইংরাজী নাম হাইপোটেনসন (hypotension)। রক্তের চাপ কিছুটা কম পেলেই তাকে অসুখ বলা উচিত নয়, যদি কোন উপসর্গ না থাকে। যাদের রক্তের চাপ ৯০ হ'তে ১০০ থাকে, তাদের অধিকাংশই অন্যদের চেয়ে দীর্ঘায়ু হয়। রক্তের চাপ কম হলে, এই সব লক্ষণ দেখা যায়: অবসাদ, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এই অসুখের কারণ—সঙ্কোচনকালে (systole-এ) হৃৎপিণ্ড কর্তৃক কম রক্ত পাঠানো, এ্যাড্রিন্যাল (adrenal) নামক গ্রন্থির ঠিক মত কাজ না করা, বহুমূত্র (diabetes), পুষ্টির অভাব, বেশীদিন শয্যাশায়ী থাকা ইত্যাদি। প্রতিকার হিসাবে—কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করণীয়; খাবারে লবণের পরিমাণ বাড়াতে পারেন; পায়ে আঁট মোজা পরবেন; পুষ্টিকর খাবার খাবেন।

সমালোচনা

অদ্বৈতবাদের সূক্ষ্ম রহস্য : শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : গ্রন্থকার স্বয়ং; ১৪/৩সি, বলরাম বসু ঘাট রোড, কলিকাতা-২৫। (১৩৮২), পৃঃ ৫৭, মূল্য দুই টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী, সরল পঞ্চদশী, পাতঞ্জল-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক, সুলেখক ও সুপণ্ডিত শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচ্য গ্রন্থে নিম্নলিখিত সাতটি প্রবন্ধ আছে : হিংসা ও অহিংসা, সংখ্যার সাহায্যে অদ্বৈতবাদ, জ্ঞান ও ধ্যানের পার্থক্য, অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি এবং ব্রহ্মানুভূতির উপায়, নির্বিকল্প সমাধি ও অপরোক্ষ জ্ঞান, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্তির নিরসন, নির্গুণ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে পার্থক্য। অধিকন্তু প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ 'হস্তামলকম্' ও 'শুকাষ্টকম্'-এর শ্লোকাবলী গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিবন্ধসপ্তকের শীর্ষক হইতেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের গাম্ভীর্য সুপরিস্ফুট। সুধী লেখকের আলোচনা-শৈলী সুন্দর ও সাবলীল। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হওয়ায় গ্রন্থটি অদ্বৈততত্ত্ব-রসিকগণের উপভোগ্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় আছে : "হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্মে'র চেয়ে 'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত ক'রে ফেললে আর কি। অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনম্ আয়ান্তম্' ইত্যাদি। হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই—মনু বলেছেন। ...অন্যায় ক'রো না, অত্যাচার ক'রো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।" প্রথম প্রবন্ধটিতে গ্রন্থকার সনাতন-ধর্মের এই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন শাস্ত্রযুক্তির মাধ্যমে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আছে : 'জীব, জগৎ—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—এ সব তিনি আছেন ব'লে আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১-কে পুঁছে ফেল্লে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।' দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে লেখক অপূর্ব কুশলতার সহিত এই তত্ত্বের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রবন্ধটি অতীব হৃদয়গ্রাহী।

সকল প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা স্থানাভাবে সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুখপাঠ্য এবং শাঙ্করমতানুযায়ী। বর্ষীয়ান গ্রন্থকার সুদীর্ঘকাল অদ্বৈত বেদান্তের চর্চায় নিরত আছেন। তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা প্রশংসনীয়। পাঠকগণ এই গ্রন্থে প্রামাণিক তথ্যই পাইবেন।

গ্রন্থটিতে কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ আছে। ৪৭-সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'হস্তামলকম্'-এর পরিচিতি আছে। 'শুকাষ্টকম্'-এর ক্ষেত্রে ঐজাতীয় পরিচিতি কেন নাই তাহা বোঝা গেল না।

একটি সূচীপত্র থাকাও বাঞ্ছনীয়। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি দূর করা হইবে।

ছাপা ও কাগজ ভাল। অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী সুধীবৃন্দ কর্তৃক গ্রন্থটি অবশ্যই সমাদৃত হইবে।

রাজসূয় : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশিকা : শ্রীমতী শোভনা ভট্টাচার্য, সাহিত্য-সার্বভৌম-গ্রন্থপ্রকাশ, ১৬, সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলিকাতা—৭০০০১৭। (১৩৮১), পৃষ্ঠা ১৭৬, মূল্য দশ টাকা।

মুখ্যতঃ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিয়া আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি রচিত। প্রতি পঙ্‌ক্তি কুড়ি মাত্রার সমষ্টি, দশ মাত্রায় যতি; ছন্দ অমিত্রাক্ষর। মহাভারত ব্যতীত ব্রহ্ম-পদ্ম-বিষ্ণু-বায়ু- শ্রীমদ্ভাগবত- ব্রহ্মবৈবর্ত-স্কন্দ- বামন-কূর্ম-পুরাণ হইতেও কতিপয় কাহিনী সন্নিবেশিত। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও কুরুপাণ্ডব-জীবন এবং জরাসন্ধ-শিশুপালবধাদি ঘটনা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নহেন। তিনি ইতিপূর্বে "জালালাবাদের যুদ্ধ", "গান্ধীজীবন", "আজাদহিন্দ নেতাজী",' সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি বর্তমান যুগে সাধারণ পাঠকগণের মনোরঞ্জনে কতটা সক্ষম হইবে তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। তবে বিদগ্ধ পাঠকসমাজে ইহা আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

বর্তমানে যাত্রাগান ও সখের থিয়েটার আমাদের সমাজে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। আমাদের বক্তব্য ইহাই যে, যদি কোন কোন যাত্রাসম্প্রদায় বা থিয়েটার ক্লাব অগ্রণী হইয়া এই গ্রন্থটি হইতে তাঁহাদের পছন্দমত বিশেষ বিশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়া অভিনয় করেন তাহা হইলে ঐ সমস্ত পৌরাণিককাহিনী ও মহাভারতের কাহিনী আমাদের জন-জীবনে প্রচারিত হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে। প্রচারের অভাবে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভুলিতে বসিয়াছে। এই কারণে আমরা এই কাব্যগ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুরাজ চন্দ্র দাশ

পূজা : সংকলক : স্বামী দামোদর দাস। প্রকাশক : স্বামী গুণেশ্বর দাস, বাসুদেব আশ্রম, ৪ কেদারনাথ মুখার্জি লেন, হাওড়া। (১৩৮১), পৃষ্ঠা ১৪২, মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থখানি পূজাপদ্ধতি ও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তুতির একটি প্রয়োজনীয় সংকলন। গ্রন্থকার নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্তদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য, সুতরাং পূজা ও ধ্যানের পদ্ধতি সংকলন করতে গিয়ে তিনি স্বভাবতঃই শ্রীগুরুর সাধনপদ্ধতি-সম্পর্কিত নির্দেশের অনুসরণ করেছেন। একথা সত্য যে, পূজা, জপ ও ধ্যানের ব্যাপারে বিভিন্ন সাধক ও সিদ্ধ পুরুষদের নির্দেশ সবসময় ঠিক একই রকম হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি প্রণালীর কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও পূজা ও অর্চনার অনেকগুলি সাধারণ রীতি আছে, যা সকল পূজক ও উপাসকের পালনীয়, যেমন জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, সূর্য-প্রণাম, গুরু-প্রণাম, সংকল্প, আবাহন ইত্যাদি। অনেক দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্র, পূজামন্ত্র ও প্রণামমন্ত্র এতে সন্নিবিষ্ট হবার ফলে প্রায় সকল হিন্দুর পক্ষেই তাঁদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার আরাধনায় এ গ্রন্থের সহায়তা পাওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া অনেকগুলি স্তব এবং পূজাবিধি ও পূজার উপকরণাদি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত হওয়ার ফলে গ্রন্থটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাগজ ও বাঁধাই সাধারণ। প্রচ্ছদপটে

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির পাশে অবস্থিত ভক্ত নারী-মূর্তিটির দৃষ্টি দেবতার অভিমুখীন না হয়ে পাঠকদের দিকে নিবদ্ধ থাকায় কিছুটা বিসদৃশ মনে হয়। বানান-ভুলের প্রাচুর্যও মনকে পীড়া দেয়; গ্রন্থটির শেষে একটি দীর্ঘ শুদ্ধিপত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতেও বেশ কিছু ভুলের উল্লেখ নেই। পরবর্তী সংস্করণে এ ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যব্যবহার: শ্রীবীরেন্দ্র-চন্দ্র সরকার। প্রকাশক: শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, রামকৃষ্ণ নিবাস, ৮৯, অশোক রোড, গাঙ্গুলী বাগান লেন, পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা। (১৩৮২) পৃঃ ৮০, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীভগবানের অবতারপুরুষগণ তাঁহাদের অনুভূতির আলোকে দুরূহ অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে যেমন প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিয়া সাধারণের উপযোগী ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন, তেমনি সেই তত্ত্বকে লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে আপন জীবনদৃষ্টান্তে সজীব করিয়া তুলেন। তাঁহাদের শরীরধারণ তো ধর্মকে সজীব ও যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্যই। এতাবৎকাল পর্যন্ত আবির্ভূত অবতারপুরুষগণ যেভাবে তাঁহাদের লোকব্যবহার ও দৈনন্দিন আচরণে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মানুভূতিকে বাস্তবরূপ দিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগের আপামর সাধারণ মানুষের অনুকরণীয় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মমতকে যুগোপযোগী করিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রেও ইহাই তাঁহার শিষ্যব্যবহারে ও আচরণে প্রকটিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর নীতিই ছিল: 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও'। সনাতন গোস্বামীও ঠাকুর হরিদাসকে অনুরূপ কথাই বলিয়াছিলেন:

'আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য॥'

আলোচ্য গ্রন্থটিতে মহাপ্রভুর এই আচার-প্রচারের দিকটিই তাঁহার শিষ্যব্যবহারের কাহিনী-বর্ণনার মধ্য দিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রধান ছয়জন শিষ্যের সহিত মহাপ্রভুর ব্যবহারের নানা দিক লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের নিবেদনে লেখক আশা ব্যক্ত করিয়াছেন, 'বইখানি সুখপাঠ্য ও মহাপ্রভুর অনুধ্যানের পক্ষেও সহায়ক হবে। তবে মত- ও পথ- নির্বিশেষে এখানি ঈশ্বর-ভক্তমাত্রেরই আনন্দবর্ধনের কারণ হলে শ্রম সার্থক হবে।' আমাদেরও মনে হয় ঈশ্বর-ভক্ত ব্যক্তিদের নিকট মহাপ্রভুর অনুধ্যানের পক্ষে পুস্তকটি সহায়ক হইবে। তবে দামোদর পণ্ডিত, রায় রামানন্দ প্রভৃতি আরো কয়েকজনের সহিত মহাপ্রভুর অমিয়মধুর ব্যবহারের অমর আলেখ্য যদি লেখক তুলিয়া ধরিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

শেষ অধ্যায় দুইটি—'শ্রীচৈতন্যদেব' ও 'মাহাত্ম্য-কথা' পরিশিষ্টে সংযোজিত হইলে গ্রন্থের শিরোনামের সহিত অধ্যায় দুইটির সংগতি রক্ষিত হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-তাৎপর্য, তাঁহার ভাব, ভক্তি, অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা লেখক শ্রীচৈতন্যদেব শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি ভক্ত-জনের দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। স্থানে স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। পরবর্তী সংস্করণে এইগুলি সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কালাডি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ১লা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল, ১৯৭৬) কালাডি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে মহাসমারোহে নবনির্মিত মন্দিরে সকাল ৮-১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বদিন বাস্তুযাগ অভিষেকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারিটি দিন মহানন্দে অতিবাহিত হয়। ইহার পরও প্রতিদিন পাঠ আলোচনাদি চলিতে থাকে; ২রা যে উৎসবের অবসান হয় আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি-পালনের মাধ্যমে।

১৪ই এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটায় পুরাতন ঠাকুরঘর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য শঙ্করের প্রতিকৃতি লইয়া শোভাযাত্রাসহকারে মন্দির-পরিক্রমা আরম্ভ হয়। শোভাযাত্রায় ছিল সর্বাগ্রে মঙ্গলঘট ও স্থানীয় পঞ্চবাদ্য; তাহার পর ছিলেন স্তোত্র-পাঠরত নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণ, গেরুয়া পতাকা-হস্তে সন্ন্যাসিগণ, স্তোত্রপাঠরত ব্রহ্মচারিগণ, পূর্বোক্ত চারিটি প্রতিকৃতি-হস্তে সন্ন্যাসিগণ ও সর্বশেষে ভজনরত ভক্তগণ। পথের দুই পার্শ্বে একদিকে প্রদীপ-হস্তে, অন্যদিকে ধূপ-হস্তে ভক্তগণ দাঁড়াইয়া-ছিলেন। তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরে উঠিবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী প্রতিকৃতিগুলি মর্মরমূর্তির সম্মুখে স্থাপন করিয়া পূজা ও আরাত্রিক করেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত। পূজাদি চলিয়াছিল বেলা প্রায় দুইটা পর্যন্ত।

বৈকালে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; প্রায় দুই হাজার লোক বসিবার মত বিরাট সভামণ্ডপ আশ্রমপ্রাঙ্গণে নির্মিত হইয়াছিল। প্রথমে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী গণানন্দ সমবেত সকলকে স্বাগত জানাইয়া বলেন যে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী আগমানন্দের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন যে, সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য নৈর্ব্যক্তিক চরম সত্যকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ নয়, তাহারা একটা স্থূল অবলম্বন চায়; মন্দির, গির্জা প্রভৃতি তাহাদের সেই চাহিদা পূরণ করে। আচার্য শঙ্করের জন্মভূমি কালাডিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে তিনি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মের মূর্ত প্রতীক, সব ধর্মমতেরই তিনি প্রতিভূস্বরূপ; কাজেই এই মন্দিরে সর্বধর্মের লোক আসিতে এবং ধর্মার্থকামমোক্ষের জন্য সর্ববিধ প্রার্থনাই করিতে পারেন। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ; 'ধর্মনির-পেক্ষ মন্দির' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব এই মন্দিরে বিদ্যমান, কারণ এই মন্দির যাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী হইতেছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র ও পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সকলেরই ভিতর একই ভগবান বিরাজিত এবং এইহেতু সকল ধর্মমতের লোকের জন্য ইহার দ্বার অবারিত। তিনি আশা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি মূলভাব—ধর্মের সর্বজনীনতা ও মানুষের সাম্য—এই মন্দির হইতে ক্রমে সারা দেশে, এমন কি বিদেশেও বিকীর্ণ হইবে;

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাই ভবিষ্যতে 'এক-পৃথিবী', 'এক-মানবজাতি' গঠনের সহায়ক হইবে।

ইহার পর ভাষণ দেন পণ্ডিচেরীর লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর শ্রীছেদিলাল। বিশপ মার ম্যাথুস এ্যাথানেসিয়াস, ডঃ এন. কে. পানিক্কর, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন। তাঁহারা সকলেই আচার্য শঙ্করের জন্মভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্বন্ধে এবং জাতীয় জীবন গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা করেন। দুই হাজারেরও অধিক লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাত্রে মন্দিরে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল তিন দিনই প্রতিষ্ঠা-দিবসের মতো সভা ও প্রায় সারাদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানে মুখরিত ছিল। ১৫ই এপ্রিল বাহিরের মণ্ডপে 'চণ্ডিকা হোম' দর্শনের পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও স্বামী অভয়ানন্দজীকে পুরোধা করিয়া আশ্রম হইতে শোভাযাত্রা সহযোগে সাধু ও ভক্তগণ আচার্য শঙ্করের জন্মভূমিতে শঙ্করাচার্যের মন্দির, সারদা ও অষ্টশক্তি মন্দির, আচার্যের জননীর শেষকৃত্যের স্থান প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসেন। বৈকালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত সভায় কোচিন শিপ্‌-ইয়ার্ডের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস. কস্তুরীর স্বাগত-ভাষণের পর কেরলের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে. করুণাকর, অধ্যাপক ভি. মহম্মদ প্রভৃতি 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ভজন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়।

১৬ এপ্রিল সকাল ৯টা হইতে ১২ পর্যন্ত স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে সাধু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী তপস্যানন্দজী উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানন্দ তীর্থপাদ প্রভৃতি অনেকেই বক্তৃতা করেন দ্বিপ্রহরে 'যতি-পূজা' ও পরে সভামণ্ডপে রাত্রি দুইটা পর্যন্ত 'চক্কর কুথূ', 'পাদুকা পট্টাভিষেক' প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত রামায়ণ-কাহিনীটির গীতি-নাট্যরূপ অতি সুন্দর হইয়াছিল।

১৭ এপ্রিল সকালে সভামণ্ডপে 'ভক্ত-সম্মেলন' হয়। দ্বিপ্রহরে 'নারায়ণসেবা'য় ১৩০ জন দরিদ্র-নারায়ণকে স্নানান্তে নূতন বস্ত্র ও চাদর দেওয়া হয়, পরে আহারের সময় মাল্য- ও চন্দন-ভূষিত করিয়া প্রত্যেককে পুনরায় একখানি বস্ত্র ও ৫৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হয়। বৈকালের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিমলা-নন্দ, উদ্বোধনী ভাষণ দেন কেরলের গভর্ণর শ্রীএন্. এন্. ওয়াঞ্চু; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. এম্. পি. মহাদেবন প্রমুখ অনেকে বক্তৃতা করেন। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'শ্রীশঙ্কর ও ঐক্যসংস্থাপক সাম্যভাব'। এইদিন সন্ধ্যায় মহাসমারোহে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গ্রাম পরিক্রমা করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসে। পতাকাহস্তে সন্ন্যাসিবৃন্দ, পঞ্চবাদ্য, গাড়ীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণ, আচার্য শঙ্কর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি, ভজনরত ভক্তবৃন্দ ও সর্বশেষে স্বর্ণালঙ্কারভূষিত হস্তিপৃষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি শোভাযাত্রাটিকে মহাসমারোহপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। হস্তীর সম্মুখে মশালধারী চলিতেছিলেন, হস্তিপৃষ্ঠে ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া একজন দণ্ডায়মান ও দুইপার্শ্বে দুইজন চামর-বীজনকারী। প্রায় তিন সহস্র ভক্ত শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া-ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন কলিকাতার বিখ্যাত শিল্পী জি. পাল। মন্দিরটি ৫,০০০ বর্গফুট জমি জুড়িয়া অবস্থিত। চারিদিক ঘেরিয়া প্রশস্ত পথ। প্রধান চূড়ার উচ্চতা ভূমি

হইতে প্রায় ৬০′ ফুট। গর্ভমন্দিরের ভিতরের মাপ ১৬′×১৬′ ফুট, তিন দিক বেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণের প্রতিকৃতি-শোভিত সাত-আট ফুট চওড়া ঘেরা বারান্দা। নাট মন্দিরের ভিতরের মাপ ৬০′×৩০′ফুট। মন্দিরটি অতি নয়নাভিরাম। উৎসবের কয়দিন মন্দির, আশ্রম, সভামণ্ডপ প্রভৃতি প্রচুর আলোকমালায় ভূষিত ছিল। উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় ১২০ জন সাধু ও দুইসহস্রাধিক ভক্ত; উৎসবের প্রথম চারিদিন প্রত্যহ গড়ে ৯০ জন সাধু ও ১,২০০ ভক্ত আশ্রমে বাস ও আহারাদি করিয়াছেন। আশ্রমবাসিগণের সুব্যবস্থায় এই বিরাট কার্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।

আশ্রমটির অবস্থান আচার্য শঙ্করের জন্মভূমির প্রায় সংলগ্ন—মাত্র একশ গজ মত দূরে। উভয়ই প্রসিদ্ধ পূর্ণা নদীর তীরে অবস্থিত।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য

বাগেরহাট, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ ও শ্রীহট্ট কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা ব্যতীতও স্থানীয় দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশুখাদ্য ও বস্ত্রাদি বিতরণ অব্যাহত আছে

ভারতে সেবাকার্য

পাটনা কেন্দ্রের মাধ্যমে মানের অঞ্চলে বন্যাত্রাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহ-নির্মাণকার্য অব্যাহত আছে।

ভিত্তিস্থাপন

বিগত ১লা এপ্রিল (১৯৭৮), রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজ, ত্যাগরাজনগর, গ্রিফিথ রোডে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূতন ভবনের শিলান্যাস করেন।

উৎসব

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিগত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মজয়ন্তী ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, গুরু-বন্দনা, বেদপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ইত্যাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে কিঞ্চিদধিক আট শত ভক্ত নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত বহু ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় স্বামী উমানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন ও নরেন্দ্রপুর আশ্রমের অন্ধ বালকবৃন্দ কর্তৃক ভজন-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পর দিবস শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বেদশাস্ত্রী মায়ের জীবন অবলম্বনে লীলা-কীর্তন করেন।

নরোত্তম নগর (অরুণাচল প্রদেশ: তিরাপ জেলা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিগত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫, শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, পূজা-হোম অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন গ্রামের বহু পাহাড়ী অধিবাসী উৎসবে যোগদান করেন ও দ্বিপ্রহরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ধর্মসভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন এবং স্থানীয় নোক্তে, অসমীয়া, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় ছাত্র ও শিক্ষকগণ বক্তৃতা দেন।

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পূর্বতন নেফা প্রদেশ। তিরাপ জেলার মপায়া পাহাড়ের পাদদেশে নরোত্তম নগর। নরোত্তম ছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধক। তাঁহারই নামানুসারে নগরটির নামকরণ করা হইয়াছে। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নোক্তে, তাংসা, ওয়াঞ্চু প্রভৃতি বালকদের বিনা খরচে থাকা-খাওয়া ও শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব গত ২৩শে জানুআরি হইতে ২৯শে জানুআরি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন প্রাতে বিশেষ পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য সভায় স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ, শ্রীধনঞ্জয় দাস ও সভাপতি শ্রীদিবাকর ত্রিপাঠী বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীরাজকিশোর রায় সঙ্গীতসহযোগে ওড়িয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তৃতীয় দিন শ্রীদিলীপকুমার মহাপাত্র, শ্রীসুরপ্রসাদ দাস, শ্রী পি. আর. চন্দ্র এবং শ্রীলোকনাথ সাহা আলোচনায় যোগদান করেন। আলোচনাচক্রের সভাপতি ছিলেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ। চতুর্থ দিন প্রাতে শ্রীআর করুণাকরণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সান্ধ্য সম্মেলনে স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করে। পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র পুরী মিশনের সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকাটি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। সভায় তিনি ও সভাপতি স্বামী শ্রীধরানন্দ ভাষণ দেন। ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় ডাক্তার চারুবালা মহান্তি. শ্রীমতী বিনোদিনী ষড়ঙ্গী ও সভাপতি স্বামী শ্রীধরানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সপ্তম দিন সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংদেও ও স্বামী শ্রীধরানন্দ স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৮ই এপ্রিল (১৯৭৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪১তম জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, হরি-সংকীর্তন ও শোভাযাত্রাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভা হয়। সভার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। ধর্ম-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী উমানন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী তথাগতানন্দ ও স্বামী গিরিজানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় দুই হাজার ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে শিক্ষকগণ কর্তৃক "সন্ধিপূজা" যাত্রাভিনয় হয়। ৮ই এপ্রিল কাকদ্বীপ কিশোর সংঘ প্রাঙ্গণে স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে একটি ধর্মসভার ব্যবস্থা হয়। সভারম্ভের পূর্বে একটি শোভাযাত্রা কাকদ্বীপ শহর পরিক্রমা করে। ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী উমানন্দ, স্বামী গিরিজানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ এবং শ্রীযুত নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। রাত্রিতে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জনশিক্ষা বিভাগ হইতে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী তত্ত্বানন্দ (কালীমোহন মহারাজ) গত ৩রা এপ্রিল (১৯৭৬), বেলা ১২-৪৫ মিনিটে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন অকস্মাৎ বিঘ্নিত হওয়ায় এবং বৃক্কের বৈকল্যহেতু রক্তে ইউরিয়া আদি পদার্থের আধিক্যবশতঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর এবং বিগত কয়েক মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৯ সালে সংঘের দিল্লী কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি কিছুকাল কাঁকুড়গাছি কেন্দ্র ও শ্রীনগর কেন্দ্রের (বর্তমানে বন্ধ) অধ্যক্ষ ছিলেন এবং মাদ্রাজ, দেওঘর, কানপুর ও আসানসোল কেন্দ্রের কর্মিরূপে সংঘসেবা করেন। উত্তরকাশী ও হৃষীকেশে তিনি কিছুকাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন। মার্চ,

১৯৭১ পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী শিক্ষণ-কেন্দ্রের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং তাহার পর অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইংরেজী ও বাংলায় কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

স্বামী ঈশ্বরানন্দ গত ২৯শে এপ্রিল (১৯৭৬), বৈকাল ৫-১৫ মিনিটে ত্রিচুরে ৮১ বৎসর বয়সে কণ্ঠে কর্কট রোগের ফলে দেহত্যাগ করেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি ঐ রোগে ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২০ সালে সংঘের ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে তিনি স্বীয় মন্ত্রগুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কাঞ্চীপুর, মহীশূর, চেংগলপেট ও ত্রিচুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীতও তিনি ত্রিবান্দ্রম, কুইলাণ্ডি, মাদ্রাজ, উতকামুণ্ড ও রাজকোট কেন্দ্রের কর্মিরূপে সংঘসেবা করেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ-জয়ন্তী

কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিগত ১১ই জানুআরি,'৭৬ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে নাগেরকয়েল-এ শ্রী ভি. এস. কেশব পেরুমলের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় প্রধান বক্তা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—"প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র কন্যাকুমারী জেলা বর্তমানে দ্বিগুণ সার্থকতা লাভ করেছে মহাসাগরের বুকে ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর সমাসীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক তপশ্চর্যা ও ধ্যান-ধারণায় ভবিষ্যৎ ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পন্থা-উদ্ভাবনের ফলে এবং অধিকন্তু বিবেকানন্দ রক্ মেমোরিয়েল কমিটির একনিষ্ঠ ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টাগুলির মাধ্যমে। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামীজীর দিব্যবাণীসমূহের অনেকটাই বর্তমানে বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। স্বামীজীর অপূর্ব প্রভাববিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সমাজ-জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা বিষয়ে উদ্দীপনাময়ী শিক্ষা যে শুধু ভারতীয়গণকেই দীন-আর্ত-পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও সেবাপরায়ণ করেছে তা নয়, পৃথিবীর বহু দেশের লোকের মনেও নূতন আশার আলো প্রজ্বালিত করেছে, সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছে এবং সর্বত্রই সামাজিক অভ্যুত্থানের বিপর্যয় ও অস্থিরতার মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও শিক্ষা-দীক্ষার দিকে সকলের ক্রমবর্ধমান দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বামীজীর প্রচারিত বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় ও মানবপ্রেমের উদাত্ত বাণী আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য- ও মৈত্রী-স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেছে।

"আমরা বেদান্তের সর্বজনীন ও সার্বভৌম শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে যথার্থরূপে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে সমর্থ হইনি। স্বামীজীর প্রচারিত ত্যাগ ও সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক পরিবর্তন-সাধনের মহৎ কার্যে ব্রতী হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং তার দ্বারাই বেদান্তের উচ্চ শিক্ষার সার্থকতা ও উপযোগিতা উত্তরোত্তর প্রমাণিত হবে।"

সভাপতি শ্রী ভি. এস. কেশব পেরুমল তাঁহার ভাষণে দেশের ধর্মনেতৃবৃন্দ ও মঠাধিপতিগণের নিকট বেদান্ত-প্রচার ও তৎসঙ্গে জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের সনির্বন্ধ আবেদন জানান এবং এ কার্যে বিবেকানন্দ কেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অধ্যাপক পি. মহাদেবন ধন্যবাদ দেন।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই আশ্বিন। (১৩০৬ সাল) [১৮শ সংখ্যা।]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি *]

ভাষ্য-মূল।—কিং পুনঃ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মঃ আহোস্বিৎ প্রয়োগে। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথাধর্ম্মঃ *।

জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথা অধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি, যো হি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসো হ্যপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবঃ অপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা,—গৌরিত্যস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ।

বঙ্গানুবাদ—শব্দজ্ঞানেই কি ধর্ম্ম হয় অথবা শব্দের প্রয়োগে ধর্ম্ম হয়। ইহার বিশেষ কি ?

জ্ঞানে যদি ধর্ম্ম থাকে, তথাপি অধর্ম্মও আছে।

শব্দজ্ঞানে যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মও উপস্থিত হয়। যিনি শব্দও জানেন, তিনি অপশব্দও জানেন, যেমন শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম হয় সেইরূপ অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্মও উপস্থিত হয়। কিম্বা অত্যন্ত অধিক অধর্ম্ম উপস্থিত হয়। অপশব্দ অত্যন্ত অধিক, কিন্তু শব্দ অল্পসংখ্যক। এক একটি শব্দের অপভ্রংশ বহুসংখ্যক। যেমন,—"গৌঃ" এই পদের গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি অপভ্রংশ।

ভাষ্য-মূল।—আচারে নিয়মঃ*।

আচারে পুনর্ঋষির্নিয়মং বেদয়তে। "তেঽসুরাঃ হেলয়ো হেলয়ঃ ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ" ইতি। অস্তু তর্হি প্রয়োগে।

প্রয়োগে সর্ব্বলোকস্য*।

যদি প্রয়োগে ধর্ম্মঃ, সর্ব্বলোকোঽভ্যুদয়েন যুজ্যেত। কশ্চেদানীং ভবতো মৎসরঃ যদি সর্ব্বলোকোঽভ্যুদয়েন যুজ্যেত। ন খলুঃ কশ্চিৎ মৎসরঃ। প্রযত্নানর্থক্যং তু ভবতি। ফলবতা চ নাম প্রযত্নেন ভবিতব্যম্। ন চ প্রযত্নঃ ফলাদ্‌ব্যতিরেচ্যঃ। ননু চ যে কৃতপ্রযত্নাস্তে সাধীয়ঃ শব্দান্ প্রযোক্ষ্যন্তে। ত এব সাধীয়োঽভ্যুদয়েন যোক্ষ্যন্তে। ব্যতিরেকোঽপি বৈ লক্ষ্যতে। দৃশ্যন্তে হি কৃতপ্রযত্নাশ্চাপ্রবীণা অকৃতপ্রযত্নাশ্চ প্রবীণাঃ। তত্রঃ ফলব্যতিরেকোঽপি স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—আচারে নিয়ম আছে।

বৈশাখ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর —বর্তমান সঃ।

আচারে অর্থাৎ প্রয়োগে ঋষি অর্থাৎ বেদ নিয়ম জ্ঞাপন করিতেছেন। "সেই অসুরগণ "হেলয়" (হে অলয়ঃ !) অর্থাৎ হে অরিগণ ! "হেলয়ঃ" অর্থাৎ হে অরিগণ ! প্রয়োগ করিয়া পরাভূত হইয়াছিল।" তবে প্রয়োগে ধর্ম্ম হউক।

প্রয়োগে ধর্ম্ম হইলে সকল লোকের হয়।

যদি প্রয়োগ করিলেই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে সকল লোকের অভ্যুদয় (অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি) হইত, যদি সকল লোকই শ্রেয়ঃসম্পন্ন হইত, তবে এক্ষণে কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করিত। কোন ব্যক্তিই মৎসর হইত না। তাহা হইলে প্রযত্নের অনর্থকতা হইয়া পড়ে। প্রযত্ন মাত্রেই ফলবান্ হইয়া থাকে (অর্থাৎ প্রযত্ন থাকিলে তথায় ফলানুসন্ধান থাকেই থাকে)। প্রযত্ন কখনই ফলভিন্ন হয় না। যদি বল, যাহারা কৃতপ্রযত্ন তাহারাই উৎকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করে এবং তাহারাই উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ করে। ইহার ব্যতিরেক (অর্থাৎ বৈপরীত্য) ও দেখা যায়। যে ব্যক্তিগণ কৃতপ্রযত্ন, তাঁহাদিগকেও অপ্রবীণ (অর্থাৎ বিফলমনোরথ) হইতে দেখা যায় এবং যে ব্যক্তিগণ অকৃতপ্রযত্ন তাঁহাদিগকেও প্রবীণ (অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ) হইতে দেখা যায়। তাহাতেও ফলের বৈপরীত্য ঘটিতে পারে।

[১ম বর্ষ।] ১লা কার্ত্তিক। (১৩০৬ সাল) [১৯শ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।*

১। একটী জলাশয়ে এক বক আস্তে আস্তে একটা মাছের দিকে লক্ষ্য করে ধর্‌তে যাচ্চে, পেছনে এক ব্যাধ সেই বকটীকে লক্ষ্য কর্‌ছে, কিন্তু বক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ কর্‌ছে না। অবধূত সেই বককে নমস্কার করে বল্লে, আমি যখন ধ্যান কত্তে বস্‌ব তখন যেন ঐ রকম পেছনে চেয়ে না দেখি।

২। বাসনার লেশ থাক্‌তে ভগবান্ দর্শন হয় না। ছোট ছোট বাসনাগুলি পূর্ণ ক'রে নেবে, আর বড় বড় বাসনাগুলি বিচার ক'রে একেবারে ত্যাগ কর্‌বে। সাধনের সময়ে যেন কোনরূপ বাসনা না উঠে। তখন যে বাসনা উঠ্‌বে, তাহার জন্য আবার জন্মাতে হবে।

৩। যেমন খালি গাড়ুতে জল ভর্ত্তে গেলে ভক্ ভক্ করে শব্দ হয়, কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না, তেম্‌নি যার ভগবানলাভ হয়নি, সে'ই ভগবান্ সম্বন্ধে নানা গোল করে, আর যে তাঁর দর্শনলাভ করেছে, সে স্থির হয়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

৪। দাঁড়িপাল্লার যে দিক ভারি হয়, সেই দিক ঝুঁকে পড়ে, তার যেদিক হাল্‌কা হয়, সেই দিক উপরে উঠে যায়। মানুষের মন দাঁড়িপাল্লার ন্যায়; তার একদিকে সংসার, আর দিকে ভগবান্। যার সংসার, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির ভার বেশী হয়, তার মন ভগবান্ থেকে উঠে গিয়ে

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত।—বর্ত্তমান সঃ

সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর যার বিবেক বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির ভার বেশী হয়, তার মন সংসার থেকে উঠে গিয়ে ভগবানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৫। শরীর থাক্‌তে 'আমার আমিত্ব' একেবারে যায় না, একটু না একটু থাকেই; যেমন নারিকেল গাছের বাল্‌তো খসে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। কিন্তু এই সামান্য আমিত্ব মুক্ত পুরুষকে আবদ্ধ কর্ত্তে পারে না।

৬। সংসার কেমন ? যেমন আমড়া—শস্তের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল।

বিজয়া* ।

২৮শে আশ্বিন, ১৩০৬ সাল।

মায়ের পূজা শেষ হইল; মা স্বস্থানে যাত্রা করিবেন।—"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ"॥ মা! মহাদেব যেখানে আছেন এমন শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করুন। আমাকে কৃপা করিতে কিন্তু ভুলিবেন না; শীঘ্রই আবার আসিবেন।

মা বাড়ী আলো ক'রে ছিলেন। কত গম্‌গমে ছিল, কত জাঁক জমক ছিল, কতই আনন্দোৎসব হতেছিল। আজ ঘর আঁধার ক'রে, মন আঁধার ক'রে চলে গেলেন! মাকে পাঠাইয়া, মাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি—চারিদিক ফাঁকা; সকলেই বিমর্ষ; কেহ কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন; কেহ কেহ ব'সে কাঁদিতেছেন। শোকে সকলেই কাতর; কেবল বাটীর লোক নয়,—আত্মীয়-বন্ধুগণ, পাড়াপড়শীগণ, অতিথিঅভ্যাগতগণ, অপরাপর লোকজন—সকলেই শোকতপ্ত। মা! আবার কবে আস্‌বে? মা, অন্তরের সহিত ভক্তিভরে যেন তোমায় ডাক্‌তে পারি।

ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সেই ছেলেবেলাকার 'মা'বলাও ভুলে গেছি!—মা! "কুপুত্র যদিও হয়, কু-মাতা কখন নয়"; ছেলেবেলায় যেমন গর্ভধারিণীর বেশে আমায় কোলে নিতে, সেইরূপ আবার একবার কোলে নাও মা। আবার একবার সেইরূপ স্নেহভরে ছেলের পানে চাও মা। 'মা' ব'লে ডাক্‌তে যে একেবারে ভুলে গেছি!! সেইরূপ স্নেহময়ী মা'র বেশে সুমুখে দাঁড়াও—আবার 'মা' বল্‌তে শিখাও মা। মা, তুমি না দয়া কর্‌লে, কে ক'র্‌বে? তুমি না শিখালে কে শিখাবে মা? আহা! 'মা' কি মধুমাখা নাম। এ নাম সাধ মিটিয়ে নিতে পারলুম না! ছেলেবেলায় যেমন গর্ভধারিণীকে অন্তরের সহিত 'মা' ব'লে ডাক্‌তে পারতুম, তেমনি প্রাণের সহিত যেন তোমায় ডাক্‌তে পারি।

মা! তোমায় যেমন ভক্তি ক'রব মনে করছি তেমনি ক'রে যেন সকলকেই ভক্তি করতে

* বর্ষসূচী হইতে জানা যায় রচনাটি উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের।—বর্তমান সঃ

পারি। তেমনি নির্ম্মল চোখে যেন সকলকেই দেখতে পারি। মনের মালিন্য হ'তে যেন রক্ষা পাই।

মা আসতে গেছেন; আর ভেবে কি হবে বলুন? মা মঙ্গল করবেন; সকলে একত্রিত হউন; শান্তিজল গ্রহণ করুন,—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি"।

"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তি ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা। কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। ...এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে"।—

ইন্দ্রাদি দেবগণ মঙ্গল করুন। বৃহস্পতি প্রভৃতি শুভ হউন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যম, বরুণ, পবন, ধনরাজকুবের প্রভৃতি সকলে এই মন্ত্রপূত বারি প্রক্ষেপ করিতেছেন। কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, মেধা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি প্রভৃতি মাতৃকাগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁরাও আমাদিগের ধর্ম্মাদিচতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধির জন্য, শিরোপরি শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হউক। ওঁ স্বস্ত, ওঁ স্বস্ত, ওঁ স্বস্ত।

মা ব্রহ্মময়ী এসেছিলেন,—বাটী পবিত্র ক'রে গেছেন, দেশ পবিত্র ক'রে গেছেন, আমাদিগের সকলকেই পবিত্র ক'রে গেছেন। তাঁহার স্পৃষ্ট বারি আমাদিগের গাত্রে পড়িয়াছে। সকলে ধন্য হইয়া গিয়াছি। আমাদিগের আত্মীয়-বন্ধুবর্গ, পাঠক ও গ্রাহকবর্গ, দেশের যাবতীয় লোক, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, সকলকারই মঙ্গল হউক; শ্রীবৃদ্ধি হউক; বুদ্ধিবৃত্তি সৎ হউক; সকলে সর্ব্বতোভাবে শান্তিলাভ করুন; ধরা স্বর্গধাম হউক; বলিতে যেন পারি—আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান।

মা এসেছিলেন।—মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করে সকলকার মন পবিত্র হ'য়ে গেছে। হৃদয়ে স্নেহময়ীর ছায়া প'ড়ে আজ আমাদের কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়েছে। মা আবার আসতে গেছেন; তাই আজ বিজয়া। বি-বিশেষ, জি ধাতু জয় করা। হৃদয় দিয়া হৃদয় জয় কর। আজ আমাদের বিজয়োৎসব! মন দিয়া মন হরণ কর; প্রাণ দিয়া প্রাণ ক্রয় কর। দাও; উপযাচক হইয়া দাও। —যাও লোকের বাড়ী বাড়ী; ঘরে ঘরে ফেরো; বন্ধু ব'লে, ভাই ব'লে—সহোদর ভাই ব'লে—আলিঙ্গন কর। আমাদের মা এসেছিলেন,—জেনেছি সকলকারই সেই একই মা; আমরা সেই একই মা'র সন্তান। যে সে মা নয়,—ব্রহ্মময়ী। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান। খোলো—চোখ খুলে দেখ; স্পষ্ট ক'রে দেখ;—অন্তরে কে সজল নয়নে ব'সে আছেন।—আমাদের আনন্দময়ী মা—স্নেহময়ী জননী। দৃষ্টি বিস্তার কর; আর একটু বিস্তার কর; দেখ—সেই মা'ই সকলকারই ভিতর বিরাজ করছেন। মার কাছে ছোট বড় নাই; ভাল মন্দ নাই; কাওরা হাড়ি নাই; হিন্দু মুসলমান নাই। মা যে আমাদের ব্রহ্মময়ী—মার কাছে সব ছেলেই সমান। ছাড়ো—লজ্জা ঘৃণা ভয়; ছাড়ো দ্বেষ-বুদ্ধি; আত্মাভিমান—বৃথা অহঙ্কার; "ছাড়ো মোহ মায়া"।—নির্ম্মল চোখে দেখ; "নয়ন মিলিয়ে দেখ"—হাড়ি ডোম চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, ছোট বড়, সকলকারই

ভিতরে সেই একই মা। বাহিরে দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন পিষ্টক—"ভিতরে সেই একই পুর"। যাও "উদ্বোধন", - গ্রাহক পাঠক, আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত, ছোট বড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, গৃহস্থ সন্ন্যাসী, হিন্দু মুসলমান—সকলকার নিকট নত মস্তকে যাও; নির্ম্মল অন্তঃকরণে যাও। যাও, সকলে যাও।—পূজনীয় ব্যক্তির পূজা কর; স্নেহের যিনি—স্নেহ কর; ভালবাসার—ভালবাস। বন্ধন ছিন্ন কর; অর্গল খুলিয়া দাও, হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন কর। তোমার হৃদয়ের প্রেম, লোকের চরণে দাও; লোকের হস্তে দাও, লোকের হৃদয়ে দাও। দাও,—দাও ও গ্রহণ কর; আজ আমাদের আনন্দোৎসব—হৃদয়ের উৎসব। —হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাও; প্রাণ ভ'রে মিলাও; নির্ম্মল অন্তঃকরণে মিলাও; সহৃদয়তার পরম শান্তি উপভোগ কর।

সকলকার সঙ্গে, ডেকে, অন্তরের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ কর। আমরা সবে সেই ব্রহ্মময়ীর সন্তান; সকলকার সহিত মিষ্টিমুখ কর; অমৃত পান কর; আমাদের মা ব্রহ্মময়ী নিজ বক্ষঃস্থল হ'তে যে অমৃত নিঃসরণ করছেন, সেই অমৃত পান কর। অন্তরে আর কোন রকম মলিন ভাব পোষণ ক'রো না। মা'র ছায়া আর তা হ'লে হৃদয়ে পড়বে না—মাকে আর দেখতে পাবে না। অমর হ'তে পারবে না; ব্রহ্মময়ীর অমৃত ধনে আর অধিকারী হ'তে পারবে না। আসুন সকলে; দিগ্‌দিগন্তর হ'তে আসুন; আজ আমাদের বিজয়া; আজ ভারতে সম্মিলনের দিন। ভারতবাসী যে যেখানে থাকুন, আজ সকলে এক হৃদয় এক আত্মা হউন; এমন সুযোগ আর হবে না। শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর, নীচ উচ্চ, ভেদাভেদ, যেন আজ কাহারও ভিতর না থাকে; কোন প্রকার রাগ দ্বেষ যেন কেহ পোষণ না করেন; হৃদয় নির্ম্মল হউক; আজ ভারতবাসী সকলে, হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরে অন্তরে, এক হউন; এমন সুদিন আর পাব না।

আজ বিজয়া। এই দিনে ভারতের রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করে থাকেন। আসুন ভারতবাসিগণ! সকলে মিলে আজ আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে রিপু। ঘরে বাহিরে শত্রু। অন্তরেন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়—সকলেই বিপক্ষ। সমগ্র ভারত দুর্গা-নাম জপ ক'রে এই মহৎ যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হউন। আজ বিজয়ার দিন, দুর্গা-নাম লইয়া রণযাত্রা করুন; আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধ-মনোরথ হইব। বালক যুবা বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ সন্ন্যাসী, জ্ঞানী বা কর্ম্মী, সকলেই নিজ নিজ শত্রু-দমনে তৎপর হউন।

মহাশক্তির উপাসনা করিয়াছি। অনন্ত শক্তিমতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; নিশ্চয়ই আমরা রিপুজয়ী হইব। প্রাণ ভ'রে শক্তির পূজা যদি ক'রে থাকি, নিশ্চয়ই আমরা শক্তিমান্ হইব, সংসারক্ষেত্রে জয়ী হইব। মাকে যদি সত্য হৃদয়ের সহিত আরাধনা ক'রে থাকি, চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ 'পরমার্থ', তাহাও লাভ করিব সন্দেহ নাই।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

বঙ্গোপসাগর।

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে, পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙ্গালা দেশ। বাঙ্গালা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদর বন পর্য্যন্ত থাক্। কেউ কেউ বলেন, সোঁদর বন পূর্ব্বে গ্রাম-নগর-ময় ছিল। উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও কথা মান্‌তে চায় না। যা'হক ঐ সোঁদর বনের মধ্যে, আর বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে অনেক কারখানা হয়ে গেছে। এই সকল স্থানেই পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরাকান রাজের, এই সকল স্থান অধিকারের, বহু চেষ্টা; মোগল প্রতিনিধির, গঞ্জালেজ্ প্রমুখ পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারম্বার ক্রিশ্চিয়ান, মোগল, মগ, বাঙ্গালির যুদ্ধ।

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকাল, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেলতে দুলতে যাচ্ছেন। তবে এইত আরম্ভ, পরে বা কি আছে। যাচ্ছি মান্দ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের

দক্ষিণী মুল্লুক।

বেশী ভাগই এখন মান্দ্রাজ। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে প'ড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়। নগণ্য ক্ষুদ্র গ্রাম মান্দ্রাজ সহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্, অথবা মাদ্রাসপট্টনম্, চন্দ্রগিরির রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরাজের ব্যবসা "জাভায়"। বান্তাম সহর ইংরাজদিগের আসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্র। "মান্দ্রাজ" প্রভৃতি ইংরাজি কোম্পানির ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যস্থান "বান্তামের" দ্বারা পরিচালিত। সে বান্তাম কোথায়? আর সে মান্দ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল? শুধু "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" নয় হে ভায়া; পেছনে "মায়ের বল"। তবে, উদ্যোগী পুরুষকেই মা বল দেন—একথাও মানি। মান্দ্রাজ মনে পড়্‌লে খাঁটি দক্ষিণ দেশ মনে পড়ে। যদিও কল্‌কেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণ দেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই থর-কামান মাথা, ঝুঁটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র বিচিত্র. শুঁড়-ওলটানো চটিজুতো, যাতে কেবল পায়ের আঙ্গুল কটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলে পুলের সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজ্‌বুত) উড়ে বামুন দেখে। যদিও সেই এক-বেশ গুজরাতি বামুন, কাল কুচ্‌কুচে দেশস্থ বামুন, ধপধপে ফরসা বেরালচখো চৌকা মাথা কোকনস্থ বামুন, অনেক দেখেছি। যদিও এ সব দক্ষিণ ব'লে পরিচিত, কিন্তু সে ঠিক দক্ষিণী ঢং মান্দ্রাজিতে। সে রামানুজি তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল,—দূর থেকে যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য, কেলে হাঁড়িতে চুণ মাখিয়ে, পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে, - যার সাগ্‌রেদি রামানন্দি তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে "তিলক তিলক সবকোই কহে পর রামানন্দী তিলক্ দিখত গঙ্গা পারসে যম গৌদ্বারকে খিড়ক্"। (আমাদের দেশের চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া

---

* চৈত্র, ১৩০২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সং

গোঁসাই দেখে, মাতাল চিতাবাঘ ঠাওরেছিল। এ মান্দ্রাজি তিলক দেখে চিতে বাঘ গাছে চড়ে।) আর সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি, যা ছবৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার যো নাই, যাতে ছুনিয়ার রকমারি "ল"কার ও "ড"কারের কারখানা; আর সেই "মুড়গুতন্নির" "রসম্" সহিত ভাত "সাপড়ান", যার এক এক গরসে বুক ধড়্ফড়্ করে ওঠে—এমনি ঝাল আর তেঁতুল! সে "মিঠে নিমের পাতা", "ছোলার দাল", "মুগের দাল", ফোড়ন, দধ্যোদন ইত্যাদি ভোজন; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা; এ না হ'লে দক্ষিণ মুলুক হয়?

আবার, এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কতকদিন আগে থেকেও, হিন্দু ধর্ম্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই—সামনে টিকি, নারকেল-তেল-খেকো জাতে,—শঙ্করাচার্য্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই—মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদের পায়ের নীচে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় এই মধ্বসম্প্রদায়ের শাখা মাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রামসনেহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে না। শিষ্য কত্তেও চায় না; সেদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস দিত না। এই মান্দ্রাজিরাই এখনও বড় বড় তীর্থস্থান দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণ দেশেই,—যখন উত্তরভারতবাসী "আল্লা হু আকবর" "দীন্ দীন্" শব্দের সামনে, ভয়ে ধন রত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রী পুত্র ফেলে, ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,—রাজচক্রবর্ত্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণ দেশেই সেই অদ্ভুত সায়নের জন্ম,—যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্ক রাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখ স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠিত ছিল।—যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা; যাঁর আশ্চর্য্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ পঞ্চদশী গ্রন্থ, সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়নের এই জন্মভূমি। মান্দ্রাজ সেই "তামিল" জাতির আবাস. যাদের সভ্যতা সর্ব্বপ্রাচীন;—যাহাদের "সুমের" নামক শাখা "ইউফ্রেটিস" তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতাবিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল;—যাহাদের জ্যোতিষ, ধর্ম্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি;—যাহাদের পুরাণ সংগ্রহ বাইবেলের মূল;—যাহাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল;—যাদের কাছে আর্য্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীর শৈব বা বীর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা কবৃছে। এই যে এত বড় বৈষ্ণব ধর্ম্ম,—এও এই "তামিল" নীচবংশোদ্ভূত শট্‌কোপ হতে উৎপন্ন—যিনি "বিক্রীয় সূর্প্যং স চচার যোগী"। এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন।—এখনও এদেশে যেমন বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট, বা অদ্বৈত, সমস্ত মতের মত চর্চ্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই; এখনও ধর্ম্মে অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তত আর কোথাও নাই।

মান্দ্রাজ।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল; আর বাহিরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্ছে, আর এক একবার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠ্‌ছে, আর

ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। সাম্‌নে সুপরিচিত মান্দ্রাজের ট্র্যাণ্ড রোড্‌। দুজন ইংরেজ পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর, একজন মান্দ্রাজি জমাদার, এক ডজন পাহারওয়ালা, জাহাজে উঠ্‌লো। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে, যে কালা আদমির কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হক্ না কেন, সে যে রকম নোংরা থাকে, তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা। তবে আমার জন্য মান্দ্রাজিরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে,—বোধ হয় পাবে। ক্রমে দু চারিটি ক'রে মান্দ্রাজি বন্ধুরা নৌকায় চ'ড়ে, জাহাজের কাছে আস্‌তে লাগ্‌লো। ছোঁয়া ছুঁয়ি হবার যো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিমাচার্য্য, ডাক্তার নঞ্জনরাও, কীড়ি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখ্‌তে পেলুম। আঁব, কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিম্‌কি ইত্যাদির বোঝা আস্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ভিড় হতে লাগ্‌লো। ছেলে মেয়ে, বুড়ো, নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতি বন্ধু মিঃ শ্যামিএর, ব্যারিষ্টার হয়ে মান্দ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলেম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয়ানন্দ বার কতক আনাগোনা কর্‌লে; তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাক্‌বে,—শেষে ধম্‌কাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে, আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়্‌তে লাগ্‌লো। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, অবসন্ন হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। তখন মান্দ্রাজি বন্ধুদের কাছে বিদায় চাহিলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। আলাসিঙ্গা "ব্রহ্মবাদিন" ও মান্দ্রাজি কায কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌বার অবসর পায় না; কাযেই সে কলম্বো পর্য্যন্ত জাহাজে চল্‌লো। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়্‌লে। তখন একটা রোল উঠ্‌লো। জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজার খানেক মান্দ্রাজি স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা, বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল। জাহাজ ছাড়তেই, এই বিদায়সূচক রব। মান্দ্রাজিরা আনন্দ হ'লে বঙ্গদেশের মত হুলু দেয়।

ভারত-মহাসাগর।

মান্দ্রাজ হতে কলম্বো চারি দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়্‌তে লাগ্‌লো। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুল্‌তে লাগ্‌ল। যাত্রীরা মাথা ধ'রে স্থাকার ক'রে অস্থির। বাঙ্গালির ছেলে দুটিও ভারি 'সিক'। একটী ত ঠাউরেছে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল, যে কিছু ভয় নাই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেণ্ড ক্লাসটা আবার 'স্ক্রুর' ঠিক উপরে। ছেলে দুটিকে কালা আদমি ব'লে, একটা অন্ধকূপের মত ঘর ছিল, তারির মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবন দেবেরও যাবার হুকুম নাই। সূর্য্যেরও প্রবেশ নিষেধ। ছেলে দুটির ঘরের মধ্যেও যাবার যো নেই; আর ছাতের উপর ত সে কি দোল্। আবার যখন জাহাজের সাম্‌নেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বরে বসে যাচ্ছে, আর পেছনটা উঁচু হয়ে উঠ্‌ছে, তখন 'স্ক্রু'টা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুর্‌ছে, আর সমস্ত জাহাজটা ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ করে নড়ে উঠ্‌ছে। সেকেণ্ড ক্লাস ঐ সময়, যেমন বেরালে ইঁদুর ধ'রে ঝাড়া এক একবার দেয়, তেমনি করে নড়্‌ছে। [ক্রমশঃ]

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৮তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ৯০৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

দিব্য বাণী

তপসশ্চানুপূর্ব্যেণ ফলমূলাশিনস্তথা।
ত্রৈলোক্যং তপসা সিদ্ধাঃ পশ্যন্তীহ সমাহিতাঃ॥
ঔষধান্যগদাদীনি নানাবিদ্যাশ্চ সর্বশঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপোমূলং হি সাধনম্ ॥
যদ্দুরাপং দুরাম্নায়ং দুরাধর্ষং দুরন্বয়ম্।
তৎ সর্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥

—মহাভারত, ১৪।৫১।১৫-১৭

তপস্যায় সিদ্ধ ফলমূলভোজী সমাহিত যোগিগণ
ইহজগতেই তপোবলে করে ত্রিভুবন দরশন।
আরোগ্যের হেতু ঔষধ-সকল নানাবিধ বিদ্যা আর
তপস্যায় লভ্য—তপস্যাই তাই মূল সব সাধনার।
দুর্লভ দুর্বোধ্য দুরায়ত্ত সব তপস্যায় সিদ্ধ হয়,
অমোঘ অব্যর্থ তপস্যার বল অতিক্রমণীয় নয়।
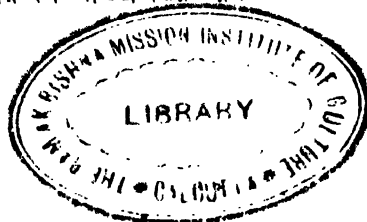
কথাপ্রসঙ্গে

তপস্যা

শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণসমূহে তপস্যার প্রভাব ও মহিমা কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও সবিস্তারে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'তপঃ'-শব্দটি বারংবার ব্যবহৃত হইলেও, সর্বত্র উহা একই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই এবং স্থলবিশেষে উহার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করাও সুকঠিন।

মহাভারতের শান্তিপর্বে 'তপঃপ্রশংসা' বা 'তপোমহিমবর্ণন' নামক অধ্যায়ে পিতামহ ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন :

অহিংসা সত্যবচনং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতেভ্যো হি মহারাজ! তপো নানশনাৎ পরম্॥

খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের মতে ইহার তাৎপর্য: অহিংসা, সত্যভাষণ, দান ও ইন্দ্রিয়সংযম—এই সমুদয় অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ এবং উপবাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর কিছুই নাই।

এইরূপ অর্থ অন্বয়-অনুসারে আক্ষরিক হইলেও, কতটা সমীচীন তাহা বিচার্য। কারণ মহাভারতেরই ভীষ্মপর্বে গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, অহিংসা, সত্যভাষণ ও ইন্দ্রিয়সংযম তপস্যারই অন্তর্গত। সুতরাং 'এই সমুদয় অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ'—এই কথার কোনও অর্থ হয় না এবং 'উপবাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর কিছুই নাই'—ইহাও একান্ত দুর্বোধ্য।

আমাদের মনে হয়, উল্লিখিত শ্লোকে 'অনশন'-শব্দটির অর্থ বাসনার নিবৃত্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে বলিতেছেন: 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন···।' 'অনাশক'-শব্দটির সাধারণ অর্থ অনশন অর্থাৎ উপবাস। সুতরাং অনেকেই উক্ত বাক্যটির অর্থ করিয়াছেন: ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও উপবাসের দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আচার্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন: 'কামানাম্ অনশনম্ অনাশকম্, ন তু ভোজননিবৃত্তিঃ; ভোজননিবৃত্তৌ ম্রিয়তে এব ন আত্মবেদনম্।' অর্থাৎ 'অনাশক'-শব্দটির অর্থ কামনাসমূহের নিবৃত্তি, ভোজন-নিবৃত্তি নহে; ভোজননিবৃত্তিতে মৃত্যুই হয়, আত্মজ্ঞান নহে।

এই যে কামনার অনশন বা নিবৃত্তি, ইহাই প্রকৃত তপস্যা। এইজন্য আচার্য শংকর উল্লিখিত শ্রুতিতে 'তপসা'-পদটিকে অবিশেষিত স্বতন্ত্র-ভাবে গ্রহণ করেন নাই—'অনাশকেন'-পদটিকে 'তপসা' পদের বিশেষণরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। 'তপঃ'- শব্দটির সাধারণ অর্থ ব্রত, উপবাস আদি কৃচ্ছ্রসাধন। শংকরের মতে আলোচ্য স্থলে শ্রুতির তাৎপর্য ঐরূপ তপস্যায় নহে, এইজন্য তাঁহার মতে 'অনাশক'-পদটি 'তপঃ'-শব্দের বিশেষণ হওয়াই যুক্তিযুক্ত; প্রকৃত তপস্যার অর্থ কামনার নিবৃত্তি—ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেলুড় মঠে জনৈক ভক্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তপস্যা কাহাকে বলে।

শ্রীশ্রীমহারাজ উত্তর দেন: তপস্যা নানা রকমের আছে। কেউ ব্রত নেন, বার বছর বসবেন না। কেউ শীতকালে সারারাত জলের

মধ্যে গলা অবধি ডুবিয়ে জপ করেন। কেউ গরম কালে দুপুর-রোদে চারিদিকে আগুন জেলে তার মধ্যে বসে জপ করেন, কেউ বা পেরেকের ওপর দাঁড়িয়ে বা বসে জপ করেন। এঁরা পরজন্মে রাজা হবেন—এ জগৎটা ভাল ক'রে ভোগ করবেন, এই সব কামনার বশবর্তী হয়ে ওই রকম তপস্যা ক'রে থাকেন। কিন্তু এ সব প্রকৃত তপস্যা নয়—যে-কেউ অভ্যাস করলেই করতে পারে। শরীরকে জয় করা সোজা। মনকে জয় করা, কামকাঞ্চন, নামযশের বাসনা জয় করা খুবই কঠিন। আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের ওপর
প্রথম—সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, সত্যখোঁটাকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, জীবনের প্রত্যেক কাজে ; দ্বিতীয়—কামজয়ী হতে হবে ;
।—বাসনাজয়ী হতে হবে।

ইহা স্পষ্ট যে, আচার্য শংকরের ব্যাখ্যার সহিত শ্রীশ্রীমহারাজের উপরি-উক্ত বাসনাজয়-রূপ তপস্যার সুন্দর মিল আছে। তাঁহাদের বাণীর আলোকে মহাভারতের পূর্বোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিলে একটি সঙ্গত ও সহজবোধ্য তাৎপর্য উপলব্ধ হয়।

গীতাতেও 'তপঃ'-শব্দটি সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ তপস্যার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবভেদে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার প্রত্যেকটি কিভাবে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়, তাহাও জানাইয়াছেন. তপস্যার এইরূপ বিশ্লেষণাত্মক এবং সাধকমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য, পরম উপযোগী বিবরণ আর কোথাও দেখা যায় না। গীতার একাধিক স্থলে 'তপঃ'-শব্দটির উল্লেখ আছে। ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান ছাব্বিশটি দৈবী সম্পদের একটি তালিকা দিয়াছেন। উক্ত তালিকায় সত্ত্বসংশুদ্ধি, দম, স্বাধ্যায়, আর্জব, অহিংসা, সত্য, শৌচ ইত্যাদির সহিত 'তপঃ'-কথাটিরও পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু সপ্তদশ অধ্যায়ে যে ত্রিবিধ তপস্যার বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেও ভাবসংশুদ্ধি বা সত্ত্বসংশুদ্ধি, আত্মবিনিগ্রহ বা দম, স্বাধ্যায়, আর্জব, অহিংসা, সত্য, শৌচ ইত্যাদির উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, ষোড়শ অধ্যায়ে 'তপঃ'-শব্দটি সঙ্কুচিত অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও ভাষ্যকার শংকর ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের 'তপঃ'-শব্দটির ব্যাখ্যায় সপ্তদশ অধ্যায়ে উল্লেখিত তপস্যাসমূহের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, উহাতে এই ত্রুটি হয় যে, অহিংসা, সত্য, শৌচ, আর্জবাদির দৈবী সম্পদ্‌রূপে পৃথক্ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। মনে হয়, এই জন্যই আচার্য রামানুজ ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত 'তপঃ'-শব্দটিকে কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, ব্রতোপবাসাদি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্বাচার্য দেখিলেন যে, ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে যে সকল তপস্যার কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অহিংসা, সত্য, শৌচাদি অনেকগুলিই ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে দৈবীসম্পদ্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু 'ব্রহ্মচর্যরূপ' অতি প্রয়োজনীয় তপস্যাটির উল্লেখ ঐ শ্লোকত্রয়ে নাই, এইজন্য তিনি সেখানে 'তপ':-শব্দটির অর্থ করিলেন—'ব্রহ্মচর্যাদি'। মাধ্বভাষ্যের টীকাকার জয়তীর্থ বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, কেহ বলেন, 'তপঃ'-শব্দটির অর্থ সপ্তদশ অধ্যায়ে যে-সকল তপস্যার কথা বলা হইবে, সেইগুলি ; এইরূপ ব্যাখ্যা অসমীচীন, কারণ সপ্তদশ অধ্যায়ে 'দেবদ্বিজগুরু-প্রাজ্ঞপূজন'

ইত্যাদি যে-সকল তপস্যার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি সবই যদি এখানে 'তপঃ-শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে শৌচ, অহিংসা, সত্য, আর্জবাদি যাহা সেখানে উক্ত হইয়াছে, তাহা এখানেও পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখিত হওয়ায় পুনরুক্তি-হেতু এইরূপ পৃথক্ উল্লেখের কোনও সার্থকতা থাকে না।[১]

'ব্রহ্মচর্য'-শব্দটিও সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত শারীর তপস্যার অন্তর্গত। দৈবী সম্পদের মধ্যে 'তপঃ'-শব্দটিকে 'ব্রহ্মচর্য' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে কোনও দোষ হয় না। কারণ সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠিত অহিংসা, সত্য, শৌচাদি তপস্যার দৈবী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইতে যদি কোনও বাধা না থাকে, তাহা হইলে অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যরূপ তপস্যারও দৈবী সম্পদ্রূপে গণ্য হইতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। সহজ কথায়, মধ্বাচার্য ও জয়তীর্থের মূল বক্তব্য এই যে, ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'তপঃ'-শব্দটির পরিবর্তে 'ব্রহ্মচর্য'-শব্দটি পঠিত হইলেই সকল অসুবিধা দূর হয়। কিন্তু মধ্বাচার্য 'তপঃ'-শব্দের অর্থ কেবলমাত্র 'ব্রহ্মচর্য' লেখেন নাই—'ব্রহ্মচর্যাদি' লিখিয়াছেন। 'আদি'-পদের দ্বারা আর কি কি দৈবী সম্পদ্ সূচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ তিনি করেন নাই এবং জয়তীর্থও বিষয়টির উপর কোনও আলোকপাত করেন নাই। ফলে আমাদের জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে রামানুজের ব্যাখ্যাই সঙ্গত, সুস্পষ্ট ও নিরুপদ্রব বলিয়া মনে হয়।

আচার্য রামানুজের ব্যাখ্যা খুবই সমীচীন এই কারণে যে, 'তপঃ'-শব্দটির রূঢ় অর্থ হইতেছে উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধন। বাসনার নিবৃত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা হইলেও, বৈধ উপবাসাদি কৃচ্ছ্র-সাধনেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। আর্য ঋষিগণ ব্যক্তিজীবনকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া সুপরিকল্পিত চতুরাশ্রমের বিধান দিয়া বিস্ময়কর প্রজ্ঞাদৃষ্টির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। চতুরাশ্রম-ব্যবস্থায় তৃতীয় আশ্রমবাসীদের অর্থাৎ বানপ্রস্থীদের নির্দিষ্ট কৃত্যসমূহের মধ্যে কায়িক কৃচ্ছ্রসাধনরূপ তপস্যাই প্রধান। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও ভাগবতাদি পুরাণে বানপ্রস্থীদের তপস্যার কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য শংকরও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন: তপস্যা বানপ্রস্থিগণের অ-সাধারণ ধর্ম, যেহেতু উপবাসাদি কায়িক ক্লেশই ঐ আশ্রমের মুখ্য ধর্ম এবং যেহেতু 'তপঃ'-শব্দটির প্রয়োগ-প্রসিদ্ধ অর্থই হইল ঐজাতীয় কায়িক কৃচ্ছ্রসাধন।[২]

তপস্যা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস—এই ত্রিবিধ আশ্রমের সাধারণ ধর্ম, কিন্তু বানপ্রস্থাশ্রমের উহা অ-সাধারণ অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম। এইজন্যই মুখ্যতঃ বানপ্রস্থিগণই 'তপস্বী' আখ্যায় অভিহিত হইতেন। আর্য ঋষিগণের পরিকল্পনায় বানপ্রস্থ-আশ্রম সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রস্তুতিপর্ব। গার্হস্থ্য-আশ্রমে ধর্মাবিরুদ্ধ ভোগাদির পর দেহশুদ্ধির জন্য বানপ্রস্থীকে বৈধ উপবাসাদি কঠোর ব্রত অবলম্বনে কালাতিপাত করিতে হইত। তাঁহার ধর্ম মুখ্যতঃ কায়িক প্রযত্নসাধ্য তপস্যা। সন্ন্যাসীর ধর্ম মুখ্যতঃ

১। 'তপো বক্ষ্যমাণম্ ইতি কশ্চিৎ; তৎ অসৎ; দেবদ্বিজেত্যাদিনা উক্তস্য অত্র গ্রহণে শৌচাদেঃ অপি তপোগ্রহণেন গৃহীতত্বাৎ পুনরুক্তি-প্রসঙ্গাৎ।'

২। 'তপঃ চ অসাধারণঃ ধর্মঃ বানপ্রস্থানাং, কায়ক্লেশপ্রধানত্বাৎ; তপঃশব্দস্য তত্র রূঢ়েঃ।'
—ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২০, ভাষ্য।

ইন্দ্রিয়সংযম এবং উহা তাঁহার অযত্নসাধ্য স্বাভাবিক ধর্ম। আচার্য শংকরের মতে সন্ন্যাসীর ধর্ম 'তপঃ-'শব্দবাচ্য নহে,[৩] কারণ তপস্বী বলিতে বানপ্রস্থীকেই বুঝায় —সন্ন্যাসীকে নহে।

যে তপস্যা সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রস্তুতি-স্বরূপ, তাহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাতঞ্জল যোগ-সূত্রেও আমরা 'তপঃ'-শব্দটিকে ঐ অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ-সাধনা সম্পর্কে অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত সাধনার সার উক্ত অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেই বিধৃত। সূত্রটি এই : 'তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'—তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান 'ক্রিয়াযোগ' নামে অভিহিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩২-সংখ্যক সূত্রেও 'নিয়ম'-রূপ যোগাঙ্গের বিবরণে তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের উল্লেখ আছে। কিন্তু তপস্যা যে কী, মহর্ষি তাহার উল্লেখ করেন নাই। শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে, তপস্যার ফলে অশুদ্ধিক্ষয়-হেতু কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি অর্থাৎ দূরদর্শন, দূর-শ্রবণাদি হইয়া থাকে। পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে দ্বন্দ্বসহন অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম ইত্যাদি সহ্য করাকেই তপস্যা বলা হইয়াছে মহারাজ ভোজদেব তাঁহার ব্যাখ্যায় চান্দ্রায়ণাদি ব্রতকেই তপস্যা বলিয়াছেন। সূত্রটির ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন : "'তপস্যা'-শব্দের অর্থ—এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়া থাকা, উহাদিগকে ইচ্ছামত কার্য করিতে না দিয়া আত্মবশে রাখা।" 'রাজযোগ'-গ্রন্থের 'সংক্ষেপে রাজযোগ'-অধ্যায়ে স্বামীজী লিখিয়াছেন : "উপবাস বা অন্য উপায়ে দেহ-সংযমকে 'শারীরিক তপস্যা' বলে।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা কিভাবে প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিবেন, তাহা যখন নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না, তখন তিনি 'তপ', 'তপ' অর্থাৎ 'তপস্যা করো', 'তপস্যা করো'—এই নির্দেশ লাভ করেন। কে এই নির্দেশ দিলেন, তাহা জানিবার জন্য ব্রহ্মা চতুর্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াও কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তপস্যাতেই অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে বুঝিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী সুকঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া বলিলেন : "তুমি নির্জনে যে 'তপ', 'তপ' নির্দেশ শ্রবণ করিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া আমিই উপদেশ করিয়া-ছিলাম। তপস্যাই আমার হৃদয় এবং আমি তপস্যার প্রাণস্বরূপ। তপোবলেই আমি চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকি। দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই কাহিনীটির উৎস উপনিষদ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে : 'সঃ অকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। সঃ তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্বম্ অসৃজত।' —সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন, 'আমি বহু হইব, আমি প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।' তিনি তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

৩। 'ভিক্ষোঃ তু ধর্মঃ ইন্দ্রিয়সংযমাদিলক্ষণঃ নৈব তপঃশব্দেন অভিলপ্যতে।'
—ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২০, ভাষ্য।

উপনিষদের বহু স্থলেই তপস্যার কথা উল্লেখিত আছে। যখনই কেহ কিছু জানিতে চাহিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদে এবং ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদে দীর্ঘকালীন ব্রহ্মচর্যাদি তপস্যার পরই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষিও তপঃ-প্রত্যয়-ভাস্বর ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি তপস্যার প্রভাবে এবং ঈশ্বরের কৃপায় ব্রহ্মবস্তুকে জানিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়, বরুণপুত্র ভৃগু তাঁহার পিতাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এবং পিতাও পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন। সেই উপদেশের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পুত্র বারংবার তপস্যা করিতেছেন, কারণ সর্বপ্রকার জ্ঞানের নিদান হইতেছে মনের একাগ্রতা। সেই একাগ্রতাই পরম তপস্যা। ক্রমান্বয়ে পাঁচবার তপস্যা করিয়া ভৃগু সোপান-আরোহণক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

আচার্য শংকর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে ভৃগুর তপস্যাপ্রসঙ্গে, তপস্যাই যে সবার্থসাধক —যাবতীয় সাধ্য বিষয়ের সাধনসমূহের মধ্যে তপস্যাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং স্মৃতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা।[৪]

আচার্য শংকর যাহা বলিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতেও আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন পাই। স্বামীজী বলিয়াছেন: তপস্যা একটি মানসিক যন্ত্রবিশেষ, যাহার দ্বারা সব কিছুই করা যায়। শাস্ত্রে আছে—'ত্রিভুবনে এমন কিছুই নাই, যাহা তপস্যার দ্বারা লভ্য নহে।' তপস্যার দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক যে-কোন বিষয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিশুদ্ধচিত্তে আপনা হইতেই স্ফুরিত হয়, তাহাও চিত্তশুদ্ধিরূপ বহু আয়াস- ও পরিশ্রম-সাধ্য। আধিভৌতিক জ্ঞানে যে-সকল গুরুতর সত্য মানব-হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সেগুলিও সহসা উদ্ভূত দীপ্তির ন্যায় মনীষীদেরই মনে সমুদিত হইয়াছে, কিন্তু বন্য অসভ্য মনুষ্যের মনে তাহা হয় না। ইহাই প্রমাণ যে, আলোচনা ও বিদ্যাচর্চারূপ কঠোর তপস্যাই তাহার কারণ।

সকল জ্ঞানের—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের—মূল স্তম্ভ যে তপস্যা, ভারতবর্ষ তাহা সুপ্রাচীনকালেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল। 'রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস'—কবির এই উক্তিতে ভারতবর্ষের শাশ্বত স্বরূপের যথার্থ পরিচয় উন্মোচিত। ভারতের গৌরব রাজ-ঐশ্বর্যে নহে, তপস্বীর তপোবলে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগবিলাসের চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত ভারতবাসীকে বর্তমান যুগসংকটে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তপস্যাই ভারতের মর্মবাণী। তপস্যাসহায়েই আমাদের জাগতিক

৪। 'সর্বেষাং হি নিয়তসাধ্যবিষয়াণাং সাধনানাং তপ এব সাধকতমং সাধনম্ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।...তৎ চ তপঃ বাহ্যান্তঃকরণসমাধানম্...

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে॥ ইতি স্মৃতেঃ।'—তৈ. উ. ৩।১।১, ভাষ্য

ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতির চরম শিখরে সমারূঢ় হইতে হইবে। আজ আমরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়—কোন্‌টি শ্রেয়ের পথ, কোন্‌টি প্রেয়ের ; কোন্‌টি কল্যাণের পথ, কোন্‌টি অকল্যাণের তাহা নির্ধারণে অসমর্থ। এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিতে ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রয়োজন আমাদের কঠোর তপস্যায় ব্রতী হওয়া। একদা নারায়ণের নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলে নির্জনে নারায়ণের নির্দেশ শুনিয়াছিলেন— 'তপ', 'তপ'—'তপস্যা করো', 'তপস্যা করো'। ব্রহ্মা 'পিতামহ' —প্রতিনিধি মানুষ। আর আমরাও—সকল নরের অয়ন যিনি, চিরকালের একমাত্র আশ্রয় যিনি—সেই নারায়ণেই নিত্য অবস্থিত। তাঁহার 'তপ', 'তপ'— বাণীও অহরহঃ অনুরণিত হইতেছে। সাময়িকভাবে হইলেও জনকোলাহল হইতে একটু দূরে সরিয়া অন্তর্মুখ হইলেই সেই ভাগবতী বাণী নিশ্চয়ই শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারই অনুবর্তনে কঠোর তপস্যা অবলম্বনে পরা অপরা বিদ্যার সশ্রদ্ধ অনুশীলনে আমরা যেন নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারি। একদিকে কঠোর পরিশ্রম, নিরন্তর বিদ্যাভ্যাস, নিরলস বিজ্ঞানচর্চা, অতন্দ্র গবেষণা এবং অন্যদিকে ব্রত, উপবাস, দ্বন্দ্বসহন, জপ, প্রাণায়াম, সংযম, সত্য, সরলতা, সৌম্যত্ব, মৌন, ভাবসংশুদ্ধি, বাসনানিবৃত্তি—এই উভয়মুখী তীব্র তপস্যা অতীতগৌরব-ম্লানকারী নবভারতের অবধারিত রূপায়ণে আমাদের অমেয় পাথেয় হউক।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : বাহ্য-সাধনাভাবে অপি ক্ষীরাদেঃ দধ্যাদি-হেতুত্ব-দর্শনাৎ দেবানাং যোগধনিনাং চ বাহ্য-সাধনং বিনা পুরাণাদৌ যোগমহিম্না সর্গাদিদর্শনাৎ অস্মাকং চ শরীরান্তরং বিনা অপি শরীরাধিষ্ঠাতৃত্বদর্শনাৎ। 'পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বে.উ. ৬।৮), 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্' শ্বে. উ. ৪।১০) ইত্যাদৌ ঈশ্বরস্য সর্বসাধনপটীয়স্যাঃ মায়াশক্তেঃ শ্রবণাৎ। সূত্রকারেণ 'উপসংহারদর্শনাৎ নেতি চেৎ, ন ক্ষীরবৎ হি' (২।১।২৪), 'দেবাদিবৎ অপি লোকে' (২।১।২৫), 'সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ' (২।১।৩৭) ইতি সূত্রৈঃ কুলালাদেঃ মৃদাদ্যুপসংহারদর্শনাৎ ঈশ্বরস্য চ বাহ্যসাধনোপ-সংহারাভাবাৎ ন স স্রষ্টা ইতি আশঙ্ক্য বাহ্যসাধনাভাবে অপি ক্ষীরস্য দধিহেতুত্ববৎ লোকে দেবাদিবৎ চ প্রপঞ্চহেতুত্বোপপত্তেঃ মায়াবশাৎ এব সর্বেষাং সর্বকর্তৃত্বাদি-ধর্মাণাম্ উপপত্তেঃ চ ন কঃ অপি দোষঃ ইতি সমাধানাৎ চ অশরীরস্য অপি তস্য মায়াগুণবশাৎ এব সর্বম্ উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ।

নমু তর্হি প্রসিদ্ধমায়াবী ইব কিম্ ইতি ন গৃহ্যতে ইতি আশঙ্ক্য আহ — যশ্চাব্যক্তঃ ইতি। অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ ইতি অর্থঃ। 'অচিন্ত্যম্ অব্যক্তম্' (কৈবল্য উ. ৬.৬)

ইত্যাদি শ্রুতেঃ 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ং তথারসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ' (কঠ উ. ১।৩।১৫) ইত্যাদি শ্রুত্যা চ রূপাদ্যভাবাৎ ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ। কিন্তু স শ্রুত্যৈকগম্যঃ ইতি ভাবঃ।

ননু ব্রহ্মণঃ এব সকলজগদাকারত্বে ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ ন স্যাৎ সর্বস্য অপি ব্রহ্মকারণকত্বাবিশেষাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—**ব্যস্তসমস্তঃ** ইতি। ব্যস্তঃ ভোক্তৃভোগ্যরূপেণ বিভক্তঃ যঃ সমস্তঃ প্রপঞ্চঃ তদ্রূপঃ ইতি অর্থঃ। লোকে যথা সমুদ্রাদেঃ একস্য এব ফেনতরঙ্গবুদ্বুদরূপেণ বিভক্তানেক-কার্যহেতুত্বং তদ্বৎ একস্য অপি ব্রহ্মণঃ বিভক্তানেক-কার্যহেতুত্বং সম্ভবতি। অত্র সূত্রম্—'ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ, স্যাৎ লোকবৎ' (২।১।১৩) ইতি। অস্য চ অয়ম্ অর্থঃ—ভোক্তুঃ ভোগ্যত্বাপত্তেঃ ভোগ্যস্য চ ভোক্তৃত্বাপত্তেঃ অবিভাগঃ বিভাগাভাবঃ স্যাৎ ইতি চেৎ, ন, লোকবৎ সমুদ্রবৎ বিভাগোপপত্তেঃ ইতি। ততঃ চ ব্রহ্ম এব সর্বকারণম্ ইতি ভাবঃ।

ব্রহ্মণঃ এব সত্যানৃতভোগ্যরূপেণাবস্থানম্ আহ **সদসদ্ যঃ** ইতি। সৎ সত্যম্, অসৎ অসত্যম্। 'সত্যং চ অনৃতং চ সত্যম্ অভবৎ' (তৈ. উ. ২।৬) ইতি শ্রুতেঃ একং সত্যপদং ব্রহ্মপরম্, অপরং ব্যাবহারিক-সত্য-বিয়দাদি-পরম্। অনৃতং শুক্তিরজতাদি ॥৩॥

অনুবাদ: (বাহ্যসাধনাদির অভাবেও সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে, কারণ) দেখা যায় যে, বাহ্যসাধন-নিরপেক্ষভাবেই দুধ দধির হেতু হইয়া থাকে এবং বাহ্যসাধন বিনাই দেবগণ ও সিদ্ধ যোগিগণ যোগশক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি আদি করিয়া থাকেন, ইহাও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। আর ইহাও দেখা যায় যে, আমাদের মতো জীবগণও স্থূলশরীরাশ্রয় বিনাই সংকল্পপ্রভব স্বাপ্ন-শরীরের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে (অতএব তদ্রূপ বাহ্যসাধন-নিরপেক্ষ হইয়াই ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা হন, ইহাই তাৎপর্য)। (এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণও রহিয়াছে, যথা—) 'পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব···মহেশ্বরম্।'—'পরমেশ্বরের পরা শক্তি বিবিধরূপধারিণী', 'মায়াকে মূল প্রকৃতি (জগতের উপাদান) ও পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে'—ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বরের সর্বসাধনসমর্থা মায়াশক্তি বর্ণিত হইয়াছে। (ব্রহ্মসূত্রেও দেখা যায়—) 'উপসংহারদর্শনাৎ নেতি চেৎ, ন ক্ষীরবৎ হি'[১],

১। সূত্রার্থ: (পূর্বপক্ষী)—লৌকিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঘটের কর্তা কুম্ভকার দণ্ড, চক্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াই ঘট-কার্য নির্মাণ করে। এবং ঘটের উপাদান মৃত্তিকারও নিজের অতিরিক্ত কুম্ভকার প্রভৃতির সাহায্যেই ঘট-নির্মাণ-সামর্থ্য দেখা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম নিজের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করেন না বলিয়াই জগতের কর্তা বা উপাদান হইতে পারেন না। (সিদ্ধান্তী)—পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ বাহ্যসাধন-নিরপেক্ষভাবেই দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়; এইভাবে ব্রহ্মও অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই জগৎসৃষ্টি করেন।

'দেবাদিবৎ অপি লোকে'[২] এবং 'সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ'[৩] ইত্যাদি সূত্রদ্বারা—ঘটাদি নির্মাণে কুম্ভকারাদির মৃত্তিকাদি বাহ্য উপাদান সংগ্রহ করিতে দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের বাহ্য উপাদান সংগ্রহের অভাব রহিয়াছে ; অতএব ঈশ্বর জগৎ-স্রষ্টা নহেন— এইরূপ শঙ্কা করিয়া সূত্রকার (শ্রীবাদরায়ণ) এইভাবে তাহার সমাধান করিয়াছেন যে, বাহ্যসাধনের অভাবেও দুধ যে প্রকার দধিরূপ কার্যের হেতু হইয়া থাকে, দেবগণ অন্য সাধন বিনা কেবল নিজ শক্তিপ্রভাবেই যেমন বিচিত্র সৃষ্টি আদি করিয়া থাকেন, ঈশ্বরও তদ্রূপ প্রপঞ্চনির্মাণের হেতু হন এবং মায়াবলেই তাঁহার সর্বকর্তৃত্বাদি সর্বধর্ম যুক্তিসিদ্ধ হয় ; অতএব এ বিষয়ে কোন দোষ উত্থাপিত হইতে পারে না। (ঈশ্বরের যে অশরীরত্ব আক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—) আর তিনি অশরীর হইলেও তাঁহার মায়াশক্তি-প্রভাবেই সব কিছু সম্ভব হয়, ইহাই ভাবার্থ।

(শঙ্কা) তাহা হইলে ঈশ্বরকে প্রসিদ্ধ মায়াবীর ন্যায় গ্রহণ করা হয় না কেন? এই শঙ্কার উত্তরে (আচার্য) বলিতেছেন—**'যশ্চাব্যক্তঃ'**। অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। 'তিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত', 'যাহা রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপবিহীন, অব্যয় এবং নিত্য'—ইত্যাদি শ্রুতিমুখে জানা যায় যে, তিনি রূপাদিবিহীন বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। কিন্তু তিনি একমাত্র শ্রুতিগম্য (শ্রুতিসহায়ে জ্ঞাতব্য), ইহাই তাৎপর্য।

(শঙ্কা) ব্রহ্মই যদি সমস্ত জগদাকার ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে (জগতে) ভোক্তা-ভোগ্য-বিভাগই থাকিবে না, যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত বস্তুর কারণ (সুতরাং সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ)। এই শঙ্কার উত্তরে (আচার্য বলিতেছেন—**'ব্যস্তসমস্তঃ'**। 'ব্যস্ত' অর্থাৎ যিনি ভোক্তা-ভোগ্যরূপে বিভক্ত, (এবং) 'সমস্ত' অর্থাৎ এক প্রপঞ্চরূপ (জগদ্রূপ), ইহাই অর্থ। লৌকিক ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, একই সমুদ্র ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদাদি আকারে বিভক্ত হইয়া নানাবিধ কার্যের হেতু হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই ব্রহ্মের নানাভাগে বিভক্ত, অনেক কার্যের হেতু হওয়াও সম্ভব। এ বিষয়ে (ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে) এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে—'ভোক্তৃত্বাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাৎ লোকবৎ'। এই সূত্রের অর্থ—(একই ব্রহ্ম সর্বরূপ হইলে) ভোক্তার ভোগ্যত্বপ্রাপ্তি হইবে এবং ভোগ্যেরও ভোক্তৃত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে ; তাহা হইলে ভোক্তা ও ভোগ্যের

২। সূত্রার্থ : অচেতন দুগ্ধ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্যরূপে পরিণত হইলেও সচেতন কোনও কর্তাই বাহ্যসাধনহীন হইয়া কার্য নির্মাণ করিতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ প্রভৃতিতে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ চেতন হইয়াও নিজ নিজ যোগসিদ্ধিবলে বাহ্যসাধন বিনাই বিভিন্ন কার্যের কর্তারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মও অন্যনিরপেক্ষভাবেই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইতে পারেন।

৩। সূত্রার্থ : যাহা নিগুর্ণ তাহা উপাদান হয় না : সুতরাং নিগুর্ণ ব্রহ্মও জগতের উপাদান হইতে পারেন না—এই আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, জগৎকারণত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম জগতের কারণ-পদার্থে থাকা প্রয়োজন, সেই সমস্ত ধর্ম ব্রহ্মে রহিয়াছে বলিয়াই ব্রহ্ম জগৎকারণ।

কোন ভেদই থাকিবে না—এই শঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, না তাহা নহে, 'লোকবৎ'—কারণ, লৌকিক সমুদ্রদৃষ্টান্তের ন্যায় ভেদ উপপন্ন হয়। অতএব ব্রহ্মই সর্বকারণ, ইহাই ভাবার্থ।

এক ব্রহ্মই ব্যবহারিক সত্য আকাশাদি ভোগ্যরূপে এবং প্রাতিভাসিক রজ্জুসর্পাদি ভোগ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন—ইহাই (আচার্য) বলিতেছেন—**'সদসদ্ যঃ'**। যিনি 'সৎ'—সত্য (এবং) 'অসৎ'—অসত্য। এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ রহিয়াছে—'সত্যং চ অনৃতং চ সত্যম্ অভবৎ'—সত্য (ব্রহ্ম) সত্য (ব্যবহারিক) ও অসত্য (প্রাতিভাসিক) হইয়াছেন। (এই শ্রুতিতে) শেষোক্ত 'সত্য'-পদটি ব্রহ্মবোধক এবং অপর অর্থাৎ প্রথমোক্ত 'সত্য'-পদটি ব্যবহারিক সত্য আকাশাদি-বোধক। 'অনৃত' অর্থাৎ শুক্তি-রজতাদি অসত্য পদার্থ। ৩। [ক্রমশঃ]

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[সুরেশকুমার নাহাকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Godavari House,
Ootacamund, (Madras)
12.9.26

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার 6/9 তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। এখানকার ভক্তেরা যাঁরা মঠ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাঁদের ইচ্ছা আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর উহার opening হয়। খুব সম্ভব ঐ দিন হইতে পারে। আমরা তাহলে October-এর প্রথম সপ্তাহে অন্যত্র যাইতে পারি, হয় বাংলোর না হয় মাদ্রাজ, ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা।

পরীক্ষা দিলে ক্ষতি নাই। যখন সংসারে আছ, কায কর্ম্ম করিতেছ, তখন reasonable & possible & proper & legitimate emulation, ambition থাকা উচিত বলিয়া আমার মনে হয়। তোমরা ভক্ত, তাঁকে তোমার কখনই ভুল হবে না। তোমার তাঁতে বিশ্বাস ভক্তি কখনই কমিবে না বরং দিন ২ বৃদ্ধি হইতেই থাকিবে, তার কোন সন্দেহ নাই। আমার শরীর এক রকম মন্দ নয়, তাঁর ইচ্ছায়। আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা জানিবে। মধ্যে ২ সংবাদ দিও। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

* শ্রীঅসিতকুমার নাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

Mylapore, Madras
7. 12. 26

শ্রীমান সুরেশ

তোমার প্রেরিত পত্র ও ৩৲ পাইয়াছি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা জানিবে। আমার শরীর মন্দ নাই। ২/৩ দিনের জন্য মাদ্রাজ হইতে ১৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত এক পল্লীগ্রামে ঠাকুরের একটি ছোট আশ্রম আছে। সেখানে গতকল্য আমরা মাদ্রাজ মঠ হইতে ৭/৮ জন আসিয়াছি।

তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন ২ তাঁর কৃপায় বৃদ্ধি হউক এবং সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাক। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

R. K. Ashram, Khar, Bombay
11. 2. 27

শ্রীমান সুরেশ

তোমার 4. 2. 27 তাঃ পত্র পাইয়াছি। আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। ইতিমধ্যে তোমার কোন পত্র আমি পাই নাই। আমরা আগামী ১৪ই সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিয়া ১৫ই মঙ্গলবার নাগপুরে পৌছিব। সেখানে আন্দাজ ৩ দিন থাকিয়া ঠাকুরের বেলুড় মঠে যাইব। আমার শরীর তত মন্দ নয়। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন ২ তাঁর কৃপায় বৃদ্ধি হউক। এখানকার আর ২ সংবাদ সব মঙ্গল। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

রামকৃষ্ণ মঠ, Belurmath P. O., Dt. Howrah
7. 3. 27

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার পূর্ব্ব পত্র নিশ্চয় এতদিনে পাইয়াছ। প্রভুর কৃপায় রাঁচির উৎসব নির্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, কোন চিন্তা নাই।

তোমার প্রেরিত ৩৲ পাইয়াছি। বেলুড় পোষ্ট অফিসের নাম এখন Belurmath P. O. হইয়াছে।

এখানকার সব তাঁর কৃপায় কুশল। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

মঠ বেলুড়, বেলুড় মঠ পোঃ, Dt. হাওড়া

৮।৪।২৭

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার প্রেরিত ৩৲ পাইয়াছি। তোমার শরীর এখন ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি দিন ২ বৃদ্ধি হউক এবং অনাসক্ত হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য কায করিতে থাক। আমার শরীর এবার মঠে আসা অবধি তত ভাল থাকিতেছে না। আরো কিছুদিন দেখিয়া যদি সুস্থ বোধ না করি তবে অন্যত্র কোথাও কোন dry place-এ change করিতে হইবে। যা তাঁর ইচ্ছা হয় হইবে। তুমি ও তোমরা ও ভক্তেরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। এখানকার আর ২ সংবাদ তাঁর ইচ্ছায় এক প্রকার কুশল। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

P. O. Belurmath, Howrah

6. 7. 27

শ্রীমান সুরেশকুমার

তোমার 4. 7. তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমরা সকলে তাঁর কৃপায় ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন ২ বর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা ও ভক্তেরা সকলে জানিবে। কালীপ্রসন্ন ভাল আছে ত? তাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। তোমার প্রেরিত ৩৲ তিন টাকা পাইয়াছি। ওখানে বৃষ্টি হইতেছে শুনিয়া আনন্দ হইল। এখানেও হইতেছে, তবে তত বেশী নয়, আরো অধিক দরকার। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয় পর্যায়

এক

শ্রীগুরুর দেওয়া ব্রত, আদেশ ও শক্তি নিয়ে নরেন্দ্রনাথ কি করলেন ?

প্রথমে নরেন্দ্রনাথ সারাৎসারিত হলেন বিবেকানন্দে—এক ক্রান্তদর্শী আধিকারিক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে। যে সম্ভাবনা নিয়ে আসা হয়েছিল, তারই হল পূর্ণ বিকাশ। তাঁর পরবর্তী কালের সকল চিন্তা, চেষ্টা, অনুভূতি, দুঃখ, আনন্দ, উক্তি—সব এই এক অতি-মানবীয় চেতনায় প্রোজ্জ্বল।

বাইরে থেকে দেখতে দেহের আকার একই রইল, কিন্তু যে দেহে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলব্ধ সকল শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, সে দেহের অধিবাসীটি আর এক রইলেন না।

ঠাকুর বলেছিলেন নরেন্দ্রকে কালী মানার পরের দিন : '… তুই আমি কি আলাদা ? এটাও আমি, ওটাও আমি।' 'এটা-ওটা', 'তুমি-আমি' সব এখন অতি সূক্ষ্মভাবে একাকার হল এ দেহে নরেন্দ্র হলেন রামকৃষ্ণাত্মা বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ হলেন বিবেকানন্দ-দেহাহুত বিদেহানন্দ।

স্বামীজী যখন সন্দেহলেশহীনভাবে সম্যক্ অবধারণ করলেন যে, তাঁর গুরু স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান, তখন তাঁতে সন্ন্যস্ত ব্রত, আদেশ ও সঞ্চারিত শক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সকল মানুষের পক্ষে কত গভীর তা স্বতঃই অনুভব করলেন। কারণ এ ভগবানের দেওয়া ব্রত ও চাপরাশ। এ ভগবানের শক্তি তাঁতে গচ্ছিত রাখা রয়েছে মায়ের কাজের জন্যে, জগতের কল্যাণের জন্যে।

একদিকে গৃহে অভুক্ত মা-ভাই-বোন। অন্যদিকে অবতীর্ণ ভগবানের দেওয়া ব্রত-আদেশ-শক্তি। এ স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-সাধনার দ্বিতীয় পর্বে একটি অতি সংকটপূর্ণ মুহূর্ত।

স্বামীজী প্রথমে মা-ভাই-বোনদের যাতে অভুক্ত না থাকতে হয়, আর যাতে তাঁদের মাথা গুঁজবার একটু ই থাকে, তার ব্যবস্থা করলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী করলেন সংঘগঠন ও মঠপ্রতিষ্ঠা। এ দুটি কাজ করলেন তিনি একটি ঐকতানের কুশলী পরিচালকের মত। একদিকে মা-ভাই-বোনদের সংসারে ব্যবস্থা, অন্যদিকে ত্যাগী গুরুভাইরা যাতে সংসার ছেড়ে এসে সন্ন্যাসে থাকেন তার ব্যবস্থা। দুই-ই করলেন স্বামীজী।

এ কাজ করতে তাঁর লেগে গেল প্রায় পাঁচ বছর। অতঃপর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক অগ্নি-মুহূর্তে তিনি হলেন অভিনিষ্ক্রান্ত—ভারতের ধূলি-ধূসর পথে তিনি হলেন চলমান পরিব্রাজক। তাঁর রামকৃষ্ণ-সাধনার এক নূতন পর্যায় হল শুরু।

যোগারূঢ়, ব্রহ্মজ্ঞানী, প্রত্যাদিষ্ট বিবেকানন্দ চলেছেন ভারতের বহু-বিতত পথে—যে পথ বেয়ে বয়ে গেছে জাতির যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসের স্রোত। উজানে চলেছেন কালের ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে জাতির প্রাণোত্রীর অভিমুখে। শির আকাশে, পদতলে বহুপ্রত্ন বহুবিচিত্র বসুন্ধরা। উদাস হাওয়ায় গায়ের উত্তরীয় হয়েছে গৈরিক বিজয় পতাকা। সুমুখে পরিস্রিয়মাণ চক্রবাল, নীরবে ইঙ্গিত করছে : "ভগ চরৈবেতি !"

চলেছেন একাকী অথচ সঙ্গীহীন নন—কারণ অন্তরে রয়েছেন অনুপ্রবিষ্ট জাগ্রত অবতীর্ণ ভগবান। তাঁকে কোথাও কোন মন্দিরে বসিয়ে ভোগ-নৈবেদ্যে ভুলিয়ে রাখার জো নেই। অন্তরে দুর্বার অন্তপ্রেরণা হয়ে তিনিই নিয়ে বেড়াচ্ছেন শিষ্যকে তীর্থ হতে তীর্থান্তরে, নগরে, জনপদে, পর্বত-গুহায়, অরণ্যে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, রাজার প্রাসাদে, গৃহহীনের বৃক্ষচ্ছায়ায়—ভগবানের অন্বেষণে নয়, তিনি তো রয়েছেন জাগ্রত অন্তরেই—মানুষের মহাতীর্থে। বলেছিলেন: 'তোর হাড় করবে' মায়ের কাজ। হাড়ে চেপে প্রথমে দেখালেন তাঁর সব-হওয়া মাকে।

দেখালেন এই ভূ-ভারতে কত অজ্ঞান-সম্ভূত দুঃখ, দারিদ্রপিষ্ট নারায়ণের কি লাঞ্ছনা, নিরীহের ওপর সমাজের কি নিষ্পেষণ, কত সুপ্ত দেবত্ব উন্মুক্তি-প্রত্যাশী। অন্যদিকে উন্মোচিত করলেন মলিন আবরণের অন্তরালে যত্রতত্র বিচ্ছুরিত অতুলনীয় অধ্যাত্ম-সম্পদ।

পথ চলতে চলতে যেখানে মিলেছে বিবিক্ত-সেবীর মনের মত একটি নিভৃত ধ্যানস্থান, স্বামীজীর সমাধি-লোলুপ মন তাঁকে প্রেরিত করেছে যোগাসনে বসতে। কিন্তু পদে পদে দেখেছেন: 'যখনই তপস্যা করব মনে করি, তখনই ঠাকুর একটা বাগ্‌ড়া দেন।'[৩৫]

এই 'বাগ্‌ড়া' দেওয়াটা হচ্ছে ঠাকুরের নরেন্দ্র-সাধনার এক দিক। স্বামীজী ভুলে থাকলেও ঠাকুর কখনও ভুলে যেতেন না নরেন্দ্র ধ্যান-সিদ্ধ আধিকারিক পুরুষ, যার আগে বস্তু-লাভ, তারপর সাধন, যাকে সাধ্য-সাধনা করে প্রেমের আকর্ষণে আনা হয়েছে অখণ্ডের ঘর থেকে এ ধরায়। উদ্দেশ্য: জীবের দুঃখ দূর করান আর জীবকে শিক্ষা দেওয়ান।

ঠাকুর জানতেন নরেন্দ্র অল্পায়ু অথচ সুমুখে রয়েছে বিপুল অসমাপ্ত কর্ম। ঠাকুর 'বাগ্‌ড়া' না দিলে স্বামীজীকে কাজ করাতো কে?

আর স্বামীজীর কাজ স্বামীজী ছাড়া আর কে করতে পারতেন? তাই অন্তরে অনুস্যূত ভগবানের এ যোগ-কৌশল—'বাগ্‌ড়া' দেওয়া। আর এটি ঠাকুর করে চলেছিলেন তাঁর পরম জীব-কারুণ্যের প্রেরণায়।

আধ্যাত্মিক জীবনে দুটি সাধনা রয়েছে—একটি হওয়ার সাধনা আর একটি দেওয়ার সাধনা। অনেক সাধক হওয়ার সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করে আনন্দে বিহ্বল হয়ে, দেওয়ার সাধনায় উত্তীর্ণ হতে ভুলে যান। অনেকের সে উদ্যম বা শক্তিও থাকে না।

কিন্তু ঠাকুরের স্বোক্তি থেকে আমরা জানি স্বামীজীর জীবনে ভগবৎ-পরিকল্পনা অনুযায়ী হওয়ার সাধনাটা গৌণ, দেওয়ার সাধনাটি হচ্ছে মুখ্য। সেজন্যে ঠাকুর তাঁকে সমাধি-বিলাসে কালাতিপাত করতে দিতে একেবারেই রাজী ছিলেন না। কারণ অল্প সময়ে অনেক '…কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।'[৩৬]

কড়ার কড়া তস্য কড়া' কিনা! তাই সর্বস্ব দিয়ে 'ফকির' হয়েও চাবিটি নিজের হাতে ঠিক রেখেছিলেন! কারণ কালী তো ইচ্ছাময়ী। কখন ঐ মায়ার হাল্‌কা বাঁধনখানি নরেনের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে দিবেন জোর করতালি আর নরেন্দ্র 'ওঁ' বলে হবেন মহাসমাধিলীন তার কিছুই ঠিক নেই। আর অমন হলে এত কষ্ট করে আসার অনেকটাই রয়ে যাবে অসমাপ্ত।

তাই স্বামীজীর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট ঠাকুর ব্যস্ত ছিলেন স্বামীজীকে হওয়ার-সাধনা থেকে তাঁর

৩৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১৩৭৩), ১।২৯৯

৩৬ তদেব, ১।৩০০

দেওয়ার-সাধনায় অধিকতর ব্যাপৃত রাখতে। তাছাড়া হওয়ার বাকি ছিলই বা কি? তবু স্বামীজীর তপস্যা চলছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, চোখ চেয়ে ধ্যানে, সহস্রশীর্ষ পুরুষের ধ্যানে।

দুঃখ দূর করার ব্রত দিয়েছিলেন ঠাকুর শিষ্যকে। কিন্তু যে নিজে কখনো দুঃখ পায়নি, সে অন্যের দুঃখ বুঝতে পারে না—দূর করা তো দূরের কথা। তাই নরেন্দ্রকে এমন দারিদ্র-দুঃখে ফেললেন যে, অনশনে অন্নের অন্বেষণে, জ্ঞাতি-লাঞ্ছিত, বন্ধু-পরিত্যক্ত ও দুর্ভাগ্য-পর্যুদস্ত হয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝলেন দুঃখ কি বস্তু। তাই ভাবালু সঙ্গীত-মুখর বন্ধু যখন গাইছিলেন: 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে'...তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর মাথায় যেন কেউ গুরুতর আঘাত করল। আর ক্ষোভে নিরাশায় অভিমানে বলে উঠেছিলেন:

নে নে চুপ কর! ক্ষুধার তাড়নায় যাদের আত্মীয়বর্গের কষ্ট পেতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাদের কখনো সহ্য করতে হয় না, টানা পাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের কাছে ঐরকম কল্পনা মধুর লাগতে পারে, আমারও একদিন লাগত। কঠোর সত্যের সুমুখে ওসব এখন বিষম ব্যঙ্গ বলে বোধ হচ্ছে।[৩৭]

গৃহত্যাগের পূর্বেই স্বামীজী দুঃখ কি তা মর্মে মর্মে নিজ অভিজ্ঞতায় সুগভীর ভাবেই জেনেছিলেন। কিন্তু সারা দেশে সে দুঃখের পরিব্যাপ্তি ও কায়েমী অবস্থিতির ত্রাস-সঞ্চারী বিরাট বৈরী রূপের মুখোমুখি হলেন প্রথমে তাঁর পরিব্রাজক জীবনে। যদিও খালি পেটেও তাঁর নিজের ধর্ম হয়েছিল, তিনি এখন সম্যক্ অবধারণ করলেন ঠাকুরের সে বাণীর মর্মার্থ: 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। ধর্ম-সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হয়ে ঠাকুরের এটাই ছিল একটি অতি আধুনিক আবিষ্কার।

দেওয়ার-সাধনায় উন্মুখ ঠাকুর ভবতারিণীকে বহু অনুনয় করে বলেছিলেন: 'মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না!'[৩৮] উদ্দেশ্য, মানুষ নিয়ে আনন্দ করবেন ও তাদের যা দেবার ছিল সব দেবেন।

কিন্তু হায়! মানুষের যে দুঃখের শেষ নেই। তাকে নিয়ে কি করে আনন্দ করা চলে? তাই জীবের দুঃখ দূর করাই জীবনের প্রধান ব্রতরূপে দিলেন শিষ্যকে। এতে তাঁর নিজের জীব-যোগ-সাধনারই পরিব্যাপ্তি হল। 'এটাও আমি, ওটাও আমি' বলেছিলেন তো!

দুঃখীর দুঃখ আপন হৃদয়ের গভীরে অনুভব করাই দুঃখ অপসারণের প্রথম সোপান। স্বামীজী তাঁর নিজের বিশাল হৃদয়ে ভূ-ভারতের সকল দুঃখকে যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে নিলেন।

ভগবানের জন্যে যত কেঁদেছিলেন তার চেয়ে কম কাঁদলেন না দুঃখী মানুষের জন্যে। ঠাকুর কালীর জন্যে যত কেঁদেছিলেন, নরেনের জন্য তার চেয়ে যে কম কাঁদেন নি, সে বোধ হয় এ জন্যেই।

স্বামীজীর মতো দুঃখীর বন্ধু এক বুদ্ধদেব ছাড়া খুব কমই হয়েছেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে এক পত্রে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন:

"...এস আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্য প্রার্থনা করি; দিবারাত্র তাদের

৩৭ দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃঃ ১৪৯　　৩৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, (১৩৭৪), পৃঃ ৮১

জন্য প্রার্থনা কর বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নই, দার্শনিক নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি।

"এদেশে যাদের গরিব বলা হয়, তাদের দেখছি ; আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে ! কিন্তু ভারতের চির-পতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে ! তাদের উদ্ধারের উপায় কি ? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো ? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো ? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে ? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দিবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্ত-মোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু করে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতসারে মরতে পারি—কেউ হয়ত আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য একফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললে না, কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনো নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে-সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি। হে ভ্রাতৃগণ ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মতো গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন…।"[৩৯]

শিষ্যের হৃদয়গুহায় অধিষ্ঠিত ঠাকুর সব দেখে-শুনে নিশ্চয় আশ্বস্ত হলেন। স্বামীজীর এই অমেয় হৃদয়বত্তাটি তাঁর শ্রীগুরুর সাধনারই সম্প্রসারণ।

দক্ষিণেশ্বরে জীব-শিব-মন্ত্র পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছ থেকেই। তাই স্বামীজীর দৃষ্টিতে গরিবের দুঃখ আরো ভয়ানক বস্তু, কারণ এ হচ্ছে শিব-লাঞ্ছনা, শিবাপরাধ। স্বামীজী ধ্যানে জানলেন জীবের দুঃখাপসারণ-ব্রত কেন এক উচ্চাঙ্গের যোগ-সাধন — জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বয়ে সাধা অভিনব যোগ-সাধন। যেদিন গুরুর মুখে জীব-শিব-মন্ত্র পেয়েছিলেন, সেদিনই প্রতিভাধর নরেন্দ্রনাথ বেদান্ত ঘরে আনার সংকল্প করেছিলেন।[৪০]

৩৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৫৭-৫৮
৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৩৭৯), ৫।২৬৩

স্বামীজী দরিদ্রকে বলেছেন 'নারায়ণ', 'সব-হারা' বলেননি। এই ভোগ-রাগ-বঞ্চিত নারায়ণকে স্বামীজী বসালেন তাঁর ভাবের নূতন দেউলে। মানুষের তিনি হলেন পূজারী। গুরুর দেওয়া বৈপ্লবিক ইশারা ছিলঃ মাটির প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর জ্যান্ত মানুষে হয় না ?

কিন্তু মানুষের দুঃখ দূর করেন কিভাবে ? তিনি যে ভিক্ষান্ন-ভোজী, কপর্দকহীন সন্ন্যাসী। ভাবলেন যাদের অনেক রয়েছে অর্থ, তাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাদের অল্পও নেই তাদের করবেন অভাব মোচন। অনেক ধনীর, সঙ্গতিপন্ন রাজন্যবর্গের দ্বারে দ্বারে গেলেন কিন্তু কৃতকার্য হন নি দুঃখীর দুঃখ দূর করার জন্য সম্পদ আহরণ করতে। আর একটি সত্য তিনি আবিষ্কার করলেন যে সকলেই দুঃখী। যাদের আছে তারাও দুঃখী, যাদের নেই তারাও দুঃখী। দুঃখের অতীত শুধু তাঁরাই, যাঁদের হয়েছে 'বস্তু'লাভ। 'অবস্তু' অনেক পাওয়াতেও দুঃখ, না পাওয়াতেও দুঃখ।

ঠাকুর স্বামীজীকে শুধু জীবের দুঃখ দূর করার ব্রত দেন নি, তাঁকে হাতে লিখে চাপরাশ ও আদেশ দিয়েছিলেনঃ 'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'।

কি করে মানুষের দুঃখ দূর করবেন ও কি শিক্ষা দিবেন ? চলমান বিবেকানন্দ বহু তপস্যার মাধ্যমে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন এ দুটি প্রশ্নের সম্যক্ সমাধান।

গুরুর দেওয়া ব্রত ও আদেশের মাঝে তিনি দেখতে পেলেন এক সংযোগ। অর্থাৎ জীবের দুঃখ দূর করতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু কি শিক্ষা দিবেন ? অবতীর্ণ ভগবানের স্বহস্ত-লিখিত চাপরাশ পেয়েছেন নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও। কিন্তু কি শিক্ষা দিবেন ?

ঠাকুর সূত্রাকারে স্বামীজীকে দিলেন ব্রত ও আদেশ। তাতে সঞ্চারিত করলেন নিজের অমেয় আধ্যাত্মিক শক্তি, আর দিলেন তাঁর ঈশহৃদয়ের অনন্ত প্রেম।

স্বামীজী স্বকীয় সাধন-প্রতিভা দ্বারা ও মহা-মায়ার কৃপায় আবিষ্কার করলেন তাঁকে দেওয়া ব্রতের ক্ষেত্র-পরিধি। তিনি এ সত্যও আবিষ্কার করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থ অবতীর্ণ হয়েছেন।

অতএব তাঁকে দেওয়া ব্রতের প্রয়োগভূমি হবে সমস্ত জগৎ। শিক্ষার মাধ্যমে যে ব্রত উদ্‌যাপিত করতে হবে এ তাঁর কাছে ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে আসছিল।

কিন্তু কি শিক্ষা দিবেন ? সবকালেই প্রত্যাদিষ্ট আধিকারিক পুরুষদের নূতন করে ভাবতে-বুঝতে হয়েছে তিনি কি শিক্ষা দিবেন ? কি ধারায় ব্রত উদ্‌যাপিত হবে ?

অরণ্যে, পথে, প্রান্তরে পরিব্রাজক স্বামীজী সকল কর্ম, স্বাধ্যায়, প্রবচন, ধ্যান—সব কিছুর মাঝে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত করার উপায়।

অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ আপাত-অজ্ঞেয় কারণে স্বামীজীকে পদব্রজে চলমান করলেন ভারতময়। ভারতের সকল স্তরের লোক স্বামীজীকে দেখল, স্বামীজী সকলকে দেখলেন। শুধু দেখাই নয়।

ঠাকুরের শিক্ষায় আছেঃ

"যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে— বিদ্বেষ-ভাব আর রাখবে না। ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না ; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না ; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান—এই বলে নাক সিঁট্‌কে ঘৃণা ক'রো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে—যতদূর পার। আর

ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ ভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্বস্বরূপকে দেখতে পাবে।"[৪১]

স্বামীজী সকলের সঙ্গে, সর্বস্তরের সর্বধর্ম বা অধর্মের লোকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশলেন—তাঁদের অন্ন, দুঃখ-সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-সমস্যার অংশভাগী হলেন। নিজের ধ্যানগুহায় স্বস্বরূপকেও দেখতে থাকলেন।

বিপদ এসেছে, আপদ জুটেছে, অভুক্ত থাকতে হয়েছে কতদিন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে মানুষের জন্য প্রেম ক্রমেই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। গুরুর দেওয়া ব্রত তিনি ভোলেন নি। যে মানুষ-পূজা ঠাকুর তাঁকে শিখিয়েছিলেন, সে মানুষের জন্যে তিনি সুগভীর আত্মীয়তা অনুভূতিতে পেলেন। নরেন্দ্রকে তাঁর সমাধি-লোলুপতার জন্যে একদিন ঠাকুর কঠোরভাবে তিরস্কার করে ভাবী বিবেকানন্দের একটি চিত্র তাঁর সুমুখে তুলে ধরেছিলেন। বহুদুঃখে বলেছিলেন: "আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস্!"

হিমালয় থেকে ভারত-মহাসাগরের দিকে স্বামীজী যতই এগিয়ে যেতে থাকলেন, তাঁর চিত্তসমুদ্রে ততই একটি প্রশ্ন-তরঙ্গ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে: কি করে গুরুর দেওয়া ব্রত উদ্‌যাপন করি?

অবশেষে পরিব্রজ্যায় বিবর্তিত, বহ্নিমান প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী এলেন মাতৃপদপ্রান্তে—কন্যাকুমারীতে। মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে সন্তান জ্ঞাপন করলেন অন্তরের উদ্ভিন্ন বেদনা-রাশি: কেমন করে কি করি মা আমায় বলে দাও, আমার ঘাড়ে যে চাপান আছে অনেক দায়—ঠাকুর বলেছেন, আমার 'হাড় করবে।'

উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "...আমার বিশ্বাস যে সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন।"

মাতৃ-চালিত বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে অন্যরূপা মায়ের চরণেই এলেন, ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কৃপা ভিক্ষা করতে।

জগন্মাতার পাদমূলে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের উত্তালতার মধ্যে ভারতের শেষ শিলা-খণ্ডের উপর সমাহিত বিবেকানন্দ পেলেন ব্রত উদ্‌যাপনের সুনির্দিষ্ট নিশানা। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হল মাতৃকৃপাকিরণে স্ফুটনোন্মুখ সহস্রদল পদ্মের দলগুলি বিকশিত হতে শুরু করল।

ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানস্থ বিবেকানন্দের ধ্যানের বিষয় ছিলেন না সাকার ঈশ্বর বা নিরাকার তত্ত্ব। তাঁর চিন্তার বস্তু ছিল ভারতবর্ষ, বহুধর্মের জন্মস্থান ও মিলনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ—ভারতের গৌরবময় অধ্যাত্ম-মহিমোজ্জ্বল অতীত। দুঃখদারিদ্রমগ্ন, হীনবীর্য, হৃতগৌরব, হৃতাধ্যাত্ম-সম্পদ বর্তমান এবং আপাত-তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎও।

ভারতের এই লুপ্ত গৌরব কি পুনর্বার সুপ্রতিষ্ঠ করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে কি উপায়ে?

তাঁর দিব্য দর্শনে ভারতের সমুজ্জ্বল অতীত ও ভবিষ্যৎ ভেসে উঠল। আর সেই সঙ্গে

৪১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৮২), পৃঃ ১৬৪

তাঁর প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট হতশ্রী ভারতের করুণ রূপ। তিনি ভাবতে লাগলেন এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর ব্রত তিনি কিভাবে উদ্‌যাপিত করবেন।

ধ্যানস্থ স্বামীজী দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ একটি পূর্ণ ও অত্যুজ্জ্বল চিত্র। তিনি জানলেন ধর্মই অগণিত ভারত-সন্তানের মেরুদণ্ড। তাঁর শান্ত সমাহিত চিত্তে এই বাণীই ধ্বনিত হল: "যে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি-প্রভাবে ভারতবর্ষ একদিন বিভিন্ন সংস্কৃতির ও বিভিন্ন ধর্মের জন্মভূমি ও মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, একমাত্র সেই অনুভূতিবলেই পুনরভ্যুত্থান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর।"[৪২]

ভারতের দুর্গতির কারণ এই যে যথার্থ ধর্ম কোথাও সার্বজনীন ও সক্রিয় ভাবে অনুসৃত হয় নি। ধর্মকে যথাযথ অনুসরণ করে ও জীবনে তাকে রূপায়িত করে কোন জাতি কখনও অধঃপতিত হয় নি। প্রত্যুত ইতিহাসের সাক্ষ্য হতে জানা যায়, জাতীয় জীবনে যত শক্তি সাফল্য আনয়নে সমর্থ হয়, সক্রিয় সত্য-ধর্ম তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

স্বামীজীর চিত্তভূমিতে ভেসে উঠল সমগ্র ভারতবাসীর ঊর্ধ্বায়নের উপাদান ও কৌশল। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাঁর গুরুদত্ত জীবন-ব্রত কি ধারায় উদ্‌যাপিত হবে। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, ব্রত উদ্‌যাপিত হবে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে।

'পরিব্রাজক' বিবেকানন্দ শিলাখণ্ডের উপর সমাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু যিনি ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে, ভারতের ভূমিতে ফিরে এলেন তিনি এক বিবর্তিত আশ্চর্য পুরুষ—ভারতাত্মা বিবেকানন্দ।

সেই যে দক্ষিণেশ্বরের কালী প্রবেশ করেছিলেন তাঁর অস্তিত্বে, ভ্রাম্যমান করেছিলেন তাঁকে সংসারের বর্ত্মে, আবর্তে, তিনিই তাঁকে শিলাসনে ধ্যানস্থ করালেন কন্যাকুমারীর পাদমূলে। সেখানেই জীবনের ব্রত, যা দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিন ঘোষিত হয়েছিল, তা কার্যে পরিণত করার নিশানা পেলেন।

স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-সাধনার পর্যায়ে পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই কালীর রহস্যপূর্ণ ভাব-আবির্ভাব। ঠাকুরের যে নরলীলায় মন এসেছিল তার ব্যবহারিক রূপায়ণ হল বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার মাধ্যমে। স্বামীজীর ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-চিন্তার পেছনে রয়েছে 'চির উন্মদ-প্রেম পাথারে'র উত্তাল শক্তি-গম্ভীর তরঙ্গ-ভঙ্গ।

বিবেকানন্দের অস্তিত্ব, ঠাকুরের সব দিয়ে 'ফকির' হওয়ার দিন থেকে কখনও রামকৃষ্ণ-ছাড়া ছিল না।

দুই

ভারতের দক্ষিণ সৈকত থেকে আবার পথ চলছেন স্বামীজী 'উত্তরস্যাং দিশি'। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হয়ে গেছে। স্বামীজী একত্রিশ বয়সে পদার্পণ করেছেন। এই বৎসরটি স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ।

জগন্মাতার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত স্বামীজীর মনে শ্রীরামকৃষ্ণদত্ত ব্রত ও আদেশ পালনের উপায় ও ধারা অনেকাংশে নির্ণীত হয়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীগুরুর নিকট জীব-শিব-মন্ত্র যেদিন পেয়েছিলেন সেদিনই বনের বেদান্ত মানুষের ঘরে আনার সঙ্কল্প করেছিলেন।

৪২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১৩৭৩), ১।৩৮৯-৯০

এ মন্ত্রে নিহিত যে এক অমূল্য ধন ছিল সে হচ্ছে বেদান্তের আলোকে সেবার আদর্শ। কন্যাকুমারীতে ধ্যানে তিনি আবিষ্কার করলেন: ত্যাগের কল্যাণ-সম্ভাবনা নিহিত সেবায়, সেবার অধ্যাত্ম-সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে ত্যাগে। ত্যাগ-ভিত্তিক সেবায় ও সেবা-বিকশিত ত্যাগে তিনি দেখতে পেলেন ধর্মের নবীন সম্ভাবনা—বিশেষ করে তাঁর গুরুদত্ত ব্রত উদ্‌যাপনে।

তিনি জানলেন তাঁর গুরু যে জীবের দুঃখ দূর করার ব্রত ও শিক্ষা দেওয়ার আদেশ দিলেন—এ দুয়ের সংযোজন ভারতের তথা জগতের ধর্ম-ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আগামী তরঙ্গ।

জগতে যুগে-যুগে-আসা সকল আধিকারিক পুরুষকেই ভেবে-বুঝে যুগোপযোগী শিক্ষা নূতন করে দিতে হয়েছে; মূলতঃ যদিও সকলেরই অন্যতম উদ্দেশ্য দুঃখ-নিরসন ও জ্ঞানদান।

সবকালেই আধিকারিক ধর্মদাতাগণ বেশী শিক্ষা দিয়েছেন নির্মুক্ত দৈবাত্ম সম্ভাবনা দ্বারা, যত না দিয়েছেন তাঁদের তমোনাশন বাণী দ্বারা। তাঁদের বাণীর সকল শক্তি এসেছে তাঁদের হওয়া থেকে। বিবেকানন্দ 'দেবপ্রসাদাৎ তপঃপ্রভাবাৎ চ' অমিত-শক্তিশালী এক ভূমাসংহিত লোকোত্তর লোকগুরুতে বিবর্তিত হয়েছেন তাঁর পরিব্রাজক দিনগুলিতে। গুরুর যে আদেশ একদিন মাথায় নিতে ইতস্ততঃ করেছিলেন, এখন তিনি সম্যক্ জেনেছেন যে, চাপরাশ যাঁকে স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান দিয়েছেন, তাঁকে শিক্ষা দিতেই হবে। কারণ শিক্ষার মাধ্যমেই তাঁকে দুঃখ দূর করার ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।

কিভাবে জীবের করবেন দুঃখ দূর ও কি শিক্ষা দিবেন, ভারতাত্মা বিবেকানন্দের ইহাই এখন সম্যক্ চিন্তা।

সবকালেই সকল আধিকারিক পুরুষকে নূতনভাবে এই সমস্যার সময়োপযোগী সমাধান-পদ্ধতি প্রবর্তিত করতে হয়েছে

বুদ্ধদেব এ সমস্যাটিকে অবিলম্বিত বর্তমানতার দিক থেকে গ্রহণ করে, দুঃখবিদ্ধ জীবকে আশু 'বিষাক্ত বাণ নিরসনের' শিক্ষা দিলেন, কারণ তাঁর মতে দুঃখ-নিবৃত্তি বাণ-নিষ্কাশনেই সম্ভব, তত্ত্ববিচারে নয়। আচার্য শঙ্কর একই সমস্যাকে অন্তিম অব্যবহিততার দিক থেকে গ্রহণ করে দুঃখত্রস্ত জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, সকল দুঃখের মূল হচ্ছে অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর না করলে দুঃখ-নিবৃত্তি অসম্ভব। অজ্ঞান থেকেই বিষাক্ত বাণের উৎপত্তি। কাজেই তত্ত্ববিচার আবশ্যক। বুদ্ধের পদ্ধতিকে যদি অতীন্দ্রিয় প্রয়োগবাদ বলা চলে, শঙ্করের পদ্ধতিকে বলা চলে অতীন্দ্রিয় ভাববাদ।

ইতিহাসে প্রমাণ রয়েছে যে, ভারতীয় ধর্মীয় সাধনায় এদুটি পদ্ধতির মধ্যে একটি ব্যবধান থেকে গিছল। এই ব্যবধানের গহ্বরে পড়ে ভারতের সামূহিক জীবন-দর্শনে দুটি বিশিষ্ট সমস্যা উদ্ভূত হয়ে জাতির ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে—যেমন বৌদ্ধমতে সন্ন্যাসের উপর সামঞ্জস্যহীন জোর, আর শঙ্করের মতে উত্তরকালে ব্রহ্মবাদের চেয়ে মায়াবাদের উপর সামঞ্জস্যহীন জোর।

তাঁর পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী মানবজীবনকে সর্বায়তনে পর্যবেক্ষণ করার প্রভূত সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সুযোগ দেবার জন্যেই বুঝিবা তাঁর সেকেলে তপঃপ্রস্তুতিতে ঠাকুরের সব সময়ে 'বাগড়া' দেওয়া। মানবজীবনের সমস্যাগুলির দূরপ্রসারী বিজড়িত বিস্তারগুলি তিনি পথ চলতে চলতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছিলেন। আর মানুষের আশু-অন্তিম সকল প্রয়োজনগুলিও তাঁর সম্যক্ সপ্রেম অধ্যয়নের বিষয় ছিল। আর তাঁর চিত্তভূমিতে সদা জাগ্রত রয়েছিল তাঁর শ্রীগুরুর দ্যুতিস্ফূর্ত

শিক্ষাগুলি: যেমন—'ভগবানলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য', 'খালি পেটে ধর্ম হয় না,' 'মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়, আর জ্যান্ত মানুষে হয় না?' আর 'শিব-জ্ঞানে জীবসেবা'।

স্বামীজী কালী-ব্রহ্ম-মর্মও নিজ অনুভূতিতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি মায়াবাদের প্রচারক না হয়ে হয়েছিলেন ব্রহ্মবাদের প্রচারক ও মহামায়ার উপাসক। তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অপরোক্ষানুভূতিতে জেনেছিলেন মানুষের আত্মায় সকল শক্তি নিহিত রয়েছে দেহাত্ম-বোধে বন্দী মানুষ ভুক্তি খুঁজে অবস্তুতে হয়েছে বন্দী। তাই তার এত ভয়, অভাব, তৃষ্ণা, স্বার্থপরতা ও হিংসা।

চলমান ভারতাত্মা বিবেকানন্দের চিত্তে পূর্বসূরীদের শিক্ষা-চিন্তা-ধারার আভ্যন্তরীণ স্রোত এসে সম্মিলিত হল এক সদ্যোমুক্ত বেগ-শালী ধারার সঙ্গে। স্বামীজীর নিরপেক্ষ ধারণক্ষমতার আধারে সসম্মানে গৃহীত হল বুদ্ধ-দেবের অবিলম্বিত বর্তমানতা ও শঙ্করের অন্তিম অব্যবহিততা।

কারণ তিনি স্পষ্টই দেখেছিলেন মানুষের দুই-ই চাই: অন্ন ও দর্শন, করুণা ও জ্ঞান।

মানুষের দেহে বিদ্ধ বিষাক্ত বাণ টেনে বার করার যেমন আশু প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্থায়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে করে সে নূতন বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ না হবার কৌশল জানতে পায়।

তাই স্বামীজীর অতীন্দ্রিয় বাস্তববাদে পাশা-পাশি সমস্থান পেল ধর্ম ও বিজ্ঞান, দর্শন ও কর্ম, ত্যাগ ও সেবা, মোক্ষ ও জগৎহিত। তাঁর ধর্ম-দর্শনে জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণীত হল, বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতিকে আয়ত্ত করে মুক্ত হওয়া। তিনি দেখলেন যে, অতীন্দ্রিয় ধর্মের ব্যবহারিক সার্থকতা জীবনসমস্যা-সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণে, আর জীবন-সমস্যাগুলি সার্থক হয় অতীন্দ্রিয় ধর্মের দুয়ারে পারমার্থিক সওয়াল-জবাব করে।

তিনি আরও দেখলেন যে, আধুনিক জগতের জীবন-সমস্যাগুলির সম্যক্ সমাধান সম্ভব তীব্র কার্যসাধ্যতার আর সুগভীর আধ্যাত্মিকতার সংযোগে। সেইজন্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশেষ সাধনলব্ধ সম্পদের বিনিময়ের বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ সমকালে একই মানুষকে হতে হবে আধ্যাত্মিক-বৈজ্ঞানিক। মুক্তির অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতিই শুধু নয়, সর্বস্বার্থমুক্তি আর সর্বভূতহিতে রতিও।

তিন

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ দেখছিলেন তাঁর সমসাময়িক সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমস্যাজীর্ণ অবস্থা অথচ ঘরে রয়েছে জগতের উচ্চতম ভাবসমৃদ্ধ ধর্ম-দর্শন। কোথাও যেন দুই-এর অন্তরের যোগ নেই। তাই একদিকে সমাজ যেমন হয়েছিল পাংশুল, অন্যদিকে উচ্চাদর্শ হয়েছিল নিষ্প্রাণ। তাই স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস হল—যে সমাজে সবচেয়ে উচ্চাদর্শ কর্মে পরিণত করা যায়, সে সমাজই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আর উচ্চ আদর্শ সমাজে কার্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে প্রতি ব্যক্তিতে তার অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে উদ্বুদ্ধ করা ও অন্যকে এদিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। একেই স্বামীজী নির্ণয় করলেন ত্যাগ ও সেবার নূতন সংজ্ঞারূপে। ত্যাগের অর্থ সংসার থেকে পলায়ন নয়, এই জীবনে পরমপুরুষার্থলাভের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করা। সেবার অর্থ আত্মম্ভরি পরোপকার নয়, নিঃস্বার্থ মানুষ-পূজা—অন্যকে তার পরমপুরুষার্থলাভের সুযোগ করে ও উপাদান জুগিয়ে দেওয়া।

ত্যাগ না হলে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করতে পারে না। অন্য কথা

কি, গৃহস্থাশ্রমেও ত্যাগ-ভিত্তিক জীবন না হলে মানুষ মানুষই হতে পারে না। আর ত্যাগ যখন উষর সমাজে নেমে আসে, ছড়িয়ে পড়ে কল্যাণধারায়, তখনই সমাজের হয় উর্ধ্বায়ন।

স্বামীজী দেখলেন পরমুখাপেক্ষীর কোন কালে ত্রাণ যে নেই শুধু তাই নয়, পরমুখাপেক্ষিতার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আত্মোন্নতির সকল শক্তি মানুষেই নিহিত। একটি জাতির ভাগ্য মূলতঃ নির্ভর করে তার নিজস্ব সন্তানের উপর। তাই স্বামীজীর জীবন-ব্রতে জনগণ পেলেন কেন্দ্রস্থান। তিনি স্পষ্টতঃই দেখলেন একটি জাতির পরিত্রাণ ব্যষ্টি-ভিত্তিক ও সমষ্টি-আধারিত। আর ব্যষ্টির মুক্তি তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশে-প্রকাশে। তাই ব্যষ্টির জন্য করণীয় ব্রতের সার কথা :

"তোমার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাব বিকশিত কর, আর সব কিছুই উহার চারিদিকে সুসমঞ্জস ভাবে মিলিত হইবে।"[৪৩]

তবে বুঝতে হবে এই 'তুমি' শুধু ব্যষ্টি-'তুমি' নয়, সমষ্টি-'তুমিও' বটে।

ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে ব্যষ্টি-সাপেক্ষ-নিরপেক্ষ সমষ্টির যে একটি ঈশরূপ প্রকটিত হয়েছে, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সভ্যতায় ও কৃষ্টিতে জ্ঞানতঃ গ্রহণ ও বিন্যস্ত করার একটি সর্বার্থ-সাধক প্রয়োজন স্বামীজী বিশেষভাবে অনুভব করলেন। বলা যেতে পারে ঠাকুরের শিক্ষাই তাঁতে এই মনন-ধারা প্রবর্তিত করেছিল। একদিকে ঠাকুর যেমন শিক্ষা দিয়েছেন ব্যষ্টির দেবত্ব—'ভক্তির জোর থাকলে মানুষেই ঈশ্বর-দর্শন হয়।'[৪৪] অন্যদিকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সমষ্টির ঈশত্ব—'অনেক লোক এক সঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।'[৪৫]

আলমোড়ার অনতিদূরে কাঁকড়িঘাটে একটি বিরাট অশ্বত্থমূলে পরিব্রাজক স্বামীজীর যে একটি নিগূঢ় তত্ত্বানুভূতি হয়েছিল সে সম্বন্ধে সহযাত্রী প্রিয় গুরুভ্রাতাকে বলেছিলেন : 'ছাখ গঙ্গাধর, এই বৃক্ষতলে একটা মহা শুভ মুহূর্ত কেটে গেল; আজ একটি বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত'।[৪৬] তাঁর এই অনুভূতির দ্যোতনা মানুষের ভাবী ইতিহাসে চিন্তা ও কর্মের কি বিপ্লব আনবে তা আজও আমাদের ভাবনাতীত। এই জন্যই হয়ত স্বামীজী তাঁর এই অনুভূতির সময়কে বলেছিলেন 'এক মহা শুভ মুহূর্ত'।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি—'কাকো নিন্দি, কাকো বন্দী, দোনো পাল্লা ভারী।' সেই হেতু ব্যষ্টি-সমষ্টি পারস্পরিক পূজন-ধারণ-ভাবনার ভারসাম্যেই রয়েছে স্থায়ী পরমশ্রেয়ের ও সমাজ-কল্যাণের সম্ভাবনা। সমষ্টির জন্য স্বতঃপ্রণোদিত আত্মোৎসর্গের চেয়ে উচ্চতর আদর্শ ব্যষ্টির হতে পারে না। কিন্তু সেই জন্যে গোষ্ঠি-স্বার্থের জন্যে ব্যষ্টি-বলি দেবার অধিকার সমষ্টির নেই, যেমন নেই আত্মোন্নতির জন্যে সমষ্টি-স্বার্থ অস্বীকার করার অধিকার ব্যষ্টির।

৪৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (১৩৬৯), ৫।৪৬৫
৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ (১৩৭৪), পৃঃ ১৯২
৪৫ ঐ ৪র্থ ভাগ, (১৩৭৩), পৃঃ ১৫
৪৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১৩৭৩), ১।২৮৩

স্বামীজী গভীরভাবে অনুভব করলেন যে, ভারতে একটি ব্যষ্টি-সমষ্টির সামগ্রিক-সপ্রেম-পারস্পরিকতা-ভিত্তিক সমাজ-দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে এমন কি ভাবী কালের সকল সমাজ-দর্শন প্রভাবিত হতে পারবে মানবসভ্যতার আন্তর প্রয়োজনের তাগিদে।

কন্যাকুমারী থেকে উত্তরস্যাং দিশি চলমান শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক ভারতাত্মা স্বামীজীর অন্তরে উল্লিখিত ভাব-কোরকগুলি যে স্ফুটনোন্মুখ হয়ে উঠেছিল এ কথা ভাববার প্রমাণ-ভিত্তি রয়েছে বিবেকানন্দ-সাহিত্যে।

এই ভাব-কোরকগুলি আকাশকুসুমের কুঁড়ি নয়, শ্রীগুরুর কৃপায় ও নিজ সাধনায় লব্ধ সবল স্বস্থ অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলির ব্যবহারিক অবতরণ জগতের কল্যাণার্থে। যখন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, মানুষের সকল দুঃখের মূলে রয়েছে ভয় ও বলহীনতা, স্বতই তাঁর ব্রতৈকাগ্র মন খুঁজে বেড়াতে লাগল সকল বল ও অভয়ের উৎসকে। কারণ এতেই রয়েছে স্থায়ী দুঃখ-নিরসনের নিয়ামক।

নির্বলের ধর্ম হয় না ; শক্তিহীনের দুঃখের শেষ নেই ; ভয়কাতুরের জীবন মৃত্যুসদৃশ। শক্তি ও অভয়ের শঙ্খ-নিনাদ ছাড়া তমসাচ্ছন্ন অর্ধ-মৃতদের পুনর্জাগরিত ও উজ্জীবিত করার অন্য উপায় নেই। মানুষ একে অন্যের জন্য দুঃখ জয় করে দিতে পারে না। পারে সে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে, যাতে মানুষ নিজের অজ্ঞান অতিক্রম করে দুঃখ জয়ে সমর্থ হয়।

শক্তিরূপিণী মহামায়ার হাতের যন্ত্র স্বামীজী ; আত্মার অমরত্বকে অনুভূতিতে জেনেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ফকির-হয়ে-দেওয়া সকল শক্তি তাতেই অনুস্যূত। ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ-সত্য শ্রীগুরুর তন্ত্র-বেদান্ত-তত্ত্ব সমন্বয়েই যে শুধু বৌদ্ধিক ভাবে পেয়েছিলেন তা নয়, নিজ অনুভূতিতেও পেয়েছিলেন। একটি নিগূঢ় রহস্য এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে তন্ত্রসাধনায় বিশেষ কোন উৎসাহ দেন নি। তবু কালীর সঙ্গে আড়ি করেই যেন তাঁকে সাক্ষাৎ অনুভূতিতে পেলেন। কৌতুকময়ী কালী নরেনের মনটিকে তাঁর নিজের চেয়ে গভীরতর ভাবেই জানতেন। তাই আপাত বিনা সাধনে নরেন তাঁকে পেয়ে ধন্য হলেন। তিনি কালীকে হৃদয়ে রেখে ব্রহ্মবাদের মাধ্যমে করলেন শক্তির নবারাধনা। মনে হয় শ্রীগুরুর নির্দেশেই স্বামীজী তাঁর (অদ্বৈত) বেদান্তের [illegible]কেই মানুষে শক্তি ও অভীঃ জাগ্রত করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

ব্রত উদযাপনের সকল উপাদান যখন ব[illegible] সাধনায় সংগৃহীত হয়েছে, শিক্ষা দেবার মূল সূত্রগুলি যখন চিত্তায়ত্ত তখন স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে ঘটল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

[ক্রমশঃ]

কালী-উপাসনা ধর্মের কোন অপরিহার্য সোপান নয়। ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বই উপনিষদ থেকে পাওয়া যায়। কালী-উপাসনা আমার বিশেষ খেয়াল ; আমাকে এর প্রচার করতে তুমি কোনদিন শোননি, বা ভারতেও তা প্রচার করেছি বলে পড়োনি। সকল মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, আমি তাই প্রচার করি। যদি কোন অদ্ভুত প্রণালী থাকে, যা শুধু আমার পক্ষেই খাটে, তা আমি গোপন রেখে দিই এবং সেখানেই তার ইতি। কালী-উপাসনা কি বস্তু, সে তোমার কাছে কোনমতেই ব্যাখ্যা করব না, কারণ কখন কারও কাছে তা করিনি। —স্বামী বিবেকানন্দ

যখনি আঘাত আসে

শ্রীশান্তশীল দাশ

যখনি আঘাত আসে, সে-আঘাতও তোমারি যে দান—
এ কথা ভাবিতে চাই, কিছুতেই মন যে মানে না।
তুমি কি নিষ্ঠুর এতো, ভালবাস দুঃখদাহ দিতে!
তবে তুমি প্রেমময় কী করে যে হলে, তাই ভাবি।

প্রেম কি আঘাত হানে? ঝরায় কি নয়নের জল?
বুঝি না, আঘাত পেয়ে কেঁদে মরি দুঃসহ ব্যথায়।
সে-ব্যথা তোমার প্রাণে লাগে না? পাষাণ বুঝি তুমি?
কে জানে তোমার লীলা, তুমি জান—আমরা বুঝি না।

কেবলি আঘাত আসে দিনে রাতে; যত ভাবি মনে,
তোমার কল্যাণ স্পর্শ আছে এই আঘাতের মাঝে—
কিছুতেই এই মন সে-চিন্তায় পায় না সান্ত্বনা;
কাঁদে আর মনে মনে গড়ে তোলে নানা অভিযোগ।

যে-তুমি আঘাত হানো, তারই কাছে অভিযোগ করি—
আর কার কাছে বল যাব আমি, সবাই যে কাঁদে;
দুঃখের তিমির রাতে অজস্র চোখের ধারা নিয়ে
বলি, তুমি হে নিষ্ঠুর, থামাও তোমার এই লীলা।

কত আর কাঁদি বল, কেঁদে কেঁদে কাটে যদি বেলা,
তোমায় ডাকবো তবে কখন, হে পাষাণ দেবতা?

অশোক বনের সীতা

শ্রীশিবশম্ভু সরকার*

চারি পাশে জাগে স্বর্ণলঙ্কা
সজ্জা-শোভার দ্যুতি—
হুঙ্কারে ভোগ উছলে আভোগ
মাটিময় অনুভূতি।
কুশলা কলার নিপুণ পরশে
প্রসাধনে ঢেউ রূপের ঝলসে
ঢল উল্লাস কল উচ্ছ্বাস
ঘরে, বনে নিশি জাগে
কামনার তাল হোল উত্তাল
কবন্ধ অনুরাগে।
চিত্তের তাপে থর থর কাঁপে
খল খল ছোটে হাসি—
সুষমার সীমা স্বর্ণলঙ্কা
ফোটে সুখ রাশি রাশি॥

এরি মাঝে এক কোণে
নিভৃত সংগোপনে
ছিন্নবসনা আভরণহীনা
বিমলিন দু'নয়নে—
অস্ফুটে কয় পলকেতে ভয়
শ্বাস ফেলে ক্ষণে ক্ষণে—
'—হে আমার রাম চির অভিরাম
পাব আর এ'জীবনে?
শত শঙ্কার ব্যথা হাহাকার
দূরে যাবে দরশনে!'
—আর্তি সীতার উঠে দুর্বার
মোহ-ভূমে ফোটে গীতা
চারি পাশে ভোগ তারি মাঝে যোগ
অশোক বনের সীতা।
পূততার পারমিতা॥

---

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ), কলিকাতা।

তুমি নেই !

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

কেমন ক'রে বল্‌বো আমি
নেই হে তুমি নেই,
চিহ্ন তোমার ছড়িয়ে আছে
আকাশ-বাতাসেই !

সুদূর মেঘের ঐ কালোতে
নবারুণের এই আলোতে,
সরূপ হয়ে আসো কাছে
তুমি অরূপ সেই !
কেমন ক'রে বল্‌বো আমি
নেই হে তুমি নেই !!

তোমার প্রাণের মধুর বাণী
শুনি পাখির গানে,
তোমার পরম শান্তি, স্নেহ,
সন্ধ্যে ব'য়ে আনে।

ধ্যানের রূপে আসো তুমি
শীতল ক'রে হৃদয়ভূমি,
কবি আমার সাধক হ'য়ে
হারায় তোমাতেই !
কেমন ক'রে বল্‌বো আমি
নেই হে তুমি নেই !!

গাহি তব গুণগান

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

শুধু গাহি তব গুণগান।
যত কিছু গুণ দেখি মোর কাজে
সকলি তোমারি দান।
তাই গাহি তব গুণগান।
দোষ, ত্রুটী যত আছে মোর কাজে
সকলই তো জানি নিজ অপরাধে,
অসংযমের পরিণতি তাহা
দহন করিছে প্রাণ ;
সে তো নহে তব দান।
শুধু গুণ যত আছে করমে আমার
সকলি তোমারি দান।
তুমি মঙ্গলময়, হো'ক তব জয়,
আমার সকল কাজে,
তোমার অমন মোহন মূরতি
যেন সদা মনে রাজে,
অপরাধ যদি ক'রে থাকি আমি,
দাও সাজা দাও জীবনের স্বামী,
তাহে দুখ নাই, যাতনা জুড়াই,
নাহি করি অভিমান।
তুমি প্রেমময়, হৃদয় আমার
সদা গাহে তব গান।
যত কিছু গুণ দেখি মোর কাজে
সকলি যে তব দান।

পরাজয়

শ্রীমতী হেমবরণী মুখোপাধ্যায়

তোমার কাছে মানি
এ লগনে বিফল হ'লো
আমার গরবখানি।
জয়ের হাটে বিকাতে এসে,
নিলাম কিনে অবশেষে
ধূলায় ঝরা ব্যথা-ভরা
পরাজয়ের গ্লানি।
হয়তো ভূবন রাঙ্‌বে আবার,
জয়ের নিশান উড়বে তাহার,
হাওয়ার সাথে মিলিয়ে যাবো.
হারিয়ে আমার 'আমি'।
জীবনে মোর জয় পরাজয়
স্বপনে তা হোলোরে ক্ষয়,
চাওয়া পাওয়ার অতীত আজি,
চাহি চরণখানি।

তবুও

ব্রহ্মচারী সুষময়

তবুও তোমারে চাই গো হে নাথ, তবুও তোমারে চাই গো ;
শত অপরাধে অপরাধী জানি, তব পানে তবু ধাই গো।
কত না কামনা কত না বাসনা হৃদয়েতে নাথ রয়েছে,
তবুও এ-মন ফিরে ফিরে শুধু তোমারে চাহিয়া ফিরেছে।
ভুল ক'রে আমি কত কিছু চাই, তোমা হেন ধনে চাই নি,
শূন্য প্রাণেতে তাই তো ফিরেছি, তব দরশন পাই নি।
যা চেয়েছি নাথ, সে সব মিথ্যা, তুমি তো সকলি জানো ;
(সেই) মিথ্যা ঘুচায়ে আমারে দয়াল, চরণে তোমার টানো।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

শ্রীশ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তিসর্বস্বভূতা গোপিকাগণ যখন যমুনাকূলে ভগবানের সহিত মিলিত হয়ে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন তাঁদের মনে নিজেদের সৌভাগ্যজনিত গর্ব উদিত হয়েছে—এটা জানতে পেরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই গর্ব দূর করবার জন্য হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন। ভগবানের অন্তর্ধানে বিরহবেদনায় ব্যথিত হয়ে প্রথমে গোপীরা মূর্ছাবস্থাপ্রাপ্ত হলেন। পরে শোকের তীব্রতা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হলে অর্ধবাহ্যদশায় তাঁরা ভগবানের লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন। তারপর বাহ্যদশা-প্রাপ্ত হলে সেই রাত্রিকালে বনমধ্যে ভগবানের বহু অন্বেষণ করতে লাগলেন। যখন ঘন অন্ধকারে গহন অরণ্যমধ্যে আর কোনরূপে প্রবেশ করা সম্ভব নয় দেখলেন, তখন পুনরায় যমুনাপুলিনে ফিরে এসে সমবেত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকামনায় তাঁর গুণগান কীর্তন করতে লাগলেন। সেই গুণগানকীর্তন-সূচক বাক্যাবলীকে গোপীগীতা বলা হয়। সেটি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ে আছে। সেই একত্রিংশ অধ্যায়ের নবম শ্লোক হচ্ছে :

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের এই একত্রিংশ অধ্যায়ে ১৯টি শ্লোক আছে। তার মধ্যে ১ম থেকে ১৮শ শ্লোক পর্যন্ত শ্লোকগুলি ইন্দিরাছন্দে রচিত। ইন্দিরাছন্দের লক্ষণ হচ্ছে—"নররলৈর্গুরাবিন্দিরা মতা" (ছন্দোমঞ্জরী)। শেষের শ্লোকটি বসন্ততিলকছন্দে রচিত। অতএব "তব কথামৃতং" ইত্যাদি শ্লোকের ছন্দ ইন্দিরা। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের" প্রারম্ভে এই শ্লোকটি মাষ্টার মহাশয় উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে দুটি পঙ্‌ক্তিতে লেখা থাকলেও এর চরণ দুই নয়—চার অর্থাৎ এই শ্লোকটি সম্পূর্ণই কথামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে। "তব কথামৃতং তপ্তজীবনং" এইটি শ্লোকের প্রথম চরণ বা পাদ। দ্বিতীয় হচ্ছে—"কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্"। তৃতীয় হচ্ছে—"শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং" আর চতুর্থ হচ্ছে—"ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ"। "যে" পাঠ মূল ভাগবতের কোন কোন বইতে আছে। আবার কোন কোন বইতে "তে" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। যাই হোক, প্রথমে "যে" পাঠের অন্বয় ও অর্থ দেওয়া যাচ্ছে।

অন্বয় : যে জনাঃ তপ্তজীবনং কবিভিঃ ঈড়িতং কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমৎ তব কথামৃতং ভুবি আততং গৃণন্তি [তে] ভূরিদাঃ। এই অন্বয়ে একটি "তে" পদ অধ্যাহার করতে হবে।

আর এক প্রকার অন্বয় : যে তপ্তজীবনং কবিভিঃ ঈড়িতং কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমৎ তব কথামৃতং ভুবি আততং গৃণন্তি [তে] জনাঃ ভূরিদাঃ।

প্রথম অন্বয়ে "যে জনাঃ" উদ্দেশ্যাংশে কর্তৃকারক। "গৃণন্তি"-টি ক্রিয়াপদ। আর "কথামৃতম্"-টি কর্মকারক। "তব" পদটি যুষ্মদ্‌শব্দের উত্তর ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত। সম্বন্ধে ষষ্ঠী। "তপ্তজীবনং" "কবিভিঃ ঈড়িতং" "কল্মষাপহং" "শ্রবণমঙ্গলং" "শ্রীমৎ" এই পাঁচটি পদ

"কথামৃতম্"-এর বিশেষণ। "আততং" পদটি "গৃণন্তি" ক্রিয়ার বিশেষণ। পরে অধ্যাহৃত "তে" পদটি বিধেয়াংশে কর্তৃকারক। "ভূরিদাঃ" পদটি বিধেয় এই বিধেয়াংশে "ভবন্তি" এইরূপ একটি পদ অধ্যাহার করা যেতে পারে। অথবা "ভূরিদাঃ" পদ থেকেই তার অন্তর্ভূতরূপে ক্রিয়া বুঝিয়ে যায় ব'লে "ভবন্তি" পদের অধ্যাহার না করলেও চলে। "ভূরিদাঃ" মানে প্রচুর দানকারী।

দ্বিতীয় অন্বয়ে—"যে" পদটি উদ্দেশ্যাংশে কর্তৃকারক। উদ্দেশ্যাংশে ক্রিয়াপদ কর্মকারক ও ক্রিয়াবিশেষণ প্রথম অন্বয়ের মত। বিধেয়াংশে কর্তৃকারক হচ্ছে "তে জনাঃ"। অবশ্য "তে" পদটি অধ্যাহৃত ক'রে তার সঙ্গে "জনাঃ" পদটি জুড়ে নিতে হবে। মোট কথা "জনাঃ" পদটি কর্তৃকারক। অধ্যাহৃত "তে" পদটি তার বিশেষণ। বাকী সব প্রথম অন্বয়ের মত।

সমস্ত বাক্যেই একটি উদ্দেশ্য অংশ থাকে আর একটি বিধেয় অংশ থাকে। যেমন "রামঃ অযোধ্যায়াঃ রাজা আসীৎ" এই বাক্যে "রাম" উদ্দেশ্য আর "অযোধ্যার রাজা ছিলেন" এইটি বিধেয়।

সেই রকম—"যে জনাঃ তপ্তজীবনং কবিভিঃ ঈড়িতং কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমৎ তব কথামৃতং ভুবি আততং গৃণন্তি [তে] ভূরিদাঃ।" এই বাক্যে "যে জনাঃ...গৃণন্তি" পর্যন্ত অংশটি উদ্দেশ্য আর "[তে] ভূরিদা" অংশটি বিধেয়। অতএব উদ্দেশ্যাংশে কর্তা "জনাঃ" বা "যে জনাঃ" আর বিধেয়াংশে কর্তা "তে"। অবশ্য সমস্ত বাক্যের উদ্দেশ্যাংশে এবং বিধেয়াংশে যে কর্তা বা ক্রিয়া থাকে—এইরকম নিয়ম নেই। স্থানাভাবে এসব বিচার বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করে উদ্দেশ্য, বিধেয় অংশ দেখানো হলো

এখন "যে" পাঠ নিয়ে যেরূপ অন্বয় করা হয়েছে সেই অনুসারে সমগ্র বাক্যটির বা সমগ্র শ্লোকটির বাংলা অর্থ দেওয়া হচ্ছে, পরে প্রত্যেক পদের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ও অর্থ দেওয়া হবে।

প্রথম অন্বয়ানুসারে অর্থ: যে সকল ব্যক্তি, সংসারসন্তপ্ত জনের প্রাণপ্রদ বা শীতল বারিস্বরূপ, জ্ঞানিগণকর্তৃক স্তুত (প্রশংসিত), পাপবিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলজনক, অতিশান্ত (চিত্তের শান্তিদায়ক), তোমার অমৃতস্বরূপ কথা, পৃথিবীতে ব্যাপ্তভাবে (ব্যাপকভাবে) বলেন (বা প্রচার করেন), তাঁরা বহুলোকের জীবন দান করেন।

দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে অর্থ: যাঁরা সংসারসন্তপ্ত জনের প্রাণপ্রদ বা শীতল বারিস্বরূপ, জ্ঞানিগণস্তুত, পাপনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলকারক, অতিশান্ত, তোমার অমৃতরূপী কথা, পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে বলেন বা প্রচার করেন, সেই সকল ব্যক্তি বহুদানকারী (পূর্বজন্মে তাঁরা বহুদান করেছিলেন)।

"তে" পাঠ অনুসারে অন্বয় ও অর্থ পূর্বোক্ত "যে" পাঠেরই মত। কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, "যে" পাঠে—"তে" পদ অধ্যাহার করতে হয়; আর "তে" পাঠে—প্রথমে "যে" পদ অধ্যাহার করতে হয়। যৎ-পদের সঙ্গে তৎ-পদের নিত্য সম্বন্ধ। এই জন্য "তে" পাঠ অনুসারে আর পৃথক্ অন্বয় বা অর্থ দেওয়া হলো না।

এখন পদগুলির বিশ্লেষণ করা হচ্ছে: "তব" পদটির অর্থ সকলেই জানেন। তবে এখানে যুষ্মদ্ শব্দের সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি করা হয়েছে। কর্তায় বা কর্মে ষষ্ঠী নয়। সম্বন্ধে ষষ্ঠী (যাকে পাণিনিতে শেষে ষষ্ঠী বলা হয়।) করাতে 'তোমার' সম্বন্ধে অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্বন্ধে সব কিছু বোঝায়। ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে, যেরূপ লীলা করেন, যেমন চলাফেরা করেন, যেমন কর্ম

করেন, যেমন কথাবার্তা বলেন—ইত্যাদি সমস্ত গুণ, কর্ম, লীলা, অবশ্য যা মানুষ ধারণা করতে পারে— ধারণার অতীত বিষয় আর মানুষ কি ক'রে চিন্তা করবে বা বলবে—সে সমস্তকে বোঝায়। সুতরাং "তব" পদের অর্থ হলো, ঈশ্বর সম্বন্ধে— ঈশ্বরের গুণ, মাহাত্ম্য, যশঃ, নাম, রূপ, লীলা ইত্যাদি।

"কথামৃতম্"—কথ্ (চুরাদিগণীয়) ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করে, তার স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় করলে "কথা" শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। কথা শব্দের অর্থ—আলাপ, বচন, ভাষণ ইত্যাদি।

অমৃত শব্দের অর্থঃ "ন মৃতং মৃত্যুর্যস্মাৎ" অর্থাৎ যার থেকে মৃত্যু হয় না তা অমৃত। এখানে 'মৃত' শব্দটির অর্থ মৃত্যু। মৃ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয়। দেবতারা অমৃতপান করেছিলেন—এইজন্য তাঁরা অমর। তাঁদের অমরত্ব অবশ্য আপেক্ষিক। মনুষ্যলোকের তুলনায় তাঁরা অমর অর্থাৎ দীর্ঘকাল বাঁচেন।

"কথা অমৃতমিব" এইরূপ উপমিত কর্মধারয় সমাস করে এখানে "কথামৃতম্" পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে বুঝতে হবে। "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে" (পাঃ সূঃ ২।১।৫৬। ব্যাঘ্রাদি আকৃতিগণ। স্থানাভাবে বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। রূপক কর্মধারয় নয় অর্থাৎ "কথা এব অমৃতম্" এইরূপ "ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ" (পাঃ সূঃ ২।১।৭২) সূত্রানুসারে রূপক কর্মধারয় নয়। যেখানে উপমানটি প্রধানভাবে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয় সেখানে রূপক কর্মধারয় হয়। যেমন "মুখচন্দ্রঃ প্রকাশতে"— মুখের প্রকাশ ক্রিয়ায় অন্বয়বাধিত চন্দ্রই প্রকাশ ক্রিয়াতে অন্বিত। অতএব এখানে "মুখমেব চন্দ্রঃ" এইরূপ রূপক কর্মধারয়। কিন্তু "মুখচন্দ্রং চুম্বতি" স্থলে মুখের চুম্বন সম্ভব বলে "মুখং চন্দ্র ইব" এইভাবে উপমিত কর্মধারয়। এখানেও "কথামৃতং গৃণন্তি" অর্থাৎ কথামৃত বলেন— এই বলা ক্রিয়ার সঙ্গে কথারই অন্বয় সম্ভব, অমৃতকে বলা যায় না। উপমিত কর্মধারয়। যেটুকু না বললে নয় তাই বললাম। বেশী বলা সম্ভব নয়, পূর্বোক্ত কারণে। তাছাড়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতিও ঘটতে পারে।

ভগবানের কথা অমৃতসদৃশ কি করে হলো? হলো এইভাবে যে, অমৃতপান করলে যেমন মৃত্যু জয় হয়, সেইভাবে ভগবানের কথা অর্থাৎ তাঁর নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি কীর্তন করলে ভগবানে ভক্তি হওয়ায় সেই ভক্তির দ্বারা সংসারে বিষয়তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ, কর্ম, এবং মূলতঃ এসকলের কারণ অবিদ্যার দ্বারা যে জীবের অশেষ দুঃখভোগরূপ মৃত্যু, সেই মৃত্যু নিবারিত হয়। এই হিসেবে ভগবানের কথা অমৃতের মতো।

এখন "কথামৃতে"র বিশেষণগুলির মধ্যে "তপ্তজীবনম্" পদটির বিশ্লেষণ ও অর্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 'তপ্ সন্তাপে'—সন্তপ্ত করা অর্থে ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী তপ্ ধাতুর উত্তর এখানে কর্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় করা হয়েছে। তপ্ত=সন্তপ্ত-তাপযুক্ত। "তপ্তস্য জীবনম্" ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করে "তপ্তজীবনম্" পদ সিদ্ধ হয়েছে। সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তপ্ত ব্যক্তি যার দ্বারা বাঁচে। জীব্ ধাতুর প্রাণধারণ অর্থে ভ্বাদি পরস্মৈপদী। 'জীব্ প্রাণধারণে' অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করা হচ্ছে জীব্ ধাতুর অর্থ। তার করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে 'জীবন'-শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ যার দ্বারা প্রাণধারণ করা যায়। মোটকথা "তপ্তজীবনম্"-শব্দের অর্থ হলো যার দ্বারা সন্তপ্ত ব্যক্তি বাঁচে, তা। 'জীবন'-শব্দের আর এক আভিধানিক অর্থ 'জল'। প্রখর রৌদ্রতাপে কোন লোক সন্তপ্ত হয়ে মুমূর্ষুপ্রায় হয়েছে, তাকে জল দিয়ে সঞ্জীবিত করা হয়। অবশ্য একেবারে মরে

গেলে তাকে আর জল দিয়ে বাঁচান যায় না। 'তপ্ত'-শব্দের আর এক অর্থ 'দগ্ধ'ও হয়। চুরাদিগণীয় তপ্ ধাতু দাহ অর্থে ব্যাকরণে পঠিত। অতএব 'তপ্ত' বলতে 'দগ্ধ' অর্থও হতে পারে। কোন মানুষ আগুনে দগ্ধ হয়েছে অথচ মরেনি, তাকে যা দিয়ে (জল বা কোন প্রকার ওষুধ ইত্যাদি) বাঁচান বা সঞ্জীবিত করা যায়, তাকেও "তপ্তজীবনম্" বলা যেতে পারে। এখানে "কথামৃতে"র বিশেষণ "তপ্তজীবনম্"। সুতরাং এখানে অর্থ হবে—সংসারে যে মানুষ অবিদ্যা, কামনা, কর্ম, বিষয়তৃষ্ণা, জন্ম, জরা, রোগ, শোক ইত্যাদির দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে দেয় কথামৃত ; অর্থাৎ ভগবানের কথা বা নাম গুণ ইত্যাদি কীর্তন করলে ভগবানে ভক্তি হয়, ভক্তি হলে তা থেকে জ্ঞান হয়। কারণ ভগবান বলেছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (গীতা, ১৮।৫৫)। জ্ঞান হলে অবিদ্যা, কামনাদি নিবৃত্ত হয়ে যায়, তখন মানুষ মুক্ত হয়ে যায় ; মুক্ত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ "বেঁচে যাওয়া"। অথবা রামানুজাচার্যাদির মতে ভক্তি থেকেই সাক্ষাৎ মুক্তি হয় ব'লে ভগবানের কথামৃত অর্থাৎ অমৃত-স্বরূপ কথা সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে দেয়। জল দিয়ে যেমন তপ্ত ব্যক্তিকে বাঁচান হয়, সেইরূপ ভগবৎ-কথামৃত দ্বারা সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তি বেঁচে যায়। সুতরাং "কথামৃতং তপ্তজীবনম্" এটা সিদ্ধ হলো। অতএব জীবন শব্দের জল অর্থ ধরলে কথামৃত সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তির জলস্বরূপ—এইরূপ অর্থ হয়।

"জীবতি অনেন"—অর্থাৎ যা দিয়ে জীব বা মানুষ প্রাণধারণ করে বা বাঁচে তাকে "জীবন" বলে। এই অর্থ ধরলে—অন্ন, জল, ঔষধ ইত্যাদিকে "জীবন" বলা যায়। কথামৃত সংসার-সন্তপ্ত ব্যক্তির "জীবন" অর্থাৎ বাঁচবার কারণ, এই ব্যাপক অর্থও হয়।

এখন "কথামৃতে"র দ্বিতীয় বিশেষণ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। "কবিভিঃ ঈড়িতম্" এইটি দ্বিতীয় বিশেষণ। অবশ্য এখানে "কবিভিঃ" পদটি কথামৃতের বিশেষণ নয় কিন্তু "কবিভিঃ" পদটি "ঈড়িতম্", এই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত। "কবিভিঃ" কর্তায় তৃতীয়া অর্থাৎ কবিগণ কর্তৃক। "ঈড়িতম্" পদটি অদাদিগণীয় আত্মনেপদী স্তুতি অর্থে ঈড়্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করে সিদ্ধ হয়েছে। মোটকথা—"ঈড়িতম্" মানে স্তুতি-ক্রিয়ার কর্ম অর্থাৎ স্তুত। স্তুতিক্রিয়ার কর্তা—কবি, কর্ম—কথামৃত। অতএব "ঈড়িতম্" পদটি "কথামৃতে"র বিশেষণ। 'কৃ বর্ণনে' কব্ ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় যোগে "কবি" শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কবি অর্থাৎ যাঁরা বর্ণনা করেন, যেমন—বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। এখানে "কবি" শব্দটি পণ্ডিত বা জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জ্ঞানীরাও তত্ত্ব বর্ণনা করেন। সেই জ্ঞানিগণ কর্তৃক ঈড়িত অর্থাৎ স্তুত এমন যে কথামৃত। জ্ঞানীরা বা ভক্তেরা ভগবল্লীলাগুণাদি-কীর্তনের স্তুতি করেন।

এখন "কথামৃতে"র তৃতীয় বিশেষণের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। "কল্মষাপহম্", এইটি তৃতীয় বিশেষণ। কর্ম অর্থাৎ শুভকর্ম, স্যতি অর্থাৎ বিনাশয়তি এইরূপ অর্থে কর্ম উপপদপূর্বক সো ধাতুর (সা) উত্তর 'ক' প্রত্যয় করলে "কর্ম" শব্দের র স্থানে ল হয় নিপাতনবশত, আর সো ধাতুর ষত্ব হয়, সো ধাতুর ওকার স্থানে আকার হয়ে ক-প্রত্যয়ের অ পরে থাকায় আকার লোপ হলে "কল্মষ"-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যা শুভকর্মকে অর্থাৎ পুণ্যকে নাশ করে তা হলো কল্মষ অর্থাৎ পাপকর্ম, কাম ক্রোধাদি। পাপকর্ম পুণ্যকর্মকে নাশ করে, এটা কারো কারো মত। এটা সর্বসম্মত না হলেও পাপকর্ম যে পুণ্যকে অভিভূত

করে—এটা সকলেই স্বীকার করেন। মোটের উপর "কল্মষ"-শব্দের অর্থ হলো অশুভ কামনা, পাপ ইত্যাদি। কল্মষম্ অপহন্তি এইরূপ অর্থে কল্মষ উপপদপূর্বক অপ + হন্ ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয় ক'রে (অপহ) "কল্মষাপহ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তাহলে "কল্মষাপহ" শব্দের অর্থ হলো যা পাপকে বিনষ্ট করে। ভগবানের কথামৃত পাপকে বিনষ্ট করে। "ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ" অর্থাৎ ভগবানের ভক্তদের কখনও অশুভ থাকে না। ভগবদ্‌ভক্তির দ্বারা সকল অশুভ অর্থাৎ পাপ, কামনা, বাসনা, দুঃখ প্রভৃতি সব অশুভ নিবৃত্ত হয়। কেবল পাপ নিবৃত্ত হয়, এমন নয়; পরন্তু সব অশুভ ভগবদ্ভক্তি থেকে নিবৃত্ত হয়। ভগবানের কথামৃত আলোচনা করলে অর্থাৎ ভগবন্নাম-গুণাদি কীর্তন করলে ভগবানে ভক্তি হয়। তা থেকে সব অশুভ চলে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১৭) আছে—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥"

অর্থাৎ যাঁর শ্রবণ ও কীর্তন পুণ্যপ্রদ, যিনি সাধুগণের সুহৃৎ, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎকথা-শ্রবণ-কারিগণের হৃদয়ে ধ্যাত হয়ে তাঁদের সকল অমঙ্গল দূর করে দেন। সুতরাং ভগবৎ-কথামৃত যে পাপাদিনাশক তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এখন চতুর্থ বিশেষণ—"শ্রবণমঙ্গলম্"। শ্রবণেন মঙ্গলম্ শ্রবণমঙ্গলম্। অর্থাৎ শ্রবণ-মাত্রেই, কথামৃত শ্রোতার মঙ্গল প্রদান করে। "কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্" (পাঃ সূঃ ২।১।৩২) সূত্রে সমাস অথবা (পাঃ সূঃ ২।১।৪ সহসুপা) সূত্রে সমাস। শ্রু ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়যোগে "শ্রবণ" শব্দটি নিষ্পন্ন। শ্রবণেন অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা, শ্রোনার দ্বারা। "মঙ্গলম্" শব্দটি মগি ধাতুর (মনৃগ ধাতু) উত্তর "মঙ্গেরলচ্" [উঃ সূঃ ৭৪৮] সূত্রানুসারে অলচ্-প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়। মঙ্গলের অর্থ শিব, ভদ্র বা কল্যাণকর। অথবা "মঙ্গল" শব্দের উত্তর "মঙ্গলং করোতি" অর্থে 'নামণিচ্' করে তার উত্তর পচাদ্যচ্-প্রত্যয় করে "মঙ্গল" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, বলা যায়। অর্থ হলো মঙ্গলকর। ভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণ করলেই জীবের মঙ্গল হয়, জীব ক্রমে ক্রমে সংসার থেকে উদ্ধার পায়। হরিদাস ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করতেন, যাতে অন্যান্য সাধারণ মানুষ এমন কি জীবজন্তুও উদ্ধার পায় এই অভিপ্রায়ে।

এখন "কথামৃতে"র পঞ্চম বিশেষণ "শ্রীমৎ"-পদের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কথামৃত কিরূপ? না – শ্রীমৎ। 'শ্রিঞ্ সেবায়াং' শ্রি ধাতুর উত্তর "কিব্‌বচি" ইত্যাদি বার্তিক সূত্রানুসারে ক্বিপ্-প্রত্যয় ও ধাতুর দীর্ঘ করে 'শ্রী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। শ্রী শব্দের অনেক অর্থ। যথা—লক্ষ্মী, সম্পত্তি, শোভা, ইচ্ছা, মাহাত্ম্য অর্থাৎ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য, বীর্য অর্থাৎ প্রভাব, যত্ন, প্রযত্ন অর্থাৎ নির্বন্ধাতিশয়। এইসব অর্থের মধ্যে এখানে জ্ঞান ও বৈরাগ্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ স্বামিপাদ (শ্রীধর স্বামী) "শ্রীমৎ"-এর অর্থ করেছেন "সুশান্তম্"। জ্ঞান এবং বৈরাগ্য হলে চিত্তের শান্তি অর্থাৎ সংসারোপরতি হয়ে থাকে। সুতরাং জ্ঞান ও বৈরাগ্য শ্রী শব্দের বাচ্যার্থ। লক্ষণা দ্বারা শান্তি অর্থ পাওয়া যায়। সেই শ্রী অর্থাৎ শান্তি অতিশয়ভাবে আছে যার অর্থাৎ যা হতে হয় এইরূপ অতিশায়ন অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করে 'শ্রীমৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় —তার অর্থ হলো, যা হতে অতিশয় শান্তি হয়। তাই স্বামিপাদ বললেন, "সুশান্তম্"। অতএব কথামৃত হচ্ছে অতিশয় শান্তিদায়ক। ভগবৎ-

কথামৃত অর্থাৎ ভগবন্নামগুণলীলা শ্রবণ করলে, কীর্তন করলে ভগবানে ভক্তি হয়, ভক্তি হলে জ্ঞান হয়, মতান্তরে ভক্তি থেকেই সংসারশান্তি হয়। শ্রবণকীর্তনাদি নবধা ভক্তির অন্তর্গত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৭।৫।২৩) আছে—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
সুতরাং "কথামৃত" "শ্রীমৎ"।

কথামৃতের পাঁচটি বিশেষণ বিশ্লেষিত হলো। এখন "আততম্" এই ক্রিয়াবিশেষণের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আঙ্ + তন্ + ক্তঃ অর্থাৎ আঙ্-উপসর্গপূর্বক ("তন্ বিস্তারে") তন্ ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করলে—"আতত"-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। "আততম্" পদের অর্থ হলো ব্যাপ্ত। ক্রিয়ার বিশেষণ বলে অর্থ হল—ব্যাপ্তরূপে। এটি "গৃণন্তি" ক্রিয়ার বিশেষণ। "গৃণন্তি" পদের অর্থ হলো বলে, উচ্চারণ করে, আলাপ করে, ভাষণ করে ইত্যাদি। গৄ ধাতুর (ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী) লট্ ঝি (অন্তি)তে "গৃণন্তি" পদ নিষ্পন্ন হয়। গৃণন্তি অর্থাৎ ব্রুবন্তি, ভাষন্তে বা আলপন্তি বা। এইরূপ অর্থ। সুতরাং কথামৃতকে যাঁরা ভুবি অর্থাৎ পৃথিবীতে (ভূ-শব্দের অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিতে ভুবি) ব্যাপ্তভাবে কীর্তন করেন, বা বলেন, বা প্রচার করেন—এইরূপ অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপ্তভাবে বলতে কি বুঝায়? ব্যাপ্ত বলতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ সোজা কথায় ব্যাপক। কিসের ব্যাপক? তার উত্তরে বলবো—দেশের ব্যাপক, কালের ব্যাপক ও পাত্রের ব্যাপক। অর্থাৎ দেশে দেশে বা নানা স্থানে, নানা কালে অর্থাৎ যথাসম্ভব অবিরত, নানা পাত্রে অর্থাৎ নানা জনে। শ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, পৃথিবীর সর্বগ্রামে সকল মানুষের কাছে নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন কর, প্রচার কর ইত্যাদি। মোট কথা যাঁরা ভগবৎ-কথামৃতকে পৃথিবীর বহুদেশে, বহুকালে, বহুজনে প্রচার করেন, প্রচার করে শোনান—এই হলো "আততং ভুবি কথামৃতং গৃণন্তি" অংশের অর্থ। এখানে "আততম্" পদটি "গৃণন্তি" ক্রিয়ার বিশেষণ, আর "কথামৃতম্" পদটি কর্মকারক। "ভুবি" পদটি অধিকারণকারক। আর "যে" পদটি কর্তৃকারক। "যে" এইরূপ পাঠ শ্লোকে থাকলে সেটা "গৃণন্তি" ক্রিয়ার কর্তৃকারক। আর "তে" পাঠ থাকলে "যে" পদকে অধ্যাহার করে সেই অধ্যাহৃত "যে" পদই "গৃণন্তি" ক্রিয়ার কর্তা হবে।

তাহলে প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লেখিত দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে "যাঁরা সংসারসন্তপ্তজনের জীবন-স্বরূপ বা জলস্বরূপ, জ্ঞানী বা ভক্ত কর্তৃক স্তুত, পাপাদি বিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, অতিশয় শান্তিপ্রদ তোমার কথামৃত (অমৃতস্বরূপ কথা) পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে বলেন অর্থাৎ কীর্তনাদি দ্বারা প্রচার করেন"—এতটা পর্যন্ত অর্থ হচ্ছে "যে তপ্তজীবনং কবিভিঃ ঈড়িতং কল্মষাপহং শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমৎ তব কথামৃতং ভুবি আততং গৃণন্তি" এই অংশের। এটি গোটাটাই বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ। যাঁরা তোমার সংসারসন্তপ্ত···ইত্যাদি বিশেষণ-বিশিষ্ট কথামৃত জগতে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন—তাঁরা কি? এই আশঙ্কার বা প্রশ্নের উত্তরে বিধেয় হলো—"তে জনা ভূরিদাঃ" অর্থাৎ সেই সকল লোক প্রচুর দান করেন বা প্রচুর দান করেছিলেন।

এখন এই বিধেয় অংশের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে—তার মধ্যে—"তে জনাঃ" অংশটির "জনাঃ" পদটি কর্তৃকারক, আর "তে" পদটি তার বিশেষণ। 'জন জননে' (হ্বাদিগণীয়) বা 'জনী প্রাদুর্ভাবে' (দিবাদিঃ) জন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করে "জন" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যারা জন্মায় অর্থাৎ লোক—এই হলো সংক্ষেপে "জন"

শব্দের অর্থ। তার বহুবচনে "জনাঃ" । অর্থ হলো সেই সকল লোক বা মানুষ ("তে জনাঃ" এই অংশের)। "তে" পদটি তো সকলেরই জানা— তৎ এই সর্বনামের পুংলিঙ্গের বহুবচন।

এখন—"ভূরিদাঃ" পদের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। ভূ-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক "ক্রিন্" প্রত্যয় করলে (ক্রিন্‌এর রি থাকে) "ভূরি" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভূরি শব্দ যখন পুংলিঙ্গ হয়,—তখন তার অর্থ— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর যখন তিন লিঙ্গ হয় তখন তার অর্থ প্রচুর। এখানে প্রচুর অর্থেই ভূরি শব্দটি নেওয়া হয়েছে।

"ভূরি বা ভূরীণি দদতি "এইরূপ অর্থে—ভূরি উপপদপূর্বক দা ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অঙ্ প্রত্যয় করে "ভূরিদ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তার বহু-বচনে হয়েছে—"ভূরিদাঃ", অর্থ হলো প্রচুর দাতা। কি দান করেন?—এই প্রশ্নে শ্রীধরস্বামী প্রথমে বলেছেন, জীবন দান করেন। অর্থাৎ যাঁরা কথামৃত প্রচার করেন বা লোককে শোনান তাঁরা প্রচুর জীবন দান করেন। সংসারের তাপে মানুষ মৃতপ্রায়। ভগবৎ-কথামৃত শুনলে মানুষ ভক্তি লাভ ক'রে জীবন পায়। সুতরাং যাঁরা কথামৃত প্রচার করেন বা শোনান তাঁরা বহুলোককে জীবন দান করেন। এই অর্থে "ভূরিদাঃ"।

শ্রীধরস্বামী দ্বিতীয় অর্থ করেছেন—যাঁরা উক্তরূপে কথামৃত প্রচার করেন বা শোনান বা কীর্তনাদি করেন তাঁরা প্রচুর দানকারী। "ভূরি দদতি" এই অর্থে অঙ্ প্রত্যয় করে কালের অর্থাৎ বর্তমানকালের বিবক্ষা না করে যেকোন কালের বিবক্ষা করেও "ভূরিদাঃ" পদের অর্থ সম্ভব হতে পারে। অতএব তাঁরা প্রচুর দান করেছিলেন এই অর্থেও "ভূরিদাঃ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যাঁরা তোমার কথামৃত কীর্তনাদি করেন তাঁরা পূর্বজন্মে প্রচুর দান করেছিলেন। এখানে দান ক্রিয়াটি ধর্মমাত্রের উপলক্ষণ। দান করলে ধর্ম হয়। সুতরাং পূর্বজন্মে দান করেছিলেন—এর অর্থ হলো পূর্বজন্মে তাঁরা পুণ্য অর্জন করেছিলেন। ধার্মিক না হলে ভগবানের কথা কীর্তনাদি করতে প্রবৃত্তি হয় না। যারা পাপী তারা পাপবাসনাবশত ভগবানের নামগুণ-আদি কীর্তনে পরাঙ্মুখ হয়, তারা বিষয়েই রত থাকে। শ্রুতিতে আছে—"ধর্মেণ পাপমপনুদতি" অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা পাপ নষ্ট হয় বা অভিভূত হয়। অতএব যাঁরা পূর্বজন্মে অনেক ধর্ম করেছেন— তাঁদের পাপ বা পাপবাসনা অভিভূত হওয়ায় এজন্মে তাঁরা ভগবানের কথামৃত কীর্তনাদি করেন। তাঁদের ভগবৎ-কথায় প্রীতি হয়। "ভূরিদাঃ" পদের প্রথম অর্থে একটা "ভবন্তি" ক্রিয়ার অধ্যাহার করা যায়। দ্বিতীয় অর্থে তার প্রয়োজন হয় না।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লেখিত প্রথম অন্বয়ে "জনাঃ" শব্দটি মাত্র উদ্দেশ্যাংশে গৃহীত হয়েছে। তাই বিধেয়াংশ থেকে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে আমরা এতক্ষণ সমগ্র শ্লোকটির পদগুলির যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ করেছি তা উভয় অন্বয়েই সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে বঙ্গানুবাদও আগেই দেওয়া হয়েছে। অতএব প্রথম অন্বয়কে অবলম্বন ক'রে আবার উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশ দেখিয়ে পদগুলির পুনর্বিশ্লেষণ ও অর্থকরণ নিষ্প্রয়োজন।

অতি সংক্ষেপে শ্লোকটির অর্থ বলা হলো। বিস্তারিতভাবে বলা সময়সাপেক্ষ এবং ভগবৎ-প্রেরণাসাপেক্ষ

স্বাস্থ্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা

ডক্টর সত্যপ্রকাশ দে*

স্বাস্থ্য অর্থে সাধারণতঃ নীরোগ শরীর বুঝায়। কিন্তু শরীর শুধু নীরোগ থাকিলেই পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। সবল শরীরও স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। নানা নীতি ও নিয়ম রক্ষার দ্বারা শরীর সবল ও সুস্থ রাখা সম্ভব। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে এই সব নিয়মগুলির বিষয় আলোচনা করা হয়। পাশ্চাত্যে ও উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক উচ্চমানের; নানা কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিগত কয়েক দশকে আমাদের জনসাধারণের মধ্যেও কিছু উন্নতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কয়েক দশক নানবিধ প্রচার-কার্য, গর্ভবতী ও প্রসূতির প্রতি অধিক যত্ন ও নানা রকম বিশেষ জীবনরক্ষক ভেষজাদি আবিষ্কারের ফলে মৃত্যু-হার হ্রাস পাইয়াছে—বর্তমান জনস্ফীতির ইহা একটি মূল কারণ

জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে সামগ্রিক-ভাবে নানাদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়—কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলে না। তাছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যও রক্ষা করা সম্ভব নহে। এইজন্য স্বাস্থ্য-নীতি বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে তিনটি বিষয় আলোচনা করিতে হয়:

(১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য (Personal Hygiene)।

(২) পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য—Environmental Hygiene)।

(৩) সামাজিক স্বাস্থ্য (Social Hygiene)।

১। **ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য** (Personal Hygiene : শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে সাধারণতঃ কয়েকটি বিষয়ে সচেতন থাকা কর্তব্য। যথা—

(ক) সুষম আহার: দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য পরিমাণগত ও গুণগত সুষম আহারের প্রয়োজন। জননীর গর্ভে শিশুর প্রথম দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয়। এই সময় গর্ভবতী মাকে সম্যক্ আহার দেওয়া প্রয়োজন; নচেৎ শিশুর নানারকম শারীরিক এমন কি মানসিক ক্ষতি হয়। পূর্বে এক প্রবন্ধে[১] এ বিষয় সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

শৈশব হইতে কৈশোর পর্যন্ত শরীরের বৃদ্ধির সময়। এই সময়ে যথোপযুক্ত আহার না পাইলে শরীরের পূর্ণ বৃদ্ধি সম্ভব হয় না আহার সুষম হইবে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ক্যালোরি (Calories) হিসাব করিয়া যথাযথ আমিষ (প্রোটিন),

* জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হিসাবে ইনি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যথা—কেন্দ্রীয় ভেষজ পরীক্ষাগার, কলিকাতা; ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা, কলিকাতা; হাফ্‌কিন ইন্‌স্টিটিউট, বম্বে; ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থা, ব্যাঙ্গালোর। ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বহু গবেষণাগার দর্শন করিয়াছেন এবং ইঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি এদেশের ও বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হইয়াছে।

১ উদ্বোধন, ৭৬তম বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, পৃঃ ৪১২-১৩

শর্করা (কারবোহাইড্রেট) ও স্নেহ জাতীয় (ফ্যাট) অর্থাৎ তৈল ইত্যাদি দেওয়া আবশ্যক। খাদ্যপ্রাণ অর্থাৎ ভিটামিন ও বিবিধ প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থও আহারে থাকা দরকার। অনেকের ধারণা সুষম আহারের ব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। আমাদের দেশে নানারকমের শাকসব্জী ও ফল পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য হইতেই প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আহার্য সংগ্রহ করিয়া সুষম আহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। বহু প্রদেশে মাছ, মাংস ও ডিম আহার করা হয় না। দুধ ও ডালজাতীয় শস্যাদিতে এই সব আমিষ-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় বিশেষতঃ সোয়াবীনে মাছ, মাংস অথবা দুধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রোটিন বর্তমান থাকায় ইহা ব্যবহার করিলে আমিষের বিকল্প ব্যবস্থা হয়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যের জন্য শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টি—এই দুই বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। সুতরাং মাঝে মাঝে শরীরের ওজন লইয়া বৃদ্ধি ও পুষ্টির সম্বন্ধে অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যৌবনের পরে বৃদ্ধি বিশেষ হয় না। মেদবৃদ্ধি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। শরীরের পুষ্টিই বাঞ্ছনীয়, মেদবাহুল্য নহে। শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য ও কর্ম ক্ষমতার প্রয়োজনে সুষম আহারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুতরাং সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া দৈনিক আহার-তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। বয়স অনুপাতে সুষম আহারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে

(খ) ব্যায়াম ঃ স্বাস্থ্যরক্ষা বা শারীরিক বলবৃদ্ধির নিমিত্ত অঙ্গচালনা বিশেষ প্রয়োজন। বাল্যকালে ও কৈশোরে নানা রকম বিশেষ ব্যায়ামের প্রচলন থাকায় স্বাভাবিকভাবে পেশীসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ব্যায়ামের ফলে শিরা, উপশিরায় রক্তসঞ্চালন হয় ও আভ্যন্তরিক কোষ-ও গ্রন্থি-সমূহের কার্যকারিতার সহায়তা করে। সকল বয়সে কোন না কোন রকম ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়! যখন সাধারণ খেলাধূলা সম্ভব হয় না, তখন যেখানে সুযোগ আছে, সেখানে অল্প সাঁতার বা বেড়ানর অভ্যাস করিলে শরীরের উপকার হয়। এইরূপ নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাসে নানাবিধ ব্যাধির, যথা বাত, ডায়াবিটিস ইত্যাদির প্রকোপ হ্রাস করা যায়।

(গ) পরিচ্ছন্নতা ঃ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্যের জন্য শরীর পরিষ্কার রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। ঘাম হইলে গায়ের চামড়ায় ময়লা জমে ; এই কারণে নানা রকমের জীবাণু বা ছত্রাক সহজেই চর্মরোগের সৃষ্টি করিতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ সকলেই এ বিষয়ে সচেতন, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে প্রায় সকলেই একাধিক-বার স্নান করেন। অবগাহন স্নানই প্রশস্ত, তবে শহরাঞ্চলে যেখানে সে সুযোগ নাই, সেখানে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার পরিষ্কার জলে স্নান করা প্রয়োজন। গায়ের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য আজকাল প্রায় সর্বত্র সাবানের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। পূর্বে দেশীয় নানা উপাদান ব্যবহার করিয়া প্রসাধন-সামগ্রী তৈয়ার হইত। সেগুলির ব্যবহারে ত্বকের কোন ক্ষতি হইত না, অথচ অল্প মূল্যের সাবানে ক্ষারজাতীয় পদার্থ অধিক থাকায় চর্মের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে স্নানের পূর্বে গাত্রে তৈলমর্দন-প্রথা দেখা যায়। এইরূপ মর্দন শরীরে রক্তচলাচলের সহায়তা করে। বর্তমানে বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে এই প্রথার বিলোপ হইতেছে।

(ঘ) ব্যাধির প্রতিষেধক ব্যবস্থা : সাধারণ জীবনে সম্পূর্ণ নীরোগ থাকা সম্ভব নয়। সকলেরই কিছু না কিছু অসুখ হয় এবং শরীর অল্পবিস্তর অসুস্থ হয়। সামান্য জ্বর, পেটের অসুখ, সর্দিকাশি ইত্যাদির অভিজ্ঞতা বোধ হয় সকলেরই হইয়াছে, তবুও যাহাতে কোন সংক্রামক ব্যাধি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, বিশেষতঃ যখন কোন রোগ মহামারী-রূপে দেখা দেয় অথবা ঋতুবিশেষে কোনও বিশেষ ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় তখন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে নানা রকম সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাধি সাধারণতঃ এই সময় দেখা যায়। সুতরাং পূর্ব হইতে সাবধান হইলে বহু ক্ষেত্রে ব্যাধির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহাকেও কয়েকটি রোগ হইতে মুক্ত রাখার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অবহেলার ফলে বহু শিশুর অকালে জীবনহানি ঘটে অথবা তাহারা চিরদিনের মত বিকলাঙ্গ হইয়া যায়। শিশুর জন্মের পর তাহাকে প্রথমে বসন্ত রোগের টিকা ও পরে ট্রিপল এন্টিজেন ও পোলিও প্রতিষেধক টিকা দেওয়া কর্তব্য। ট্রিপল এন্টিজেন ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথিরিয়া ও ঘুঙরি কাশির (whooping cough) প্রতিষেধক টিকা। পোলিও রোগে বহু শিশুর হাত, পা পক্ষঘাতে চিরকালের মত অকর্মণ্য হইতে পারে ও ফলে তাহাদের জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে এই ব্যাধির প্রভাব অধিক লক্ষ্য করা যায়। পোলিও আক্রমণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে হইলে পোলিও প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এই টিকা খাওয়াইতে হয়। শিশুর জন্মের প্রথম ছয় অথবা নয় মাসের মধ্যে এই সব প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বয়স্কদের প্রত্যেকেরই পক্ষে মহামারীর পূর্বেই সেই রোগের প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করা কর্তব্য, বিশেষতঃ কলেরা ও টাইফয়েডের টিকা প্রতি বৎসর এবং বসন্তের টিকা প্রতি তিন বৎসর অন্তর নিয়মিত ভাবে লওয়া দরকার। শহরাঞ্চলে পথে ঘাটে নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, কল কারখানায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্মস্থলে নানা রকমের দুর্ঘটনা হইতে পারে। রাস্তায় অথবা ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনার ফলে ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে, সুতরাং পূর্ব হইতে টিটেনাস টক্সয়েড (Tetanus Toxoid) টিকা লইলে এই রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রী অথবা যাহারা মাঠে খেলাধুলা করে তাহাদের প্রত্যেককে এই টিকা দেওয়া একান্ত কর্তব্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এইসব টিকা না দেওয়া হইলে বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় না। একবার এই টিকা লইলে ইহার কার্যকারিতা বহুদিন থাকে।

(ঙ) আহার ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা : আমাদের দৈনন্দিন আহার সহজ-পাচ্য হওয়া উচিত। অধিক তৈল, ঘি বা মসলা দিলে পরিপাকযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে, ফলে হজমের গোলমাল দেখা দিতে পারে। আহারের নির্দিষ্ট একটা সময় থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেকের বাড়ীতে আহারের কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। এইরূপ সময়ের বিশৃঙ্খলার ফলে পরিপাকের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

রুশদেশের শরীরবিজ্ঞানবিদ পাওলভ (Pavlov) দেখাইয়াছেন যে, কোন প্রাণীকে নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া আহার খাইবার অভ্যাস করাইলে, যদি ঠিক সেই সময়

কোন আহার না দিয়া মাত্র ঘণ্টা বাজান হয়, তাহা হইলে পরিপাক-গ্রন্থিসমূহ হইতে নিঃসৃত রস পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষরিত হয়। পাশ্চাত্যে প্রায় সর্বত্রই আহারের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। প্রত্যেক পরিবার এই নিয়মানুসারে আহারপর্ব সমাধা করেন। বাড়ীর সকলে যদি একই সময়ে আহার করেন, তাহা হইলে সকলেরই অনেক সুবিধা হয় এবং তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ শেষ করিয়া কিছু বিশ্রাম বা চিত্তবিনোদনের অবসর পাইতে পারেন। খাদ্যাদি ও পানীয় জল বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার থাকিলে নানা রকম ব্যাধির আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। আহার্য ও পানীয়ের মধ্য দিয়া নানা রকম রোগের জীবাণু বা কীটাণু শরীরে প্রবেশের ফলে আমাশয়জাতীয় রোগ, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির সৃষ্টি হয়। বাড়ীতে রান্না করা আহার্য অথবা বাহিরে দোকান হইতে আনীত কোন খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কারভাবে রক্ষিত কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। রাস্তার ধারে অনেক ব্যবসায়ী নানা রকমের খাবার অথবা কাটা ফল বিক্রয় করেন। এগুলি যেভাবে রাখা হয়, তাহাতে অনায়াসে রোগের জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। তৃষ্ণার জন্য গৃহের অন্যত্র জল, বোতলের মিষ্ট জল, অথবা সরবৎ না খাইয়া ডাব বা গরম চা খাইলে ব্যাধির আশঙ্কা থাকে না। বর্তমানে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার লোভে আহার্য-দ্রব্যে নানা প্রকার ভেজাল মিশাইয়া থাকেন। সুকৌশলে এগুলি সংমিশ্রণের ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলি ধরিতে পারা সম্ভব নয়। এইরূপ ভেজালে যখন একাধিক লোকের ব্যাধির খবর পাওয়া যায় তখন এ বিষয়ে লোকে সচেতন হয়। কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদম অঞ্চলে তৈলে ভেজাল মিশাইবার ফলে বহু ব্যক্তি পঙ্গু হয়, এমনকি কয়েক জনের মৃত্যুও হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে সরিষার তৈলে ঐরূপ ভেজালের ফলে কলিকাতা নগরী ও বাহিরে বহু জায়গায় ব্যাপকভাবে বেরিবেরি রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মসলা ইত্যাদিতে নানা রকম কৃত্রিম উপকরণ মেশান হয়। চিকিৎসকদের মতে এইরূপ ভেজাল দ্রব্য আহার করিবার ফলে নানা রকমের জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মিষ্টান্নে রঙের ব্যবহারেও বহু ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় সামগ্রী দেওয়া হয়, ফলে স্বাস্থ্যের অপকার হয়। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে এই রকম রঞ্জক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে কর্কটজাতীয় রোগেরও উৎপত্তি হইতে পারে। পাশ্চাত্যে আহার্য সম্পর্কে সর্বত্র কঠোর নিয়মের প্রচলন দেখা যায়—প্রায় প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের টিনে সরকারী সীল দেওয়ার প্রথা আছে। ভারতবর্ষে এই ধরনের আইন থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নেশা প্রভৃতি বর্জন করা একান্ত বিধেয়। বিশেষতঃ মাদক দ্রব্য ও ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। মদজাতীয় পানীয় গ্রহণের ফলে যকৃতের ব্যাধি ও অত্যধিক ধূমপানের ফলে ফুসফুসে কর্কট রোগ (cancer) হইতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সিগারেটের প্যাকেটে এ বিষয়ে স্পষ্ট সতর্কীকরণ বাণী মুদ্রিত থাকে। বর্তমানে ভারতবর্ষেও সিগারেটের প্যাকেটে সতর্কীকরণ বাণী মুদ্রিত হইতেছে।

(চ) অপর কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা: যে সকল স্থানে মশা বা মাছির উপদ্রব দেখা যায় সেখানেও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। মশা নানা রোগের বাহক; বিশেষতঃ ভারতবর্ষে

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়া ব্যাধির প্রসারের জন্য দায়ী হইল মশা। সাধারণতঃ এইসব মশার উপদ্রব সন্ধ্যার পর দেখা দেয়। রাত্রে শয়নের সময় মশারি ব্যবহার করিলে উক্ত রোগগুলির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। বহু বৎসর পরে সারা দেশে পুনরায় ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

মশার ন্যায় মাছিও বহু রোগের বাহক বিশেষতঃ টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণু মাছি দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের উপর বাহিত হইবার ফলে উক্ত রোগগুলি দেখা দেয়। বাড়িতে রান্না করা খাবার অথবা দোকান হইতে আনীত মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাহাতে মাছির সংস্পর্শে না আসে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

পানীয় জল নানাভাবে দূষিত হইতে পারে; বহু রোগের জীবাণু পানীয় জল অশুদ্ধ করিতে পারে। যেখানে বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা নাই, সেখানে পানীয় জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিলে বহু রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। **পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য** (**Environmental Hygiene**):

পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং শহরাঞ্চলে অথবা গ্রামাঞ্চলে পল্লীর পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। পূর্বেই মশা ও মাছিকে বহু রোগের জীবাণুবাহক বলা হইয়াছে। চারিদিকের অপরিচ্ছন্নতার ফলে অথবা স্থানে স্থানে জল জমিয়া থাকার দরুন মাছি ও মশার প্রাদুর্ভাব হয়। নিয়মিতভাবে আগাছা বা অনাবশ্যক গাছপালা প্রভৃতির উচ্ছেদ করিয়া ও যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলিয়া পল্লীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা যায়। বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে গৃহস্থ বাড়ীর দৈনন্দিন আবর্জনা রাস্তায় যত্র তত্র না ফেলিয়া নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলিলে চারিদিক অপরিষ্কার হয় না।

পল্লীগ্রামে শুধু উপরি-উক্ত ভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিষ্কার করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ পল্লীবাসীর মলমূত্রত্যাগের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকে না। মাঠে ঘাটে যত্র তত্র এই কাজ সম্পন্ন করা হয়; ফলে মল বা মূত্রের মধ্যে কোন ব্যাধির জীবাণু থাকিলে তাহা সহজে মাঠে ঘাটে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং এইসব সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু ধূলা বা মাছি দ্বারা গ্রামবাসীর পানীয় জল ও আহার্যাদি দূষিত করিতে পারে। জীবাণুঘটিত আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, এ ছাড়া কীটাণুঘটিত আমাশয় (amoeba) অথবা কেঁচোজাতীয় বা অপর প্রকার ক্রিমি (round worm, thread worm) ইত্যাদি অন্ত্রে প্রবেশের ফলে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে। মাঠে ঘাটে বিষ্ঠার মধ্যে hook worm জাতীয় কীটাণু অথবা তাহাদের ডিম্ব থাকিতে পারে। খালি পায়ে চলার কালে চামড়া ভেদ করিয়া ইহারা শরীরে প্রবেশ করে। এই কীটাণু এক প্রকার রক্তাল্পতা ব্যাধির কারণ, বিশেষভাবে চিকিৎসা না করিলে রোগীর প্রাণহানি হইতে পারে। বহুস্থানে এইভাবে জীবাণু ছড়াইবার ফলে টাইফয়েড অথবা কলেরার মড়ক হইতে দেখা যায়। বহুকালের এই অভ্যাস ত্যাগ করা সহজসাধ্য নহে। আর্থিক দুরবস্থার দরুন প্রতি গৃহস্থের পক্ষে পৃথক্‌ভাবে পায়খানা তৈয়ার করা অথবা নিয়মিতভাবে তাহা পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না। যদি গ্রামবাসীরা সকলে যৌথ প্রচেষ্টায় বিশেষ স্থান নির্বাচন করিয়া কয়েকটি সার্বজনীন

ব্যবহারোপযোগী বিজ্ঞান-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসঙ্গত পায়খানা (sanitary latrine) তৈয়ারী করেন, তবে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে ব্যয়বাহুল্য হয় না, এবং পূর্বোক্ত অস্বাস্থ্যকর প্রথার বিলোপ সাধন হয়।

রোগাক্রান্ত গবাদি পশুর বিষ্ঠা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত নিষ্কাশিত জীবাণু অপর সুস্থ পশুর ও বহুক্ষেত্রে মানুষেরও ক্ষতি করিতে পারে। আমাদের পল্লীগ্রামে প্রত্যেক চাষীর ঘরে বলদ ও গাভী থাকে। স্বল্পপরিসর কুটিরগুলির সংলগ্ন কোন স্থানে ইহাদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়, এমন কি স্থানাভাবে শীত ও বর্ষাকালে যে ঘরে মানুষ বাস করে, বিশেষতঃ রাত্রিযাপন করে, সেই ঘরেই উহাদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মানুষ ও পশু উভয়ের পক্ষে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা সম্ভব হয় না। বলা বাহুল্য, এইরূপ পরিস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। সামবায়িক ভিত্তিতে যৌথ গোঁয়াড় বা গোশালার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থ তাহাদের বলদ ও গাভীগুলিকে সেইস্থানে রাখিলে নিজেদের কুটিরগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া স্বাস্থ্যসঙ্গত ভাবে বাস করিতে পারেন। উপরন্তু পশুদের এইভাবে পরিষ্কার পরিবেশে পালন করিয়া তাহাদের রোগমুক্ত ও সুস্থ থাকার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এবং পশুদের মলমূত্রাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয়। বর্তমানে গোবর গ্যাসের কথা অনেকে শুনিয়াছেন; এইভাবে গোশালা তৈয়ারী করিলে বড় গ্রামগুলিতে গোবর গ্যাসের উৎপাদন সম্ভবপর হইতে পারে এবং তাহার ফলে গ্রামীণ শিল্পও যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

আমাদের দেশে শতকরা ৭০ জনেরও অধিক এখনও গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। সুতরাং জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে পল্লী-গ্রামের দিকে নজর দিতে হইবে। শুধু সরকার অথবা পৌর প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিলে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হয় না। যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। সকলের সহযোগিতায় পানীয় জলের জন্য নলকূপ অথবা সার্বজনীন ব্যবহারোপযোগী শৌচাগার, গোশালা প্রভৃতি স্থাপন করিলে গ্রামের শ্রী ফিরিয়া আসিবে এবং সাধারণভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ স্বাস্থ্য-সঙ্গত হইলে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

পরিশেষে পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমান কালে সারা বিশ্বে বায়ুমণ্ডল ও পানীয় জল দূষিত হওয়ার সমস্যা সম্বন্ধে অনেকেই অবগত আছেন। সংবাদপত্রে নানা সমীক্ষা ও আলোচনার কথা প্রকাশিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ উন্নত দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বহু কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দিন দিন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ঐসকল কলকারখানা হইতে নানা রকমের দূষিত বাষ্প ও অন্যান্য পদার্থ চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে অথবা নদী নালা দিয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ফলে বাতাস ও জল ক্রমশঃ দূষিত হইতেছে। পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষতঃ উন্নত দেশগুলিতে, যানবাহনের সংখ্যাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ট্রেন, মোটর গাড়ি, বিমান প্রভৃতি চারিদিকে যাতায়াতের ফলে পেট্রোল অথবা ডিসেল তৈলের বাষ্পও বাতাসে প্রবেশ করিয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত করিতেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এইভাবে বায়ুমণ্ডল ও পানীয় জল ক্রমশঃ দূষিত হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জীবন-যাত্রার নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হইবে ও নানা জটিল ব্যাধিও দেখা দিবে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে

বহু দেশে, বিশেষতঃ উন্নত দেশগুলিতে, নানা গবেষণা ও আলোচনা শুরু হইয়াছে। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্যা সারা বিশ্বের। আশা করা যায় বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের এই ভয়াবহ সমস্যার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে। পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিতে হইলে এই সমস্যাটি বর্তমানে প্রাধান্য লাভ করে।

৩। **সামাজিক স্বাস্থ্য** (Social Hygiene): সামাজিক পরিবেশ তথা সামাজিক জীবন সুস্থ না হইলে ব্যক্তিগত অথবা পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও সামগ্রিকভাবে সকলের পক্ষে স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের জীবনে নানা সমস্যার ফলে বর্তমান সমাজে কয়েকটি বিশেষ ধরনের ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে জীবনযাত্রার প্রণালীতে যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ উন্নত দেশে মানুষের দৈনন্দিন কাজ যন্ত্রের মতো হওয়ায় অজ্ঞাতসারে মনের উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। উপরন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভোগলালসার প্রবৃত্তি বিশেষভাবে প্রবল হওয়ার ফলে মনের উপর নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে জনসাধারণ নানা অসুবিধা ও অভাবের নিপীড়নে জর্জরিত। সমাজে সাধারণ নাগরিক অপরের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করেন না, উপরন্তু কয়েক প্রকার সমাজদ্রোহীর উৎপাতে দৈনন্দিন জীবনধারায় বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের উদ্ভব হওয়ায় মনের উপর চাপ পড়া স্বাভাবিক। চিকিৎসকদের মতে মনের উপর অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীরে কয়েকটি ব্যাধির আবির্ভাব হইতে পারে। মানসিক উত্তেজনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা প্রভৃতির ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ কয়েকটি গ্রন্থির কার্যকলাপে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এড্রিনাল (Adrenal), পিটিউটারি (Pituitary), প্রভৃতি গ্রন্থির এইরূপ প্রতিক্রিয়ার দরুন ক্ষরণ বৃদ্ধি পাইলে শিরা, উপশিরা এমনকি হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতার ব্যাঘাত ঘটে। পক্ষান্তরে মনের শান্তি ও প্রফুল্লতা শরীরের যাবতীয় গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। ইউরোপে এক চিকিৎসক-সম্মেলনের মতে যাহাদের মন প্রফুল্ল থাকে তাহাদের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যাধি (coronary thrombosis) বিরল। ভারতবর্ষে অনুরূপ সমীক্ষায় জানা যায় মানসিক অশান্তি, দুর্ভাবনা, উদ্বেগ বা প্রিয়জন-বিয়োগজনিত শোকে বহু ক্ষেত্রে coronary thrombosis অথবা হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতায় বিপর্যয় ঘটে। অত্যন্ত দুশ্চিন্তা, মানসিক অশান্তি ইত্যাদির ফলে রক্তচাপ-বৃদ্ধি (hypertension) হয় ও এমনকি যাহাদের ডায়াবিটিস রোগ আছে তাহাদেরও রোগাবস্থার অবনতি হইতে দেখা গিয়াছে। যথার্থ নাগরিক চেতনাবোধ সকলেরই পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর ; অপরের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি থাকিলে নিজেরও মঙ্গল। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানা দরকার যে, ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যের জন্য সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা অপরিহার্য।

আমরা অল্প-বিস্তর নানা ইচ্ছাকৃত অপ্রীতিকর কার্য করিয়া অপরের অসুবিধার সৃষ্টি করি; কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকে নিজেদের বাড়ীর আবর্জনা অপরের বাড়ীর সামনে অথবা পাশের খোলা জায়গায় ফেলিয়া আসেন। রেডিয়ো-যন্ত্র

সজোরে চালাইয়া আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু ঐভাবে রেডিয়ো বাজিলে রোগী বা ক্লান্ত ব্যক্তির নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে, পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বিরক্তিকর হইতে পারে—ইহা তাঁহারা খেয়াল করেন না। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, বিশেষতঃ রোগীর ব্যবহৃত ময়লা বস্ত্র ইত্যাদি রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া ইত্যাদি অভ্যাস বিপজ্জনক। এই থুথু ও আবর্জনায় নানা রকম ব্যাধির জীবাণু থাকিতে পারে; ক্ষতিকর জীবাণু বাতাসের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশের ফলে সুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগ এই ভাবে প্রসারিত হয়। মুখে হাত বা রুমাল চাপা না দিয়া কাশিলে ইনফ্লুয়েনজার অনুজীবাণু অনায়াসে অপরে সংক্রামিত হইতে পারে।

মিষ্টান্নের দোকান ও হোটেলগুলির পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যে-কোন খাবারের দোকান অথবা রেস্তোরাঁগুলির রন্ধনশালা অথবা ব্যবহৃত বাসনগুলি যথাযথ পরিষ্কার করা সম্পর্কে বিশেষ কোন সচেতনতা দেখা যায় না

নিউইয়র্ক শহরের খাদ্য আইন বিভাগের একজন পরিদর্শক (Inspector) স্থানীয় রেস্তোরাঁগুলিতে আমাকে লইয়া যান প্রত্যেকটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ব্যবহৃত বাসনগুলি প্রথমতঃ পরিষ্কার জলে ধুইয়া পরে বড় sterilizer-এ যেভাবে শোধন করা হয় তাহাও আমাকে দেখান হয়। একটি প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে উক্ত ভদ্রলোক আমাকে রান্না-ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মেঝেতে ½" চওড়া একটি লম্বা ফাটল দেখাইয়া বলিলেন যে, ফাটলের মধ্যে জমা ময়লা পরিষ্কার করা যায় না; সুতরাং মেঝেটি যতদিন না সংস্কার করা হইবে ততদিন ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বন্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আমাদের দেশে খাদ্য সম্পর্কে নানা আইন থাকা সত্ত্বেও তাহার উপযুক্ত প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা লওয়া হয় না, সজাগ দৃষ্টি ও নিয়মিত সতর্ক পরিদর্শন না থাকিলে বর্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর আর একটি গুরুতর অপরাধ খাদ্যে ভেজাল-সংমিশ্রণ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে বিষয়টি উল্লেখিত হইলেও, পুনরায় আলোচিত হইতেছে, কারণ ইহা একটি সামাজিক কলঙ্ক যাহার অপনয়ন ব্যতীত সমাজের কল্যাণ সম্ভব নহে। খাদ্যে ভেজালের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরীরের নানা ক্ষতিসাধন হয়। পরিপাকযন্ত্রের রোগ ব্যতীত বহু জটিল ব্যাধিরও সৃষ্টি হইতে পারে। অনিষ্টকর দ্রব্য খাদ্যের সহিত গ্রহণ করায় রক্তে নানা অবাঞ্ছনীয় পদার্থ যাওয়ার ফলে রক্তাল্পতা, যকৃৎ, হৃদ্‌যন্ত্র অথবা বৃক্কের (kidney) রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। শিরা, উপশিরা প্রভৃতির স্থিতিস্থাপকতা অথবা ব্যাসের পরিসর হ্রাস হওয়ার ফলে রক্তচাপবৃদ্ধি ও হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে নানা রকমের রং ব্যবহার করিয়া তাহাদের আকর্ষণীয় করা হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে কয়েকটি বিশেষ অনুমোদিত রং ব্যবহার করা কর্তব্য, অননুমোদিত রং ব্যবহারের ফলে পাকস্থলীতে কর্কট রোগ হইতে পারে। কয়েকটি ভেজাল দ্রব্য অথবা রং বহুদিন গ্রহণের ফলে বিষের ক্রিয়ার ন্যায় দেহের নানা ক্ষতি-সাধন করায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সামাজিক স্বাস্থ্যের কল্যাণে ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান প্রয়োজন। যাহারা অর্থের লোভে

অপরের স্বাস্থ্য ও জীবন বিপন্ন করে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্তমানে খাদ্যের ন্যায় ঔষধেও বহু প্রকারের ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার করা হইতেছে, এমন কি সম্পূর্ণ নকল ঔষধও বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে, এণ্টিবায়োটিক-জাতীয় জীবন-রক্ষক ভেষজাদি জাল হইতেছে। যাহারা এইরূপ করে তাহাদের নরহত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া সেই অপরাধের জন্য বিচার করা উচিত। যতদিন খাদ্যে বা ভেষজে ভেজাল দেওয়া ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ রোধ করা না যায়, ততদিন যে-কোন স্বাস্থ্য-কল্যাণ পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

মানুষের জীবনধারায় প্রতিপদে সুস্থ শরীরের প্রয়োজন। সাধারণ সংসারী মানুষ অথবা সমাজের কোন মহৎ কার্যে ব্রতী ব্যক্তি—প্রত্যেকেই নীরোগ, সবল হইলে নিজ জীবনব্রত যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। মনের সঙ্গে শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুস্থ শরীর মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শরীর সবল ও সুস্থ থাকিলে মনে বল ও দৃঢ়তা আসে—যে-কোন সমস্যার সমাধানে অথবা প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করিতে মানুষ পশ্চাৎপদ হয় না। কর্মজীবনে বা আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিক্ষেত্রে সাফল্যলাভে মনের বল সহায়তা করে। উপনিষৎ বলেন: "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ: প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। প্রকাশিকা: প্রব্রাজিকা বিদ্যাপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৫৭। (১৯৭৬), পৃঃ ১১১, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার কথা যেমন 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' তেমনি আবার পরমাশ্চর্য পদে পদে—স্বামী সারদানন্দের অতিলৌকিক প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে, 'ব্যক্ত হয়েও গুপ্ত', 'অঘটন-ঘটনাবলী-পরিপূর্ণ'। অনির্বচনীয়, অনন্তভাবময়, অখণ্ড অবতারকে পুঁথির পাতায় বর্ণনা করা, বাক্যমনাতীত অসীমকে গ্রন্থের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাহলেও তাঁর সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের রচনার অভাব নেই। ঠাকুরের আশ্রিত উপনীত ও চিহ্নিত সন্তানগণ—একাজের জন্যে যাঁদেরকে তিনি বেছে নেন—বোধকরি তাঁরাই এই অদ্ভুত বিচিত্র সত্তাকে, Isherwood-এর আপ্ত আখ্যায়, 'phenomenon'-কে চিনিয়ে দেবার অগ্রাধিকারী। তাঁর কৃপাধন্য কতিপয় সাধক-সাধিকা তাঁর লীলাবিলাস লিপিবদ্ধ করেছেন, নানা রূপে রঙে দেবমানবের মূর্তি এঁকেছেন। আলোকের অভিযাত্রী বহুজনের কাছে সেগুলি সর্বতীর্থসারের সকাশে উত্তরণের মানচিত্রস্বরূপ। সব পথ-নির্দেশিকা সর্বাঙ্গসুন্দর বা সম্পূর্ণ সহায়ক না হলেও তাতে মহিমময়ের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়না, সুধাক্ষরণে বাধা হয় না। স্বভাবকবি শ্রীরামকৃষ্ণের পরম মনোরম উপমায়, 'অত হিসাবে কাজ কী? তুমি আম খাও।' ভগবানের মহিমা-কীর্তন—যতবার হোক, যেভাবেই হোক—পরম শুভংকর।—বিশেষত কীর্তনকারী যদি হন ঠাকুরের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসব্রতী সন্তান, যাঁর জীবন-প্রাণ প্রভুর শ্রীপদে চিরসমর্পিত।

শ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার বইখানি, সংক্ষেপে হলেও নিরতিশয় নিষ্ঠা ও বিনীত বিশ্বাসের সঙ্গে রচিত, ঠাকুরের একটি অতি স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন জীবনালেখ্য। ভাষা ভাবগম্ভীর আবেগাতিশয্যবর্জিত। বইটির বিষয়-বিভাগ করা হয়েছে এগারোটি অধ্যায়ে এইভাবে: জন্মকথা ও বাল্যকাল, কালীমন্দিরের পূজারী, বিবাহ ও বিবিধ ধর্ম-সাধনা, দিব্য দর্শন ও বাণী, তীর্থ-ভ্রমণ, শ্রীশ্রীমা, ভক্তসমাগম, বার্তাবহ, সদানন্দ মহাপুরুষ, মহাসমাধি ও নবযুগের সূচনা বিন্যাস ও অনুপুঙ্খ নিয়ে কূটতর্কের মধ্যে না গিয়ে শুধু একটা কথার কথা বলে ফেলি। 'সদানন্দ মহাপুরুষ' শীর্ষক পরিচ্ছেদটির পরিপূরক-রূপে সেই করুণাঘন অবতারপুরুষ, কঠোর ত্যাগ-তপস্যা ও নিদারুণ দৈহিক ক্লেশ ছাড়াও, ঈশ্বর-বিরহে নিজে যে কী কাঁদনে কেঁদেছেন, তরুণ ত্যাগী ভক্তদের প্রতীক্ষায় কী অঝোর অশ্রুপাত করেছেন এবং সকলকে ইষ্টলাভের জন্যে কতো কাতর কান্না কাঁদতে বলেছেন সেকথা বল্লে হাসি-কান্নার হীরাপান্নায় ঝলমল-ছলছল যুগাবতারের যে ভাবমূর্তিটি ফুটে উঠতো তা হয়তো রোদনভরা বর্তমান যুগের অনুপযোগী হতো না। দেহধারী ভগবানের জীবনবেদের—ঈশ্বরমুখী ও মানবমুখী উভয়ত—অশ্রুসজল অংশগুলিও ব্যঞ্জনাময় ও শিক্ষণীয় তথ্য বোলে মনে হয়।

ভূমিকাতে লেখিকা জানিয়েছেন যে বইটি 'বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীগণের জন্যে রচিত', যদিও কোন্ মানের ছাত্রছাত্রী—সদ্যসাক্ষর, না বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বা উচ্চশ্রেণীর, না বিশ্ববিদ্যালয়ের—তা অনুক্ত রয়ে গেছে এবং বইটি আদ্যন্ত পড়েও তা স্পষ্ট নয়। সে যাই হোক, ঠাকুরের দিব্যজীবনের আনুপূর্বিক বর্ণনা ও আলোচনা করার চেষ্টা তিনি করেননি এবং গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস বলা যায় না। কোন তীব্র তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোও তিনি ফেলেননি। লেখিকার স্বীকৃতি অনুসারে, বইটি 'তথ্যমূলক' এবং সব তথ্য আহৃত হয়েছে লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত থেকে। কট্টর সমালোচক বলতে পারেন যে বিবরণ শুধুই পল্লবগ্রাহী, ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণ অগভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-প্লাবনে নিমগ্ন পাঠক হয়তো বলবেন, বহু প্রসঙ্গের বিবরণ যথোচিত হয়নি বা বহু মহিমার কথা বাদ পড়ে গেছে, যেগুলি নির্বাচিত ঘটনার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র ১১১ পৃষ্ঠার কৃশ কলেবরের মধ্যে সর্বদেবদেবীস্বরূপের বিশ্ব-রূপের পূর্ণ বাণীরূপ যাঁরা প্রত্যাশা করেন তাঁদের কিছু কিছু অপ্রাপ্তির অনুযোগ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু কিছু কিছু তথ্যের আপাতপ্রতীয়মান অসঙ্গতি, প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি, ভাষার শৈথিল্য ও ছাপার ভুল হয়তো এড়ানো যেতো। যেমন, লেখিকা এক জায়গায় লিখেছেন, 'সেবাধর্ম প্রবর্তিত করবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠা' (পৃ ৫৫)। অন্যত্র, 'শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো স্বামীজী জগতের বিশেষতঃ ভারতের কল্যাণের জন্যই "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই সংঘ স্থাপন করে গেছেন' (পৃ ৮২)। উদ্ধৃত অংশে পদযোজনা ও যতিচিহ্ন ব্যবহারেরও কিছু নমুনা মিলবে। উল্লিখিত 'নির্দেশ মতো'-র মতোই 'অনুরোধ মতো' (পৃ ২১), 'মার-নাম' (পৃ ২১), 'উচ্চ পদস্থ' (পৃ ৯২), 'মায়ার দরুণ' (পৃ ৪৮), 'রাণী রাসমণি' (পৃ ১৯, ২১, ৭৬ ইত্যাদি), 'সমাজের কিছু লোকের অসংযত চরিত্র তাদের, পানাসক্তি' (পৃ ৯৪), 'ধীর, স্থির শান্ত চরিত্র' (পৃ ৬৬) ইত্যাদি কিঞ্চিৎ অশুদ্ধি রয়ে গেছে, বইটির শেষে সংযুক্ত 'শুদ্ধিপত্র' সত্ত্বেও। ভাষাগত-ভাবে, 'অঙ্কে বিদ্বেষ' (পৃ ৫), 'শিবরাত্রি

উপলক্ষ্যে' (পৃ ১০), 'কালীপূজা উপলক্ষ্যে' (পৃ ৬১), 'পরণে বারাণসী' (পৃ ১৭), 'চকিতের মতো' (পৃ ২৭), 'তাঁকে উল্লেখ করতেন "বাম্‌নী" অর্থাৎ ব্রাহ্মণী।' (পৃ ২৭), 'আঘাত প্রদান' (পৃ ১৬), 'জগদাতীত' (পৃ ৩৭), 'অতিরঞ্জন কাহিনী' (পৃ ৬১), 'বৈধব্যপ্রাপ্তি' (পৃ ৭.), 'বিদ্যার্জনের উদ্দেশে' (পৃ ৫), 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত' (পৃ ৮৫) ইত্যাদি ঈষৎ অসতর্কতার দৃষ্টান্তও চোখে লাগে। তাছাড়া, অধিকাংশ উদ্ধৃতির আকর-নির্দেশ দেওয়া হয়নি, এবং যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানেও অসম্পূর্ণ: যেমন, লীলাপ্রসঙ্গের মতো বহুসংস্করণ বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু সংস্করণের সংখ্যা বা সন-তারিখের হদিস নেই। তথ্যপঞ্জী ও শব্দসূচীও নেই। কিন্তু এহ বাহ্য। বিদ্যার্থীদের উপযোগী ঠাকুরের শ্রীমুখের গল্প ও উপদেশ বইটিতে বিরল ; কেবল সেগুলি নিয়েই একটি আলাদা অধ্যায় থাকলে বইটির উপকারিতা বাড়তো। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে লেখা বোলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও—অন্যথা নগণ্য—এইসব সামান্য ত্রুটির উল্লেখ করতে হলো। বলা নিষ্প্রয়োজন, বইটির অসামান্য উৎকর্ষ এতে হ্রাস পায়নি, 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থের সুপরিচিতা লেখিকার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ছাত্রছাত্রীদের নমনীয় চিত্তের সার্বিক সামর্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্যে মহাজীবনের তথ্যভিত্তিক আলোকোজ্জ্বল এই রেখাচিত্রটি অমিত বিত্ত। আশা করি, ছোটরা এই ক্ষীণতনু বইখানির মধ্যে বিরাটের সান্নিধ্য অনুভব করবে, বৃহত্তর আধার ও গভীরতর উৎসের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কামনা করি, বইটির সংস্পর্শে ও প্রভাবে তাদের প্রাণে পরশমণির ছোঁয়া লাগবে ও, অন্তত কিছুটা, ঠাকুরের মানুষ-ভাবের ছাঁচে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে তারা অনুপ্রাণিত হবে। তিনি যেমন বলতেন, তিনি নিজে ষোল টাং করেছেন, কেউ যদি এক টাংও করে তাহলেই যথেষ্ট। **বকলম**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে বাগেরহাট, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ ও শ্রীহট্ট কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সেবাকার্য অব্যাহত আছে।

ভারতে বিহারের মানের অঞ্চলে বন্যা-ত্রাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহনির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ভিত্তিস্থাপন

বিগত ২রা মে (১৯শে বৈশাখ ১৩৮৩, অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ

মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী শিক্ষণকেন্দ্রের নূতন ভবনের শিলান্যাস করেন।

উৎসব

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠে বিগত ২রা হইতে ৫ই ফেব্রুআরি (১৯৭৬) পর্যন্ত রাজা মহারাজের পুণ্য জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ২রা জন্মতিথি দিবসে মঙ্গলারতি, ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থ হইতে পাঠ করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্তমণ্ডলী এবং দরিদ্রনারায়ণ (প্রায় ২,৫০০) বসিয়া প্রসাদ পান। বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ডঃ কাশীনাথ মিশ্র এবং শ্রী এস্. সি. পালিত 'রাজা মহারাজ' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ৩রা সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীরঙ্গনাথ মিত্র এবং শ্রীরাজকিশোর রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে ভাষণ দেন। ৪ঠা সভাপতি ডঃ কাশীনাথ মিশ্র, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীমতী সত্যবতী দাশ ও শ্রীমতী মনোরমা মহাপাত্র শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। ৫ই সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ ও শ্রীসীতাকান্ত মহাপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে ভাষণ দেন।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই মার্চ '৭৬ বহরমপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিন দিনের ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন সভাপতি স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ, কঠোপনিষদপাঠ ও ভজনাদি হয়। তিন দিনই ধর্মসভার পর শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুরের চণ্ডীর গানের ব্যবস্থা ছিল।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল (১৯৭৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৩রা সকালে পদকীর্তন ও ভক্তিমূলক গান, মধ্যাহ্নে পূজা ও আরতি এবং অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে একটি আলোচনাসভা হয়। প্রধান অতিথি জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, সভাপতি জনাব এম শহীদুল আলম, স্বামী অক্ষরানন্দ, স্বামী জগদানন্দ, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে ও অন্যান্য বক্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাত্রে শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী রচিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিগোষ্ঠী। ৪ঠা স্বামী বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত আলোচনা-সভায় সভাপতি জনাব আবদুল বারী চৌধুরী, স্বামী অক্ষরানন্দ, স্বামী জগদানন্দ ও শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেবাধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন জনাব সারওয়ারজান মিঞা, জনাব কাজী খলিলুর রহমান ও জনাব লিয়াকৎ হোসেন। রাত্রে স্থানীয় শিল্পিগণ ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন। ৫ই যথারীতি পূজা, ভোগ, আরতি ও ভক্তিমূলক গান সমাপনান্তে অপরাহ্নে ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় দশ সহস্র ভক্তকে খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

১৯৭৬ সালের সর্বভারতীয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ হইতে প্রেরিত ২৭ জন ছাত্রই উত্তীর্ণ হয়—২৩ জন প্রথম বিভাগে এবং ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে।

একজন ছাত্র বাণিজ্য শাখায় অষ্টম স্থান অধিকার করে।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী অক্ষয়ানন্দ (কেশব মহারাজ) গত ৯ই মে (১৯৭৬), বৈকাল ৫টা ৬ মিনিটে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে ৯০ বৎসর বয়সে চণ্ডীপুর আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। বিগত কয়েক মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২০ সালে সংঘের শাখাকেন্দ্র উদ্বোধনে (বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে) যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে স্বীয় মন্ত্রগুরুর নিকট হইতেই তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কিছুকাল কামারপুকুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত ১৯৫২ সাল হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি চণ্ডীপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। বেলুড় মঠ, কাশী সেবাশ্রম, জয়রামবাটী ও ভুবনেশ্বর কেন্দ্রেরও কর্মিরূপে তিনি সংঘসেবা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ত্রাণকার্যেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

স্বামী মেধসানন্দ (মাধবন মহারাজ) গত ২৯শে মে সকাল ৫টায় কালিকট আশ্রমে রক্তের অস্বাভাবিক উচ্চ-চাপের ফলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর এবং বিগত কয়েক মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৭ সালে সংঘে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ত্রিবান্দ্রাম, রাজামহেন্দ্রী, কালাডি, তিরুবল্ল এবং পোনামপেট কেন্দ্রের কর্মিরূপে তিনি সংঘসেবা করেন। বেলুড় মঠে তিনি দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং ১৯৬৮ সাল হইতে শেষ পর্যন্ত কালিকট ও কুইলাণ্ডি আশ্রমে ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

শ্রীসারদা মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

গত ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৮২ (৮ই মার্চ, ১৯৭৬), সোমবার বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী কৈলাসানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দের শুভাগমন হয়। সন্ন্যাসিবৃন্দ ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীকে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া সুসজ্জিত মণ্ডপে পত্রপুষ্পে শোভিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির নিকট আসন গ্রহণ করেন। পরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণে বলেন :

'এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা সবাই ঠাকুরের ভক্ত। সেইজন্য আমি সাধারণভাবে সামান্য কিছু বলবো।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালিত হয়েছে। অনেক জায়গায় বক্তৃতাদি ও সম্মেলন

হয়েছে, নানারকম প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েরা যে কি ভাবে তাদের জীবন গড়বে তার কোন পূর্ণ চিত্র এই সব সভা-সমিতি ও তাদের কার্যকলাপ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাকে ব্লু-প্রিন্ট বলে, তেমন কিছু দেখছি না।

এসব দেখে রথ টানার কথা মনে হয়। যখন রথ টানা হয়, তখন উৎসাহে মত্ত হয়ে সবাই 'হরিবোল হরিবোল' বলে টানতে শুরু করে; রথ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অথবা রাস্তার ধারে চলে যাচ্ছে কিছুই তাদের খেয়াল থাকে না। কিন্তু যাঁরা পিছনে থাকেন তাঁরা ঠিক খেয়াল রাখেন—নৌকার হাল ধরার মতো—রথটি যাতে ঠিক পথে চলে।

এসব কনফারেন্স প্রভৃতিতে খুব উৎসাহ দেখা দিয়েছে, মেয়েদের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টাও চলছে। কিন্তু কি ভাবে, কোন্ প্রণালীতে উন্নতি হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। যারা মায়ের আদর্শ নিয়ে সারদা মঠে যোগ দিয়েছে ও মাকেই আদর্শ করেছে, তারা মার প্রদর্শিত পথেই জীবন গঠন করবার চেষ্টা করছে। আর যাঁরা মায়ের নামে সারদা সমিতি, সারদা সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন, তাঁরাও মায়েরই আদর্শ প্রচার করছেন। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের কনফারেন্স প্রভৃতিতে যে সব ভ্রান্তি ও সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, দেখতে হবে সেগুলি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের মেয়েরা যেন ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতি অনুসারে ঠিক পথে পরিচালিত হয়। সেজন্য তাদেরই হাল ধরে থাকতে হবে। ঠাকুরের বাণী বা স্বামীজীর আদর্শ যে তারা প্রচার করবে না, তা নয়। কিন্তু মুখ্যতঃ মায়েরই জীবন-আদর্শ মেয়েদের প্রচার করতে হবে, কারণ তারাই এবিষয়ে সর্বোত্তম যন্ত্রস্বরূপ।

বাইরের বহু দেশ ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে— বিশেষ করে মেয়েরা কি ভাবে জীবন যাপন করবে তার নির্দেশ পাবার জন্য। আর সেই ভারতের মেয়েরা যদি হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছেড়ে দিয়ে নানা রকম বিদেশী ভাব নিয়ে উন্নতির চেষ্টা করে, তাতে কোন সুফল হবে না। অতএব সারদা মঠ ও মায়ের নামে স্থাপিত বিবিধ সংঘগুলির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের উপরই এই বৃহৎ দায়িত্ব প্রধানতঃ ন্যস্ত।

সেজন্য তোমাদের সবাইকে যেন মা শক্তি দেন। তাঁর জীবনানুসারে জীবন গড়ে তুলে তোমরা ভারতবর্ষ তথা জগতের কল্যাণ করো। মায়ের আদর্শ ছেড়ে দিলে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতেরই অনিষ্ট।

আমি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করি, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমরা আজ ঠাকুরের মন্দিরের শিলান্যাসের আয়োজন করেছো, তা অচিরে পূর্ণ হোক। প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করেন আর শক্তি দেন, যাতে তাঁদের আদর্শ সারা ভারতে ও তার বাইরে তোমরা ছড়িয়ে দিতে পারো।'

স্বামী গম্ভীরানন্দ ও স্বামী ভূতেশানন্দও ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায় ৩০০ ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হয়। সকলেই ভিত্তিস্থানে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী গঙ্গার পূর্ব পারে দক্ষিণেশ্বরে ১৯৫৪ সালে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্তৃপক্ষ শ্রীসারদা মঠের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৫৯ সালে সাত জন সন্ন্যাসিনী গঠিত একটি ট্রাস্টের উপর উক্ত মঠ পরিচালনার সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৯৬০ সালে শ্রীসারদা মঠের অছিবৃন্দ বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের ১৯৭২-৭৪ বর্ষদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮২ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা কার্ত্তিক। (১৩০৬ সাল) [১৯শ সংখ্যা।]

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

যাই হউক এখন মন্‌সুনের সময়। যত ভারতমহাসাগরে জাহাজ পশ্চিমে চলবে, ততই বাড়বে এই ঝড় ঝাপট। মান্দ্রাজিরা অনেক ফল পাকড় দিয়েছিল তার অধিকাংশ, আর গজা, দধ্যোদন প্রভৃতি সমস্তই, ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট

জাহাজে মান্দ্রাজী যাত্রী।

কিনে, সুধু পায়ে জাহাজে চড়ে বস্‌লো। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন কখন জুতোও পায়ে দেয়। দেশে দেশে রকমারি চাল। ইউরোপে পা দেখান বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকতে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক্ বা না থাক্। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার ব্রহ্মবাদিন, মাইসোরি রামানুজি "রসম"-খেকো ব্রাহ্মণ। কামানো মাথায় সমস্ত কপাল যুড়ে "তেংকলে" তিলক। "সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে" এনেছেন দুটো পুঁটলি। একটায় চিড়াভাজা, আর একটায় মুড়ি মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে। আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিলো। তাতে একটু বেরাদারি-লোক গোল করবার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠে নি। ভারতবর্ষে ঐ টুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বল্লে, ত আর কার কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদিরি— কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচ শ, কোনটায় সাত শ, কোনটায় হাজারটী প্রাণী। কনের অভাবে ভাগ্‌নিকে বে করে। যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখতে গিছ্‌লো, তারা জাতচ্যুত হয়। যাই হক, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ-খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাকারী শিষ্য, জগতে অল্প হে ভায়া। মাথাকামান, ঝুঁটি বাঁধা, সুধু পায়ে, ধুতি পরা, মান্দ্রাজি, ফাষ্ট ক্লাসে উঠলো; বেড়াচ্ছে, চেড়াচ্ছে, ক্ষিদে পেলে মুড়ি মটর চিবুচ্ছে। চাকররা মান্দ্রাজি মাত্রকেই ঠাওরায় "চেট্টি" আর "ওদের অনেক টাকা আছে", "কিন্তু কাপড়ও পরবে না" "আর খাবেও না।" তবে আমাদের সঙ্গে প'ড়ে, "ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্ছে"— চাকররা বল্‌ছে। বাস্তবিক কথা,—তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে মান্দ্রাজিদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন, থক্ থকিয়ে এসেছে। [ক্রমশঃ]

---

* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

সংসারী ও উদাসী দুই বন্ধু; উভয়ে বড় প্রণয়; একদিন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে উভয় বন্ধুতে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল। আমরাও সেখানে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। কথাবার্ত্তাগুলি কিছু নূতন ধরণের; সচরাচর যেরূপ কথাবার্ত্তা শুনা যায়, সেরূপ নহে। পাঠকবর্গের তৃপ্তি হইবে এই বিশ্বাসে সেই কথাগুলি উদ্বোধনে পাঠাইলাম।

সংসারী।—তোমাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখি কেন? কাহারও সহিত বাক্যালাপ কর না, সর্ব্বদা কি চিন্তা কর?

উদাসী।—'সত্য' কি তাই ভাবি; 'শিব' কি তাই ভাবি; 'সুন্দর' কি তাই ভাবি।

স।—তোমার কথার ত কিছু মর্ম্ম বুঝিতেছি না। ভাবিয়া ভাবিয়া কোন্ দিন হয় ত খেপিবে।

উ।—আর্কিমিডিস খেপিয়াছিলেন; আমাদের শিবও খেপা।—আমার ভয় কি?

স।—তোমাকে যেন 'তত্ত্বজ্ঞানী' 'তত্ত্বজ্ঞানীর' মত ঠেকিতেছে। কিছু কি তত্ত্ব পাইয়াছ? পাইয়া থাক ত, আমাদিগকেও তোমার প্রাপ্ত ধনের অংশীদার করা উচিত। একা সন্দেশ খাইলে কি হইবে?

উ।—পাইলে হয় ত দিব। জানি না, দিব কি না দিব। সত্য, তুমি কোথায়?

স।—আচ্ছা ভাই, এস না; বেড়াইতে বেড়াইতে তোমার মনে দিবানিশি যে ভাবতরঙ্গ খেলিতেছে, তাহারই কিছু আমাকে দাও না,—তাতে কি দোষ?

উ।—দোষ কিসে নয়, জানি না,—তাই সত্য খুঁজিতেছি। নিখুঁত জিনিষ খুঁজি—নিখুঁত কিছু পাই না। চাঁদে কলঙ্ক, ভোগে রোগ, মানে অপমান। মৃত্যু—মৃত্যু ছায়ার ন্যায় জীবনের পশ্চাতে ঘুরিতেছে! আলোয় আঁধার; প্রণয়ে বিচ্ছেদ!

স।—তুমি যে Pessimist হইয়া গেলে দেখিতেছি। কেন, তুমি কি মান না, ঈশ্বর যা করেন সব মঙ্গলের জন্য? কবিবর টেনিসনের সেই অমরগীতি কি মনে নাই?—

And yet I believe through the ages
an increasing purpose runs;
And the minds of men are widened
by the process of the suns.

এই ছায়া, আজ যাহা তোমাকে কত ভীষণ বিভীষিকা দেখাইতেছে, কাল বুঝিবে, তাহাতে কত মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ও সব দুঃখ চিন্তা ছাড়িয়া দাও, সংসার আনন্দধাম। এখানে যা দুঃখ দেখিতেছ, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য।

উ।—(বিস্মিতভাবে) মঙ্গল! কি মঙ্গল?

স।—কেন? তুমি যাহাকে অমঙ্গল বল, তাহা ত এই,—ভূমিকম্প, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিদাহ ইত্যাদি। আচ্ছা, এই সকল দ্বারা আপাততঃ অনেক লোক মরিয়া গেল, অনেক পরিবারে হাহাকার উঠিল বটে, কিন্তু দেখ, উহাতে লোকসংখ্যা কমিয়া গেল, জগতের অধিকাংশ শস্য অল্প লোকে ভোগ করিতে লাগিল। ইহা কি ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল নহে?

উ।—কাহার কৌশল জানি না। কিন্তু সত্য কি উন্নতি হইল? লোকসংখ্যা কমিলে শস্য উৎপাদন করিবে কে? আর এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রণালীর মধ্য দিয়া না গেলে কি মঙ্গল হইবে না? আর 'মঙ্গল' 'মঙ্গল' যাহা বলিতেছ, তার সহিত আমার কি সম্পর্ক, যদি আমার বাঁচিবার আশা না থাকে?

স।—ক্রমোন্নতিবাদ তবে আর কি? ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই সমস্ত দোষ চলিয়া গিয়া সবই নির্দ্দোষ হইবে। ধরা স্বর্গধাম হইবে।

উ।—(হাসিয়া) কঠোর বৈজ্ঞানিকও কল্পনায় বদ্ধ! অসম্ভব আশা—ধরা স্বর্গধাম হইবে।

স।—তোমার যেরূপ চিন্তাপ্রণালী দেখিতেছি, যেরূপ সকল বিষয়ে দোষদর্শন দেখিতেছি, তাহাতে তুমি দেখিতেছি, কাযের বার হইবে।

উ।—ভাই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহাই হই।

স।—(সবিস্ময়ে) সে কিরূপ?

উ।—কাযের বার হওয়া ত বড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে ত আদর্শ; সে ত পরমার্থ। সেই খানেই যেতে হবে বটে; তবে যাই কিসে? যাইতে ত পারি না। কে যেন টেনে কাযে রেখে দেয়। কায দোষ ছাড়া নেই।

স।—ভগবান্ ত বলেছেন, কর্ম্ম সদোষ বটে, কিন্তু ছাড়িও না।

উ।—আমি ত ছাড়্‌তে চাই, সে যে ছাড়ে না।

স।—তবে কি কর্‌বে?

উ।—কি করি, তাই ভাবি। ততদিন ভাবিব, যতদিন এই টানাপড়েন থাকিবে—এই ব্যবহারিক পারমার্থিক থাকিবে—যতদিন এই দেবাসুর যুদ্ধ থাকিবে।

যখন আমি কেবল সুন্দর হব, তখন সবই কেবল সুন্দর দেখ্‌বো। তৃপ্তি ত আমার 'আমি'কে নিয়ে। 'আমি'কে ছেড়ে কোথাও যেতে পার? তাই কিছু নিখুঁত দেখায় না—আমি নিখুঁত নই ব'লে। কখন হবেও না।

চুলোয় যাক জগৎ। সব যেন সাধু হয়েছে—তাতে কার এসে যায়? ঢের লোক জগতের উপকার করেছে—কর্‌বেও ঢের লোক। কুকুরের লেজটাকে সোজা কর্‌তে পার? মনটাকে ঠিক ক'র্‌তে পার? কাযের লোক হবো না বল্‌ছিলে—তোমরা কাজের কি জান বল দেখি? কাযের মূলটা কোথা কিছু ভেবে দেখেছ? তোমরা সত্য চাও না—চাও কায। কাজটা কি।—নিজের আর পাঁচজনের শরীর পুষ্টির সব আয়োজন!! যেন শরীরটা অমর। অনিত্য জোড়া তাড়া দিয়ে আর কতক্ষণ রাখ্‌বে, একটু সাহসী হও, দেহাদি ভাব ছাড়; একটু সত্য

কথা শেখ; মন মুখ এক কর, প্রাণে হাত দিয়া কথা কও; একটু ভাবের ঘরে চুরী ছাড়। 'আমি আমি' 'আমার আমার' ক'রে ম'রছো, আমি যে কি তা বোঝ; একটু ব্যবহারিক দৃষ্টি ছেড়ে, পারমার্থিক দৃষ্টির বিকাশ কর। তখন দেখ্‌বে ব্যবহারিক কায কি সুন্দর হয়। আগে অন্তর সাফ কর, মন ঠিক কর। নিজেকে তোয়ের কর, পরে আসরে নেবো। আগে খুঁটী পাকড়াও, পরে ঘুরতে আরম্ভ কর। তা না হলে যে প'ড়ে যাবে। আগে পারমার্থিক কায শেখো, পরে ব্যবহারিকের কথা কহিও।

স।—ব্যবহারিক পারমার্থিক কি?

উ।—যার মধ্যে রয়েছি, তা ব্যবহারিক, যাহা কর্‌ছি তাহা ব্যবহারিক, দেখ্‌চি ব্যবহারিক, শুন্‌চি ব্যবহারিক, চল্‌ছি ব্যবহারিক। আর যা হওয়া চাই, যা হলে ভাল হয়, সকলের চেয়ে ভাল হয়, যা নিখুঁত, দোষস্পর্শহীন, তাই পারমার্থিক। হায়, কবে পারমার্থিক ধনে ধনী হব?

স।—আচ্ছা ভাই, আজ একটা ব্যবহারিক কাযের বড় তাড়া আছে, যেতে হবে। সময়ান্তরে দেখা হবে। ক্রমশঃ পারমার্থিকে যেতে চেষ্টা করা যাবে। বিদায়।

উ।—(শূন্যমনে) বিদায়। সত্য, কোথায় তুমি?

অন্নচিন্তা।

(৬)*

(বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে লিখিত।)

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, দেশমধ্যে নূতন নূতন ফসলের আবাদ করা। তাঁহারা বলেন, বন-জঙ্গলে, পাটের অন্যান্য জাতীয় যে গাছ জন্মে, তাহারই আবাদ করিলে দেশের অভাব ঘুচিবে। সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে পারিলে, অর্থাগমের একটী নূতন পন্থা উদ্‌ঘাটিত হইবে,—সিমূল বা হিমূল (cossava) আলুর আবাদ করিলে দুর্ভিক্ষকালে উপকার দর্শিবে। এই সকল পরামর্শপ্রদানকারীরা কিন্তু কেহ কখন নিজে কোন ফসলের আবাদ করিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে ঘোর সংশয় আছে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া সংবাদপত্রাদিতে বৃহৎ বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ইংরাজিভাষায় উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রীয় (Botanical) যে সকল বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আবিষ্কৃত যাবতীয় উদ্ভিদের গুণাগুণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে এবং সেই সকল বিবরণ দেখিয়া ইঁহারা একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। আবার যিনি অভিজ্ঞ বলিয়া নিজের জ্ঞান সাধারণে প্রচার করেন, তাঁহার অভিজ্ঞতার উৎপত্তি, এক ছটাক

* আষাঢ়, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

বা আধ কাটা জমির পরীক্ষা হইতে। এই ক্ষুদ্রতম স্থানের উপরে পরীক্ষাকরতঃ, বিঘা বা একার (acre) পরিমাণ জমির গড় পড়্তা আয় ব্যয় হিসাব করিয়া সাধারণকে লাভ দেখান; আর সেই কার্য্যে অপরকে প্রকারান্তরে প্রলুব্ধ করা কত দুর্নীতিসঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বলিতেও লজ্জা হয়, আমাদের কোন এক তথা-কথিত কৃষিবিদ্ বলিয়াছিলেন যে, experiment অর্থাৎ পরীক্ষা করিতে হইলে অপরের স্কন্ধে করা উচিত! ইহার প্রকৃত অর্গ যে কি তাহা বুঝিতে কি আর পাঠকের বাকী আছে? তথাপি বলি, উক্ত অভিজ্ঞতালাভেচ্ছু ব্যক্তি পরীক্ষার দ্বারা ভাবী লোকসানের ভার অপরের স্কন্ধে চাপাইতে চাহেন! এরূপ দেশহিতৈষিতাকে ধন্য।

তাহার পরে, যাঁহারা এইরূপ নূতন জিনিষের আবাদ করাইবার জন্য প্রয়াসী, তাহাদিগের ঈষৎ ভাবিয়া দেখা উচিত যে, দেশে পাটের অভাব হইয়াছে কি না। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল জেলাতেই অল্পাধিক পরিমাণে পাট জন্মিতেছে, এবং এতই সহজে ইহার আবাদ হইয়া থাকে, যে অপর বন্য গাছ হইতে পাট বাহির করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। অনন্তর ইহাও দেখা উচিত যে, তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত পাটের আবাদে খরচ কত, উৎপন্ন কত, লাভ কত? এ সকল বিশেষ কথা কিন্তু এনাগাইদ কেহ বলিতে পারে নাই। এই সকল বিশেষ কথা না বলিলে, লোকে চলিত-লাভজনক আসল পাটের পরিবর্ত্তে, অপ্রচলিত ও অনিশ্চিত লাভের ফসলের কেন আবাদ করিবে? সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয় স্বীকার করি, কিন্তু তাহার আবাদে বিঘা প্রতি খরচ কত, উৎপন্ন কত, বাজারে তাহার কাট্তী আছে কি না, এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ না করিলে কেন তাহাতে লোকে মনোযোগ করিবে? তাহার আবাদ করিয়া যদি কোন ব্যক্তিবিশেষ লাভবান হইয়া থাকেন, তবেই চাষীগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে, নতুবা চিরদিনই কালি-কলমে আবাদ চলিবে, খেতে-কোদালে হইবে না। জেরুজিলাম আর্টিচোক কিম্বা কাসাভার দ্বারা যদি দুর্ভিক্ষ নিবারিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ধান্য গোধূমের আবাদ না করিলেও চলে, কেন না, পূর্ব্বোক্ত ফসলসকল পুষ্টিকর, এবং শেষোক্ত ফসল অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ফসল প্রদান করে। গোধূম, ধান্য প্রভৃতি নিত্য আহারীয় শস্যের আবাদ ফেলিয়া, কবে দুর্ভিক্ষ হইবে, তাহার জন্য আর্টিচোক, বা কাসাভার আবাদ করিয়া ক্ষেত্র ও অর্থ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে কোন ব্যক্তিই প্রস্তুত হইবে না। আর দুর্ভিক্ষও প্রতি বৎসর হয় না, যে সকলে তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে। যদি নিতান্তই দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, তাহা হইলে তাহার ভাবী লক্ষণ কার্ত্তিক মাসেই বুঝিতে পারা যায়, এবং সেই সময় হইতে যদি জমীদার ও ধনীব্যক্তিগণ স্ব স্ব জমীদারী বা এলাকা মধ্যে তাবৎ ধান্য খরিদ করিয়া রাখেন, অথবা যাহাতে চাষীগণ ব্যাপারীদিগকে ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে ত সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণ বা উপশম করিবার ইহাই প্রধান ও একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদিগের ধারণা। দেশের কল্যাণের জন্য যাঁহাদিগের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তাঁহারা প্রকৃতই সাধু; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা একথা স্বীকার করিতে কখনই প্রস্তুত নহি যে, সাধুমাত্রেই অভ্রান্ত। সুতরাং বলিতে হয় যে, সকল সঙ্কল্প বা প্রস্তাবের পূর্ব্বে তাহাদিগের কার্য্যকারিতা কতদূর সম্ভব, তাহা বিবেচনা করিয়া তবে সাধারণ্যে তাহা প্রচার করা উচিত। দুর্ভিক্ষ নিবারণ করাই যাঁহাদিগের হৃদগত অভিপ্রায়, দেশমধ্যে যাহাতে

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারই উপায় অবলম্বন করিতে যত্নপর হওয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু সে উপায় কি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রধানতঃ দুইটী পন্থা আছে। প্রথম—দেশমধ্যে কৃষির বিস্তার; এবং দ্বিতীয়, কৃষি ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করা। কৃষিকার্য্য বিস্তার করিতে হইলে, দেশমধ্যে বহুলরূপে কৃষি-শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক এবং সেই কৃষিশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য প্রত্যেকের জমীদারীর মধ্যে, অথবা সন্নিকটস্থ কয়েকজন ভূম্যধিকারীর সম্মিলিত অর্থে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়া বিভিন্নপ্রকারে বিভিন্নজাতীয় ফসলের আবাদ করিয়া কৃষিজীবীদিগের কার্য্যতৎপরতা এবং কৃষির পরীক্ষিত উন্নতপ্রণালীসকল দেখিতে ও শুনিতে দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে অল্প মূল্যের কৃষিবিষয়ক পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়া ভদ্র ও শিক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। প্রতি জেলায় উপজেলায় শ্রমজীবীরায়তদিগকে লইয়া গ্রামস্থমণ্ডলদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া একটী একটী 'প্রজা-পঞ্চায়েৎ' নামধেয় মণ্ডলী সংস্থাপন করিতে হইবে, বৎসরমধ্যে দুইবার, না হয় একবার, উক্ত পঞ্চায়েতের উদ্যোগে, কৃষি-প্রদর্শনী হওয়াও বিশেষ স্পৃহনীয়।

দ্বিতীয় কথা, কৃষি-ব্যাঙ্ক। আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে ব্যাঙ্কিং কায বুঝেন না বললেই হয়। ব্যাঙ্কিং-কায অর্থাৎ টাকার 'লেন দেন' করা অতিশয় লাভজনক কায, ব্যবসায়ী জাতিমাত্র তাহা বুঝে। ইহাতে মহাজনের টাকা দ্রুতগতিতে যেমন বাড়িতে থাকে, ব্যবসায়ীও সেইরূপ উহাদ্বারা বহুল উপকার লাভ করিয়া থাকে। সচরাচর ধনীব্যক্তিদিগের টাকা কোম্পানির কাগজে বার্ষিক শতকরা ৩॥০ টাকা সুদে খাটিয়া থাকে, তেজারতিতে শতকরা বার্ষিক ১২ হইতে ২৫ টাকাতে খাটিয়া থাকে। কিন্তু গ্রাম্য তেজারতিতে এক ফসল মধ্যে অর্থাৎ খুব অধিক ধরিলেও, ছয় মাসের মধ্যে দেড়া বা দুনো মুনাফা পাওয়া যায়; অর্থাৎ রায়তকে একমণ ধান্য বা অন্য শস্য কর্জ্জ দিলে, পরবর্ত্তী ফসল কাটা হইবার অব্যবহিত পরেই মহাজন দেড় মণ বা দুই মণ শস্য ফেরৎ পায়। আমরা কষাই-তেজারতীর পক্ষপাতী নহি, সুতরাং কর্জ্জপ্রদত্ত রায়তের সময় অসময় না বুঝিয়া আপন আসল ও সুদ আদায়ের জন্য তাহার শোণিত শোষণ করিতে পরামর্শ দিই না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে নির্ম্মম হইতে হইবে, ইহা অতি নীচ ও ঘৃণিত প্রবৃত্তি। অর্থের দ্রুত পুনরাবর্ত্তনের মর্ম্ম যাহারা বুঝে, তাহারা অধিক সুদ ও উদ্বৃত্তির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মূলধন যাহাতে অধিকদিন না আবদ্ধ থাকে, তাহারই চেষ্টা করে। মূলধন যত অধিক বার ঘুরিবে, তত শীঘ্রই ব্যবসা বিস্তৃতি-ভাব ধারণ করে। আমরা যে মহাজনের দুর্নাম শুনিতে পাই তাহার কারণ এই যে, উহারা অর্থের দ্রুত পুনরাবর্ত্তের মর্ম্ম বুঝে না, সুতরাং নিরক্ষর রায়তদিগের প্রতি অযথা পীড়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। যাঁহাদিগের অর্থ আছে, তাঁহারা যদি কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ত যথেষ্ট অর্থলাভ হয়ই, তাহা ব্যতীত রায়তগণেরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। মহাজনের সুদের হার অতিরিক্ত বলিয়া, কৃষক বা শ্রমজীবিগণ পারৎপক্ষে ঋণ করিতে চাহে না, কিন্তু সহজে ও যথাহারে কর্জ্জ পাইলে তাহারা সেই অর্থে কায করিয়া যথাসময়ে অনায়াসে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

এইরূপ কৃষি-ব্যাঙ্ক থাকিলে, ভূ-কর্ষণকারী কৃষক ব্যতীত কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি অপরাপর শ্রমজীবিগণও তাহা হইতে অনেক সময়ে উপকার পাইতে পারে। অনেক সময়ে ইহারা অর্থাভাবে কায করিতে পারে না, কিন্তু অভাবের সময়ে সাহায্য পাইলে তাহাদিগের উত্তম হ্রাস হয় না, কিন্তু তাহা না পাইলে অল্পদিনমধ্যেই স্ব স্ব যন্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া কয়েকদিন অতিপাত করিয়া অবশেষে নিঃস্ব হইয়া পড়ে; তখন তাহাদের আর কোন উপায়ই থাকে না। পল্লীগ্রামাঞ্চলে কারীকরের অভাব—তাহার ইহাও একটী কারণ। গ্রাম্য কৃষি-ব্যাঙ্ক থাকিলে অনেক গৃহস্থ ভদ্রলোকেও কাজ-কারবার চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাঁচ শত টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক হইতে সম্বৎসরে অন্যূন পাঁচ শত টাকা যে লাভ হওয়া, সেটা কিছু বিশেষ কথা নহে।

কৃষি-ব্যাঙ্ক-মহাজনদিগের কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, এইবার আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিব। প্রথমতঃ টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার সুদ আদায়ে; দ্বিতীয়তঃ, কৃষকদিগের ক্ষেত্রজাত শস্য খরিদ করিয়া নিকটবর্ত্তী সহরে বিক্রয় করা এবং সহর হইতে জিনিষ পত্র খরিদ করিয়া গ্রামে আনিয়া বিক্রয় করা; তৃতীয়তঃ, অপরাপর শ্রমজীবীদিগের দ্রব্যাদিও খরিদ বিক্রয় করা আড়ৎদারী হিসাবে। এইরূপ সুপ্রণালীতে কার্য্য করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা আছে। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে এমন সুলভ উপায় আর আছে বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। তবে কার্য্য করা চাই। আলস্য ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া শরীর মনের সহিত কার্য্য করিলে ঈশ্বর তাহার সহায় হয়েন, ইহা প্রকৃত কথা।

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

অঙ্কা বলিল, "আমি সব করিতে পারি, বাপের মাথা কাটিতে পারি, মায়ের পেটে ছুরী দিতে পারি; আমায় দলে লও"। সর্দ্দারের হুকুমে আমার বন্ধন মোচন হইল। দলের ভিতর একজন অপরাধী ছিল, দলের নিয়মে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তাহাকে নরবলি দেবে না।—দেবীর সম্মুখে বলি হইলে উদ্ধার হইবে। তাহার কঠোর সাজা—যাহাতে ইহকাল পরকাল উভয়ই যায়! তাহার মরভেদী অপরাধ! সর্দ্দার বলিল, "ইহাকে বধ করিতে পার"? সেই খানে একখানি তলয়ার ছিল, বলিবামাত্র তাহার শিরচ্ছেদ করিলাম। সর্দ্দার কহিল "তুমি আমার দেহরক্ষক হইয়া থাক"।

নানাস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াই। একাই কত স্থান লুট করিয়া অর্থ আনি। একদিন মীরার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রচুর অর্থ পাইলাম। অর্থ লইয়া বাহিরে আসিতেছি;—বলবান প্রহরী ধৃত করিয়া আমাকে মীরার কাছে আনিল। মীরা আমাকে দেখিবামাত্র

---

* বৈশাখ, ১৩০৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

প্রহরীদিগকে বলিল, "এখনই বন্ধন মোচন কর"। পরে করযোড়ে আমাকে মিনতি করিতে লাগিল, "বাবা তোমার চরণে আমি বিস্তর অপরাধী। সামান্য অর্থের জন্য না জানি তোমার কতই ক্লেশ হইয়াছে। প্রহরীর তাড়না সহিয়াছ! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমার কি অর্থের প্রয়োজন বল? দিতেছি লইয়া যাও"। প্রথম মনে ভাবিলাম, আমায় লজ্জা দিতেছে। মীরার মুখ দেখিয়া মনে হইল,—'না এ কোন দেবী, আমায় বর দিবে'। তারপর ভাবিলাম পলাই; দ্রুতপদে ছুটিলাম, কেহ নিবারণ করিল না। আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। দেখি, বঙ্কা সর্দ্দারকে বধ করিয়াছে। বঙ্কাকে তখন চিনিতাম না। বঙ্কার একটী গাই ছিল। সর্দ্দার সেইটী খুলিয়া আনে। বঙ্কা দেখিতে পায়। বঙ্কা সর্দ্দারকে বলে, "এখন যুদ্ধ করিবে, কি কখন, বল? যদি আমায় বধ কর, আমার গাইটী নিরাপদে পাইবে। যদি তোমায় বধ করি, তোমার দলের লোককে বলিও যে, তাহা হইলে আমি তাহাদের সর্দ্দার হইব। যুদ্ধে বঙ্কা সর্দ্দারকে বধ করিয়াছে। বঙ্কা দলের সর্দ্দার—সকলে তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আমি বলিলাম, "কই, আমায় সর্দ্দার বলে নাই, আমি তোমার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি নাই। বঙ্কা বলে, "তবে যুদ্ধ কর"! আমি বলি, "ভাল"!—তিন দিন আমাদের যুদ্ধ হয়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর উভয়ের সম্মতি অনুসারে রজনীতে বিরাম করি; কিন্তু শত্রুতাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ জন্মিতে লাগিল। অপরাহ্নে হঠাৎ আমরা দুইজনেই সরিয়া দাঁড়াইলাম। বঙ্কা বলিল, "আরও কি যুদ্ধের প্রয়োজন"? আমি বলিলাম "না, দু'জনেই দলের অধ্যক্ষ হইলে হয়"। বঙ্কা তলয়ার ফেলিয়া দিল, আমিও তলয়ার ফেলিয়া দিলাম। পরস্পর আলিঙ্গন করিলাম। কিন্তু আমার আর দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি যতই ভাবি, কিছুতেই স্থির করিতে পারি না, কেন মীরা আমার বন্ধন মোচন করিল, কেন অর্থ দিতে চাহিল! মিনতি করিল কেন? আমার কাছে এই সকল কথা বিষম সমস্যা হইয়া উঠিল। এই চিন্তায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিলাম। কিছুই ভাল লাগে না! একদিন বঙ্কা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবিস্ কি"? আমি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। বঙ্কা বলিল, "তাই ত"! খানিক নিস্তব্ধ হইয়া বলিল, "পাগল হইবে"! আবার বলিল, "তাই ত"। কিছুই স্থির হইল না। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। কাহাকেও কিছু বলি না,—ঘুরিয়া বেড়াই। একদিন হঠাৎ এক মাগী আমার পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমায় বাঁচাও, একবার হরি বল"! আমি বলিলাম, "হরিবোল"। মাগী বলিল, "হরিবোল হরিবোল"! মাগীও বলে, আমিও বলি। ঐ মাগীই মীরা। তারপর সকল কথা বঙ্কা জানে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্কা আপনার কথা বলিতে লাগিল,—"আমার পিতা সামান্য লোক। চাস করিয়া খায়। আমার আর দুই তিন ভাই ছিল, তারাও চাসে যোগ দেয়। মা ভগ্নী সকলেই চাসের কাযেতে থাকে। আমাকেও ঐ সব কায করিতে বলে, আমার ভাল লাগে না। সহরের কাছেই বাড়ী। হামেসা সহরে আসি। সহরের বাড়ী, ঘর, লোকজন দেখিয়া প্রাণ জুড়ায়। [ক্রমশঃ]

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

দিব্য বাণী

অহং নৈব বালো যুবা নৈব বৃদ্ধো
ন বর্ণী ন চ ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ।
বনস্থোঽপি নাহং ন সংন্যস্তধর্মা
জগজ্জন্মনাশৈকহেতুঃ শিবোঽহম্‌॥

যদাকাশবৎ সর্বগং শান্তরূপং
পরং জ্যোতিরাকারশূন্যং বরেণ্যম্‌।
যদাদ্যন্তশূন্যং পরং শংকরাখ্যং
যদন্তর্বিভাব্যং তদেবাহমস্মি॥

—শংকরাচার্য : নির্বাণমঞ্জরী, ২, ১২

বালক যুবক বৃদ্ধ আমি নাহি হই,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আমি নই।
ব্রহ্মচারী নই আমি, নই গৃহবাসী,
বানপ্রস্থী নই আমি, নই তো সন্ন্যাসী।
জগতের সৃষ্টি-লয় যাঁহা হতে হয়,
আমি সেই শিবরূপ (—অব্যয় অভয়)।

আকাশের মতো যিনি সর্বগত পূর্ণ,
শান্তরূপ পরজ্যোতি আকারাদিশূন্য,
আদি-অন্ত-বিরহিত, যিনি বরণীয়,
হৃদয়ের হৃদয়েতে যিনি চিন্তনীয়,
'শংকর' যাঁহার আখ্যা (—ভুবনে বিদিত),
আমি সেই পরব্রহ্ম (—অক্ষর অমৃত)।

কথাপ্রসঙ্গে

অদ্বৈতভাব

১

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে মহাসম্মেলন হয়, তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হিসাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী সারদানন্দজী ইংরেজীতে যে স্বাগত-ভাষণ দেন, তাহা ভাষান্তরিত হইয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' -শীর্ষক প্রবন্ধের আকারে 'বিবিধ-প্রসঙ্গ'-নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সর্বসাধারণের পক্ষে উহার অন্তর্নিহিত সারগর্ভ কথাগুলির সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ১লা এপ্রিলের উক্ত ভাষণ ব্যতীত ৩রা, ৫ই ও ৭ই এপ্রিলও তিনি বক্তৃতা দেন, যেগুলি সহজপ্রাপ্য নহে। ৫ই এপ্রিলের বক্তৃতার বিষয় ছিল: শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আলোকে ধর্ম ও দর্শন। ঐ বক্তৃতার এক অংশে আছে: ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল মৌল ধ্যান-ধারণা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই এই তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত হয় যে, ঈশ্বরকে আমরা দর্শন করিতে পারি এবং তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারি, যেমন দুই ব্যক্তি পরস্পর আলাপ করিয়া থাকে। ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি আমাদের ঈশ্বরলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার সহিত পিতা সখা প্রভু ইত্যাদি কোন-না-কোন সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে এবং ভক্তির সহিত একাগ্রচিত্তে নিজ নিজ অবলম্বিত ভাবের অনুশীলন করিতে হইবে। অবশ্য ঈশ্বর সম্পর্কে অন্যান্য এবং সূক্ষ্মতর ধারণা বা ভাবসমূহ আছে, কিন্তু সেগুলির অনুশীলন সাধককে পরিণামে যে বিচারসহ সিদ্ধান্তে বা তত্ত্বে উপনীত করিয়া থাকে, সেই উত্তুঙ্গ তত্ত্ব-শিখরে আরোহণ করা এবং সেখানে অবস্থান করা অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

২

উপরি-উক্ত বক্তৃতাংশে ঈশ্বর সম্পর্কে যে 'সূক্ষ্মতর ভাবসমূহে'র উল্লেখ দেখা যায়, মনে হয়, তাহা নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক। কারণ, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই ভাবপঞ্চক সগুণ-ব্রহ্মাশ্রিত এবং ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া ধারণা করেন বলিয়াই সাধকগণ তাঁহাকে প্রভু পিতা মাতা সন্তান সখা পতি ইত্যাদি ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সহিত ঐজাতীয় ভাবাবলম্বন সম্ভব নহে। বিচারপ্রবণ সাধক নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে আত্ম-অভিন্নরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহারই নাম অদ্বৈতভাব। অদ্বৈতবেদান্তবিচার হইতেই এই ভাবের উদয় হয়। স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'সাধকভাব'-খণ্ডে 'মধুরভাবের সারতত্ত্ব'-অধ্যায়ে শান্তাদি ভাবপঞ্চকের সহিত অদ্বৈতভাবের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। উহা বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় অদ্বৈতভাব যেন শান্তাদি ভাবপঞ্চকের পরিপূরক ষষ্ঠ ভাব। তবে শান্তাদি পাঁচটি ভাব মূলতঃ এক শ্রেণীর এবং অধিকাংশ সাধকই ঐগুলি অবলম্বন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু এই

ষষ্ঠ ভাবটি উক্ত ভাবপঞ্চক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং মুষ্টিমেয় সাধকগণই ঐ ভাব অবলম্বন করিতে সমর্থ। সংসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সহিত আমরা যেভাবে সম্বন্ধযুক্ত, ব্যক্তি-ঈশ্বরের প্রতি সেই সেই ভাব আরোপ করা আমাদের সংস্কারাধীন হওয়ায় সহজসাধ্য। কিন্তু অদ্বৈত-ভাবের সহিত সাধারণ মানুষ পরিচিত নহে। উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। এই কারণে স্বামী সারদানন্দজী পূর্বোক্ত অধ্যায়ে লিখিয়াছেন: 'সসীম মানবমন আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ হয়, সে সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটি পৃথক্ অপার্থিব বস্তু।'

৩

কিন্তু যে বক্তৃতাংশটি লইয়া আমরা আলোচনা শুরু করিয়াছি, তাহাতে একটিমাত্র ভাবের কথা বলা হয় নাই—'সূক্ষ্মতর ভাবসমূহে'র উল্লেখ আছে। এই 'ভাবসমূহ' কী? মনে হয়, ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, অদ্বৈত-ভাব-অবলম্বনে সাধক অগ্রসর হইলে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশসহ তাঁহার চিত্তে প্রতিভাত হইতে থাকে এবং তদনুযায়ী তাঁহার ধারণাও স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। অদ্বৈত-ভাব অবলম্বন করা মাত্রই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং অদ্বৈতভাবেরও বিকাশ বা বিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং অন্তে সাধক নির্বিকল্পসমাধিসহায়ে অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন। অদ্বৈতজ্ঞানে অবশ্য বিবর্তন স্বীকার করা যায় না—কিন্তু অদ্বৈতভাবে উহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। মানুষ পড়িয়া-শুনিয়া একরূপ বোঝে, সাধনা করিয়া অন্যরূপ বোঝে এবং সিদ্ধ হইয়া আর একরূপ বোঝে। সকল সাধকেরই পক্ষে ইহা সত্য—যাঁহারা শান্তাদি ভাবপঞ্চকের সাধক তাঁহাদের পক্ষেও যেমন সত্য, যাঁহারা অদ্বৈতভাবের সাধক তাঁহাদের পক্ষেও তেমনই সত্য। সুতরাং অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিয়া যিনি সাধন করেন, তাঁহার অভেদবুদ্ধি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে, নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে; এইরূপ ধারণাসমূহই পূর্বোক্ত 'ভাবসমূহে'র অর্থ হইতে পারে।

৪

এই অদ্বৈতভাবের অধিকারী কাহারা? মুখ্যতঃ সন্ন্যাসিগণ। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, কোন কোন ভক্তসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে—আত্মার মহিমাদির কথা তাঁহারা বোঝেন না, শুনিলেও বলেন, 'ঐ-সকল কথা ছাড়িয়া সর্বদা ভাবে থাকো।' উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা সত্য। ঐরূপ করিতে করিতে তাঁহাদেরও ভিতর একদিন ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদের আর এক প্রকার ভাব। তাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়াছেন, অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির ন্যায় কোন একটি ভাব ভগবানে আরোপ করিয়া সাধনা করা, তাঁহাদের পন্থা কেমন করিয়া হইবে? সন্ন্যাসীদের নিকট ঐ-সকল ভাব সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় কঠিন।...

তাহার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলেন: 'এই আত্মার কথা সর্বদা বলবি, শুনবি, বিচার করবি। ঐরূপ করতে করতে কালে দেখবি, তোর ভেতরেও সিঙ্গি (ব্রহ্মসিংহ) জেগে

উঠবেন। ঐ-সব ভাব-খেয়ালের পারে চলে যা।'

এখানে লক্ষণীয় যে, শিষ্য সন্ন্যাসী নহেন—গৃহী। তথাপি স্বামীজী তাঁহাকে শান্তাদি ভাব-পঞ্চকের সাধনায় উদ্বুদ্ধ না করিয়া অদ্বৈতভাব-সাধনাতেই অনুপ্রাণিত করিতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অদ্বৈতভাব সন্ন্যাসিগণের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সন্ন্যাসিগণ অদ্বৈত-ভাবকে উপজীব্য করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবেন, ইহা তো স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়, কিন্তু গৃহীদের ভিতরও প্রাক্তন সংস্কারহেতু অদ্বৈতভাবের প্রবণতা থাকা সম্ভব। পক্ষান্তরে সন্ন্যাসীদের ভিতর ও দ্বৈতভাবের প্রবণতা থাকিতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী শিবানন্দজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: 'দ্বৈতবাদীদের পক্ষে সন্ন্যাস কেমন ক'রে সম্ভব?' পূজ্যপাদ মহারাজজী উত্তর দিয়াছিলেন: 'তা কেন হবে না? সন্ন্যাসের সার অর্থই হল এষণাত্রয়ের (পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা) সম্যক্‌রূপে নাশ। ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদী তো অন্য সমস্ত এষণা ত্যাগ ক'রে একমাত্র ভগবানকেই চায়, আর কিছুই চায় না। ভগবানই তো একমাত্র কাম্য বস্তু।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে কে কোন্ ভাবের অধিকারী তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। অধিকারবাদ সত্য—কিন্তু অধিকার নির্ণয় করে কে? এই পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ চাহিতেন অদ্বৈতবেদান্তের বাণী বিশ্বময় প্রচারিত হউক—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা হউক—গৃহী-সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, হিন্দু-অহিন্দু সকলেরই উহা বৌদ্ধিক সম্পত্তি হউক। তাহার পর যাঁহারা পারেন, যাঁহাদের ভাল লাগে, তাঁহারা অদ্বৈতভাব অবলম্বনে সাধন করুন; অপরে শান্ত-দাস্যাদি ভাব সহায়েই সাধনপথে অগ্রসর হউন।

আচার্য শংকরও, সন্ন্যাসিগণই অদ্বৈতভাবের অধিকারী—ইহা স্বীকার করিলেও, গৃহস্থগণের পক্ষেও বেদান্তবিচার করিতে যে বাধা নাই—ঐরূপ বিচারে যে তাঁহাদের পরম কল্যাণই হইবে অর্থাৎ পরিণামে তাঁহারাও যে অদ্বৈতভাবের পূর্ণ অধিকারী হইবেন, ইহাও স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য বলিতেন, "সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত—ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্যসেবকভাবে থাকবে। 'হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য—প্রভু, আমি সেবক—আমি তোমার দাস'।" লক্ষণীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের এই উক্তির অব্যবহিত পূর্বে এবং পরেও আছে, 'যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহং—এ ভাবটি ভাল নয়।' কোন সন্দেহ নাই, সাধারণতঃ সংসারীদের সুদৃঢ় দেহাভিমান থাকায় অদ্বৈতভাব তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী নহে। কিন্তু সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। এই কারণে গৃহীদের মধ্যেও অদ্বৈতভাবে সাধনা করিবার অনুকূল সংস্কার থাকিতে পারে। সে-সকল ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের দেহবুদ্ধি শিথিল। আরও কথা এই যে, কোন একটি ভাব সাধনা হিসাবে গ্রহণ করা এক জিনিস আর বুদ্ধিসহায়ে উহার ধারণা করা অন্য জিনিস—অদ্বৈতভাব সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে সত্য। সুতরাং সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও বৌদ্ধিক আলোচনাতে বাধা নাই।

৬

স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের ইচ্ছা ছিল, বাল্যকাল হইতেই মানুষ যেন সমস্ত দ্বৈতসংস্কার-মুক্ত হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে—

শৈশব হইতেই মানুষ যেন মদালসার ন্যায় জননীর কণ্ঠে—'বৎস, তুমি শুদ্ধ—কল্পিত নামরূপের অতীত'—এই বাণী শুনিতে অভ্যস্ত হয়। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক'—যীশুর এই বাণী উনিশ শত বৎসর ধরিয়া মানুষ শুনিয়াছে, কিন্তু উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে নাই—পাঠ ও আবৃত্তি করিয়াছে মাত্র। তাহারা যীশুকে মানবের পরিত্রাতা করিয়াছে। তিনি ঈশ্বর আর তাহারা কীট। সকল দেশেই এই ধরনের বিশ্বাস অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড।

এইজন্য স্বামীজী প্রায়ই কঠোর ভাষা ব্যবহার করিতেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—মানুষকে অদ্বৈতভাবে আকৃষ্ট করা।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে-স্বামীজী দ্বৈতভাব সম্বন্ধে কখনো কখনো কঠোর কথা বলিয়াছেন, তিনিই ভক্তিযোগ' ও 'ভক্তিরহস্যে' গ্রন্থায়িত বক্তৃতাগুলিও দিয়াছিলেন। যথার্থ আচার্যগণ এইরূপই হন—তাঁহারা স্থানকাল-পাত্রভেদে 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন' উপদেশ দিয়া মানুষকে সাধনপথে অগ্রসর করিয়া দেন। আর ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন, স্বামীজী সাধারণ আচার্য ছিলেন না —তিনি ছিলেন বিশ্বের মহত্তম আচার্যগণের অন্যতম। ব্যক্তিবিশেষের নিকট তাহার প্রয়োজনবোধে রূঢ় কথা বলিলেও আসলে তাঁহার ন্যায় কোমলহৃদয় ব্যক্তি জগতে চিরকালই দুর্লভ।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : ননু কার্যং স্বন্যূন-পরিমাণ-দ্রব্যারব্ধং, কার্যত্বাৎ পটাদিবৎ ইতি অনুমানাৎ সর্বস্য কার্যস্য স্বন্যূন-পরিমাণ-দ্রব্যারব্ধত্ব-নিয়মাৎ পরম্পরয়া পরমাণবঃ এব জগদুপাদানং, ন তু ব্রহ্ম, তস্য বিভুত্বাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—

মূলস্তোত্রম্ :

যস্মাদন্যন্নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং
দৃশ্যাদন্যো নির্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোঽপি সদা জ্ঞ-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥

যস্মাৎ ইতি। **যস্মাৎ** সচ্চিদানন্দ-স্বরূপাৎ বিষ্ণোঃ অন্যৎ পরমার্থাদি নাস্তি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছা. উ. ৬।২।১), 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ' (শ্বে. উ. ৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ইতি অর্থঃ। অনুমানস্য দীর্ঘ-বিস্তৃত-ক্ষৌম-দ্বয়ারব্ধ-রজ্জ্বাং ব্যভিচারাৎ আগমবাধিতত্বাৎ চ ইতি ভাবঃ। ব্রহ্ম পরমার্থতঃ জগদাকারেণ পরিণমতে ইতি ভাস্করমতম্ আশঙ্ক্য নিরাকরেতি—**অপি নৈবং পরমার্থম্** ইতি। এবং বিয়দাদি জগদাকারেণ অবস্থানং ন পরমার্থং ন বাস্তবম্ ইতি অর্থঃ। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্'

(শ্বে. উ. ৬।১৯) ইত্যাদিনা শ্রুত্যা নিরবয়ব-ব্রহ্মণঃ অংশতঃ জগদ্রূপপরিণামানুপপত্তেঃ। সর্বাত্মনা চ পরিণামে ব্রহ্মাভাব-প্রসঙ্গাৎ, পুনঃ প্রলয়কালে সচ্চিদানন্দাকারেণ পরিণামে চ ব্রহ্মণঃ অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গাৎ, সমুদ্রাদেশ্চ সাবয়বত্বেন অংশতঃ ফেনাদি-পরিণামে অপি অবস্থিতি-সম্ভবাৎ চ। ন ব্রহ্মণঃ জগদাকারেণ অবস্থানং বাস্তবম্।

সূত্রকারঃ অপি 'কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা' (ব্র. সূ. ২।১।২৬) ইতি পরিণামবাদম্ অদূষয়ৎ। স্পষ্টঃ অর্থঃ। 'তদনন্যত্বম্, আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' (ব্র. সূ. ২।১।১৪) ইতি বিবর্তবাদং চ অঙ্গীচকার। তদনন্যত্বং পরমার্থতঃ প্রপঞ্চ-তদ্ব্যতিরেকেণ অভাবঃ এব। আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' (ছা. উ. ৬।১।৪) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ইতি তস্য অর্থঃ। ততঃ জগতঃ মিথ্যাত্বাৎ ন জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ বাস্তবম্ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : (শঙ্কা) কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্য নিজ অপেক্ষা অল্পপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা আরব্ধ (নির্মিত) হয়, যেহেতু উহা কার্য, যথা পটাদি—এই অনুমান হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, সমস্ত কার্যই নিজ হইতে অল্পপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়—ইহাই নিয়ম। সুতরাং পরম্পরাক্রমে পরমাণু[১]-সকলই জগতের উপাদান অর্থাৎ (ন্যায়মতে) সমবায়ী কারণ, বিভু অর্থাৎ ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইতে পারেন না এই শঙ্কার উত্তরে (আচার্য শ্লোক-রচনা করিয়া) বলিতেছেন : (মূলস্তোত্র, শ্লোক ৪ ; পৃঃ, ৩৪১ দ্রষ্টব্য)।

অন্বয় : যস্মাৎ অন্যৎ ন অস্তি, এবম্ অপি পরমার্থং ন ; নির্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ (যঃ) দৃশ্যাৎ অন্যঃ ; জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-বিহীনঃ অপি (যঃ) সদা জ্ঞঃ, সংসারধ্বান্তবিনাশং তং হরিম্ ঈড়ে। ৪।

স্তোত্রানুবাদ : যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হরি ভিন্ন (পরমাণু আদি) অন্য কিছুই পরমার্থতঃ নাই ; আকাশাদি জগদাকারে অবস্থানও যাঁহার বাস্তবরূপ নহে ; জ্ঞানের অবিষয় ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যিনি যাবতীয় দৃশ্য হইতে ভিন্ন ; জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপ ত্রিপুটিভেদরহিত হইয়াও যিনি অবিদ্যোপহিত হইয়া সকলের জ্ঞাতা অর্থাৎ প্রকাশক ; সংসারের কারণীভূত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে আমি বন্দনা করি। ৪।

টীকানুবাদ : **যস্মাৎ**—যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিষ্ণু হইতে, **অন্যৎ**—অন্য (পৃথক্) পরমাণু আদি **নাস্তি**—নাই ; এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—'একমেবাদ্বিতীয়ং…কিঞ্চিৎ' ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, যাঁহার কারণ বা কার্য বলিয়া কিছু নাই, ইহাই অর্থ। দীর্ঘবিস্তৃত ক্ষৌমদ্বয়ের

১ সূক্ষ্ম অবয়ব হইতে স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি হয়—ইহাই নিয়ম। দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশ নির্ধারণ করিতে হইলে বিভক্ত দ্রব্যের এমন একটি সূক্ষ্মতম অংশ স্বীকার করিতে হয়, যে অংশটি নিজে অবিভাজ্য। দ্রব্যের এইরূপ অবিভাজ্য চরম সূক্ষ্ম অংশকেই পরমাণু বলে—ইহাই নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত।

দ্বারা নির্মিত রজ্জুতে (পূর্বোক্ত) অনুমানের ব্যভিচার হয় বলিয়া[২] এবং উহা শাস্ত্রবাধিত বলিয়াও (নৈয়ায়িক মত) গ্রাহ্য নহে - ইহাই তাৎপর্য।

ব্রহ্ম পরমার্থতঃ জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন, ভাস্করমতের এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিতেছেন—**'অপি নৈবং পরমার্থম্'**। **'এবম্'**—আকাশাদি জগদাকারে ব্রহ্মের অবস্থিতি, **'ন পরমার্থম্'**—বাস্তব নহে, ইহাই অর্থ। 'ব্রহ্ম নিষ্কল (অবয়বহীন), নিষ্ক্রিয়' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ নিরবয়ব ব্রহ্মের জগদাকারে আংশিক পরিণাম উপপন্ন হয় না। আর ব্রহ্মের সর্বাংশে পরিণাম স্বীকার করিলে (মূল ব্রহ্মেরই অভাবের প্রসঙ্গ হইবে। (জগদাকারে বাস্তব পরিণাম প্রাপ্ত) ব্রহ্ম পুনরায় প্রলয়কালে (স্বীয়) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে পরিণত হন, এইরূপ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ হইবে। (পরিণাম সাবয়ব বস্তুরই হয়—ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে—) সমুদ্রাদি সাবয়ব বলিয়া তাহার একাংশে ফেনাদি পরিণাম হইলেও (অন্যাংশে সমুদ্ররূপে) তাহার অবস্থান সম্ভব হয়। (অতএব) ব্রহ্মের জগদাকারে অবস্থান (অর্থাৎ নিরবয়ব ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম) বাস্তব নহে।

সূত্রকার (শ্রীবাদরায়ণ) ও 'কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ…বা' এই সূত্রের দ্বারা পরিণামবাদে দোষ দেখাইয়াছেন। ইহার অর্থ স্পষ্ট।[৩]

অধিকন্তু সূত্রকার 'তদনন্যত্বম্, আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ'—এই সূত্রের দ্বারা বিবর্তবাদ স্বীকার করিয়াছেন।[৪] (সূত্রস্থিত) 'তদনন্যত্বম্'—(এই শব্দের অর্থ—) ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জগতের

২ যে শণের দ্বারা রজ্জু নির্মিত হয়, তাহাকে ক্ষৌম বলে। দুইটি দীর্ঘ শণের দ্বারা নির্মিত রজ্জু, শণের পরিমাণ অপেক্ষা অল্পপরিমাণ অর্থাৎ ছোট হয়। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্য নিজের অপেক্ষা অল্পপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারাই নির্মিত হয়, এই নিয়ম এই স্থলে বাধিত হয়।

৩ সূত্রটি পূর্বপক্ষসূত্র। ইহার পূর্ববর্তী অধিকরণে বাহ্যসাধন-নিরপেক্ষ হইয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ হন, ইহা বুঝাইবার জন্য দুগ্ধের দধিভাবে পরিণতির দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তী কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ফলে ব্রহ্ম জগতের পরিণামী উপাদান, ইহা মনে করিয়া বর্তমান অধিকরণে পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছেন : নিরবয়ব ব্রহ্মই পরিণাম প্রাপ্ত হন, অথবা সাবয়ব ব্রহ্ম? প্রথম পক্ষে পূর্বপক্ষী দোষ দেখাইতেছেন—'কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ' অর্থাৎ নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলে সমগ্র ব্রহ্মেরই কার্যাকারে পরিণাম স্বীকার করিতে হয়; তাহার ফলে কার্যবস্তু হইতে ভিন্ন ব্রহ্ম থাকিবে না অর্থাৎ কারণরূপী ব্রহ্মের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে সাবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নিরবয়বত্ববোধক শ্রুতি ব্যাহত হয়।

৪ কার্য ও কারণ পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন—এই পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্রহ্মকারণবাদ এবং ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিকরণে যাহা বলা হইয়াছে, বর্তমান অধিকরণে তাহার প্রকৃত সমাধান বিবর্তবাদ অবলম্বনে করা হইতেছে। কার্য এবং কারণ—এই উভয়ের পৃথক পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ইহাই 'তদনন্যত্বম্'-শব্দের অর্থ। (তদনন্যত্বম্ তয়োঃ অনন্যত্বম্ অর্থাৎ কার্য ও কারণ উভয়ের অনন্যত্ব)। উপাদানকারণ-সত্তার অতিরিক্ত কার্যসত্তা নাই, ইহাই 'অনন্যত্ব'-শব্দের তাৎপর্য। ইহার যুক্তিরূপে শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইতেছে—'আরম্ভণ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। ('বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্'—ছা. উ. ৬।১।৪ ; 'ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বম্'—মু. উ. ২।২।১১ ইত্যাদি)।

পারমার্থিক সত্তা নাই। (সূত্রস্থিত) 'আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ'—(ইহার অর্থ—) 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' (ছা. উ. ৬।১।৪) অর্থাৎ বিকার (কার্যবস্তু ঘট, শরাবাদি) বাক্যের দ্বারা আরব্ধ (অর্থাৎ ব্যবহৃত হয় মাত্র), (কারণ) ইহা নামমাত্র (নামের অতিরিক্ত কার্যের বাস্তব সত্তা নাই), ইহাই তাৎপর্য। অতএব জগৎ মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বাস্তব নহে, ইহাই ভাবার্থ। [ক্রমশঃ]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

শ্রীশ্রীগুরুদেব জয়তি

বাগবাজার
১৯শে জুন †

কল্যাণীয়াসু রাসু

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত ও আনন্দিত হইলাম। আজ নিজ হস্তে পত্র তোমাকে লিখিতেছি। রামপ্রসাদ কেমন আছে? তাহাকে একজন ভাল ডাক্তার দেখান উচিত। কাল সকালে medical college-র জনৈক ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া রাখিব। আমার হাতের লেখা ভাল নয়, সেইজন্য পড়িতে পারিবে কিনা জানি না। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি **ব্রহ্মানন্দ**

একটি গান লিখিয়া পাঠাইলাম। গানটি নীরদ মহারাজ রচনা[১] ও সুর দিয়াছিল।

গৌড়সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অভয়ার অভয় পদ কর মন সার।
ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার ॥
অকর্ম্ম-জনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার ॥
ভ্রান্তিযুক্ত শান্তিহীন[২] হেলায় হারালে দিন।
এখন কর বিধান মন রে আমার ॥
আদিভূতা সনাতনী চরণ কর রে ধ্যান।
না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বদ্ধ আর ॥

* এই সংখ্যায় প্রকাশিত চারিটি পত্রই শ্রীমতী রাসুবালা দেবীকে লিখিত এবং শ্রীমতী রত্না সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ

† খামের উপর ডাকখানার ছাপ আছে: 19 JUN 18 (19th June 1918)।—সঃ

১ দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত সংগ্রহ" অনুসারে গানটির রচয়িতা রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)।—সঃ

২ উল্লিখিত "সঙ্গীত সংগ্রহ" ও বেলুড় মঠ হইতে প্রকাশিত 'সাধন-সঙ্গীতে' পাঠান্তর—"শ্রান্তিহীন।"—সঃ

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপদ
ভরসা

Ramkrishna Mission
Belur P. O. Howrah Dist.
13/3/1917

পরম কল্যাণীয়াসু—

মা রাণু, তোমার চিঠি যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে। আমরাও গত শনিবার শ্রীশ্রীকালী-মাতার দর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিনেই মঠে ফিরিয়া আসিয়াছি।

শ্রীযুক্ত হরি মহারাজ ও শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামী ভাল আছেন।

আমি ইতিমধ্যে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। তথায় খুব উৎসব হয়ে গেল।

মহারাজের আসিবার কোন সংবাদ নাই। তুমি কেমন আছ জানাইবে। তোমার মাতা ঠাকুরাণী ও দিদিমাতা ঠাকুরাণী এবং পিতা মহাশয় কেমন আছেন? তোমরা সকলে আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমরা ভাল আছি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
প্রেমানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

57, Ramkanto Bose St.
15. 10. 18
Calcutta

পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণুমাতা

কল্যাণীয়াসু

রাণু মা, তোমার প্রণাম পত্র (৺বিজয়া দশমীর) পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমাকে এখানে দেখিতে পাইলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিতাম। যাহা হউক প্রভুর কৃপায় কুশলে আছ, ইহাই পরম মঙ্গল। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল মনে হইতেছে। বগলের সেগুলি এখন আর নাই। একটু গরম কমিয়াছে বলিয়া তাহারা সারিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ প্রভুর কৃপায় অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করিতেছেন, তবে এখনও খুব দুর্ব্বল আছেন। কারণ আহারাদির সংযম এখনও রহিয়াছে। ঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই বেশ সুস্থ হইয়া যাইবেন, এইরূপ আশা করা যায়। পূজার সময় তাঁহার ৺কাশী যাওয়া না হওয়ায় অনেকেরই মনঃকষ্ট হইয়াছে,

কিন্তু উপায় নাই, প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় জানিয়াই সকলকে আশ্বস্ত হইতে হইয়াছে। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণাদি জানিবে।

কিমধিকম্
ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Sri Ramakrishna Asrama
Bull Temple Road,
Basavangudi P. O.
Bangalore City
13. 10. 1924

মা রাণু,

আমার শুভবিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইলাম। তোমার বাবার এবং রামপ্রসাদের কোন সংবাদ লেখ নাই। আশা করি তারা সব ভাল আছে। রামপ্রসাদ কি কচ্চে? আমার ৺কন্যাকুমারী এখনও যাওয়া হয় নাই। শরীর তত মন্দ নাই। এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল, একটু ২ শীতের আভাস দিতেছে। দাক্ষিণাত্যের অভূতপূর্ব্ব ভীষণ বন্যায় এবার একেবারে সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছে। দুঃখ দারিদ্র্য ভয়ানক পরে আরো হবে। অনেক জমির উপর ৪।৫ ৬।৭ ফিট করিয়া বালী জমিয়া রহিয়াছে। তাতে কয় বৎসর যে চাষ হবে না, তাহা বলা যায় না। প্রায় দেড় ক্রোড় যদি টাকা খরচ করিতে পারে তবে এক বৎসরের মধ্যে বালী উঠিয়ে দিয়ে চাষ কত্তে পারে, কিন্তু অত টাকা গভর্ণমেণ্ট দিতে পারিবেন কিনা বলা যায় না, সব লোকেরাও চাঁদা করে পারবে কিনা সন্দেহ, তবে এবিষয় লইয়া খুব চর্চ্চা হচ্চে। বোধ হয় ঠাকুরের কৃপায় কতকটা উপায় হতে পারে।

এখানকার আর ২ সকলে ভাল আছেন। মহাষ্টমীর দিন তোমরা মাকে দর্শন করিতে মঠে গিয়াছিলে এবং আনন্দলাভ করিয়াছিলে শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমার মাকে বাবাকে রামপ্রসাদকে আমার ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ দিবে। আর অধিক লিখিবার কিছু নাই। প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানকে খুব ভালবাস, মন প্রাণ তাঁতে ডুবিয়ে দাও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

কঠোপনিষৎ-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

যমরাজ নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছেন

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥

(১।২।১৩)

'মর্ত্যঃ'—মরণশীল জীব; 'এতৎ শ্রুত্বা'—এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ ক'রে, 'সম্পরিগৃহ্য'-সম্যক্‌রূপে তাকে পরিগ্রহণ ক'রে অর্থাৎ সম্পূর্ণ-রূপে তাকে স্বীকার ক'রে, আত্ম-অভিন্নরূপে তাকে গ্রহণ ক'রে, 'প্রবৃহ্য ধর্ম্যম্'—ধর্মসহায়ে লভ্য এই আত্মবস্তুকে অনাত্মবস্তু থেকে পৃথক্ ক'রে, 'এতম্ অণুম্ আপ্য'—এই সূক্ষ্ম যে আত্মতত্ত্ব তাকে লাভ ক'রে, 'মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা'—আনন্দের উৎসস্বরূপ এই আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে, 'মোদতে'—আনন্দ করে। এই ব'লে বলছেন, 'নচিকেতসং (প্রতি) সদ্ম বিবৃতং মন্যে'—নচিকেতার জন্য এই আত্মগৃহের দ্বার যেন উন্মুক্ত ব'লে মনে করি।

উপনিষদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে, এই আত্মতত্ত্ব প্রথমে শ্রবণ করতে হয়; তারপর মনন ও নিদিধ্যাসন করতে হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনটি হল আত্মদর্শনের উপায়। এখানে আমরা দেখছি, যমরাজ শুধু 'শ্রুত্বা' বললেন—শ্রবণের কথা বললেন। সুতরাং বুঝে নিতে হবে শ্রবণের সঙ্গে উপায়রূপে মনন ও নিদিধ্যাসনের কথাও বলা হয়েছে।

যমরাজ আত্মাকে অনাত্ম-বস্তু থেকে পৃথক্ করতে বলছেন। এই পৃথক্ করাটি একটি অপরিহার্য প্রণালী। কারণ, আত্মা আমাদের কাছে সর্বদাই প্রকাশিত। এই আত্মার আলোককে কেউ নেভাতে পারে না—'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে' (বৃহ. উ. ৪।৩।২৩) দ্রষ্টার যে দৃষ্টি তার কখনও বিলোপ হয় না। স্বপ্রকাশ বস্তুকে কেউই অপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নিত্য প্রকাশমান হোয়েও আত্মা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তার কারণ হচ্ছে, আমরা আত্মাকে পৃথক্ করতে পারি না। কিসের থেকে পৃথক্ করতে পারি না? অনাত্ম-ধর্ম থেকে। অনাত্ম-ধর্ম সরিয়ে দিলে তবে আত্মা স্বরূপে অনুভূত হবেন। একটা জবা ফুল স্ফটিকের পাশে থাকলে, সেই জবা ফুলের রঙটা স্ফটিকের উপরে প্রতিফলিত হয়ে স্ফটিকটাকে লাল দেখায়। এখন স্ফটিকের রঙ কি, তা যদি জানতে হয়, তা হলে জবা ফুলটিকে সরাতে হবে সেখান থেকে। সেই রকম আত্মার উপরে অজস্র প্রকারের অনাত্ম-বস্তুর প্রতিফলন হচ্ছে। তাই অনাত্মরূপে আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছেন, অথবা মিশ্রিতরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। জড়-ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে চেতন আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছেন। এই যে মিশ্রণ, এই মিশ্রণকে পৃথক্ না করলে আত্মার স্বরূপকে জানা যায় না। যমরাজ 'প্রবৃহ্য' ব'লে এই পৃথক্ করার কথাটি বললেন। এই পৃথক্ করার কথা নানান ভাবে শাস্ত্র বার বার বলছেন। 'বিবেক' মানেই হচ্ছে এই পৃথক্-করণ। সংস্কৃতে 'বিবেক'-শব্দের তাৎপর্যই হচ্ছে এই পৃথক্-করণ। আত্মার সঙ্গে অনাত্মধর্ম মিশে গেছে। আমরা

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

বুদ্ধির সাহায্যে খুব বিচার ক'রে সব অনাত্ম-ধর্মগুলি আত্মা থেকে সরিয়ে ফেলব, পৃথক্ করব। করলে আত্মা যেমন স্বপ্রকাশ আছেন, তেমনি স্বস্বরূপে প্রকাশিত থাকবেন। তাঁর প্রকাশের কোন তারতম্য হবে না। কেবল যে অনাত্ম-বস্তু তাঁর সঙ্গে মিশ্রিতরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল, সেগুলি সরে যাবে। যেয়ে আত্মা যা, তাই থাকবেন। যেমন স্ফটিকের কাছ থেকে লাল জবা ফুলটা যদি সরিয়ে দিই, স্ফটিকে কোন পরিবর্তন হবে না—স্ফটিক যা ছিল, তাই থাকবে। কেবল জবা ফুলের লাল রঙটা যা স্ফটিকের সঙ্গে অভিন্নরূপে আমাদের অনুভব হচ্ছিল, সেই উপাধি-ধর্মটা চলে যাবে। সেই রকম উপাধি-ধর্ম চলে গেলেই হয় আত্মস্বরূপোপলব্ধি। আত্মার স্বরূপের উপলব্ধির মানেই হল এই, আর কিছুই নয়। বাস্তব পক্ষে আত্মা কারো কাছে অজ্ঞাত নন। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সব সময় আত্মার উপলব্ধি হয়েও আমরা আত্মাকে স্বরূপে জানছি না। জানছি না এই জন্য যে, অনাত্ম-ধর্ম থেকে তাঁকে পৃথক্ করতে পারছি না। নানা উপাধি তাঁর উপরে নিজের নিজের ধর্ম আরোপ করছে। দেহরূপ উপাধি, তার ধর্ম তাঁতে আরোপ ক'রে আত্মাকে দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত মনে করাচ্ছে। ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিগুলি, তাদের ধর্ম আত্মাতে আরোপিত ক'রে আত্মাকে ইন্দ্রিয়-ধর্মী ক'রে দেখাচ্ছে। মন-রূপ উপাধি, তার ধর্ম আত্মাতে আরোপিত ক'রে আত্মাকে সুখ-দুঃখাদিবিশিষ্ট-রূপে দেখাচ্ছে। এই যে বিভিন্ন প্রকারের অনাত্ম-ধর্ম আত্মার সঙ্গে মিশে যেয়ে আমাদের একটা অবাস্তব প্রতীতি হচ্ছে, এটাই অজ্ঞান। অবাস্তব প্রতীতি কেন?—না, অনাত্ম-ধর্মগুলি সত্যি সত্যি আত্মাতে নেই, তবুও আত্মাতে যেন আছে, এই রকমের প্রতীতি হচ্ছে। কাজেই এই প্রতীতি অবাস্তব বা মিথ্যা। এই যে মিথ্যা ধর্ম যা আত্মাতে আরোপিত হচ্ছে, এইগুলিকে সরিয়ে ফেলতে পারলে, পৃথক্ করতে পারলে, আর আত্মাকে প্রকাশ করবার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় না, কোন প্রকারান্তর অবলম্বন করতে হয় না। আত্মা স্বপ্রকাশ। আত্মা আমাদের নিত্য ও অপরোক্ষ বস্তু। সব সময় আমরা আত্মাকে জানছি; অথচ সঠিক জানছি না এই জন্য যে, উপাধি-ধর্ম-মিশ্রিত-রূপে তাঁকে জানছি। এই যে মিশ্রিত জ্ঞান, যাকে শাস্ত্রদৃষ্টিতে আত্মার সম্বন্ধে ভ্রান্ত জ্ঞান বলে, সেই ভ্রান্ত জ্ঞানের জন্যে আমাদের এই সুখ-দুঃখাদি বোধ হচ্ছে, জন্ম-জরা-মৃত্যু হচ্ছে। যদি এই উপাধিগুলি আমরা আত্মা থেকে পৃথক্ করে ফেলতে পারি, আমরা আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ব। সমস্ত সংসারধর্মের অতীত যে আত্মতত্ত্ব আমাদের স্বরূপ, তাকে আমরা সংসারধর্ম-বিশিষ্ট-রূপে বোধ ক'রে হাহাকার করছি। ভাবছি আমাদের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হচ্ছে; বার বার এই রকম মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হচ্ছি; সংসারের নানা যাতনা সব সময় ভোগ করছি; হা-হুতাশ করছি; এর থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ উপায় অতি সোজা! অনাত্ম-বস্তু থেকে আত্মাকে পৃথক্ করো।

কথাটা তো খুব সোজা হল—পৃথক্ করো। করব কি করে? করতে যাই যখন, তখন দেখি যেন এমন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের ভেতর রয়েছি যা কিছুতেই কাটা যাচ্ছে না। শাস্ত্র বলছেন, আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের কোন অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে কি? বন্ধন তো নেই-ই, অসম্ভব সেটা। আলো আর অন্ধকার, দুটোকে এক সঙ্গে বাঁধা যায় না। অনাত্ম আর আত্মা, দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। তাদের ধর্মের মিশ্রণ

হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। কিন্তু এমন মোহগ্রস্ত আমরা যে, কিছুতেই এই সাধারণ কথাটি আমরা ধারণা করতে পারছি না।

আত্মা জরা-মরণ-গ্রস্ত হন না, অথচ আমরা নিজেদের জরা-মরণ-গ্রস্ত মনে করছি। 'আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ' (বৃহ. উ. ৪।৪।১২) —আত্মাকে যদি 'এই প্রকার আমি' এই ব'লে কেউ জেনে থাকে নিশ্চিতরূপে, 'বিজানীয়াদ্' —তত্ত্বতঃ জেনে থাকে যদি, তা হলে 'কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ'— কি ইচ্ছা করে, কিসের কামনায়, সে এই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জরা, অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হবে? দুঃখ হল শরীর-ইন্দ্রিয়াদির। আত্মাকে তা স্পর্শ করতে পারে না; সুখও স্পর্শ করতে পারে না। এই যে দুঃখের নামান্তর-রূপ সুখ, সে সুখও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। এইটি আমরা যদি বুঝতে পারি, তা হলে আমরা আর এই সুখ-দুঃখের দাস হয়ে থাকবো না। কথাটা সোজা। কিন্তু বিপরীত সংস্কার এমন দৃঢ় হয়ে আছে যে, কিছুতেই আমরা এই পৃথক্করণ করতে পারছি না। শাস্ত্র বলছেন, এটা অভ্যাস করতে হবে। ঠাকুর বলছেন নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকের কথা 'কথামৃতে' বারবার। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। এই যে নিত্য এবং অনিত্য, কিনা ঈশ্বর এবং জগৎ, বা ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান ও তার কার্য, এগুলিকে পৃথক্ করতে পারলে আর কিছু করবার বাকী থাকবে না। তখনই আত্মানুভূতি হবে।

আমরা বলি, আত্মাকে কি আর জানা যায়! শাস্ত্র তো পড়লুম। কিন্তু তাতে তো অনুভূতি হচ্ছে না!

অনুভূতি কথাটার মানে কি? অনুভূতি কি একটা কিছু আজগুবি কোন অবস্থা? তা নয়। অনুভূতি মানে অসন্দিগ্ধ, অবিপর্যস্ত জ্ঞান। যে জ্ঞানের ভিতরে কোন সন্দেহ নেই, কোন বিকার নেই, তাকেই বলে অনুভূতি। অর্থাৎ যেটি যা, সেটিকে ঠিক সেইভাবে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানার নাম অনুভূতি।

তবে পরোক্ষ জ্ঞানও আছে, যেমন শুনেছি যে, লণ্ডন একটা জায়গা আছে, তার এই রকম বর্ণনা। সেই বর্ণনা আর লণ্ডন দেখা দুটো কি এক হবে? যাতে লণ্ডন সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান হবে, তাকে বলব লণ্ডনের অনুভূতি। আর লণ্ডন সম্বন্ধে শোনা কথা হলে তাকে বলব লণ্ডনের সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান—একটা অস্পষ্ট ধারণা। সেই রকম শাস্ত্র পড়ে বা শুনে আত্মার সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ধারণা হয়, তাকে আমরা পরোক্ষ জ্ঞান বলতে পারি আর আত্মাকে যখন আমরা স্বরূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি তখন তাকে আত্মানুভূতি বলি।

এখানে অবশ্য আমাদের কথার ভেতরে একটু ত্রুটি থাকছে। লণ্ডন আমার থেকে ভিন্ন বস্তু, আমার থেকে দূরে। লণ্ডন সম্বন্ধে শোনা একরকম, আর সেখানে গিয়ে দেখা আর এক রকম। কিন্তু আত্মা তো আমার থেকে দূরে ন'ন! আত্মা তো সর্বদাই আমার সঙ্গে রয়েছেন, বা আমার স্বরূপরূপে রয়েছেন। সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে কি আর পরোক্ষ জ্ঞান হয়? এ সম্বন্ধে শাস্ত্র খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, আত্মা হলেন নিত্য অপরোক্ষ বস্তু—স্বপ্রকাশ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন; সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক বিষয়ে যে ধরনের পরোক্ষ জ্ঞান হয়— সেই ধরনের পরোক্ষ জ্ঞান কখনো হোতে পারে না। যেমন বই পড়ে লণ্ডনের জ্ঞান হচ্ছে পরোক্ষরূপে জ্ঞান। আমার থেকে দূরে, আমার ইন্দ্রিয়ের বাইরে,—এরকম

ভাবে জ্ঞান হচ্ছে। আত্মার সম্বন্ধে আমাদের কখনো ঐজাতীয় পরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে না ; যেহেতু আত্মা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছেন, আমাদের থেকে দূরে কখনো তিনি নন। কাজেই, ঘট পট আদি বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞানের মতো আত্মার পরোক্ষ জ্ঞান হয় না। শাস্ত্র বলেন পরোক্ষ জ্ঞান না হলেও আমরা একে পরোক্ষ জ্ঞান বলি এই জন্যে যে, আত্মার সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান আমাদের হচ্ছে না। 'পরোক্ষ-মিত্যনুল্লেখাদ্ অর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ'—(পঞ্চদশী, ৭।৫৪)—নিত্য অপরোক্ষ যিনি, তাঁকে পরোক্ষ-রূপে গ্রহণ করতে না পারলেও ফলটা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে পরোক্ষেরই মত। কারণ, শাস্ত্র থেকে আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান হচ্ছে না—আমাদের আত্মবিষয়ক সন্দেহ যাচ্ছে না। যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন জিনিসের হলে, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, আত্মার সম্বন্ধে ঠিক সেই রকম নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হচ্ছে না বলে, আমরা বলি যে, পারিভাষিক শব্দে একে পরোক্ষ জ্ঞান না বলতে পার, কিন্তু ফলটা একই দাঁড়াচ্ছে। এই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কাটছে না। সুতরাং, এই জ্ঞানকে বলবো পরোক্ষ ; অথবা বলবো এটা অপরোক্ষ জ্ঞান নয়।

শাস্ত্র অনেক শুনে বা পড়েও আমাদের অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় না। এর কারণ কি? শাস্ত্র বলছেন, আমাদের সংশয় বা সন্দেহের কারণ হচ্ছে দৃঢ় বিপরীত সংস্কার—দৃঢ়মূল বিপরীত সংস্কারই এর কারণ। অনেক দিন ধরে এই অনুভব যেন হয়েছে যে, ওখানে একটা সাপ দেখেছি। ভয়ে সেদিকে যাই না। 'ওটা সাপ নয়—দড়ি'—শুনলেও ভয় যায় না। সেদিকে গেলেই আবার সেই ভয়, ছ্যাক্ করে ওঠে বুকটা। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা! শাস্ত্র বলে দিলেন, আমরা জন্মমৃত্যুবিহীন আত্মা। কিন্তু আমাদের দৃঢ়মূল যে বিপরীত সংস্কার, সেই সংস্কারের ফলে আমাদের সন্দেহ যায় না। এই সন্দেহ যতদিন উঠবে, ততদিন আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হবে না। আর ততদিন জন্মমৃত্যুর হাত থেকেও নিষ্কৃতি পাবো না

সংশয় কখন যাবে? শাস্ত্র বলছেন, সমস্ত সংশয় চলে যাবে তাঁকে দেখবার পর। '…ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ…তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'। (মুণ্ডক উ. ২।২।৮)। তাঁকে দেখলে, তখন সংশয় যাবে। তাঁকে দেখবো কখন?—না, যখন সংশয় যাবে। কথাটা মনে হয় যেন হেঁয়ালির মত। সংশয় গেলে তবে তাঁকে দেখা, আর তাঁকে দেখলে তবে সংশয় যাওয়া—হেঁয়ালি বটে! কিন্তু হেঁয়ালি নয়, যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। অসন্দিগ্ধ জ্ঞান আর অপরোক্ষ জ্ঞান এক কথা। সম্পূর্ণ সন্দেহ-মুক্ত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান হলেই অপরোক্ষ জ্ঞান হল। তারপরে আর সংশয় হবে না। যতক্ষণ সংশয়ের অবকাশ আছে, ততক্ষণ আমরা তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলবো না। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, কেবল শব্দ শুনে আমাদের ঐ অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হবে না। অসন্দিগ্ধ জ্ঞানের জন্য এর আগের উপায়গুলি করতে হবে। সেই উপায়গুলি কি? 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্ত-মানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ।' (কঠ উ. ১।২।২৪)। খুব একটা দরকারী কথা—অসন্দিগ্ধ জ্ঞানের উপায়গুলির কথা—শাস্ত্র আমাদের এখানে বলেছেন। প্রথমে আচারশুদ্ধি। 'ন অবিরতঃ দুশ্চরিতাৎ'—যে দুশ্চরিত থেকে বিরত হয়নি, সে 'প্রজ্ঞানে'র দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা এই আত্মাকে পাবে না। তাই আচারশুদ্ধি চাই সর্বাগ্রে। আচারশুদ্ধি মানেই হচ্ছে, ঠাকুর যেমন এক কথায় বলেছেন

'মন মুখ এক করা', বা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এগুলির অনুশীলন করা। এই-গুলির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হবে। চিত্ত শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাজার বার শাস্ত্র-কথা শুনলেও, শাস্ত্রের তাৎপর্য আমাদের অন্তরে রেখাপাত পর্যন্ত করবে না। গোড়ার কথা সেইজন্য যে, দুশ্চরিত থেকে নিবৃত্ত হোতে হবে। 'ন অশান্তঃ'—যিনি ইন্দ্রিয়-গুলিকে সংযত করেন নি, তাঁর ঐ বুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্বের ধারণা হবে না। 'ন অসমাহিতঃ' —যিনি মনকে ধ্যেয় বস্তুতে কেন্দ্রিত করতে শেখেননি, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হবে না। 'ন অশান্তমানসঃ বা অপি'—ধ্যেয় বস্তুতে মনকে কেন্দ্রিত করার পর, নিদিধ্যাসনের অভ্যাস করার পর, মন যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ধ্যেয় বস্তুতে সমাহিত হচ্ছে, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় সমাধি বলি, সেই সমাধি হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান হবে না। 'সম্যক্ আধীয়তে ইতি সমাধিঃ'—মন সম্পূর্ণরূপে এই আত্মাতে অবস্থিতি করবে—এরই নাম সমাধি। ঠাকুর বলতেন: 'সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না।'

আত্মা এমনি একটি জিনিস, যাকে আমাদের দূর থেকে খুঁজে আনতে হবে না। আমাদের ভেতরেই তিনি রয়েছেন। আমাদের নিত্য সঙ্গী শুধু নন, আমাদের নিত্যস্বরূপ। তাঁকে ছেড়ে আমাদের কোন সত্তাই নেই। অথচ এমন দুরদৃষ্ট যে, সেই সত্তাকেই আমরা চিনি না। যাঁর সাহায্যে জগৎটাকে জানছি, তাঁকে জানছি না। এই হল আমাদের দুরদৃষ্ট।

আত্মাকে অসন্দিগ্ধভাবে জানতে হলে আত্মা সম্বন্ধে বার বার শুনতে হবে; ঠিক কথা—শ্রোতব্য; আত্মা সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করতে হবে; তাও ঠিক—মন্তব্য; বিচার করে যে তত্ত্ব পেলুম, তাতে চিত্তকে নিবিষ্ট করে রাখতে হবে—নিদিধ্যাসিতব্য। সবই ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে তার আগে দেখতে হবে, যে-মন দিয়ে এই অনুশীলনগুলি করবো, অভ্যাসগুলি করবো, সেই মনের প্রয়োজন মত শুদ্ধি হয়েছে কিনা। যদি মনের প্রয়োজনীয় শুদ্ধি না হয়ে থাকে, তা হলে সে মন এমন একটি যন্ত্র, যা কাজে লাগবে না। আমরা যদি একটা ভোঁতা তরোয়াল দিয়ে একটা জিনিস কাটতে চেষ্টা করি, সেটা কাটা যাবে না কখনো। তরোয়ালটাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কাজেই যন্ত্রটাকে তৈরী করতে হবে। এবং যন্ত্র তৈরী করবার উপায়গুলির কথা বলা হয়েছে এই শ্লোকে: 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ নাশান্তমা-নসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।' এইগুলি গোড়ার কথা। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলুম সবার আগে কি করতে হবে। গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে—মনের শুদ্ধির জন্য যা যা প্রয়োজন।

আর জগতে আমরা যা ধর্ম বলি, সে সবই এর ভেতরে এসে পড়ে। 'ধর্ম্য' অর্থাৎ ধর্মের দ্বারাই আত্মবস্তু লভ্য। যা কিছু ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত প্রণালী সবই মনের শুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা মন শুদ্ধ হলে তখন শাস্ত্র-বিচার আমাদের কাজে লাগবে। যতক্ষণ না মনের শুদ্ধি হচ্ছে, ততক্ষণ কাজে লাগবে না। আর মনের পূর্ণ শুদ্ধির মানে, যে-মন এখন আমাদের এবং আত্মতত্ত্বের মধ্যে আবরণ সৃষ্টি করে রয়েছে, সেই মন স্বচ্ছ হয়ে আমাদের ভেদজ্ঞান দূর করে দেবে, তখন আমরা যে আত্মা থেকে অভিন্ন এটা ঠিক ঠিক বোধ হবে। যদিও আত্মা সর্বদাই অভিন্ন, এখন ভিন্ন মনে হচ্ছে—এই ভ্রান্ত ভেদজ্ঞানটি তখন অপসারিত হবে। এই

হল প্রণালী। সুতরাং এই প্রণালী অনুযায়ী যদি চেষ্টা না করা হয়, তা হলে কেবলমাত্র পড়াশুনা ক'রে, বইয়ের পাতা উল্‌টিয়ে, ব্যাকরণ লাগিয়ে অর্থ ক'রে ফল কিন্তু কিছুই হবে না অর্থাৎ আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। শাস্ত্র এই কথা বার বার বলেছেন।

'প্রবৃহ্য'— কথাটি নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। এখন সূক্ষ্ম আত্মবস্তুর আপ্তি বা প্রাপ্তির কথা। 'অণুমেতম্ আপ্য'— পাওয়া কথাটির উল্লেখ করলেন যমরাজ 'প্রবৃহ্যে'র পর পৃথক্-করণের পর। ব্যাখ্যা-কাররা বলেছেন, পৃথক্-করণ আর প্রাপ্তি—এ দুটি ভিন্ন অর্থদ্যোতক শব্দ নয়। পৃথক্-করণের যখন পরিপূর্তি হয়, পৃথক্-করণ যখন পূর্ণ হয়, তখন আত্মবস্তুর যে বিশুদ্ধরূপে অনুভব হয়, তাকেই প্রাপ্তি বলা হয়, শাস্ত্র যাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' বলেছেন। পৃথক্-করণ আর অপরোক্ষানুভূতির মাঝে কোন অন্তরায় নেই —কোন মধ্যবর্তী সাধন নেই যার দ্বারা আত্মবস্তুকে পরে লাভ করতে হয়।

আমাদের প্রত্যেকের কাছে আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত। কারণ, আত্মা আমাদের স্বরূপ। যা আমাদের থেকে ভিন্ন, তাকে আমাদের চেষ্টা করে পেতে হয়। আত্মা আমাদের থেকে ভিন্ন নন। সুতরাং, তাঁকে পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যে অনাত্ম-ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিতরূপে আত্মার অনুভব হচ্ছে, সেই অনাত্ম-ধর্ম থেকে পৃথক্-করণ—এইটুকু করলেই আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এরই নাম প্রাপ্তি। প্রাপ্তির মতো যেন, বাস্তবিক প্রাপ্তি নয়। বাস্তবিক প্রাপ্তি তখনি সম্ভব যখন, যে-বস্তু আমার অপ্রাপ্ত আছে, তার প্রাপ্তি হয়। নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুর আর প্রাপ্তি হোতে পারে না। আমার খেয়াল নেই যে, আমার গলায় হার আছে। আমি চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। খুব ব্যস্ত হয়ে, ব্যাকুল হয়ে হারটা খুঁজছি। একজন দেখিয়ে দিল, আমার গলাতেই হারটা রয়েছে। হাত দিয়ে দেখলুম, তাই তো গলাতেই তো রয়েছে! কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, হারটা হারিয়ে গিয়েছিল, পাওয়া গেছে কি? বলতে হয়—হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে মানে যেমন হারিয়ে যাওয়া জিনিস দূর থেকে তাকে আবার সংগ্রহ করতে হয়, সেরকম করে পাওয়া যায়নি। অপ্রাপ্ত বলে যে একটা ভ্রম হচ্ছিল, সেই ভ্রমের যে দূরীকরণ, তার নাম হল পাওয়া। আত্মবস্তুর অপ্রাপ্তির বোধটা দূর হয়ে গেল। একেই বলা হয় পাওয়া। আরেকটা দৃষ্টান্ত বলি—ধান থেকে তুষ বাদ দিয়ে চাল পাওয়া। যখন আমি ধানটাকে হাতে নিয়েছি, চাল-টাকেও নেওয়া হয়েছে। চাল সেখানে আর অপ্রাপ্ত বস্তু নয়, কিন্তু তবু চাল পাচ্ছি না। তার মানে তুষের আবরণ থাকার জন্য ঐ চালটা আমার কাছে প্রাপ্ত হয়েও অপ্রাপ্ত। যখন সেই তুষটাকে সরিয়ে দেওয়া হল, তখন চালটির প্রাপ্তি হল। কি রকম প্রাপ্তি হল? অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির মত নয়, কিন্তু তুষের আবরণ থেকে বিমুক্তরূপে প্রাপ্তি হল। কাজেই যমরাজ যে 'আপ্য' বলে বলছেন, সেই আপ্তি বা প্রাপ্তি ঠিক অন্যবস্তুর প্রাপ্তির মত নয়। এখানে প্রাপ্তি মানে হল নিরাবরণরূপে অনাত্ম-ধর্ম-বর্জিতরূপে আত্মার অনুভব। এরই নাম প্রাপ্তি।

আগেই বলেছি পৃথক্-করণের পর আর কিছু বাকী থাকে না। পৃথক্-করণ পূর্ণ হলেই আত্মার অপরোক্ষানুভূতি। তারই নাম প্রাপ্তি। তারপরে যমরাজ যে কথাগুলি বলছেন, তাতেও কোনও ক্রম নেই ক্রমশঃ লাভ করার কোন ব্যাপার নেই। ঐ প্রাপ্তিরই বিশদীকরণ করা হয়েছে। এই যে আত্মবস্তুর প্রাপ্তি তাকেই

বিশদ করে বলা হচ্ছে, 'স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা'—সেই মোদনীয় আনন্দস্বরূপ যে আত্মতত্ত্ব তাকে লাভ ক'রে—'লব্ধ্বা', যিনি লাভ করেছেন, তিনি আনন্দ করেন -'স মোদতে'। এ সব কথা সেই আত্মবস্তুর অপরোক্ষানুভূতিকে বোঝাবার চেষ্টা মাত্র, এগুলি ক্রম নয়।

বাইরের একটা জিনিস, যে জিনিসটা আমাদের খুব দরকার বা খুব প্রিয়, সেই জিনিসটার প্রাপ্তি হলে তার পরে মনের ভেতরে সেই লাভের জন্য এক প্রকারের বৃত্তি হয়, সেই বৃত্তিকে আমরা সুখ বলি, আনন্দ বলি। প্রাপ্তির সঙ্গে সেই আনন্দের একটা ক্রম আছে। প্রথমে প্রাপ্তি, তার পরে আনন্দ। কিন্তু আত্মবস্তু তো নিত্যপ্রাপ্ত। সুতরাং এখানে আর ঐ রকম কোন ক্রম হচ্ছে না। পৃথক্‌করণের পর ক্রমে প্রাপ্তি, তা নয়। পৃথক্‌করণমাত্রই প্রাপ্তি। আবার প্রাপ্তির পর আনন্দের অনুভূতি তাও নয়। প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দানুভূতি; কোন ক্রম নেই। এই যে আনন্দ, এই আনন্দকে আনন্দাকার বা সুখাকার একটি বৃত্তি বলে না। যখন আমাদের কোন বাহ্য বস্তুর লাভ হয়, তখন আনন্দাকার বা সুখাকার একটা বৃত্তি হয়— অন্তঃকরণে একটি বিশেষ তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই যে নতুন তরঙ্গের উদ্ভব—সুখাকারা বৃত্তি—আত্মার ক্ষেত্রে, তা হয় না। কারণ আত্মা আনন্দস্বরূপ। আত্মার অনুভব মানে আনন্দস্বরূপের অনুভব। আত্মবস্তু আর আনন্দ— এ দুটি পৃথক্ বস্তু নয়; তাই পরস্পরের সঙ্গে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নেই। বাহ্য বস্তু লাভের পর আনন্দ হয়; এখানে সে রকম নয়। 'মোদনীয়ম্'—সেই আত্মবস্তু মোদনীয়। 'মোদনীয়' কথার মানে এই নয় যে, 'আনন্দের যোগ্য'। মোদনীয় মানে আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ সেই আত্মবস্তু লাভ ক'রে 'স মোদতে'। 'স মোদতে' কথার মানে 'সে আনন্দ করে'—তা নয়; মানে হল —সে আনন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকে; মোদন একটা নতুন কিছু বস্তু নয়, একটা ধর্মান্তরসৃষ্টির সূচক নয়। 'মোদতে' অর্থাৎ সে আনন্দস্বরূপে স্থিত থাকে। লৌকিক বস্তু লাভ ক'রে যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের সঙ্গে এই আত্মবস্তু-লাভের আনন্দের পার্থক্য এইখানে। অনাত্ম-ধর্ম থেকে আত্মাকে পৃথক্ করা মানেই হল আত্মপ্রাপ্তি, আত্মপ্রাপ্তি মানেই হল আনন্দানুভূতি, আনন্দানুভূতি মানেই হল আত্মস্বরূপে অবস্থিতি। লৌকিক বস্তু থেকে পার্থক্য এইখানে—কারণ এখানে ধাপে ধাপে কিছুই হচ্ছে না।

তারপরে নচিকেতাকে প্রশংসা ক'রে যমরাজ বলছেন, 'বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে' —নচিকেতার জন্য এই আত্মতত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত বলে মনে করি। 'সদ্ম' মানে গৃহ। সুতরাং যমরাজের কথার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছেঃ নচিকেতার জন্য গৃহ উন্মুক্ত, মনে করি। যেহেতু বলা হচ্ছে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, সুতরাং এখানে যে অর্থ সম্ভব, সেই অর্থ নিতে হবে। আত্মা বলে একটি পরিচ্ছিন্ন বস্তু নেই, যে পরিচ্ছিন্ন বস্তু কোন গৃহে থাকতে পারে। গৃহ মানেই হচ্ছে একটি পরিচ্ছিন্ন স্থান। আত্মা যদি পরিচ্ছিন্ন হন, তবেই তিনি সেই পরিচ্ছিন্ন স্থানে থাকতে পারেন। অপরিচ্ছিন্ন আত্মা পরিচ্ছিন্ন গৃহে থাকতে পারেন না। সুতরাং এখানে গৃহ মানেই হচ্ছে সেই আত্মস্বরূপ। গৃহ নয়, 'গৃহ ইব', 'সদ্ম ইব সদ্ম'—যেন গৃহ। তা হলে দাঁড়াল এই যে, সদ্ম মানে আত্মস্বরূপ। এই আত্মস্বরূপ-অনুভূতির জন্য নচিকেতার কাছে দ্বার উন্মুক্ত, অর্থাৎ নচিকেতার কাছে এই আত্মবস্তুকে আবরণ করে, আচ্ছাদিত করে,

এমন আর কোন কিছুই রইল না। দরজা খোলা—বাধা আর রইল না। আত্মতত্ত্বের অনুভূতির কোন বাধা আর নচিকেতার জন্য রইল না, এই রকম মনে করি। 'মনে করি' বলার তাৎপর্য এই যে, এখনও অবধি নচিকেতাকে উপদেশ পূর্ণরূপে দেওয়া হয়নি। নচিকেতা উপদেশপ্রার্থী। তাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করা হয়েছে মাত্র। তা সত্ত্বেও যমরাজ বলছেন যে, নচিকেতার কাছে দরজা খোলা। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে, নচিকেতা এই আত্মতত্ত্বের অধিকারী। 'হবে' আর 'হয়েছে' প্রায় সমানার্থক। অদূর ভবিষ্যতে এই আত্মতত্ত্ব নচিকেতার করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবে, এই বলে নচিকেতাকে প্রশংসা করলেন যমরাজ।*

* ৮ই ও ১৫ই জুন ১৯৭৫, রবিবার প্রাতে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যার কিয়দংশ। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় পর্যায়

বিশ্বমেলায় স্বামীজী

এক

ঠাকুরের নির্দেশে স্বামীজী গেলেন আমেরিকায় বিশ্বমেলায় যোগ দিতে। স্বামীজী বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নিশ্চিত জেনে নিয়েছিলেন যে এ-যাওয়া তাঁর নিজ ইচ্ছায় হচ্ছে না পরন্তু ভগবদ্-ইচ্ছায় হচ্ছে। ঠাকুর তাঁকে স্পষ্টতঃই সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

লোকব্যবহারে স্বামীজী ছিলেন তীব্রভাবে স্বয়ংভর। কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি পদে পদে পরীক্ষা করে নিয়েছেন তিনি ভগবচ্চালিত হয়ে এ কাজ করছেন কিনা। যিনি তাঁকে ব্রত দিয়ে বলেছিলেন, 'তোর হাড় করবে', তাঁকেও তিনি ছাড়েন নি নিজের হাড়ে হাড়ে জড়িয়ে রাখতে! বস্তুতঃ তিনি ছিলেন তাঁর চৈতন্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট।

চিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজী যে দিন প্রথম ভাষণ দেন, সেদিন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমন এক শ্রীযুক্তা এস্. কে. ব্লজেট ঐ দিনের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'আমি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের চিকাগো ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই যুবকটি উঠে যখন বললেন "আমার আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইরা," তখন সাত হাজার[৪৭] নরনারী এমন কি একটা বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনার্থ উঠে দাঁড়াল যা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ ছিল না। যখন বক্তৃতা শেষ হল, দেখলাম, দলে দলে নারীরা তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য বেঞ্চি ডিঙিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তখন মনে মনে বললাম: বাছা, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখতে পার তো তুমি ভগবান।'[৪৮]

৪৭ উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা ঠিক সাত হাজার ছিল না, কিছু কম ছিল।

৪৮ স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড (১৩৭৩), পৃঃ ৩১-৩২

এই মহিলাটি নিজের অজ্ঞাতসারে একটি পরমসত্য প্রকাশ করেছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ সত্যি জানতেন না তাঁরা 'এমন কি একটা বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনার্থ উঠে' দাঁড়ালেন। এ যে সব-দিয়ে-ফকির-হওয়া ঠাকুরের বিবেকানন্দের মুখনিঃসৃত বাণীরূপে পুনরাবির্ভাব। এ রহস্য স্বামীজী নিজে পরে প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজীর কণ্ঠস্বরে কম্পিত-ঝংকৃত সে দৈবশক্তি শ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করে তাঁদের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল এক অনভিজ্ঞাত অনুভূতিতে। তাঁরা যুক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে জেনেছিলেন বিবেকানন্দের মধ্যে এমন এক সত্তা আছে, যা 'জগবন্দন', যা সকলের অতি আপনার, কারণ তা 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'।

এমন একটি অল্পশব্দ বক্তৃতা দিয়ে, যাতে দৈনিক পত্রিকার একটি স্তম্ভও ভরে না, স্বামীজী যে জগদ্‌বিখ্যাত হলেন, তার অতীন্দ্রিয় কারণ এই যে, তিনি বিশ্বজননীর স্বকীয় যন্ত্র, যাতে রয়েছে অবতীর্ণ ভগবানের গচ্ছিত সকল দুঃখনাশক শিক্ষাদায়ক মহাশক্তি।

স্বামীজীর যশকীর্তনে চিকাগো শহর উল্লসিত, মুখরিত। সেদিন রাত্রিতে ঐ শহরের এক ধনকুবেরের গৃহে অতিথি স্বামীজী। জাঁক-জমকপূর্ণ পরিবেশ। স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে পালক-শয্যা। শয্যায় শয়ন করা মাত্র ভারতের জনগণের দুঃখদীর্ণ দুর্দশার কথা মনে হওয়ায় তাঁর বিশাল হৃদয় বেদনায় মথিত হয়ে উঠল। চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল। সে শয্যা অসহ্য হওয়ায় তিনি মেঝেতে লুটিয়ে অন্তরে অন্তঃপুরবাসিনীর পাদমূলে কাঁদতে লাগলেন :

'মা, আমার স্বদেশ যেকালে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সেকালে মানযশের আকাঙ্ক্ষা কে করে? গরীব ভারতবাসী আমরা এমনি দুঃখময় অবস্থায় পৌঁছেছি যে, লক্ষ লক্ষ আমরা এক মুষ্টি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করি, আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ভারতের জনতাকে কে উঠাবে? কে তাদের মুখে অন্ন দেবে? মা, দেখিয়ে দাও আমি কি করে তাদের সেবা করতে পারি।'[৪১]

তাঁর জীবনে একটি বিশেষ গৌরবের দিনে, স্বদেশের দুঃখীর জন্য স্বামীজীর এই যে তীব্র বেদনাবোধ ও মায়ের কাছে দুঃখ দূর করার উপায় দেখানর জন্য আকুল প্রার্থনা—এতে আমরা দেখতে পাই স্বামীজী তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় কেমন দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। স্বদেশের দুঃখ দূর করাই হয়েছে তাঁর অন্তরের ধর্ম-ব্রত, সভায় বক্তৃতা দেওয়া যেন বাইরের কাজ।

বিশ্বমেলা শেষ হবার পর নানাদেশাগত সদস্যগণ নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু স্বামীজী আমেরিকায় থেকে গেলেন প্রায় তিন বছর এসেছিলেন বিশ্বমেলায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে ভারতের অবহেলিত, বুভুক্ষু দুঃখী জনগণের ঐহিক অবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গতি সংগ্রহ করতে। কিন্তু কি যেন হয়ে গেল! নিতে এসে দিতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অশেষ আয়াস স্বীকার করে ধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর অমিত আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়োগ করে গভীরতম অনুরাগের সহিত আমেরিকাবাসীর আত্মিক সেবায়

৪১ তদেব, পৃঃ ৩২

রত রইলেন। যেন সে দেশেরই সন্তান, সেদেশের পারমার্থিক উন্নতি সাধনেই তাঁর জীবনের সার্থকতা। সঙ্গে সঙ্গে পত্রযোগে চলল সংঘের ও দেশের কাজের গতি নির্ণয়ন ও অনুগামীদের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দান। কিন্তু ভারতের কাজ যেন গৌণ, আমেরিকার কাজই যেন মুখ্য।

পরিকল্পনাহীন স্বামীজী তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় রত থেকে সম্যক্ জেনেছেন যে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখছেন :

'......প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নাম-যশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই ; বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ প্রীতি ও ভক্তি করে, আর শত শত পাদ্রী ও গোঁড়া ক্রিশ্চান শয়তানের সহোদর মনে করে। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্', আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য! যে শহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়াছে— Cyclonic Hindu. তাঁহার ইচ্ছা মনে রাখিও—I am a voice without a form.

ইংলণ্ডে যাব কি যমল্যাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় করে দেবেন।...'[৫০]

একই পত্রে তাঁর বাণীর বাতায়ন-পথে তাঁর অন্তরে প্রস্ফুট রামকৃষ্ণ-মানসিকতাকে আমরা দেখতে পাই। তিনি লিখছেন তাঁর নিজস্ব বঙ্গ-ইঙ্গ মণিপ্রবালে :

'তোমায় বলি ভায়া, যেমন চলছে চলতে দেও ; তবে দেখো কোন form যেন necessary না হয়, unity in variety—সর্বজনীন ভাবের যেন কোনমতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed, if necessary, for that one sentiment—universality. আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখবে যে, সর্বজনীনতা—Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others. ঐ দ-এ বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটি দেখাতে হবে, মনে রেখো। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চলবে।'[৫১]

তাঁর যা দেবার ছিল জগৎকে, তিনি অনেকাংশে আমেরিকার জনগণের সমুখেই নিবেদন করেন। সেই সব ভাবোদ্দীপক প্রাণস্পর্শী বাণী যা শুনে মানুষ উঠে বসত আত্মসম্বিতে আমেরিকাতে, সেই সব বাণী ভারতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে জাগিয়ে তুলল নিদ্রিত জাতিকে।

কিন্তু বিবেকানন্দ কেন ফিরে আসছেন না দেশে অবিলম্বে? অধীর দেশবাসীর দিক থেকে যখন এ নালিশ তাঁর কাছে যেয়ে পৌঁছতে থাকল, তিনি প্রত্যুত্তরে একটি সত্য প্রকাশ করলেন, যা আমেরিকায় আসার পর শ্রীরাম-কৃষ্ণ-সাধনরত বিবর্তিত বিবেকানন্দের অন্তরের সত্য আলেখ্য। তিনি লিখলেন আলাসিঙ্গাকে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে : '...আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি। ...আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না, আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—

৫০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (১৩৬৯), ৭।২৪

৫১ তদেব, ৭।২৫-২৬

এখন তোমরা নিজেদের সামলাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা আর বাজে ব'কো না।'[৫২]

দুই

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন তাঁকে লিখিত আদেশ-চাপরাশ দেন 'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে' নরেন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন: আমি ওসব পারব না।' ঠাকুর বলেছিলেন: 'তোর হাড় করবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে একজনকে চিঠিতে লিখছেন:

'তোমাকে চিঠি লেখবার পর আমার ছাত্রেরা আবার এসেছে আমায় সাহায্য করবার জন্য; ক্লাসগুলি এখন খুবই সুন্দরভাবে চলবে, সন্দেহ নেই।

'এতে আমি খুব খুসী হয়েছি, কারণ শেখানো ব্যাপারটা আমার জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য ও বিশ্রাম যেমন প্রয়োজন, আমার জীবনে এও তেমনি প্রয়োজন।'[৫৩]

যে ভারতাত্মা বিবেকানন্দ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, বিশ্বখ্যাতি লাভের পর, রাত্রিতে শয়নকক্ষের মেঝেতে লুটিয়ে, 'আমার স্বদেশের' অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে দুঃখে বালকের মত কেঁদেছিলেন—১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে, তাঁর স্বদেশ হয়ে গেছে সারা পৃথিবী, সকল পরজন হয়ে গেছে আপনজন। তবু কে না জানে তাঁর অতল ভারত-প্রেমের কথা! শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক বিবেকানন্দের এই যে আভ্যন্তরীণ বিবর্তন, এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর গুরুদত্ত ব্রত উদ্‌যাপনে রত থাকার অজ্ঞাত ফলশ্রুতির মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ যেহেতু অবতীর্ণ ভগবান, সমগ্র জগতের জন্য তাঁর আসা, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জীবের দুঃখ দূর করার ব্রত দিয়েছিলেন, শুধু ভারতীয় জীবের দুঃখ নিরসনের ব্রত দেন নি। ঠাকুরের স্বলিখিত আদেশ ছিল: "নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে।" ভারতবাসীকে শিক্ষা দিবে একথা লিখেন নি। আমেরিকায় সাধনরত স্বামীজী আবিষ্কার করলেন মানুষের দুঃখের আর এক দিক।

ঐ দেশের লোকদের চোখে চেয়ে, হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দেখলেন দুঃখ শুধু বঞ্চিতের নয়, বুভুক্ষুর নয়, যাঁরা সম্পন্ন, যাঁরা ভাল খান-পরেন, যাঁদের অনেক বিলাস-বৈভব তাঁদেরও। জগতে যে দুঃখের শেষ নেই। যাঁদের অনেক আছে, তাঁদের যেন আরো বেশী বাসনা, দৈন্য ও ভয়—দুঃখ!

আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনরত বিবেকানন্দ এ সত্য ঐ দেশে আবিষ্কার করে জেনেছিলেন যে, তাঁর ব্রতভূমি সমগ্র জগৎ—তাঁর শিক্ষা দেওয়া সকল মানব-জাতির উদ্দেশ্যে।

তিনি যে শিক্ষা আমেরিকার জনগণকে দিলেন, তার বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে, তা সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রযোজ্য।

তিনি শিক্ষা দিলেন জীবের দেবত্ব, অস্তিত্বের একত্ব, ধর্মের এককেন্দ্রিকত্ব ও মানুষের অপরাজেয়ত্ব। তিনি শিক্ষা দিলেন বেদান্ত, যা জীবের শিবত্বকে যুক্তিসহায়ে প্রমাণিত করে। তিনি শিক্ষা দিলেন যোগ, যা সাধন করে জীব নিজের দেবত্বকে অনুভূতিতে অভিজ্ঞাত হয়ে ধন্য হয়, মুক্ত হয়। তাঁর

৫২ তদেব, ৭।১৫৩

৫৩ তদেব, ৮।২০৯

তরঙ্গ-ভঙ্গে তাই, 'তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং'। সেই হেতু স্বামীজীর বাণী ঈশাবতরণের একটি আধুনিক প্রকাশ-ভঙ্গিমা।

পাশ্চাত্যে যাবার বহুপূর্ব থেকেই স্বামীজী তাঁর গুরুদত্ত ব্রত-পালনার্থ ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে বদ্ধপরিকর ছিলেন। মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ'-শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: 'আমেরিকা যাইবার জন্য মাদ্রাজ ছাড়িবার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার মনে এই সঙ্কল্পগুলি ছিল:…'।[৫৬] পাশ্চাত্যে থাকা কালে তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, ভারতের জাতীয় কৃষ্টিতে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত যে অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে, তা জগতে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য শুধু নয়, জগতের মানুষের বাঁচার জন্যই তা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। বিশ্বাত্মা বিবেকানন্দ যে ভারতকে এত ভালবাসলেন সেটা কোন ভৌগোলিক পৌত্তলিকতা নয়। এটি তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার একটি যজ্ঞপীঠ। জীবের দুঃখ দূর করার জন্যে ঠাকুর স্বামীজীকে তাঁর প্রেম-সংবাহকরূপে নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন।

দুঃখ দূর করার মূল সূত্র জীবকে অধ্যাত্ম সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা। বহুযুগের সাধনায় ভারতের মানুষ এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিল। সে অধ্যাত্ম সম্পদ যদিও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তবু ঐহিক দুরবস্থাপন্ন ভারতবাসী ঐ সম্পদ হারিয়ে ফেলতে পারে, যদি না জীবকে পুনরায় অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের পথে এগিয়ে যাবার যথার্থ শিক্ষা ও উদ্দীপনা দেওয়া যায়। স্বামীজী সে ভার নিজের স্কন্ধে নিলেন।

মনে পড়ে এক দিনের কথা: স্বামীজী সমাধির আনন্দরসে ডুবে থাকতে চেয়ে যখন ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করছিলেন, ঠাকুর তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তীব্রভাবে, কারণ 'ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস্! এ তো অতি হীন তুচ্ছ কথা! নারে, এত ছোট নজর করিস্ নি। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণ ভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধ-বোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর—একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত দুই হ।[৫৭]

সেদিনকার নরেন্দ্রনাথ—যিনি ছিলেন আধুনিক যুবক, অথচ প্রাচীন যুগের অধ্যাত্ম-ভাবে ভাবিত—যখন যুগাবতারের স্বমুখে স্পষ্টতম ভাবে শুনলেন এক অতি নবীন বৈপ্লবিক ধর্মবাণী যে নিজের মুক্তির জন্য লালায়িত থাকাও একপ্রকার স্বার্থপরতা, তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবলেন, ঠাকুর যে বলে থাকেন, 'চোখ বুজলেই ভগবান আছেন, আর চোখ চাহিলেই কি তিনি নেই' – একথার এক সম্ভাবনা-ভূয়িষ্ঠ ভবিষ্যৎ রয়েছে মানবের আগামী ইতিহাসে।

এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজী কি অত্যদ্ভুত সাফল্য লাভ করেছিলেন তা ভারত-প্রত্যাগত বিশ্বাত্মা বিবেকানন্দের কলম্বো থেকে আলমোড়া বক্তৃতাগুলি পাঠে

৫৬ তদেব, ৫।১৮৬

৫৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১৩৭৩), ১।১৮৩৪

আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমরা এই সব বক্তৃতাগুলিতে দেখি এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে, যিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল মানব-জাতির প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে, সেখানে সঞ্চারিত করছেন একটি জ্ঞান-প্রেম-শক্তি যা তিনি শ্রীগুরুর শিক্ষা-দীক্ষায় পেয়েছিলেন—বস্তুতঃ যার নামান্তরই শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বদেশে তাঁর একান্ত অনুরক্ত যে সকল অনুগামী ভেবেছিলেন বিবেকানন্দের কর্মভূমি ভারত—তিনি কেন এত সময় অপচয় করছেন বিদেশে বিজাতির সেবায়, তাঁদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সুমুখে স্বামীজী তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার প্রয়োগভূমির বিস্তৃতি অনাবৃত করে তাঁদের স্তম্ভিত করেছিলেন।

মাদ্রাজে তাঁর 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য'-শীর্ষক ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন: 'পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হইয়াছে; আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের মহান সম্রাট অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন—আর আমি ইচ্ছা করি তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক; আর যতদিন না তোমরা উহা কাজে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কাজের বিরাম না হয়। লোকে তোমায় প্রতিদিন বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্যে যাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ কর, তখনই তোমরা শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া থাকো। যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ করিয়া থাকো, বৈদেশিক ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাববিস্তারের চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজ করিতেছ, আর উপস্থিত সভা হইতেই প্রমাণ হইতেছে—তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপরদেশে জ্ঞানালোক-বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিভাবে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুন যে ফল হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান আদর্শ আর প্রত্যেককেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতের দ্বারা সমগ্র জগৎ জয়—ইহার কম কিছুতেই নহে; আর আমাদের সকলকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণ পণ করিতে হইবে।'[৫৮]

স্বামীজীর মুখে পর-পদানত ভারত এক অভিনব জগৎজয়ের কথা শুনল। এ জয় অন্যের পরাজয়ে উল্লসিত হবার জয় নয়। এ জয় সমগ্র মানবজাতিকে সর্বোদয়ের উর্ধ্বায়নে প্রবর্তিত করার দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনরত স্বামীজীতে যে আন্তরিক-স্রোতস্ প্রবহমান থেকে সকল মানুষের দুঃখ দূরীকরণকল্পে তাঁকে নিয়োজিত করেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল একই ভাষণে যখন তিনি বললেন: "বৈদেশিকগণ আসিয়া তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা ভারত প্লাবিত করিয়া দিক—ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় কর। এই

৫৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (১৩৬৯), ৫।১৭১-৭২

দেশেই একথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল: ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায়। আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখগুলিকে জড়বাদ দ্বারা জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে, এবং ক্রমশঃ এরূপ পশুসংখ্যা বাড়িতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশ জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, জাতিরূপে যদি বাঁচিতে হয়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন হইতে হইবে। তাহারা উহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা উহার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। কোথা হইতে উহা আসিবে? ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাব-রাশি বহন করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তুত—এমন মানুষ কোথায়? এই মঙ্গলবার্তা যাহাতে পৃথিবীর প্রত্যেক অলিতে-গলিতে পৌঁছায়, তাহার জন্য সর্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত—এমন মানুষ কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্যের জন্য এইরূপ বীরহৃদয় মানুষের প্রয়োজন। বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্ সত্যসমূহ প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্মী প্রয়োজন। জগতে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা না হইলে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই; সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। এখন এমন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্যেরঅন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি—আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমা-দিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—যে জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল তাহাকে— পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে।'[৫১]

'তুই যে বীর রে।' বলেছিলেন ঠাকুর নরেন্দ্রকে। বিশ্বাত্মা বীর বিবেকানন্দের মুখেই হাজার বছরের পরাধীন ভারত প্রথম শুনল এমন এক জগৎজয়ের কথা, যাতে কোন মানুষকে বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে লাঞ্ছিত বা পরাজিত করার কোন অভিসন্ধি নেই। আছে শুধু একটি ভূমা-সংহিত অতিমানবের প্রেম-আকুতি জগতের সকল মানুষের অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স আয়ত্ত করিয়ে দেবার জন্যে।

কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী তাঁর 'সমরনীতি'র ও 'জগৎজয়ে'র প্রেম-অভীঃ-উদ্ভাসিত আন্তর-বার্তাটি ঘোষণা করেছিলেন এই ভাষায়: 'জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষায় রহিয়াছে। পূর্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধি-কার-সূত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছে, তাহার দিকে জগৎ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি শত শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ-দুর্বি-পাকের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিকতা সযত্নে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

'তোমাদের পূর্বপুরুষগণের সেই অপূর্ব রত্ন-

৫১ তদেব ৫।১৭২-৩

রাজির জন্য ভারতের বাহিরের লোকেরা কতখানি উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে তাহা তোমরা কি বুঝিবে! আমরা এখানে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, যাহা কিছু গভীর শ্রদ্ধার বস্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি—এখন এই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা একটা জাতীয় পাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভারতে যে অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক বিন্দু পান করিবার জন্য ভারতের বাহিরের লক্ষ লক্ষ নরনারী কতটা আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব? অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অধ্যাত্ম জগতের অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত আবিষ্কারগুলি শিক্ষা করিব। চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না,—আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। সমভাবাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না; আর যখন একদল লোক সর্বদাই আচার্যের আসন গ্রহণ করে এবং অপর দল সর্বদাই তাহাদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে কখনও সমভাব আসিতে পারে না। যদি ইংরেজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে উহাদের নিকট যেমন শিখিতে হইবে, তেমনি তাহাদিগকে শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে।'[৭০]

ঠাকুর আক্ষেপের সুরে যে সম্ভাবনা-ভূয়িষ্ঠ শিক্ষা স্বামীজীকে দিয়েছিলেন— ভেবেছিলুম তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, আর তোর ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় পাবে'—শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজীতে তা যে ইতিমধ্যেই অত্যাশ্চর্যরূপে ফলিত হয়েছিল, তার অঙ্গীকার আমরা দেখতে পাই তাঁর বাণীতে ও কর্মে।

চার

পাশ্চাত্যকে স্বামীজী কি দিলেন? দিলেন 'জ্‌ম্ভিত-যুগ-ঈশ্বরে'র জ্ঞান-ভাস্বর প্রেম। এমন ভাবে দিলেন যাতে করে উন্নত ও বিভ্রান্ত সভ্যতাগুলির বাঁচবার ও সার্থকতা লাভের উপায় প্রবর্তিত ও উন্মুক্ত হয়ে রইল। পাশ্চাত্যের সকল সমস্যার উৎস হচ্ছে এক ভারসাম্যচ্যুতি। ঐ সব সভ্যতায় বহিঃ-প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার অন্তঃপ্রকৃতির উপর তার অধিকারের চেয়ে অনেক ছাপিয়ে গেছে। এবং এই ভারসাম্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন সব মারাত্মক সমস্যা যার সমাধান ঐ সব দেশের সমুন্নত বিজ্ঞান-চর্চার আলোকে পাওয়া অসম্ভব। স্বামীজী পাশ্চাত্যকে শিক্ষা দিলেন কি করে অন্তঃপ্রকৃতিকে মানুষ তার আয়ত্তে আনতে পারে। ঐজন্যেই স্বামীজী পরমোদার বেদান্তদর্শনের আলোকে তাদের শিক্ষা দিলেন যোগসাধনা। পাশ্চাত্যের মানুষ তাঁর কাছ থেকে প্রথমে প্রামাণিক যোগ-শিক্ষা লাভ করল। তিনি যা পাশ্চাত্যকে দিলেন, তা ভারতের বহু আয়াসলব্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদই শুধু নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতাগুলির বাঁচবার ও সার্থক অগ্রগতি লাভের অব্যর্থ উপায়ও বটে। এই হিসাবে ভাবজগতে পাশ্চাত্যের মানুষ বিশ্বাত্মা বিবেকানন্দরূপ বিশাল বটচ্ছায়ে আজ আশ্রিত।

স্বামীজী ভারতকে কি দিলেন? ভারতের

[৭০] তদেব, ৫।২১৪-৫

এক স্বর্গত মনীষী চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালাচারী এক সারসংক্ষেপ বাণীতে বলেছিলেন—'স্বামীজী বিনা আমরা আমাদের ধর্ম হারাতুম, আর আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেতুম না। তাই আমরা সব কিছুর জন্যই তাঁর নিকট ঋণী। তাঁর প্রত্যয়, নির্ভীকতা ও প্রজ্ঞায় সদা উদ্বুদ্ধ থেকে আমরা যেন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ নিরাপদে রক্ষা করতে পারি।'৬১

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজীর ধর্মপ্রকাশে ও ধর্ম-আচরণে ভারত ধর্মকে নূতন করে পেল। অবতীর্ণ ভগবানের কর্ম-কৌশল এবার এতে লক্ষিত হ'ল যে তিনি স্বামীজীর মত একজন স্থিতধী, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বৈপ্লবিক মনীষা-সম্পন্ন অভীঃ প্রেমিক পুরুষকে তাঁর ধর্ম-সংস্থাপনের যন্ত্র করলেন। স্বামীজী যে ছয় বছর লড়াই করে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে সদা জাগ্রত বুদ্ধির আধারে ধর্মকে গ্রহণ করলেন, এতে এ যুগে সনাতন ধর্মের ভিত এত শক্ত-পোক্ত হলো যে, উদ্ধত বিজ্ঞানের দুর্ধর্ষ সকল আক্রমণই তাকে পর্যুদস্ত করতে অসমর্থ হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনলব্ধ যে ভগবানকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করলেন, তিনি কল্পলোকের স্বপ্নাভ ভগবান নন, তিনি দেখে শুনে পরখ করে নেওয়া প্রমাণিত পরম প্রেমাত্মীয় মানুষের। সকল ধর্মপথের অভি-যাত্রীকে বললেন: এগিয়ে চলো, অপেক্ষমাণ ভগবানকে দেখতে পাবে পথের শেষে মতির শুদ্ধতায়। তারপর যখন সাধকের মুখোসটি খসে পড়ল, তখন মানুষ জানল অবতীর্ণ ভগবান কেমন হন দেখতে, শুনতে, ভালবাসতে, নাচতে, গাইতে, হাসি-রসিকতা করতে, অন্তর্যামীকে জাগিয়ে তুলতে; ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম বিলোতে।

মানুষের ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসে, পান চিবোতে চিবোতে বললেন: 'ভগবানকে ঘরে আনতে হয়।' মানুষকে অতিমানুষিক ভাবে ভালবেসে বললেন: 'ভগবানকে ভালবাসতে হয়!' মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বললেন: 'মাইরি বলছি ভগবানের সঙ্গে কথা বলা চলে, এই যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি।' মানবজীবন-জাহাজের কম্পাসের কাঁটাটি স্থির-লক্ষ্য করে বললেন: 'ভগবান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য।' মানুষের অন্ন-সমস্যাটিকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে সশ্রদ্ধভাবে বললেন: 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' মানুষকে ভগবানের আসনে বসিয়ে বললেন: 'মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—আর জ্যান্ত মানুষে হবে না?' জীবকে শিবের আসনে বসিয়ে বললেন: 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

যাঁরা বুভুক্ষু, বঞ্চিত, পদদলিত, অভাবের তাড়নায় যাঁদের স্বভাব গেছে পিষ্ট-নষ্ট হয়ে, যাঁরা মূক, দুঃখী, অসহায়, তাঁদের জন্য, তাঁদের মাঝখানে বসে আধুনিক কালের সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহ অবতীর্ণ-ভগবান করলেন মানুষের দুয়ারে—এদের পেটের অন্ন, গায়ের কাপড়, মাথার তেল চাই, নইলে কাশী তীর্থে যাওয়া নয়! এদের সঙ্গে এখানেই থাকা হবে মানব-তীর্থবাসে। তীর্থ-কেন্দ্রিক সনাতন ধর্মকে ঠাকুর করলেন মানব-কেন্দ্রিক। তিনি নিত্য নিলেন, লীলা নিলেন। 'এবার কাউকে বাদ দিব না'—এই হল তাঁর সর্বগ্রাহী ঘোষণা। তিনি বন্ধনময় সংসারকে উন্নীত করলেন রণভূমির কেল্লায়। অন্নগতপ্রাণ স্বল্পায়ু মানুষকে

৬১ দ্রষ্টব্য: Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, Calcutta, (1963), p. XIII

ছাজা-মুড়ো বাদে দিলেন ধর্মের সার, আর সে সঙ্গে নিরন্তু ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম। আর ঘোর কলির কালির ঘরে জ্বাললেন তমোনাশী ঊর্ধ্বগ স্বর্ণপ্রভ হুতাশন সন্ন্যাসের।

স্বামীজী বলেছেন: '...তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ) এক মহৎ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন এবং আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।'[৬২] 'যে সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি, সকলই তাঁহার চিন্তারাশির প্রতিধ্বনি মাত্র।'[৬৩]

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজীর জীবন মুখ্যতঃ ব্যতীত হয় গুরুদত্ত ব্রত ও আদেশ পালনে। ঠাকুর যা জগৎকে দিতে বলেছিলেন, তিনি তাই দিলেন—শিক্ষা। তিনি তাঁকে যা করতে বলেছিলেন তাই করলেন—দুঃখ দূর করা।

স্বামীজী তাঁর যোগবল সহায়ে তাঁর শ্রীগুরুর জীবনে বাস্তবায়িত ও তাঁর নিজের উপলব্ধ ধর্মের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করলেন, তার তুলনা মানুষের বর্তমান কালের ইতিহাসে মিলবে না। তিনি ধর্মের আদর্শ দায়িত্ব ও আঙ্গিকের যে ব্যাখ্যা করলেন, তাতে রয়েছে আধুনিক কালের মানবজাতির বহু ঐহিক ও পারত্রিক সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধান।

স্বামীজীর প্রচারিত ধর্মের মূল কথা: অন্তর্নিহিত দেবত্ব জীবনে প্রকাশ করে সত্যি মানুষ হওয়া ও অন্যের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশ করতে সাহায্য করে মানুষ গড়া।

বললেন: আমাদের জীবনের ব্রত সকলকে তার চার পুরুষার্থলাভের সুযোগ করে দেওয়া।

স্বামীজীর ব্যাখ্যাত ধর্ম শক্তি, অভীঃ ও প্রেম চর্চার নামান্তর। এতে করে পরপদানত দেশে এল স্বাধীনতা। আর ধর্ম নিজে প্রকাশিত হলেন মানুষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য সুহৃদ্রূপে।

স্বামীজী ধর্মের সামগ্রিক দায়িত্ববোধ এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, সমাজের এমন কোন সমস্যা নেই যা ধর্মের মূল সূত্রগুলি আন্তরিক ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে সমাধান করা যায় না। আমরা বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের দরুন ধর্মকে না হারিয়ে যে নূতন করে সুহৃদ্রূপে পেলুম, তার কারণ স্বামীজী যুক্তি সহকারে ও প্রয়োগ-নিপুণ ভাবে দেখালেন ধর্মই যথার্থ অগ্রগতি, উন্নতি ও সর্বার্থ-সাধনের ভিত্তি। এ শিক্ষা স্বামীজী পেয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে; আর পেয়েছিলেন তাঁর অহেতুকী সর্বজীব-উপচিকীর্ষা। জগৎ-হিতের জন্য স্বামীজীর সকল কর্ম-ভাবনার উৎস হচ্ছে এখানে।

স্বামীজী জীবের দুঃখ দূর করার দায়িত্ব মানুষের নিজের কাঁধে নিবার সাহস দিয়ে দেখালেন—যত শক্তি চাই এ ভার বইবার, তার সবই আসতে পারে ধর্ম থেকে—যার উৎস রয়েছে জীবের নিজ হৃদয়ে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক অসামাজিক ধর্মে স্বামীজী আনলেন সামাজিকতা। আর সামাজিকতাকে করলেন জীবের ঊর্ধ্বগতির জন্য দায়ী। ব্যষ্টিকে করলেন সমষ্টির উপাসক। কারণ 'তিনিই সব হয়েছেন।' সমষ্টিকে করলেন ব্যষ্টির অছি। কারণ 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

ঠাকুরের নিত্য-লীলা সব নেওয়াকে স্বামীজী তাঁর জীবন-সাধনায় ব্যষ্টি-সমষ্টিকে সমান সমানের স্থান দেওয়ারূপ উপাসনায় পরিণত করলেন।

মাদ্রাজে দত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ' ভাষণে বললেন:

৬২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০।২৯২
৬৩ তদেব, ১০।১৬৩

'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন ; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত ; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।......সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতেই পারে না!......এ কি তামাসা? এ-সব অর্থহীন বাজে কথা! আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা ; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা ; ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—'সেবা' নহে। 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না। 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়।'[৬৪]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে হিমালয়ে পরিভ্রমণকালে স্বামীজীর এই একটি নিগূঢ় অনুভূতি হয়েছিল যে, সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত।[৬৫]

এই অনুভূতি স্বামীজীর জীবন-দর্শন ও গুরুদত্ত ব্রত-উদ্‌যাপন সাধনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

স্বামীজীর ধর্ম-সাধনায় ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ব্যষ্টি-সমষ্টির দ্বন্দ্বের স্থান নেই, যা রয়েছে পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজবাদগুলিতে। দরিদ্রই যে শুধু নারায়ণ তা নয়। যে ধনী লোচ্চা তাকে পিষেছে, সেও নারায়ণ।

স্বামীজীর মত সামূহিক সামগ্রিক বিপ্লবী জগতের বিপ্লবের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। কেন তাঁকে দিই এই সম্মান? তাঁর পরিচ্ছন্ন ঋষি-দৃষ্টি এবং সর্বগ্রাহী হৃদয়বত্তা দেখে। যেসব রক্তক্ষয়ী বিপ্লব এ পৃথিবীতে হয়েছে, তাদের নায়কদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একদেশদর্শী ভাবধারার অনুশীলন এবং সমগ্র মানবকুলের বৌদ্ধিক দায়িত্ব গ্রহণেরও অনিচ্ছা। তাই আমরা শুনি উগ্র শ্রেণী-সংগ্রামের প্ররোচনা—মাথা কেটে ফেলে ও ধন কেড়ে নিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে রক্তাক্ত যুক্তি। আজ অবধি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার নামে অগণিত মানবসন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। যাঁদের এই উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বাঁচবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া যেতে পারে তাতে মস্তিষ্কের উর্বরতা প্রকাশ পেলেও হৃদয়বত্তার কোন চিহ্ন নেই। এদিক দিয়ে একদেশী বিপ্লববাদগুলি খুবই দুর্বল, কারণ এই বাদগুলিতে এককালে সকল মানবসন্তানের দায়িত্বভার গ্রহণের শক্তি তো দূরের কথা, মানসিকতারও অভাব রয়েছে।

ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামীজী যে শুধু সাম্যবাদের ঐতিহাসিক সংবেদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতিবলে জানতেন সাম্যবাদের ভিত্তি কোন ঐতিহাসিক যুক্তিজালে নেই, আছে সামূহিক অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক একত্বে।

৬৪ তদেব, ৫।১৯৮-৯
৬৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১৩৭৩), ১।২৮৩

আর ধর্মকে বাদ দিয়ে সকল উন্নয়নের চেষ্টাই ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য, কারণ শুধু ভাল খেয়ে-পরে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। মানুষ তার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে অবহেলা করে তার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। তাই স্বামীজী ধর্ম-ভিত্তিক জন-জাগরণ ও জন-উন্নয়নের শিক্ষা দিলেন। কারণ ধর্মকে বাদ দিলে জীবের দুঃখ মূলত: দূর করার কোন সম্ভাবনা নেই।

স্বামীজী শিক্ষা দিলেন সকলকে নির্ধন-ধনী, পুণ্যবান-পাপী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সকলকে সর্বোদয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কাউকে দাবানো নয়, সকলকে উচ্চতর সোপানে ও ভূমিতে এগিয়ে দেওয়া। এইটিই হল ঠাকুরের একটি 'সব নেওয়ার' অর্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজী—যিনি তাঁর শ্রীগুরুর নিকট জীব-শিব মন্ত্রলাভ করেছিলেন—শিক্ষা দিলেন: শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, চাই সকলের পূর্ণতা লাভের বিপ্লব। সকলকে চার-পুরুষার্থ লাভের পূর্ণাধিকার দেবার সংগ্রামই ছিল তাঁর ব্রত। অন্য চিন্তানায়কদের খণ্ড বিপ্লব, স্বামীজীর সামগ্রিক বিপ্লব। সবই যে তাঁরই হওয়া, তাই বঞ্চিতের জন্য যেমন রয়েছে তাঁর অসীম সহানুভূতি, যে বঞ্চনা করে তার জন্যও তাঁর সহানুভূতির কমতি নেই, কারণ সেও তো কম দুর্ভাগা নয়! চলমান নারায়ণ—নানাবেশে ক্রিয়মাণ। কোনরূপেই তাঁকে অপমান করা নয়—বহুরূপে সুমুখে যিনি তাঁরই উপচারভেদে সেবা। 'সেবা নয়, পূজা'।

জীবন্মুক্তি বা মোক্ষলাভের দিকে সকলকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া: এই হল স্বামীজীর একাত্মিত্ব-ভিত্তিক যুগান্তরকারী গণ-বিপ্লব—নরনারায়ণ-সেবা। কর্ম-কৌশল হচ্ছে ত্যাগ ও সেবা; সকলের জন্যই এক শিক্ষা।

যার কিছুই নেই, যে 'সর্বহারা' সে কী ত্যাগ করবে? সে ত্যাগ করবে ভয়, নৈরাশ্য, তমস্, পর-নির্ভরতা, সংগ্রাম-বিমুখতা। যার অনেক আছে, সে ত্যাগ করবে ঐশ্বর্য, স্বার্থবুদ্ধি, জন-কল্যাণ-বিমুখতা। যার কোন ঐশ্বর্য নেই, সে কিভাবে অন্যের সেবা করবে? সে সেবা করবে নিজ অন্তরের প্রসারতায়—নিজের দুঃখের মাঝে অন্যের কল্যাণচিন্তা করে। যার অনেক আছে, তার সেবা করবার অনেক সুযোগ। সেবার সার্থকতা নারায়ণবুদ্ধিতে, শিবজ্ঞানে জীব-পূজায়।

স্বামীজীর এই সৃজনীশক্তি-গম্ভীর জীবন-দর্শন এককালে সমগ্র মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে ও 'উন্নত' সমাজগুলিতে নবোদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানে হৃদয়বত্তা ও আলোক প্রদান করবে। [ক্রমশঃ]

'এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্বদ্বয় প্রচার করিতে হইবে। যেখানেই অশুভ, যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়—আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রও সে-কথা বলিয়া থাকেন যে, ভেদবুদ্ধি হইতেই সমুদয় অশুভ আসে এবং অভেদবুদ্ধি হইলে, সকল বিভিন্নতার মধ্যে বাস্তবিক এক সত্তা রহিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিলে সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে।' —স্বামী বিবেকানন্দ

বেদান্তের আলোকে

শ্রীমোহিনী মোহন বিশ্বাস

অনন্ত এই বিশ্বমূলে কি আছে বা কারা
বাহিরে মন খুঁজবি কত চন্দ্র সূর্য তারা।
যা কিছু এই বিশ্ব-মাঝে
সবই বিরাট মনে রাজে—
সে তত্ত্ব কি স্থূল এ চোখে পড়বে কভু ধরা ?
মনের সৃষ্টি মনের মাঝেই জাগাবে তার সাড়া।

বাহির হতে ভিতর পানে ফিরাতে নয়ন
হবেই, যদি করতে চাও সত্য অন্বেষণ।
স্থূলকে ছেড়ে সূক্ষ্ম পানে
যতই যাবে ফুটবে মনে
অদ্বয় সেই সত্যেরি রূপ চিদানন্দময়,
ভেঙে যাবে জাগা স্বপন—বিচিত্রাভিনয় ;

লয় পাবে এই দৃশ্য ভুবন চন্দ্র সূর্য তারা,
লয় পাবে এই ক্ষুদ্র 'আমি' জন্ম মৃত্যু জরা ;
যে লীলাময় করেন লীলা
প্রকৃতিরে লয়ে খেলা
লীলার সাথে তিনিও সেথা লয় পাবেন অরূপে
নামাতীত পরম ধামে—আমারি স্বরূপে।

ভবতারিণীর পূজারী

শ্রীযুগলচন্দ্র বাগ

আজিও তেমনি হেরি হে তোমায় ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুররূপে
বালকের মত 'মা' 'মা' বলি কেঁদে ধ্যানে ডুবে যাও সদা আপন স্বরূপে।
পঞ্চবটীমূলে দেহজ্ঞান ভুলি দিবস-শর্বরী সেকি কঠোর সাধন!
মানবের লাগি অশেষ যাতনা সহিলে মায়ায় তনু করিয়া ধারণ।
প্রেমের জোয়ার বহায়েছ তুমি ভাগীরথী-বুকে উথলি উঠে সদাই—
কূলে কূলে তার বারতা পশিল সে-কথা আজিও সবে কেহ ভুলে নাই।

অগণিত ভক্ত-বৃন্দ সাথে লয়ে যে-লীলা করিলে প্রভু এ মর জগতে
যুগ যুগ ধরি অম্লান রহিবে, স্মৃতি মুছিবে না ধরণীর হৃদি হতে।
শ্রীবদনে তব অবিরত কত সুমধুর বাণী ঝরে গেল শত ধারে—
হতাশের প্রাণে আশার আলোক জ্বলিল আবার মরুসংসার-মাঝারে।
ভেদবিবাদের করি অবসান শুনালে মানবে 'যত মত তত পথ'—
সকল পথেই ভগবান মিলে, সাধন করিলে তাই নিজে নানা মত।
মিলনের সেতু রচি' সুকৌশলে প্রাচী-প্রতীচীরে এক সূত্রে বাঁধি সব
অনির্বাণ দীপ জ্বেলে রাখি সদা অমর করিলে আজি জাতির গৌরব।
অহেতুক প্রেম কলসে কলসে নিঃশেষে ভরিয়া দিলে জগত-ভাণ্ডারে
তব করুণায় ফিরে পায় জাতি অধ্যাত্মসম্পদ পুনঃ গভীর আঁধারে।
তোমারি জীবন আলোকিত বাণী হৃদে স্মরি আজি দিকে দিকে জয়গান
শরণ দাও গো 'ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর, তুমি হে আমার প্রাণ'।

বার্ধক্যের বারাণসী

শ্রীমতী বীণা সেনগুপ্ত

বার্ধক্যের বারাণসী কোথা আছে আর
মানবের অন্তরের একান্ত আশ্রয়,
শোকতপ্ত দীর্ণ প্রাণে কত হাহাকার
কামনা-বাসনা-খিন্ন জর্জর হৃদয়।

নিবেছে আঁখির আলো অশক্ত চরণ
চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘনায় আঁধার,
কোথা সত্য, কোথা নিত্য, চৈতন্য পরম !
আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি সে মহা সত্তার।

সহসা কে দিল ডাক—'আয় ওরে আয়,
তোরই লাগি খুলিয়াছে আনন্দ দুয়ার,
তোরই মত তৃষাতুর শত প্রাণ তরে,
হেথা আছে পূর্ণকুম্ভ অমৃত কথার।'

রামকৃষ্ণ

প্রবোধ কৃষ্ণ ঘোষ*

জগৎ-জননী মাগো পতিত-পাবনী
তোমার তীরেতে মাগো কি হেরিনু আজ
স্তব্ধ তীর আলোকিত করিয়া জননী
আসিয়াছে পুত্র তব পরি' নব সাজ।
তোমার পবিত্র তীরে বসি নদীয়ায়
ভারত দেখেছে নামে মাতিতে গোরায়,
বিলাইতে হরি-নাম প্রতি ঘরে ঘরে
এখনও যে নামে মাগো অশ্রুবারি ঝরে।
দেখিয়াছে এ ভারত আরও কত বীর
বল্লভ শঙ্করাচার্য গুরু ও কবীর,
দেখিয়াছে নবযুগে ভারত আবার
মোহন মহর্ষি রূপে কেশবে তোমার।

এবে আসিয়াছে তব নূতন সন্তান
কালীনামে আত্মহারা, রামকৃষ্ণ নাম।
অপূর্ব সে দৃশ্য এক অতি চমৎকার
মুখরিছে এ উদ্যানে স্বরগের স্বর—
মিলিতেছে এক স্থানে মায়ের সন্তান
গাহিতেছে এক কণ্ঠে রামকৃষ্ণ নাম।
অদূরে শোভিছে ঐ জাহ্নবীর কোলে
অপূর্ব মন্দির কিবা মনোলোভা দূরে
গাহিছে সহস্র কণ্ঠে এক কণ্ঠে মিলে
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ হরে।
অদূরেতে পঞ্চবটী সাধনার স্থান
বসিলে যাহার তলে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ
আজি সেই সাধনার পাদপীঠ তলে
গাহিতেছে রামকৃষ্ণ লক্ষ কণ্ঠ মিলে।
সন্ন্যাসী ফকির ধনী পথের কাঙ্গাল
আসিয়াছে তব নামে রাজার দুলাল
গাহিতেছে এক কণ্ঠে মিলাইয়া তান
অধম-তারণ সেই রামকৃষ্ণ নাম।

---

* লেখকের বৃদ্ধা কন্যার নিকট হইতে জানিলাম, লেখক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিবার পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই কবিতা রচনা করেন।—সঃ

প্রলয়ো নির্বিকল্পসমাধির্বা*

অনুবাদক : রাধাবল্লভ দাস

ন ব্যোম্নি সূর্যো ন চ দীপ্তিরস্তি
ন বা শশাঙ্কো রমণীয়মূর্তিঃ।
ছায়াসমং বিশ্বমিদং বিভাতি
চিত্রার্পিতং তত্র চরাচরং হি ॥ ১

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
মনোঽম্বরে মেঽস্ফুটভাবযুক্তে।
বিভাত্যহংস্রোতসি বিশ্বমেত-
দ্ভূদেতি যাত্যস্তমথো সদাস্মিন্ ॥ ২

ছায়াজগদ্ ভাসমানং পুরা যৎ
শনৈঃ শনৈস্তন্মহতি প্রবিষ্টম্।
অহংপ্রবাহো হ্যবশিষ্ট এষ
নিরন্তরং সন্তনুতে তদানীম্ ॥ ৩

সোঽপি প্রবাহঃ ক্রমশো নিরুদ্ধঃ
শূন্যং হি শূন্যে মিলিতং সমন্তাৎ।
বাচামতীতং মনসোঽপ্যগম্যং
প্রাণাধিগম্যং তদিদং রহস্যম্ ॥ ৪

কামনা

শ্রীসুশীল সিংহ†

সত্য দৃষ্টিদানে স্বরূপ আমার
ফোটাও আঁখিতে,
নিজেকে আমি নিজে এবার
চাই গো জানিতে ॥
জন্ম মৃত্যু কর্মলীলা
শোক দুঃখ স্বপ্ন খেলা ;—
জীবন-ধারার এ জ্ঞান আমি
চাই গো লভিতে ॥
আমি-ই আত্মা নিত্য মুক্ত,
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ে যুক্ত,
আমার অনাদি অনন্ত সত্তা
দাও গো জানিতে ॥
আছি আমি গ্রহ তারায়
আকাশে ঐ রঙের খেলায়,
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে
আঁধার-জ্যোতিতে ॥
প্রণবনাদের মধুর তানে,
রূপ জাগে যে আনন্দ গানে,
সেই সুরে যে বাঁধা আমি
দাও গো বুঝিতে ॥
আমার আমি—সেই ঈশ্বর
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
অণুর অণু পরমাণু
পরিব্যাপ্ত মহীতে ॥
আমি যে সবার আমি—আমিই তুমি
জাগাও বোধিতে ॥

* স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "প্রলয় বা গভীর সমাধি" গানটির সংস্কৃতানুবাদ।—সঃ

† প্রধান শিক্ষক, উখড়াডিহি গোবিন্দপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

রামকৃষ্ণ মিশন

বন্যা সেবাকার্য

আবেদন

আসাম ও ত্রিপুরার অভাবনীয় বন্যায় যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে এবং কিছু লোক প্রাণ হারাইয়াছেন, জনসাধারণ সে বিষয় অবগত আছেন। বন্যাপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশন আসামের শিলচর ও করিমগঞ্জে এবং ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে সেবাকার্য শুরু করিয়াছেন। এই কাজের জন্য আশু প্রয়োজন—খাদ্য, বস্ত্র, শিশুখাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি।

দেশের এই দুর্দিনে বন্যাবিপর্যস্ত ভাইবোনদের সাহায্যকল্পে আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট মুক্তহস্তে দান করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি। যে কোন প্রকার দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক, ড্রাফ্‌ট্‌ ইত্যাদি "রামকৃষ্ণ মিশন"—এই নামে লিখিতে হইবে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, ৭১১-২০২, হাওড়া

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহী ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০-০১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯

৫। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০-০২৬

৬। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর ৭৮৮-০০৪, আসাম

৭। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতি, করিমগঞ্জ ৭৮৮-৭১০, আসাম

৮। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২

৯। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০-০৫৫

বেলুড় মঠ
২১শে জুন, ১৯৭৬

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী প্রভবানন্দের দেহত্যাগ

গত ৪ঠা জুলাই ১৯৭৬, মধ্যরাত্রি ১২টা ৩ মিনিটে (ভারতীয় সময় ৪ঠা জুলাই দুপুর বেলা) স্বামী প্রভবানন্দ আমেরিকার হলিউড বেদান্ত কেন্দ্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেহত্যাগ-কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর। হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা খারাপ হওয়ায় গত ২৯শে মে তিনি হাসপাতালে যান, এবং ১৮ই জুন হলিউড আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। ৩রা জুলাই বিকালে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র হঠাৎ আবার, শেষবার আক্রান্ত হয়। শেষনিশ্বাস ফেলিবার প্রায় পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ও ভক্তদের আশীর্বাদ করিয়াছেন।

স্বামী প্রভবানন্দ অবনী মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রম বাঁকুড়া জেলায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল কলিকাতায়।

ছাত্রাবস্থায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তানগণের বহুজনের সঙ্গলাভও তিনি করিতে পারিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে তিনি যোগদান করেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে তিনি মন্ত্রদীক্ষা এবং তাঁহার নিকট হইতেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের বহুজনের সঙ্গ- ও স্নেহ-লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদানের পর ভারতে কিছুকাল তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব প্রচারের জন্য প্রেরিত হন। আমেরিকায় কিছুকাল সানফ্রানসিস্কো কেন্দ্রে অধ্যক্ষরূপে কাজ করিবার পর তিনি পোর্টল্যাণ্ডে এবং হলিউডে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি হলিউড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষরূপে প্রভূত সাফল্যের সহিত ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিয়া গিয়াছেন; এই কাজ বলিতে, তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি সমধিক জোর দিতেন স্বামীজীর বাণী-ভিত্তিক নিজের জীবন গঠন করিয়া অপরকে জীবনগঠনে উদ্বুদ্ধ করার উপর। আমেরিকায় তাঁহার বহু দীক্ষিত ভক্ত আছে। তাছাড়া তিনি হলিউডে একটি মঠ ও কনভেণ্ট, ট্রুবাকোতে একটি মঠ ও সান্তা বারবারায় একটি কনভেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকে সুসংহত ও উন্নত করার কাজে তাঁহার অবদান খুবই মূল্যবান। সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন তিনি—যাঁহাদের কথা শুনিয়া কেবল ভাল লাগা নয় তদনুরূপ জীবন গঠনের প্রেরণাও আসে, তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন। বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রচার করিয়াছেন, অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। 'বেদান্ত এণ্ড দি ওয়েস্ট' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

তাঁহার দেহবিমুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

শিক্ষা—জীবিকা—জীবন

শ্রীমনকুমার সেন*

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাব-গভীর ও দূরদর্শী চিন্তা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলেছেন: শিক্ষা বৃত্তি নয়, জীবনই হওয়া উচিত শিক্ষার লক্ষ্য। নভেম্বর ১৯৭৫-এ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ-এর সভায় রাজ্যসমূহের ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষা-সংগঠকদের তিনি বলেন: "Education cannot be merely job-oriented. It can help a person to get a job but to enable him to keep the job, education has to be life-oriented."—"শিক্ষা নিছক জীবিকামুখী হতে পারে না। জীবিকা সংগ্রহে কোন ব্যক্তিকে তা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তাকে সেই জীবিকারক্ষায় সমর্থ করতে হলে শিক্ষাকে জীবনমুখী হতে হবে।"

বেঁচেবর্তে থাকবার জন্য যখন জীবিকা বা বৃত্তির দাবী অত্যন্ত প্রবল, তখন শিক্ষার সার্থকতা – এবং একমাত্র সার্থকতা – সম্বন্ধে এধরনের মর্মগ্রাহী ও দুঃসাহসিক উক্তি আজ-কাল বিরল। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীও নিতান্তই বস্তুবাদী, অতএব তাঁদের উক্তি-প্রত্যুক্তি-যুক্তির মধ্যে টাকা-আনা-পাই-এর অঙ্কে শিক্ষার মূল্যাঙ্কন করে জনপ্রিয়তা অর্জনের ঝোঁকই প্রবল। জীবনবাদের সত্য কথাটিকে স্পষ্টভাবে বলতে গেলে তাঁরা নিতান্তই অব্যবহারিক বা অবাস্তববাদী কল্পনাবিলাসী প্রতিপন্ন হবেন—এই তাঁদের ভয়। অন্তুতনী বস্তুচিন্তায় আচ্ছন্ন এই মানসিকতাই জীবনের অন্তিম দাবীকে উপেক্ষা করতে করতে ক্রমে তা বিস্মৃত হয়েছে এবং সেই দাবী পূরণের শ্রেষ্ঠ কিংবা একমাত্র হাতিয়ার যে-শিক্ষা, সেই শিক্ষা-বিষয়ক তাবৎ চিন্তাই আজ জীবিকাসন্ধানী অতিসংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট অব্যবস্থিত চিন্তা না করছে আমাদের জীবনমুখী, না দিতে পারছে জীবিকার সন্ধান জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই যদি আমরা হই উদাসীন বা অজ্ঞ, গন্তব্যই যদি জানা না থাকে, তাহলে আমরা যাত্রা করব কি করে, নামবই বা কোথায়? যাব কোথায় তা-ই যদি থাকে জ্ঞানের বাইরে, তাহলে অজ্ঞানের মতো ষ্টেশনে টিকিটঘরের সামনে ঘুরঘুর করা কিংবা গন্তব্য স্থানের নাম—অনুল্লেখে 'একখানা টিকিট দিন তো মশাই'-জাতীয় হাস্যকর উক্তি ক'রে—হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আমাদের ভাগ্যে আর কী থাকবে? স্বাধীনদেশ ও নবজাতির গন্তব্য সুস্থির ক'রে শিক্ষাকে সর্বস্তরে একান্তরূপে তার অনুবর্তী, অনুসারী না করলে যে বিপর্যয়কর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, আজকের ভারতের মানসিকতার সেই দশা। অসাধারণ চিন্তাকুশল ও প্রত্যয়দৃঢ় ইন্দিরাজী এই পরিস্থিতির দিকেই অকপটে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন।

শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আজও যাঁর কথাই বোধ হয় শেষ কথা, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের মধ্যে তাঁর কথারই প্রায় হুবহু প্রতিধ্বনি শুনে দেশপ্রেমিক ও শিক্ষাসাধকগণ আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হবেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমি বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কথাই বলছি।

"The end of all education and training should be man-making." "The

* সম্পাদক, লোকশক্তি

end and aim of all training is to make the man grow." "It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want."—
"তাবৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আদর্শ হওয়া উচিত মানুষতৈরী।" "তাবৎ প্রশিক্ষণের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বিকাশশীল করে তোলা।" "আমরা যা চাই তা হচ্ছে মানুষগড়ার তত্ত্ব। সবদিকে মানুষগড়ার শিক্ষাই আমরা চাই।" —শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর এ কথার পর ভারতীয় চিন্তাদর্শে আর কোন্ কথা থাকতে পারে? কিন্তু এ কথা কি আমরা স্বীকার করেছি? শিক্ষাবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী রেখাচিত্রটির পাশাপাশি অ-মানবিক অ-সামাজিক মানসিকতা ও কার্যকলাপেরও ঊর্ধ্বমুখিতা আমাদের এই আত্মঘাতী অস্বীকৃতির পরিণামেরই স্বাক্ষর বহন করছে। 'শিক্ষাই সর্বোত্তম সমাধান'—শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের অজ্ঞতা অন্ধতার ওপর জ্ঞানের অব্যর্থ আলো বিকিরণ করে, দ্রবীভূত করে তার বহু-বিচিত্র দ্বন্দ্ব; সমস্যাবিড়ম্বিত জীবন যেখানটাকে ভাবে অন্ধগলি, শিক্ষা সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে জীবনের রাজপথে পৌঁছে দেয়। অর্থ নয়, খ্যাতি নয়, প্রতিপত্তি নয়—এদের কোনোটিই বা এরা সকলে মিলেও জীবনের কোন মূল সমস্যারই সমাধান দিতে পারে না—এর অজস্র উদাহরণ কি আমাদের চোখের সামনেই নেই? মূলদর্শী বলিষ্ঠ জীবনবাদের তুলনারহিত প্রবক্তা স্বামীজী ও তাঁর ধ্যানের জননায়ক মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও সাধনার মধ্যে আর সবকিছু ছাড়িয়ে এই একটি উদাত্ত বাণীই কি সোচ্চার নয়?—'শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা: শিক্ষাই একমাত্র সমাধান।' এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না, যদি এই মহাবাণী-সূত্রে নিবেদন করি: জীবিকা তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়ই, শিক্ষাও জীবনের উদ্দেশ্য নয়, **শিক্ষাই জীবন**।

শিক্ষাই একমাত্র বস্তু যা জীবনের উদ্দেশ্য ও উপায়, লক্ষ্য ও পন্থা, সাধ্য ও সাধনার অদ্বৈত সাধন করে। শিক্ষাকে যে-পরিমাণে আমরা জীবন থেকে পৃথক্ করেছি, কম করেছি, জীবন ততখানিই আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে; সার্বিক জীবনবোধ থেকে ততখানিই আমরা দূরে সরে গেছি; আমাদের জীবন মহাজীবন-সম্ভব ধ্যানপ্রতিমার তুলনায় ততখানিই খাটো হয়ে পড়েছে। গ্রাম হতে জগৎ, বিন্দু হতে সিন্ধু, ব্যক্তিমানব হতে বিশ্বমানব পর্যন্ত জীবনকে ছড়িয়ে দেখার যে একমাত্র বীজমন্ত্র যুগপরম্পরায় আমরা আমাদের মহাজ্ঞানী মহাজনদের কাছ থেকে বিনা-আয়াসে বিনা-পৌরুষে পেয়ে ধন্য হয়েছি, তা হচ্ছে 'শিক্ষা'। জীবনবিমুখ আজকের শিক্ষাব্যবস্থা অপৌরুষের, তা সুমহৎ উত্তরাধিকারে আমাদের অযোগ্যতারই পরিচায়ক। জীবনের সার্বভৌম হাতিয়ার শিক্ষাই যদি আমাদের অধিগত না হয়, তাহলে বিবর্ণ বিষণ্ণ উদ্দেশ্যহীন জীবনযাত্রা যে জীবন-যন্ত্রণায় পর্যবসিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

আমরা জীবিকার জন্য বাঁচি না, বাঁচি জীবনের জন্য। জীবিকা বা বৃত্তিই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহলে জীবনকে এত ক্ষুদ্র মানের মধ্যে টেনে আনতে হয়, যেখানে মানুষে এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে ফারাক থাকে আকৃতিতে মাত্র, প্রকৃতিতে নয়। সেক্ষেত্রে সভ্যতার অগ্রগতির অর্থ হবে কুশলযন্ত্রের, যন্ত্র-বিজ্ঞানের অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের অগ্রগতি, আর তার আজ্ঞাবহ চলমান মনুষ্যমূর্তির অস্তিত্বমাত্র —বিকাশশীল জীবনের জাগৃতি নয়, আত্ম-জ্ঞানের অভিক্রম নয়।

এই বিকাশ বা বিস্তারণ মানেই অন্তর্জীবনের বিকাশ, অন্তর্নিহিত অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এই শক্তির পরিপ্রকাশকেই স্বামীজী বলেছেন শিক্ষা। এই শক্তিই আত্ম-

শক্তি, আত্মার শক্তি। এই শক্তিতেই সাড়ে-তিন-হাত-পরিমাণ একটি ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়—মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে দেয় সহস্র যোজন। বিশেষ করে ভারতভূমি এমনই এক একটি বিশ্বজোড়া ব্যক্তিত্বের পৌরুষে ধন্য। জীবনের মহাজীবনে উত্তরণের এত জলন্ত উদাহরণ আর কোন্ দেশের ইতিহাসকে প্রোজ্জ্বল করেছে? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী: কোন্ নির্বোধ সাড়ে-তিন-হাত শরীরের গজ-ফিতা দিয়ে এঁদের মাপতে যাবে? এঁদের জীবনের তত্ত্ব কী, ধর্ম কী?

ভারতীয় জীবনেরই লক্ষ্য এর চেয়ে কম হবে কেন? আর লক্ষ্য যদি এই হয়, তাহলে লক্ষ্য-সিদ্ধির যে পন্থাটি তাঁরা অনুশীলন ও আয়ত্ত করেছিলেন,—আমাদেরও কি সে-পথেই যাত্রা করতে হবে না? গন্তব্য অনুযায়ী তো যাত্রা হবে, উপায় অনুযায়ী তো উদ্দেশ্য লাভ হবে? যেমন বীজ তেমন বৃক্ষ হবে তো? আমাদের চর্চা যদি হয় জ্ঞান, তবেই জ্ঞানসমৃদ্ধ পূর্ণতর জীবনে হবে আমাদের পরিণতি।

অজ্ঞান মানুষের ভীড়ে আজ পথ চলা দায়,—জাতীয় জীবনের সমাজবাদী অঙ্গীকারকে সত্য করে তুলবার জন্য, তার পরিকল্পিত উন্নয়নকে অর্থবহ করবার জন্য তো চাই জ্ঞানী দায়িত্বসম্পন্ন দরদী মানুষ। অর্থনৈতিক উজ্জীবন-যজ্ঞের যোগ্য পুরোহিতকে তো নীতিনিষ্ঠ মানুষ হতে হবে: আজ কি পদে পদে বহুমুখী কর্মপ্রকল্পের নানা পর্যায়ে তারি মারাত্মক অভাব আমাদের পীড়া দেয় না? ইন্দিরাজী যে বলেছেন জীবনমুখী শিক্ষাই শুধু মানুষকে জীবিকারক্ষার যোগ্যতা দিতে পারে, এই হচ্ছে তার কারণ। জীবননিষ্ঠা ব্যতীত জীবিকাও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে, গতানুগতিকতার ক্লান্তি তাকে গ্রাস করে।

এই নিষ্ঠাহীনতা, এই তাৎপর্যহীনতা-ই জীবিকাবলম্বী অসংখ্য মানুষকে অভাব হতে নতুন অভাবে, প্রকৃত অভাব থেকে কৃত্রিম অভাবে ক্রমাগত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অপরিমেয় অর্থোপার্জনেও অতৃপ্তির অসহ্য জ্বালা কেন—বস্তুসর্বস্ব বৃত্তিবাদী পণ্ডিতদের তা একটু গভীরে তলিয়ে বোঝার সময় আসে নি কি? আমাদের বক্তব্যের তদ্‌গত আবেদন হল:

* জীবিকার মান নয় জীবনের মান উন্নয়নই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হবে;

* জীবন মানেই অন্তর্জীবন, আত্মজীবন; কেন না অন্তহীন বিকাশের সম্ভাবনা শুধু মানুষের অন্তরঙ্গেই আছে বহিরঙ্গে নেই। এই অন্তর্জীবন বিকাশের শিক্ষাকেই প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত আবশ্যিক করতে হবে।

* অভাববোধকে সীমিত করা ছাড়া ব্যক্তি-জীবন ও জাতীয় জীবনে স্বাস্থ্য, সুতৃপ্তি ও পূর্ণতার আস্বাদন অসম্ভব— বারবার অজস্রবার এই সত্যটিকে শিক্ষার্থী, জীবিকার্থী ও বৃত্তি-ভোগী মানুষের মনে গেঁথে দিতে হবে।

এই সীমিতি- বা পরিমিতি-জ্ঞানের জীবনদর্শন নবজাতির যাত্রারম্ভেই যদি ঘোষিত হত, শিক্ষার ধারায় যদি তা ভাবাদর্শরূপে বিন্যস্ত হত, তাহলে আজ অন্তহীন অভাব ও নিত্য-নূতন দাবীর অসম্ভব জটিলতা জাতি ও জীবনকে সংকটের মুখে ঠেলে দিতে পারত না, আর সমস্ত কর্মমূলে আমরা পেতাম সুযোগ্য অন্তর্মুখী কর্মী—মানুষ।

আজও সময় আছে: অনেক ক্ষয়-ক্ষতির পরেও শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আজও আমাদের সাধ্যের বাইরে নয়। তার জন্য একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীকে—শিক্ষাক্ষেত্রে

সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীকে— প্রবলভাবে তুলে ধরতে হবে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে, যাঁরা জীবনের তৃপ্তি ও পূর্ণতাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে উপলব্ধি করেন, প্রচণ্ড বিশ্বাস ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে তাঁদের আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গী বা শিক্ষাদর্শনের অনুকূলে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কিংবা অন্যের নিন্দাবাদ করে নিষ্ক্রিয় থাকলে আমরা শুধু আমাদের দুঃখকেই দীর্ঘস্থায়ী করব।

শিক্ষাসূত্রে অন্তর্জীবনের তাগিদ যত বাড়বে, বহির্জীবনের কৃত্রিম অভাব, অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বরের খোলসও তত খসে পড়বে।

এমনতর সরল স্বচ্ছন্দ জীবনেই শুধু সভ্যতার আর এক ধাপ উত্তরণ সম্ভব এবং আজও ভারতের মাটিতেই সেই সম্ভাবনা সর্বাধিক। সাধারণ জীবনে জীবিকা তো নিশ্চয় চাই, কিন্তু সে-জীবিকা যেন জীবন-স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত না হয়। শিক্ষাই এই নিশ্চয়তা দানের অধিকারী।

সমালোচনা

ঠাকুরের বাউল: শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক: শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী, জ্ঞানদা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, ১১৩ নিউটন এভিন্যু, দুর্গাপুর-৫, বর্ধমান। (১৩৮২), পৃষ্ঠা ২৬৮, মূল্য সাত টাকা।

রামকৃষ্ণ মিশনের পরলোকগত সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দ বা প্রেমেশ মহারাজ ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট একটি প্রিয় ও পরিচিত নাম। তাঁর নামটি ছিল সার্থক, কারণ এরকম স্বভাব-জাত স্নেহ, প্রেম ও মমতা সত্যিই বিরল। তবে হৃদয়ের এই সুকোমল বৃত্তিগুলি তাঁর মধ্যে স্বতঃ-উৎসারিত থাকলেও তিনি জ্ঞান ভক্তি কর্ম ও যোগের সমন্বয়েই নিজেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দের পতাকাবাহী উপযুক্ত সৈনিকরূপে গঠন করেছিলেন। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাস-জীবনের একটি বড় অংশ তিনি যাপন করে-ছিলেন। তাই বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার বহু মানুষের হৃদয়ে তিনি এখনও ভাস্বররূপে বিরাজ করছেন। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁরই সম্পর্কে রচিত।

গ্রন্থের রচয়িতা স্বামী প্রেমেশানন্দের আকৈশোর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধ লেখক ও কবি তাঁর বন্ধু সম্পর্কে লেখার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন এবং 'স্মৃতিচারণ' অংশে তাঁদের গভীর ভালবাসার কথা সানন্দে বিবৃত করেছেন। প্রেমেশানন্দজীর একটি ক্ষুদ্র নিখুঁত জীবনালেখ্য রচনা করেছেন তিনি। প্রথম জীবনে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তাঁদের পরিচয়, কিন্তু পরে উভয়েই রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দের আদর্শের বেদীতলে নিজেদের জীবন সঁপে দিয়েছেন এবং পরমকরুণাময়ী শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছেন। কেবল প্রভেদ এই যে, একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী আর একজন আদর্শ গৃহী।

'গ্রন্থকারের নিবেদন' ও 'কবি প্রশস্তি'টি পড়ে জানা যায় 'ঠাকুরের বাউল' এই নাম-করণটি শ্রীমার নিজেরই। প্রেমেশানন্দজী ছিলেন মধুরকণ্ঠ গায়ক। তাছাড়া তিনি অনেক সুন্দর সংগীতও রচনা করেছিলেন। সব জড়িয়ে এই প্রেমিক কবি ও বাউল সন্ন্যাসীটির জীবন অতি রমণীয় ও অনুধ্যানযোগ্য। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ জীবনচিত্র লেখকের পক্ষে আঁকা

সম্ভব হয়নি, কারণ তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের পর থেকে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ আর ঘটেইনি।

২৬৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির দীর্ঘতম অধ্যায় 'পত্র ও মন্তব্য' (১৮৫ পৃষ্ঠার)। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকারকে লেখা প্রেমেশ মহারাজের ৫৯টি পত্র সংযোজিত। প্রতি পত্রের পর গ্রন্থকার নিজস্ব মন্তব্য দিয়েছেন। এই চিঠিগুলিতে তাঁদের ব্যক্তিগত কুশল-প্রশ্নাদির অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতোই বয়ে চলেছে যথার্থ সাধু-হৃদয়ের পূত ভাবপ্রবাহ। গ্রন্থকার সেগুলির নিগূঢ় তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন এবং তা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নিজের জীবনের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই এসে গেছে। কিন্তু সব কিছুই তিনি ভক্তিনম্র-ভঙ্গীতে বলে গেছেন, অহমিকার রঙে রঞ্জিত করেন নি কোথায়ও। পরিশিষ্টে প্রেমেশ-মহারাজের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবোধ ভট্টাচার্যকে লেখা তিনটি উৎকৃষ্ট পত্র এবং প্রেমেশ মহারাজ-রচিত 'চরম-কাব্যে'র দুটি সংগৃহীত স্তবক উদ্ধৃত করাতে গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থটি পাঠকবর্গকে নির্মল আনন্দ দান করবে এবং প্রেমেশা-নন্দজীর পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে কাউকে তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু লিখবার এবং আরো অনেক পত্র কবিতা ও গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করার প্রেরণা যোগাবে।

প্রুফ-দেখা ভাল হয়নি বলে বইটির মধ্যে বেশ কিছু ছাপার ভুল থেকে গেছে, যেগুলি শেষে একটি 'পাঠশুদ্ধি' জুড়ে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। বইয়ের পাতা ও ছাপার মান ভাল। স্বামী মুমুক্ষানন্দ লিখিত সুখপাঠ্য সুন্দর ভূমিকাটি গ্রন্থের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থটি ভক্তমহলে বহুলভাবে প্রচারিত হোক এই কামনা করি। **শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত**

সপার্ষদ সারদা-রামকৃষ্ণ বন্দনা : স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক : স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, পোঃ জয়রামবাটী, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ। (১৩৮২), পৃষ্ঠা ১০৮ + ১৬ = ১২৪ ; মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গ্রন্থখানি সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়ক স্বামী চণ্ডিকানন্দের স্বরচিত একশত একত্রিশটি সুললিত ভক্তিরসাত্মক ভজন-সঙ্গীতের মনোরম নৈবেদ্য। গ্রন্থে লিপিবদ্ধ গীতিসমূহে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তচ্ছক্তি শ্রীসারদাদেবীর মহিমা ও লীলাকথা সুকীর্তিত হইয়াছে। ভজন-সঙ্গীতের প্রভাব ও সার্থকতা অসীম। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি : 'মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি'।— আমার ভক্তগণ যেখানে আমার মহিমা কীর্তন করে, সেখানে আমি অবস্থান করি। ভগবদ্-ভজনের মাধ্যমেই ভক্তের হৃদয়ে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, শরণাগতি প্রভৃতি দৈবীসম্পদ উদ্দীপিত ও সঞ্চারিত হয়। ভগবদ্‌ভক্তির লক্ষণ—শ্রবণ কীর্তনাদি। গ্রন্থে নিবদ্ধ বন্দনাত্মক সঙ্গীতগুলির শ্রবণ ও কীর্তনে প্রেম-ভক্তিলাভের ও রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকা-নন্দের ভাবধারা-প্রচারের বিপুল সহায়তা হইবে।

গ্রন্থের কয়েকটি সঙ্গীতে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কতিপয় অন্তরঙ্গ পার্ষদের দেবচরিত্র বন্দিত হইয়াছে। অবশিষ্ট গানগুলিতে তরুণ-তরুণীদের প্রাণে উচ্চ চিন্তা ও আদর্শ—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ, আশা, উদ্যম, মহাপ্রাণতা, নরনারায়ণ-সেবার ভাব, স্বদেশপ্রীতি বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিবার আন্তরিক প্রয়াস আছে। আমাদের আশা— এগুলি তরুণ-তরুণীদের কণ্ঠে মন্দ্রিত ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য : ইহাতে বহু গানেরই স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে গায়কগণ গ্রন্থকারের অভীপ্সিত সুর-সংযোগে গানগুলি অনায়াসে গাহিতে পারিবেন।

ছাপা ও কাগজ ভাল। বঙ্গভাষাভাষীদের মধ্যে গ্রন্থখানির উত্তরোত্তর প্রচার, প্রসার ও সমাদর কামনা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

বিবেকদীপ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সম্পাদক : শ্রীযশোদাকান্ত রায়। বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৭০০০০৬, মূল্য প্রতিসংখ্যা ১.৫০ টাকা, বার্ষিক ৩.০০ টাকা।

স্বামীজীর ভাবধারা প্রচার উদ্দেশ্যে কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে এযাবৎ-অনুষ্ঠিত সোসাইটির অন্যান্য কার্যসূচীর মধ্যে ষাণ্মাসিক পত্রিকা 'বিবেকদীপ'-এর প্রকাশ নব-সংযোজন। স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ, অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির তথ্যপূর্ণ ও মনোরম লেখা, তুইটি মূল্যবান স্মৃতি-কথা ও অন্যান্য রচনা পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশকে সমৃদ্ধরূপেই উপস্থাপিত এবং বিবেকানন্দ-চিন্তার কিরণমণ্ডিত করিয়াছে। আমরা ক্রমসমৃদ্ধতররূপে পত্রিকাটির অব্যাহত প্রকাশ ও বহুল প্রচার কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে বাগেরহাট ঢাকা দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গুঁড়ো দুধ বিতরণ ও রোগীদের চিকিৎসা এবং শ্রীহট্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে গুঁড়ো দুধ বিতরণ অব্যাহত থাকে। গত জুন মাসে ঢাকা ও শ্রীহট্ট কেন্দ্র শ্রীহট্ট জেলায় বন্যাত্রাণকার্য করে

ভারতে বিহারের পাটনা জেলার মানের অঞ্চলে বন্যাত্রাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে বন্যাপীড়িত ২২৫টি পরিবারের জন্য নির্মিত ২২৫টি পাকা বাড়ি এবং উহাদের সকলের ব্যবহারের জন্য 'বিবেকানন্দ সমাজ মন্দির' নামে একটি সভাগৃহ (Community Hall) মানের শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গত ১১ই জুন (১৯৭৬) উহাদের অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর জগন্নাথ মিশ্র। স্বাগত-ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। বিধান সভার সদস্য শ্রীরাম নগিনা সিং-ও বক্তৃতা দেন।

আসামে করিমগঞ্জ ও শিলচরে এবং ত্রিপুরায় কৈলাসহরে বন্যাত্রাণকার্য শুরু করা হইয়াছে।

গত ৭ই জুন (১৯৭৬) হইতে ২২শে জুন (১৯৭৬) পর্যন্ত রাজকোট আশ্রম ভাবনগর জেলার ৩৫টি গ্রামে ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণকার্য পরিচালনা করে এবং বাসনপত্র খাদ্যদ্রব্য বস্ত্রাদি ত্রিপল শিশুদের পোশাক ইত্যাদির দ্বারা ৪৮০টি পরিবারকে সাহায্য করে।

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৪ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্যসূচী পালিত হয় : সাপ্তাহিক শাস্ত্রালোচনা, বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, শ্রীরামকৃষ্ণ

মন্দিরে ধর্মীয় শিবির পরিচালনা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি বিশেষ পূজা আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে পালন, শিবরাত্রি রামনবমী ও দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান, খ্রীষ্টমাস ঈভ ও হজরত মহম্মদের জন্মদিন পালন, সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সহিত ধর্মালোচনা।

আশ্রম-পরিচালিত পুস্তকাগার ও পাঠাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ছিল ৫,৩৪৯। ১৩ টি বই পড়িবার জন্য দেওয়া হয় এবং মোট ১,৯৯৬ জন পাঠাগারে অধ্যয়ন করেন। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে।

সারদাদেবী তামিল স্কুল ও কলাইমগল স্কুলের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৯ ও ৫৬।

বয়স্কদের জন্য পরিচালিত নৈশ ক্লাসে ১০৮ জন ছাত্র ছিল।

ছাত্রাবাসের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষস্মারক ভবনে উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভা, আধ্যাত্মিক শিবির এবং ধর্মীয় ক্লাস হয়। এখানকার পুস্তকাগার ও পাঠাগারে ২,৬৮১টি পুস্তক ও কতিপয় পত্র-পত্রিকা আছে।

শ্যামলাতাল (হিমালয়) বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৭৪-৭৫ সালের কার্যবিবরণীর সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল: (১) আশ্রমে প্রতি একাদশী তিথিতে রামনাম সংকীর্তন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমার ও স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা হোম ভজন ও পাঠ হয় এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবা উৎসবের বিশেষ অঙ্গরূপে পালিত হয়। (২) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (দাতব্য চিকিৎসালয়ে) বহির্বিভাগে ও ১৫টি শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগে যথাক্রমে মোট ১২,০১২ ও ১০১ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। সেবাশ্রম রোগীর ঔষধপত্র ও চিকিৎসার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করে। (৩) দাতব্য পশুচিকিৎসালয়ে মোট ৩৪৬টি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা করা হয়। (৪) অতিথিশালায় অতিথিদের বাসের জন্য পাঁচটি ধাম আছে। (৫) 'ভগবতী ধাম' নামে আশ্রমে একটি গোশালা আছে। অর্থাভাবে ইহার উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। (৬) আশ্রমের গ্রন্থাগারে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক ২,৩৭৭টি বই আছে। সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ১৮। রোগীদের জন্যও একটি ছোট গ্রন্থাগারে ২১৬টি বই আছে।

বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৪-৭৫ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রম বিভাগের উল্লেখ্য কার্যাবলী: (১) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে নিত্যপূজা প্রার্থনা বেদ ও গীতা পাঠ এবং প্রতি একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন। (২) দুর্গা কালী শিব লক্ষ্মী ও গণেশ পূজা ও উৎসব। (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীযীশুর আবির্ভাব-তিথি পালন। (৪) আশ্রমে প্রতি শনিবার ও রবিবার যথাক্রমে হিন্দী ও ইংরেজীতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। আশ্রমের বাহিরে দাদারে অবস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্রে মারাঠীতে নিয়মিতভাবে, কোলিওয়াডায় (Koliwada) পাক্ষিক এবং পারেলে (Parel) সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা হয়। (৫) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মারাঠী গুজরাতী হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার অংশবিশেষের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও পুরস্কার-বিতরণ।

মিশন বিভাগের উল্লেখ্য কার্যাবলী: (১) শিক্ষা: কলেজের ছাত্রদের জন্য পরিচালিত ছাত্রাবাসে ৬৯ জন ছাত্র ভর্তি হয়। নিঃশুল্ক

পাঠাগারে এবং শিবানন্দ পুস্তকাগারে ১৯,৭৯৩-এর অধিক পুস্তক এবং ১৪০টি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ছিল। ১৩,৮০৬টি পুস্তক গৃহে পড়িতে দেওয়া হয়। প্রতিদিন বহুসংখ্যক পাঠক পাঠাগারে পড়িতে আসেন। (২) চিকিৎসা: দাতব্য হাসপাতালের বহির্বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ১,৩৩,৪৪৬ এবং অন্তর্বিভাগের ২০টি শয্যায় ৬২৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রটি প্রতি রবিবার বোম্বাই শহর হইতে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত পালঘর তালুকের সাকওয়ার আদিবাসী গ্রামে কাজ করে। চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১২,৯৬১। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ঔষধ ভিটামিন প্রোটিন-খাদ্য বিস্কুট এবং বস্ত্রাদি আদিবাসিগণের মধ্যে বিতরিত হয়। (৩) সেবাকার্য: আলোচ্য বর্ষে গুজরাত খরাত্রাণে, উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের খাদ্যাভাবের দূরীকরণে প্রচুর অর্থ ও জিনিসপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠানো হয়।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের ১৯৭৪-৭৫ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

আধুনিক পদ্ধতিতে যক্ষ্মা-রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা (বড় বড় অস্ত্রোপচারসহ) এবং আরোগ্যলাভের পর যাহাতে রোগিগণ স্বনির্ভর হইয়া সমাজে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানে রহিয়াছে। বর্তমান শয্যা-সংখ্যা ২৮০; দুঃস্থরোগিগণ বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসিত হন।

আলোচ্য বর্ষে ২৬৭ জন পুরাতন রোগী ও ৫৪৩ জন নূতন রোগী লইয়া মোট ৮১০ জন রোগী চিকিৎসিত হন। অস্ত্রোপচার, এক্সরে ও বীক্ষণাগারে পরীক্ষার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৩, ৩,১৩৭ ও ২৪,৬৯৫। বহির্বিভাগে ৯২৬ জন যক্ষ্মারোগী এবং ৪,৩৫২ জন অন্যান্য রোগীর চিকিৎসা করা হয়। 'আরোগ্যোত্তর-নিবাস' এবং 'পুনর্বাসন-কেন্দ্র'-এ ২৭ জন প্রাক্তন রোগী বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ৫,৪০৫ নূতন ও ৭,৭২৭ পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হন।

রোগীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য একটি পুস্তকাগার, গৃহবর্তী-ক্রীড়া, নাটকাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানাদি 'রিক্রিয়েসন ক্লাব'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

রোগী ও কর্মীদের জন্য প্রত্যহ ৬ মন দুধের প্রয়োজন হয়। গোশালা হইতে দৈনিক ৫ মন দুধ পাওয়া যায়। গোশালার আশু উন্নয়নের জন্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজন।

আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ১৬,৫৫,৯৬৫ টাকা; মোট ব্যয় ১৭,৯৬, ৪৫৫ টাকা; মোট ঘাটতি ১,৪০,৪৯০ টাকা। বৎসরে জনপ্রতি খরচা ৫,১৯১ টাকা।

আশ্রম-কর্তৃপক্ষ ঘাটতি পূরণের জন্য ও দরিদ্র যক্ষ্মা রোগীদের বিনা-খরচায় চিকিৎসা এবং অন্যান্য উন্নয়নকর কার্যের জন্য সরকার ও জনসাধারণের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

বিদ্যালয়-ভবনের উদ্বোধন

মেঘালয়ে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নার্টিয়াং গ্রামে গত ৩রা জুন (১৯৭৬) রামকৃষ্ণ মিশনের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ অধিকারের মুখ্য অধি-

কর্তা শ্রী ও. কে. মূর্তি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেঘালয়ের কৃষিমন্ত্রী শ্রী ই. বারে। স্বাগত-ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মিশনের চেরাপুঞ্জি শাখার অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দ। ভারতের পূর্বপ্রান্তে পাহাড়ী গ্রামেও যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় মানুষ গড়ার কাজ চলিতেছে, ইহাতে শ্রীমূর্তি ও শ্রীবারে অভিভূত হন। সভার শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। পরে শ্রীমূর্তি পরীক্ষা ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কুশলী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য এই বিদ্যালয়টি মেঘালয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২তম বিদ্যালয়।

উৎসব

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৪ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজনসঙ্গীত শোভাযাত্রা বিশেষ পূজা হোম কথামৃতপাঠ উৎসবের অঙ্গ ছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় ছয় হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী রমানন্দ ও স্বামী স্বানুভবানন্দ। সন্ধ্যায় শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৩শে ও ২৪শে বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা এবং কথা-মৃত পাঠ ও আলোচনা হয়। বৈকালীন সভায় সভাপতি স্বামী অমৃতত্বানন্দ, প্রধান অতিথি জনাব শামসুল আলম, শ্রীসত্যগোপাল ঘোষ ও শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২৪শে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বিশেষ পূজা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা হয়। পরে প্রায় চার হাজার নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালীন সভায় সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরে পদাবলী কীর্তন হয়।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী সীতারামানন্দ (যোগেশ মহারাজ) গত ৪ঠা জুন (১৯৭৬), বৈকাল ৩টা ৪০ মিনিটে ৮২ বৎসর বয়সে সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। হৃৎ-পেশীর কিয়দংশে অকস্মাৎ রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ হইয়া উহা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯১৫ সালে সংঘের নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে (বর্তমানে বাংলাদেশে) যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত বালিয়াটি কেন্দ্রের মাধ্যমেও তিনি সংঘসেবা করেন। বালিয়াটিতে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় ১৫ বৎসর উক্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী সত্যরূপানন্দ (দীনেশ মহারাজ) গত ৯ই জুন (১৯৭৬) রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিটে (ইংরেজী মতে ১০ই জুন) সেবাপ্রতিষ্ঠানে শ্বাস- ও হৃদ্-যন্ত্রের বৈকল্যহেতু ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের

মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৫ সালে সংঘের শিলচর কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে স্বীয় মন্ত্রগুরুর নিকট হইতেই তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। শিলচর কাশী সেবাশ্রম কিশেনপুর এবং কনখল সেবাশ্রমের কর্মিরূপে তিনি সংঘসেবা করেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

আবির্ভাব-তিথি

বাংলা ১৩৮৩ সাল, ইংরাজী ১৯৭৬-৭৭ খ্রীঃ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৯ শ্রাবণ	রবিবার	২৫ জুলাই
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	২৪ শ্রাবণ	সোমবার	৯ অগষ্ট
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৮ ভাদ্র	মঙ্গলবার	২৪ অগষ্ট
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২ আশ্বিন	শনিবার	১৮ সেপ্টেম্বর
স্বামী অখণ্ডানন্দ	মহালয়া	৭ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	২৩ সেপ্টেম্বর
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১৭ কার্তিক	বুধবার	৩ নভেম্বর
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	১৯ কার্তিক	শুক্রবার	৫ নভেম্বর
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১৪ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	৩০ নভেম্বর
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	২৭ অগ্রহায়ণ	সোমবার	১৩ ডিসেম্বর
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২ পৌষ	শুক্রবার	১৭ ডিসেম্বর
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১১ পৌষ	রবিবার	২৬ ডিসেম্বর
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২০ পৌষ	মঙ্গলবার	৪ জানুআরি
শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	২৮ পৌষ	বুধবার	১২ জানুআরি
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	৭ মাঘ	শুক্রবার	২১ জানুআরি
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	৯ মাঘ	রবিবার	২৩ জানুআরি
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	২১ মাঘ	শুক্রবার	৪ ফেব্রুআরি
শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৮ ফাল্গুন	রবিবার	২০ ফেব্রুআরি
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২৫ ফাল্গুন	বুধবার	৯ মার্চ

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব বিগত ২৩ বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও গত ২০শে হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২০শে সকালে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং ভজনাদি হয়। কথামৃত ও লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী চিৎসুখানন্দ। মধ্যাহ্নে প্রায় ১৪০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ

করেন। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-কথকতা ও রামায়ণ কীর্তন হয়। ২১শে হইতে ২৩শে রামনাম সংকীর্তন ও 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ধর্মসভাতে 'প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ' আলোচনা করেন স্বামী তথাগতানন্দ ও 'নৌকাবিলাস' কীর্তন হয়। 'মাথুর' কীর্তন করেন স্বামী শিবানন্দ গিরি। 'শ্রীমা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা

কুমারঘাট (ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক গত ৭ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। উৎসবের শুরুতে প্রভাত ফেরি ও শেষে 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' নাট্যানুষ্ঠান হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতি শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিত ও আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

নাটশাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। ১৩ই পূজা পাঠ ভোগ আরাত্রিক ইত্যাদি হয় এবং প্রায় পাঁচশত ভক্ত প্রসাদ পান। ১৪ই পূজান্তে মধ্যাহ্নে প্রায় দশ হাজার ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ অধিকারী শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে ভাষণ দেন। রাত্রিতে তরুণ সংঘ কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'ধ্রুব' নাটক অভিনীত হয়।

খগৌল (পাটনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গত ১৪ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ পূজা হোম এবং কীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বেদান্তানন্দ, স্বামী প্রাণাত্মানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সংঘসচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ তলাপাত্র সংঘের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

বঙ্গাইগাঁও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক গত ২১ হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। বিশেষ পূজা হোম পাঠ কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রত্যহ বৈকালীন ধর্মসভায় স্বামী ইজ্যানন্দ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী হরেন মহারাজ ভাষণ দেন। সভান্তে রামায়ণ গান করেন শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী। ছায়াছবির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীযোগেশ দাস।

পূর্ণিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মঙ্গলারতি ঊষাকীর্তন ভজন পূজা হোম ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন সভাপতি স্বামী অনুপমানন্দ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ স্বামী বিবিক্তানন্দ ও শ্রীভরত প্রসাদ শর্মা। রামায়ণ গান করেন শ্রীকানাইলাল হালদার।

পরলোকে

য়ের শিষ্য শ্রীকেশবচন্দ্র নাগের সহধর্মিণী **লক্ষ্মীমণি নাগ** গত ২রা জ্যৈষ্ঠ ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই দানশীলা ভক্তিমতী মহিলা শ্রীশ্রীমায়ের চরণচিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

ইঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক!

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ২৩৭ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের শেষ অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দ 'নির্গুণ'-এর স্থলে 'সগুণ' পড়িতে হইবে।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা কার্ত্তিক। (১৩০৬ সাল) [১৯শ সংখ্যা।]

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

চাষীর কায হীন কায বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিরূপে সহরে থাকিব, কোন উপায় নাই। একদিন একটী খাবারের দোকানের কাছে বসিয়া ভাবিতেছি, আহার হয় নাই, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আট ক্রোশ রাস্তা ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হয়। আমায় দেখিয়া দোকানীর মনে দয়া হইল; দোকানী কিছু খাবার দিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে? আমি সমস্ত পরিচয় দিলাম, দোকানীর পায়ে ধরিয়া বলিলাম, আমায় আপনি রাখুন, আপনার কায কর্ম্ম করিব। আমি ঘরে যাইব না। দোকানীরও বেচা কেনা করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক ছিল। আমার পিতার নিকট লোক পাঠাইল, পিতার অনুমতিতে সেই দোকানেই রহিলাম। আমার মত বয়াটে সঙ্গী দুই চারিজন জুটিল। নেশা ভাঙ এদিক ওদিক বেড়ান চেড়ান ক্রমে শিখিলাম। দোকানীর নিকট যা পাই, তা উরি মধ্যে একটু ভাল কাপড় চোপড় করিতেই যায়।—অন্য দরকার চুরি করিয়া মিটাইতে হইল, দু'চারিদিন ধরা পড়িলাম। কিছু বেশী তফিল সরাইয়াছি. টাকাও খরচ হইয়া গিয়াছে। দোকানী একটুকু অনুগ্রহ করিল, টাকা দিতে পারিলে কয়েদ করিবে না। মায়ের কাঁদা কাটায় সর্ব্বস্ব বাঁধা রাখিয়া বাপ টাকা দিল। সেই হতে তার সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বস্ব বেচে কিনে কোথায় গেল তা জানি না। এদিকে আমি প্রকাশ্য চোরের দলে মিশ্‌লুম। জোয়া খেলি, বিদেশী পথিক লোককে ঠকাইয়া লই। একদিন কিছু মাল হাতে হয়, এক বেশ্যালয়ে বেড়াইতে যাই। সে বেশ্যা ঐ পিঙ্গলা। আমোদ আহ্লাদ চলিল, সে খুব আদর করিল, কিন্তু আমার মন তাহার উপর না পড়িয়া টুন্না নামে তার একটা দাসী তার উপর পড়িল। পিঙ্গলার বাড়ী যাতায়াত করি, টুন্নার সঙ্গে কথার বেশ সুবিধা হয়, তাহাকে চাকরি ছাড়াইলাম, বাসা করিয়া দিলাম। এখন আমার খুব সচ্ছল, যা চাই পিঙ্গলা দেয়। টুন্না একটি গাই কিনিল। যে পথে চলিতেছিলাম, তাহাতে যে জেল হইয়াছিল—এ বলা বাহুল্য। একদিন সে জেলের একটী আলাপী লোকের সঙ্গে টুন্নার বাড়ীর সাম্‌নে সাক্ষাৎ হয়। মহাসমাদরে বাড়ীর ভিতর আনিলাম, সমস্ত রাত আমোদ প্রমোদ চলিল। ভোরের বেলা আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি যে বন্ধুও নাই, আর ভাল কাল গাইটীও নাই। সেই গাইয়ের জন্য টুন্নার ঝাঁটা খাইয়া গাই-এর সন্ধানে বাহির হইলাম। পাঁচ সাতদিনে সন্ধান করিয়া ধরিলাম। দেখিলাম চোর আমার সেই জেলের বন্ধু। তিনি

* আষাঢ়, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

একজন দস্যুর সর্দ্দার। সে গাইটী দেবে না, আমিও ছাড়িব না। উভয়ে দাঙ্গা—তার প্রাণবধ হয়। তারপর অঙ্কার সহিত আলাপ। দু'জনে মিলিয়া ভাবিলাম, ভাল ডাকাতি চলিবে। কিন্তু দিন দিন দেখিতে লাগিলাম, অঙ্কার তেমন কাযে মন নাই। অঙ্কা কি ভাবে, কি করে, —কিছুই বুঝিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলে না। একদিন অনুরোধে অঙ্কা ডাকাতি করিতে চলিল। কুম্ভরাণার বড় প্রতাপ! সকলে ধরা পড়িলাম। সকলের প্রাণবধ হইবে স্থির, এমন সময়ে এক ব্যক্তি কারাগারে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তোমরা সকলে এস, তোমরা মুক্ত"। পরে মুক্তিলাভ করিয়া শুনিলাম যে, রাণাপুত্র উদা পিতার নিকট বলে যে, এই দস্যুদল তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং কুম্ভরাণা পুত্রের অনুরোধে আমাদের মুক্তি দিল। কিন্তু মুক্তির সময় কারাধ্যক্ষ আমাদের বিশেষ করিয়া বলে,—"সাবধান এ পথে আর চলিও না"! রাণাপুত্র উদা'র কখনও আমরা প্রাণরক্ষা করি নাই। তাহার এরূপ ব্যবহারের কারণ ত আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এখন বুঝিতে পারিয়াছি; যাক্ সে অনেক কথা। এদিকে দল ত ছোড়ভঙ্গ হইয়া যাক্, তাড়িখানায় বসিয়া তাড়ি খাই। পিঙ্গলার কাছে ঝগড়া কলহ করিয়া কিছু অর্থ আনি। একদিন হঠাৎ কপাল ফিরিল। অঙ্কা নাই, একটি স্ত্রীলোক একথালা মোহর লইয়া বলিল, "বাবা, এইগুলি লও, বৈষ্ণব সেবা করিও"। প্রথম মনে ভাবিলাম, গোয়েন্দা! এদিক ওদিক দেখি, লোকজন কেউ নাই। মাগীও মোহর রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মোহরের প্রতি আর আমার লক্ষ্য রহিল না। মাগী যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কি অদৃশ্য দড়িতে আমার বুকে টান পড়িতেছিল! আমি পশ্চাৎ যাইতে বাধ্য হইলাম। পথে মধুরকণ্ঠে মাগী গান ধরিল। অমন সঙ্গীত আর কখনও কোথাও শুনি নাই; প্রাণ উদাস হইয়া গেল! মাগীর পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলাম, "ওরে, ওরে তুই কে"? মাগী বলিল, "আমি হরিবোলা, যাও বাবা ফিরিয়া যাও, আবার দেখা হবে। বৈষ্ণব সেবা করিও"। আমি ফিরিয়া আসিলাম। তখন অঙ্কা আসিয়াছে। অঙ্কা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল, "বঙ্কা, আমার কেন দস্যুবৃত্তি ভাল লাগে না বুঝিলি? আমি বলিলাম, "বুঝিলাম"।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কার কথা শেষ হইলে, সুজন বলিতে লাগিল, "কসায়ের ছেলে, বালক বয়সে বাপ গরুর ছাল খুলিতে ভাগাড়ে পাঠায়। সহরেই বাস, ভাগাড় অনেক দূর। তারপর লোকে যে রকম গরুকে যত্ন করে গরু অনেক মরে না, ছাল পাওয়া মুস্কিল। অনেক দিন খাওয়া দাওয়া বারণ হয়। ছাল পাই না তা কি কর্ব্বো? কিন্তু বাপ কোন রকমেই বোঝে না। একদিন ভাগাড়ে যাইতেছি, পথে এক ব্যক্তির সহিত দেখা। তার হিজ্ড়ে ছাগলের পিত্তির বড় দরকার। ছাগল একটী সন্ধান করেছে, কিন্তু দরে বনে নাই বলিয়া কিনিতে পারে নি। আমাকে বল্লে, একটা কায পার্ব্বি? অমুক বাটীতে পাট্কিলে রঙের হিজ্ড়ে ছাগল আছে,

সেইটে মার্‌তে পার্বি" ? আমি বল্লুম, "কি করে ? লোকেরা যে আমায় মার্বে" ! সে বল্লে, ঘাসের নুটি করিয়া এই সামগ্রীটে ছাগলের সাম্‌নে দিতে পারিস্‌, তা'হলে সে খাবে। সে আমায় বিস্তর প্রলোভন দিল—তোর আর বাপের বাসায় থাক্‌তে হবে না, গো ভাগাড়ে যাবার দরকার নাই। আর এ কাযে টাকা পাইবি, যদি বাপের কাছেই থাক্‌তে চাস্‌, টাকা পেলে তোর বাপ খুব আদর কর্বে"। আমি ছাগল মারিতে রাজি হইলাম। [ক্রমশঃ]

ভগবদ্‌গীতা শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩০ হইতে ৩৯ শ্লোক পর্যন্ত—মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ সহ।—বর্তমান সঃ

[১ম বর্ষ।]   ১৫ই কার্ত্তিক। (১৩০৬ সাল)   [২০শ সংখ্যা।

পরমহংসদেবের উপদেশ*

১। সহ্য গুণের চেয়ে আর গুণ নেই। যে সয় সে'ই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটা—শ ষ স।

২। সৎ'এর রাগ কিরকম জান ?—যেমন জলের দাগ; জলের একটা দাগ দিলে তখনই যেমন আবার মিলিয়ে যায়, যেম্‌নি সৎ'এর রাগ হয় আর তখনি থেমে যায়।

৩। ভগবান্‌ দু'বার হাসেন। ভাই ভাই যখন দড়ি ফেলে জমি ভাগ কর্‌তে কর্‌তে বলে "এ জমি আমার, ও জমি তোমার", তখন একবার ভগবান্‌ হাসেন। আর, যখন রুগী মরো মরো হয়, এবং ডাক্তার বদ্দি এসে বলে "ভয় কি ?—আমি বাঁচাব",—তখন একবার হাসেন।

৪। জলে ডুবে গেলে যেমন প্রাণ আটু পাটু করে, সেই রকম যখন ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে, তখনই তাঁর দর্শন পাবে।

৫। দু রকম মাছি আছে। এক রকম—মধু মাছি; তারা মধু ভিন্ন আর কিছু খায় না। আর এ মাছিগুলো মধুতেও বসে; আর যদি পচা ঘা পায়, তখনি মধু ফেলে পচা ঘায়ে গিয়ে বসে। সেই রকম, দুই প্রকৃতির লোক আছে;—যারা ঈশ্বরানুরাগী তারা ভগবানের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ কর্‌তেই পারে না। আর যারা সংসারাসক্ত জীব, তারা ঈশ্বরীয় কথা শুন্‌তে শুন্‌তে, যদি কেহ কামিনীকাঞ্চনের কথা কয়, তা হ'লে ঈশ্বরীয় কথা ফেলে তখনই তাইতে মত্ত হয়।

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত।—বর্তমান সঃ

৬। খাঁচার ভিতর থেকে পাখী উড়ে গেলে যেমন কেউ খাঁচার আদর করে না, তেম্‌নি এ দেহরূপ খাঁচা থেকে প্রাণপাখী উড়ে গেলে এ দেহের আর কেহ যত্ন করে না।

৭। পানায় ঢাকা পুকুরের ভিতর মাছ যেমন কিল বিল ক'রে বেড়ায়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর মানুষের খোলের মধ্যে লীলা কর্‌ছেন।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

লঙ্কা।

আলাসিঙ্গার 'সিকনেস' হ'ল না। 'তু'ভায়া একটু আধটু গোল প্রথমে ক'রে, সামলে বসে আছেন। চারিদিন কাযেই নানা বার্ত্তালাপে, "ইষ্টগোষ্টিতে" কাটলো। সামনে কলম্বো। এই—সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু ত দেখেছি; সেতুপতি মহারাজার বাড়ীতে, যে পাথর খানির উপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্ব্ব পুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেছি। কিন্তু এ পাপ সিলোনি-লোক বৌদ্ধগুলো তা মানতে চায় না! বলে—আমাদের দেশে ও কিম্বদন্তিপর্য্যন্ত নাই। আর নাই বল্লে কি হবে?—"গোঁসাইজী পুঁথিতে লিখ্‌ছেন যে"। তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা ব'লবে না। ব'লবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাযে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল, না আকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো!—ঘাগরা পরা, খোঁপা বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়ে মান্‌ষি চেহারা। আবার—রোগা রোগা, বেঁটে বেঁটে, নরম নরম শরীর। এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্ছা! গেছি আর কি! বলে—বাঙ্গালা দেশ থেকে এসেছিলো। তা ভালই করেছিলো।—ঐ যে একদল দেশে উঠ্‌ছে, মেয়ে মান্‌ষের মত বেশ ভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্টি হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাঁসেন হোঁসেন করেন;—ওরা কেন যাক্‌ না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্ছে গা? সেদিন "পুরীতে" কাদের ধরা পাকড়া কর্ত্তে গিয়ে হুলস্থুল বাধালে; বলি—রাজধানীতে পাকড়া ক'রে প্যাক করবার, ওযে অনেক রয়েছে।

"সিংহল" নামের উৎপত্তি।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙ্গালি রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ ব'লে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ক'রে, নিজের মত আরও কতগুলো সঙ্গী জুটিয়ে, জাহাজ করে ভেসে ভেসে, লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে "বেদ্দা"

* আষাঢ়, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির করে রাখ্‌লে, মেয়ে বে দিলে। কিছুদিন ভাল মানুষের মত রইল; তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি ক'রে, হঠাৎ রাত্রে সদল-বলে উঠে, বুনো রাজাকে সর্দ্দারগণ সহিত কতল্ করে ফেল্‌লে। তারপর বিজয় সিংহ হলেন রাজা। দুষ্টুমির এই খানেই বড় অন্ত হলেন না। তারপর, আর তাঁর বুনোর মেয়ে রাণী ভাল লাগলো না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন, আর অনেক মেয়ে, আনালেন। অনুরাধা ব'লে এক মেয়ে ত নিজে কল্লেন বিয়ে; আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন; সে জাতকে জাত নিপাত কর্ত্তে লাগলেন। বেচারিরা প্রায় সব মারা গেল। কিছু অংশ ঝাড় জঙ্গলে আজও বাস কর্‌ছে। এই রকম ক'রে লঙ্কার নাম হ'ল সিংহল, আর হ'ল বাঙ্গালি বদমায়েসের উপনিবেশ। ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে, তাঁর ছেলে মাহিন্দো, আর মেয়ে সংঘমিত্তা

সিংহলের ইতিবৃত্ত ও বৌদ্ধ আচার ব্যবহার।

সন্ন্যাস নিয়ে, ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে, সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখলেন যে, লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হয়ে গিয়েছে। আজীবন পরিশ্রম ক'রে, সে গুলোকে যথাসম্ভব সভ্য করলেন; উত্তম উত্তম নিয়ম করলেন; আর শাক্যমুনির সম্প্রদায় আনলেন। দেখতে দেখতে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠলো। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড সহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্। এখনও সে সহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে, আক্কেল হায়রান্ হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তুপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী, দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গল হয়ে রয়েছে, এখনও সাফ্ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হল্‌দে চাদর মোড়া, ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়্‌লো। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠলো,—মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্ত্তি, জ্ঞান মুদ্রা করে প্রচারমূর্ত্তি, কাৎ হয়ে শুয়ে মহানির্ব্বাণমূর্ত্তি—তার মধ্যে। আর দেলের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি কর্‌লে,—নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙ্গাচ্ছে; কোনটাকে করাতে চির্‌ছে; কোনটাকে পোড়াচ্ছে; কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজ্‌ছে; কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্চে;—সে মহাবীভৎস কারখানা! এ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এদিকে ত অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখ্‌লে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম'র বাড়ীতে ঢুকেছে চোর। কর্ত্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া ক'রে, বেদম্ পিট্‌ছে। তখন কর্ত্তা দোতালার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগ্‌লেন "ওরে মারিস্ নি, মারিস্ নি; অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" বাচ্ছা-অহিংসারা, মার থামিয়ে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তবে চোরকে কি করা যায়"? কর্ত্তা আদেশ করলেন, "ওকে থলিতে পুরে, জলে ফেলে দাও"। চোর যোড়হাত ক'রে, আপ্যায়িত হয়ে, বল্লে, "আহা কর্ত্তার কি দয়া"। বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্ম্মের উপর সমদৃষ্টি, এইত শুনেছিলুম। বৌদ্ধপ্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে, রঙ্গ বে রঙ্গের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাঁদের যথেষ্ট পূজো করে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার কর্‌ছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের নয়; তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ "ভিক্ষু", গৃহস্থ, মেয়ে, মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে, সে যে বিট্‌কেল আওয়াজ আরম্ভ কর্‌লে, তা আর কি বল্‌বো। লেক্‌চার ত অলমিতি হ'ল;

রক্তারক্তি হয় আর কি। অনেক ক'রে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস। তখন শান্তি হয়।

ক্রমে উত্তর দিক থেকে হিঁদু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ করলে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্ব্বত্য সহর স্থাপন করলে। তামিলরা কিছুদিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দু রাজা খাড়া করলে। তারপর এলো ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষে ইংরাজ রাজা হয়েছেন; কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েছেন, পেনসন আর মুড়গুতান্নির ভাত খাচ্ছেন। উত্তর সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক; দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ, আর রঙ্গ্‌ বেরঙ্গের দো আঁসলা ফিরিঙ্গি। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান কলম্বো বর্ত্তমান রাজধানী, আর হিন্দুদের জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে, বে থা'র সময়; খাওয়া দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নাই; হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্ছে; ধর্ম্ম প্রচার হচ্ছে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইউরোপী নাম ইন্দ্রুম পিক্রম এখন বদলে নিচ্ছে। হিঁদুদের সব রকম জাত মিলে, একটা হিঁদু জাত হয়েছে; তাতে অনেকটা পাঞ্জাবী জাঠদের মত সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্য্যন্ত, বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে শিব শিব ব'লে, হিঁদু হয়। স্বামী হিঁদু, স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান। কপালে বিভূতি মেখে, 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বল্লেই ক্রিশ্চিয়ান সদ্যঃ হিঁদু হয়ে যায়। তাইতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদরিরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চিয়ান বিভূতি মেখে, 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' ব'লে, হিন্দু হয়ে জাতে উঠেছে। অদ্বৈতবাদ, আর বীর শৈববাদ এখানকার ধর্ম্ম। হিন্দু শব্দের জায়গায় শৈব বল্‌তে হয়। চৈতন্য যে নৃত্য কীর্ত্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্য,– এই তামিল জাতির মধ্যে। সিলোনের তামিল ভাষা খাঁটি তামিল, সিলোনের ধর্ম্ম খাঁটি তামিল ধর্ম্ম। লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্ত্তন, শিবের স্তব গান, সে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ, আর বড় বড় কত্তালের ঝাঁজ, আর এই বিভূতি মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পাহলওয়ানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরের মত, তামিলদের মাতওয়ারা নাচ না দেখ্‌লে, বুঝতে পার্‌বে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাব্‌বার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল; অতএব ডাঙ্গায় নেবে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা শুনা হল। সার কুমার স্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংরেজ; ছেলেটী শুধু পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্‌-প্রমুখ বন্ধু বান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গুতান্নির খাওয়া হ'ল আর কিং ককোয়ানট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখ্‌লাম। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কাউন্‌টেস কানোভারার মঠ ও স্কুল দেখ্‌লাম। কাউণ্টেসের বাড়ীটী মিসেস হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউণ্টেস ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস হিগিন্স ভিক্ষে করে করেছেন। কাউণ্টেস নিজে গেরুয়া কাপড় বাঙ্গালার শাড়ীর মত পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ্গ খুব ধরে গেছে দেখ্‌লাম। গাড়ী গাড়ী মেয়ে দেখ্‌লাম—সব ঐ বঙ্গের শাড়ী পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটি দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথমন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান কর্‌ছেন। সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেছে। আমাদের মত নয়—খালি আষাঢ়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এস্থান হতেই ব্রহ্ম সায়াম প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম গেছে। সিলোনি বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চল্‌তে চেষ্টা করে। নেপালি, সিকিমি, ভুটানি, লাদাকি. চীনে, জাপানিদের মত শিবের পূজা করে না; আর "হ্রীং তারা" ওসব জানে না। তবে ভূত টুত নামানো আছে। 'বৌদ্ধরা' এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু আম্নায় হয়ে গেছে। উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের বলে মহাযান; আর দক্ষিণি অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতিদের বলে হীনযান। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নাম মাত্র করে; আসল পূজোতারা- দেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের জাপানি, চীনি, কোরিয়ান্‌রা বলে কানয়ন্ ; আর হ্রীং ক্লীং তন্ত্র মন্ত্রের বড় ধুম। টিবেটিগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ মাংসর যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ, ভূত, প্রেত, তাড়াচ্ছে। চীনে আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে ওঁ হ্রীং ক্লীং—সব বড় বড় সোনালি অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাঙ্গালার এত কাছাকাছি যে বেশ বোঝা যায়।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে ফিরে গেল। আমরাও কুমার স্বামীর (কার্ত্তিকের নাম—সুব্রহ্মণ্য, কুমার স্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে এঁর ভারি পূজো, ভারি মান; এঁকে বলে ওঁকারের অবতার ইত্যাদি।) বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং ককোয়ানট), দু বোতল সরবত ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠ্‌লাম।　　[ক্রমশঃ।]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবার জন্য উৎসুক বিভিন্ন প্রকারের কোটি কোটি মানবের অভীষ্ট ফললাভ, যে সমাজবন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য,—কেবল কর্ম্মবাদ বা কেবল জ্ঞানবাদরূপ ভিত্তির উপর, সে সমাজ অবস্থান করিতে পারে না। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, পতঞ্জলি প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানমার্গের ঐকান্তিক উপাসকবৃন্দ, শুক, সনাতন, সনন্দন, নারদ, ধ্রুব

* ভাদ্র, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

প্রভৃতির ন্যায় ভক্তসমূহ ও জৈমিনি যাস্ক কুমারিল শবরস্বামী প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মৈকপ্রাণ মনীষিগণ যে সমাজের আশ্রয়ে নিজ নিজ লক্ষ্যের দিকে অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারেন, কেবল জ্ঞান বা কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সেই সমাজ সর্ব্বজনপ্রিয় হইবে ইহা অসম্ভব। সুবচনী হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত যে দেশের উপাস্য দেবতা; কাপালিক অঘোরপন্থী হইতে সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত যে দেশে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে উচ্চতম অধিকারী; শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আচারের সম্প্রদায়গুলি যে দেশের বিরাট সমাজের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ; পারলৌকিক আত্মার মঙ্গলের জন্য যে দেশের অধিকাংশ লোকই অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প;—সেই দেশে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণবাদ, জৈমিনির কর্ম্মবাদ বা শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ সমাজবন্ধনের মূলভিত্তি হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ভারত কেবল কর্ম্ম চাহে না, শুদ্ধ ভক্তিতে ভারতের আত্মা তৃপ্ত নহে, ভক্তিহীন, কর্ম্মহীন কেবল তত্ত্বজ্ঞান লইয়াও ভারত থাকিতে পারে না; অথচ ভারত কর্ম্মও চাহে, জ্ঞানও ভালবাসে, ভক্তি প্রেম ও শান্তিময় ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্যও ভারতের আকাঙ্ক্ষা চিরদিন প্রবল।

ভারতীয় সমাজের এই বিশেষভাব আচার্য্য শঙ্করের অমানুষী প্রতিভার বিষয় হইতে অধিককাল লাগে নাই; বাল্যকালেই দেশের এ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশের বিশৃঙ্খল বিপর্য্যস্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজের পুনরুজ্জীবনের দৃঢ়সঙ্কল্প হৃদয়ে ধরিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিতে হইলে সর্ব্বস্বত্যাগী হইতে হয় এ শিক্ষার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন—আচার্য্য শঙ্কর।

সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া স্বজাতির উদ্ধার করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর, যে নূতনপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথে চলিতে হইলে কি করিতে হইবে ও কি বুঝিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি, দশখানি উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তসূত্র অবলম্বন করিয়া, যে কয়খানি ভাষ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, মায়াবাদ তাহার সার; মায়াবাদরূপ মূলভিত্তির উপর শাঙ্কর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদের প্রচার হওয়ার পরদিন হইতেই হিন্দুসমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মায়াবাদের সর্ব্বসামঞ্জস্যকারিণী শক্তির প্রভাবে পৌরাণিক অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের যত প্রকার শাস্ত্র-গ্রন্থ আছে, তাহাদের প্রকৃতপক্ষে অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়া প্রযুক্ত যে সকল সংশয় উদিত হইয়া ধর্ম্মজীবন হিন্দুসমাজের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছিল মায়াবাদ-সূর্য্যের প্রখর যুক্তি-রশ্মিতে ঐ সকল সংশয়-অন্ধকার কোথায় মিলাইয়া গেল! সেই আচার্য্য শঙ্করের অমানুষী প্রতিভার অমৃতময়ফল এ হেন মায়াবাদের অন্তস্তত্ত্বে প্রবেশ করিতে কোন্ হিন্দুহৃদয়ের বাসনা জাগিয়া না উঠে? মায়াবাদ কি?—ইহার এক কথার উত্তর এই হইতেছে যে, জীবের বাসনাধীনই, প্রপঞ্চের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়, হইয়া থাকে; ইহাই—যে যুক্তিবলে স্থাপিত হইয়াছে তাহাই মায়াবাদ।

কথাটা বড়ই শক্ত হইল, সুতরাং একটু বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। [ক্রমশঃ]

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৮তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

দিব্য বাণী

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মপগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তেঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

হেম্নঃ কার্যং হুতবহগতং হৈমমেবেতি যদ্বৎ
ক্ষীরে ক্ষীরং সমরসতয়া তোয়মেবাম্বুমধ্যে।
এবং সর্বং সমরসতয়া ত্বংপদং তৎপদার্থে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

—শুকাষ্টকম্ ১, ৩

ত্রিগুণরহিত তত্ত্ব যাহা শব্দাতীত,
তাহারে জানিবামাত্র হয় বিগলিত
ভেদাভেদ ; নষ্ট হয় পুণ্যপাপচয় ;
দূরে যায় মায়ামোহ। বিগতসংশয়
ত্রিগুণ-অতীত পথে বিহার তাঁহার,
বিধি-নিষেধের বন্ধ কোথায় আবার ?

হেমময় আভরণ অনলে স্থাপিলে
হেমে হয় পরিণত ; দুগ্ধে দুগ্ধ মিলে ;
সলিল সলিলে মিলে—ব্রহ্মে লয় পায়
নিখিল জগৎ জীব—(জ্ঞানের প্রভায়)।
ত্রিগুণ-অতীত পথে বিহার যাঁহার
বিধি-নিষেধের বন্ধ কোথায় তাঁহার ?

কথাপ্রসঙ্গে

পার্থসারথির বাণী : 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব'

১

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে পার্থসারথির শ্রীমুখ হইতে সুদূর অতীতের এক মহাশুভক্ষণে যে পার্থসঞ্জীবনী বাণী উদ্‌গীত হইয়াছিল, সমস্ত ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া এবং কালেরও গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া আজ যাহা সমগ্র বিশ্বের নিত্যকালের অধ্যাত্মসম্পদ হিসাবে সমাদৃত, সে-বাণীর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইল নিস্ত্রৈগুণ্যত্ব। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের দ্বারা জীব আবদ্ধ হইয়া আছে। কি ব্যষ্টিজীবনে, কি সমষ্টিজীবনে সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় এই তিন গুণের খেলা। 'খেলা' নয়, 'দৌরাত্ম্য' বলিলেই সমীচীন হয় বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে, কারণ সর্বত্রই আজ রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য—সত্ত্ব উহাদের দ্বারা বিশেষভাবে অভিভূত। পাপপুণ্য সুখদুঃখ শুভাশুভ জন্মমৃত্যু—এই তিন গুণেরই পরিণাম। সুতরাং যেভাবেই হউক, এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে, মুক্তিলাভ করিতে হইবে—ইহাই শ্রীভগবান নানাভাবে শরণাগত সখা অর্জুনকে নিমিত্তমাত্র করিয়া বারংবার উপদেশ করিয়াছেন।

পার্থসারথি-উপদিষ্ট এই নিস্ত্রৈগুণ্যত্ব অনেকাংশে সাংখ্যদর্শনোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্যত্বের সদৃশ প্রতীয়মান হইলেও, উহা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় উহাতে ত্রিগুণাতীত-ভক্তির কোনও স্থান নাই। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, যে-ব্যক্তি গুণত্রয়ের বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একমাত্র ঈশ্বরের বা অবতীর্ণ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আশায় নৈরাশ্যে, 'ত্বমেব শরণং মম' বলিয়া শ্রীভগবানের প্রপন্ন ভক্ত হইয়াছেন, তিনি ভগবৎ-কৃপায় গুণাতীত হইবেন এবং তাহার পরও জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবদ্‌ভক্তি অবলম্বন করিয়াই দেহধারণ করিবেন। বলা বাহুল্য, সাংখ্যযোগীর এই ধরনের স্থিতির অবকাশ একেবারেই নাই।

অধিকন্তু সাংখ্যদর্শনোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্যত্বের প্রাপ্তির উপায় সর্বকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া—যতদূর স্বরূপতঃ ত্যাগ সম্ভব, ততদূর ত্যাগ করিয়া, কারণ 'ভোজনাদিব্যাপারস্তু আশরীর-ধারণাবধি'—অভ্যাস ও বৈরাগ্যসহায়ে ঈশ্বর-সম্পর্কলেশশূন্য ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও নির্গুণ পুরুষের বিবেক অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য-বিচার। পক্ষান্তরে গীতোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্যত্বের প্রাপ্তির উপায় শ্রীভগবানে ঐকান্তিক শরণাগতি এবং ইহাতে সর্বকর্মের ফলত্যাগের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে, স্বরূপতঃ সর্বকর্মত্যাগের উপর জোর একেবারেই নাই।

২

গীতায় যে নিস্ত্রৈগুণ্যত্বের কথা আছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে, সর্বাগ্রে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের স্বরূপ ও কার্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা সুবিদিত যে, গীতার একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে—চতুর্দশ অধ্যায়ে—এই গুণত্রয়ের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত

হইয়াছে। অন্যান্য অধ্যায়েও কিছু কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ— এই গুণত্রয় জীবকে দেহে আবদ্ধ করে। 'গুণ'-শব্দের একটি অর্থ রজ্জু। রজ্জুর দ্বারা যেমন পশুকে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, গুণত্রয়ের দ্বারাও সেইরূপ জীবের বন্ধনদশা ঘটে তমোগুণ জীবকে আলস্য জড়তা নিদ্রা প্রমাদ ইত্যাদির দ্বারা বদ্ধ করে। রজোগুণ রাগাত্মক; ইহার ফলে ভোগাভিলাষ, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহু কর্মে জড়িত হইবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি ভাবের উদয়ে জীব বদ্ধ হয়। তমঃ ও রজোগুণ যে জীবকে বদ্ধ করে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। উহা নির্মল, প্রকাশক অর্থাৎ চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক ও নিরুপদ্রব। সুতরাং উহা কিভাবে জীবকে বদ্ধ করে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে উপলব্ধ হয় না। সত্ত্বগুণের প্রাচুর্যে জীবের অশেষ সুখানুভূতি হয় এবং জ্ঞানেরও পরিধি বিস্তৃত হয়। রজঃ ও তমোগুণের আধিক্যে আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধির স্বাভাবিক শক্তি অভিভূত থাকে। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে নির্জিত করিয়া সক্রিয় হইলে জীব নিজেকে সুখী ও জ্ঞানী মনে করে। ইহাই জীবের বন্ধন। কারণ, সত্ত্বগুণও তো স্থায়ী নহে—উহা কালান্তরে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা কিছু-না-কিছু অভিভূত হইবেই। তখন জীব নিজেকে পূর্বাবস্থার তুলনায় দুঃখী ও অজ্ঞান মনে করিবে। কিন্তু জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই স্বরূপের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যদি অন্তঃকরণাদির দিক হইতে নিজেকে সুখী বা জ্ঞানী মনে করা যায়, তাহা হইলে উহা বন্ধনস্বরূপ। 'আমি সুখী বা জ্ঞানী নহি, পরন্তু সুখস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ'—এই দৃষ্টিই সম্যক্ দৃষ্টি, ইহাই মুক্তিমার্গ।

একে অন্যকে সর্বদাই করিতেছে। কখনও তমোগুণ প্রবল—রজঃ ও সত্ত্ব অভিভূত। কখনও রজোগুণ প্রবল—তমঃ ও সত্ত্ব অভিভূত। কখনও সত্ত্বগুণ প্রবল—রজঃ ও তমঃ অভিভূত। মনের যে এই ত্রিবিধ গতি আছে, ইহা আমরা পদে পদে লক্ষ্য করি। অন্তর্মুখ শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ব্যক্তি সহসা রজোগুণের প্রাবল্যে নানা কর্মে নিজেকে জড়িত করিয়া উদ্বেগজনিত দুর্ভোগ ভুগিতে লাগিল; বহির্মুখ ব্যক্তি সুকৃতিবশতঃ সত্ত্বগুণের উদয়ে কিছুকালের জন্য অন্তর্মুখ হইয়া নির্মল সুখের অধিকারী হইল; অথবা তমোগুণী ব্যক্তি রজোগুণী ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া কর্মপ্রিয় হইল—মানব মনের এই ধরনের অসংখ্য অবস্থান্তর আমাদের প্রতিনিয়ত দৃষ্টিগোচর হয়। কখন যে কাহার মনের পরিবর্তন ঘটিবে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। একটু ভাবিয়া দেখিলেই অনায়াসবোধ্য হয় যে, আমরা সকলেই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের দাস।

কিন্তু এই গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে আমাদের উঠিতে হইবে। নতুবা শাশ্বত শান্তি নাই। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করিলে স্বর্লোক হইতে সত্যলোক পর্যন্ত ঊর্ধ্ব-গতি হয়; রজোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহত্যাগ হইলে কর্মভূমি এই পৃথিবীতেই মনুষ্যরূপে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশুপক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়

কিন্তু মৃত্যুর পর পশুপক্ষীই হউক, মানুষই হউক বা দেবতাই হউক, কিছুতেই জীবের নিস্তার নাই। কারণ এইসকল দেহান্তর-প্রাপ্তি নিত্য নহে। পুণ্যক্ষয়ে সত্যলোক হইতেও মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। তখন আবার জীবনের ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, কে বলিবে! তাই গুণত্রয়ের পরিণাম-

প্রসঙ্গ শেষ করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিলেন, দেহোৎপত্তির কারণ এই তিন গুণ অতিক্রম করিলেই জীব জন্ম মৃত্যু ও জরারূপ দুঃখ হইতে জীবনকালেই বিমুক্ত হয় ও অমৃতত্ব লাভ করে। অর্থাৎ যে-উপদেশ তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্থকে দিয়াছিলেন, সেই 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব' উপদেশই প্রকারান্তরে এখানেও দিলেন। ইহার পর অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি গুণাতীতের যে লক্ষণাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ঐ গুণাতীত ব্যক্তি ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত জ্ঞানী ভক্ত যে একই আধ্যাত্মিক অবস্থাপন্ন, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। অধিকন্তু গীতার অন্তিম অধ্যায়ের 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকেও এই নিস্ত্রৈগুণ্য-লক্ষণই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং গীতার আদিতে মধ্যে ও অন্তে ত্রিগুণাতীতত্বই প্রতিপাদিত হওয়ায় উহাই নিঃসন্দেহে গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় —যে-কথার উল্লেখ আমরা এই নিবন্ধের প্রারম্ভেই করিয়াছি।

৩

উল্লেখ্য যে, এই 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব' উপদেশটির তাৎপর্য সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। সুতরাং বিষয়টির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

শোকমোহগ্রস্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় শিষ্যরূপে শরণাপন্ন অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন। তাহার পরই কর্মযোগের রহস্যপ্রসঙ্গে বলিতেছেন :

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

মহাভারতকার 'বিশালবুদ্ধি' ব্যাসদেব পার্থসারথির এই বাণীটি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫-সংখ্যক শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন। কর্মযোগের প্রসঙ্গ বলিয়া আচার্য শংকর 'নিস্ত্রৈগুণ্যে'র অর্থ করিয়াছেন—'নিষ্কাম'। তিনিই গীতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার অর্থাৎ বর্তমানে উপলব্ধ গীতার ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে তাঁহার ব্যাখ্যাই প্রাচীনতম। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, পরবর্তী কালের অধিকাংশ টীকা-ভাষ্যকারগণই তাঁহার ব্যাখ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। ফলতঃ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ স্বনামধন্য টীকাকারগণ পূর্বোক্ত 'নিষ্কাম' অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার রামানুজ লিখিয়াছেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব'—ইহার অর্থ হইতেছে, 'সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করো'। তিনি তাঁহার ব্যাখ্যার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহার চির-অনুগত একান্ত বশংবদ টীকাকার বেদান্তদেশিক সেই ব্যাখ্যার সঙ্গতি সপ্রমাণ করিতে যথেষ্ট বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

কোন সন্দেহ নাই, সমস্ত আচার্যগণের ব্যাখ্যাই শুভাবহ। তাঁহাদের শাস্ত্রব্যাখ্যায় কস্মিন্‌কালে কাহারও কোনও অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। তবে মানুষের মন বিচিত্র, রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কোনও ব্যাখ্যাই সকলেরই মনঃপূত হইতে পারে না। আচার্যগণ নিজেরাই যে নিজেদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহারা ব্যাখ্যান্তর দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রথম ব্যাখ্যাটি তাঁহাদের মনোমত না হইলে, আরেকটি ব্যাখ্যা দেন, সেটিও রুচিকর না হইলে আরেকটি দেন। এবং পাঠকবর্গেরও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, ব্যাখ্যাকারদের যে-ব্যাখ্যাটিতে তাঁহাদের মন সায় দেয়, তাহাই গ্রহণ করিতে। ইহাতে আচার্যগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা প্রমাণিত হয় না।

বিতর্ক-জটিল আলোচ্য শ্লোকটির যে-ব্যাখ্যা আচার্য শংকর বা আচার্য রামানুজ করিয়াছেন,

নানাকারণে তাহাতে আমাদের মন সায় দেয় না। আমাদের মনে হয়, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে'র অর্থ ত্রিগুণাতীত। প্রথম কারণ, কর্মযোগপ্রসঙ্গে উপদিষ্ট বলিয়াই যে চরম উপদেশ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা মনে হয় না। দ্বিতীয় কারণ, এইরূপ অর্থ করিলে শ্লোকটির অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ের সহিত স্বাভাবিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তৃতীয় কারণ, কয়েকটি শ্লোকের পরেই স্থিতপ্রজ্ঞের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। চতুর্থ কারণ, শব্দের যে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা— এই ত্রিবিধ শক্তি আছে, তাহার মধ্যে যেখানে অভিধা-শক্তিসহায়ে অর্থাৎ আভিধানিক মুখ্য অর্থসহায়ে ব্যাখ্যা সম্ভব, সেখানে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যেখানে অভিধাশক্তির দ্বারা কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না, কেবলমাত্র সেই স্থলেই লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। 'নিস্ত্রৈগুণ্য'-শব্দটির পরিষ্কার মুখ্যার্থ হইতেছে ত্রিগুণাতীত। সুতরাং অন্যরূপ অর্থ করা নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঐ অধ্যায়েরই ৪৪-সংখ্যক ও ৫৩-সংখ্যক শ্লোকোক্ত 'সমাধৌ' বা 'সমাধি'-শব্দটিকে উহার সুপ্রসিদ্ধ অর্থেই গ্রহণ করা যায়—টানিয়া-বুনিয়া অন্যরূপ অর্থ করিতে হয় না। পঞ্চম কারণ, 'নিস্ত্রৈগুণ্য'—এই বিশেষণ পদটির পরবর্তী 'নির্দ্বন্দ্ব' 'নিত্যসত্ত্বস্থ' 'নির্যোগক্ষেম' এবং 'আত্মবান্'—এই চারিটি বিশেষণ ত্রিগুণাতীত ব্যক্তিরই লক্ষণ হওয়ায় উহারা আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থকেই সমর্থন করে। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ নিত্য নহে, আত্মারই 'সৎ-ত্ব' নিত্য; তাই 'নিত্য-সত্ত্বস্থে'র অর্থ 'আত্মস্থ'। আলোচ্য শ্লোকটির এই ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আরও অনুপুঙ্খের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনুকূল যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা সম্ভব নহে।

ইংরেজীতে প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যাকার ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং মনীষী শ্রীঅরবিন্দও 'নিস্ত্রৈগুণ্যে'র অর্থ ত্রিগুণাতীত-ই করিয়াছেন। স্বল্পখ্যাত একাধিক চিন্তাশীল ব্যক্তি, যাঁহারা জীবনের বহু বর্ষ গীতার অনুশীলনে অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদের গীতা-ব্যাখ্যা গ্রন্থায়িত করিয়াছেন, তাঁহারাও 'ত্রিগুণাতীত' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আধুনিক যুগের মানুষ বলিয়া প্রাচীন-প্রবণতাহেতু উন্নাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কালিদাসের শ্লোকচরণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বলিতে পারা যায়: 'ন চাপি ভাষ্যং নবমিত্যবদ্যম্'—ব্যাখ্যা নূতন বলিয়াই নিন্দনীয় হয় না।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দও 'নিস্ত্রৈগুণ্যে'র অর্থ 'ত্রিগুণাতীত' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন- ও উপদেশ-ধন্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে তাঁহার সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সংস্করণে আলোচ্য শ্লোকটির অন্যরূপ অর্থ করিলেও, জনৈক ব্যাখ্যাকারের 'ত্রিগুণাতীত'-পক্ষে ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন: 'আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম।…পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারংবার বলিয়াছেন, 'মতুয়ার বুদ্ধি' (Dogmatism) কোরো না। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার উদার মন্তব্য সকল ব্যাখ্যাকারেরই সমর্থনীয় ও অভিনন্দনীয়।

৪

এই নিস্ত্রৈগুণ্যত্ব—ত্রিগুণাতীতত্ব—কিভাবে

লাভ করিতে হইবে পার্থসারথি তাহা গীতার সপ্তম অধ্যায়ে সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন :

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই 'মায়া'। মায়া 'গুণময়ী' অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা। এই মায়া 'দৈবী'—কখন কাহাকে কি বিচিত্র প্রকারে যে আবদ্ধ করিবে, তাহা বুদ্ধির অগম্য। অতএব ইহা 'দুরত্যয়া' ইহাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। কিন্তু মায়া ঈশ্বরেরই। এই কারণে যাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরেরই বা অবতীর্ণ ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়েও—'কি উপায়ে গুণত্রয়ের অতীত হওয়া যায়?' অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে—শ্রীভগবান বলিয়াছেন :

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

—যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ভজনা করেন, তিনি এই গুণত্রয় সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হইতে সমর্থ হন।

রজঃ ও তমোগুণ হইতেই যে যাবতীয় দুঃখ-দুর্গতি শরণাগত ভক্ত তাহা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া শরণাগতিরই অঙ্গহিসাবে গীতার শেষ দুই অধ্যায়ে বর্ণিত রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা, রাজস ও তামস আহার ইত্যাদি বর্জন করিয়া সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক যজ্ঞ-দান-তপস্যা, সাত্ত্বিক কর্ম, সাত্ত্বিক জ্ঞান ইত্যাদি অবলম্বন ও অনুশীলন করেন। কারণ, প্রথমতঃ সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ নির্জিত না করিয়া তমোগুণ বা রজোগুণের ভূমি হইতে সরাসরি ত্রিগুণাতীত-ভূমিতে উত্তরণ সম্ভব হয় না। এইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণের হৃদয়ে সত্ত্বগুণেরও প্রতি যে-আকর্ষণ থাকে, তাহাও বন্ধন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, সত্ত্বগুণও চোর; উহা সাধককে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দেয় বটে, কিন্তু লক্ষ্য পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে না; তবে সত্ত্বগুণই সিঁড়ির শেষ ধাপ, উহার পরই ছাদ। ভগবৎ-কৃপায় সাধকের এই শেষ বন্ধনও দূরীভূত হয়। শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তিনি স্বয়ং তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া ভাস্বর জ্ঞান-প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট করেন। এইরূপ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মভূত ব্যক্তি যে পরা ভক্তি ও পরম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাহাও শ্রীভগবান গীতার অন্তিম অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

জীব ঈশ্বরের শরণাগত হয় না, কারণ তাহার বোধই নাই যে, সে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। সুকৃতিবশে যখন এই বোধের উদয় হয় এবং গুণত্রয়ের বন্ধন অসহ্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, তখনই জীব ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। মায়াধীশ ঈশ্বরের দ্বারাই মায়াধীন জীবের মায়ামুক্তি সম্ভব। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : নমু সর্বৈঃ পরিদৃশ্যমানস্য জগতঃ কথং মিথ্যাত্বং ? দৃশ্যত্বাৎ এব শুক্তি-রূপ্যাদিবৎ জগতঃ মিথ্যাত্বম্ ইতি চেৎ, তর্হি ব্রহ্মণঃ অপি দৃশ্যত্বাৎ মিথ্যাত্বাপত্তিঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ —**দৃশ্যাদ্ অন্যঃ** ইতি। দৃশ্যাৎ চৈতন্যবিষয়াৎ অন্যঃ বিষ্ণুঃ ইতি শেষঃ। 'অদৃষ্টো দ্রষ্টা' (বৃহ. উ. ৩।৭।২৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ইতি অর্থঃ। দৃশ্যাৎ অন্যত্বে হেতুম্ আহ—**নির্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ** ইতি। বিষয়ানপেক্ষ-বিজ্ঞান-স্বভাবত্বাৎ ইতি অর্থঃ। 'বিজ্ঞানঘনঃ' (বৃহ. উ. ২।৪।১২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কূটস্থ-জ্ঞানমাত্র-স্বরূপস্য কথং সর্বজ্ঞত্বম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ— **জ্ঞাতৃজ্ঞানেত্যাদিনা**। **জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়-বিহীনঃ** অপি জ্ঞাতা জ্ঞানাশ্রয়ঃ। জ্ঞানম্ অবিদ্যায়াঃ অন্তঃকরণস্য বা পরিণামবিশেষঃ। জ্ঞেয়ং বিয়দাদিবস্তু, তদ্রহিতঃ অপি অবিদ্যাদ্যুপহিতঃ সন্ সদা জ্ঞঃ জ্ঞাতা, 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' (শ্বে. উ. ৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ইতি অর্থঃ। তস্মাৎ জগতঃ মিথ্যাত্বাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বম্ অবাস্তবং তটস্থং তদুপলক্ষণং, ন তু বিশেষণম্ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : (পূর্বপক্ষী) সর্বজন কর্তৃক (সাক্ষাৎ) পরিদৃষ্ট (এই) জগৎ মিথ্যা কেন হইবে ?

(সিদ্ধান্তী যদি বলেন—) শুক্তিরজতাদির ন্যায় দৃশ্য বলিয়া এই জগৎ মিথ্যা, (তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন—) তাহা হইলে দৃশ্য[১] বলিয়া ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব-প্রসঙ্গ হইবে—এই আশঙ্কার উত্তরে (আচার্য) বলিতেছেন : **দৃশ্যাদ্ অন্যঃ** - দৃশ্য হইতে অর্থাৎ চৈতন্যের বিষয় হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন—'বিষ্ণু', এই শব্দটি অধ্যাহার করিয়া বাক্য শেষ করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ, যথা 'অদৃষ্টো দ্রষ্টা'—তিনি (ব্রহ্ম) স্বয়ং অদৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনের অবিষয় হইয়াও সকলের দ্রষ্টা (প্রকাশক)। তিনি (ব্রহ্ম) দৃশ্য হইতে ভিন্ন, এই বিষয়ে হেতু বলা হইতেছে : **নির্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ**—কারণ, ব্রহ্ম বিষয়-নিরপেক্ষ[২] বিজ্ঞানস্বরূপ। 'তিনি (দৃশ্যত্বরহিত) বিজ্ঞানঘন-স্বরূপ'—এইরূপ শ্রুতিও এই বিষয়ে প্রমাণ।

---

১ সাক্ষাৎ-জ্ঞান-বিষয়ত্বই 'দৃশ্য' শব্দের অর্থ। অদ্বৈতবেদান্তমতে এইরূপ দৃশ্যত্ব যাহার থাকে, তাহা মিথ্যা। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও 'দৃশ্যত্ব'—এই হেতুটিকেই মিথ্যাত্বের সাধক বলা হইয়াছে। পূর্ব-পক্ষীর মতে ব্রহ্মও সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন বলিয়া 'দৃশ্যত্ব'-নামক হেতুটি ব্রহ্মে রহিয়াছে ; সুতরাং যাহা দৃশ্য, তাহাই মিথ্যা—অদ্বৈতবেদান্তীদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়েন।

২ জড়পদার্থই জ্ঞানের বিষয় হয়। ব্রহ্ম অজড় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াই কোন জ্ঞানের বিষয় হন না। অতএব সাক্ষাৎ-জ্ঞান-বিষয়ত্বরূপ দৃশ্যত্ব ব্রহ্মে নাই—ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিমত।

(শঙ্কা) কূটস্থ (অর্থাৎ নির্বিকার) এবং জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম কি প্রকারে সর্বজ্ঞ[৩] হইতে পারেন ?—এই শঙ্কার উত্তরে (আচার্য) বলিতেছেন : **'জ্ঞাতৃজ্ঞান…'** ইত্যাদি।—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটি-রহিত হইয়াও তিনি (ব্রহ্ম) জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয়। অবিদ্যা বা অন্তঃকরণের পরিণাম-বিশেষই (এখানে) জ্ঞান[৪] এবং আকাশাদি বস্তুই জ্ঞেয়। এই ত্রিপুটি-রহিত হইয়াও তিনি (ব্রহ্ম) অবিদ্যা ইত্যাদি[৫] উপহিত হইয়া **'সদা জ্ঞঃ'** - সর্বদা জ্ঞাতা (সর্বপ্রকাশক । এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ, যথা -'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' - (প্রত্যগভিন্ন) ব্রহ্ম সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে জানেন (অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন), তাঁহার জ্ঞাতা কেহই নাই, ইহাই এই শ্রুতির অর্থ।

অতএব জগতের মিথ্যাত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বাস্তব নহে, উহা (ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব) তটস্থ লক্ষণ বা তাঁহার (ব্রহ্মের) উপলক্ষণ[৬] মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মের বিশেষণ নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল। [ক্রমশঃ]

---

৩ যিনি সমস্ত জানেন, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা বা আশ্রয় নহেন। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না—ইহাই পূর্বপক্ষীর বক্তব্য।

৪ বেদান্তমতে অজ্ঞানের পরিণাম অন্তঃকরণ একটি তৈজস (তেজোনির্মিত) পদার্থ। ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মাধ্যমে বহিঃস্থিত বিষয় পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হয়-ইহার নাম বৃত্তি। এইরূপ বৃত্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে বিষয়াকারা বৃত্তি প্রকাশিত হয়-ইহার নাম বিষয়ের জ্ঞান।

৫ মায়া এবং অবিদ্যা পৃথক্—এই মত গ্রহণ করিলে মায়োপহিত চৈতন্যকে সর্বজ্ঞ বলিতে হইবে। কাহারও মতে অন্তঃকরণ-উপহিত, অপর কাহারও মতে বৃত্তি-উপহিত চৈতন্যই সর্বজ্ঞ। এইরূপ বিভিন্ন মতের কথা স্মরণ করিয়াই টীকাকার 'অবিদ্যাদি'-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

৬ যে ধর্মের সাহায্যে কোন বস্তুকে অন্য সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে নির্ধারণ করা যায়, সেই ধর্মকে ব্যাবর্তক ধর্ম বলে। ব্যাবর্তক ধর্ম দুই প্রকার : উপলক্ষণ ও বিশেষণ। নির্ধারণ-কালে বিশেষ্যে বর্তমান না থাকিয়াও যে ধর্ম বিশেষ্যকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, সেই ধর্মকে উপলক্ষণ বলে। যেমন, কোন এক কালে একটি গৃহের উপর শকুন বসিয়াছিল, তাহার পর শকুনটি সেই গৃহের উপর না থাকিলেও, উহা 'শকুন-বসা গৃহ' বা 'শকুন-পড়া গৃহ'—এই বলিয়া অন্য গৃহ হইতে পৃথক্ করিয়াই সেই গৃহটিকে নির্ধারণ করা হয়। এখানে শকুনটি উপলক্ষণ।

আর যে ধর্ম বিশেষ্যে বর্তমান থাকিয়াই তাহাকে অন্য সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, সেই ধর্মকে বিশেষণ বলা হয়। যেমন, নীল বস্ত্র। এখানে 'নীল'-শব্দটি বস্ত্রের বিশেষণ।

যাহা জগতের কারণ, তাহাই ব্রহ্ম, ইহাই 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম সমস্ত উপাধিশূন্য এবং নির্বিকার বলিয়া জগৎকারণত্ব-ধর্মটিও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মে নাই। অতএব 'জগৎকারণত্ব' ব্রহ্মের উপলক্ষণ মাত্র, বিশেষণ নহে। এই উপলক্ষণেরই বেদান্তশাস্ত্রসম্মত নাম 'তটস্থ লক্ষণ'। বেদান্তপরিভাষা, বিষয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীমতী স্নেহলতা সেনগুপ্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belurmath
26. 5. 27

মা স্নেহ,

তোমাদের বাড়ীতে বিপদ যাইতেছে সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলাম। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমার শিশুসন্তানটি শীঘ্র রোগমুক্ত হউক এবং তোমরা সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ কর। কোন ভয় নাই, বাবার খবর শীঘ্র পাইবে।

ঠাকুরের কৃপায় আমার শরীর আজকাল মন্দ নয়। মঠেরও সমস্ত কুশল। ঠাকুরের কৃপায় তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস নিশ্চয়ই লাভ হইবে। কাতরে প্রার্থনা কর—তাঁর দয়া নিশ্চয়ই হইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং বাড়ীতে সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

Sri Ramakrishna Math
Belurmath
11/9/30

মা স্নেহ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মা, ছেলেপিলের অসুখ, তুমি আর কি করিবে? চিঠি না দিয়েছ, তাতে কিছু হয় নাই; ঠাকুর আছেন তাঁকে খুব ডাকবে—তাঁর কৃপায় ছেলেপিলেদের অসুখ সেরে যাবে—হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস লাভ হইবে। খুব, মা, তাঁকে ডাকবে।

আমার শরীর ভাল নয়। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং ছেলেদের সব জানাইবে। মঠে দুর্গাপূজা হইবে। মার কৃপায় তোমাদের কল্যাণ হউক। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belurmath
14.2.32

মা স্নেহলতা,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সুখী হইয়াছি। হাঁ মা, ঠাকুর তোমাদের নানান বিপদে ফেলেছেন। তিনি যখন ঐরূপ করছেন, তাঁর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা কর। তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন। তাঁর আশীর্ব্বাদে সব বিপদ আপদ নিশ্চয়ই কেটে যাবে। আমিও প্রার্থনা করছি তিনি তোমাদের সুখ, শান্তি, আনন্দ, ভক্তি, বিশ্বাস দিন।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে, তত ভাল নয়। তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বেলুড় মঠ,
হাওড়া
*

মা স্নেহলতা,

তোমার পত্র ২খানা পেয়েছি। উৎসবাদি ও মাঝে ২ শারীরিক অসুস্থতার দরুন তোমার পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। সেজন্য কোন চিন্তা করিও না। পত্র না লিখিলেও সর্ব্বদাই তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ঠাকুর তোমাদের সকলের কল্যাণ করুন—তোমরা তাঁকে নিয়ে আনন্দে ও শান্তিতে জীবন কাটাও। আশ্রম দূরে তাহা আমি জানিতাম না। সুবিধা হইলে তথায় যাইবে—ঠাকুরের স্থানে গেলে ভক্তদের ভাল লাগে তাই লিখিয়াছি—কষ্ট বা অসুবিধা করিয়া যাইও না। ছেলেদের জ্বর নিয়া পরীক্ষা দিতে হইয়াছে—কি করিবে? যাক্ আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি ঠাকুরের কৃপায় সব পাশ হউক এবং সুস্থ হইয়া তাঁহার চরণে ভক্তি বিশ্বাস লাভ করুক। অধিক কি লিখিব। আমার শরীর মন্দ নয়। পুনরায় তুমি ও বাটীস্থ সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

* পোষ্টকার্ডটিতে বেলুড় মঠ ডাকখানার ছাপ আছে: 27 MAR 33 (27th March 1933)।—সঃ

ধ্যান

স্বামী প্রভবানন্দ

সর্বোচ্চ স্তরের সমাধিলাভই হ'ল ধ্যানের বা আধ্যাত্মিক জীবনের অথবা জীবনেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য। চেতনার তিনটি স্তর আছে, আমরা জানি: জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এগুলির পরে আছে চতুর্থ স্তর, তুরীয়। এর নাম সমাধি। নির্বিকল্প অর্থাৎ সর্বোচ্চ সমাধিলাভের পর স্বামী বিবেকানন্দ নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন:

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্,' বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥'

নিষ্কর্ষ এই যে, সমাধিপথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পায়, অহংভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। নিম্ন স্তরের (সবিকল্প) সমাধিতে এই 'অহং' থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে 'অহং'-ও লোপ পায়। যা থাকে তা বাক্যমনের অগোচর। সবিকল্প সমাধিতে 'অহং' থাকলেও আমি কে, আমি কোথায়, আমি কি, তা' জানা যায় না।

অতএব শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হ'ল নির্বিকল্প সমাধি। যাঁরা ঐ সমাধি থেকে ফিরে আসেন, তাঁরা কি দেখেন? তাঁরা সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখেন—যেমন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে বলছেন, 'কিছুই নেই, আছেন শুধু ভগবান।' তারপর বলছেন, 'ভগবান সব কিছু হয়েছেন।' আমার গুরুদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন আমাকে বলেন, 'আমি ঐরূপ ভাবাবস্থায় থাকলে দেখতে পাই, ভগবান আছেন রকমারি খোলের ভিতর সাধুর খোলে, দুষ্ট লোকের খোলে, চোরের খোলে, আবার ভাল লোকের খোলে। কিন্তু ভগবান ছাড়া আর কিছুই দেখি না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি ধাতব বিগ্রহ গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে, সেই বিগ্রহের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যে, মনে হত একটি ছোট্ট শিশুর সঙ্গে তিনি খেলছেন। এই বিষয়টি নিয়ে একদা আমার এক গুরুভাই-এর সঙ্গে আলোচনাকালে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, ঠাকুর ভাবমুখে এই কাজ করেছিলেন। আমার মন্তব্যটি শুনতে পেয়ে মহারাজ বললেন, 'তুই দেখছি সবজান্তা হ'য়ে গেছিস।' আমি বললাম, 'আপনি কি বলতে চান যে, এই চর্মচক্ষুতেই ধাতু, বিগ্রহ ও আর সব কিছুতেই ভগবান দর্শন করা যায়?' মহারাজ এক কথায় এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন—বললেন, 'জড় ও চেতনের সীমা-নির্দেশক রেখাটি আমাকে দেখা দিকি।' আমাদের চোখে সবই জড় বস্তু, কিন্তু যাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে তাঁরা সব কিছুই দেখেন চেতনস্বরূপে—এক আত্মা ছাড়া তখন আর কিছুই দেখা যায় না। তাই এইরূপ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করাই লক্ষ্য হওয়া চাই। স্বামীজী ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন, 'মানুষের ভিতর পূর্বাবধি বিরাজিত দেবত্বের উন্মেষই হ'ল ধর্ম।' অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে ভগবানের অস্তিত্ব—সেইটি উপলব্ধি করাই হ'ল ধর্ম। সুতরাং

ঈশ্বরানুসন্ধানীকে প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে যে, দেবত্ব অন্তরের বস্তু—ঈশ্বর অন্তরের মধ্যেই বিরাজমান।

ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের রাজ্য যে অন্তরেরই মধ্যে বিরাজমান—এই অনুভূতি বা ভাব পৃথিবীর সকল ধর্ম কর্তৃকই স্বীকৃত সর্বত্রই এই ভাব দেখা যায়—কেবলমাত্র বেদান্তেই নয়; খ্রীষ্ট, ইসলাম, সুফি, বৌদ্ধ সকল ধর্মের মধ্যেই দেখা যায় এই মতবাদের অস্তিত্ব। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'তোমরাই ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বর সেই মন্দিরেই বিরাজিত। এখানে নয়, সেখানে নয়, ঐ দেখ তোমাদের ভিতরেই আছে ভগবানের রাজ্য।' কিন্তু এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। ভগবানের সন্ধানে তুমি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াতে পার; তুমি হয়তো ভাবতে পার, যদি ভারতবর্ষে গিয়ে হিমালয়ে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন পর্বতগুহায় তপস্যায় রত হই, তাহলে ভগবানের দর্শন পাব। এক কালে আমারও সর্বদা এইরূপ মানসিক প্রবণতা ছিল যে, কৃচ্ছ্রসাধন করে তপস্যায় রত হই, কিন্তু আমার গুরুদেব বললেন, 'না, এইখানে বসেই তাঁর সন্ধান কর, তাহলেই সর্বত্র তাঁর দেখা পাবে; যদি এখানে না পাও, তাহলে আর কোথাও পাবে না।' তারপর আরো বললেন, 'তোমাদের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন কি? আমরা তো সবই তোমাদের জন্য করে রেখেছি।'

অন্তরের মধ্যে সেই অনন্ত সত্তার উপস্থিতি ব্যতীত আমরা জীবিত থাকতে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে, চিন্তা করতে—কোনও কর্মই করতে পারি না। কেনোপনিষদে বলা হয়েছে:

'(শিষ্য)—কার ইচ্ছায় প্রেরিত হয়ে মন চিন্তা করে? কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রাণ ক্রিয়া করে? কার ইচ্ছায় মানুষ বাক্য উচ্চারণ করে? কোন্ জ্যোতির্ময় পুরুষ চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন?

'(গুরু)—তিনি কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু। বিবেকিগণ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে এই সংসার থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে অমৃতত্ব লাভ করেন।'

অমৃতত্বলাভের অর্থ এই যে, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। শরীর তো আর অমর হয় না, কিন্তু তাঁরা জীবৎকালেই উপলব্ধি করেন যে, তাঁদের মৃত্যু নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ একদা আমাকে বলেছিলেন, এমন একটা সময় তাঁর গেছে, যখন তিনি অনুভব করতেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট। একবার চিন্তা ক'রে দেখুন তো এই ব্যাপারটি! কিন্তু অন্তরের অন্তরতম স্থলে এটা অনুভব করতে হবে। কেবল কথায় কিছু হবে না বই-পড়া বিদ্যা বা তোতাপাখীর মত আওড়ে যাওয়ার বুলিতে কিছুমাত্র কাজ হবে না।

অন্তরস্থ ভগবদ্‌রাজ্যকে বেদান্ত অভিহিত করেছেন 'আত্মা' ব'লে। এই আত্মাই ব্রহ্ম। মূলতঃ মানুষ তিনটি আবরণে আচ্ছাদিত ঈশ্বর-সত্তা। সে তিনটি আবরণ হ'ল—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। এই তিন শরীরেরই আছে খাদ্যের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, স্থূল দেহ খাদ্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। সূক্ষ্ম দেহেরও আছে খাদ্যের প্রয়োজন—যেমন সাংস্কৃতিক জীবন, শিল্প, বিজ্ঞান—বৌদ্ধিক যাবতীয় বিষয়। এবং কারণ দেহ, যাকে বলা হয় 'আনন্দময় কোষ', তারও আছে আহারের প্রয়োজন—নতুবা তা যায় শুষ্ক হ'য়ে। এই কারণ দেহের খাদ্য কি?—ধ্যান, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, ঈশ্বরচিন্তা। এই হ'ল এই দেহের খাদ্য।

ধ্যান সম্ভব হয় এবং সহজসাধ্য হয় যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে। কিন্তু এই ভক্তি জন্মাবে কি ক'রে? একটি বাংলা গানে আছে: 'খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।' যতই ঈশ্বরচিন্তা করবে, যতই তাঁতে মন নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করবে, ততই তোমার হৃদয়ে ভক্তি-বৃদ্ধি হবে। এই ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃতি, সকল প্রকার প্রেমেরই প্রকৃতি দিব্য। পত্নীর প্রতি পতির প্রেম, পতির প্রতি পত্নীর প্রেম অথবা সন্তানের প্রতি মাতাপিতার প্রেম—সবই স্বর্গীয়। কিন্তু এই সত্যটি তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, পতি, পত্নী, সন্তানের অন্তঃস্থিত ঈশ্বরকেই তুমি ভালবাসছো। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ী সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে: যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সমুদয় ধনসম্পদ মৈত্রেয়ীকে (এবং তাঁর অপর ভার্যা কাত্যায়নীকে) দান করে সন্ন্যাস নেবেন। মৈত্রেয়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি ধনপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী আমার হয়, তাহলে কি আমি অমর হবো?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, 'না। ধনীদের জীবন যেমন হয়, তোমারও জীবন সেইরকমই হবে, কারণ ধনের দ্বারা অমরত্বের আশা নেই।' মৈত্রেয়ী বললেন, 'যা দিয়ে আমি অমর হতে পারবো না, তা দিয়ে আমার কী হবে?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'তুমি তো আমার আদরণীয়াই ছিলে, এখনও আমার প্রিয় কথাই বলছো।' তারপর তিনি মৈত্রেয়ীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। বললেন,—

'পতির জন্যই যে পতি প্রিয় হন, তা নয়; পতির অন্তরস্থ পরমাত্মার জন্যই পতি প্রিয় হন। পত্নীর জন্যই যে পত্নী প্রিয় হন, তা নয়; পত্নীর অন্তরস্থ পরমাত্মার জন্যই পত্নী প্রিয় হন। সন্তানদের জন্যই যে সন্তানরা প্রিয় হয়, তা নয়; সন্তানদের অন্তরস্থ পরমাত্মার জন্যই সন্তানরা প্রিয় হয়...।' অর্থাৎ পতি, পত্নী, সন্তান প্রভৃতি সকলেরই অন্তরস্থ পরমাত্মাকেই যে আমরা ভালবাসছি এটা জানতে হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে: আমরা যদি মূলতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ হই, তাহলে আমরা তা জানতে পারি না কেন? একভাবে বলা যায় যে, আমরা সকলেই তা জানি। কারণ, আমরা সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করি। ঈশ্বর কি বস্তু? প্রথমতঃ তিনি সৎস্বরূপ—অনন্ত জীবনস্বরূপ। আমরা সকলেই চাচ্ছি অনন্ত জীবন, কিন্তু সাধারণতঃ তা চাই স্থূল দেহে। মহান পাণ্ডবগণের অন্যতম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'পৃথিবীতে সব চেয়ে আশ্চর্য কি?' যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন, 'প্রতিদিন মানুষ মরছে, তবু আমরা ভাবি যে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকবো। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে?' দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর চিৎস্বরূপ—শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানেরই সাহায্যে আমরা সব কিছু করছি এবং আমাদের জানার আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান কি তা আমরা জানি না। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। আমরা সকলেই আনন্দের জন্য লালায়িত, কিন্তু তা খুঁজি জড়ে; আমাদের অন্তরের গভীরে যে পরমানন্দ সত্তা, তার খবর রাখি না। একজন মনস্তত্ত্ববিদ যথার্থই বলেছেন, 'ভগবানলাভের প্রেরণা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, কিন্তু পরিচালিত হয় সে প্রেরণা ভুল পথে।'

যদি পরমানন্দস্বরূপ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়েই নিত্য বিরাজিত, তাহলে আমরা আনন্দের সন্ধানে বাইরে যাই কেন? এ বিষয়ে উপনিষদ বলছেন: 'স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করেই সৃষ্টি করেছেন। এইজন্য মানুষ বাহ্য বিষয়সমূহই দর্শন করে অন্তরাত্মাকে নয়। বিরল কোন বিবেকী ব্যক্তি অমৃতত্বের অভিলাষী হয়ে

ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত ক'রে অন্তরাত্মাকে দর্শন করেন।' এই প্রসঙ্গে আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমরা প্রায় একশ তীর্থযাত্রী হিমালয়ে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ দর্শন করতে যাবার সময়ে দেখতে পেলাম হিমালয়ে সূর্যকিরণের অপূর্ব সৌন্দর্য। সেই অপূর্ব সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে তীর্থযাত্রীরা কি করলেন? তাঁরা সেখানে বসে পড়ে ধ্যান করতে শুরু করলেন। তাঁদের মনের ভাবটা এই যে, বাহ্যজগতের সৌন্দর্য যখন এত বেশী, অন্তরের সৌন্দর্য না জানি আরো কত বেশী! এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা বলেছেন:

'মানুষকে তাদের কাজের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তারা ধন, মান বা ইন্দ্রিয়সুখকে সব চেয়ে ভাল বলে মনে করে। এদের মধ্যে শেষোক্তটি ভোগের পর আসে অবসাদ ও অনুতাপ। অপর দুটি মেটানো যায় না কখনও। যত পাই, তত চাই; আবার যশের আকাঙ্ক্ষা আমাদের বাধ্য করে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে অপরের মতামতের দ্বারা। কিন্তু যা আমাদের ভালবাসার বিষয় হয় না, তার জন্য কোন বিবাদ বিসংবাদ হয় না, তা নষ্ট হলেও দুঃখ হয় না, অপরে তা লাভ করলে হিংসা হয় না, সংক্ষেপে বলা চলে, মনে কোন চাঞ্চল্য আসে না। যা নশ্বর তার প্রতি ভালবাসাই ঐ সব মানসিক চাঞ্চল্যের উৎস। অপর দিকে যা অবিনশ্বর ও অসীম, তার প্রতি ভালবাসা মনকে অবিমিশ্র আনন্দে পরিপূর্ণ করে। সুতরাং এই অবিমিশ্র আনন্দই আমাদের পরম কাম্য এবং তার প্রাপ্তির জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।' অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় 'নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্'—অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতন জীবগণের যিনি চৈতন্যস্বরূপ—সেই পরমাত্মাকেই আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'অনুসন্ধানে'র অর্থ: আমাদের অন্তরে যিনি রয়েছেন, শুধু তাঁর আবরণ উন্মোচন করা। আগেই বলেছি, ভগবান আমাদের অন্তরেই আছেন আর আধ্যাত্মিকতা হ'ল পূর্ব থেকে বিরাজিত আমাদের অন্তরস্থ দেবত্বকে উদ্ঘাটন করা। এই দেবত্বকে পেতে হবে না, এ পাওয়া হয়েই আছে—শুধু আবরণটুকু উন্মোচিত করে দিতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন গুপ্তধন মাটির নীচে প্রোথিত আছে আর মাটির উপর দিয়ে আমরা সকল সময়ে চলাফেরা করছি। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? যতক্ষণ না গুপ্তধন বার হচ্ছে, ততক্ষণ সাবল দিয়ে খোঁড়া। যদি কেউ বলেন, অমুক স্থানে তেল পাওয়া যেতে পারে; খোঁড়াখুঁড়ি করা সত্ত্বেও তেল না পাওয়াও যেতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্তক্ষেত্রে গুপ্তধনের আবিষ্কার নিশ্চিত, কারণ গুপ্তধন যে সব সময়ে সেখানেই ছিল। এই খনন কাজটি কি? এটি হ'ল আধ্যাত্মিক সাধনা। এখানে আর একটা আপত্তি উঠতে পারে, আমরা যতই সাধনা করি না কেন, সব সাধনাই তো সীমিত—সীমিত উপকরণ দিয়ে কি অসীমকে পাওয়া যায়? আচার্য শঙ্কর এর উত্তরে বলেছেন, 'বাধাগুলিও সীমিত—অনাদি কিন্তু সান্ত।' বাধাগুলি দূর কর, দেখবে অসীম 'স্বে মহিম্নি' বিরাজিত। সূর্য মেঘাবৃত; একটা দমকা হাওয়া এসে মেঘ সরিয়ে দিল; সূর্য প্রকাশিত হল। সাধনার দ্বারা বাধা অপসারিত করে ঈশ্বরলাভও ঠিক সেইরকম।

এই সব বাধাকে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের কাজ আবার দু'রকম।

প্রথমতঃ আত্মাকে ঢেকে রাখা; দ্বিতীয়তঃ যার কোনই অস্তিত্ব নেই, সেই 'অহং'কে সৃষ্টি করা। এই 'অহং'কে—'আমি'কে খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর। এটা ঠিক একটা পিঁয়াজের মতো। পিঁয়াজের ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য একটার পর একটা খোসা ছাড়িয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত দেখবে কিছুই নেই। তাহলে 'আমি' বলবো কা'কে? এই স্থূল দেহটি কি তুমি? তোমার চরিত্র বা তথাকথিত ব্যক্তিত্বটা কি তুমি? তাই যদি হয়, তাহ'লে একজন চোরও বলতে পারে, 'আমার চৌর্যবৃত্তি ছাড়বো না; ছাড়ি যদি, তাহ'লে আমার ব্যক্তিত্বকে হারাবো।' তাহ'লে আমাদের ব্যক্তিত্ব আছে কোথায়? আছে অসীমে, ভগবানে।

'অহং'-এর যে বাস্তব সত্তা নেই, তা আগেই বলেছি। এই মিথ্যা 'অহং' থেকে—'অস্মিতা' থেকে—জন্মায় 'রাগ', 'দ্বেষ' ও 'অভিনিবেশ'। যা সুখ দেয় তার প্রতি আসে 'রাগ' অর্থাৎ আসক্তি, আর যা দুঃখ দেয় তার প্রতি আসে 'দ্বেষ' অর্থাৎ প্রতিকূল মনোভাব। আর 'অভিনিবেশে'র কথা আগেই বলেছি, আমরা সবাই চিরকাল বেঁচে থাকতে চাই—জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধই অভিনিবেশ। এ থেকেই হয় মৃত্যুভয়। জীবনের প্রতি মমত্ববোধ এমনই সহজাত সংস্কারে পরিণত হয়েছে যে, এমন কি যারা যথোচিত ধ্যান করে, তারাও দেখবে যত তারা ভিতরে প্রবেশ করবে, যেন তাদের হাঁফ ধরছে, মনে হচ্ছে যেন তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু অধ্যাত্মপরায়ণ ব্যক্তি এই সহজাত সংস্কারকেও জয় করেন।

এই সব বাধা দূর করবার জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিসের—মানবজন্ম, মুক্তির ইচ্ছা আর মহাপুরুষের আশ্রয় অর্থাৎ গুরুকৃপা। গুরু কে? যিনি ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। তা না হলে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার মতো হবে। দু'জনেই পড়ে যাবেন গর্তে। সেইজন্য প্রয়োজন হয় এমন একজন মহাপুরুষের আশ্রয়—যিনি ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যদি তোমার সেরকম তীব্র হয়, শ্রীভগবানই গুরুমূর্তিতে তোমাকে শিক্ষা দেবেন। তাই ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষাই হ'ল—সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা।

গুরুর মুখ থেকে শুনতে হবে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। তুমি কোন শাস্ত্রই পাঠ না করতে পার, অথবা পৃথিবীর সকল শাস্ত্রই তুমি পাঠ করতে পার, কিন্তু তাতে তুমি পাবে না ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান আসবে গুরুরই কাছ থেকে।

অনেক সময় লোকে মনে করে যে, গুরুর ধারণা কেবলমাত্র হিন্দুধর্মেই দেখা যায়। কিন্তু এটা সব ধর্মের মধ্যেই আছে। বাইবেলে আমরা পড়ি—নিকোডিমাস নামে এক ব্যক্তি যীশুর নিকট এসেছিলেন; যীশু তাঁকে বললেন, 'সত্য সত্যই আমি তোমায় বলছি, কোন মানুষ জলে ও আত্মায় না জন্মালে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।' (জলে জন্মান বলতে কি বুঝায়? তাকে কি জলে ডুবতে হবে? না, একেই আমরা বলি দীক্ষা। ব্যাপটিজম্ ও দীক্ষা একই জিনিস। আর আত্মায় জন্মানর অর্থ হ'ল সমাধিলাভ; তখনই তুমি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পার।) নিকোডিমাস তখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলি হবে কি করে?' যীশু উত্তরে বললেন, 'আমি সত্যসত্যই তোমাকে বলছি, আমরা যা জানি, তাই বলি; আমরা যা দেখেছি তারই সাক্ষ্য দিই; তবু তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।' তারপর তিনি একটি সুন্দর সত্যের নির্দেশ দিলেন—'কোন মানুষই স্বর্গে অধিরোহণ করেনি, যে নাকি স্বর্গ থেকে নেমে

আসেনি। এমন কি ঈশ্বরের পুত্র যাঁর অবস্থান স্বর্গে, তিনিও নেমে এসেছেন মর্তে।' মনে রাখতে হবে এই কথাটি - যদি স্বর্গ থেকেই নেমে না আসতেন, তাহলে কেউ-ই স্বর্গে যেতে পারতেন না। আমরা সবাই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি—কোথায় সেই স্বর্গ? অন্তরে। আমাদের সকলেরই অন্তরে রয়েছে ঈশ্বরের রাজ্য,—যেমন ঈশ্বরপুত্র যীশুরও অন্তরে ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, দেবত্বেই মানুষের জন্মগত অধিকার। আমরা স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ, তা না হলে আমরা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

আমাদের গুরুদেব ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। তাঁর উপস্থিতিতে আমরা অনুভব করতাম—ঈশ্বর যেন করতলধৃত একটি ফলের মত, তাঁকে জানা এত সহজ। আমার গুরুদেব আমায় বলেছিলেন, 'এই আত্মবিশ্বাস রেখো —অপরে যখন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছে, তখন আমিই বা তা' পারব না কেন?' যীশু বলেছিলেন, 'যে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, তার ধ্বংস নেই, সে নিত্য-জীবন লাভ করবে।' এই বিশ্বাস কথার কথা নয়—খাঁটি, পাকা বিশ্বাস চাই। এ দেশে আসার আগে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-প্রণেতা 'শ্রীম'র কাছে গিয়ে তাঁকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কাছে গিয়ে কি লাভ করেছেন?' তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্বাস'—সেই অবিচলিত বিশ্বাস যা আসে ঈশ্বর-উপলব্ধির পর।

আধ্যাত্মিক সাধনা করতে করতে হৃদয় পবিত্র হলে ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়। স্বামীজী বলেছিলেন, পৃথিবীর সকল শাস্ত্রই যদি নষ্ট হয়ে যায়, কেবল যীশুখ্রীষ্টের 'যাঁদের হৃদয় পবিত্র তাঁরা ধন্য; কারণ তাঁরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করবেন'—এই একটিমাত্র বাণী যদি বেঁচে থাকে, তাহলেই ধর্ম বেঁচে থাকবে।

আধ্যাত্মিক সাধনা বলতে কি বোঝায়? প্রধানতঃ আমাদের নিত্য ও অনিত্যের বিচার করতে হবে। সব কিছু সতত পরিবর্তনশীল; আজ আছে, কাল নেই। তবে থাকে কি? থাকেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না: শাস্ত্র সব মুখে উচ্চারণ করা হয়েছে, তাই এঁটো হয়ে গেছে, কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি, সেটি ব্রহ্ম।

এই ব্রহ্মবস্তুকে জানতে হলে বিদ্যামায়ার আশ্রয় নিতে হবে। ধ্যান, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সংগ্রাম, শাস্ত্র—এ সবই বিদ্যামায়ার অন্তর্গত। কিন্তু বিদ্যামায়া মানুষকে মায়ারও পারে নিয়ে যায়। 'অহং'-বোধ না থাকলে ধ্যান করা যায় কি? আমাদের নিতে হবে প্রতীকের সাহায্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বর সাকার, নিরাকার আরও কত কি! কিন্তু আমরা তাঁকে শুধু সাকার বা নিরাকার ভাবেই চিন্তা করতে পারি। এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। ব্রহ্ম যেন বিরাট সাগর, তার উপর ভাসছে নানা আকারের বরফের পাহাড় (অর্থাৎ ঈশ্বরের অবতারগণ)। তুমি গ্রহণ করতে পার, যীশুখ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ অথবা শ্রীশ্রীমাকে —এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে সেই শাশ্বত সত্য। অথবা তুমি নিতে পার আধ্যাত্মিক প্রতীক 'ওম্' এই শব্দটিকে এই শব্দই ব্রহ্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন শাশ্বত বৈদান্তিক ধর্ম মানবজাতির সম্মুখে খুলে দেয় অন্তরঙ্গ দেবমন্দিরের অসংখ্য প্রবেশদ্বার ও তার সম্মুখে রাখে আদর্শসমূহের অফুরন্ত বিন্যাস; আর প্রত্যেকটি আদর্শই সেই এক ঈশ্বরের অভিব্যক্তি।

এখন ধ্যান-অভ্যাস কি করে করা যায়,

তা' দেখা যাক্। গুরু শিষ্যের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করে তার 'ইষ্ট' নির্ধারণ করেন ও সেইমত শিষ্যকে একটি মন্ত্র দেন। শিষ্য ধ্যান করতে আরম্ভ করে কিন্তু অর্জুনের মত সেও অনুভব করে, 'মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রবল ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভকর। মনকে বিষয়বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা—বায়ুকে পাত্রবিশেষে আবদ্ধ করার মতোই—সুকঠিন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন, মন যে দুর্নিরোধ ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহায়ে তাকে সংযত করা যায়।' (অভ্যাসের উপর জোর দিয়ে আমার গুরুদেব বার বার আমাকে বলতেন,—ধ্যান কর্, ধ্যান কর্, ধ্যান কর্।)

ধ্যানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন, 'বায়ু-বর্জিত স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, ধ্যান-অভ্যাসকারী সংযত যোগীর চিত্তও সেরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে। ধ্যানাভ্যাস দ্বারা যখন যোগীর মন নিরুদ্ধ হয়, তখনই তাঁর আত্মোপলব্ধি হয় এবং তিনি পরম সন্তোষ লাভ করেন। শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা উপলব্ধ এই অতীন্দ্রিয় সুখ অসীম। তিনি এতে অবস্থান করেন এবং সেজন্য আত্মস্বরূপ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ন না।'

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন : 'প্রশান্তচিত্ত রজো-বৃত্তিশূন্য নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত যোগী পরম সুখ লাভ করেন। মনকে সর্বদা যোগযুক্ত ক'রে নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মাভিন্ন আত্যন্তিকী শান্তি লাভ করেন। সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির সর্বত্র সমদৃষ্টি হয়। তিনি নিজ আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ আত্মাতে দর্শন করেন।'

সাধকের এই অবস্থা হঠাৎ হয় না। ভগবৎ-কৃপা চুম্বকের মতোই তোমাকে আকর্ষণ করবে এবং সে আকর্ষণ তুমি স্পষ্ট অনুভব করবে। তখন তুমি হয়ে যাবে নিজের এবং সমগ্র মানব-জাতির আশীর্বাদস্বরূপ।

মহান বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের বাণীর উল্লেখ ক'রে শেষ করছি :

'সব চেয়ে সুন্দর ও সব চেয়ে প্রগাঢ় ভাবাবেশ, যা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য, তা' হচ্ছে অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি। সকল প্রকৃত বিজ্ঞানের এটাই উৎস। এ ভাব যার অজানা, যে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আবিষ্ট হবার শক্তি হারিয়েছে, সে মৃতের সদৃশ।

'আমাদের কাছে যা অনধিগম্য, তা সত্যই বিদ্যমান এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান ও প্রোজ্জ্বল সৌন্দর্যে তা প্রকাশিত, আমাদের জড়বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তা আমরা অত্যন্ত আদিম আকারেই শুধু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি—এই জ্ঞান, এই বোধই হচ্ছে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমি।'*

* হলিউড বেদান্তকেন্দ্রে ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ। অনুবাদক : শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ।—সঃ

আবির্ভাব

শ্রীমতী মানসী বরাট

যাঁহার আলোকে আলোকিত হয়
সূর্য চন্দ্র তারা,
কি করিবে তাঁর অন্ধ আঁধার
বন্ধ কংসকারা!

চিরজাগ্রত ভগবান
নাশিতে তমসা অমারাত্রির
আজিকে দীপ্যমান!

কোথা দুর্যোগ শৃঙ্খলবন্ধন!
অজ্ঞান যত সান্ত্রীরা অচেতন।
নবচেতনার বিজয়বিষাণ
মন্দ্রিল আহ্বান—
এসেছেন আজ মুক্ত চিরন্তন
কৃষ্ণ জনার্দন।

বৃন্দাবনের ধূলি

(ভজন)

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী*

ওরে বৃন্দাবনের ধূলি
তোরে মাথায় নিয়ে দুঃখ ব্যথা
সকলি যাই ভুলি।
কোন্ স্বরগের তুই রে মায়া
ধরার বুকে রাখলি কায়া
আপনারে তুই বিলিয়ে দিলি
হৃদয় দুয়ার খুলি।
সাধ জাগে মোর তোরি মত
হই চরণের রেণু
যে পথে যায় ব্রজের রাখাল
বাজিয়ে মোহন বেণু।
পরশে মোর সকল হিয়া
উঠবে জেগে শিহরিয়া
মুক্তি পেয়ে হৃদয়খানি
উঠবে দুলি দুলি॥

প্রার্থনা

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য †

নির্মল কর বুদ্ধি আমার চিত্ত শুদ্ধ কর,
কর পবিত্র সংযত-মন সুন্দর অন্তর।
নিরত করহে পুণ্য কর্মে করহে বিগত-ভয়,
বিরত করহে অন্যায় কাজে অবিদ্যা কর ক্ষয়।
সত্তম কর সজ্জন কর প্রেমময় অন্তর।

---

* কাব্যতীর্থ, সাহিত্যভূষণ

† রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক

মনের কলুষ করহে বিলোপ বিষয়-এষণা নাশ,
নিষ্কাম কর নির্লোভ কর করহে নিরভিলাষ।
কর তিতিক্ষু সত্যসন্ধ করহে নিরঞ্জন,
কর অকপট অনসূয় কর কুমতি নিয়ন্ত্রণ।
দাও কল্যাণ শুভ সদিচ্ছা, শান্ত সুমতি কর।

প্রীতি অনুরাগে সেবা আর ত্যাগে আর্তপূজারী কর
নিষিক্ত কর করুণার রসে মরমী দরদী কর।
মোচন করহে হীনতা মূঢ়তা অনুচিত অভিমান,
দাও পরজ্ঞান বিবেক বিরাগ করহে ভক্তিমান।
কর নিস্পৃহ বিমুক্ত-মোহ কামনা শমিত কর।

জাগাও শ্রদ্ধা বিশ্বাস বল শৌর্য বীর্য দাও,
বলিষ্ঠ কর দ্রঢ়িষ্ঠ কর বরিষ্ঠ করে নাও।
বিনম্র কর সন্নত কর করহে শরণাগত,
দাও অবিচল শম দম জ্ঞান কর কর অনুগত।
মঙ্গল কর কুশল কর্মে কর প্রীয়মাণ কর।

ভক্ত-জিজ্ঞাসা

শ্রীমতী অপর্ণা রায়*

প্রাণের চেতন বেদনায়
রাঙ্গানো যে ভালবাসা রাখী—
হাসিমুখে তুমি পরেছ কি ?

শতাব্দীর ভাব যন্ত্রণায়
যে কথাটি বলা ছিল বাকী
কাণ পেতে তুমি শুনেছ কি ?

অলক্ষ্য আলোক-তীর্থপথে
পদচিহ্ন কে গিয়েছে আঁকি
চোখ মেলে তুমি দেখেছ কি ?

ধ্যানের কুসুম রাশি রাশি
দিকে দিকে সে-ই ছড়াল কি,
মুঠাভরে তুমি তুলেছ কি ?

* এম. এ. (কলিকাতা), এম. এ. (লণ্ডন), অধ্যাপিকা, লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ, কলিকাতা

সমন্বয়ের সাধক*

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

(১)

রামানন্দ

ভারতের ধর্ম কেবল গ্রন্থ ও বুদ্ধির ধারণাতেই আটকে নেই, মানুষ তাকে জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। যা সত্য তা শুধু বিশ্বাস করলে বা বুঝলেই হবে না, তাকে উপলব্ধি করতে হবে, তবেই হবে জীবন-সমস্যার সমাধান। উপলব্ধিই ধর্ম—এই-ই ভারতের চিরন্তন প্রাণবাণী।

ধর্মের মূল সত্যগুলি চিরদিন একই রকম থাকে—সত্য তো আর পালটায় না। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনচর্যা, সমাজ প্রভৃতি যুগে যুগে পালটে যায়ই। তাই ধর্মের মূল সত্য অপরিবর্তিত থাকলেও সে সত্য লাভ করার জন্য সর্বসাধারণের চলার পথ যুগে যুগে কালোপযোগী করার প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে ভারতে এই কাজটি করার জন্ত লোক এসে যানই। আচার্য রামানন্দ এঁদেরই একজন।

আচার্য রামানন্দের জীবনকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীকে স্পর্শমাত্র ক'রে সমগ্র চতুর্দশ শতাব্দী জুড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বিস্তৃত—১২৯৯ থেকে ১৪১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, ১১১ বছর। ভারতে তখন মুসলমান শাসন চলছে—তাঁর জীবৎকালে খিলজীবংশের শেষ সুলতান এবং তোঘলকবংশের সবাই শাসন করেছেন। সে সময় ভারতের ধর্মজীবনে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিভিন্ন শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের দ্বৈত সাধনার প্রভাব তো ছিলই, তদুপরি পড়েছিল মুসলমান ধর্মেরও প্রভাব।

রামানন্দ এ সব-কিছুর ভেতর থেকেই যা ভাল জিনিস, যার সর্বকালীন মূল্য রয়েছে তা আহরণ করে, সেগুলিকে সমন্বিত ও প্রেমভক্তি-মণ্ডিত করে গড়ে তুলেছিলেন জীবনের পরম তীর্থযাত্রার— অধ্যাত্মসাধনার— একটি নতুন পথ। যা সঙ্কীর্ণতা-দোষদুষ্ট, তার কোন কিছুরই স্থান ছিল না সে পথে। সে পথে জ্ঞান, যোগ, এবং ভক্তির প্রপত্তি বা শরণাগতির সমন্বয় ঘটেছিল। নিজ সম্প্রদায়মধ্যে সামাজিক প্রথাগুলিরও সংস্কারসাধন করেছিলেন তিনি এই উদার দৃষ্টি নিয়েই—হিন্দুসমাজের ভিতরকার জাতিগত কোন ভেদ তো নয়ই, হিন্দু-মুসলমানেও কোন ভেদ ছিল না সেখানে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান সাধক কবীরের নাম সর্বজনবিদিত।

রামানন্দের পূর্ব নাম রামদত্ত। প্রয়াগের নিকটবর্তী মালকোটে ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মেছিলেন। পিতা পুণ্যসদন, মাতা সুশীলা দেবী। এই মালকোট কেবল রামানুজের পদধূলিপূতই নয়, রামানুজ এখানে একটি বিষ্ণু-মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আট বছর বয়সে, উপনয়নের পরই রামদত্তের অধ্যয়ন আরম্ভ হয়, গ্রামেই। বারো বছর বয়সের সময় কাশী এসে তিনি এক স্মার্ত পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন শুরু করেন। এই সময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে রামানুজপন্থী মহাপুরুষ রাঘবানন্দের সঙ্গে তাঁর

* আকাশবাণীর সৌজন্যে

সাক্ষাৎ হয়। রাঘবানন্দ কিশোরটিকে দেখা মাত্র তার অন্তরের বৈভব দেখতে পেলেন এবং তাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে নিজ আশ্রমেই রেখে দিলেন। নাম রাখলেন 'রামানন্দ'। শোনা যায়, রামানন্দ স্বল্পায়ু নিয়ে জন্মেছিলেন, রাঘবানন্দই নিজ শক্তিবলে তাঁকে দীর্ঘায়ু করেন।

দীর্ঘকাল আশ্রমে রেখে রামানন্দের অধ্যাত্মজীবন নিজে হাতে গড়ে তোলার পর রাঘবানন্দ তাঁকে পরিব্রাজকরূপে ভারতভ্রমণ করতে আদেশ করেন। রামানন্দ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে গঙ্গাসাগর—সারা ভারত ঘুরে তৎকালীন সমাজের অবস্থা ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন। গঙ্গাসাগরে এসে তিনি কপিল মুনির সাধনপীঠ আবিষ্কার করেছিলেন; সেখানে পরে মন্দির হয়েছে। আশ্রমে ফিরে এসে তিনি গুরুদেবকে জানালেন যে, ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে কালোপযোগী সাধনপথ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেছে, আশ্রমের সাধনপদ্ধতির ও নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্তনের তিনি পক্ষপাতী; বিশেষ করে জাতিগত কোন বৈষম্যই তিনি এখানে রাখতে চান না। সবাই যখন ভগবানের সন্তান, তখন তাঁর ভক্তদের ভেতর জাতি-বংশগত কোন ভেদ আবার থাকবে কেন?—সকলকেই সব রকম সামাজিক অধিকার সমানভাবে দেওয়া দরকার—"জাতি পুতি পুছই না কোই। হরিকো ভজই সব হরিকো হোই।" রাঘবানন্দ তাঁর এই উদারভাবে খুশী হলেন, তবে নিজ আশ্রমে রামানুজাচার্য-প্রবর্তিত কোন নিয়মের পরিবর্তন করতে চাইলেন না। রামানন্দকে নিজের মতো করে সম্প্রদায় গঠন করার জন্য প্রাণ খুলে অনুমতি দিলেন। রামানন্দ করলেনও তাই। শোনা যায়, এই আশ্রমেরই আশানন্দ, পরমানন্দ, মহানন্দ প্রভৃতি ছয় জন রামানুজপন্থী রামানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সঙ্গেই আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

রামানন্দ যে নতুন সাধনপথ প্রবর্তিত করেন, তা "রামওয়াৎ" বা রামানন্দের নামানুসারে "রামানন্দ" সম্প্রদায় নামে খ্যাত। রামানন্দের সমকালীন ও পরবর্তীকালীন কয়েক শতাব্দীর উদার ভাব ও ভক্তি প্রচারক-গণের ওপর রামানন্দের প্রভাব পড়েছিল বলা যায়। তাঁরা সকলেই রামানন্দের মতো ধর্মের অনুষ্ঠান-ভাগ যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়ে বৈরাগ্য- ও ভক্তি-বৃদ্ধির ওপরই জোর দিয়েছিলেন সর্বাধিক। রামানন্দ এবং চৈতন্যদেব ছাড়া এঁদের ভেতর আর কেউ-ই বাহ্য পূজাকে পর্যন্ত সমর্থন করতেন না। একথাও বলা যায়, উত্তর ভারতে ব্যাপক ভাবে ভক্তিসাধনা প্রবর্তনের মূলেও তিনি। একটি লোক-চলিত কথা আছে, "ভক্তির উদ্ভব দ্রাবিড় দেশে। রামানন্দ তাকে নিয়ে এলেন উত্তর ভারতে, কবীর তাকে ছড়িয়ে দিলেন সব ঠাঁই।"

রামানন্দের প্রচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি: (১) জাতিভেদ-প্রথা না মানা; (২) চলিত ভাষায় প্রচার; (৩) অনুষ্ঠান যথাসম্ভব বাদ দিয়ে বৈরাগ্য-, পবিত্রতা- ও ভক্তি-বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া। জপের ওপর খুব জোর দিতেন তিনি। পবিত্রতা এবং বীরভাবের বিকাশের অধিকতর সহায় হবে জেনেই তিনি রামচন্দ্রকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামোপাসনা প্রচার করলেও এই রামই যে বেদান্তের ব্রহ্ম, সেই অদ্বয় নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই যে বিভিন্ন সাকার রূপে পূজিত হন, এই সচ্চিদানন্দই যে আসল গুরু, আমাদের সকলেরই স্বরূপও যে তিনি—স্বরূপতঃ আমরা তাঁর সঙ্গে অভেদ—এ

কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন শিখদের 'গ্রন্থসাহেব'-এ বিবৃত তাঁর রচিত একটি গাথায়। সেটিকে (অনুবাদ) আমরা আজ শেষ অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করছি এই সমন্বয়াচার্যের স্মৃতিপূজায় :

আমি বাহিরে আর ছুটবো কোথায়,
কিসের তরে ?
উৎসব তো চলছে নিতুই আমার ঘরে—
আমার আপন হৃদয়-পুরে।
আমার মন-পাখী তাই গুটিয়ে ডানা
বসে আছে চুপটি করে ॥

হৃদয়-জুড়ে এলো যেদিন আবেগের প্লাবন
পূজিবারে পরব্রহ্মে, উদ্দেশে তাঁর চন্দন-ধূপ
করতে নিবেদন—
গুরু সেদিন দেখিয়ে দিলেন,
নয় বাহিরে—নয়কো দূরে—
ব্রহ্ম আছেন আমারি এই হৃদয়-পুরে ॥

লোকে তাঁকে বৃথাই খোঁজে বেদে,
হেথা-সেথা বেড়ায় খুঁজে কেঁদে।
ওগো আমার হৃদয়বাসী,
তুমিই আমার গুরু!
তুমিই আমার সকল ব্যর্থতারে,
অজ্ঞান আঁধারে,
দিয়েছ শেষ করে ॥

প্রভু আমার, গুরু আমার
তোমারই হোক জয়!
রামানন্দ হারিয়ে গেছে এই গুরুরই মাঝে—
হয়ে গেছে সে-ও ব্রহ্মময়!
এই গুরুরই নামের গুণে ছিন্ন হয়ে যায়
চিরদিনের তরে
লক্ষ লক্ষ করম পাশ
অবলীলাভরে ॥

(২)

রুহিদাস

ভগবান সকলেরই হৃদয়ে রয়েছেন, সেদিক থেকে সব মানুষই সমভাবে শ্রদ্ধার পাত্র, সকলেই ঈশ্বরের মন্দির। আমাদের দেহটি মন্দিরের বাইরের গঠন, আর মনবুদ্ধি যেন গর্ভমন্দির— যেখানে চেতনারূপে ভগবান অধিষ্ঠিত। মন্দিরের বাইরেটা, আমাদের দেহটা, আমরা সবাই দেখতে পাই। কোন মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তাই তার দেহকে কেন্দ্র করেই। গর্ভমন্দিরটি মনবুদ্ধি— আমরা দেখতে পাই না বটে, তবে মানুষের আচরণ, কথা, লেখা প্রভৃতি দৈহিক কর্মের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত তার চিন্তা ও বুদ্ধির পরিচয় পাই। তাই মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তার মনবুদ্ধিকেও কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কিন্তু দেহাভ্যন্তরে, মনবুদ্ধিরও অভ্যন্তরে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই আসল মানুষটির সন্ধান আমরা পাই না। পাই না বলেই সব মানুষকে আমরা এক বলে জানতে পারি না, আমাদের কথায় না হলেও কাজের বেলা ভেদদৃষ্টি থেকেই যায়।

থাকার কারণ মানুষে-মানুষে দেহ-মন-বুদ্ধিগত পার্থক্য আছেই—দুজন মানুষের দেহ কতকগুলি বিষয়ে সমরূপ হলেও ঠিক একরকম হয় না। মন-বুদ্ধিও তাই ; কতকগুলি বিষয়ে সকলেরই মন সমধর্মী হলেও দুজন মানুষ ঠিক একইভাবে চিন্তা বা বিচার করে না। দেহ-মন-বুদ্ধির দিক থেকে সত্যি আমরা এক নই, বিভিন্ন। তার ওপর আবার মানুষ নিজেই কতকগুলি বাহ্য ভেদ সৃষ্টি করে নিয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি নিয়ে।

এই সব ভেদদৃষ্টি নিঃশেষে মুছে যায়, মানুষ যখন নিজের এবং সকলেরই ভেতর দেহমন্দিরে হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত আসল মানুষটিকে দেখতে পায় কারণ তখন সে দেখে, এই আসল মানুষটি স্বয়ং ভগবান। নিজের এবং সব মানুষেরই ভেতর সেই একই ভগবানকে সে দেখে তখন। ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে অসংখ্য মানুষ এ সত্য প্রত্যক্ষ করে এসেছেন বলে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে পরম সাম্যের বাণী প্রচারিত। কিন্তু হলে কি হবে? আচরণে স্বার্থান্ধ সাধারণ মানুষ সমাজে ভেদ সৃষ্টি করে রাখতই; বিশেষ করে জাতি- ও ধর্মগত ভেদ। একসময় আমাদের সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছিল এই ভেদদৃষ্টি; নিম্নবর্ণের মানুষকে ঘৃণা করতেন উচ্চবর্ণের মানুষেরা, সামাজিক ও ধর্মাচরণের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করতেন তাদের।

তার ওপর মুসলমানরা যখন ভারতে এল তখন নতুন করে আর একটা ভেদসৃষ্টি হল—হিন্দু-মুসলমান ভেদ।

সেই সময়, মধ্যযুগে, কয়েকজন আচার্য এই সব সর্বনাশা ভেদদৃষ্টিকে মুছে দিতে তৎপর হয়েছিলেন। আচার্য রামানন্দ, যাঁর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তাঁদের অন্যতম। রুহিদাস তাঁরই শিষ্য।

নিজগুরু-প্রচারিত মতই রুহিদাসের মত: "মনুষ্যজাতি এক পরিবার। সব মানুষই ভাই-ভাই, সবাই সমান। সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান। কোন্ জাতির ঘরে, কোন্ বংশে কে জন্মেছে, তা দিয়ে ঠিক করা যায় না কে ছোট, কে বড়। অপর মানুষের ওপর কার কতখানি ভালবাসা, কতখানি সহানুভূতি, তাই-ই হচ্ছে কে ছোট, কে বড় তা নির্ণয় করার একমাত্র মাপকাঠি।"

রুহিদাস ছিলেন ঈশ্বরভক্ত, মানবপ্রেমিক, মানবসেবাপর। সাধনার বলে নিজের ও সকলের মধ্যে একই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে তিনি প্রচার করেছেন সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখে ভালবাসার কথা, সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকই বিভিন্নভাবে একই ভগবানের আরাধনা করছে—এই সত্য ধারণা করার কথা। এভাবে সর্ববিধ ভেদ মুছে দিয়ে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও সমন্বয়সাধনের চেষ্টা তিনি আজীবন করেছিলেন।

ইতিহাস বলে, এই প্রচেষ্টায় ব্রতী তৎকালীন কোন আচার্যই ব্যাপক সাফল্যলাভ করতে পারেন নি; কিন্তু যেটুকু সাফল্য তাঁরা অর্জন করেছিলেন, সমসাময়িক পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিক থেকে তা অমূল্য। প্রয়োজনের দিক থেকে বলা যায়, সমসাময়িকই বা কেন, আধুনিক যুগেও মানুষে-মানুষে সর্ববিধ ভেদদৃষ্টির অপসারণের প্রয়োজনবোধই তো সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন আকারে সোচ্চার। (বৃহত্তর ক্ষেত্রব্যাপী, সারা পৃথিবীব্যাপী সে প্রয়োজন মেটাবার জন্য নবযুগে মহাশক্তিধর আচার্যও অবতীর্ণ হয়েছেন।)

রুহিদাস নিজেই ছিলেন চর্মকারবংশোদ্ভূত। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বহু ব্যক্তি শ্রদ্ধাবনত হয়েছিলেন তাঁর কাছে; এমনকি চিতোরের রাণী ঝালি এবং শোনা যায় মীরাবাঈও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নিজ ইষ্ট গিরিধারী-লালই যে নামরূপাতীত অদ্বয় নির্গুণ সত্তা, এই সত্য উপলব্ধি করে নিজ আধ্যাত্মিক জীবনকে পূর্ণতা দিবার জন্যই মীরাবাঈ রুহিদাসের সহায়তা নিয়েছিলেন বলে কথিত। রুহিদাসের

নিজের ইষ্ট রামচন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি নাম-রূপাতীত অনাদি অনন্ত অদ্বয় ভগবানেরই উপাসক ছিলেন, যে ভগবানের সঙ্গে রামচন্দ্রকে তিনি অভেদ বলে জানতেন, যে ভগবানকে তিনি সর্ববিধ আচার-অনুষ্ঠানের পারে বলেছেন। রুহিদাস বলতেন, "কোন আচার-অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না; ঈশ্বরে যার প্রেম হয়েছে, কেবল সেই-ই তাঁকে খুঁজে পায়।" আর সব মানুষের ভেতর প্রেমের পথে সেই ঈশ্বরকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই বলতেন "মানবসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

রুহিদাসের জন্মস্থান বারাণসী। চতুর্দশ শতাব্দীর লোক তিনি। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, তিনি জাতিস্মর ছিলেন। জ্ঞান হবার পরই তিনি পিতাকে উপনয়নের জন্য পীড়াপীড়ি করেন—নইলে ভগবানলাভের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চর্মকারের ছেলের উপনয়ন! বিমূঢ় পিতা তাঁকে রামানন্দের কাছে নিয়ে গিয়ে সব বললে তিনি রুহিদাসকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। রুহিদাস শান্ত হন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের বৈরাগ্যও বাড়ছে দেখে মা-বাবা তাড়াতাড়ি তাঁর বিবাহ দিলেন। রুহিদাস পৈতৃক কার্য জুতোসেলাই করেই সংসার নির্বাহ করতে লাগলেন। তারই মধ্যে যথাসাধ্য দানাদি করতেন; ইষ্ট-স্মরণ তো চলতই কাজের ভেতরই। শেষে তিনি আত্মীয়-স্বজন থেকে একটু দূরে থাকতেন। একটা ঝুপড়ি বেঁধে নিয়েছিলেন; একটি শালগ্রাম শিলা যোগাড় করে নিত্যসেবা শুরু করেন।

কোনরকমে সংসার চলছিল, পিতার মৃত্যুর পর বারাণসীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনটনের আর অন্ত রইল না। শোনা যায়, এই সময় এই ভক্ত সাধকের দারিদ্র্য দূর করার জন্য একদিন এক বণিক তাঁকে একটি পরশপাথর দিতে চাইলেন। রুহিদাস প্রত্যাখ্যান করলেন—"সেকি বস্তুজ্ঞান করে পরশ রতন। নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥" বণিক আবার একদিন এসে প্রচুর অর্থ দিতে চাইলেন তাঁকে। রুহিদাস তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, "অর্থে রজোগুণ বাড়িয়ে দেবে, রঘুবীরের কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে নেবে।" বণিক কিন্তু রেখে গেলেন প্রচুর অর্থ। রুহিদাস পরে তা দিয়ে মন্দির নির্মাণ করে রামচন্দ্রের পূজা ও ভক্তসেবা শুরু করেছিলেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, রুহিদাসের ইষ্টদেবই বণিকের ছদ্মবেশে এসেছিলেন এবং দ্বিতীয় দিন নিজ মূর্তিতে তাঁকে দর্শনও দিয়েছিলেন। সেই "পীতাম্বর, ঘনশ্যাম, শ্যামল সুন্দর"-কে দেখে রুহিদাসের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। পরে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ জেনে সে অর্থ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁরই সেবার জন্য।

রুহিদাস, রইদাস এবং রবিদাস একই ব্যক্তি। তাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম "রুহিদাসী" বা "রইদাসী" সম্প্রদায়। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। নিজ প্রচারিত বাণীকেই মূর্ত করেছিলেন তিনি নিজ জীবনে, মানুষের হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ভগবানকে অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে: "তাঁর শ্রীচরণ যেই হৃদয়ে ধরয়। তারে নীচ কহিলেই অপরাধ হয়।" তৎকালীন জাতি- ও ধর্ম-জনিত ভেদ-কলুষিত ভারতের জাতীয় জীবনের দুর্দিনে তিনি সমাজে ঘৃণ্য ও পতিত অসংখ্য মানুষের পরিত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন সব ধর্মের, সব জাতির মানুষকে ভালবেসে, সবার সেবা করে নিজ জীবনকে উন্নত ও শান্তিময় করার পথ দেখিয়ে:

"হরিভক্ত চণ্ডাল যে হয়।
ভুবন-পাবন সেই সর্বশাস্ত্রে কয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাসেবাকার্য

আবেদন

আসাম ও ত্রিপুরায় ভয়াবহ বন্যার উপর্যুপরি আক্রমণে বিপর্যস্ত জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশার প্রতিকারকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন সীমিত সামর্থ্য লইয়া গত ১৫ই জুন হইতে সাধ্যানুযায়ী সেবাকার্য চালাইয়া যাইতেছে। দীর্ঘ দিন এই কাজ চালাইতে না পারিলে আরও জীবনহানির আশঙ্কা।

রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে কাছাড় জেলায় শিলচর ও করিমগঞ্জ কেন্দ্র মারফত ৬৯টি গ্রামের ৪,৭৫২টি পরিবারের ২৭,১৯৪ জন লোকের মধ্যে চাল, ডাল, আটা, চিড়া, গুড়, বেবি ফুড, সরিষার তেল, কেরোসিন তেল, ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি বিতরণ করিতেছে এবং ত্রিপুরায় কৈলাশহর, ধর্মনগর ও কমলপুর কেন্দ্র মারফত তিন হাজার পরিবারের প্রায় বার হাজার লোকের মধ্যে চাল, ডাল, লবণ, বেবি ফুড, গুঁড়া দুধ, ধুতি, শাড়ী বিতরণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত কাছাড় ও ত্রিপুরা—দুই জায়গায়ই —রোগীদের চিকিৎসাও চলিতেছে।

গত বৎসরের বন্যাবিধ্বস্ত পাটনা জেলার মানের ব্লকে প্রায় এগার লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২২৫টি পাকা বাড়ী এবং একটি সমাজ মন্দির গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য জুন মাসে সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিশনকে আবার নূতন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

দুর্গত ভাইবোনদের সাহায্যকল্পে মুক্তহস্তে দান করিবার জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি। যে কোন প্রকার দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনে দান আয়করমুক্ত। চেক, ড্রাফ্‌ট্ ইত্যাদি "রামকৃষ্ণ মিশন"—এই নামে লিখিতে হইবে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, ৭১১-২০২, হাওড়া
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০-০১৪
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯
৫। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০-০২৬
৬। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২
৭। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০-০৫৫
৮। রামকৃষ্ণ মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ ৬০০-০০৪
৯। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর ৭৮৮-০০৪, আসাম
১০। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতি, করিমগঞ্জ ৭৮৮-৭১০, আসাম

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সহকারী সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ
২০শে জুলাই, ১৯৭৬

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এক

ভারত-প্রত্যাগত শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজী প্রথমে দেশবাসীর নিকট তাঁর ধর্মভিত্তিক সর্বোন্নয়নের বাণী প্রচার করলেন। তাঁর ওজস্বিনী বাণীর অভিঘাতে ভারতে যে নবজাগরণ এল, পরবর্তী কালে এদেশের ইতিহাসে তা কিভাবে ফলপ্রসূ হতে থাকল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানা গবেষণা করছেন। আমরা এখানে শুধু লক্ষ্য করছি স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-সাধনার সংবেদ ও বিবর্তন।

কলকাতায় তাঁর বক্তৃতাদি হয়ে যাবার পর স্বামীজী মনোনিবেশ করলেন সেই যুগ্ম আধারের প্রতি, যা হবে ভাবী কালে ঠাকুরের ভাব-সংবাহক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

ঠাকুরের মহাসমাধির অব্যবহিত পরে মঠ স্থাপিত হয়েছিল। গুরুভাইদের ভার ঠাকুর স্বামীজীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকায় থাকাকালে তিনি পত্রযোগে মঠের সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন ও তাঁর ভাবধারায় তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে ও তাঁদের মানসিকতা গঠনে চেষ্টিত ছিলেন। তিনি জানতেন এরাই তাঁর উত্তরসাধক ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সংবাহক।

এই সময়ে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় থাকাকালে) সংঘে তাঁর মৌলিক ও অমূল্য অবদান এইরূপে এসেছিল যে, তিনি তাঁর অনুভূতি ও প্রজ্ঞার দ্যুতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের মহিমা ও তাৎপর্য অনাবৃত করেন। এমনভাবে করেন যে, তাঁর ত্যাগী গুরুভ্রাতাগণও স্তম্ভিত বিস্ময়ে শ্রীঠাকুরকে নূতনভাবে গভীরতর অনুভূতির সহিত ভাবতে বুঝতে অনুপ্রাণিত হন, অন্যদের তো কথাই নেই।

একই কালে তিনিই সর্বাগ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে শ্রীমায়ের কেন্দ্রভূমিকার আধ্যাত্মিক মর্মকথা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রকাশ করেন। স্বামী শিবানন্দকে ১৮৯৪ সালের এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

> "মা-ঠাকুরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন; শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে, এই জন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে!'[৬৬]

সংঘজননীরূপে ও শক্তিরূপিণীভাবে শ্রীমায়ের অতুলনীয় জীবনের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণ-সম্ভাবনাকে স্বামীজীই সর্বপ্রথম প্রকাশ ও বোধগম্য করেন। এতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজী যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ভিত ও ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করে গেছেন তাই না,

৬৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (১৩৬৯), ৭।৪৫

জগতের নারীর অভ্যুত্থান যাতে সর্বোচ্চ আদর্শাশ্রয়ে ক্রিয়মাণ হয়ে আলোকশিখরে উত্তীর্ণ হতে পারে, তারও ভাব-ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন।

এক সময়ে স্বামীজী কালীকে মানতেন না। তারপর একদিন এল নিজেই আবিষ্কার করলেন ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেলেন: '...মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে!' শক্তি-রূপিণী শ্রীমাতে তিনি যে আশা-আশ্রয় নির্ধারিত করে গেলেন, এটি জগতের অগণিত সাধকগণের নিকট যে কত বড় এক সম্পদ হয়ে রয়েছে, তা ক্রমে নানা দেশে আবিষ্কৃত হতে হতে চলেছে। সে এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। এই আবিষ্কার ও অবদান স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনাকে শুধু যে পূর্ণতা দিয়েছে তাই নয়; এতে করে স্বামীজী দেশে দেশে কালে কালে অগণনীয় অজ্ঞাত সাধকদেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রয়েছেন। মানবসভ্যতার আন্তর লোকে স্বামীজীর এই 'জ্যান্ত দুর্গা' প্রতিষ্ঠাতে যে শক্তি আরাধিতা হয়ে রইলেন, তিনি কি আর দিশেহারা গৃহ-ছাড়াদের বিশেষভাবে আশ্রয় না দিয়ে স্বস্তি পাবেন?

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মে তিনি ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য ও ভক্তদের সহযোগিতায় রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐদিনই তিনি বিশেষভাবে আবিষ্কার করলেন যে, গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁর প্রগতিশীল ভাবধারাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। কারণ সভাভঙ্গের পর স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে বললেন, তোমার এসব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল? স্বামীজী জবাবে বললেন: 'তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন নি। তিনি সাধন-ভজন ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যেসব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে আমার জন্ম হয় নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের ।'[৬৭]

আর একদিন হাস্যপরিহাসরত গুরুভ্রাতাদের আসরে একজন স্বামীজীকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন: স্বামীজী কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করবার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেন না, আর তাঁর কার্যধারার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও জীবনের সামঞ্জস্যই বা কোথায়?

স্বামীজী প্রথমে হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যখন বার বার বাধা পেতে থাকলেন তখন তিনি হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে গর্জে উঠলেন:

'তোমরা মনে করেছ যে, তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ, আর আমি কিছুই পারিনি! তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা শুষ্ক নীরস জিনিস; তার চর্চা করতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলা টিপে মারতে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বলছ, সেটা

৬৭ স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১৩৭৩), ৩।১৩

যে একটা দারুণ আহাম্মকি, কেবল মানুষকে দুর্বল করে মাত্র, তা বুঝছ না। যাও, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি-মুক্তি চায়? কে দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কি বলছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমঃকূপ থেকে তুলে মানুষ করে গড়তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ-টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুনতে চাইনে। যে আমার মতলব অনুসারে করতে চায়, তারই কথা শুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুর দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি-মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।'[৬৮]

আরক্তিম-মুখ, প্রদীপ্ত-চক্ষু, রুদ্ধপ্রায়-স্বর, কম্পিত-দেহ স্বামীজী ভাবাবেগ সংবরণার্থ বিদ্যুদ্বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ করলেন।

কিন্তু এই অপ্রীতিকর ঘটনাটির মাধ্যমেই আমরা দেখলুম শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক বিবর্তিত স্বামীজীর জীব-প্রেমে বহ্নিমান স্বরূপটি। ঠাকুর যেখানেই থাকুন, তাঁর নরেনের এই হুঙ্কার শুনে নিশ্চয়ই বিশেষ আহ্লাদিত হয়েছিলেন। কারণ এ ঘটনায় বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, তাঁর সেই যুগান্তকারী তিরস্কার— 'ভেবেছিলাম তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি……' —নরেনের জীবন-সাধনায় আশ্চর্যরূপে সার্থক হয়েছে। 'রামকৃষ্ণ-টামকৃষ্ণ'কে কথার তোড়ে উড়িয়ে দিলেও আমরা দেখতে পেলুম যে, আক্ষরিকভাবে তিনি গুরুর আজ্ঞাবহ দাস, আর এ আজ্ঞাবহতা তাঁকে এক অতুলনীয় স্বার্থবুদ্ধি-লেশশূন্য জীবহিতৈকসাধন মহাব্রত-ধারীতে পরিণত করেছে।

কিছুক্ষণ পরে সৌম্য শান্ত গম্ভীর বিবেকানন্দ ফিরে এসে আসন গ্রহণ করলেন গুরুভ্রাতাদের মধ্যে। সকলেই নির্বাক বসে। স্বামীজী নিজেই তখন উদ্বেলিত হৃদয়াবেগে বললেন:

'মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরে ওঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ুসকল এত নরম হয় যে, তাতে ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য হয় না।……ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাকতে পারি না। সেই জন্য কেবলই এই ভক্তি-স্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি। আর জ্ঞানের শিকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই, কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হয়নি। সেই জন্য যেই দেখি, উদ্দাম ভক্তিপ্রবাহে প্রাণটা ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে, অমনি তার মাথায় কঠিন জ্ঞানের অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করতে থাকি। ওঃ, এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে! আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস; তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক আমার উপর তাঁর কি ভালোবাসাই!'…[৬৯]

গুরুভাইদের মধ্যে যাঁরা স্বামীজীর ভাব ও কর্মধারা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, তাঁরা সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক বিবেকানন্দের আন্তর আলেখ্যটি দেখে জানলেন ও মানলেন যে, যাঁর এমন গুরু-ভক্তি ও যাঁকে ঠাকুর নিজে সংঘের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, তাঁর ভাব ও কর্মধারায় দোষদৃষ্টি গুরুর প্রতিই অপরাধতুল্য।

আমরা যে স্বামীজীর জগৎজয়ের কথা শুনি

৬৮ তদেব, ৩।১৬

৬৯ তদেব, ৩।১৭

এক হিসাবে সেটি হল নিজের গুরুভাইদের একান্তভাবে স্বমতে আনা। কারণ স্বামীজী জানতেন যে, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ যদি তাঁর বাণী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করেন, তাঁর শ্রীরাম-কৃষ্ণসাধনা গভীরভাবে বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

তাই এই বিঘ্ন-সম্ভাবনা দূরীভূত হবার পর, স্বামীজী আবার পূর্ণোদ্যমে প্রচারকার্যে রত হলেন উত্তর ভারতে।

সে-কার্য সমাপ্ত করে ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধার ও বিশ্রামের জন্য কিছু দিনের জন্য তিনি দার্জিলিং-এ গেলেন। কয়েকদিন পরে সংবাদ পেলেন যে, কলকাতায় প্লেগ করালমূর্তি ধারণ করেছে, জনগণ ভীত, ত্রস্ত, পলায়নপর, নগরজীবন বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত।

কালবিলম্ব না করে স্বামীজী ফিরে এলেন কলকাতায় এবং সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। আয়োজন দেখে এক গুরুভাই প্রশ্ন করলেন: 'টাকা আসবে কোথা থেকে?' স্বামীজী দ্বিধাহীন জবাব দিলেন, 'কেন? দরকার হলে নূতন মঠের জমি-জায়গা বিক্রী করব। আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রী করে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?'

মনে রাখতে হবে কত আয়াস স্বীকার করে স্বামীজী এ জমি খরিদ করার অর্থ সংগ্রহ করে-ছিলেন এবং বেলুড় মঠ তাঁর কর্ম-পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করেছিল। তথাপি আর্তের ব্যথা যখন প্রাণে বাজল, তখন অম্লান বদনে সেই জমি বিক্রী করতে প্রস্তুত হলেন। অবশ্য অন্য উপায়ে এ বিপদ নিরস্ত হওয়ায় মঠের জমি বিক্রী করতে হয় নি। তবে এ অবসরে আমরা দেখলাম শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামীজীর হৃদয়বত্তা—যার তুলনা এ বিশ্বে বিরল। দুঃখ-তপ্ত প্রাণীর আর্তি-নাশনে কি তীব্র ব্যাকুলতা! এর অব্যবহিত পরেই স্বামীজীর আন্তর জীবনে আসে এক প্রবল বিবর্তন শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার মোহনার মুখে।

দুই

আমরা স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছি। ১৮৯৮ সালের ৬ই অক্টোবর. স্থান কাশ্মীর। অন্য নৌকা থেকে স্বামীজীর শ্বেতাঙ্গিনী শিষ্যাগণ দেখলেন স্বামীজীর নৌকা উজান বেয়ে তাঁদের দিকেই আসছে। তিনি নৌকার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন—এক হাতে নৌকার একটি বাঁশের খুঁটি ধরে, অন্য হাতে হলদে রঙ ফুলের একটি মালা।

৩০শে সেপ্টেম্বর একাকী তিনি ক্ষীরভবানী দর্শনে গিয়েছিলেন। অমরনাথে শিবদর্শনের পর স্বামীজীর শক্তিভাবে ভাবিত মন মাতৃদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল।

স্বামীজী শিষ্যাদের নৌকায় উঠে হাতের মালাখানি দিয়ে প্রত্যেকের মাথা স্পর্শ করে সকলকে নীরবে আশীর্বাদ করলেন। শেষে মালাটি একজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটি আমি মাকে নিবেদন করেছিলাম।' মুখখানি মায়ের আশীষ-গৌরবে উদ্ভাসিত। তারপর আসন গ্রহণ করে বললেন, "আর হরি ওঁ নয়, এবার 'মা' 'মা'।" "আমার স্বদেশপ্রেম ভেসে গেছে। আমার যা কিছু ছিল, সব গেছে। এখন কেবল 'মা' 'মা'।" কিছুক্ষণ মৌন থেকে আবার বললেন, "আমার খুব অন্যায় হয়েছে; মা আমাকে বললেন, 'যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস্? না আমি তোকে রক্ষা করি?' সুতরাং আমার স্বদেশপ্রেম বলে কিছু নেই, এখন আমি ছোট

শিশু।”[১০]

তারপর সস্নেহে শিষ্যদের বললেন: ‘এখন আমি এর চেয়ে বেশী বলতে পারব না; বলতে নিষেধ আছে।’[১১]

পরে এ বিষয়ে যে তথ্য জানা গিয়েছিল তা এই: স্বামীজী ক্ষীরভবানীতে কয়েকদিন কঠোর তপস্যা, জপ-ধ্যান ও দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ স্থানে অবস্থানকালে একদিন বিধর্মীদের অত্যাচারজনিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ও প্রতিমার দুর্দশার কথা ভেবে তাঁর মনে এই খেদ এল: ‘কেমন করে লোক এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে? প্রতিকারের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি! আমি যদি সে সময় থাকতুম, কখনও এরকম হতে দিতুম না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা করতুম।’ ঠিক সেই সময়ে তিনি পূর্বোক্ত দৈববাণী শুনেছিলেন।

আবার যখন তাঁর মনে হল, তিনি নিজে যদি একটি নূতন মন্দির তৈরী করতে পারতেন তবে বেশ হত: তৎক্ষণাৎ পুনরায় মায়ের কণ্ঠধ্বনি শুনলেন:

‘বৎস, আমি মনে করলে অসংখ্য মঠ মন্দির স্থাপন করতে পারি। এই মুহূর্তেই এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল সুবর্ণ-মন্দির নির্মিত হতে পারে।’[১২]

আমরা কল্পনা করতে পারি নেপথ্যবাসিনী জগন্মাতার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে ও তাঁর বাণীর অভিঘাতে স্বামীজীর সুরবাঁধা মনে কি এক অপার্থিব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। সে সঙ্গীতের অন্তরের কান্না: ‘এখন শুধু মা মা!’

ঠাকুর ‘ফকির’ হয়ে স্বামীজীকে সব দিয়েছিলেন। স্বামীজী এখন নিঃস্ব হয়ে ঠাকুরকে সব ফিরিয়ে দিলেন। এই হল স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ।

ব্রহ্মজ্ঞ বিশ্বাত্মা যুগনায়ক বীর বিবেকানন্দ বিবর্তিত হলেন বিশ্বজননীর অঙ্কের শিশুতে। লক্ষণীয় স্বামীজীর ‘এখন শুধু মা মা’ আর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বকীয় ভাবটির মাঝে অণুমাত্র পার্থক্য নেই।

স্বামীজীর জীবনের তিনটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে আমরা দেখতে পাই জগন্মাতার বিশেষ আবির্ভাব। একটি, যখন সংসারের নিদারুণ অনটনে দিশেহারা হয়ে, ঠাকুরের নির্দেশে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে জগন্মাতার কাছ থেকে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা চাইতে গিয়ে দেখেছিলেন জলজ্যান্ত ভবতারিণীকে। তারপর কালী তাঁর অস্তিত্বে প্রবেশ করে তাঁকে যন্ত্র করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়ে নিচ্ছিলেন।

ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন: ‘মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর, তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।’[১৩] মাও লক্ষ্মীমণিটির মতো তাই করলেন। কারণ অনেক কাজ করিয়ে নেবার ছিল।

তারপর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে এসে জগন্মাতার আশীর্বাদে আবিষ্কার করলেন তাঁর গুরুদত্ত ব্রত উদ্‌যাপনের উপায়।

তারপর জীবনের ব্রত যখন অনেকাংশে সমাপ্ত হয়েছে, যে মায়াটুকুতে আবদ্ধ করে বিশ্বাত্মা বিবেকানন্দকে দিয়ে জগতে ধর্মসংস্থাপনের এত কাজ করিয়ে নেওয়া হল, তাতে অনুসংশ্লিষ্ট তাঁকে জগন্মাতা ভারতের প্রান্তান্তরে নিয়ে লীলাচ্ছলে বললেন:

‘আমি তোকে রক্ষা করি, না তুই আমাকে রক্ষা করিস্?’ অর্থাৎ বাছা: তোকে না হলেও আমার চলে, কিন্তু আমাকে না হলে তোর চলে না!

১০ তদেব, ৩।১৬৬ ১১ তদেব, ৩।১৬৬ ১২ তদেব, ৩।১৬৭ ১৩ তদেব, ১।১৯৮

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় সিদ্ধ বিবেকানন্দের বাইরের আকার প্রায় একই রইল, কিন্তু এই অনুভূতির পর যদিও তিনি কর্মত্যাগ করেন নি, যন্ত্রবৎ চালিত হয়ে আবার একবার পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন ও অমিত তেজের সহিত ধর্মপ্রচারও করেছিলেন, স্বামীজীর অন্তরের মানুষটি আর ঠিক এক রইলেন না। বেদান্তকেশরী হয়ে গিয়েছিলেন মায়ের অঙ্কের শিশু।

তাঁর ভাবান্তরিত অন্তরের একখানি নিগূঢ় আলেখ্য আমরা পাই তাঁর ১৮ই এপ্রিল ১৯০০-এর জো-কে লেখা একখানি চিঠিতে, যার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি :

'...কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়। আর আমার সমুদয় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন। ...লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

'যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর ভাবে বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গভীর আহ্বান!—যাই. প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক (সংসারের ভাল-মন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!'—যাই প্রভু, যাই।...

'শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস! ...তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি।

'...আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি ব'লব। যা-কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে; কেন না নিজের শরীর থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয়-হেয় ব'লে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে!...ওঁ তৎ সৎ।'[৭৪]

তিন

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা তাঁর নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য। তাই তিনি মঠ-মিশন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে রাখবার জন্য প্রেমের জোড়ে মানুষের অঙ্গনে। বেলুড় মঠের ভাবাদর্শ সম্বন্ধে একদিন বলেছিলেন, 'ঈশ্বর

৭৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (১৩৬৯), ৮।১৩১-৩৪

করেন তো এ মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ—সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন আদর্শ দেখতে পায়, তা করতে হবে।'[৭৫] আর একদিন বলেছিলেন, 'সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, তখন মনে হ'ল যেন এখান হতে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলেছে!...'[৭৬]

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা আরম্ভ হয়েছিল তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরে। তাঁর এ সাধনা সাকার বা নিরাকার সাধনা নয়। এ সাধনা মানুষের ইতিহাসে অবতীর্ণ ভগবানের অবতরণের চরিতার্থতার অভিযান।

তাঁর এই অপূর্ব সাধন-মর্মকথা নিজেই ইঙ্গিত করেছেন 'মুক্তি' কবিতায়:

"এস, এস, এস তুমি, আলোকের ওগো অধিরাজ!
তোমারি লাগিয়া আজ অন্তরের স্বাগত আহ্বান!
ওগো সূর্য, আজ তুমি ছড়াইছ মুক্তি দিকে দিকে!
ভাব দেখি, কেমনে পৃথিবী আছিল প্রতীক্ষারত
কত কাল; তোমারি সন্ধানে প্রতি দেশে প্রতি যুগে
কত না ছাড়িল গৃহ, কত প্রিয় পরিজন প্রীতি
তোমারি লাগিয়া তারা চলিয়াছে আত্ম-নির্বাসিত
ভয়ঙ্কর সাগর চিরিয়া—আদিম বনানী মাঝে;
প্রতি পদক্ষেপে তার দেয় তাল জীবন-মরণ।
তারপর এলো দিন—সফলিয়া উঠিল যখন
সকল সাধনা কর্ম পূজা প্রেম আত্মবলিদান—
গ্রহণ করিলে আসি—সব হ'ল - সম্পূর্ণ সার্থক!
তখন উঠিলে তুমি—হে প্রসন্ন, ছড়াবার তরে
মুক্তির আলোক শুভ্র—সারা বিশ্ব-মানবের 'পরে!

"চল প্রভু, চল তব বাধাহীন পথে ততদিন—
যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী
তুলি উচ্চ শির নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খলভার,—
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন।"[৭৭]

---

৭৫ স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১৩৭৩), ৩।১৭৭ ৭৬ তদেব, ৩।১৭৮

৭৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৭।৪২৯-৩০

আন্ত্রিক গোলযোগ

ডক্টর জলধি কুমার সরকার*

এই প্রবন্ধে আন্ত্রিক গোলযোগ (intestinal disorder) বলতে সাধারণভাবে পেটের গোলমাল অর্থাৎ গরহজম, পেটব্যথা হ'তে উদরাময়—পর্যন্ত সমস্ত অসুখ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করব।

অনেকেই জানেন যে, মুখগহ্বর (mouth cavity) হ'তে আরম্ভ করে মলদ্বার (anus) পর্যন্ত সমস্ত অংশটি একটি অখণ্ড নলবিশেষ। খাদ্য-দ্রব্য গলাধঃকরণ হ'বার পর কণ্ঠে ও বক্ষে অবস্থিত খাদ্যনালীর (oesophagus) মধ্য দিয়া উদরে অবস্থিত পাকস্থলীতে (stomach) প্রবেশ করে। তার পরের অংশটি ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine , যার পর পর তিনটি অংশ হচ্ছে ডিয়োডিনাম (duodenum), জেজুনাম (jejunum) ও ইলিয়াম (ileum)। ক্ষুদ্রান্ত্রের পর খাদ্য প্রবেশ করে বৃহদন্ত্রে (large intestine), যার আর এক নাম কোলোন (colon)। এর শেষ অংশটির নাম মলনালী (rectum', যেটা মলদ্বারে যেয়ে শেষ হয়। খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে এই সব অংশের মধ্য দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন অংশ হইতে নির্গত বিভিন্ন প্রকার হজমী রসের (enzyme) সংস্পর্শে আসে, এবং তার ফলে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে আমরা হজম হওয়া বলি। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, পরিবর্তিত খাদ্যের সারাংশ শুষে নেয় এবং এতেই শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। বাকিটা মলরূপে নির্গত হয়। কিন্তু ভাববেন না যে, মল কেবল খাদ্যদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ। এর শতকরা ষাটভাগে আছে নানারূপ জীবাণু (becteria)। এই সব জীবাণু অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সবসময়ই বাসা বেঁধে আছে এবং তারা হজমে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। জন্মের পর থেকে আরম্ভ করে দেহের বিনাশ হওয়া পর্যন্ত এরা আমাদের সাথী। খাদ্যদ্রব্য গলা হ'তে মলদ্বার পর্যন্ত আস্তে আস্তে এগোতে থাকে, কারণ অন্ত্র-নালীকে বেষ্টন করে যে মাংসপেশী থাকে, তা সবসময়ই নিয়মিতভাবে সঙ্কোচন-প্রসারণ (peristalsis) করে চলেছে এবং অন্ত্রের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সঙ্কোচন-প্রসারণ আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, যেমন করে না হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া।

মোটামুটিভাবে আমাদের আন্ত্রিক গোল-যোগের কারণগুলি হচ্ছে: (১) খাওয়ার অনিয়ম বা অত্যাচার, যেমন অতিভোজন বা গুরুপাক খাদ্যগ্রহণ (২) অন্ত্রের কোন অংশে ঘা বা প্রদাহ (৩) বাহির হ'তে আসা এ্যামিবা (amoeba) বা অন্য কোন কৃমির বাসা বাঁধা (৪) দূষিত জীবাণু বা জীবপরমাণুর (virus) প্রবেশ (৫) ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা বা অশান্তি। এইসব কারণের জন্য হজমী রসের কাজে অথবা খাদ্যের সারাংশ শুষে নিতে বাধা পড়ে কিংবা অন্ত্রের স্বাভাবিক সঙ্কোচন-প্রসারণ হ'তে পারে না। ফলে আন্ত্রিক গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

* কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। এফ. এম. এ.

আন্ত্রিক গোলযোগকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর উপসর্গে ভাগ করা যেতে পারে—(১) ক্ষুধামান্দ্য (২) বমি বা পেটফাঁপা (৩) পাতলা দাস্ত (৪) পেটব্যথা (৫) আমাশয় বা রক্তামাশয় (৬) পাতলা না হ'লেও আমমিশ্রিত অস্বাভাবিক দাস্ত। আগের অনুচ্ছেদে আন্ত্রিক গোলযোগের যে কারণগুলি বলা হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটি কমবেশী এইসব উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। অন্ত্রের অনিয়মিতভাবে বা উল্টাপাল্টা সঙ্কোচন-প্রসারণ হ'লে পেটব্যথা বা পেট-কনকন করে। কারণগুলির কয়েকটি সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বর্ণনার প্রয়োজন।

কৃমি: বেশীর ভাগ কৃমি বা কৃমির ডিম খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে মিশে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। সচরাচর যে চারপ্রকারের কৃমি এদেশে অসুখের সৃষ্টি করে—তারা হচ্ছে এ্যামিবা (amoeba), হুকওয়ার্ম (hookworm), রাউণ্ডওয়ার্ম (roundworm) এবং জিয়ার্ডিয়া (giardia)। এদের মধ্যে কেবলমাত্র রাউণ্ড-ওয়ার্মকে খালি চোখে দেখা যায়—সাদা বড়-রকমের কেঁচোর মত। অন্যগুলোকে দেখতে হ'লে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। রাউণ্ডওয়ার্মের ডিম এবং অ্যামিবা ও জিয়ার্ডিয়া, গুটিকাকার (cyst) অবস্থায় খাদ্যের সঙ্গে শরীরে ঢোকে। হুকওয়ার্মের ডিম মলের সঙ্গে নির্গত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকাকালীন তা হ'তে বাচ্চা হুকওয়ার্ম নির্গত হয়। সুযোগ পেলে নগ্নপদ লোকের পায়ের চামড়া ফুটো ক'রে ঢুকে শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ ক'রে তা অন্ত্রে যায় এবং সেখানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হুকওয়ার্ম-আক্রমণের প্রধান উপসর্গ আন্ত্রিক গোলযোগ নয়, রক্তাল্পতা। পল্লীগ্রামের লোকের রক্তাল্পতার একটি বড় কারণ হচ্ছে এই কৃমির প্রাদুর্ভাব। রাউণ্ডওয়ার্ম কেঁচোর মত বড় এবং কোন কোন রোগীর অন্ত্রে ৫০।৬০টি রাউণ্ডওয়ার্মও থাকতে পারে। এই কৃমি থাকলে রোগীর মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা হয় এবং সব সময়েই পেট ভর্তি বোধ হয়। ছেলেমেয়েদের মলদ্বারে ঘুমাবার সময় যে ছোট ছোট সাদা কৃমি দেখা যায়—তাদের থ্রেডওয়ার্ম (threadworm or pinworm) বলে। এরা প্রধানতঃ ঘুমের ব্যাঘাত করে, আন্ত্রিক গোলযোগ খুব বেশী করে না। মলদ্বারের চারিপাশে এরা ডিম পাড়ে এবং এই ডিম আঙ্গুলে লেগে থেকে খাদ্যের মাধ্যমে আবার শরীরে প্রবেশ করে। সেইজন্য এদের নির্মূল করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

এ্যামিবার আক্রমণকে এ্যামিবায়াসিস (amoebiasis) বা এ্যামিবিক আমাশয় (amoebic dysentery) বলে। আমাদের দেশে এর প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এই ক্ষুদ্রকায় এককোষবিশিষ্ট (unicellular) প্রাণীটি শুধু যে অন্ত্রে বাসা বাঁধে তা নয়, অনেক সময় এরা যকৃৎ (liver) ফুসফুস বা মস্তিষ্কে যেয়ে প্রদাহ বা স্ফোটকের (abscess সৃষ্টি করে। সচরাচর এদের বাসস্থান হচ্ছে বৃহদন্ত্র। সেখানে ছোট ছোট অসংখ্য ঘায়ের সৃষ্টি ক'রে এরা আমাশয় করে। তখন মলে অসংখ্য এ্যামিবা নির্গত হয়। এই অবস্থায় অর্থাৎ এদের স্বাভাবিক মূর্তি (vegetative form) নিয়ে এরা যদি খাদ্যের মাধ্যমে কোন সুস্থ লোকের শরীরে ঢোকে, তা হ'লে পাকস্থলীর অম্লরসে এদের বেশীর ভাগ মারা যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু রোগ যখন পুরান হতে থাকে, তখন রোগীর বৃহদন্ত্রে থাকাকালীন এ্যামিবারা তাদের উপরে একটি কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে। এই অবস্থার এ্যামিবাকে এ্যামিবিক সিষ্ট (amoebic cyst) বলে এবং পুরাতন রোগীর মলের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ এ্যামিবিক সিষ্ট নির্গত হয়। পাকস্থলীতে অম্লরস থাকা

সত্ত্বেও সিষ্টগুলি অনায়াসে অক্ষত অবস্থায় উহা পার হয়ে যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের নানা হজমীরসের সাহায্যে সিষ্টের আবরণ ভেদ হয়ে যায়। এবং তার মধ্য হতে স্বাভাবিক চেহারার vegetative form) এ্যামিবা নির্গত হয়ে বৃহদন্ত্রের মধ্যে রোগের সৃষ্টি করে

জিয়ার্ডিয়ার প্রাদুর্ভাবও কম নয়। এদেরও এ্যামিবার মত সাধারণ অবস্থা ও সিষ্‌ট-এর অবস্থা আছে। এদের আক্রমণে হঠাৎ পাতলা দাস্ত হয়, তবে অনেকের পেটব্যথা বা অম্বলই প্রধান উপসর্গ হয়ে পড়ে।

জীবাণু: আগেই বলেছি যে আমাদের অন্ত্রে অসংখ্য জীবাণু বা জীবপরমাণু বাসা বেঁধে আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বি. কোলাই* (B. coli) যা স্বাভাবিকভাবেই অন্ত্রে থাকে এবং অন্ত্রের কোনও ক্ষতি তো করেই না বরং সম্ভবতঃ হজমের কাজে সাহায্যই করে। আমাশয়ের জীবাণু বাসা বাঁধলে ব্যাসিলারি আমাশয় হয়। কলেরার জীবাণু দ্বারা যে কলেরা বা ওলাউঠা হয় এবং টাইফয়েড জীবাণু ঢুকলে টাইফয়েড হয়, তা সকলেই জানেন।

মোটামুটিভাবে কারণগুলি সম্বন্ধে বলা হোল। অন্ত্রের একটি বিশেষ ধরনের অসুখের কথা বলা হয় নি। সেটি হচ্ছে পেপটিক আলসার (peptic ulcer)। এর অর্থ হচ্ছে পাকস্থলীতে ঘা (gastric ulcer) অথবা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ডিয়োডিনামে ঘা (duodenal ulcer)। পেটে ব্যথা বা পেটজ্বালা এর প্রধান উপসর্গ। এই অসুখের ঠিক কারণ জানা নাই, তবে সময়ে না খাওয়া এবং দীর্ঘকাল যাবৎ মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।

এখন আন্ত্রিক গোলযোগের প্রতিকার বিষয়ে আসা যাক। ভারতবর্ষে বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে এই সমস্যাটি খুবই বড়। এখানে আন্ত্রিক গোলযোগ নাই, এরূপ লোক বিরল। হয়ত এজন্য এখানকার জলহাওয়া কিছুটা পরিমাণে দায়ী। প্রতিকার সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে এর জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন তবে পাতলা দাস্ত বা বমি হওয়ার আগের দিনে যদি কোনরূপ খাওয়ার অত্যাচার হয়ে থাকে, তবে উপবাস, ডাবের জল ইত্যাদির উপর একদিন নির্ভর করে থাকলে অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থা বিনা ঔষধে ফিরে আসে। শরীরের কোন অংশে রোগ হ'লে যেমন সেই অংশকে বিশ্রাম দিতে হয়, অসুস্থ অন্ত্রেরও সাময়িকভাবে খানিকটা কাজ কমান উচিত। আর একটি বিষয়ে আমি জোর দিতে চাই এবং সেটি হচ্ছে দাস্ত পরীক্ষা করান। আন্ত্রিক গোলযোগ পুরান হ'লেই এটি দরকার। কারণ দাস্ত পরীক্ষা না ক'রে আন্ত্রিক গোলযোগের কারণ নির্ণয় করা অনেক সময় চিকিৎসকের পক্ষেও মুস্কিল। ঠিক কারণ নির্ণয় না হ'লে ঔষধ কার্যকরী হয় না। ফলে রোগীর অর্থনাশ হয়। এরূপ দেখেছি যে, রোগীর বৎসরাধিক চিকিৎসা এবং তারপরে হাওয়া বদলের পরেও আরোগ্য না হওয়ায় দাস্ত পরীক্ষায় জিয়ার্ডিয়া কৃমি ধরা পড়ায় সামান্য খরচে কয়েক দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে দাস্ত পরীক্ষায়ও কোন দোষ ধরা পড়ে না। সেই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসা কঠিন হ'য়ে পড়ে। তখন অনিয়মিত খাওয়া, আহারের বাহুল্য, সহ্য-না-হওয়া কোন খাদ্য

* ইহার বর্তমান নাম ই. কোলাই (E. coli)।

গ্রহণ (food allergy) এবং মানসিক উত্তেজনা ও অশান্তি—এসকলের কথা চিন্তা করতে হবে। মনে রাখবেন, মানসিক কারণে আমাদের অনেক রকম রোগের উপসর্গ হ'তে পারে, শুধু আন্ত্রিক গোলযোগ নয়। অতিভোজন, বিশেষতঃ রাত্রে, অনেকের হজমের গোলমাল সৃষ্টি করে। সত্য কথা বলতে কি, আমরা অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাই এবং এর মাত্রাধিক্য হলে অথবা দীর্ঘদিন ধরে এরূপ চললে, আমাদের রক্তচাপ-বৃদ্ধি, বহুমূত্র প্রভৃতি নানারূপ রোগের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য মাঝে মাঝে উপবাস (যেমন একাদশীতে) স্বাস্থ্যরক্ষার দিক হ'তে ভাল মনে হয়। যাদের শারীরিক পরিশ্রম বেশী করতে হয় না তাদের কিছু কিছু হালকা ব্যায়াম অভ্যাস করলে পেটের গোলমাল আস্তে আস্তে চলে যেতে পারে। কারও কারও সব সময় কিছু (যেমন সুপারি) খাওয়া পেটের গোলমালের কারণ হ'তে পারে। দূষিত বা ভেজাল দেওয়া খাদ্য যে আন্ত্রিক গোলযোগের একটা বড় কারণ, এটা সর্বজনবিদিত কথা। বর্তমান সামাজিক অবস্থায় এর প্রতিকার কি তা জানি না।

ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে কারও কারও কদভ্যাসের কথা বলে শেষ করব। পেটের সামান্য গোলযোগ হ'লে বা গোলযোগের আশঙ্কা ক'রে একটা বা দুইটা সালফাগুয়ানিডিন (Sulphaguanidine) জাতীয় বড়ি খেয়ে অনেককে নিশ্চিন্ত হ'তে দেখেছি। অত কম মাত্রায় ওই-জাতীয় ঔষধে কোন সুফল হয় না। সব ঔষধের একটা কার্যকরী মাত্রা আছে এবং তাও কয়েক দিন ধরে ব্যবহার করতে হয়। কম মাত্রার ঔষধে মানসিক শান্তি হয়ত খানিকটা হয় কিন্তু কম মাত্রার ঔষধে জীবাণুদের ঔষধ-প্রতিরোধক ক্ষমতা (drug resistance) জন্মে এবং ফলে ভবিষ্যতে ওতে আর কাজ হয় না। আবার কারও কারও মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে থাকে (এর জন্য তাঁর চিকিৎসকও কম দায়ী নন) যে, তার পুরাতন এ্যামিবায়াসিস আছে, যদিও কয়েকবার দাস্ত পরীক্ষা সত্ত্বেও এ্যামিবা পাওয়া যায় নি। মনে রাখবেন, একটি বিশেষ জাতীয় বড়ি দুই একটি খেয়ে সাময়িক আরাম বোধ হ'লেই তা এ্যামিবায়াসিস প্রমাণ করে না। কিন্তু এও স্বীকার করতে হবে যে, কারণ-না-পাওয়া অথবা চিকিৎসায় উপকার-না-পাওয়া আন্ত্রিক গোলযোগ যদি বেশী দিন চলতে থাকে তবে রোগীর মনে কোন কিছু ভুল ধারণা হওয়াকে দোষ দেওয়া যায় না।

'খাদ্য খুব সাদাসিধা হওয়া উচিত। মাত্র একবার বা দুইবারে দিনের আহার্য উদরসাৎ না করিয়া অল্পমাত্রায় কয়েকবার খাওয়া ভাল। কখনও ক্ষুধা-পীড়িত হইও না। যিনি অত্যধিক ভোজন করেন, তিনি যোগী হইতে পারেন না। যিনি বেশী উপবাস করেন, তাঁহারও পক্ষে যোগ কঠিন।...যথাযোগ্য খাদ্য কি, তাহা নিজেদেরই স্থির করিতে হইবে। অপর কেহ উহা বলিয়া দিতে পারে না। একটি সাধারণ বিধি এই যে, উত্তেজক খাদ্য বা বেশী মশলা-দেওয়া রান্না বর্জনীয়।...আমাদের কাজের পরিবর্তনের সহিত খাদ্যেরও যে পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, আমাদের যত কিছু সামর্থ্য, তাহা আমরা খাদ্য হইতেই লাভ করিয়া থাকি।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথা*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বেলুড় মঠে আমার যাতায়াত শুরু ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে। স্বামী শিবানন্দজীর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হ'ল না। মন ভেঙে গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার তখন ধারণা জন্মেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তানগণের আর কেউ স্থূলশরীরে নেই। সেজন্য স্বামী শিবানন্দজীর দেহত্যাগের পর বছর খানেক আর মঠে যাইনি। শুধু তাই না, অন্যত্র দীক্ষালাভের জন্য চেষ্টাও করি। একজন দীক্ষা দিতে রাজী হলেন—তখনই একটা নাম বলে দিয়ে সেটা জপ করতে বললেন এবং বললেন যে, তিনি কাশীধামে যাচ্ছেন, ফিরে এসে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দেবেন।

আমি সেই নাম জপ করতে থাকলাম। তবে মনে প্রবল বাসনা জাগল—শ্রীশ্রীঠাকুর-মার ছবি ঘরে রাখবো এবং নিত্য প্রণাম করবো। এই ছবি কেনার জন্যই একদিন আবার বেলুড় মঠে গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের মন্দিরে প্রণাম করার পর স্বামীজীর ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি পাশের ঘরে খুব ভীড়। শুনলাম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এসেছেন। শুনেই মনে যেন আগুন ধরে গেল—একি করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য কোন সন্তান তখনো স্থূলশরীরে আছেন কিনা খোঁজ না করেই বাইরে দীক্ষা নিয়ে বসলাম! মনে ঝড় বইতে লাগল—সেই ঝড় মনে নিয়েই বাড়ী ফিরলাম। একটা অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণায় সাতদিন কাটলো। কি করি!

এই অবস্থার মধ্যেই একদিন, যিনি দীক্ষা দেবেন বলেছিলেন, কাশী থেকে ফিরে ডেকে পাঠালেন। আমার মনের অবস্থা তখন আরো কাহিল হয়ে উঠলো—বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম। আমার মা একদিন সব টের পেয়ে বললেন, "ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরকে ডাক। তাঁকে বল, তিনি উপায় একটা ঠিক করে দেবেন।" শুনে সাহস পেলাম। তারপর আবার গেলাম একদিন বেলুড় মঠে। তখন গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

মঠে গিয়ে স্বামী অভয়ানন্দের কাছে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, "বিজ্ঞান-মহারাজ তো মঠে এসেছেন। ওই সামনে ঠাকুরের মন্দিরের ভিত খোঁড়া হচ্ছে, ওখানে চেয়ারে বসে আছেন। কাজ দেখছেন। তবে ওখানে যেও না, ঘরে ফিরে এলে ওঁর কাছে গিয়ে নিজেই সব বল।" অভয়ানন্দজীকে সঙ্গে যেতে বললাম, তিনি রাজী হলেন না, বললেন, "একা গেলেই ভাল হবে।" স্বামী বিজ্ঞানা-

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ডাইরী আকারে লিখিত পুরাতন খাতা হইতে সংকলিত। লেখকের বয়স যখন ১৮।১৯ বৎসর, সেই সময় বিজ্ঞানানন্দজীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। এই বয়সের যুবকদের সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজী কিরূপ ব্যবহার করিতেন—সহানুভূতিতে, চিন্তায় কৃপা করিয়া তাহাদের স্তরে নিজেকে নামাইয়া আনিয়া শিষ্যের চিত্ত ভরপুর করিয়া দিতেন—লেখাটিতে তাহার কয়েকটি চিত্র পাওয়া যাইবে। যাঁহারা তাঁহার এইরূপ স্পর্শ পাইয়াছেন, স্মৃতিকথাটি তাঁহাদের নিকট বিশেষ করিয়া খুবই উপাদেয় বোধ হইবে।
—সঃ

নন্দজী ঘরে ফিরবার মিনিট পনেরো পরে অভয়ানন্দজী আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। ঘরে সাহস করে ঢুকে প্রণাম করার পরই বললেন, "কি খবর?" এমনভাবে বললেন, আমি যেন কতদিনের পরিচিত! শুনে সাহস বাড়ল। সব খুলে জানিয়ে প্রার্থনা করলাম, "মহারাজ, আপনার নিকট আমি দীক্ষাপ্রার্থী! যে মন্ত্রটি আগে পেয়েছি, সেটি নিত্য জপ করি।" শুনে বললেন, "বেশ তো, ঐটাই বছর আষ্টেক জপ করুন।" বললাম, "মহারাজ, আপনার কাছে দীক্ষা নেবার আমার একান্ত ইচ্ছা।" তবু বললেন, "বিশ্বাস করে লেগে থাকুন।" হঠাৎ বলে ফেললাম, "মহারাজ, ঠাকুরকে আমার খুব ভাল লাগে।" মহারাজ আর দ্বিরুক্তি করলেন না—একদৃষ্টে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দীক্ষা দিতে রাজী হলেন। বুধবার সকালবেলা মঠে আসতে বললেন। তারপর বললেন, "আমার কাছে দীক্ষা নিচ্ছেন, কিন্তু যাঁর কাছে নাম নিয়েছেন তাঁকে আগে যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, ঠিক তেমনি করবেন। আপনার বাড়ীতে এলে আগে যেমন যত্ন করতেন, ঠিক তেমনি করবেন। তাঁর দেওয়া নাম প্রত্যহ যেমন জপ করতেন তেমনি করবেন। কখনো যেন অশ্রদ্ধা করবেন না।" তারপর তাঁর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন, "তোমরা মনে কর মন্ত্র একটা ছেলেখেলা। আমরা উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে মন্ত্র দর্শন করেছি জীবন্ত মূর্তিতে।"......

ফেরার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ দীক্ষা নিতে গেলে কি কি লাগবে?" বললেন, "কি আর লাগবে—একটা হরতুকী।"

নির্দিষ্ট দিনে, বুধবারে তাঁর কৃপা পেয়ে ধন্য হলাম। দীক্ষান্তে কিভাবে কি করবো সব দেখিয়ে দেবার পর বললেন, "সময় থাকলে বেশী করে [জপ] করবে।......হাঁটতে হাঁটতে, গাড়ীতে যেতে যেতে করলেও চলবে।" জিজ্ঞেস করলাম, "আর গায়ত্রী জপ করবো কি?" বললেন, "হ্যাঁ, গায়ত্রী খুব ভাল।" বললেন, "মন্ত্রদীক্ষা তো হল।... এর মধ্যে সবই আছে।" আবার বললেন, "আগের মন্ত্রও জপ করবেন, এবং যিনি দিয়েছিলেন তাঁকেও শ্রদ্ধাভক্তি করবেন। নতুন মন্ত্র লিখে নিন, নয়তো ভুলে যাবেন। আজ থেকে জানবেন আপনি আর একা নন। আপনার পেছনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা আছেন জানবেন—কোন ভয় নেই, বিপদ থেকে তাঁরাই রক্ষা করবেন; অন্তিম সময়ে তাঁরা এসে হাত ধরে নিয়ে তাঁদের কাছে রেখে দেবেন। ঠাকুর আবার আসছেন—এবারে বেশ শক্ত শরীর নিয়ে।"

পরে আবার বললেন, "কারো সঙ্গে তর্ক করবেন না। সকলের মতকেই শ্রদ্ধা করবেন। আমার ধর্মটাই ঠিক, অন্যেরটা ঠিক নয়-এরকম বুদ্ধি করবেন না—সব মতকেই শ্রদ্ধা করবেন। অনাসক্তভাবে সংসারে থাকতে চেষ্টা করবেন। অন্তিমকালে ঠাকুর ও মা এসে হাত ধরে নিয়ে যাবেন।"

আবার বললেন, "ঠাকুরের সমস্ত পার্ষদদের ছবি ঘরে রাখবেন এবং প্রণাম করবেন।" একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমারও রাখবেন।" শেষে বললেন, "বাইরে ঠাকুরঘরের বারান্দায় গিয়ে একটু জপ-ধ্যান করে নিন এবং নীচে গিয়ে মঠে যেখানে যত মহারাজ আছেন সকলকে প্রণাম করুন।"

বিকেলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, সেবক কফি তৈরী করছেন। খাওয়ার পরই বাইরে যাবেন, নীচে গাড়ী তৈরী; শুনলাম ঠাকুরের মর্মরমূর্তি যেখানে গড়া হচ্ছে, সেখানে তা দেখতে যাবেন।

* * *

তৃতীয়বার স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর দর্শন লাভ করি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বেলুড় মঠে গিয়ে। ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করলেন, "বসুন, কি খবর? কেমন আছেন?" বললাম, "ভালই আছি।" শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "আপনি তো খুব ভদ্রলোক!—দেখুন, এঁদের (সমবেত সকলকে দেখাইয়া) কেউ ভাল নেই—আপনি জিজ্ঞেস করুন এঁদের! আপনিই একমাত্র ভাল আছেন। খুব ভাল লোক আপনি।" সবাই হাসতে লাগলেন। তিনিও আরো নানা কথা ব'লে—নানা রঙ্গরসের কথায় আমাদের সকলকে মাতিয়ে দিলেন।··
তিনি এলাহাবাদ ফিরবেন। একটু পরেই যতীশ মহারাজ, অনঙ্গ মহারাজ, ভরত মহারাজ প্রভৃতি এসে পড়লেন। মহারাজ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা ভাই আমাকে একটু সাহায্য করো—আমার একটু উপকার করো—এই ট্রাঙ্কটা মোটরে তুলে দাও।" আমরা তাঁর এরূপ কথায় মুগ্ধ, কৃতার্থ হলাম।······মোটর ছাড়ার সময় আমরা সবাই বললাম, "আবার আসবেন।" বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, "রামের ইচ্ছা।"

* * *

আজ বুধবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৫। বাসন্তী-পূজার সপ্তমী তিথি। বেলুড় মঠে ৺বাসন্তীপূজা হবে, বিজ্ঞানমহারাজ এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। মঠে গিয়ে দর্শন ক'রে, আনন্দ ক'রে ফিরে এলাম। আবার গেলাম ১৪ই এপ্রিল, একাদশীর দিন, বিকাল ৪টায়। ভেবেছিলাম ঘরে লোকের খুব ভীড় হবে, আশ্চর্য! একাই রয়েছেন। সেই সহাস্য জিজ্ঞাসা, "কি খবর?" দুচার কথার পর বললাম, "মহারাজ, বড় বিপদে পড়েছি। হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে বার্ন কোম্পানীতে চাকরী করি, সকাল ৮টায় হাজির হতে হয়; কালীঘাটে থাকি, ৭টায় বেরুতে হয়। তার আগেই স্নানাহার সেরে নিতে হয়। সাইকেলে যাওয়া-আসা করি। অতদূর—অফিসে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম ও আবার এতখানি সাইকেল চালিয়ে ফিরে এসে জপ-ধ্যান করে শুতে রাত অনেক হয়। আবার ভোর ভোর ৪টায় ওঠা কষ্টকর হয়। আগের পাওয়া মন্ত্রটি খুব বড়; গায়ত্রী মন্ত্রও বড়; এর পর আপনার কাছে পাওয়া মন্ত্র জপ—তাও আবার আপনি বলেছেন তাড়াহুড়ো করে যেন জপ না করি এবং জপের সঙ্গে ধ্যানও চলবে—কাজেই সব করতে অতখানি সময় পাচ্ছি না।······আপনি আগের মন্ত্রটি ত্যাগ করার অনুমতি দিন।"

সব শুনে মহারাজ কৃপা করে অনুমতি দিলেন, ······পরে বললেন, "যাঁর কাছ থেকে মন্ত্রটি নিয়েছিলেন, তাঁকে কিন্তু আগের মতোই শ্রদ্ধা করবেন।" পরে গায়ত্রী মন্ত্রও বাদ দেবার কথা বলেছিলাম, মহারাজ তাঁতে রাজী হননি—"না গায়ত্রী জপ করবেন।" আমি করুণনেত্রে চেয়ে আছি দেখে বললেন, "আচ্ছা, যখন সময়ের খুব অভাব হবে, মাঝে মাঝে না হয় বাদ দেবেন।"

* * *

১৯৩৫-এর মে মাসের এক রবিবার। মন্দিরের কাজ পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানমহারাজ মঠে এসেছেন শুনে গেছি। স্বামীজীর ঘরের সামনের বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন, বহু ভক্তও সমাগত, সেখানেই দর্শন পেলাম। খুব হাসালেন সকলকে। আমাদের সঙ্গে খুব হৈ-হুল্লোড় লাগালেন। যেন আমাদের সমবয়সী—আমাদের ইয়ার-বন্ধু! কি আশ্চর্য ব্যবহার! আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ইনিই কি সেই গুরুগম্ভীর ব্যক্তি—যাঁর কাছে এগুতেই

ভয় পেয়েছিলাম! কি বিমল আনন্দের স্রোতই না বইয়ে দিয়েছিলেন……সেদিন!

বিকেলে ঘরে ঢুকে দেখি, গম্ভীরভাবে বসে আছেন। ঘরে আরো কয়েকজন ছিলেন। আমাকে একবার বললেন, "ঐ টেবিলের ওপর আমার চশমাটা রয়েছে, দাও তো ভাই।" আমার এবং আরো দুজনের ঠিকানা লিখে নিলেন। আর কোন কথা নয়। সকালে দেখেছিলাম আনন্দোজ্জ্বল সমুদ্র—এখন দেখছি অতি প্রশান্ত সমুদ্র, গম্ভীর (যা অধিকাংশ সময়ই দেখা যেতো)। আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলে মহারাজ বললেন, "আপনারা এবার আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।" আমরা ঘর থেকে চলে এলাম।

হঠাৎ এদিন কেন আমাদের নাম ঠিকানা ডাইরীতে লিখে নিলেন, বুঝলাম না, জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় নি। বুঝলাম পরে। ১লা জুন তাঁর একখানি পত্র পেলাম, খুলে দেখি ভিতরে তাঁর ফটো! এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ মঠ থেকে পাঠিয়েছেন।…অহেতুক কৃপার কথা বই-এ পড়েছিলাম, এই সময় প্রাণে প্রাণে তা অনুভব করলাম।

* * *

৭ই অক্টোবর, ১৯৩৫ ৺বিজয়া দশমীর দিন মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে পত্র দিই। তাঁর মঠে আসার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু পরে শুনলাম এলাহাবাদ মঠে তিনি দুর্গাপূজা করেন, কাজেই আসা হবে না। উত্তরে তিনি অন্য কথার মধ্যে লিখেছিলেন, "পূজার সময় আমাদের এখানেই মায়ের প্রতিমা গড়িয়া পূজা হইয়াছিল, সেই কারণে মঠে যাইতে পারি নাই।" আর স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—"চেষ্টা করিবেন, যতদূর সম্ভব অনাসক্তভাবে থাকিবেন।"

* * *

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৫। রবিবার। বিশেষ কারণে, কোন সংবাদ না পেলেও, মনে হল বিজ্ঞানমহারাজ মঠে এসেছেন। পর দিন বেলুড় মঠে গিয়ে দেখি সত্যিই এসেছেন। খুব আনন্দ হল। দর্শনমাত্রেই সেই সহাস্য প্রশ্ন, "কি খবর?" এদিন মহারাজ কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, কি কি দেখেছেন, সব গল্প করতে লাগলেন। প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টার সময় সব উঠে গেলাম, আবার বিকেলে তাঁর ঘরে গেছি। বহু ভক্ত মেজেতে কার্পেটের উপর বসে। আমিও বসলাম। অনেক রকম প্রসঙ্গ উঠতে লাগল। হঠাৎ এক ভদ্রলোক বিজ্ঞানমহারাজকে প্ল্যানচেট সম্বন্ধে নানা কথা শোনাতে লাগলেন। তার পর ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেল। মহারাজ বললেন, "…পাটনায় গভীর অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে ভূত দেখবার জন্য সমস্ত রাত্রি ছিলাম - কিছুই দেখিনি। তবে ঠাকুর ভূত সম্বন্ধে বলেছেন, তাই বিশ্বাস করি।" ভূতের গল্প খুব জমে উঠল। আমার মনে ভাবনা হচ্ছে—এখন তো বেশ সব শুনছি। রাত্রি ১১টা—১২টায় একলা সাইকেলে গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তখন খুব ভয় করবে (আমার বয়স তখন ১৯।২০ বছর হবে)। এরপর ইংরেজী বই-এর ভূতের গল্প শুরু হল। হঠাৎ বিজ্ঞানমহারাজ আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "খুব ভয় করছে, না?" তখন রাত্রি ৮টা হবে। আমি চুপ করে আছি। হঠাৎ মহারাজের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল আমার মনে হল তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে খুব জোর দিয়ে বললেন, "ভয় কি? কিছু ভয় নেই। মানুষ কি কম? মানুষকে দেবতারা পর্যন্ত ভয় করে, ভূত তো কোন্ ছার!" মহারাজের সেই গুরু-গম্ভীর প্রদীপ্ত মূর্তি দেখে ও কথা শুনে গল্প বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই স্তব্ধ।

নিমেষে আমার মন থেকে ভয় চলে গেল। চিরদিনের মতো।

বৈশাখ। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ। খুব ব্যাকুল হয়ে সকালে মঠে গেছি—পরীক্ষা করে দেখতে গেছি, তিনি মঠে এসেছেন কি না। কারণ, আগের রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। পাঁচ ছয় মাস বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদে ছিলেন। কখন মঠে আসবেন, কখন চলে যাবেন, জানতেও পারব না—কাজের চাপে মাঝে মাঝে গিয়ে যে খবর নেবো, তারও সময় ও শক্তি নেই। কাজেই মনে একটা অভিমান জমে উঠেছিল—যদি এমন হয়, এলেন, চলে গেলেন, খবরও জানতে পারলাম না—তাহলে…ইত্যাদি চিন্তায় মন আচ্ছন্ন ছিল—(কম বয়সে যা সাধারণতঃ হয়)। যেদিন মঠে গেলাম তার আগের দিন রাত্রে আমাদের ক্লাব 'বিবেকানন্দ ইউনিয়ন'-এ ব্যায়াম করে জনৈক আত্মীয়ের বাড়ী যাই। রাত বারটায় সেখান থেকে বাড়ী ফিরছি। একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা জনশূন্য, দোকানপাট সব বন্ধ। চারিদিক জনমানবশূন্য, নিস্তব্ধ। একলা ফুটপাথ ধরে চলেছি। হঠাৎ একটা গাছের অন্ধকার ছায়া থেকে একটি অপরিচিত যুবক বের হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, "উনি মঠে এসেছেন, আর আপনি দেখা করতে যান নি ?"—বলেই আমার বিপরীত দিকে চলে গেল। আমি অবাক—'কে যুবকটি—কোনদিন তো দেখিনি' ইত্যাদি ভেবে পিছন ফিরে তাকাতে আর তাকে দেখতেই পেলাম না। খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা—মনে নানা কথা জাগতে লাগলো। তাই পরদিন থাকতে না পেরে বেলুড় মঠে গিয়ে দেখি সত্যিই বিজ্ঞানানন্দজী এসেছেন। (ঘটনাটি আমার মনেরই প্রক্ষেপ হতে পারে। কাকতালীয়বৎও হতে পারে।) কিন্তু যাই হোক, মিলে গেছে দেখে আনন্দে উন্মাদের মতো হয়ে মঠবাড়ীর দোতলায় উঠে দেখি, ঘর খালি, গঙ্গার দিকের (দোতলার) বারান্দার রেলিং ঘেঁসে একটা চেয়ারে দক্ষিণাস্য হয়ে তিনি বসে আছেন। দেখে এত আনন্দ হয়েছে যে প্রণাম করতেই ভুলে গেছি। ভাবছি, ইনি করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণেরই আর এক মূর্তি। চিন্তায় বাধা পড়ল, হুঁশ ফিরে এল, "কি খবর ?" শুনে। একবার ভাবলাম তাঁকে আগের রাত্রের ঘটনাটি বলি—আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, ঘটনাটা যাই-ই হোক, তাঁর কৃপাতেই ঘটেছে। কিন্তু ভয় হল ; তাছাড়া অন্য ভক্তেরাও সব বসে ছিলেন। শুনলাম আজই তিনি এলাহাবাদ ফিরবেন। একটু পরেই যাত্রার তোড়জোড় চলতে লাগল। দেখে ভাবলাম, আর একটু হলেই এবার আর দর্শন হত না ! মঠের মহারাজরা প্রণাম করতে এলেন। আমি কিছু টাকা কিছুদিন ধরে (বেশ কষ্ট করেই) সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। সামনে একটি তেপায়ার ওপর তা রেখে প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি ?" আমি ভয়ে ভয়ে, লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললাম, "মহারাজ, গুরুপ্রণামী।" মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, "তোমরা এসব দিকে আস কেন ? যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাঁরা এসব করবেন।" আমি চুপ করে রইলাম, ভয় হতে লাগলো, যদি না নেন ! অন্তর্যামী তিনি, যেমন আমার অভিমানের কথা টের পেয়েছিলেন, দারিদ্র্যের কথা টের পেয়েছিলেন, তেমনি তখনকার মনের ভাবও বুঝে কৃপা ক'রে সেই সামান্য প্রণামী গ্রহণ করলেন।

মঠ থেকে গাড়ী ছাড়ার পর আমি মঠে আরতি দেখে হাওড়া স্টেশনে গেলুম। সময় ছিল প্রচুর, ট্রেন ছাড়বে রাত্রি ৯টার কাছা-

কাছি। বিজ্ঞানমহারাজ স্টেশনে যেতেন গাড়ীর ছাড়ার সময়ের অনেক আগে, ২।৩ ঘণ্টা আগে। স্টেশনে গিয়ে দেখি মহারাজ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে রয়েছেন ও ভক্তেরা সামনে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। মহারাজ বললেন, "আপনারা যখন এসেছেন, আমার একটু উপকার করুন। আপনারা উঠে এসে গাড়ীর মধ্যে বসুন। তাহলে ভীড় দেখে কেউ আর এ গাড়ীতে উঠবে না গাড়ী ছাড়ার সময় নেবে যাবেন। আমিও মজা করে ফাঁকা গাড়ীতে যাব। গাড়ীতে ভীড় দেখলে বিশেষ করে সাহেব-মেমগুলো উঠবে না—ওরাই সব চেয়ে বেশী জ্বালাতন করে।"...তারপর তিনি নিজে কিভাবে একবার এদের সঙ্গে এক গাড়ীতে যাবার সময় অসুবিধা বোধ করেছিলেন তা বললেন; মহাপুরুষ মহারাজেরও অনুরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তারপর নানা-ভাবে আমাদের হাসাতে লাগলেন। একজন মহারাজের হাত থেকে ছেলেমানুষের মতো মনিব্যাগ কেড়ে নিলেন। মহারাজ বার বার ফেরত চাচ্ছেন, তিনি দিচ্ছেন না। শেষে যখন বললেন, "ব্যাগ দিন, এখুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে" —তখন হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "ভালই তো হবে। এই নাও তোমার পয়সা, ব্যাগটা খুব ভাল, আমার পছন্দসই, আমি আর দেবো না।" এই ধরনের হাসাহাসি চললো—তাঁর চলে যাওয়ার জন্য আমাদের মনে যে ভারাক্রান্ত ভাব ছিল, তা এভাবে কাটিয়ে দিলেন। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ ঃ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক: শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ৫২, ঠাকুরবাটী স্ট্রীট, পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলী। (১৩৮২), পৃষ্ঠা ৭৯, মূল্য পাঁচ টাকা।

অধ্যাত্মপথের পথিকমাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমাণে জানেন যে, আধ্যাত্মিক ভাবধারায় জীবনগঠনের জন্য সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গের প্রয়োজন অপরিমেয়। গ্রন্থটির নিবেদনে গ্রন্থকার বলেছেন, সৎগ্রন্থ-অধ্যয়নেও সাধুসঙ্গের কাজ হয়ে থাকে এবং তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই গ্রন্থ পাঠে অধ্যাত্মকামী মানুষের উজ্জীবন ঘটবে। তবে গ্রন্থের অভ্যন্তরে লেখকের মূল প্রতিপাদ্য হল, যে-মানুষ অধ্যাত্ম-আলোকে নিজের জীবনকে প্রজ্জ্বালিত করেছেন, অধ্যাত্মপথে উন্নতিকামী প্রতিটি মানুষকে আসতে হবে তাঁরই কাছে আপন হৃদয়ের প্রদীপটি জ্বালিয়ে নেবার জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই ভগবানের দর্শন পেতে হলে প্রথমে যথার্থ ভক্ত-হৃদয়রূপী বৈঠকখানায় যেতে হবে। তবেই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর প্রাণে জাগবে বিশ্বাস ও ভক্তি এবং সাধন ও তপস্যার আকাঙ্ক্ষা এবং পরিশেষে হবে ভগবান-লাভ।

গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী, স্বামী নিগমানন্দের শিষ্য এবং শাস্ত্রবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। এই গ্রন্থে তিনি শাস্ত্র মন্থন করে 'সাধুসঙ্গে'র পরম পাবনী শক্তির রূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। গীতা ভাগবত যোগবাশিষ্ঠসার ভক্তিসূত্র চৈতন্যচরিতামৃত রামচরিতমানস ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সাধুসঙ্গের অমোঘ শক্তির কথা এবং ভেক নাম ও গুরুমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া কবীর নাভাদাসজী স্বামী নিগমানন্দ অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি

সাধক ও প্রেমী ভক্তদের বাণী ও রচনা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই বিস্তৃতি ও উদারতার ফলে গ্রন্থটি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই আদরণীয় হবে।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিত মুখবন্ধ এবং শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তবে শাস্ত্রাদি থেকে এত উদ্ধৃতির ফলে পুস্তকটি সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গের উপর একটি গবেষণা গ্রন্থের রূপ নিয়েছে এবং একথা সত্য যে সাধারণতঃ যাঁরা পঠন-পাঠনে কিছুটা অগ্রসর তাঁদেরই এই ধরনের গ্রন্থ অধিক আকৃষ্ট করে, অপরদের ততটা নয়। তাছাড়া এই ধরনের এবং এই অবয়বের গ্রন্থের সচরাচর যে মূল্য হওয়া উচিত এই গ্রন্থটির মূল্য তদপেক্ষা অধিক হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি সহজে সংগ্রহযোগ্য হবে না। তবে গ্রন্থটির বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট ধরনের।

আশা করি, এই গ্রন্থ যাঁরা পাঠ করবেন তাঁদের হৃদয়ে সাধুসঙ্গলাভের সত্যিকারের আগ্রহ জাগবে এবং যথার্থ সাধুত্ব কি তার মাপকাঠিও তাঁরা জেনে নিতে সক্ষম হবেন।

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

জ্ঞান মহারাজের সান্নিধ্যে : সম্পাদক : শ্রীতারকনাথ আঢ্য। প্রকাশক : শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ১৩।১, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উত্তর ব্যাঁট্‌রা, হাওড়া। (১৯৭৬), পৃঃ ১৭৪, মূল্য চার টাকা।

গ্রন্থটির 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আছে : "কয়েক বছর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ সম্বন্ধে 'কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।......ঐ সংস্করণটি বর্তমানে নিঃশেষিত। ইতিমধ্যে বহু অনুরাগী পাঠক ও ভক্তবৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করেন, যেন তাঁর জীবন ও বাণী-সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান গ্রন্থ 'জ্ঞান মহারাজের সান্নিধ্যে' প্রণয়ন করা হয়েছে।" 'প্রকাশকের নিবেদন'-এও ঐ একই কথা পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

সুতরাং গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গতা কতদূর সম্পাদিত হইয়াছে তাহা যাচাই করিবার জন্য 'কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ' গ্রন্থটিও দেখিতে হইল। ফলতঃ দেখা গেল উহার অন্তর্গত ৮১-পৃষ্ঠাব্যাপী 'কথা-প্রসঙ্গে' পরিচ্ছেদটিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া আলোচ্য গ্রন্থে ১৬-পৃষ্ঠাব্যাপী 'ভাবের কথা'—পরিচ্ছেদে পর্যবসিত করা হইয়াছে। ইহা 'পূর্ণাঙ্গ' প্রকাশনের নিদর্শন নহে। আশঙ্কা হয় বর্তমান গ্রন্থটিও নিঃশেষিত হইলে ইহার ৭৪-পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পূর্ণ নূতন 'কথাপ্রসঙ্গে' হইতে অনুরূপভাবে পরবর্তী কোনও প্রকাশনে ১২।১৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কোনও 'ভাবের কথা'র উদ্ভব না হয়!

আরও দেখা গেল, 'কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ' বইটিতে ৩২টি পত্রের যে সঙ্কলন ছিল, তাহা সম্পূর্ণ বাদ দিয়া আলোচ্য গ্রন্থে নূতন ৩১টি পত্রের সঙ্কলন দেওয়া হইয়াছে। ইহাও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনের নিদর্শন নহে।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, 'কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ' গ্রন্থটির অতিরিক্ত যে-সকল নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, যেমন নূতন 'কথাপ্রসঙ্গে', নূতন 'পত্রসংকলন' ইত্যাদি, তাহা লইয়া এবং কিছু পরিশ্রম করিয়া পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজের অসংখ্য অনুরাগী ও ভক্তগণের নিকট হইতে স্মৃতিকথা সংগ্রহ করিয়া 'কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ' গ্রন্থটির অনুপূরক হিসাবে একখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নূতন গ্রন্থ অনায়াসে প্রকাশিত হইতে পারিত।

গ্রন্থারম্ভে পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের যে

চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট এবং চিত্রোপরি 'ওঁ ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ'-কথাটি জ্ঞান মহারাজের 'মার্কামারা'—'ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়'-কথার পরিবর্তে কেন দেওয়া হইয়াছে তাহা দুর্বোধ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ'-গ্রন্থটিতে জ্ঞান মহারাজের চিত্রগুলি যথাযথ এবং প্রশংসনীয় ভাবে উপস্থাপিত।

পরিশিষ্ট (ক)-রূপে লক্ষণীয়ভাবে প্রদর্শিত 'রূপান্তর'-শীর্ষক কবিতাটির লেখক সম্পর্কে সম্পাদকীয় কোনও মন্তব্য নাই। ১৮-সংখ্যক পত্রের প্রারম্ভে (পৃঃ ১৩৯) পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং সম্পাদক মহোদয় পাদটীকায় শুধু এইটুকু জানাইয়াছেন যে, কবিতাটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে। ফলে অন্ততঃ কোন কোন পাঠকের এইরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে যে, কবিতাটি হয়তো জ্ঞান মহারাজেরই রচনা—বিশেষতঃ যখন উহার আদিতে ও অন্তে তাঁহারই মার্কামারা 'ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়'-কথাটি শোভা পাইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কবিতাটি জ্ঞান মহারাজের অনুপ্রাণনায় তাঁহারই অনুরাগী কোন যুবকের রচনা। উহা 'সন্ন্যাসীর গীতি'-র সরল ছন্দে রচিত এবং উহার ষষ্ঠ হইতে নবম স্তবক পর্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ও অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতীর চিন্তাধারা উপজীব্যরূপে গৃহীত। পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের পত্রে উল্লেখিত না হইলে কবিতাটি আলোচ্য গ্রন্থে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হইত।

আলোচ্য গ্রন্থটির সম্পাদনায় আরও অনেক অল্পস্বল্প ত্রুটি আছে। উহাদের উল্লেখ করিয়া সমালোচনাকে দীর্ঘতর করিতে চাই না। মুখ্যতঃ 'কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ'-গ্রন্থটির পরি- ৫ এত কথার অবতারণা। ঐ পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে আমাদের প্রথমোক্ত মন্তব্যগুলির কোনও মূল্য নাই। সম্পাদক ও প্রকাশকের উল্লেখিত 'পূর্ণাঙ্গ' প্রকাশনের নিরপেক্ষ বিচার করিতে যাইয়াই কর্তব্য হিসাবে আমাদের ঐ সকল মন্তব্য করিতে হইল।

পরিশেষে আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য জ্ঞান মহারাজ সম্বন্ধে বেশ কিছু নূতন তথ্য এবং ৩১টি নূতন পত্র পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। শিষ্যের মধ্যেই গুরুকে অংশতঃ পাওয়া যায়। যাঁহারা স্বামীজীকে দেখেন নাই, অথচ তাঁহার একজন শিষ্যকেও দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীজীকে আংশিকভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহারা ভাগ্যবান এবং তাঁহাদের সঙ্কলিত এই জাতীয় পুস্তক দেশবাসীর সম্পদ, সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ সম্পর্কে এই ধরনের যত তথ্য এবং পত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়, ততই দেশের ও দশের মঙ্গল। সুতরাং গ্রন্থটিকে আমরা আন্তরিকভাবে সাদর অভিনন্দন জানাই এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি, কারণ আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই গ্রন্থ সকলেরই কল্যাণ করিবে। পরিশিষ্ট (খ)-এ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির সম্পর্কিত তথ্যের জন্য সম্পাদক মহোদয়কে ধন্যবাদ। আশা রাখি মন্দিরের কর্তৃপক্ষ পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজের আরও স্মৃতিকথা এবং সম্ভব হইলে আরও পত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে বাগেরহাট ঢাকা দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গুঁড়ো দুধ বিতরণ ও রোগীদের চিকিৎসা এবং শ্রীহট্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে গুঁড়ো দুধ বিতরণ অব্যাহত থাকে।

ভারতে গত ১৫ই জুন (১৯৭৬) হইতে আসাম ও ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণকার্য পরিচালিত হইতেছে। কাছাড় জেলায় শিলচর ও করিমগঞ্জ কেন্দ্র মারফত চিড়া গুড় চাল আটা ডাল বেবি-ফুড সরিষার তেল কেরোসিন তেল ধুতি শাড়ি ইত্যাদি বিতরিত হইতেছে এবং ভ্রাম্যমাণ ডিসপেন্সারির দ্বারা রোগীদের চিকিৎসাও করা হইতেছে। ত্রিপুরায় কৈলাশহর ধর্মনগর ও কমলপুর কেন্দ্র মারফত চাল ডাল লবণ ধুতি শাড়ি কম্বল ও গুঁড়ো দুধ বিতরিত হইতেছে।

রাজকোট আশ্রম কর্তৃক গণ্ডাল তালুকে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় বিপর্যস্ত ২০০ পরিবারের মধ্যে ২৯শে জুন (১৯৭৬) হইতে ২রা জুলাই (১৯৭৬) পর্যন্ত বাসনপত্র শাড়ি এবং শিশুদের পোশাক বিতরিত হইয়াছে।

রাজকোট আশ্রম বরোদায় ত্রাণকার্য শুরু করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

কোয়াম্বাতুর (Coimbatore) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৭৪-৭৫ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ৪০০ একর জমির উপর অবস্থিত এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটিতে চৌদ্দটি শিক্ষায়তন, একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং একটি চিকিৎসালয় আছে। আলোচ্য বর্ষে উহাদের কার্যাবলীর সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় : ছাত্র-সংখ্যা ১৮৬। আবশ্যিক বিষয়ের অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় ছিল : বীজগণিত ও জ্যামিতি, রসায়ন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং।

(২) শিক্ষক-শিক্ষণালয় : ছাত্রসংখ্যা ২৯। দুই বৎসরের পাঠ্যক্রম। নবগণিত ও বিজ্ঞানের ৫টি আধুনিক ধরনের পাঠ্যক্রম পরিচালিত হয় এবং উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০০ শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত হন।

(৩) স্বামী শিবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় : মুখ্যতঃ গ্রামীণ বালকবালিকাদের জন্য পরিচালিত। ছাত্রসংখ্যা ১৯৪ ; ছাত্রীসংখ্যা ৪৮। ঐচ্ছিক বিষয় : বীজগণিত ও জ্যামিতি,

পদার্থবিদ্যা রসায়ন এবং ইতিহাস। বিনা খরচে ৩৫টি ছাত্রছাত্রীর মধ্যাহ্নের জলযোগ এবং ২৫টি ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট পোশাক পায়।

(৪) টি. এ. টি. কলানিলয়ম সিনিয়র বেসিক স্কুল: ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৩২, তন্মধ্যে ছাত্রী ১৭৯। বিনাখরচে ১৬০টি ছাত্রছাত্রী মধ্যাহ্নের জলযোগ এবং ৭০টি ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট পোশাক পায়। এই স্কুলটির একটি নার্সারী বিভাগ আছে।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়: শিক্ষার্থীদের সংখ্যা: বি. এড. ১৬০, সংক্ষিপ্ত বি. এড. ৮০, শিক্ষাবিষয়ে ডিপ্লোমা ১৭, এম. এড. ১৭ এবং পিএইচ. ডি. ৬ মোট ২২৬। ৭৭৩ জন শিক্ষকের জন্য মহাবিদ্যালয়টির সম্প্রসারিত বিভাগে ২৪টি ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এম. এড. ও পিএইচ. ডি. পাঠ্যক্রমে শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়। এম. এড. পাঠ্যক্রমের ঐচ্ছিক বিষয়: শিক্ষাবিষয়ক উচ্চ মনোবিদ্যা, শিক্ষাবিষয়ক প্রশাসন, শিক্ষা-চিন্তা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ। পৃথক্ গবেষণা বিভাগ, প্রকাশন বিভাগ এবং মনোবিজ্ঞান-বীক্ষণাগার ইত্যাদিও আছে। শিক্ষাসম্বন্ধে গবেষণা-বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

(৬) কলা ও বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়: ছাত্র-সংখ্যা ৭৭৯। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা আছে। ডিগ্রি পাঠ্যক্রমে আছে: গণিত পদার্থবিদ্যা রসায়ন ইতিহাস বাণিজ্য ও সমবায়। এম. এস্. সি. পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত পদার্থবিদ্যায় ও গণিতে যথাক্রমে ইলেকট্রনিক্স ও পরিসংখ্যান বিশেষ বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়।

(৭) শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়: শিক্ষার্থীদের সংখ্যা: সার্টিফিকেট ৭৭, স্নাতক (বি. পি. এড.) ২৪, স্নাতকোত্তর (এম. পি. এড.) ৮—মোট ১০৯।

(৮) পলিটেকনিক: শিক্ষার্থীদের সংখ্যা: ত্রৈবার্ষিক সিভিল ও গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১৪৪ ষাণ্মাসিক অটোমোবিল ইঞ্জিনিয়ারিং ৪২ ষাণ্মাসিক কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্র্যাকটার সারভিসিং ১০—মোট ১৯৬।

(৯) কৃষি-বিদ্যালয়: কৃষি বিজ্ঞানে দুই বৎসরের সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রমে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬৮।

(১০) গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়: গ্রামসেবার তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমে এবং কৃষিবিষয়ক অর্থনীতি ও সমবায়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬।

(১১) শিল্প প্রতিষ্ঠান: টার্নিং ফিটিং মোল্ডিং-এর দুই বৎসরের এবং মুদ্রণ-প্রযুক্তিবিদ্যায় হ্যাণ্ড কম্পোজিং ও প্রুফ রিডিং-এর এক বৎসরের পাঠ্যক্রমে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৬। একটি ছাপাখানাও আছে। সেখানে ছাত্রগণ হাতে কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং ছোটখাটো ছাপার কাজও করা হয়।

(১২) গ্রামীণ চিকিৎসালয়: চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৯,৬৫৬, তন্মধ্যে নূতন রোগী ছিলেন ১১,০১৯।

(১৩) শিল্পবিভাগ: এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইলেকট্রনিক মোটর, পাম্প-সেট ইত্যাদি নির্মিত হয়।

(১৪) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: পুস্তক সংখ্যা ৪৩,১৯৫, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৫০; গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্যা ১৫,৬৮৬; পাঠকদের গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ২৫০।

(১৫) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান: ১০ জন ছাত্র টাইপ-রাইটিং শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

(১৬) বালবিদ্যালয়: আড়াই হইতে ছয় বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬। সকলেই বিনা খরচায় জলযোগ পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তীতে ত্রিশ হাজার ভক্তের সমাগম হয় এবং দশ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বালক-বালিকাদের ক্রীড়া-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই উৎসবে যোগদান করে।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলের এক অনুষ্ঠানে ১৩টি নার্সিং স্কুলের ৩৯ জন ছাত্রীর মধ্যে ৫১টি পুরস্কার প্রদত্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ১৯ জন ছাত্রী ২৮টি পুরস্কার পায় এবং সর্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার পাওয়ায় শীল্ড লাভ করে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

টালিগঞ্জ ইন্দ্রানী পার্ক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক গত ১০ই ও ১১ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হইয়াছে। ১০ই এপ্রিল মঙ্গলারতি, প্রভাত-ফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগ ও আরতি, ভক্তিমূলক গান এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-পাঠ হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী উমানন্দ ভাষণ দেন। পরে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১১ই এপ্রিল মধ্যাহ্নে নর-নারায়ণের সেবা হয়। অপরাহ্ণে ভক্তিমূলক গান ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-পাঠ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নূতন পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১১ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব মঙ্গল-আরতি বিশেষ পূজা হোম ভজন-কীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। চারিগ্রাম শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় সাত শত ব্যক্তি খিচুড়ি প্রসাদ পান। বৈকালীন ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ ও শ্রীকিরণ ঘোষাল শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। স্থানীয় শিল্পিগণ ভক্তিসংগীত পরিবেশন করেন।

দিনহাটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গত ১৬ই হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ পূজা কথামৃত-পাঠ ভজন ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রায় তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীহৃষীকেশ সাহা শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রামকৃষ্ণ সঙ্গীত সমাজ এবং শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত 'রামকৃষ্ণ লীলাগীতি' ও 'বিবেকানন্দ লীলাগীতি' পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর চিত্রসম্বলিত একটি প্রদর্শনী উৎসবের অঙ্গ ছিল।

ভিকসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি আশ্রমে গত ১৮ই এপ্রিল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজীর উপস্থিতিতে ভগবান শ্রীরাম-

কৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। মঙ্গলারতি ষোড়শোপচারে পূজা হোম চণ্ডীপাঠ গীতাপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ খিচুড়ি প্রসাদ পান। বৈকালীন ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী ইজ্যানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী প্রমথানন্দ ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন।

রাখাল চণ্ডী (২৪ পরগণা) রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক গত ২০শে মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ ও শ্রীকিরণ চন্দ্র ঘোষাল ভাষণ দেন। ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা কথামৃতপাঠ প্রসাদবিতরণ ইত্যাদি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

শ্যামপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মণ্ডপের দশম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে গত ১২ই জুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ কথামৃতপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে গত ১১ই হইতে ১৪ই মার্চ '৭৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রত্যহ মঙ্গলারতি ও পূজান্তে প্রসাদবিতরণ করা হয়। প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা ধর্মসভায় ভাষণ দেন ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। রামায়ণগান করেন শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভক্তি-গীতি পরিবেশন করেন শ্রীমতী রেখা চ্যাটার্জী। শেষদিন মণিমেলার ভাইবোনেরা ও সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ শহর পরিক্রমা করেন এবং প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

আমতলী (ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। ১৩ই প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, পরে উপনিষদপাঠ এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও কথামৃতপাঠ হয়। রাত্রে 'লক্ষ্মণ-শক্তিশেল' পালা পরিবেশন করেন শ্রীহৃষ্কমণি সিং ও তদীয় সম্প্রদায়। ১৪ই মার্চ মঙ্গলারতি ও ভজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ প্রভাত-ফেরী ষোড়শোপচারে পূজা হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে তিন সহস্রাধিক ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতি শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীকুলেশ-প্রসাদ চক্রবর্তী ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক কথামৃতপাঠ ও ভজনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ই মার্চ হইতে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পূজা পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক দিন বিকালে ধর্মীয় সঙ্গীতের সহিত ধর্মসভা আরম্ভ হয়। ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী বিকাশানন্দ। বিভিন্ন দিনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রী পি. এস. রাওয়াল ও শ্রীসুনীল কুমার ভৌমিক। সভান্তে ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও বক্তৃতা করেন শ্রীযোগেশ দাস। ছায়াচিত্র সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সমাজ, আলিপুরদুয়ার। রামায়ণগান পরিবেশন করেন সঙ্গীতসুধাকর শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী। উৎসবের শেষদিনে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই কার্ত্তিক। (১৩০৬ সাল) [২০শ সংখ্যা।]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

মায়াবাদের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রথমে জীব বলিলে কি বুঝায়, তাহাই বুঝা আবশ্যক। তুমি জগতে যত ব্যবহার করিয়াছ করিতেছ বা করিবে সকল ব্যবহারেই তোমার আত্মজ্ঞান আছে, তাহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে। জগতে শত শত বস্তুতে তোমার সংশয় হয়, সহস্র সহস্র বিষয়ে তোমার ভ্রান্তি হয়, বল দেখি সেই সংশয় ও ভ্রান্তির সময়ে তোমার আত্মবিষয়ে সংশয় বা ভ্রম কখনও কি হইয়াছে? মনে কি পড়ে কখন তুমি নিজেকে—'আমি' 'আমি' কি না—আমি আমি নহি এ প্রকার সংশয় বা বিপরীত জ্ঞানের বিষয় করিয়া কোন ব্যবহারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ? নিশ্চয়ই ইহার উত্তরে সকলেই বলিবে যে—না; অর্থাৎ কোন ব্যক্তিরই আত্মবিষয়ে সংশয় বা বিপরীত জ্ঞান হয় না। তাহাই যদি হইল, এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি—'আমি' বলিতে তুমি বাস্তবিক কি বুঝিয়া থাক?

সেই একদিন যেদিন জননী জঠর হইতে সদ্যঃ নির্গত হইয়া ছোট ছোট অকর্ম্মণ্য কতকগুলি অবয়বের সমষ্টি, একটী পিণ্ডপ্রায় আকৃতি, কি জানি কি ভাবে কান্দিতে কান্দিতে জননীর স্তন মুখে দিয়াও অজ্ঞানবশতঃ বা অনভ্যাসের বশে দুগ্ধ টানিতে পারিতেছিল না, বল দেখি তুমি কি সেই সদ্যঃজাত পিণ্ডাকৃতি সামর্থ্যহীন শিশু? সেই একদিন যেদিন নূতন নূতন বিষয়ের নব নব পরিচয়ে সমুদ্দীপ্ত বাসনা-স্রোত, তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় নববিকাশোন্মুখ ইন্দ্রিয়-মন্দির, বসন্তসমাগমে অঙ্কুরিত সহকারপাদপের ন্যায় সেই সুন্দর কৈশোরবপুকে নাচাইয়া তুলিল;—বল দেখি সেই উদীয়মান নব নব আশার বিলাস-নিকেতন শরীর আর তুমি কি একই বস্তু? না কখনই না। বাল্য শরীর আর নাই, কৈশোরের সেই কোমল বপু কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, অথচ তুমি ত যাহা ছিলে তাহাই আছ। বাল্য কৈশোর যৌবন বা জরার আবির্ভাবে নূতন নূতন ভিন্ন ভিন্ন দেহ আমার হইয়াছে, আবার নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বাল্য শরীরে 'আমি' বলিলে যাহা বুঝিতাম, যৌবনের শরীরেও 'আমি' বলিলে যেন তাহাই বুঝি না কি? বাল্য যৌবন জরার কত শত অবস্থার সঙ্গে মিশাইয়া কত শতবার আমাকে কত শত প্রকারে বুঝিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়—তত্তৎকালে আমার সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া অনুভূত সেই বাল্য যৌবন জরার কত শত অবস্থা এক্ষণে একেবারে অনন্ত বিস্মৃতির জলে

* শ্রাবণ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি ত এখনও যাহা তাহাই আছি। জন্মলাভের পর, জ্ঞানের প্রথম বিকাশ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কতশত সুষুপ্তি, কত মোহ, কত অনবধানতা এ জীবনে কাটিয়া গেল; কিন্তু বল দেখি, এই দীর্ঘকালের মধ্যে 'আমি' বলিলে যাহা বুঝায়, সেই মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায়, সূক্ষ্মভাবে একাকার অনুস্যূত এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় প্রকাশময় ভাবের বিচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা কি তোমার অনুভবের গোচর হয় ?

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা দার্শনিকতার অভিমান রক্ষা করিতে গিয়া, এই সর্ব্বাবস্থানুস্যূত অনির্ব্বাচ্য অথচ সর্ব্বানুভববেদ্য অহংভাবে আবৃত প্রকাশময় আত্মতত্ত্বের খণ্ডন করিতে অনেকে উদ্যত হইতে পারেন ও নানা যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া অপেক্ষাকৃত অজ্ঞসম্প্রদায়ের নিকট বিজয়-ভেরী বাজাইয়া নিজমত সংস্থাপনও করিতে পারেন, উহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু ধূলিধূসরিতপাদ হলবাহক হইতে উচ্চতম দার্শনিক পর্য্যন্ত, যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কাপট্য পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইলে, সেই প্রত্যেকেই বলিবে যে এই আমিময় স্বপ্রকাশ সূক্ষ্ম কি যেন কি এক প্রকারের বস্তুর বিচ্ছেদ আমার জীবনে অনুভূত হয় নাই, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা কেহ বুঝে না, ইহার বিলয়াবস্থা এজীবনে এক্ষণ পর্যন্ত অনুভবের গোচর হয় নাই, ইহার বিলয় হইবার পর কি হইবে, তাহা ভাবিবার শক্তিও নাই। ইহা স্বয়ংপ্রকাশ ইহাতে সংশয় নাই, বিপর্য্যয় নাই। এই সূক্ষ্ম অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বানুভব সাক্ষিক প্রকাশময় অহংভাবাবৃত বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি ; মায়াবাদে ইহাই ব্যবহারিক জীবের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অল্প আয়তনের ভিতরে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃতভাবে বিশদ আলোচনা হওয়া অসম্ভব, এই জন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে জীববিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের মত প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে অন্য আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে। [ক্রমশঃ]

বড় বউ।

(বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

একুশ বৎসর বয়সে গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। গোপীমোহন বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিষয়কর্ম্ম শিখিতেছিলেন, সম্পূর্ণ শিখিতে পারেন নাই। যত্ন পরিশ্রমে, তাহা যেন করিলেন, কিন্তু তাঁহার তিনটী নাবালক ভাই আছে, বিমাতাও জীবিতা আছেন। প্রথম চিন্তা, বিমাতা তাঁহার সহিত এক সংসারে থাকিবেন কি না ?—তাহার উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ আছে, কুপথগামী না হয়! লেখাপড়া শেখে, অংশমত যে সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহা ভোগ করিতে পারে, কৃতী হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মান-মর্য্যাদা রক্ষা করে, এই সকল চিন্তা দিবানিশি তাঁহার মনোমধ্যে উঠিতে থাকে। বাড়ীতে দুইটী বিধবা ভগ্নীও আছে, এ দুইটী তাঁহার সহোদরা। তাহাদের নিমিত্ত তাঁহার পিতা কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই ; সেও এক চিন্তা বটে! কিন্তু তাঁহাদের ভার তিনি

স্বয়ং লইলেই চলিয়া যাইবে, তাঁহার অংশ হইতে তাঁহাদের খরচ পত্র নির্ব্বাহ হইলে আর কোনও আপত্তি থাকিবে না। ভগ্নী দুইটী "চতুর্থী" করিবে, সেই কথা উপলক্ষে তাঁহার বিমাতার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা তাহাও খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, "মা, আপনার উপর এখন দুনো ভার পড়িল! আমাকে মানুষ করিয়াছেন, আর বড় দেখিতে শুনিতে হইবে না; কিন্তু আপনার আর তিনটী সন্তানকে মানুষ করিবার ভার আপনারই উপর! কেননা আমাদের পিতা নেই! বিমাতা উত্তর করিলেন, "কেন গোপীমোহন, তুমি বড় ভাই রহিয়াছ, তোমাকে তিনি মানুষ করিয়া গিয়াছেন, আমার ভয় কি? তুমিই দেখিবে শুনিবে!" কিন্তু একথা শুনিয়াও গোপীমোহন নিশ্চিন্ত হইলেন না, সরল ভাষায় সরলভাবে বলিতে ত্রুটি করিলেন না; বলিলেন, "মা, সংসারে চক্রী-লোকের অভাব নেই! অর্থ বড় বিবাদমূলক, ইহাতে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা!"—আরও বলিতে যান, কিন্তু সরল-প্রকৃতি বিমাতা এক কথায় তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া গোপীমোহনকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "গোপীমোহন, ভয় করিও না যিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি আমাকেও তাঁহার সেবার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই উপদেশে সংসার চিনিয়াছি! যদিও না চিনিতাম, তাঁহার শেষ কথা আমার ইষ্টমন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, তুমি আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া থাকিও, গোপী-মোহনকে তোমার গর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, সাংসারিক কোনও কার্য্যে ব্যস্ত থাকিও না, তাহারই উপরে ভার দিও। সে যদি তোমার ছেলেদের বঞ্চিত করে, করুক—তুমি কিছু দেখিও না! এই মনে বুঝিও যে, আমি তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। যদি এইরূপ বুঝিয়া চল,—আমি স্বামী—আমার কথায় তোমার ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল হইবে। অশৌচ অবস্থায় দেবকার্য্যের অধিকার নাই। আমি আমার স্বামীর অভিমত কার্য্য করিব। আশীর্ব্বাদ করি, যেন তুমিও তোমার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিতে পার।" গোপীমোহনের দ্বিগুণ চিন্তা বাড়িল। বিমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সপত্নী-সন্তান যথার্থই ভার গ্রহণ করিবে, কোন কথা কহিলেন না।

গোপীমোহন সংসারধর্ম্ম করেন। ভাইগুলিও বশ, কথামত চলে, স্কুলে যায়। বাড়ীতে যখন মাষ্টার পড়াইতে আসে, গোপীমোহন সেই খানেই বসেন। স্কুলের মাষ্টারদের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কখন কখনও নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাটীতে আহারাদি করান, এবং ভাইগুলির কথা বারংবার বলেন। মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা—কিশোরীমোহন রাধামোহন—এক রকম লেখা পড়া শিখিতে লাগিল; যত চেষ্টা সেরূপ নয়,—যাহাই হউক এক রকম শিখিতে লাগিল। কিন্তু ছোট—প্যারীমোহন—কিছুই শিখিতে পারে না। মাষ্টারেরা বলিতে লাগিল, "ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না!" ইহাতে গোপীমোহন সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক দেন, কাছে বসাইয়া শেখান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বুদ্ধিবিকাশের লক্ষণ আর কিছুই দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা বয়সের সহিত বাড়িতে লাগিল। ললিতাদেবী—গোপীমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যত্ন করিয়া, কত বুঝাইয়া, নিজে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া দশমবর্ষীয় প্যারীমোহনকে প্রথম ভাগ শিখাইতে পারিলেন না। প্যারীমোহনের সম্বন্ধে একদিন

ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "ওর ত কিছু হইল না, বিধাতার বিড়ম্বনা কি করিবে বল ? আর পীড়নে কোন ফল নেই ; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিৎ নয় ;—ছোট্ ঠাকরুণ দেবসেবা করেন ; প্যারীমোহন যত পারে, তাঁহার সেই কার্য্যে সহকারী হউক ;—ফুল তুলু'ক, বিল্বপত্র আনু'ক, চন্দন ঘসু'ক। গোপীমোহন সম্মত হইলেন। ললিতাদেবী শাশুড়ীর নিকট এ কথা প্রস্তাব করিলেন ; শাশুড়ী বলিলেন, "মা, আর কেন আমাকে তোমাদের কাযে জড়াও" ? কিন্তু ললিতাদেবী নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রবৎ দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া যে সকল সাংসারিক কার্য্য তিনি করেন, তাহারই দু'একটা কার্য্য করিতে বলেন। প্যারীমোহনের পক্ষে ইহা একটা আশ্চর্য্য মন্ত্র হইল। যে প্যারীমোহন পাঁচ বৎসরে বর্ণের ছবি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, দুই তিন দিনে ললিতাদেবী যে সকল সাংসারিক কার্য্য করেন, তাহা বুঝিতে পারিল এবং ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া, সরকারের সহিত তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। দু'এক দিনেই, বাজার সরকার বুঝিতে পারিল যে, অবাগীর ব্যাটা প্যারীমোহন বাজার করা বেশ বোঝে—এ গাড়লকে ঠকাইয়া দু' পয়সা রোজকার করিবার যো নাই। সরকার যখন বাজার করে, তখন প্যারীমোহন কোনও কথা বলে না, যেন অন্যমনে আছে, কিন্তু দস্তরী বাটার সমস্ত কথা, বড় ভায়'কে আসিয়া খপর দেয়। ভাযে'র কাছেই আবদার! আর কা'রও কাছে বড় কথাবার্ত্তা কহে না।—ভায'কে বলিল, যে আমি বাজার করিতে পারি। ললিতাদেবীও দু' দশ টাকার বাজারে তাহাকে গাড়ী করিয়া একা পাঠাইতে লাগিলেন ; দেখিলেন, সে যেরূপ সামগ্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে বিষয় আশয়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত, অপর সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমস্তই প্যারীমোহন করিতে লাগিল। শান্ত, নীরবে কার্য্য করে। ভাযে'র সহিতই তাহার কথা। একদিন চুপি চুপি বলিল, "বউ দিদি, বড় দাদাকে বলিও, মেজ দাদা ও সেজ দাদাকে আরও ভাল কাপড় দিতে"। ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন" ? আর কিছু উত্তর করিল না—বোকা হইয়া রহিল। কিন্তু ললিতাদেবী কথাটি বোকার কথার ন্যায় বুঝিলেন না ; গোপীমোহনকে প্যারীমোহনের কথা বলিলেন।

গোপী।—কেন ? আমি ত' আমাদের অবস্থানুযায়ী বস্ত্র দি। তবে খোসপোষাকী হয় এ আমার ইচ্ছা নয়।

ললিতা।—যদি উহাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে,—ছেলে মানুষ পাঁচজনকে সাজ গোজ করিতে দেখে—

গোপী।—কা'কে দেখে ? কা'র সহিত মিশিতে দি ? নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আমি স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা বয়াটে বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে উহাদের দেখা হয়। স্কুলের ভাল ভাল ছেলে আনাইয়া, প্রতি রবিবারে উহাদের সহিত আমোদ করিবার নিমিত্ত ভোজ দি। তুমি ও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন ?

ললিতা।—নিতান্ত বোকা কিরূপে বুঝিব ? যেরূপ সংসারের কার্য্য করিতেছে, এরূপ যে কেহ পারে, তাহা আমার ধারণা নাই।

গোপীমোহন ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, "তোমাদের আদরেই ত' গেল"! এ কথা আর

বাড়িল না। অন্য আর একদিন গোপীমোহনকে ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার কায কেন ওকে একটু একটু শেখাও না" ? গোপীমোহন ক্রোধের সহিত উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন— "তোমার দেখ্‌ছি, দেওরের উপর সমস্ত ভার দিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে! ক' এ আঁকড়ি দিতে জানে না, তাকে আমি বিষয়-কর্ম শেখাব ? এ তোমার কুট্‌নো কোটা বাট্‌না বাটা নয়"! ললিতাদেবীর উত্তর, গোপীমোহন আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলেন যে, প্যারীমোহন এখন পত্র লিখিতে পারে। ললিতাদেবী বাপের বাড়ীতে যে সব পত্র পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে হয় না। ললিতাদেবী যদিচ পড়িতে জানিতেন, কিন্তু সাদায় কালী দিতে হইবে বলিয়া লিখিতে শেখেন নাই। গোপীমোহন আরও শুনিলেন যে, প্যারী-মোহন রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া ললিতাদেবীকে শুনায়! হিসাব পত্র মুখে মুখে করিতে পারে। ললিতাদেবীর নিকট টাকা লইয়া দু'পাঁচখানা ইংরাজী বই কিনিয়াছে। কাহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে, জানেন না, কিন্তু পড়িতে পারে নিশ্চয়। শেষ যে বইখানি কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা যায়। মাঝে মাঝে যেন দু'একখানা চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এ সকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। আদর করিয়া প্যারীমোহনকে ডাকাইলেন; কিন্তু প্যারীমোহন দাদার নিকট আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপীমোহন বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া, কথার উত্তর না পাইয়া ললিতাদেবীকে বলিলেন, "বাঃ বেশ কালিদাস"! সে দিন গেল। ললিতাদেবী ছাড়েন না। গোপীমোহন একখানি খাতা দিয়া বলিলেন, "তোমার 'হিসাবী মুহুরীকে' দিয়া এগুলি ঠিক দেওয়াও দিকি"! সেই খাতা-খানিতে ভুল ছিল, রেওয়া মিলে না, সে নিমিত্ত অবকাশমত স্বয়ং হিসাব দেখিবেন বলিয়া, তাঁহার শয়নকক্ষে খাতাখানি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার খাতায় ভুল আমার কালিদাস ধরিয়াছে। ২১৷৷৶০ খরচ পড়িয়াছে, তাহার জমা নাই।" এই ভুল ধরিতে যথেষ্ট জমা খরচ বোধ থাকা আবশ্যক। প্যারীমোহন তাহা ধরিয়াছে শুনিয়া, গোপীমোহন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। ললিতাদেবী বলিলেন, "ভাল, তোমার এরূপ কায যত আছে, তাহা আমাকে দাও, কেমন না প্যারী পারে দেখ"! পরীক্ষায় স্থির হইল যে, যে সকল খাতা পত্র গোপীমোহন ললিতাদেবীর নিকট হিসাব নিকাস করিতে দিয়াছিলেন, সত্যই যদি প্যারীমোহন তাহা রেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে মহুরীয়ানায় প্যারীমোহন অদ্বিতীয়! কেননা, একটি জমা খরচ, গোপীমোহন কএকদিন চেষ্টা করিয়া নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। কায কর্ম্ম ত' দেবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু প্যারীমোহন ত' তাঁকে যম দেখে! তাহার উপায় ? সে উপায় ললিতাদেবী করিলেন। "যা তোমার আবশ্যক, পত্রে প্যারীমোহনকে হুকুম দিও"। গোপীমোহন হুকুম লিখিলেন, "প্যারী, তোমার দেওয়ানজীর নিকট গিয়া, জমীদারীর কায কর্ম্ম শিখিতে হইবে। কাল হইতেই কাযে যাইও"। দিন কতক বাদেই ললিতাদেবী আবার গোপীমোহনকে বলিলেন, "দেখ, প্যারী বলে যে, সে জমীদারীর কায কর্ম্ম করিতে পারে। সে কি বলে, আমি বুঝিতে পারি না"। এবার ললিতাদেবীও স্বয়ং বিস্মিত! কেননা, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার স্বামী যে কার্য্য করেন, তাহা বালক সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিয়া, কিরূপে অল্প দিনের মধ্যে শিখিল! কিন্তু গোপীমোহন অবিশ্বাস

করিতে পারেন না। তিনি দেখেন যে, দেওয়ানজী স্বয়ং প্যারীমোহনের নিকট অবনতশির, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ভয় করে! দেওয়ানজী দু' একটা প্যারীমোহনের নামে নালিস করিয়াছিল যে, ছোটবাবু ছেলে মানুষ, এসব বোঝেন না, এম্‌নি সব আল্‌গা কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার উত্তর কি দিব? সেই সব নালিস শুনিয়া গোপীমোহন বুঝিতেন যে, প্যারীমোহন ছাঁকা-জালে দেওয়ানজীকে ধরিয়াছে, সেরূপ তিনি স্বয়ং পারেন না। দিন কতক এইরূপে চলে। একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "প্যারীমোহন তালুক দেখিতে যাইতে চায়। তাহার মনের সন্দেহ—সকলই বেবন্দোবস্ত হইয়া আছে।" গোপীমোহনের আনন্দ হইল; প্যারী কার্য্যক্ষম বুঝিয়াছেন, কেননা, কলিকাতার জায়গা জমী বাড়ী ঘর দোরের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু ছেলে মানুষ একা যাবে! কাহার সহিত না বুঝিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ করিবে! দুই একখানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেষ প্যারীমোহনকে যে তালুকে কোনও ভয়ের কারণ নেই, সে তালুকে পাঠাইলেন। প্রতি পত্রে বুঝিতে পারিলেন যে, প্যারী আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে; অশাসিত মহল শাসিত হইয়াছে। প্যারীমোহনকে ফিরিয়া আসিতে পত্র লিখিলেন, সে পত্রের উত্তর তাঁহার নিকট আসিল না; উত্তর ললিতাদেবীর নিকট আসিল। মর্ম্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দিন কতক তাহাকে জমীদারীতে রাখিতে হুকুম হয়। নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটি চর উঠিয়াছে। সেই চর লইয়া অপর এক জমীদারের সহিত বিবাদ বাধিতেছে, প্যারীমোহনের বাসনা—সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। এ সকল কথা গোপীমোহনকে বলিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ, বিবাদের কথা শুনিলে গোপীমোহন স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, তাহাতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইবে। অবশ্য ললিতাদেবী কথা গোপন করেন নাই, চিঠিখানি স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পরদিন গোপীমোহন, প্যারীমোহন যে তালুকে আছেন, তথায় রওনা হইলেন। আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত যত হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের নিমিত্ত আকুল হইলেন, না জানি বালক কি ফ্যাসাদ বাঁধাইয়াছে। পত্র পঁহুছিতে যতদিন প্রায় ততদিনে তিনি স্বয়ং পৌছিবেন, এই ভাবিয়া তিনি রওনা হইলেন। পঁহুছিয়া দেখেন, স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষ পক্ষে শতশত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা চর দখল করিতে জমায়েৎ হইয়াছে। প্যারীমোহন ঘোড়সওয়ার হইয়া হুকুম দিতেছে, "মার"! এবং স্বয়ং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগে ছুটিল, লাঠিয়ালেরা পশ্চাৎ ছুটিল! ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ প্যারীমোহনের আক্রমণে হটিয়া গিয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপীমোহন বলিলেন, "কি করিতেছিস্"? অমনি প্যারীমোহন অশ্ব হইতে নামিয়া পূর্ব্ববৎ জড় হইয়া গেল; ওদিকে বিপক্ষদলে আরও লোক জমায়েৎ হইল। তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। লাঠিয়ালরা গোপীমোহনের মুখ চাহিয়া বলিয়া 'হুজুর হুকুম দেন, ছাতু করিয়া দি"! হুজুর হুকুম দিলেন না। বিপক্ষ দল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্বপক্ষের লাঠিয়ালরা হুকুম না পাইয়া পৃষ্ঠ দিল। বিপক্ষ দল হইতে একটী সড়কি আসিয়া গোপীমোহনের মাথায় বিঁধিয়া গেল। প্যারীমোহন চকিতের ন্যায়, দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলাইল। সড়কি বাহির হইল, কিন্তু রক্তমোক্ষণে

গোপীমোহন অতিশয় কাহিল ! প্যারীমোহন অতি সন্তর্পণে বাড়ী আনিলেন। আঘাত হেতু হইয়া গোপীমোহন পক্ষাঘাতপীড়ায় শয্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয় মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক, একজন 'এল এ' দুইবার ফেল ও আর একজন এণ্ট্রান্স দুইবার ফেল হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছে। এখন গান বাদ্য শিক্ষা হয়। প্যারীমোহন ললিতাদেবীকে বলিল, মেজ দাদা সেজ দাদা ঢের টাকা খরচ করিতেছে, আমি আর টাকা রাখিতে পারিব না। ললিতাদেবী বলিলেন, "কেন, চাইলেই তুই দিবি কেন ? যদি তোরে কিছু বলে, তুই ওঁর নাম কর্‌বি, যে উনি মানা করেছেন"। প্যারীমোহন বলিল, "দাদাকেও মান্‌বে না"।

প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপীমোহন শয্যাগত হইবার পর নানান্ ধরণের লোক মেজো বাবু ও সেজো বাবুর নিকট যাওয়া আসা করে। সময় নাই অসময় নাই, বাবুদিগের জুড়ী হুকুম হয়। এ সকল কথা গোপীমোহনের কানে গিয়াছে। ভাইদের তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বাবুদ্বয় ইয়ার বক্‌সি লইয়া সর্ব্বদাই বলেন যে, তাঁহার বড় দাদা বাল্যকালাবধি শাসন করিয়া ছোটটাকে পাগল করিয়াছেন এবং তাহাদেরও খেতে পর্‌তে না দিয়া পিঁজরায় পুরিয়া রাখিয়া এক রকম উল্লুক বানাইয়াছেন। ইয়ার বক্‌সির উত্তর, "এরূপ বেরসিক ভাইও কারও দেখি নেই"! মোসাহেব কতক কতক কর্ম্মচারীরাও পরামর্শ দেয় যে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই চিরকাল আছে ; হুজুর সাবালক হ'য়েছেন, আপ্‌নার সম্পত্তি আপ্‌নি বুঝে লওয়া ভাল। এইরূপ উপদেষ্টা ও শ্রোতা সংযোগে যেরূপ হয়, তাহাই হইতে লাগিল। যেরূপ কুৎসিৎ ধুম্ ধাম্ হয় হইতে লাগিল ! গোপী-মোহন সমস্তই শুনিলেন,—চক্ষে জল পড়ে ! ললিতাদেবী যতদূর চাপিয়া রাখিতে পারেন, রাখেন। একদিন শুনিলেন যে, পূজার দালানে একজন বেশ্যা মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে ও মুরগীর হাড় গোঁড় ছড়ান ছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া গোপীমোহন ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইলেন। উভয়ে চক্ষু লাল করিয়া উপস্থিত হইল ; খুব ব্যাজার ভাব ! গোপীমোহন গাঙ্গাইয়া গাঙ্গাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহারাও উত্তর দিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া গোপীমোহন যেমন তর্জ্জন করিয়া উঠিতে যান, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু পিতৃ-লোকে উপস্থিত হইল। পিতৃ-স্থান অপবিত্র হইয়াছে শুনিয়া বংশধর প্রাণত্যাগ করিলেন !

ললিতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া পার্টিসন স্যুটের নালিস করিয়া-ছিলেন। তাঁহার উকীলকে বিশেষ উপদেশ—যেন পার্টিসনে পূজাবাড়ী তাঁহার জিম্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে পড়ে। একদিন প্যারীমোহন তাঁহাকে বলিলেন, "বউ দিদি, আমি আমার অংশ লইব না। আমি দাদাদের দিলাম। ললিতাদেবী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "মূর্খ, ওরা কি তোকে খেতে পর্‌তে দেবে ? দূর করে তাড়িয়ে দেবে"! প্যারীমোহন চুপ করিল। ললিতাদেবী বুঝিলেন আর বুঝাইতে পারিবেন না। তাহার পর মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "তোর অংশ থাকিলে, তোর পিতৃপুরুষের নাম থাকিবে! আমার জীবনস্বত্ব বই তো নয়! তোর থাকিলে ঠাকুর সেবা চলিবে। ওরা ত' শালগ্রাম নুড়ি বলিয়া ফেলিয়া দেবে" !

প্যারী।—বউ দিদি, তার যো নেই। বাবার উইলে পূজার খরচ দিতেই হ'বে! বড় দাদার উপর ঠাকুর সেবার ভার ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে তুমি যাহাকে বলিয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে!

ললিতাদেবী জানিতেন, বুঝিলেন সত্য কথা। শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর চলিবে কিসে"?

প্যারী।—তাহার ভাব্‌না নেই।

ল।—কিসে?

প্যা। তোমার মনে আছে? আমি একদিন শালগ্রামকে দেখিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ও হুড়িটে কি"? তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?"

ল।—না।

অনেক দিনের কথা সত্যই তাঁহার স্মরণ ছিল না।

প্যা।—তুমি বলিয়াছিলে, "ঠাকুর। ইনি সকলের কর্ত্তা। ইনি সব করিতে পারেন ও সব করিতেছেন। এঁর হুকুম ভিন্ন গাছের পাতাটীও নড়ে না"। অন্য কেহ বলিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। তুমি বলিলে, আমি অমনি দেখিতে পাইলাম, সত্যই ঠাকুর!

ল।—ঠাকুর ত' তোকে আর হাতে করে এনে খেতে দেবে না!

প্যা।—দেবে!

ললিতাদেবী কণ্টকিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে জানিলি"?

প্যা। আমায় পড়া শেখালে কে? আমায় কায কর্ম্ম শেখালে কে?

ল।—তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে?

প্যা।—হঁ্যা। আমি একদিন ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিয়াছিলাম, "ঠাকুর আমি বড় বোকা; আমাকে মানুষ করে দেবে? এই দেখ, ঠাকুর আমাকে মানুষ করিয়াছেন! আমার যা' যখন হয়, আমি ঠাকুরকে মনে মনে বলি, আর ঠাকুর সব বলে দেয়! ঠাকুর আমায় বলেছেন, আমায় খেতে দেবেন।"

ল।—তুই কি ঠাকুরকে বলেছিলি, "ঠাকুর, আমাকে খেতে দিও"!

প্যা।—তা' কেন বল্‌বো। তোমায় কি কখন বলি যে, তুমি আমায় খেতে দিও, তুমি ত' আপ্‌নি দাও। ঠাকুর আমাদের কুল-দেবতা; ঠাকুরই ত খেতে দিচ্চে।

ললিতাদেবীর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তত্রাচ বলিলেন, "তোর টাকা, তুই যাকে খুসী দিবি, সৎ কার্য্য করিবি"।

প্যা। কে করে বল? খপরের কাগজে পড়ে'ছিলেম, টাকার নিমিত্ত বাপ্‌কে গুলি করিয়াছে! চক্ষের উপরে দেখিলাম, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা বধ হইল! আমি বুঝিয়াছি, টাকাতে এই সব কাযই হয়, আর কিছু হয় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠাকুর হাসে!

ল।—কেন তুই বে কর্‌বি নে, ঘর সংসার কর্‌বি নে? পিতৃপুরুষের নাম লোপ করবি?

প্যা।—বউ দিদি, ঠাকুর যদি মনে করেন, দাদাদেরই ভাল কর্‌বেন। আর যদি মনে করেন, আমি একশ'টা বিয়ে কর্‌লে মেরে ফেলবেন! ঠাকুর বলেছেন, ও সব ঠাকুরের কায। আমি ও সব কর্‌বো না।

[ক্রমশঃ]

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥

দিব্য বাণী

ত্রিনেত্রাং হাস্যসংযুক্তাং সর্বালঙ্কারভূষিতাম্।
বিজয়াং ত্বামহং বন্দে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্॥
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানাং সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতাম্।
ভবানীং ত্বামহং বন্দে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্॥
নিশুম্ভশুম্ভমথনীং মহিষাসুরঘাতিনীম্।
দিব্যরূপামহং বন্দে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্॥

—মৎস্যসূক্ত: দুর্গাস্তোত্রম্, ৩-৫

সর্বাভরণে ভূষিতা মা তুমি
বিজয়িনী সুহাসিনী
ত্রিনয়নী তোমা বন্দি দুর্গা
দুর্গতি-বিনাশিনী।
ব্রহ্মাদি সব সুর-বন্দিতা
গন্ধর্ব- আর সিদ্ধ-পূজিতা
(বরাভয়-প্রদায়িনী)
ভবানী তোমায় বন্দি দুর্গা
দুর্গতি-বিনাশিনী!
নিশুম্ভ- আর শুম্ভ-মথনী
মহিষাসুর-ঘাতিনী
দিব্যরূপিণী বন্দি দুর্গা
দুর্গতি-বিনাশিনী।

কথাপ্রসঙ্গে

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

'দুর্গা' শব্দটির একটি অর্থ দুরধিগম্যা। 'দুঃখেন গম্যতে প্রাপ্যতে ইতি দুর্গা'—অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক ত্যাগতপস্যা সাধনভজন করিয়া এই মহাদেবীকে লাভ করা যায়, এইজন্য ইনি দুর্গা। দুর্গাসপ্তশতীর টীকাকারগণ এই অর্থে 'দুর্গা' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। আবার গমনার্থক ধাতু জ্ঞানার্থকও হয়। এইজন্য তাঁহারা 'দুর্গা' শব্দটির আরেকটি অর্থ করিয়াছেন—দুর্জ্ঞেয়া। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত মলিন সংস্কার-সমূহ স্তূপীকৃত আবর্জনার ন্যায় আমাদের চিত্ত-দর্পণের উপর পড়িয়া থাকায় দুর্গাতত্ত্ব উহাতে প্রতিভাত হয় না, বহু পরিশ্রম করিয়া উহা অপসারিত করিতে পারিলেই দেবীতত্ত্ব পরিমার্জিত চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয়—এই কারণেই দেবী দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া।

'দুর্গা' শব্দের আরেকটি আভিধানিক অর্থ হইল—শিবভার্যা। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অর্থটি বা দেবীর এই পরিচয়টি পৌরাণিক যুগেরই অবদান। পৌরাণিক যুগে রুদ্রাণী ভবানী শিবানী মৃড়ানী ঈশানী শর্বাণী ভৈরবী ইত্যাদি পতিনির্ভর নামের যে মিছিল আমরা দেখি, বৈদিক যুগে তাহা দেখিতে পাই না। দুর্গা অম্বিকা উমা অদিতি ইত্যাদি বৈদিক নামগুলি পতিনির্ভর নহে। দেবী এখানে স্বনাম-ধন্যা। ইহার কারণ এই যে, বৈদিক যুগে স্তবনীয় দেব-দেবীর মধ্যে পতি-পত্নী সম্পর্কের ধারণা আর্যমনে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। পৌরাণিক যুগেই ঐ বিকাশ ঘটিয়াছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি মন্ত্রে দেবী দুর্গার প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি শিবজায়া হইলেন বহু শতাব্দী পরে—নানা বিবর্তনের মাধ্যমে। এমন কি প্রাচীন উপনিষদগুলির অন্যতম কেনোপনিষদে 'উমা হৈমবতী'-র নাম থাকিলেও, তাঁহাকে শিবজায়া বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। যদিও 'শিব' নামটি শুক্লযজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়েই আমরা পাই, মনে রাখিতে হইবে আরও প্রাচীন ঋগ্বেদের রুদ্রই বিবর্তিত হইয়া প্রথমতঃ 'রুদ্রশিব'—রুদ্রাধ্যায়ের শিবও রুদ্রশিবই— ও অনেক পরে পৌরাণিক শিবে পরিণত হইয়াছেন। অনুরূপভাবেই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দুর্গা—যাঁহার আদিরূপ ঋগ্বেদের অদিতি, এইরূপ মনে করা হয়—পৌরাণিক যুগেই শিব-পরিণীতা হইলেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগেও এই বিবর্তন একদিনেই ঘটে নাই—ক্রমশঃ হইয়াছে, কারণ দুর্গাসপ্তশতীতেও 'দুর্গা' শব্দের আটবার উল্লেখ থাকিলেও, তিনি যে শিবেরই পত্নী, তাহা বলা হয় নাই। তাঁহাকে অবশ্য 'শশিমৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা গৌরী' বলিয়া স্তব করা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণের হৃদয়-বিলাসিনী লক্ষ্মী বলিয়াও স্তব করা হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি যে সকল দেবগণেরই শক্তির সংহত মূর্তি এবং ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শক্তি যে তাঁহাকে শুম্ভনিশুম্ভবধে সহায়তা করিতেছেন, তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে স্পষ্ট উল্লেখিত হইয়াছে যে, মহেশজায়া ভবানীরই অন্য নাম দুর্গা। সুতরাং দেবী দুর্গা সম্বন্ধীয় ধারণার সুস্পষ্ট বিবর্তন পৌরাণিক যুগেও আমরা লক্ষ্য করি। আর মার্কণ্ডেয়পুরাণ যে স্কন্দপুরাণ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, তাহা

পুরাণ-বিশেষজ্ঞগণেরই সুচিন্তিত অভিমত।

অতএব 'দুর্গা' শব্দটির অর্থ আমরা পাইলাম —'দুরধিগম্যা' 'দুর্জ্ঞেয়া' ও 'শিবজায়া'। বিদগ্ধ গবেষকগণ ও কোষকারগণ 'দুর্গা' শব্দের আর কি কি অর্থ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

'দুর্গ' শব্দের সুপরিচিত অর্থ গড় বা কেল্লা। শত্রুসৈন্যের পক্ষে দুর্গম বলিয়া ব্যুৎপত্তি অনুসারেই কেল্লার নাম দুর্গ। দুর্গসমূহের মধ্যে আবার গিরিদুর্গই শ্রেষ্ঠ—'সর্বেষাং চৈব দুর্গাণাং গিরিদুর্গং প্রশস্যতে।' নৃপতিগণ দুর্গে দুর্গরক্ষাকারিণী দেবীর পূজা করিতেন। দুর্গের রক্ষাকারিণী বলিয়া কালক্রমে দেবীর নাম হয় দুর্গা। কালিকাপুরাণে দুর্গভূমিতে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে।[১] দেবী-পুরাণে ও খিল হরিবংশে দেবীর বিশেষণ হিসাবে 'দুর্গপরাক্রমা' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দেবীর এই পরাক্রম দুর্গরক্ষাবিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে

'দুর্গ' হইতে পরম্পরায় আমরা 'দুর্গা' নামটি পাইলাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 'দুর্গা' শব্দের একটি অর্থ হইতেছে শিবজায়া। এক্ষণে কিভাবে শিবজায়া, এই নামের উৎপত্তি হইল তাহা দেখা যাইতে পারে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে। বর্ণনাটি অনেকাংশে দুর্গাসপ্তশতীর মহিষাসুর-বধ ও শক্রাদিস্তুতির অনুরূপ। পুরাকালে রুরু নামে এক দানব ছিল। তাহার পুত্রের নাম দুর্গ। তপস্যার প্রভাবে দৈত্যেশ্বর দুর্গ ইন্দ্রাদি দেবগণকে অধিকারচ্যুত করিলে দেবগণ মহেশ্বরের শরণাপন্ন হন। মহেশ্বরের অনুজ্ঞা লইয়া মহাদেবী ভবানী দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিতা সহস্রভুজা মহাদেবীর সহিত বিন্ধ্যাচলে সসৈন্য দুর্ধর্ষ দুর্গের দারুণ যুদ্ধ হয়। দেবীর শরীরসম্ভূত নয় কোটি শক্তি মহাসুর দুর্গের সৈন্যসমূহ বিনাশ করে। দুর্গ প্রথমে হস্তীর, পরে মহিষের রূপ ধারণ করিলে দেবী ত্রিশূলের দ্বারা তাহাকে আঘাত করায় সে মহিষশরীর পরিত্যাগ করিয়া সহস্রবাহুধারী পুরুষের আকৃতি ধারণ করিয়া সহস্র আয়ুধ-সহায়ে পুনরায় যুদ্ধনিরত হইলে দেবী দিব্য মহাস্ত্রের দ্বারা তাহাকে বধ করেন। দুর্গাসুর-বধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে ভক্তিসহকারে দেবীর স্তুতি করেন। স্তবে পরিতুষ্টা দেবী বলেন: "দারুণ সংগ্রামে দুর্গ নামক এই মহাদৈত্যকে নিহত করাতে আজ হইতে জগতে আমার নাম 'দুর্গা' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। যাহারা দুর্গারূপা আমার শরণাগত হইবে, তাহাদের কোথাও কোনও কালে দুর্গতি হইবে না এবং এই পবিত্র দুর্গাস্তুতি 'বজ্রপঞ্জর' নামে অভিহিত হইবে।"[২] সুতরাং 'দুর্গা' শব্দটির আরও দুইটি অর্থ আমরা পাইলাম—দুর্গরক্ষিণী ও দুর্গদৈত্যবিনাশিনী। একটি শ্লোকেও আছে: 'বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ। তং ননাশ পুরা

[১] 'দুর্গভূমৌ যজেদ্ দুর্গাং দিকপালাংশ্চৈব দ্বারতঃ।
পূজয়িত্বা বিধানেন জয়ং ভূপঃ সমাপ্নুয়াৎ॥' —রাজনীতিবিশেষ অধ্যায়, ৮৫

[২] 'অদ্যপ্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি। দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥
যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ কচিৎ। দুর্গাস্তুতিরিয়ং পুণ্যা বজ্রপঞ্জরসংজ্ঞিতা॥'
—কাশীখণ্ড, ৭২।৭১-৭২

তেন বুধৈ দুর্গা প্রকীর্তিতা ॥'—'দুর্গ' শব্দ বিপত্তি-বাচক, আকার নাশবাচক। পুরাকালে দেবী দুর্গকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বুধগণ কর্তৃক 'দুর্গা' নামে সমাখ্যাত।

আরও বলা হইয়াছে: 'দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি। শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥ মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ। এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥'—'দুর্গ' শব্দের অর্থ: দৈত্য মহাবিঘ্ন ভববন্ধ কুকর্ম শোক দুঃখ নরক যমদণ্ড জন্ম মহাভয় ও অতিরোগ। আকার হন্তৃবাচক। সুতরাং দুর্গা তিনিই, যিনি দৈত্য মহাবিঘ্ন ভববন্ধ ইত্যাদি বিনাশ করেন।

দেবী-উপনিষদেও বলা হইয়াছে: 'দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাদ্ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে।'—দুর্গতি হইতে সম্যক্ রক্ষা করেন বলিয়া দেবী 'দুর্গা' নামে অভিহিতা।

আরও কয়েকটি শ্লোকে পাওয়া যায়:

'দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ। উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥ রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ। ভয়শত্রুঘ্ন-বচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ॥ স্মৃত্যুক্তিশ্রবণাদ্ যস্যা এতে নশ্যন্তি নিশ্চিতম্। ততো দুর্গা হরেঃ শক্তি র্হরিণা পরিকীর্তিতা॥' দকার দৈত্যনাশার্থক, উকারের বেদসম্মত অর্থ হইতেছে বিঘ্ননাশ, রকার রোগনাশার্থক, গকার পাপনাশার্থক এবং আকার ভয়- ও শত্রু-নাশার্থক। সুতরাং যে নাম স্মরণ উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলে দৈত্য বিঘ্ন রোগ পাপ ভয় ও শত্রু বিনষ্ট হয় শ্রীহরির সেই শক্তির নামই দুর্গা—ইহা শ্রীহরি নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি যে, প্রথমে উল্লেখিত শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে, দেবী পুরাকালে দুর্গকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'দুর্গা'; পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে, দৈত্য প্রভৃতি যিনি বিনাশ করেন, তাঁহার নাম 'দুর্গা'। সুতরাং দৈত্য যে বর্তমানেও আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে:

'দুর্গেতি দৈত্যবচনোঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ। দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা প্রকীর্তিতা॥'
—'দুর্গ' শব্দের অর্থ দৈত্য, আকার নাশার্থক। দুর্গকে যিনি নিত্যই বিনাশ করেন, তিনি 'দুর্গা' নামে বিঘোষিত।

৩

'দুর্গা' নামের উপরি-উক্ত অর্থসমূহের বিশ্লেষণ করিলে দুর্গার যে রূপটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মানসপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা দুরধিগম্যা অথবা দুর্জ্ঞেয়া কোন দেবীর রূপ নহে, এমন কি শিবজায়ারও রূপ নহে, তাহা দুর্গতিনাশিনীরই রূপ। লক্ষণীয় যে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশ খণ্ডে 'দুর্গতিনাশিনী' শব্দটি 'দুর্গা' নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ পুরাণকারের মতে 'দুর্গতিনাশিনী' ও 'দুর্গা' পর্যায়বাচী শব্দ।

ভগবতী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী বলিয়াই বিশেষ জনপ্রিয় দেবী—ব্যাপকভাবে তাঁহার পূজা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। মানুষের দুঃখের অন্ত নাই। জীবনে সুখাপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক। এদেশে দুঃখের বিশ্লেষণ যেভাবে হইয়াছে, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও সেভাবে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আধ্যাত্মিক আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন শ্রেণীর দুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমরা আমাদের শাস্ত্রে পাই। যাঁহারা বিচারপ্রবণ তাঁহারা

দুঃখের অভিঘাতে ক্লিষ্ট হইয়া উহার কারণ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হন এবং তত্ত্ববিচারই যে দুঃখ-মুক্তির উপায়, তাহা উপলব্ধি করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই রোগে শোকে দুর্বিপাকে ঐশী শক্তির শরণাপন্ন হন। বৈদিক যুগে আর্যগণ যেমন বন্যায় বাত্যায় শত্রুসংকটে রক্ষাকারিণী দেবী অদিতির শরণ গ্রহণ করিতেন, আজও বিপৎকালে হিন্দুগণ দুর্গারূপিণী সেই অদিতিরই শরণাগত হন।

'স্তুত্বা তথাহি দুর্গাং
কেচিৎ তীর্ণা দুরুত্তরাং বিপদম্।
অপরে রোগবিমুক্তিং
বরমন্যে লেভিরেঽভিমতম্॥'

—দুর্গার স্তবস্তুতি-আরাধনা করিয়া অনেকে দুস্তর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, রোগ-মুক্ত হইয়াছেন, অভীপ্সিত বর লাভ করিয়াছেন। এই বিশ্বাস ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ নিদ্রোত্থিত হইয়াই দুর্গানাম স্মরণ করা, যাত্রারম্ভে পথের বিঘ্নবিপদ দূর করিতে দুর্গানাম উচ্চারণ করা, পত্রশীর্ষ 'শ্রীদুর্গা সহায়' বা 'শ্রীদুর্গা শরণম্' বাণী দ্বারা মঙ্গলান্বিত করা, শান্তিস্বস্ত্যয়নাদিতে দুর্গাসপ্তশতীর শ্লোকের পুরশ্চরণ করা ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ আমাদের জীবনে ভগবতী দুর্গার ব্যাপক প্রভাবের পরিচায়ক। আর কত ধর্মপ্রাণ হিন্দু যে দুর্গামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকেই পরমারাধ্যা ইষ্টদেবীরূপে গ্রহণ করিয়া নিত্য নিয়মিত উপাসনা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে!

৪

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সমাজের সর্বত্র যে ব্যাপক দুর্গতি পরিলক্ষিত হয় তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দুর্গতিনাশিনী দেবী আমাদের আরাধনায় সন্তুষ্টা নহেন। দুর্গা-প্রতিমার সংখ্যা আমরা প্রতি বৎসরই বাড়াইতে পারি, প্রতিমার গঠনে ও সাজসজ্জায় অভিনব শিল্প-চাতুর্যের স্বাক্ষর রাখিতে পারি, গীতবাদ্যের তূর্য-ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতে পারি, কিন্তু ভাব-ভক্তিহীন এই সকল অনুষ্ঠানে দেবী যে পরিতৃপ্তা নহেন, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি। অভাব-অনটন অশিক্ষা-কুশিক্ষা রোগ-শোক অত্যাচার-অবিচার অনাচার-ব্যভিচার—সমাজের সর্বত্র আজ ইহাদের অবাধ সঞ্চরণ। এই মর্মন্তুদ পরিপার্শ্ব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মনে-প্রাণে দুর্গতিনাশিনী দেবীর শরণাপন্ন হইতে হইবে।

সসৈন্য দুর্গাসুর আমাদের মনে, আর শক্রাদি দেবগণের অবস্থিতিও সেখানেই। অহিংসা ও হিংসার, সত্য ও মিথ্যার, সরলতা ও কুটিলতার, ত্যাগ ও ভোগের, ক্ষমা ও ক্রোধের, বিনয় ও দম্ভের, সংযম ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার তুমুল সংঘর্ষে দৈবী শক্তি আজ পর্যুদস্ত। এই বিষম দুঃখদ পরিস্থিতিতে দুর্গাপূজার প্রাক্‌লগ্নে প্রার্থনা করি আমরা যেন শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে দেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার অপার করুণায় দুঃখদুর্গতি হইতে রক্ষা পাই; আমরা যেন দুর্গতিনাশিনী মহাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া সর্বান্তঃকরণে বলিতে পারি:

'প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥'

—হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবি, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। হে ত্রিভুবন-বাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি আপনি বরদা হউন।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত]

(১) **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্** Chilkapita, Almora, U. P.

প্রিয় যতীন, 10. 10. 15.

তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। তারপর তোমাদের প্রীতি-প্রেরিত পাঁচটী টাকাও পাইয়াছি। নগেনের মাতুলের গঙ্গালাভ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, অবশ্য ইহা তো অবশ্যম্ভাবী তার সন্দেহ নাই।

পত্র তোমার office-এর ঠিকানায় দিলাম। তুমি ৺পূজার বন্ধে বাড়ী যাইবে বলিয়াছ এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া ৺কাশীতে আসিবে লিখিয়াছ, বোধ হয় দুই জায়গায়ই যাইবে। নিশ্চয় ৺বারাণসী দর্শন তোমার মাতাঠাকুরাণীকে একবার করাইবে। রাঁচী হইতে ৺কাশী অধিক দূর নয়।

ওখানকার ভক্তগণকে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ দিবে। আমাদের এখনকার ধ্যান ভজন প্রভুর কৃপায় কেবল জগতের জীবের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আর কিছুই বা কোন রকম নাই। প্রভুর নাম বা ধ্যান করিতে বসিলেই কেবল—প্রভু, জগতের কল্যাণ করুন, আপনি কেবল করুণার অবতার—এই ভাবনাই আসে। ঈশ্বর তো নিত্যই আছেন, বেদাদি শাস্ত্রও নিত্য আছে, তীর্থাদিও চিরকাল আছে, তথাপি ধর্ম্মের গ্লানি হয়; লোক-সকলের, জাতিসকলের বুদ্ধি মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সময়ে প্রভু তোমার অহৈতুকী করুণার অবতার হয়, না হইলে জগতের উদ্ধারের কোন উপায় নাই, ইহাই জগতের ইতিহাস-সিদ্ধান্ত এবং এই বর্ত্তমান যুগে করুণার অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর নিজ শক্তি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর পার্ষদগণ জগতের কল্যাণের জন্যই আসিয়াছেন। বাবা, এই আমার এখনকার ধ্যান জ্ঞান। আর অধিক কি লিখিব? তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা বারম্বার জানিও এবং মধ্যে ২ কুশলবার্ত্তা লিখিয়া সুখী করিও। ইতি

তোমাদের যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(২) **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্** মঠ, বেলুড়, হাওড়া

প্রিয় যতীন, 15. 6. 16.

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার পত্র আসিবার পূর্ব্বেই ৺উত্তর-কাশী হইতে দেবেনের দেহত্যাগের সংবাদ এখানে আসিয়াছিল। মহারাজ ইত্যাদি আমরা সকলেই প্রথমটা খুব দুঃখিত হইয়াছিলাম, কারণ ভক্ত যতদিন জগতে থাকেন প্রভুর স্মরণ মনন ভজন সাধনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন, সেটা হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আনন্দ উপভোগের বাসনা মিটিল না (কাহারও মেটে না)। সেইজন্য প্রথমে শুনিয়াই একটু দুঃখ আসিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তুমি যেরূপ লিখিয়াছ যে "দেবেন প্রভুর অমৃতধামে চিরশান্তি

লাভ করিয়াছে", তাহাই মনে হইল আর দুঃখ রহিল না। তবে তাকে আমরা বড়ই ভালবাসিতাম বলিয়া যখনই তার সেই সদামুগ্ধ ভাবযুক্ত মুখখানি মনে পড়ে, তখনই একবার হৃদয়ের ভিতরে কেমন একটা ভার ২ ভাব হয়; ইহা দেহধারী ভক্তদের সকলেরই হয়। যাহোক সে অতি ভাল ছেলে ছিল। শ্রীশ্রীমার কৃপা তার উপর ভূরি ২ ছিল এবং মহারাজ প্রভৃতি আমরা সকলেই তাকে বিশেষ ভালবাসিতাম, এখনও বাসি। সে অতি সদ্‌গুণসম্পন্ন বালক ছিল। এরূপ আধার জগতে কম দেখিতে পাওয়া যায়। যাহোক সে উত্তরাখণ্ডে ৺কাশীধামে সাধুসঙ্গে প্রভুর ধ্যান জপ ও নাম করিতে ২ দেহত্যাগ করিল, অধিক ভুগিয়া কষ্ট পাইল না এবং অন্য কাহাকেও ভোগাইল না, কষ্টও দিল না, আনন্দে প্রভুর অমৃতময় শান্তিক্রোড়ে চলিয়া গেল। ধন্য সে, ধন্য তার জনকজননী, এবং ধন্য তার পূর্ব্বপুরুষগণ—জয় প্রভু!

আমাদের ১৮ই জুন রবিবার বাংলোরে যাবার কথা হইয়াছে। এখন প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয়, পরে জানিতে পারিবে। এখানকার সব একপ্রকার কুশল। তোমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার কুশল প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি। যদি বাংলোর যাওয়া না হয়, তবে আমি আলমোড়ায় যাইব।

নিশ্চয়ই তুমি প্রভুর চরণে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া, চিত্ত স্থির করিতে পারিবেই পারিবে এবং আনন্দ লাভ করিবে।

মহারাজকে তোমার কাঁঠালের কথা বলিয়াছি। এখানে ৬।৭ [দিন] অনবরত বৃষ্টি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বেয়াড়া (?) হাওয়া চলিতেছে। জল অবশ্য খুব অধিক হইতেছে না। বেশ ঠাণ্ডা রেখেছে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩)　　**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্**　　শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৫।৪।২৯

প্রিয় যতীন,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আশীর্ব্বাদ করি নববর্ষ তোমাদের সকলকে এবং সমগ্র ভারতকে এবং সমগ্র জগৎকে শান্তি প্রদান করুক। প্রভুপদে তোমাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি দিন ২ অচল অটল হইতে থাকুক। শান্তি, প্রকৃত শান্তি ধর্ম্মের দ্বারাই সম্ভব। প্রকৃত পার্থিব কল্যাণও ধর্ম্ম ভিন্ন স্থায়ী হয় না। প্রভুর জীবনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ নব ভাব এই যুগের যাহা উপযুক্ত এবং যাহা তিনি জীবনে আচরণ করিয়াছিলেন এবং সমগ্র জগৎ যাহা এখন পাঠ করিয়া জানিতেছে, তাহা যে ক্রমে সমাজে আচরিত হইবে, (কি উপায়ে হইবে তাহা কেহই জানে না) তাহার আর সন্দেহ নাই। অনেকেই উহা অসম্ভব বিবেচনা করে, কিন্তু ঈশ্বরাবতারের কার্যে অসম্ভব সম্ভব হয়; তা না হলে আর ঈশ্বরের কার্য্য কি? প্রভুর ইচ্ছায় জীবিত থাকিলে আরো অসম্ভব সম্ভব হইতে দেখিবে এবং আশ্চর্য্য হইবে এবং বলিবে, 'জয় প্রভুর জয়, জয় যুগাবতারের জয়!' আর আনন্দে নৃত্য করিবে।

মহারাজ কলকাতায় আছেন এবং ভাল আছেন। শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়া আশ্রমে আছেন, মধ্যে খুব জ্বর হইয়াছিল, কলকাতা থেকে ডাঃ সতীশ চক্রবর্তী (শরৎ মহারাজের

সহোদর) সেবার জন্য গিয়াছিলেন। এখন তিনি সুস্থ হইয়াছেন শুনিয়াছি। তোমরা সকলে পুনরায় আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানিবে। এখানকার প্রভুর ইচ্ছায় একপ্রকার সব কুশল। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৪) **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্** Sri Ramakrishna Math, P.O. Belur Math

শ্রীমান যতীন্দ্র, 14. 10. 28

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বাবা, তুমি এই সুদীর্ঘকাল নানা প্রকার রোগে কাতর, নানাবিধ বিধিব্যবস্থাতেও সুস্থ হইতে পারিতেছ না, ইহাতে তোমার যে মানসিক অবস্থা ঐরূপ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। তুমি ভগবদ্‌ভক্ত বলিয়াই এখনও নিশ্চিন্ত ভাবে আছ। তবে তুমি ভীত হইও না, ভয় খাইবার কি আছে! তুমি জগদ্‌গুরু যুগাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত, তোমার আবার ভয় কি? তাঁর কৃপায় তুমি রোগমুক্ত হইবে—আমি আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি। আর তোমায় লিখিতেছি—ঠাকুরের কৃপায় তোমার ভক্তি বিশ্বাস জ্ঞান, ঠাকুরের উপর নির্ভরতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে—তা তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন। তাঁর এই কৃপা হইতে তুমি কদাপি বঞ্চিত হইবে না।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করিবেনই। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(৫) **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্** Belur Math P.O., Dt. Howrah (Bengal)

শ্রীমান যতীন্দ্র, 25/12/28

তোমার পত্র পাইয়া কুশল সংবাদ অবগত হইলাম। বাবা, ঠাকুর তোমাদের দেখছেন বৈকি! এ বিষয়ে কোন ভুল নাই, তবে যে সব ভোগ আছে তা কিছু ভোগ হয়ই। তাঁর কৃপায় ৬ মাসের ভোগ একদিনে সেরে যায়। এ ঠাকুরের নিজের কথা—তুমি তাঁকে জানাচ্ছ, তিনি শুনছেন না, তা কি হয়? তিনি কপালমোচন। মানুষের কর্ত্তব্য তাঁর উপর নির্ভর করে যেতে হবে—চেষ্টাচরিত্র ঔষধ পথ্য সব। যখন সেরে যাবে তখন বুঝতেই পারবে না কিসে কি হল। এই হল তাঁর কৃপা। তুমি তাঁর কৃপায় আরোগ্যলাভ করবেই। তুমি যে তাঁকে ডাকছ এবং জানাচ্ছ—এর চেয়ে মহৌষধ আর নাই জানিবে। ইহাতে তোমার ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে। তিনি তোমায় নিশ্চয়ই দেখছেন, রক্ষা করছেন এবং যাহাতে তোমার কল্যাণ হয় তাহা তিনি করিবেন, ইহা নিশ্চয়ই জানিবে।

আমি তোমায় আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ঠাকুর তোমায় রোগমুক্ত করে দিন। মাঝে মাঝে পত্র দিও। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

আমরা রোজ একটু ক'রে 'কথামৃত' গ্রন্থ থেকে পড়বো এবং তা বুঝবার চেষ্টা করবো। আজ কথামৃতের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড থেকে আরম্ভ করছি। অবশ্য যে-কোন জায়গা থেকেই আরম্ভ করা যায়। কারণ, 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে'—আদি, অন্ত, মধ্য সব জায়গায় সেই ভগবানেরই কথা আছে। তবে সাধারণতঃ গোড়া থেকেই আরম্ভ করা হয় এবং তাই স্বাভাবিক, এইজন্য গোড়া থেকেই আরম্ভ করছি। উপক্রমণিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-চরিত মাষ্টারমশাই সংক্ষেপে সুন্দরভাবে লিখেছেন। আমরা সে অংশটি পড়ছি না। তারপর প্রথম পরিচ্ছেদে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ি আর বাগান ইত্যাদির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাও আমরা এখন পড়বো না। আমরা পড়বো সেখান থেকে, যেখানে বলা হয়েছে মাষ্টারমশাই প্রথমে ঠাকুরকে কিভাবে দর্শন করলেন, তাঁর প্রথম কথা কি শুনলেন। সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে আমরা এই গ্রন্থের অনুসরণ করবো।

(পাঠ:) **'প্রথম দর্শন— ১৮৮২ ফেব্রুয়ারী মাস···ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।'** (প্রথম অনুচ্ছেদ)

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, মাষ্টারমশাই কেবল যে ঠাকুরের কথাগুলি উল্লেখ করেছেন, তা নয়, কথাগুলির পটভূমি, যে-অবস্থায় ঠাকুর কথা বলছেন, অল্প কথায় তার একটি চিত্র কথামৃতের প্রতি পরিচ্ছেদের ভিতরই দিয়ে গেছেন।

এর একটু রহস্য আছে। মাষ্টারমশাই তাঁর ডায়েরীতে ঠাকুরের কথাগুলি সংক্ষেপে লিখে রাখতেন। এত সংক্ষেপে যে, তিনি ছাড়া আর কারো কাছে তার কোন অর্থ হয় না। খুব সংক্ষিপ্তভাবে খালি কয়েকটি নোটের মত শব্দ উল্লেখ করা থাকতো। কথামৃত লেখবার আগে এই শব্দগুলি নিয়ে এক একদিনের চিত্র তিনি ধ্যান করতেন। তিনি বলতেন যে, ধ্যান করতে করতে সেই দিনের সমগ্র চিত্রটি তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠতো। যখন এইভাবে সমস্ত দিনের ঘটনাটি তাঁর মানসপটে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো, তখন তিনি লিখতে আরম্ভ করতেন।

এইজন্য আমরা দেখতে পাবো কথামৃতের প্রত্যেকটি কথার ভিতরে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কেবল যে ঠাকুরের কতকগুলি উপদেশ এক জায়গায় সমাবিষ্ট ক'রে সকলকে পরিবেশন করা হচ্ছে, তা নয়। এক একটি দিনের চিত্র মাষ্টার-মশাই সামনে উপস্থিত ক'রে দিচ্ছেন। ঠাকুর বসে আছেন, কোন্ দিকে বসে আছেন, সঙ্গে ঘরে কে কে আছেন ইত্যাদি সব উল্লেখ ক'রে যাচ্ছেন। এর আগে কালীবাড়ির বর্ণনা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়েছেন; তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কথামৃতের পাঠকরা যেন গোড়া থেকে ঐ চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ঠাকুরকে ধ্যান ক'রে কথাগুলি বোঝবার চেষ্টা করেন। এই হ'ল কথামৃতের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

মাষ্টারমশাই নিজে ধ্যানের সাহায্যে কথাগুলিকে যেন সদ্য শুনে তার পরে লিখতেন,

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

এবং তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে, যারা শুনবে বা যারা পড়বে, তারা যেন সেই চিত্রটিকে চোখের সামনে দেখছি, সাক্ষাৎভাবে ঠাকুরের কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনছি, এইভাবে ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি আলোচনা করে। তা যদি করে, তা হ'লে কথাগুলি ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্নরূপে আসবে না ; তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে আসবে, জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে কথাগুলি আমাদের কাছে পৌঁছুবে—নৈর্ব্যক্তিকরূপে নয়। উপদেশগুলিকে তখন, যাকে abstract বলে, তা মনে হবে না ; মনে হবে ঠাকুর সাক্ষাৎ যেন বলছেন এবং বলছেন আমাদেরই মত লোকের জন্য। এই চিত্রটি সামনে রেখে আমরা তাঁর চিন্তা ক'রে কথামৃত আলোচনা করলে বহু সুফল পাব। তাই মাষ্টারমশাই এইভাবে কথাগুলি বলেছেন, কোন dramatic effect-এর উদ্দেশ্যে নয়, ধ্যানের বস্তু ক'রে তিনি কথাগুলিকে আমাদের সামনে দিয়েছেন।

(পাঠ:) **'মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন ···ইনিও বলিয়াছেন, 'আবার এসো'! কাল কি পরশ্ব সকালে আসিব।'** (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত)

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করবার যে, মাষ্টারমশাই ঠাকুরের কাছে যাবেন, মনে এরকম কোন সংকল্প নিয়ে বেরোননি। বরানগরে গেছেন, অনেক বাগান ছিল তখন সেখানে। এ-বাগানে সে-বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁর আত্মীয়, সিধু—যিনি ঐ জায়গার সঙ্গে পরিচিত, তিনি বললেন, 'গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।' তারপর এ-বাগানে সে-বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বাগানে গিয়ে পড়লেন। তাই মাষ্টারমশাই দৈবক্রমেই সেখানে গিয়ে পড়েছেন, পরিকল্পনা করে নয় ; সাধু দেখতে যে গেছেন, তাও নয়।

তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে মাষ্টারমশাই দেখলেন, অপরের সঙ্গে ঠাকুর কথা বলছেন। সেই কথার এখানে উল্লেখমাত্র করেছেন। কথাগুলির সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের অন্তরের কোন যোগ তখনও হয়নি। তবে কথাগুলি তাঁর ভাল লেগেছে। মনে হয়, তখনও ঠাকুরের আকর্ষণ খুব প্রবলভাবে যে বোধ করেছেন, তা নয়। কারণ, বলছেন, 'একবার দেখি কোথায় এসেছি, তারপর এখানে এসে বসবো।'

বাগান দেখতে ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময়ে আরতির কাঁসর ঘণ্টা খোল করতাল বেজে উঠলো। তাই সব মন্দিরে আরতি দেখে তারপরে এলেন ঠাকুরের ঘরের সামনে। দেখলেন ঘরের দরজা বন্ধ।

প্রথমে বৃন্দে ঝি'র সঙ্গে কথা। মাষ্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?" বৃন্দে ঝি বলছেন, "আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে!" বৃন্দে ঝি, তাঁর ত পড়াশুনা কিছুই নেই, কিন্তু দেখেছেন বড় বড় পণ্ডিতদের ঠাকুরের কাছে আসতে, অনেক সাধুকে সেখানে আসতে দেখেছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট সাধকদের আসতে দেখেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা মন দিয়ে হয়তো না শুনলেও এমনি শুনেছেন এবং এইটুকু জানেন যে, ঠাকুরের কথায় সকলেই মুগ্ধ। বই-টই যে ঠাকুর পড়েন না, তা তিনি জানেন। কাজেই তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, 'বই-টই সব ওঁর মুখে।'

মাষ্টারমশায়ের কাছে এটা আশ্চর্য বলে মনে হ'ল, কারণ তাঁর ধারণা ছিল, আধ্যাত্মিক জীবনে অভিজ্ঞ হতে হ'লে, গ্রন্থাদি পড়া

অপরিহার্য। জ্ঞানের ভাণ্ডার তা না হলে ভরবে কি দিয়ে! সুতরাং ঠাকুর বই পড়েন না শুনে তিনি অবাক হলেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা পরে দেখবো একটি ভক্ত, মহিমাচরণ, যিনি ঠাকুরের কাছে যেতেন, বলছেন, 'অনেক খাটতে হয়, তবে ঈশ্বরলাভ হয়; পড়তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!' আর ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন, 'শাস্ত্র কত পড়বে? বই পড়ে কি জানবে? বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না।'

সাধারণ মানুষের মনে হয় যে, জ্ঞানলাভ করতে হলে অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়তে হবে। অনেক না পড়লে জ্ঞান হবে কি করে! লৌকিক জ্ঞানই মানুষ কিছু না পড়ে নিজে কতটুকু অর্জন করতে পারে তার ঠিক নেই, আর এ ত লৌকিক জ্ঞান নয়—ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান! শাস্ত্রেই তা লেখা আছে, এবং সাধকদের অনুভূতির কথাও গ্রন্থে লেখা আছে, সে সব বই না পড়লে সে-জ্ঞান হবে কি করে! সুতরাং ঈশ্বরলাভ করতে হলে অনেক বই পড়তে হয়—এই কথাই সাধারণের মনে হয়, যা মহিমাচরণ বলেছেন,—পড়তেই কত হয়!

মহিমাচরণের বাড়িতে ঘরভর্তি বই ছিল। ঐ রকম ঘরভর্তি বই দেখার পর লোকে যদি শোনে যে এত সব বই পড়তে হয়, তা হ'লে সেখানেই নমস্কার ক'রে চলে যাবে—ভাববে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরলাভ আর হবে না!

বৃন্দে ঝি'র সঙ্গে কথা হবার পর মাষ্টারমশাই যখন ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন, ঘরে তখন আর কেউ নেই। তিনি ঠাকুরের ভাবটি লক্ষ্য করলেন। কি রকম ভাব? না, ছিপেতে যখন মাছ এসে লাগে, ফাত্না নড়ে, তখন যে ব্যক্তি ছিপ নিয়ে বসে আছে, তার যেরকম ভাব হয় ঠাকুরের ভাব ঠিক সেই রকম।

মাষ্টারমশাই খুব পর্যবেক্ষণ-শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন। অদ্ভুত তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তি! কোন জায়গায় গেলে প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে পারতেন। ভাসা-ভাসা উড়ো-উড়ো দেখা তাঁর ছিল না। আমরা দেখেছি, তিনি মঠে আসতেন যখন, ঘরে ঘরে যেতেন। আর তাঁর সঙ্গে অনুরাগী ভক্ত যাঁরা আসতেন, তাঁদের বলতেন: 'ত্মাখো, সব জিনিস দেখতে হয়। মঠ দেখা কি খালি জায়গাটা দেখা? এসে সব দেখবে, সাধুদের সঙ্গে কথা বলবে। তাঁরা কিভাবে থাকেন দেখবে।' উনি দেখতেন ঘরে ঘরে ঢুকে। কারো বিছানার কাছে কিছু বই আছে, কি কি বই আছে তাও উল্টে দেখতেন। আমরা সম্ভবতঃ আর কাউকে এত খুঁটিয়ে দেখতে দেখিনি। বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সব দেখা—এ তাঁর বরাবরের অভ্যাস ছিল। তাই আমরা কথামৃতের ভিতর যখন বর্ণনা পাই, দেখতে পাই কত খুঁটিয়ে তিনি বর্ণনা করছেন।

ঠাকুরকে তিনি ঐরকম অন্যমনস্ক অবস্থায় দেখলেন। তখনও এই অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। সেই পরিচয় পরে ক্রমশঃ খুব নিবিড়ভাবে হবে। এখন শুধু দেখলেন ঠাকুর অন্যমনস্ক। সুতরাং ভাবলেন ঠাকুর হয়তো কথা বলতে চান না সন্ধ্যা-বন্দনাদি করবেন। তাই বললেন, 'আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।' ঠাকুর বললেন, 'না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়!' ঠাকুরের কথার ভাবটা কি মাষ্টারমশাই তখন বুঝলেন না। পরে বুঝবেন। ঠাকুর বোঝাবেন, সন্ধ্যা-বন্দনাদির কি প্রয়োজন, কতদিন তা করতে হয়, কখন তার প্রয়োজন আর থাকে না। এগুলি সব পরে শিখবেন। এখন দেখলেন ঠাকুরের অন্যমনস্ক ভাব—সকলের সামনে চোখ চেয়ে থেকেও তাঁর

মন যেন বাহ্য কোন কিছুতেই নেই। উপমা দিলেন ঐ ছিপে মাছ ধরার মত। যখন মাছ গেঁথেছে, তখন কি আর রক্ষে আছে! তখন কি আর যে মাছ ধরছে. তার মন অন্য কোন দিকে যায়? ঠাকুরের এখন কোন দিকে দৃষ্টি নেই—চারে মাছ এসেছে, ছিপে মাছ গাঁথা হয়েছে, এরকম অবস্থা।

এই যে অন্যমনস্ক ভাব, এটি সাধনার পরিপক্ক অবস্থাতেই হয়। তার আগে হয় না। ঠাকুরের সন্তানদের, তাঁর সাক্ষাৎ পার্ষদদের কয়েকজনের সংস্রবে আসবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। লক্ষ্য করেছি যে, তাঁদেরও এইরকম একটা অদ্ভুত অন্যমনস্ক ভাব হোত, যা অন্য কোথাও আমরা দেখিনি। বড় বড় সাধুদের, নামকরা বিখ্যাত সাধুদের সম্পর্কে এসেছি অন্য জায়গায়। কিন্তু কোথাও এই রকম অবস্থা—জগৎটাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, এইরকম অবস্থা দেখিনি। এটি সাধনার অনেক পরিপক্ক অবস্থা। আমি সমাধিস্থ অবস্থার কথা বলছি না, সেটা আরও অনেক দূরের কথা। এই যে মাঝে মাঝে যেন জগতের খেই থাকছে না, ভুল হয়ে যাচ্ছে, জগৎটা যেন মনের উপর রেখাপাত করছে না, আছে জগৎটা, অস্পষ্ট অনুভবও হচ্ছে, কিন্তু মনের উপরে কোন দাগ কাটছে না, এই অবস্থার কথা বলছি। স্বামীজীর রচিত একটি গানে নির্বিকল্প সমাধির প্রাথমিক স্তর হিসাবে ঠিক এই অবস্থারই বর্ণনা আমরা পাই: 'ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর'—'অস্ফুট মন-আকাশে' বিশ্বচরাচর ছায়ার মত ভাসছে। ছায়ার মত—অর্থাৎ তার যেন দেহ নেই, তার যেন বাস্তব সত্তা নেই। আর ছায়া ব'লে তার অস্তিত্ব যেন মনের উপর রেখাপাত করছে না। এ একটা অদ্ভুত অনুভূতি,—যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ছায়ার মত হয়ে যায়! এই অবস্থার মানুষ—'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ'—দেহে থেকেও যেন দেহে নেই। এটি সমাধি-অবস্থা নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সব কাজ যে বন্ধ হয়ে গেছে, তা নয়। ইন্দ্রিয়াদির কাজ হচ্ছে, কিন্তু কাকে নিয়ে হচ্ছে তার ঠিক নেই। ইন্দ্রিয়াদি মনের কাছে বিষয় উপস্থাপিত করে। মন সেগুলি নিয়ে যিনি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, তাঁর কাছে হাজির করে। এখন তিনি যদি সেগুলি গ্রহণ না করেন, তা হলে ইন্দ্রিয়াদির কাজ করা আর না করা সমান। এ অবস্থায় একেবারে যে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তা নয়। আছে। কিন্তু জগৎটা ছায়ার মত হয়ে গেছে।

ঠাকুরের এই অবস্থাটি মাষ্টারমশাই দেখলেন। এটি আমাদের ভাববার জিনিস। কারণ, এই রকম অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। লৌকিক জীবনে আমরা জানি, কখনও কখনও কোন একটা বিষয়ে মানুষের মন নিবিষ্ট হলে, সে অন্যমনস্ক হয়। কিন্তু সেখানে তার মনের অভিনিবেশ আছে এমন একটা জিনিসে যা আমরা ধরতে বুঝতে পারি। যেমন একজনের কথা—তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি ব্যবসায় নেবেছেন। তা ব্যবসাতে তখন মনটা এমন নিবিষ্ট যে, বাইরে ব্যবহার করছেন কিন্তু সব ভাসা ভাসা। মনটা ব্যবসাতে—ব্যবসার সমস্যা নিয়ে একেবারে ব্যস্ত। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা ব'লে আমাদের সুখ হয় না, তোমার মন যে কোন্ দিকে থাকে! আমরা কথা বলি আর তুমি কোন্ দিকে চেয়ে থাক!' এ অন্যমনস্কতা, এটা আমরা বুঝি। জগতের কোন একটা বিষয়ে অভিনিবেশ হয়ে মনের যে ঐ রকমের বাইরের জিনিসকে গ্রহণ করবার অশক্তি, এটা মানুষের হয়। কিন্তু এখানে? এখানে মনের বিষয়টি কি যা তাকে এমনভাবে টেনে রেখেছে যে,

বাইরের বস্তুকে অনুভব করতে দিচ্ছে না? সেই বিষয়টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। অভিনিবেশ আমরা বুঝি। অভিনিবেশ এতদূর হতে পারে যে, মানুষ বাইরের জগৎ সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যেতে পারে। এর একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। স্যার জে. সি. বোসের একজন ছাত্র আমাদের বলেছেন। তিনি নিজে তখন খুব কৃতবিদ্য হয়েছেন। সরকারি বড় কাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গেছেন জে. সি. বোসের সঙ্গে দেখা করতে। জে. সি. বোসের বাড়িতে তাঁর অবাধ প্রবেশ ছিল। শুনলেন, তিনি ছাতের উপরে আছেন। ছাতের উপরে টবে সব গাছ লাগান আছে, সেখানে তিনি বসে আছেন। উনি গেছেন, সামনে দাঁড়িয়েছেন, স্যার জে. সি. বোসের কোন হুঁশ নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্যানমগ্ন ঋষির ধ্যানভঙ্গ করবার ইচ্ছে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ পরে তাঁর খেয়াল হল,—'ও তুমি! কখন এসেছ?' 'অনেকক্ষণ এসেছি।', 'আমায় ডাকলে না কেন?' আর উত্তর দিলেন না। এরকম অভিনিবেশ আমরা বুঝি; তা গাছেই হোক, জগতের অন্য কোন রহস্যেই হোক, বা সংসারী লোকের মন যাতে আকৃষ্ট হয়, সেই অর্থ-উপার্জনেই হোক। এ সবের আকর্ষণ আমরা বুঝি। কিন্তু এখানে আকর্ষণের বিষয় আমরা জানি না। এখানে আকর্ষণের বিষয় সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। ঠাকুরের এই অবস্থার বর্ণনা কথামৃতে আমরা আরো পাবো। এর নাম অর্ধবাহ্যদশা। মাষ্টারমশাই এই অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুরকে দেখলেন, এবং তারপর ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা যা হ'ল, তা অতি অল্প। ঠাকুর বোধ হয় তখন তাঁর মনকে কথাবার্তা কওয়ার যে ভূমি, তাতে নাবাতে পারছেন না।

ঠাকুরের এই অবস্থা অনেক সময় হোত। মনের গতি এক এক সময় এমন হয়ে থাকত যে, এই জগতের বিষয়ে মন কিছুতেই নাবতে পারত না। একটা ঘটনার উল্লেখ করছি: ঠাকুর বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করতে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক যুবক-ভক্তের সমাগম হয়েছে। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুভূতি-প্রসঙ্গে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের কথা এসে পড়লো। স্থূল চোখে যা দেখা যায় না, এমন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস বা জীবাণু ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় শুনে ঠাকুর ঐ যন্ত্র দিয়ে দু-একটি জিনিস দেখতে চাইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যুবক-ভক্তদেরই এক বন্ধুর কাছে একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আছে। তিনি ডাক্তার—সবে মাত্র ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ঐ যন্ত্রটি মেডিকেল কলেজ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি যন্ত্রটি নিয়ে এলেন এবং ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে ঠাকুরকে দেখবার জন্য ডাকলেন। ঠাকুর উঠলেন, দেখতে গেলেন, কিন্তু না দেখেই ফিরে এলেন। সকলে কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'মন এখন এত উঁচুতে উঠে রয়েছে যে, কিছুতেই তাকে নাবিয়ে নীচের দিকে দেখতে পারছি না।' অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে দেখতে হলে মনকে যে স্তরে নাবাতে হবে, তিনি আর সেই স্তরে মনকে নাবাতে পারছেন না। মন তাঁর কিছুতেই নাবল না, দেখাও হ'ল না।

এই রকম মন তাঁর। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি হ'ল ঊর্ধ্ব দিকে, জগৎ-অতীত তত্ত্বের দিকে। সেই মনকে জোর ক'রে নাবিয়ে রাখতে হয়। কি প্রয়োজন? তাঁর নিজের কোন দরকার ত নেই। তবু তাকে নাবিয়ে রাখেন কেন?—আমাদের জন্য। তিনি চান ইন্দ্রিয়াতীত যে আনন্দ, তার সন্ধান আমাদের

দেবেন এবং সেই জন্য নিজে সমাধির আনন্দকেও উপেক্ষা করছেন। বলছেন, 'মা, আমায় বেহুঁশ করিস্ না। আমি এদের সঙ্গে কথা বলবো।' কি প্রয়োজন তাঁর? আত্মানন্দে বিভোর তিনি। 'আত্মরতিঃ' 'আত্মতৃপ্তঃ' 'আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ' যিনি, তিনি আমাদের জন্য এত ব্যস্ত যে, মা'র কাছে প্রার্থনা করছেন, 'মা, আমায় বেহুঁশ করিস্ না, আমি এদের সঙ্গে কথা বলবো।' কথা তিনি বলেছেন। তাই আজ 'কথামৃত' পৃথিবীর সর্বত্র পরিবেশিত হচ্ছে। ঠাকুরের মনের সহজ যে গতি—অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের দিকে তাঁর মনের স্বাভাবিক যে গতি—তাকে যেন ধরে বেঁধে তিনি নাবিয়ে আনছেন আমাদের জন্য। মুহুর্মুহুঃ সমাধি হচ্ছে। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন যে, সমাধি তাঁকে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছে না। যে সমাধির জন্য ঋষি-মুনিরা জন্ম-জন্মান্তর আরাধনা করে যাচ্ছেন, তপস্যা করে যাচ্ছেন, সেই সমাধি বার বার আসছে, তবু তিনি তাকে উপেক্ষা করছেন, বিরক্তিবোধ করছেন—'এরকম সমাধিমগ্ন হ'য়ে থাকলে আমার আসার সার্থকতা কি!'

ঠাকুর গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়েছেন: তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে দেখলে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা · তার ভিতর থেকে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আসছে। তাদের ইচ্ছে হ'ল ভিতরে কি হচ্ছে দেখবে। একজন কোন রকমে একটা মই যোগাড় ক'রে পাঁচিলের ওপর উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়লো কি যে ভিতরে দেখল তা দু' জন বন্ধুকে বলতে পারল না। দ্বিতীয় বন্ধুও ঐ রকম দেখে নিজেকে সামলাতে পারলে না। সেও হাসতে হাসতে ভেতরে লাফিয়ে পড়লো। তৃতীয় বন্ধুও ঐ মই বেয়ে উপরে উঠলো আর ভিতরের আনন্দের মেলা দেখতে পেলো। দেখে প্রথমে তার খুব ইচ্ছে হ'ল সেও ঐ আনন্দে যোগ দেয়। কিন্তু পরেই ভাবলে— আমি যদি ওতে যোগ দিই, তা হলে বাইরের দশজনে ত জানতে পারবে না, এখানে এমন আনন্দের জায়গা আছে; একলা এই আনন্দটা ভোগ করবো? এই ভেবে সে জোর করে নিজের মনকে ফিরিয়ে নীচে নেবে এলো আর যাকেই দেখতে পেলো তাকেই বলতে লাগলো—ওহে এখানে এমন আনন্দের জায়গা রয়েছে, চলো চলো সকলে মিলে ঐ আনন্দ ভোগ করি।

এই তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ঠাকুর নিজে—যিনি এসেছেন একলা আনন্দ ভোগ করবার জন্য নয়, সেই অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার সকলের কাছে উন্মুক্ত করবার জন্য, উজাড় করে দেবার জন্য। কাজেই, তাঁর নিজের সমাধি-সুখকে পর্যন্ত উপেক্ষা করতে হচ্ছে। এই জিনিসটি ঠাকুরের যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তা আমাদের মনে রাখতে হবে।

লীলাপ্রসঙ্গের ভিতর ঠাকুরের জীবন বিশ্লেষণ ক'রে অনেক কথা আলোচনা করা হয়েছে। তার ভিতর একটি কথা এই যে, ঠাকুরের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁর নিজের জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্য, জগতের শিক্ষার জন্য। এটি বুঝতে হলে খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁর জীবন অনুধাবন করে দেখতে হয়। আমরা অত বুঝতে না পারলেও এইটুকু বুঝি যে, যিনি ইচ্ছা করলেই সমাধিতে ডুবে থাকতে পারতেন, তিনি আমাদের জন্য এইভাবে সমাধি-সুখকে উপেক্ষা করেছেন, জগন্মাতার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, 'আমাকে বেহুঁশ করছিস্ কেন, আমি এদের সঙ্গে কথা বলবো।' তিনি

জানেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বিপুল অজ্ঞতা রয়েছে। এই সংসারে সাধারণ সুখ নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে আছি অথবা দুঃখে হাহাকার করছি। এই সুখদুঃখময় সংসারের পারে যাবার পথ দেখাবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল। শুধু নিজের প্রাণ নয়, তাঁর পার্ষদদেরও প্রাণ যাতে অনুরূপভাবে ব্যাকুল হয়, সেজন্য তাঁদের সেইভাবেই তৈরী করছেন। নরেন্দ্রনাথ সমাধিতে ডুবে থাকতে চাইলে, তাঁকে ভৎর্সনা ক'রে বলছেন, 'ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিস্ নি।'

শ্রীশ্রীমাকেও ঠাকুর বলেছিলেন, 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।'

তাঁর জীবন সমর্পিত হয়েছে আমাদের জন্য এবং তাঁর যাঁরা সাঙ্গোপাঙ্গ, যাঁরা তাঁর লীলা-সহায়ক হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে তিনি 'জগদ্ধিতায়' উদ্বুদ্ধ করেছেন, বলেছেন, 'তোমার জীবনের যে আনন্দ, সেই অসীম আধ্যাত্মিক আনন্দ শুধু নিজে ভোগ করবার জন্য তুমি জগতে আসনি। এসেছ এই জগৎকে সেই আনন্দের সন্ধান দেবার জন্য।' এই হ'ল ঠাকুরের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর নিজের জন্য কিছু করছেন না—করছেন জগতের সকলের জন্য। এবং সেই করাটা কি? না, মানুষকে সমস্ত দুঃখকষ্টের পারে নিয়ে যাওয়া, তার অজ্ঞাত যে আনন্দ সেই আনন্দের সন্ধান দেওয়া, শুধু সন্ধান দেওয়া নয়, হাত ধরে তাকে সেখানে পৌঁছে দেওয়া। বলছেন, 'যা করবার আমি করেছি, তোমাদের আর বেশী কিছু করতে হবে না, এই আলো দেখে চলে এসো।' বলছেন, 'বাড়া ভাতে বসে যা, রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে।' পাকা গিন্নির মত রসুই ক'রে তৈরী ক'রে রেখে দিয়েছেন, বাড়া আছে সব। আমাদের শুধু খেতে বসতে হবে—খেতে হবে; আগুন জ্বালা আছে, শুধু পোয়াতে হবে। যার যা প্রয়োজন সমস্ত নিজে যেন আগে থেকে ক'রে রেখে দিয়েছেন। আর আহ্বান করছেন, 'তোমরা এসো, এসে এই আনন্দ উপভোগ করো।' ঐ তিন বন্ধুর তৃতীয় বন্ধুর মত! এবং শুধু ডাকছেন না, পথ দেখাচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, শক্তি সঞ্চার করছেন, সমস্ত বাধাবিঘ্ন নিজের হাতে যেন অপসারিত করছেন পথ থেকে। এ সব করছেন শুধু দুচারটির জন্য নয়, তাঁর পার্ষদ যে ক'জন সামনে ছিলেন, তাঁদেরই জন্য নয়, সকলেরই জন্য। আগেই বলেছি, পার্ষদদের তৈরী করছেন এমনভাবে যাতে তাঁরা তাঁর এই যে mission, তাঁর জীবনের এই যে উদ্দেশ্য তা সফল করতে সহায় হন।

তিনি কাজ করছেন, তাঁর স্থূল দেহ থাকতে যতটুকু দেখা গেছে, তার চেয়ে শত সহস্র লক্ষ গুণ বেশী এখন। অশরীরিরূপে তিনি সমস্ত জগতে যে কাজ করছেন, তার প্রভাব আমরা আভাসে মাত্র পাচ্ছি এখন। স্বামীজী বলেছেন, যা কালে পরিণত হবে তার আভাসমাত্র আমরা পাচ্ছি, পুরো চিত্রটি আমাদের সামনে নেই। ক্রমশঃ যেন সেটি পরিস্ফুট হচ্ছে এবং তার এই ক্রমশঃ পরিস্ফুটনের আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি, আর ভাবছি কালে না জানি কি হবে!

আজকে এই পর্যন্ত। পরে আবার আমরা এই প্রসঙ্গের অনুসরণ করবো।*

* ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৫, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে 'কথামৃত'-আলোচনার কিয়দংশ। মার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

ভারতে উন্নতির পথ*

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রামকৃষ্ণ মিশনে আসতে পারাটা আমার কাছে সব সময় একটা বিশেষ সুযোগ। এখানে একটা শান্তির ভাব আছে শুধু কোলাহল নেই ব'লেই নয়, সেবার পরিপূর্ণতা আছে ব'লে। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ অতি প্রাঞ্জলভাবে আমাদের দর্শনশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং আমাদের দেশবাসীদের কাছে ও অন্যান্য দেশে ভারতের বাণী প্রচার করেন; তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।

ভারতকে 'ত্যাগভূমি' ও 'ধর্মভূমি' বলা হয়। ধর্ম শুধু 'রিলিজন'-এর মধ্যে সীমিত নয়—সঙ্কীর্ণ আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের গণ্ডির মধ্যে 'রিলিজন'কে আবদ্ধ করাও উচিত নয়। ধর্ম হল নিজের প্রতি, সকল মানুষের প্রতি, সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য।

দর্শনশাস্ত্রের দিক থেকে, ধর্মের ব্যাপকতর ধারণাই হল ভারতীয় চিন্তার শুভকারী বৈশিষ্ট্য। তাই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে 'সর্বধর্মসমভাব'-এর অর্থে গ্রহণ করতে পারি—ধর্মহীনতার অর্থে নয়—সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধার অর্থে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদের মতো [ধর্ম] জীবন যাপন করেছিলেন এবং এইসব পথ ধরে তিনি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বকীয়-ভাবে, মহাত্মা গান্ধীরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

তত্ত্বের দিক থেকে আমাদের এমন সর্বব্যাপী সহনশীলতা থাকলেও ব্যবহারে আমরা খুব সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিলাম এবং বহু শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজের বহু অংশের মানুষকে আমরা মৌল মানবিকতা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলাম। ঝোঁকটা ছিল সমষ্টির উন্নতিকে অবহেলা করে ব্যষ্টির মুক্তি অন্বেষণের দিকে। কর্ম অদৃষ্ট-ভিত্তিক বলে ব্যাখ্যাত হ'তো—শ্রম- ও কর্তব্য- ভিত্তিক রূপে নয়। জ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ভারতের অবনতি হয়েছিল। নিষ্প্রাণ আচার-অনুষ্ঠানের মালিন্য হ'তে মুক্ত ক'রে আমাদের প্রাচীন সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যুগে যুগে সত্যদ্রষ্টা ও সংস্কারকগণের আবির্ভাব হয়েছে।

এইসব সত্যদ্রষ্টাগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব-বিস্তারকারী ও প্রেরণাদায়িগণের অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বাণী ছিল সকল মানুষের মধ্যে এবং সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরান্বেষণ করা। তাঁর ধর্ম ছিল জাতিগঠনের ধর্ম। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রচারিত যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞতা, তা বর্জনের নয়, গ্রহণের। আত্মসংযম-শিক্ষায় মিশন সংগঠিত সমাজসেবার ভাবের ওপরও জোর দিয়েছেন। এইটাই আমার মা কমলা নেহেরুকে আকৃষ্ট করেছিল এবং আমার বাবা জওহরলাল নেহেরুর গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

আজকের অধিকাংশ সমৃদ্ধিশালী দেশে একটা আধ্যাত্মিক শূন্যতা দেখা যায়। বিশেষ ক'রে বর্তমান [ভোগ্যবস্তু-]অর্জনে অতিলোলুপ সমাজের ভিত্তিভূমিকে যুবসমাজ প্রত্যাখ্যান করছে। মাত্র গতকাল সুইডেনের এক মহিলার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। তাতে

* স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতামালার রেকর্ড-প্রকাশ উপলক্ষে ১৮ই জুন, ১৯৭৬ তারিখে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইংরেজী ভাষণ হইতে সংকলিত ও অনূদিত।

তিনি লিখছেন :

"পশ্চিমে আমাদের অদ্ভুত সংস্কৃতি প্ল্যাস্টিক দিয়ে মোড়া। এখানে লোকেরা জীবনটাকে প্রচণ্ড ভয় করে এবং তা থেকে নিস্তার পাবার জন্য নিত্যই নব নব কৌশল খুঁজে বেড়ায়। এমন কি যখন বিদেশে যায় তখনও সেই প্ল্যাস্টিকের থলিটাকে ছেড়ে আসতে তারা ভয় পায়; ভয়—ধুলোর, রোগের, জীবন-সংগ্রামের ও জীবন-যন্ত্রণার কোন চিহ্নের; ভয়—কষ্টের ও অন্য লোকেরা যে সব ভার বহন করে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার। তাই তারা এ বিষয়েও সম্পূর্ণ অনবহিত যে তারাও আনন্দ ও তৃপ্তির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে।"

তবু আমাদের দেশের অনেকে ও-দেশের সেই জীবনটাকে উত্তম জীবন ব'লে মনে করেন; মনে করেন, এই হল অগ্রগতি এবং এইদিকে আমাদের নিজেদের অগ্রসর হওয়া উচিত। রামকৃষ্ণ মিশন, বিশেষ ক'রে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের কাজ হল বিষয়গুলিকে আরো সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে আমাদের সাহায্য করা। [পথের সন্ধানে] অনেকে যে প্রাচীন ভারতের তথা প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার এবং হিন্দু বৌদ্ধ ও সুফী ধর্মমতের ভেতর হাতড়ে বেড়াবেন তা বোঝা যায়। এ অনুসন্ধিৎসা কতটা আন্তরিক ও গভীর, এবং কেউ কেউ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর কতটা কাজে লাগাচ্ছেন, তা বিচার করা আমাদের পক্ষে কঠিন। এই জন্যেই আরো নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ও সাধুগণের প্রয়োজন, যাঁরা আমাদের প্রাচীন জ্ঞানের নির্যাস ও সত্য পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেবেন।

আমরা—ভারতবাসীরা—নিজেদের আধ্যাত্মিক ব'লে জাহির করতে ও পাশ্চাত্য দেশগুলিকে জড়বাদী ব'লে নিন্দা করতে অত্যধিক ব্যগ্র। প্রকৃত তথ্য এই যে, আমাদের দেশবাসীরাও অন্যদের চেয়ে কম জড়বাদিতার ও ভোগলিপ্সার পরিচয় দেননি: বস্তুতঃ স্বাধীনতা ও উন্নয়নের ফলে উন্নতি করার যে-সব সুযোগ-সুবিধে মিলেছে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ এর আধিক্যই দেখাচ্ছেন।

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার পাশ্চাত্যের অনুবর্তী হবার জন্য তার নিজস্ব চাপ সৃষ্টি করে। শিক্ষা ও জনসংযোগের মাধ্যমগুলি আমাদের বহুজনকে ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান জীবনযাত্রার মানের দিকে আকৃষ্ট করে। আমরা যদি আত্মনিষ্ঠ হই তাহলে কখন কোথায় আমাদের থামতে হবে তা আমরা জানতে পারব। প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রয়োগ করতে হবে অত্যাবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্থানের জন্য, নতুন অভাব জাগিয়ে তোলার জন্য বা এমন সব উপকরণ জড়ো করার উৎসাহ দেবার জন্য নয়—যেগুলির ভোগদখল ক্ষণিকের প্রমোদ যুগিয়ে অচিরে অসন্তোষ ও অস্থিরতার উদ্রেক করে, যন্ত্রের ওপর আমাদের আরো বেশি নির্ভরশীল করে, আমাদের পরমুখাপেক্ষী করে, আভ্যন্তর সম্পদ ও শক্তি না বাড়িয়ে চিত্তবিনোদনের জন্য পরপ্রত্যাশী করে।

আমাদের স্বাধীনতার সার্থকতা অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি নীরস একঘেয়ে কাজ থেকে আমাদের জনসাধারণকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সফলতার একটা নিজস্ব নকশা তৈরি করতে না পারে,—যদি না পারে বুদ্ধিগত বলিষ্ঠতা, ভাবগত দায়িত্বজ্ঞান ও নান্দনিক সংবেদনশীলতার একটা বৈশিষ্ট্যসূচক সমন্বয় সাধন করতে যা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, উৎকর্ষে গর্ববোধ ও সেই সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা ও সুন্দর ভারসাম্যের মাঝখানে আমাদের অকিঞ্চিৎকরতায় বিনম্রতা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ।...

স্বামীজীর গানের খাতা

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

স্বামীজীর গানের খাতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্বোধন পত্রিকার গত আশ্বিন, ১৩৮২ সংখ্যায় এবং উহার একদিককার ২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ মাঘ, ১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে; এখানে তাহার পর হইতে দেওয়া হইল। পাঠকদের সুবিধার জন্য পৃষ্ঠা-সংখ্যার পর, মূল খাতার লেখা আরম্ভ হইবার পূর্বে আমরা [ ] এই বন্ধনীর মধ্যে স্বরলিপিসহ লিখিত গানগুলির কেবল গানের অংশটুকু যতিচিহ্ন বসাইয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে বানান পরিবর্তিত করিয়া লিখিয়া দিলাম। স্বামীজী যে গানগুলি, বিশেষ করিয়া স্বরলিপিসহ যে গানগুলি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির অংশমাত্র লিখিয়াছেন, তাহাও আবার সব ক্ষেত্রে একটানা নয়; এখানে সেইটুকুই দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর মূল খাতার লেখা যেমন আছে, ঠিক সেভাবেই দেওয়া হইল। যেখানে স্বরলিপি আছে, স্বরের বিভিন্ন গ্রাম (উদারা ও তারা) বুঝাইবার জন্য যে সব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, স্বামীজী কোথাও তাহা দু-এক জায়গায় দিয়াছেন, কোথাও দেন নাই—হয়ত নিজের বুঝিবার জন্য প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই দেন নাই। আমরা বর্তমানে খাতায় সেগুলি যেমন পাইয়াছি, ঠিক সেভাবেই দিলাম—সঙ্গীতজ্ঞ পাঠক অবশ্য দেখিলেই বুঝিবেন, কোন্ স্বরটি কোন্ গ্রামের—বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খাতাটি অতি পুরাতন এবং লেখাগুলি অধিকাংশই পেন্সিলের। সেজন্য এখনো আমরা সব অংশ ঠিক মত পড়িতে পারিয়াছি বলিয়া নিঃসন্দেহ নই, বিশেষ করিয়া হিন্দী গানগুলির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লইয়াও এখনো নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যে সব অংশে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে তাহার পার্শ্বে (?) এরূপ চিহ্ন, এবং যে অংশগুলি পড়িতেই পারি নাই সেখানে (…) এরূপ চিহ্ন দেওয়া রহিল। যদি কোন অভিজ্ঞ পাঠক আমাদের সন্দেহস্থলগুলির উপর আলোকসম্পাত করিতে পারেন—যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিক কিনা এবং ভুল হইলে যথার্থ শব্দগুলি কি তাহা আমাদের লিখিয়া জানাইয়া দেন, আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব এবং প্রয়োজন মতো ভ্রম সংশোধন করিয়া লইব—অবশ্য মূল খাতার সহিত আবার মিলাইয়া দেখিয়া।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে গাহিয়া শুনাইয়াছেন এরূপ যে-সব গান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' পাওয়া যায় তাহার কয়েকটি স্বামীজীর এই গানের খাতায় রহিয়াছে; অপরে গাহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইয়াছেন এরূপ কয়েকটি গানও আছে। এই সব গানগুলির এবং স্বামীজীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট 'সঙ্গীত-কল্পতরু'তে এই খাতার যে গানগুলি পাওয়া যায় সেগুলিরও উল্লেখ যথাস্থানে পাদটীকায় করা হইল। ইহা ছাড়াও, প্রচলিত দু-একটি গানের উল্লেখও প্রয়োজনবোধে পাদটীকায় করা হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—২৫

[সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী।
ভজলে অযোধ্যানাথ দোসরা না কোই॥
হসন বোলন চতুর চাল, অয়ন বয়ন দৃগ বিশাল,
ভ্রুকুটি কুটিল তিলক ভাল, নাসিকা সোহায়ী॥][1]

ঝিঁঝিট

ধ্‌প পপপ মপধা পমাগ পপ ধধ ধধ ধনি ধনিসা—
সী তাপতি রা— মচন্দ্র রঘু পতি রঘু রা— য়ী——

সা সা সা— সা সা সা। সা রে সা—সা নী নি ধা—ধ ধ´নি ধনি্সা—
ভ জ লে অ যো ধ্যা না— — থ দো স রা না কো——ই
ভ্রু কু টি কু টি ল তি ল ক ভা ল না সি কা সো হা - —য়ী—

পপ পধা পধা নি´নি নি নী—নি সা সা নি্‌ সা রে´রে সা সা সা নী—
হ স ন বো—ল ন চ তু র চা—ল অ য় ন ব য় ন দৃ গ বি শাল—

পৃষ্ঠা—২৬

[পটু তরে (?) কোন্ নায়ে (?) হু তোরা
তু সুরজ্ঞান মউমদ (?) চতুর বাল যুআ।
হুঁ ঠট্টত (?) রিঝে তুআ কাঁহা ভইলে বা
সদা রংগ রিঝে—আলম—॥]

(............)

সা রে গা—মা গমা —গমপা —নি্নি্—ধপ মপা—গা রে´গ রেগ রে—সারেসাসা
প টু ত—রে এএ এএ কোন্ না———য়ে এএ হু তো ওরা আ—আআআআ

সা—নি সা ধা — সা রে´প্প ম গ রে — রেগপ ম ম গমপা—
তু উ উ উ সু র জ্ঞা আআআ আআআ আআ আ আ ন অ

[1] গানটি 'সঙ্গীত কল্পতরু'তে (৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩১) এভাবে রহিয়াছে :
[রাগ—ভৈরব, তাল একতালা] সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাই। রসনা রস নাম লেত সন্তান্‌কো দরশ দেত/বিহসিত মুখ চন্দ্র মন্দ্র সুসর সুখদাই। দশন দমক চঁওর চাল, অয়ন বয়ন দৃগ বিশাল/ভ্রুকুটি মন অদন পায় নাশিকা সুহাই॥ কেশর কো তিলক ভাল, মানুঁ রবি প্রাতঃকাল,/শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত রতিপতি সবিশাই। গলমে শোভে মোতি মাল, তারাগণ উরু-বিশাল/মানুঁ গিরি সের উপায় সুর সর চলি আই॥ শ্যামরো ত্রিভঙ্গ অঙ্গ কাছ নিকট/কাজনি খঞ্জ মানুহু সারা কি দবি/আপহি বলাই।/ সখা সহিত সরযূতীর, বৈঠে রঘুবংশ বীর/হরখ নিরখ তুলসীদাস চরণ রজ পাই।—তুলসীদাস

প ধ পধনি ধ নিসা র্সা—নিধধপ প প র্ম প র্ম প গ সা রে গা-পাধপ মমগা ধপ
ম উ মঅদ অঅঅ অ অ অঅ অ চ তু র অ অ অ—বা ল যু আ———

গ—ম পা—পা—ধনিসা—সা নিসরেসা নিসা—ধ নি সা রে সা—নিসা—ধ-প—
হুঁ ঠ ট্ট ত—রি—–ঝে তু আ—— কাঁ হা ভ ই—লে—বা আ আ আ—

প-মপা রেগরে সারেগরেসা—সারেসম্পপর্গমাগমপ—পপ পধ—পধনি ধনিসা—
স দাআ আআ ——রং——গ————————রি ঝে এ——এ——

রেসা নিধপ—রেগারেগা রে সারেগরেসাসা

আ———লম——————————————

পৃষ্ঠা—২৭

[এক পয়ান[২] ছন কবহুঁ না বেসর যা।
লালন নেত নয়ন আগে ঠাড় রহে॥]

বিস্মৃত

*ক্ষণ

ধ ধ পা মপধপম—গমা—মাপ — মপমপধা—প মপগা—রেগ রেগ সা রে গমা
এ ক প যাযাআন-অঅ—*ছন ক-ব-—হুঁ উউ না আ—আ——বে সর

গ ম গর্মপম গা রেগারে—সা | রে সসারে গ-ম গমপমস—রেগরে সা
অ অ অ— যা ———যা | লা— ল ন অ—— —নে ত (নিত্য)

ধা প্ ধা নী— সা নি সা-সা—ধা-নি সা নিসারেস্া নিধপ্প— | —
ন য় ননআ আ আ—গে ঠা আ ড় র——হে————

পৃষ্ঠা—২৮ [ফাঁকা]

পৃষ্ঠা—২৯

র ধে

সা—গগরে — সানি ধ নি সা — সারে গাম—ধা প্প ম গ ধা—নিনি ধধ পপ

মম গগরে গগরে সা নি ধা—নিসারেসা সা- গগরে etc. |—

মম ধধ পপ পম ধা—নিসা—নিসারে"—সা— সারেগগ

২ পয়ান—পয়ান<প্রয়াণ

স্বামী বিবেকানন্দের গানের খাতা : ২৬ পৃষ্ঠা

গম গগরেরে স সা—নি ধ—সানি ধপ্প মারেমা নিধা নি্সা—
রে সা।

পৃষ্ঠা—৩০

[নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ-হিল্লোলে
চিরশান্তি-পরিমল অবিরত যায় ভাসি ॥
মহাকাল রূপ ধরি আঁধার-বসন পরি
সমাধি-মন্দিরে মা গো কি কর়গো একা বসি ॥
অভয় চরণতলে প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি ॥][৩]

গ নি বাগেশ্রী কানেড়া

মমম মপা—মপা মা গা রে সা মমম মপধা পধনি ধনিসা
(1) নিবিড় আঁধা রেএ এ এ মা তর চমকে ও রূপ ও— ও–
(2) তাইযোগী ধ্যা— আ আ আ ন্ ধ রে হয়েগি রিগুহা–

র্রে সা নি ধ পধ পধনি ধপ— |
ও——— রা——শি ইই |
——— বা—— সী — |

৩ স্বরলিপিতে গানের লাইনগুলির পাশে যে চিহ্ন দেওয়া রহিয়াছে, তাহা অনুসরণ করিলে গানটির পঞ্চম হইতে অষ্টম লাইন পর্যন্ত এরূপ হয়: "মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি/অভয় চরণ তলে প্রেমের বিজলী জ্বলে/সমাধি মন্দিরে মাগো কি কর গো একা বসি। চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥" গানটির প্রচলিত রূপ—যাহা কথামৃতেও আছে, এবং অর্থের দিক দিয়াও যাহার সঙ্গতি আছে—আমরা তদনুযায়ী এখানে সাজাইয়া দিলাম; ইহাতে ৫, ৭, ৬, ৮ এভাবে সাজাইতে হইয়াছে। মনে হয় এই চিহ্নগুলি স্বামীজী দেন নাই, পরবর্তী কালে, গানটির লাইনগুলির বিন্যাস জানে না এরূপ কেহ, বোধ হয় মন্মথ বাবুর কন্যাই, এই চিহ্নগুলি বসাইয়াছেন।

(4)-এর পাশে link (1), এবং পরের লাইনে আগে (4) লিখিয়া কাটিয়া তাহার নীচে (৪) লেখায় এরূপ হইবার সম্ভাবনাই সমধিক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে গানটি যেরূপ দেখা যায়, তাহার সহিত এখানে কয়েকস্থলে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে: 'চমকে অরূপরাশি' স্থলে 'চমকে ও রূপরাশি'; 'অবিরল যায় ভাসি' স্থলে 'অবিরত যায় ভাসি'; এবং, 'ও মা কে তুমি গো একা বসি' স্থলে 'মা গো কি কর গো একা বসি'।

ম মা ধা ধ নিসা-নিসা-নিসা নিসারে —সানিসা—নিসারে—সা নি ধ প—
(3) অ ন স্ত আঁ ধাধ় কোলে- মহা নির্ব্বা——আ ন হি লো————লে এ এ এ
(6) অ ভ য় চ রণ তলে প্রেমে র বি ——ই জলি জলে————
Link (1) (4) চি র শা-স্তি পরি— মল অবিরত যায় ভা - — সি।
(8) চিন্ময় মু খ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হা— — সি

সা রে সা-নি সা-সা—রেগা রেগমপ ম প ম পা—মা গ রে সা—
(5) ম হা কা-ল রূ প ধ রি আঁধার ব স অ অ অ ন অ প রি
(7) স মা ধি ম ন্দি রে মাগো কিকরগো এ এ কা আ —— ব সি—৩

পৃষ্ঠা—৩১

[পরবত পাথার ব্যোমে জাগো
রুদ্র উদ্যত বাজ।][৪]

কানেড়া

নি সা নিসারে সা সা সা নি সা নি ধ নি ধ নি ধ নি ধ প
(1) প র অ— ব ত পা আ আ আ আ আ আ থা র
(3) রু উ উ উ— দ্র উ— দ্য————————————ত

নি সা রে - সা রে সা রে ম পা—ম গ র্গ র্গ র্গ র্গ গ ম — গরে—সা
(2) ব্যো — —ও— ——মে জা আ আ আ —————আ আ আ গো
(4) সা নি সারে
বা আ— — — — — — —জ। পর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে দেখা যায়, স্বামীজী এই গানটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বহুবার (১।১৮।১, ৩।১৫।৩, ৪।১৩।৫, ৫।১৬।১, ৫।১৬।২ ইত্যাদি) গাহিয়া শুনাইয়াছেন। স্বামীজীর মুখে যে কোন গান শুনিলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবস্থ হইয়া যাইতেন—"তোর গান শুনলে (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভেতর যিনি আছেন সাপের ন্যায় ফোঁস করে ফণা ধ'রে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন;" তবে এই বিশেষ গানটি স্বামীজী যখনই গাহিতেন, শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন।

৪ এই গান দুটিও স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গাহিয়া শুনাইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এই দুটি গান একত্র করিয়া একটি গানই আছে (৩।১৫।৩); খাতার ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত লাইন দুটির মধ্যে শব্দের সামান্য পার্থক্যও রহিয়াছে: পরবত পাথার। / ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ। / দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল,/ ধর্মরাজ শঙ্কর শিব তার হর পাপ।

পৃষ্ঠা—৩২

[দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল।
ধরমরাজ শংকর শিব তর হন পাপ ॥][৪]

কানেড়া

নী নি নী নি সা-সা সা সা নি সা রে রে গ-রে সা র্সা নি সা
দে ব দে ব ম হা দে ব কা — — ল কা-ল ম হা - কা ল

রে রে সা — নি ধ পা — ম ম গ গ রে রে
ধ র ম রা জ শং ক র শি ব ত র
ম প মপ মা র্গর্গ র্গর্গ গমগরেসা

হ অ পা প

পৃষ্ঠা—৩৩

(রামপ্রসাদ)

জাগ্ মা কুল কুণ্ডলি ইই নী—
(তুমি) নিত্যানন্দ অ স্বরূ উউ পিনী—প্রসুপ্তভুজগাকারা—আধারপদ্ম বা আ সিনী
ত্রিকোণে এ জ্বলে কৃশানু উ—তাপিত হ অ ইল অ তনু উ -
মূলাধা আ র ত্যজ অ শিবে এএএ স্বয়ম্ভু শিব বে এএ ষ্টিনী—
গচ্ছ সুষুম্নারি পথ অঅ স্বাধিষ্ঠান—হও অঅ অতীত—
মণিপুর অঅ অনাহত অঅঅ, বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চা রিনি—
শিরসী সহস্র দলে এ পরমশিবেতে এ মিলে—ক্রীড়া কর কুতুহলে
সচ্চিদানন্দ দায়িনী ইই

পৃষ্ঠা—৩৪

[ময় গোলাম্ ময় গোলাম্ ময় গোলাম্ তের।
তু দেবান্ তু দেবান্ তু দেবান্ মেরা ॥
তু দেবান্ মেহেরবান্ নাম তেরে মীরা।
আব্ কি বার দে দিদার মেহের কর্ ফকির ॥][৫]

স্বামীজী এদুটিকে পৃথক গান হিসাবেই খাতায় লিখিয়াছেন, একটি গানকেই দুই পৃষ্ঠায় লেখেন নাই। খাতায় কোন কোন গান অবশ্য দুই পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এক পৃষ্ঠায় সব ধরে নাই বলিয়াই দুই পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে; এখানে ৩১ ও ৩২ দুই পৃষ্ঠারই অর্ধেক ফাঁকা পড়িয়া আছে; তাছাড়া, যেখানে একই গান দুই পৃষ্ঠা জুড়িয়া লেখা, সেখানে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাথায় পৃথকভাবে সুরের উল্লেখও স্বামীজী করেন নাই।

৫ গানটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে (২। পরিশিষ্ট।২) আছে, বরাহনগর মঠে স্বামীজী গাহিতেছেন :

ভৈরবী খেমটা

মা- ম ম — গা - রেগ র্রেসা ধা নি সা রে´গ রে গ রে সা
ময় গোলাম্ ময় গো লা ম ম য়্ গোলা-ম তে — — র

ধা ধ প— মপ ধ নি ধপ—মা গ—রে সা রে ·গ মা গ-রে গ রে সা
তু দে বান্ তু উউউ উ দে বান্ তু উ দে বা ন্ - মে · — — রা

ধ প ধা নি নি সা নি সা রে গ রে সা নি ধ নি ধ নি ধপ ।
তু দে বান্ মে হের্ বান্ না আ আ ম তে রে মী — — · রা ।

ধ ধ ধ প—মপ র্ধ র্নি র্ধপ মর্গ রেসারে গমগ রে—গরে—সা
আব্ কি বা র দে — — দিদার মে হে র ক-র্ ফ কি র

পৃষ্ঠা—৩৫

[ওহে দিন যে গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা ডাকৃচি বারে বারে॥
শুনি, কড়ি নাই যার তুমি তারে কর পার,
আমি দিন-ভিখারী নাইক কড়ি দেখ থলি ঝেড়ে॥
আমি আগে এসে (ওহে) রইলাম বসে
যারা শেষে এলো চলে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥]

(............)

সা ধা পা—ম গ ধ ম—পা প্প ধা ধ পধনি সা সাসা প ধা নী ন্নী ধা ন পা(?)
ও হে দি ন্ যে গেল স ন্ধ্যা হ ল পা — —র ক র — আ মা রে

র্সা র্সা র্সারেরে—রে—রে রে সারেগম গরে সা সসা ধ নি ধ প
তু মি পারের্ ক র্ত্তা শু নে— বা —— র্ত্তা ডাকৃচি বা রে বারে

সা সা সা রে—সা রে—রে প্প প ম ম গ রে সা রে গ ম গ রে
শু নি ক ড়ি নাই যা র্ তু মি তা রে ক র পা — — — র

সা সা রে রে রে রে রে রে সারেগমরে সাসা ধ নি ধ প
আ মি দিন্ ভি খা-রি নাইক ক— —ড়ি দেখ থ লি ঝেড়ে

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা। তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥ দো রোটি এক লেঙ্গোটি, তেরে পাস ম্যয় পায়া। ভগতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাঁবা॥ তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ। অব্ কি বার দে দীদার মেহের কর ফকীরাঁ॥ তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া। দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া॥

আমি আগে এসে (ওহে) রইলাম বসে
যারা শেষে এলো চলে গেল—আমি রইলাম পড়ে।

পৃষ্ঠা—৩৬

[কে এলো কি ভাবে রথে করে।
ওলো একি জ্বালা, অবলা রাজবালা,
বুঝি ভুলায়ে বিদেশী নে যায় ধরে ॥]

টপ্পা   মালকোষ

০ ∧   ২ ∧   ৩
রে সা—নি ধ   ম গ গ   ম ধ   ধ নী   র্সা—
কে   এ লো   কিভাবে   র থে   ক   রে

১ ∧ ∧ ২   ৩
গ গ   ম ধ নী   সা   রে রে   সা—   নি নি নী—সা
ও লো   এ কি জ্বা—লা   অ   ব—লা   রা জ বা—লা

∧   ১∧ ∧   ২   ∧৩
ধ নি   সা গ গা — রে রে সা— নি সা নী —ধা—
বু ঝি   ভু লা য়ে — বি দে শী - নে যায়্ ধ — রে -

এখানে '০' '১' '২' প্রভৃতি চিহ্নগুলি কালিতে লেখা। কিছু পরিবর্তনও কালিতে আছে, যাহার মধ্যে বিন্যাসের পরিবর্তন হইল : 'নে যায় য় ধরে' স্থলে 'নে যায়্ ধ রে'। এই পৃষ্ঠার এবং পরের পৃষ্ঠারও (পৃঃ ৩৭) ডাইনে কোণার দিকে কালিতে টিক দেওয়াও আছে।

পৃষ্ঠা—৩৭

[বরজ কিশোরি হরি খেলত রংগে।
ঘোঁ ঘট ওঠমে বদন ছাপাওয়ত,
যে সে বারে বারে চাঁদ্ মেঘ ছিপায় ॥][৬]

ধামার   বসন্ত   4

মা মা মা—মা—গ ম পা^প —গা—ম   ধা—ধ নি   ধ নি সা—নি সা—
ব র জ   কি   শো   রি   হ   রি   খে—ল ত-রং — — গে

গ গ গা গ   রেগমগরে´সা   নি—ধ ধ   ধনিসা   নিসা—
ব র জ কি   শো—রি হ রি   খে ল ত   রং—   গে—

৬ 'সঙ্গীত-কল্পতরু'তে আছে (৩য় সং, পৃঃ ৫৭৬) : [দোল যাত্রা। রাগ বসন্ত।] বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে। চুয়া-চন্দন আবীর গোলাব দেয় ত শ্যামের অঙ্গে॥ ধ্রু॥ ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ফিরি বোলত রাই। ঘুং ঘট ওঠমে বয়ল ছাপাপত/ বেরি বেরি যেছে মেঘসে চাঁদ লুকাই॥ ললিতা এক সখী ফাগু হাতে করি দেয়ত কানু নয়ান। বৃকভানু কিশোরী দুহুঁ বাহু চুম্বত শ্যাম বয়ান॥ আওর এক সখী জীউ জীউ কারি কাঁতা লাগাও আবীরা। কমরী ফাগু লেই কানু নয়ান/ বেরি বেরি দেয়ত হাঁ হাঁ কবীরা॥—কবীর

ধা ধ র্নি সা—সা সা নি সা নিসারে—সা নি সা নি—ধা
ঘোঁ ঘ ট ও—ঠ মে ব দ ন — —ছা পা ও য় ত

ধ নি সা মা মম ম গমপমগ রে সা নী ধ ধ ধ নি ধ নি সা—
যে সে বা —রে বা রে — — চাঁ দ্ মে এ ঘ ছি পা য় —

৭—৩৮

[কোথা ওহে তরুণ তপন / কাঁদাইয়ে কমলিনী করিছ গমন ॥
যতেক তাপস-সুতা করে ধরি বনলতা / যামিনীরে করে আবাহন ॥]

টপ্পা শ্রীরাগ রে ম ধ

সা রে গ মপ ম প ধ পধা প ম গ রে সা সা সা পা পা ম প ধা পমগ
কো থা ও হে ত রু ণ অ অ ত প অ অ ন | কাঁ দা ই য়ে ক ম — লি নি

গ ম প ধা পপ ম গ রে সা ॥
ক রি ছ গ ম — — ন

গ গ প ধা পধনিসা নি সা সা সা সা সা নিসারে—সানিধপ প প প ম মপধা
য তে ক তা প — — স সু তা ক রে ধ রি ব ন — — — লতা। যামিনীরে করেআ—

প ম গা রে সা ॥
বা — হ — ন ॥

অস্তি—অসি—অস্মি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

অস্তি—আছে। অসি—আছ। অস্মি—আছি। কি আছে? টেবিলটা আছে, গ্লাসটা আছে, ঐ ঘরটি আছে, ঘরের মধ্যে লোকজন আছে, ঘরের বাহিরে বাগান আছে, বাগানে গাছ, লতা, ফুল আছে; মাথার উপর আকাশ আছে; মাটি আছে, জল আছে, বায়ু আছে, সূর্য-চন্দ্র-তারা আছে; নিকটের বস্তু আছে, দূরের বস্তুও আছে; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ আছে; স্থূল আছে, সূক্ষ্ম আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে; যাহা বুঝিতে পারি তাহা আছে, যাহা বুঝিতে পারি না তাহাও আছে; ক্ষুদ্র আছে, বৃহৎ আছে; জড় আছে, চেতন আছে। কি আছে তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। যে দিকে চাই—দেখি আছে, আছে, আছে। শুনিতে পাই—আছে, আছে, আছে। স্পর্শ করি—আছে, আছে, আছে। ঘ্রাণে আসে—আছে, আছে, আছে। আস্বাদ করি—আছে, আছে, আছে। কত কি যে আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ভাবিতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করে। ভিতরে বাহিরে আমরা

অনুক্ষণ অস্তি দিয়া পরিবৃত।

অস্তি-র মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যখন তাহার সহিত কথা বলিতে যাই, তখন সে প্রথম পুরুষ হইতে মধ্যম পুরুষে রূপান্তরিত হয়। অস্তি তখন হয় 'অসি'—আছ। হে নদী, তুমি আছ; হে শৈল, তোমাকে দেখিতেছি; হে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র তোমরা আছ এবং আলো দিতেছ; হে ভগবান, তুমি সর্বত্র রহিয়াছ।

অস্তি-কে যখন নিজের সহিত যুক্ত করি তখন অস্তি-র রূপ 'অস্মি'—আছি। আমি আমাকে যত কিছুর সহিত যতভাবে জড়াইয়া ফেলি 'আছি'-ও অনুরূপভাবে বদলাইয়া যায়। 'আমি দাঁড়াইয়া আছি', 'শুইয়া আছি', 'আমি কোট পরিয়া আছি', 'আমি ক্ষুধার্ত', 'আমি বাঙালী', 'আমি মাঘ মাসে পল্লীগ্রামে রহিয়াছি'—এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটি 'আছি'-কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করিতেছে। দাঁড়াইয়া থাকা আর কোট পরিয়া থাকা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা। আমি বাঙালী আর আমি ক্ষুধার্ত—আমার এই দুটি বিশেষণ পরস্পর আলাদা।

অস্তি-অসি-অস্মি-র একটি বা একাধিক অভিব্যক্তি সর্বদাই আমাদের অনুভবকে স্পর্শ করিতেছে। 'পাঁচটা বাজিল, তুমি বাড়ী যাও, আমি একটু খবরের কাগজ পড়িব'—এখানে প্রথম-মধ্যম-উত্তম তিন পুরুষেরই অস্তিত্ব বিঘোষিত। 'তুমি গাও, আমি বাজাই'—এখানে শুধু মধ্যম ও উত্তম। 'আমি ছেলেটিকে দেখিতেছি'—এস্থলে শুধু উত্তম ও প্রথম পুরুষ।

সে আছে, তুমি আছ, আমি আছি—এই তিন অনুভবের মধ্যে সাধারণ সত্যটি কি? থাকা—অস্তিত্ব—উপনিষদের ভাষায় সৎ। ইহা একটা কথার কথা নয়—সর্বজন-প্রত্যক্ষ সত্য। প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ অনবরত বদলাইতেছে—কিন্তু এই তিন পুরুষের অধিষ্ঠান সৎ অপরিবর্তনীয়। রঙ্গমঞ্চে নট-নটীরা পর পর আসিতেছে, তাহাদের ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চটি যেমন তেমনই অবিক্রিয় দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক সেই-রূপ—অনাদি অনন্ত অপরিমেয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মে প্রথম পুরুষের যাবতীয় আকার, মধ্যম পুরুষের অসংখ্য অভিব্যক্তি এবং উত্তম পুরুষের অগণিত ব্যঞ্জনা মাথা তুলিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, জল মাটি বায়ু আলোক, বৃক্ষ লতা বন প্রান্তর, পশু পক্ষী নর নারী— ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে সৎ দাঁড়াইয়া, 'সূর্য আছে', 'চন্দ্র আছে' না বলিয়া আমাদের বলা উচিত অনাম অরূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সূর্য নাম-রূপ, চন্দ্র নাম-রূপ দেখা দিতেছে। আগে সৎ, তাহার পর সূর্য চন্দ্র; যেমন আগে রঙ্গমঞ্চ, তাহার পর নট-নটীর অভিনয়।

মধ্যম পুরুষ, তোমার অসংখ্য অভিব্যক্তিও সৎস্বরূপকে অবলম্বন করিয়া। তুমি সূর্য, তুমি চন্দ্র, তুমি পর্বত, তুমি নদী, তুমি পুরুষ, তুমি নারী, তুমি সুন্দর, তুমি কুৎসিত এই অসংখ্য পরিবর্তনশীল তুমি-র পশ্চাতে অপরিবর্তনীয় যে তুমি রহিয়াছ, তাহাই সৎ। সেই সত্তায় আর মধ্যম পুরুষ নাই। মধ্যম পুরুষের নাম-রূপ সরাইয়া দিলে যাহা থাকে তাহা সৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

অনুরূপ প্রণালীতে উত্তম পুরুষের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তির পিছনে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন তিনিও সৎস্বরূপ ব্রহ্মই। অস্তি-অসি-অস্মির ভেদ তুলিয়া দিলে সদ্‌ঘন পরব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন। তিনিই সর্বকারণ, সর্বাশ্রয় সর্বলক্ষ্য। সেই সৎস্বরূপকে জানিতে পারিলে সকল সংশয়, মোহ, ভয়, বন্ধন বিদূরিত হয়। সৎস্বরূপের সহিত তাদাত্ম্যজ্ঞানের নামই মুক্তি।

খণ্ড খণ্ড অস্তিত্বে আমরা বাঁধা পড়িয়াছি বলিয়া অখণ্ড সৎ-কে ধরিতে পারি না।

সেই অস্তি-অসি-অস্মির সীমামুক্ত অনন্ত সত্তা সর্বদাই তোমার আমার সকলের ভিতরে বাহিরে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছেন। শাস্ত্র এবং তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিগণের অনুভূতির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আনিয়া আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিকে বদলাইতে হইবে। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃপ্রকাশ তাহা নাম-রূপের আবরণ দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছেন। ঐ আবরণকে চেষ্টা করিয়া সরাইয়া দিতে হইবে। ইহা সুকঠিন ব্যাপার নয়। জন্মজন্মান্তর আমরা ভুল সংস্কারবশে নাম-রূপকেই যথাসর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। নূতন অভ্যাস সাধিয়া নাম-রূপকে যিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মাইতে হইবে। কঠোপনিষদ বলিতেছেন—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। (১।২।২৩)—"যিনি আত্মসত্যকে প্রেমের দ্বারা বরণ করেন, আত্ম-সত্য তাঁহার নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।" আত্মসত্য কি? অস্তি-অসি-অস্মি—এই তিন অনুভবের পশ্চাতে ত্রয়-মুক্ত অসীম সত্তা। উহা কল্পনা নয়, শূন্য নয়। প্রগাঢ় সত্য, সকল অনুভবে অনুস্যূত

উপনিষদ এই সকল বেদবাক্য অভ্যাস করিতে বলিতেছেন: (১) অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) আমি পুরুষ নই, নারী নই, দাঁড়াইয়া নাই, শুইয়াও নাই, সুখী নই, দুঃখীও নই—আমি ব্রহ্ম—সকল পরিচয়ের পশ্চাতে যে অখণ্ড জন্মহীন ক্ষয়হীন বৃহৎ অস্তিত্ব বর্তমান সেই অমৃতত্ব। (২) তৎ ত্বমসি (ছান্দোগ্য উপনিষদ)—তুমি পুরুষ নও, নারী নও, হাতী নও, ঘোড়া নও, অসংখ্য নাম-রূপের কোনটাই নও—সকল নাম-রূপ যাঁহাতে দাঁড়াইয়া সেই নামহীন আকারহীন সীমাহীন সৎস্বরূপ ব্রহ্ম। (৩) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ)—যাহা কিছু এই এই ঐ ঐ বলিয়া দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ-ঘ্রাণ-আস্বাদ করিতেছ, মন দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেই অনন্ত অস্তিত্ব—ব্রহ্ম। (৪) নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (কঠোপনিষদ) এই জগৎ সংসারে যে বহুত্ব প্রতীয়মান হইতেছে, সত্য দৃষ্টিতে তাহা নাই। পরম সত্য এক অবিভক্ত সর্বাবগাহী সত্তা।

অতিপ্রত্যূষে অথবা গভীর রাত্রে যখন বিশ্ব-প্রকৃতি স্বভাবতই নিঝুম তখন ঐ বেদবাক্যগুলির অনুধ্যান অপেক্ষাকৃত সহজ। অস্তি-অসি-অস্মির ত্রিধারাকে ধীরে ধীরে সরাইয়া নিগূঢ় নিরাকার অস্তিত্বে মনকে ডুবাইয়া দিতে হয়। ভয় পাইবার কিছু নাই, সংশয় উঠাইবারও কিছু নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি গাহিতেছেন—

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো
মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ॥ ৪।৪।৮

"অতিসূক্ষ্ম বহুপ্রসারিত সনাতন জ্ঞানালোকদীপ্ত পথ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। উহাকে চিনিয়াছি। এই পথ ধরিয়া যুগে যুগে বহু ব্রহ্মবিদ্ সংসারের অজ্ঞান মোহ হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন।"

অস্তি-অসি-অস্মিকে যখন চিনি নাই, তখন তাহারা কত ভাবে যে আমাকে বিপর্যস্ত করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আনে ভয়, আনে মোহ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। বিচার দ্বারা, তত্ত্বানুশীলন দ্বারা ঐ ত্রয়ের স্বরূপকে ধরিতে পারিলে সকল সন্দেহের মীমাংসা হয়। নির্বাসিত তখন ঘরে ফিরিয়া যায়, সর্বহারা তখন সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়।

'মামেকং শরণং ব্রজ'

ডক্টর রমা চৌধুরী*

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইভাবে বলা আছে—

'ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অমুকযোগো নাম অমুকোঽধ্যায়ঃ।'

অর্থাৎ—'ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে 'অমুক যোগ' নামক অমুক অধ্যায় সমাপ্ত।'

এরূপে, সর্বজনপূজ্য 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' কেবল নামতঃ 'স্মৃতি'-পদবাচ্য। 'শ্রুতি'-পদবাচ্য না হলেও, কার্যতঃ, স্বরূপতঃ, সর্বতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শ্রুতিতুল্য সম্মাননীয় কারণ যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি বেদোপনিষদের সারমর্ম জগতে অতুলনীয় এই মহাগ্রন্থে নিবদ্ধ করা হয়েছে অতি সহজ-সরল-সুমধুর-মর্মস্পর্শী ভাবে। সেজন্য, স্বয়ং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেই এইভাবে তাকে 'উপনিষদ', 'ব্রহ্মবিদ্যা','যোগশাস্ত্র' প্রমুখ সুন্দর সুন্দর ভাবগর্ভ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ গীতাতে ভারতীয় দর্শন-ধর্ম নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্বসমূহ নানা ভাবে, নানা রঙে রসে গন্ধে, নানা সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে, নানা সাফল্যে সৌভাগ্যে সৌকর্যে, নানা আলোকে অমৃতে আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠেছে অপরূপ-অনুপম-অত্যাশ্চর্য মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়। যেমন, এই দিব্য গ্রন্থে আছে 'সাংখ্যযোগ' 'কর্মযোগ' 'জ্ঞান-যোগ' 'সন্ন্যাসযোগ' 'ধ্যানযোগ' 'জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ' 'অক্ষরব্রহ্মযোগ' 'রাজযোগ' 'বিভূতি-যোগ' 'ভক্তিযোগ' 'মোক্ষযোগ' প্রমুখ বিবিধ নিগূঢ় বিষয়ে বিস্তৃত প্রপঞ্চনা। তাহলে শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতার চরমা পরমা কথা কি? শ্রীভগবান্ নিজেই গীতার শেষ অধ্যায়ে একেবারে শেষের দিকে ছ'টী শ্লোকে সেই কথা বলেছেন এই ভাবে—(১৮।৬১-৬৬)

'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি
শাশ্বতম্॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে
হিতম্॥

* প্রাক্তন উপাচার্যা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি—(১) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত, (২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাচার্যা এবং (৩) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের সদস্যা।

ইনি কুড়িটির অধিক আধুনিক সংস্কৃত নাটিকা রচনা করিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঐগুলির অভিনয় পরিচালনা করিয়া ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী রহিয়াছেন। দর্শন বিষয়ক ইঁহার মূল্যবান প্রকাশনগুলিও উল্লেখযোগ্য।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'
'ঈশ্বর, অর্জুন, সর্বভূতের বিরাজেন হৃদ্দেশে।
মায়ায় তাদের যন্ত্রারূঢ়বৎ চালিয়ে নিঃশেষে॥
তাঁরই শরণ লও তুমি আজ, ভারত,
সর্বতোভাবে।
তাঁরই প্রসাদে পরমা শান্তি শাশ্বত স্থান পাবে॥
কহি তোমা আজ জ্ঞানের কথা গুহ্য থেকে
গুহ্যতর।
নিঃশেষে তা' বিচার করে', যথা ইচ্ছা তথা কর॥
শোন, পুনরায়, সর্বগুহ্যতম আমারি বাক্য পরম।
অতি প্রিয় তুমি, তাই বলি তোমা হিতকর
যা চরম॥
মন্মনা হও, মদ্ভক্ত তথা, কর মোরে পূজা
নমস্কার।
অতি প্রিয় তুমি, প্রতিজ্ঞা করি পাবে মোরে
তথা অনিবার॥
সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে' তুমি আমারি শরণ লও।
মুক্ত করব তোমা সর্বপাপ থেকে, শোকাকুল
কেন হও॥'

এই ছয়টি শ্লোকে রয়েছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একেবারে শেষ কথা—চরমা ও পরমা কথা। গীতাগ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হবার পূর্বের অবশিষ্ট কয়েকটী শ্লোকে (১৮।৬৭-৭৮), গীতা-শ্রবণের অধিকারী, গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যার ফল, প্রভৃতি অন্য বিষয়ে বলা হয়েছে—গীতার প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে একেবারেই নয়। সেজন্য উপরের ছয়টি শ্লোক দৃশ্যতঃ এবং অর্থতঃ উভয় দিক্‌ থেকেই সুবৃহৎ ও সুনিগূঢ় গীতাগ্রন্থের পরি-সমাপ্তি কারণ, স্বয়ং শ্রীভগবানই এস্থলে, একবার নয়, দুবার "গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্" (১৮।৬৩), এবং "সর্বগুহ্যতম" (১।৬৪)—এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা' থেকে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে, এস্থলেই গীতার বিবিধ বিস্তৃত উপদেশাবলীর উপসংহার করা হয়েছে—সে সবের সারমর্ম উদ্ধৃত ক'রে।

সেই সারমর্ম কি? সেই সারমর্ম এক কথায়—'প্রপত্তি'—ভারতীয় সাধনতত্ত্বের একটি শ্রেষ্ঠসাধন। ভারতীয় দর্শনে পঞ্চসাধনের কথা বলা হয়েছে—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, প্রপত্তি এবং গুরূপসত্তি। 'প্রপত্তি'র অর্থ হল—ঈশ্বরে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ; 'গুরূপসত্তি'র অর্থ হল—গুরুতে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। সেজন্য সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, 'জ্ঞান', 'ভক্তি' ও 'কর্ম' আত্মনির্ভরশীল সবল মুমুক্ষুগণের এবং 'প্রপত্তি' ও 'গুরূপসত্তি' পরনির্ভরশীল দুর্বল মুমুক্ষু-গণের সাধন। অর্থাৎ, যাঁরা নিজেদের গুণ-শক্তিতে আস্থাশীল, তাঁরা স্বপ্রচেষ্টায় 'জ্ঞান' 'ভক্তি', 'কর্মে'র কঠিন, দুর্গম পন্থা অবলম্বন করবেন সাহসভরে, সেই অতি বিপজ্জনক, শাণিত ক্ষুরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ সাধনপথ, যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে—

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'
কঠোপনিষদ, (১।৩।১৪)

'শাণিত ক্ষুরসম মোক্ষপথ দুর্গম
বলেছেন মুনিঋষিগণ।'

অপরপক্ষে যে-সকল মুমুক্ষুর নিজেদের গুণশক্তির প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, তাঁরা স্বভাবতঃই অপর কোনো শ্রেষ্ঠ জনের সাহায্য এবং আশ্রয় ভিক্ষা করেন মোক্ষলাভের আশায়। কে সেই শ্রেষ্ঠ জন? প্রথমতঃ, পরমেশ্বর। আমরা নিজেরা যদি না পারি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন লাভ করতে, তাহলে শ্রীভগবানের কৃপাই ত আমাদের একমাত্র ভরসা

—কারণ, তখন আমরা স্বভাবতঃই তাঁরই করুণা ভিক্ষা ক'রে, তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে নিজেদের নিবেদিত ক'রে দিই এই বলে—

'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥'

'ধর্ম জানি, তবু না হই প্রবৃত্ত।
অধর্ম জানি, তবু না হই নিবৃত্ত ॥
তেমনি করি আমি, হৃদিস্থিত হৃষীকেশ!
যেমনি তুমি মোরে কর নিযুক্ত ॥'

'ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।'

'জানি না দান, জানি না ধ্যান,
জানি না তন্ত্র, মন্ত্র, স্তোত্র।
জানি না পূজা, জানি না সন্ন্যাস,
তুমিই গতি, ভবানি! সর্বত্র ॥'

পক্ষান্তরে, যাঁরা এমন কি শ্রীভগবানের নিকটও এরূপ সাক্ষাৎভাবে উপনীত হ'তে পারেন না, তাঁদের শেষ ভরসা পৃথিবীতে শ্রীভগবানের মূর্ত প্রতিচ্ছবি শ্রীগুরু, এবং তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে তাঁরা নিজেদের সমর্পণ ক'রে দেন, যাতে তিনিই স্বয়ং তাঁদের হস্তধারণ ক'রে মোক্ষপথে নিয়ে যেতে পারেন সস্নেহে—এব তখন এই হয় তাঁদের জীবন-মন্ত্র—

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥'
'গুরুই ব্রহ্মা গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেব মহেশ্বর।
গুরুই পরব্রহ্ম, সেই গুরুকেই নমি নিরন্তর ॥'

এরই নাম 'গুরূপসত্তি', যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

এস্থলে, স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে যে, 'প্রপত্তি'-সাধনের প্রকৃত অর্থ কি কেবলই অলসতা, নিশ্চেষ্টতা, কর্মহীনতা, নির্জীবতা, উৎসাহহীনতা, পরনির্ভরশীলতা? কেবলই শ্রীভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে নিজে কিছুই না করা? কিন্তু তাহলে, এরূপ নিস্তেজ সাধন কিরূপে গীতার লক্ষ্য হতে পারে?—বিশেষ ক'রে স্বয়ং গীতাতেই যখন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে—

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥'
(গীতা, ৬।৫)

'নিজেই নিজের উদ্ধার কর,
করো না আত্মায় অবসন্ন।
আত্মাই আত্মার বন্ধু পরম,
আত্মাই আত্মার শত্রু ভীষণ ॥'

কিন্তু প্রকৃতকল্পে, প্রপত্তি-সাধন যে কর্মত্যাগের দ্যোতক নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত, তা তার স্বরূপ সামান্যমাত্রও বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

স্বরূপতঃ, প্রপত্তির ছয়টি অঙ্গ, যথা—(১) আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ; (২ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্; (৩) রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ; ৪) গোপ্তৃত্ব-বরণম্; ৫) কার্পণ্যম্; (৬) আত্মনিক্ষেপঃ। অর্থাৎ, (১) পৃথিবীর সকলেই সেই একই পরব্রহ্মের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, এই স্থির উপলব্ধি ক'রে সকলের সঙ্গেই নিগূঢ়তম প্রীতি ও মৈত্রীর সুদৃঢ়, অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া; তাঁদের সর্ব প্রাণ মন জীবন দিয়ে সেবা ও পূজা করা; এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সমগ্র জীবনোৎসর্গ করা। (২) এই সকল উচ্চ, উৎকৃষ্ট, পবিত্র ভাবের বিপরীত সমস্ত ভাবই নিঃশেষে বর্জন করা। অর্থাৎ, হিংসা, দ্বেষ, অনিষ্টাচরণ, অমঙ্গল-ভাবনা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। (৩) রক্ষাকর্তৃরূপে একমাত্র শ্রীভগবানকেই বিশ্বাস করা। (৪) একমাত্র

শ্রীভগবানকেই রক্ষাকর্তৃরূপে বরণ এবং পূজা করা। (৫) সঙ্কীর্ণ অহঙ্কার অর্থাৎ 'অহং-মম' ভাবের নাগপাশ থেকে শাশ্বত এবং পরিপূর্ণ ভাবে মুক্তিলাভ করা। (৬) শ্রীভগবানে সানন্দে সাগ্রহে, সকল সংশয় ত্যাগ ক'রে আত্মসমর্পণ করা—নিজের ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' ধ্বংস ক'রে। এইটিই প্রপত্তির মূল অঙ্গ।

এই থেকে অতি সহজেই প্রতীত হবে যে, প্রপত্তি-মার্গে নিষ্কাম কর্মের স্থান কেন্দ্রীভূত। অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরমপ্রসাদ লাভ করতে হলে, সাধককে পূর্বে সর্বতোভাবে তার উপযুক্ত হতে হবে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ভক্তি নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে অহরহ। নতুবা, অযোগ্য পাত্রে তাঁর দিব্যালোক উদ্ভাসিত হবে কিরূপে, তাঁর আনন্দবাণী রণিত হবে কিরূপে, তাঁর অমৃতরস সিঞ্চিত হবে কিরূপে? সেজন্য, শ্রীভগবানের কৃপা সাধককে স্বপ্রচেষ্টায় অর্জন করতে হবে সগৌরবে – জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের মাধ্যমে। কিন্তু তাহলে, পুনরায় 'প্রপত্তি'র কি প্রয়োজন? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, এবং গীতাতেই সেই কথাই স্পষ্টতমভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। জ্ঞান চাই, ভক্তি চাই, নিষ্কাম কর্ম চাই—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত 'অহং-মম' ভাব নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে তাঁর পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন ক'রে দিতে হবে গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে—সঙ্গে থাকবে অবশ্য অন্য সবই পূর্ববৎ, কেবল সঙ্কীর্ণ অহঙ্কার থাকবে না একেবারেই—জ্ঞান থাকবে, ভক্তি থাকবে, নিষ্কাম কর্ম থাকবে সবই থাকবে, থাকবে না কেবল সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য, থাকবে না কেবল সদম্ভ ব্যক্তিত্ব, থাকবে না কেবল সকাম স্বার্থপরতা। সুতরাং 'প্রপত্তি' অলসতা নয়, কর্মহীনতা নয়, উৎসাহহীনতা নয়, নির্জীবতা নয়, দুর্বলতা নয়, পরনির্ভরশীলতা নয়—উপরন্তু ভক্তি-নিষ্কামকর্ম-সমম্বিত অতি পরিশ্রমী, অতি উদ্যোগী, অতি কর্মব্যস্ত জীবন—কিন্তু সেই একটিই মূলীভূত কথা বার বার এসে পড়ছে—ঈশ্বরে সমস্ত কিছুই সমর্পণ ক'রে দিতে হবে নিঃশেষে শেষ পর্যন্ত—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'
(গীতা, ৯।২৭)

'যা কর তুমি, যা কর আহার, যা কর হোম, যা কর দান, যা কর তপস্যা, হে কৌন্তেয়, সব কর মোরে সমর্পণ॥' পুনরায় একেবারে শেষের দিকে, বলা হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে—

'সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥'
(গীতা ১৮।৫৬)

'সদা সর্বকর্মকারিজনও লভেন শাশ্বত পদ
অব্যয়।
আমারি প্রসাদে, যদি তিনি মোরে অর্পণ
করেন কর্মচয়॥'

এস্থলে অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে, নিষ্কামকর্মকরণ এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পরস্পর-বিরোধী ত নয়ই, বরং পরস্পরাশ্রয়ী – যেহেতু নিষ্কামকর্মকরণের অর্থই হ'ল ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ— কেবল সকামকর্মকরণই ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে—সে বাধা আমাদেরই তথাকথিত 'অহং-মম' ভাব, আমাদেরই নিষ্ফল আস্ফালন, আমাদেরই শূন্য-গর্ভ দম্ভ, আমাদেরই দুর্বুদ্ধিপ্রসূত দুঃসাহস। এ অতি সাধারণ ব্যাপার, এবং এই অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হয়েই আমরা প্রায় সকলেই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বে আবদ্ধ হয়ে, ভূমা মহানের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হই। এই কারণেই পরমকরুণাময় শ্রীভগবান শ্রীমুখনিঃসৃত গীতাতে বলেছেন যে, প্রপত্তিই হল সকল সাধনের পরম ও চরম

রূপ—কারণ, জ্ঞানই হোক, ভক্তিই হোক, নিষ্কাম কর্মই হোক শেষ পর্যন্ত সকলকেই সেই একই প্রপত্তিতেই পরিপূর্তি, পরিপুষ্টি, পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে।

বিশ্বালোকস্বরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের সমগ্র দিব্য জীবন দিয়ে গীতার এই মহাতত্ত্বই প্রকাশিত-প্রমাণিত ক'রে গিয়েছেন যে, সংসারের শত সহস্র কর্মের মধ্যেও, শত সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও, শত সহস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও মোক্ষ লাভ সকলের পক্ষেই সম্ভবপর—যদি এইভাবে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই স্বয়ং ব্রহ্মের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে গণ্য ক'রে সকল পার্থিব বাসনা-কামনা, সকল সঙ্কীর্ণ গর্ব-ঔদ্ধত্য, সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব—অহং-মম ভাব ত্যাগ ক'রে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরম-করুণাময় পরমেশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ক'রে, তাঁরা স্বপ্রচেষ্টায় ইষ্টপথে অগ্রসর হন, নিজেদের 'জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'রূপে, শ্রীভগবানের পূজার অর্ঘ্যরূপে গণ্য ক'রে গভীরতম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

পরমকরুণাময়ী, ভক্তবৎসলা, দীনতারিণী শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর অশেষ স্নেহবিগলিত, অনন্তকরুণাপূত, অজস্রাশীর্বাদপূরিত, সেই অমৃতময়-আনন্দময়-আলোকময়, অপরূপ-অনুপম-অত্যাশ্চর্য, রমণীয়-রসঘন-রোমাঞ্চকর প্রপত্তি-বাণী, আশ্বাস-বাণী, আশা-বাণী, আনন্দ-বাণী, মোক্ষ-বাণী আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক চিরকাল—এই প্রার্থনা।

'মা, সাধন-ভজন কিছু হয়ে উঠছে না।

মা—তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয়, আমি করবো।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার কিছু করতে হবে না ?

মা—না।

আমি—তবে এখন হতে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি আমার নিজ কৃত কর্মের উপর নির্ভর করে না ?

মা—না, তুমি কি করবে ? যা করতে হয়, আমি করবো।

শ্রীশ্রীমায়ের এই অহেতুকী কৃপায় আমি নির্বাক হইলাম।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

নির্বাক হলাম আমরাও। কিন্তু যে নিগূঢ়তম সত্য, মধুরতম রস, স্নিগ্ধতম স্নেহ এই অমৃতময়ী বাণীর মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে, তা যেন আজ আমরা গভীরতম কৃতজ্ঞতা, পবিত্রতম শ্রদ্ধা, প্রগাঢ়তম ভক্তি এবং প্রসন্নতম প্রীতির সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি। তাহলেই আমাদের জীবন ধন্যাতিধন্য হবে, এবং মোক্ষ লাভও হবে সহজতর।

"ভগবানলাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে, আমার জপ-তপের উপর নহে—এই বিশ্বাস, এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা একান্ত আবশ্যক। সাধন-ভজন কেবল ডানা-বেদনা করিবার জন্য। ডানা-বেদনা হইলেই বসিবার ইচ্ছা হয়। তখন পক্ষীর মাস্তুল ভিন্ন অন্য কোন বিশ্রামের স্থান না থাকায় সেই মাস্তুলেই আশ্রয় লইতে হয়। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া কোথাও কোন বিশ্রামের স্থান নাই নিশ্চয় না হইলে, অনন্যশরণ হওয়া যায় না। তাই ধ্যান-ভজন, জপ-তপ প্রভৃতি যথাশক্তি করিতে হয় ; করিয়া কিন্তু পরে এই বিশ্বাসেই আসিতে হয় যে, সাধন-ভজন সব কোন কর্মেরই নহে। 'আমার জপের মালা, ঝুলি কাঁথা জপের ঘরে রৈল টাঙ্গা।' "

—স্বামী তুরীয়ানন্দ

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্

স্বামী জীবানন্দ

গৌরী শুদ্ধা ভুবনজননী পাবনী শাশ্বতী ত্বং
নিত্যানন্দা প্রকৃতিপরমা দিব্যরূপা ভবানী।
শক্ত্যাধারা বিমলসুখদা চিন্ময়ী সিদ্ধিদাত্রী
মাতর্দুর্গে মম শিরসি তে স্থাপয় শ্রীপদং ত্বম্ ॥ ১

সর্বব্যাপ্তা বিমলহৃদয়া বিশ্বরূপা সুদেবী
কল্যাণী ত্বং সততসদয়া মাতৃদেবী জনানাম্।
দিব্যানন্দা সকলশুভদা শান্তিদা দুঃখহন্ত্রী
মাতর্দুর্গে মম শিরসি তে স্থাপয় শ্রীপদং ত্বম্ ॥ ২

বাসন্তী ত্বং ভুবনভবনে শারদীয়া সুপূজ্যা
ভাবাতীতা সততমচলা কেবলা শক্তিমূর্তিঃ।
সাক্ষীভূতা গগনসদৃশা নির্গুণা ত্বং হ্যসক্তা
মাতর্দুর্গে মম শিরসি তে স্থাপয় শ্রীপদং ত্বম্ ॥ ৩

দেবী নিত্যা ত্রিগুণরহিতা পালয়িত্রী পরা ত্বং
মায়ারূপা ভুবি ভগবতী কারয়িত্রী চ কর্ত্রী।
মায়াতীতা ভবভয়হরা জ্ঞানদা মুক্তিদাত্রী
মাতর্দুর্গে মম শিরসি তে স্থাপয় শ্রীপদং ত্বম্ ॥ ৪

বিশ্বাম্বা ত্বং বিপুলভুবনে সারদা সারদাত্রী
লীলায়াং বৈ বিধৃতসুতনূ রামকৃষ্ণস্য শক্তিঃ।
পারাবারঃ পরমকরুণা-সংপ্রকাশে পৃথিব্যাং
মাতর্দুর্গে মম শিরসি তে স্থাপয় শ্রীপদং ত্বম্ ॥ ৫

দুর্গে দুর্গতিনাশিন্যৈ
ত্রিনেত্রায়ৈ নমো নমঃ।
প্রপন্নপালিকায়ৈ তে
ভগবত্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬

শয়ান

শ্রীদিলীপকুমার রায়*

টেনে নাও পায়ে তোমার
ক'রে এ অপারে পার,
কে পারে তুমি বিনা
ফুল ফোটাতে কাঁটাবনে ?

বাজিয়ে অকূল-বাঁশি
ক'রে প্রাণ মন উদাসী
দূরে হায় থাকো কেন
অন্ধকারের দুর্লগনে ?

দয়াময় তুমি—জানি,
শুনি তো কৃপার বাণী,
ছুঁয়ে যাও বাঁশির সুরে
অন্তর আমার ক্ষণে ক্ষণে।

জানি—নও নিঠুর তুমি
ওঠো নাথ, তাই কুসুমি'
কত সে রূপে রঙে
আশীর্বাদের উচ্ছলনে !

তোমাকে করি স্মরণ,
শিখাও আজ করতে বরণ
দিয়ে ঠাঁই আমাকে নাথ,
তোমার রাঙা শ্রীচরণে।

জ্বালো গো, জ্বালো জ্বালো
হৃদয়ে তোমার আলো,
নৈলে বাসব ভালো
তোমাকে অচিন, কেমনে ?

* সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার। পুনা হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

'নাল্পে সুখমস্তি' †

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ছায়া থেকে ছায়ার পিছে
ছুট্‌লিরে তুই অনুক্ষণ !
জড়ালি তাই মৃত্যু-জালে
ক্ষ্যাপ্‌লা জালে মীন যেমন।
এই বাসনার বন্দীশালা
যাক্ না ভেঙে ! ঘুচ্‌বে জ্বালা !
তৃষ্ণা-নদীর পারে যে তোর
নিত্য সুখের বৃন্দাবন !

নয়ন-জলের ধারায় এবার
ভরলো জীবন-পেয়ালা তোর !
ভুলের যত কাঁটার ফসল
কুড়ালি তুই জীবন ভোর !
অল্প নিয়ে কেনরে আর
রইবি প'ড়ে ? তুই ভূমার !
সেই অসীমের চরণে তোর
চিরদিনের বাসভবন।

† চারণকবির অপ্রকাশিত কবিতা।

জানি

বনফুল

ধরা-ছোঁওয়া দাওনি আজও
জানি তবু
জানি তবু
জানি তবু পাব তোমায়।

কান পেতেছি আকাশেতে
খবর পাঠাই বাতাসেতে
লক্ষ তারা আলোর সুরে
এই কথাটি কেবল শোনায়
পাব তোমায়, পাব তোমায়।

ভুবন-ভরা আলো যাহার
সে কেমনে লুকাবে গো
প্রেম-সাগরে ভাসছে যাহা
তা কেমনে শুকাবে গো।

হবেই দেখা তোমার সাথে
মিলবে সোনা সোহাগাতে
ফুটবে নতুন রূপ যে তাতে
জানি, জানি তোমার ছোঁয়ায়।
পাব তোমায়, পাব তোমায়
পাব তোমায়।

সে-দৃষ্টি দাও

শ্রীশান্তশীল দাশ*

দুঃখে তুমি সুখেও তুমি
আলোয় তুমি, অন্ধকারে ;
নিদ্রা জাগরণে তুমি—
তবু দেখি কই তোমারে !

আলোয় ভরা সুখের দিনে
থাকি নানা জনের মাঝে ;
কলরবে মুখর গৃহে
কতই সুরে ধ্বনি বাজে।

অন্ধকারে সে-নির্জনে
ভাগ্যে তুমি, তবু তোমায়
স্মরণ করে একটি বারও
অন্তরেতে ডাকি না হায় !

এমনি করে সময় কাটে,
তোমার পানে ফিরে না চাই ;
দেখার মত, চেনার মত
কোথায় বল সে-দৃষ্টি পাই।

আসুক আলো, নামুক আঁধার
মন্দ ভালো, দুঃখ ও সুখ ;
দেখবো তোমায় সে-দৃষ্টি দাও
'সদাই তুমি প্রসন্ন মুখ'।

---

* সুপ্রসিদ্ধ কবি

একাকার

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী*

হে ঈশ্বর হে আনন্দ ধরণীর প্রাণ !
এবং বিশ্বের !
হায় ! সে বিশ্ব যে কত বড় অন্তহীন বৃহৎ মহৎ
মেলেনা সন্ধান ।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছিটানো আকাশে
নিয়ে এই মাটি মাখা পৃথিবীর
গাছপালা ফুল পাতা ঘাসে
নদ নদী অরণ্য প্রান্তরে—
তার মাঝে এতটুকু দেহটার অসীম অন্তরে
কোন্ খানে তার ঈশ্বরের—আনন্দের বাস !
আহা ! কে জেনেছে কে পেয়েছে
আনন্দের ঠিকানাটা তাঁর !
চিরকাল খুঁজিতেছে কারা—খুঁজিতেছে আমাদেরও
চোখের নিমেষ সম একবিন্দু প্রাণ
সেই সীমাহীন রূপহীন অরূপের রূপের প্রকাশ—
যে ঈশ্বর হবে তার একান্ত 'আমার' !
অবশেষে অন্তরের মাঝে অশ্রুসিক্ত চোখে
দেখিতে সে পায় যেন বাষ্পময় কার
রূপের আভাস ।
আর আঁখি মেলে হেরে তুমি বিশ্বনাথ এক-একাকার !
বিশ্বেশ্বর বিশ্বের আকার ।

---

* সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল বাংলা সাহিত্যের সেবিকা। ১২টি গ্রন্থের লেখিকা। 'সোনা রূপা নয়'-গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিতা।

আকাশাত্মা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ *

দুষ্পার নীল স্বচ্ছ আকাশ স্বরাট অহংমুক্ত
ঋক্ চেতনার ব্যঞ্জনাঘন ভাস্বর রবিস্যূক্ত !
সজাগ ভর্গ সৌরজ্যোতির্মণ্ডলে ধৃতিমগ্ন,
প্রাণে প্রাণে প্রতিবিম্বিত যার অযুত সৃষ্টিলগ্ন।
বীজাণু জীবাণু দ্বৈতাদ্বৈত কোষাণুকোষের গর্ভে
সূক্ষ্মানুরাগে স্পন্দন জাগে আদি উন্মেষ পর্বে।
ত্রিগুণান্বিত ভূতপ্রপঞ্চে তদ্গত তন্মাত্র
চিৎচুম্বকে গ্রন্থনক্রিয়ামগ্ন দিবসরাত্র।
পরমাকর্ষ মহাকর্ষের ওপারে আলোকবর্ষ,
অনন্তকোটি যোজন ঘুরেও পায়না সীমার স্পর্শ ;
চতুরায়তনে চতুরাননের লীলা অনিত্যে নিত্যে
ঋজু তির্যক্ বক্র কুটিল জটিল রেখায় বৃত্তে।
বিন্দুতে সাতসমুদ্র লীন অণুতে দশ-দিগন্ত
চোদ্দভুবন ত্রিকাল ত্রিগুণ পায়নাকো যার অন্ত
ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতিরূপিণী তোমারেই দিনরাত মা,
স্মরে যোগীজন রামকৃষ্ণের ধ্যানরূপা আকাশাত্মা।

* সুপ্রসিদ্ধ কবি। অর্ধশতাব্দী যাবৎ কবিতা ও কাব্যসমালোচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সেবক। মোট ১৭টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। ইংরেজী ফরাসী জার্মান রুশ ও চীন ভাষায় ইঁহার বহু কবিতা অনূদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ: 'উদাত্ত ভারত' ও 'রক্ত গোলাপ'।

এ কি মার বিশ্বব্যাপী ডোর

ডক্টর শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত †

এমন শারদ প্রাতে সোণালি রোদের গান শুনি,
পৃথিবীকে মনে হয় ভুল নয়, বিষণ্ণতা নয় ;
জীবনের পথ দিয়ে চলতে গেলে বহু দুঃখ হয়,
তবুও শরৎ এই বুকে গাঁথে সুখের বিনুনি।

† বর্ধমান শ্যামসুন্দর কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। উক্ত গ্রন্থটি পরিবর্ধিত আকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। 'বাংলা সাহিত্যের রূপচিত্র', 'বঙ্কিমসাহিত্য পরিক্রমা' ও 'মধুমঞ্জরী' ইঁহার অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ।

এতো পৃথিবীরই কৃতি, পৃথিবীর এই তো গাঁথুনি—
বিচিত্র রূপের মধ্যে অন্তরঙ্গ অনন্ত বিস্ময় ;
অস্তিত্বের বোঝা নিয়ে উজ্জ্বল ফুলের গন্ধময়
পরিপার্শ্বে ঘুরে ফিরি, বুঝতে চাই রহস্যের ধ্বনি।

করতল ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় ঊর্ধ্বপানে,
হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় কি যে স্নিগ্ধ স্পর্শের আস্বাদ ;
ধরিত্রীর রহস্যের কোনো সুর বুকের বাগানে
ফুল হয়ে ফুটলো কি না, তাও জানতে হয় কিছু সাধ !
স্নেহের রহস্য একি ? এ কি মার বিশ্বব্যাপী ডোর
শরতের সুর দিয়ে বাঁধা হল ? হৃদয় বিভোর !

গান

[ভীমপলশ্রী—দাদরা]

স্বামী প্রত্যয়ানন্দ

রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা
অবগুণ্ঠনে ঢাকা
আছ মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি
আঁখি দু'টি স্নেহমাখা ॥
মা বলে ডাকিলে পার না ফেরাতে
ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে তুলে নিতে,
কে আছে এমন জুড়াইতে ব্যথা
না ডাকিতে দাও দেখা ॥
কভু রাধা কভু সীতাসতী-রূপে
শীতল করেছ ভূমি,
সারদা জ্ঞানদা এই যুগে মাগো—
তোমার তুলনা তুমি।
নিয়েছি গো ঠাঁই তব পদতলে
বাড়ায়েছি হাত, নে মা কোলে তুলে
ভরসা আমার তব পদছায়া
হৃদয়ে রয়েছে আঁকা ॥

দিনে দিনে বাড়ছে দেনা

সেখ সদরউদ্দীন*

দিনে দিনে বাড়ছে দেনা
শুধবো কবে তোমার ঋণ ?
সংসারেরই ঘানি টেনে
ঘুরছি আমি রাত্রদিন।

তোমায় ডাকার নেইক সময়
ধ্যান-ভাবনার সময় নাই,
কাজের কথাই জাগে মনে
যখন তোমায় ডাকতে যাই।

কেমন করে বল না আজ
তোমার পূজায় সাজাই ডালি ?
বাস্তবের এ কঠিন কাজে
কখন বলো ধর্ম পালি ?

তবে যদি সুধীর মতে
'তোমার কাজ'ই ধর্ম হয়,
সেটুক আমি করছি পালন
জেনো তুমি সুনিশ্চয়।

---

* এম. এ., বি. এড্., প্রধানশিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, পানিহাটি। সম্পাদক, নীলিমা

মহালক্ষ্মী-মন্দিরে

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

এসে অবধি ভাবছি, মহালক্ষ্মী-মন্দিরে যাবো। কিন্তু তেমন উদ্যোগ কিছু করি নি। বোম্বে বেড়াতে এসেছি, মাসখানেক থাকবো, তাই তাড়ার কিছু নেই। যেদিন যাবো আপনি সব আয়োজন হতে থাকবে, আমার শুধু যোগ দেওয়া, শুধু তৈরী থাকা।

কিন্তু তালিকা-হাতে ভ্রমণ যাঁরা করেন, সময় বাঁচিয়ে সবটুকুই যাঁরা সবকিছু দেখায় ভরে নিতে চান, তাঁরা উদ্যোগী এবং সন্ধানী। সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশী দেখার কৃতিত্ব সকলকে না জানানো অবধি তাঁদের স্বস্তি মেলে না। আর যদি নাই জানানো গেল, তাহলে ভ্রমণের উদ্দেশ্য প্রায় অর্থহীন। ওরই পাশে আমরা কেউ কেউ বিনা তালিকার ভ্রমণকারী। এ পর্যন্ত কোন ভ্রমণ-সহায়ক গাইডবুক (ভ্রমণ-নির্দেশিকা) স্মরণ করি নি। তাই এক হিসাবে যিনি যা দ্রষ্টব্য বলেন, তাই অসামান্য জ্ঞানে গ্রহণ করি। দেখবো ভেবে দিন কাটানো অনেক সময় দেখার চাইতে ঢের ভালো। হয়তো এ যাত্রা তাই ঘটে যেতো, কিন্তু দেবী মহালক্ষ্মীর ইচ্ছা অন্যরকম। তরুণ বৈমানিক আর এক বোম্বে-পথিকের আহ্বান এলো, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'। সেদিনই প্রথমদর্শন।

বোম্বের 'খার' অঞ্চল থেকে 'মহালক্ষ্মী'র পথে ধাবমান ট্যাক্সিতে অজস্র ইঁটকাঠের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে চিরন্তন সমুদ্রের স্পর্শ পেতে পেতে সমুদ্রসম্ভব এই নগরীর বিপুল সম্ভাবনার কথা মনে জাগছিল। 'মহিম' থেকে 'মেরিন ড্রাইভ' অথবা 'মেরিন ড্রাইভে'রও পরে 'নরীম্যান্‌স্ পয়েন্ট' সর্বত্র এখানে সমুদ্রবন্ধনের চেষ্টা। একবার বেঁধে ফেলতে পারলে কোটি কোটি অর্থের আর লক্ষ লক্ষ মানুষের নিশ্চিত মিলন। বোম্বের নানাপ্রান্তে মানুষ সমুদ্র দেখতে আসে। আসলে জয় করতে আসে। সমুদ্র-জয়ের অর্থই লক্ষ্মীলাভ।

লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আমাদের মনে সতৃষ্ণ ভক্তির কথা স্বীকার করা ভালো। স্বয়ং নারায়ণেরও লক্ষ্মী না হলে রীতিমতো সঙ্কট, আর আমরা যারা অন্নবস্ত্রের জোগানে উদয়াস্ত ব্যতিব্যস্ত তারা আর সব দেবতাকে ছাড়লেও ছাড়তে পারি, মা লক্ষ্মীকে ছাড়া আমাদের কিছুতেই চলে না। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে তাই সব সময় ভীড় লেগে আছে। কলকাতা যদি হয় ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী, বোম্বে তাহলে অর্থনৈতিক রাজধানী। এখানকার মানুষ সময়ের মূল্য এবং টাকার মূল্য—এ দুই-ই খুব ভাল বোঝে। সুতরাং মা লক্ষ্মীর কৃপার জন্য সদাব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে এসে পূজা ও ভোগ দিয়ে যেতে তারা ভোলে না। শব্দ বা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের স্বভাব নয়। মহালক্ষ্মী তাদের কাছে লক্ষ্মীদেবীরই বৃহৎ সংস্করণ। টাকা এবং আরো টাকা। সুতরাং নিয়মিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরে এসে মানবজন্মের দ্বিতীয় পুরুষার্থটি (কারু কাছে হয়তো ওই একটিই পুরুষার্থ, তবে ধর্মের

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা-গ্রন্থের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত। 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য'—ইঁহার অপর তিনটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

নামে করছে বলে প্রথম পুরুষার্থটিও ধরতে হবে) লাভের বাসনা মায়ের পাদপদ্মে জানিয়ে যাওয়া একান্ত দরকার। আর যাঁর কাছে টাকা পাই, তাঁর পায়ে সেই টাকারই কিছু অঞ্জলি দিয়ে যাওয়া—যত বড়ো, যত দামের ভোগ চড়ানো সেই পরিমাণে পুণ্যবৃদ্ধির অর্থবৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনা - এই ধর্মার্থ-সাধনা যদি এত সহজেই করা যায়, তাহলে কে না সেই শুভ প্রচেষ্টা করতে চায়? সুতরাং বোম্বের আর সব মন্দিরের চেয়ে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে যদি ভীড় বেশী হয়ে থাকে, অথবা এ মন্দিরের প্রণামী বাবদ আয় যদি আর সব মন্দিরকে ছাপিয়ে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু অর্থ-প্রত্যাশায় যারা যায়, শব্দের অর্থ তাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে চলে। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বামে বসে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী শ্রী হলেও, মহালক্ষ্মী হল দুর্গার আর এক নাম। মহালক্ষ্মীর মন্দিরের নাটমন্দির-অংশে তাই দেবীর দিকে মুখ করে উপবিষ্ট সিংহ। জগৎ-জননী এ মন্দিরে তিনটি মূর্তিতে বিরাজিত, মূল মূর্তিটিই মহালক্ষ্মীর। তিনি সিংহবাহিনী। আর এই মহালক্ষ্মী বা দুর্গার মধ্যেই সর্বদেবী, জগতের সব মায়েদের অধিষ্ঠান। যাঁরা লক্ষ্মী মনে করে এঁর পূজো করেন, তাঁদের পূজোও এক হিসাবে এঁরই পূজো—তিনি আমাদের দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী একাধারে। আবার তিনি কালীও বটে। চণ্ডীতে আছে—মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী—এ ত্রিমূর্তিতে মায়ের বন্দনা।

পুরাণে আছে, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। বোম্বের মহালক্ষ্মীর মন্দিরটি সমুদ্রের ধারে। আর এই মন্দিরের পিছন থেকে অবারিত সমুদ্র পশ্চিম আকাশের দিকে অনন্ত-প্রসারিত। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে প্রবেশের পথটি একটু সংকীর্ণ, কিন্তু পশ্চাতের সমুদ্র-পটভূমিতে সব অপূর্ণতা মোচন হয়ে এ মন্দিরকে এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে।

মূল মন্দির থেকে একটু নীচে আর একটি ছোট্ট শিব-মন্দির। মহালক্ষ্মী বা দুর্গা—তিনি তো শিবেরই শক্তি। শিব-শক্তির মিলনতীর্থ এ মন্দিরে ভক্তেরা আগে মায়ের দর্শন সেরে শিবের দর্শনে যান। মন্দির-পরিক্রমা সেরে অনেকে আরো নেমে চলে যান সমুদ্রতীরের বড়ো বড়ো গ্রানাইট পাথরের টুকরোর উপর দিয়ে যতটা সমুদ্রের কাছাকাছি যাওয়া যায় ততটা ঘনিষ্ঠ হতে। যাঁরা আর একটু উঁচু থেকে সমুদ্রের পরিব্যাপ্ত রূপ দেখতে চান, তাঁরা নীচে না নেমে মহালক্ষ্মী-মন্দিরের পিছন দিয়ে চলে যান শেষপ্রান্তে। সেখান থেকে ইচ্ছে করলে সারা দিন সমুদ্রের কলরোল শুনে আর রঙ-বদলের খেলা দেখে কাটিয়ে দিতে পারেন। অবশ্য, মন্দিরের অভিভাবকদের অনুমতি থাকলে।

জনপ্রিয় মহালক্ষ্মী-মন্দিরে ভীড় আছে ঠিকই। তবু সমতল থেকে কিছুটা উচ্চতায় সমুদ্রের পটভূমিকায় এ মন্দিরটির সমগ্র পরিবেশে কোথাও এক আন্তরিক স্নিগ্ধতা আছে—যা বিত্তের দ্বারা তর্পণীয় নয়। অর্থের সন্ধানে এসে কেউ যদি পরমার্থ চেয়ে বসে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হিসাবের খাতায় কেউ কেউ কবিতা লিখেছেন—রামপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথের কথা[১] ভাবুন। তেমনি মা লক্ষ্মীর করুণায় সংসার-দারিদ্র্য ঘোচাতে এসে যদি কারু অন্তরের দারিদ্র্য ঘুচে যায় এখানে, তাহলে একান্ত সঙ্গতই হবে সে ঘটনা। মানব-জীবনের 'তবিলদারী' ভক্ত ও সাধকের দৃষ্টিতে

১ 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ': অমিতাভ চৌধুরী।

ভাবসম্পদের অধিকারে পরিণত হয় বা হয়েছে অনেক বার। তাছাড়া, এ মন্দির তো শুধু অর্থোপাসনার মন্দির নয়, শক্তি-উপাসনার মন্দির। মহালক্ষ্মী দুর্গা এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

একথা মনে হওয়ার একটু কারণ আছে। প্রথম দিনের দর্শনের পর দ্বিতীয় যে দিনটিতে মহালক্ষ্মী-মন্দিরে গিয়েছিলুম, সেদিন ছিল স্নানযাত্রার পূর্ণিমা তিথি। মন্দিরে যাত্রার পথে সহযাত্রীরূপে পেয়েছিলুম পরম শ্রদ্ধেয় তিনজন সন্ন্যাসীকে। যে গাড়ীতে গিয়েছিলুম, তার অধিকারী প্রবীণ এক গৃহী ভক্ত আমাকে নিয়ে সামনে বসেছেন। বিত্তে, সম্পদে, বিদ্যায়, মনুষ্যত্বে এই ভক্তের পরিবারটি সবদিক দিয়ে শ্রীমণ্ডিত। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে সেদিন মহার্ঘ নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে পূজনীয় সন্ন্যাসী-মহারাজদের অগ্রবর্তী করে বিনম্র ভক্তিতে মায়ের পূজাবেদীর কাছে যেন আত্মসমর্পণ করে ভক্তটি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেদিন ভীড়ের মধ্যে বার বার দর্শনে বাধা পড়তে লাগলো। তবু ঘুরে ফিরে সে-মন্দিরে যতক্ষণ ওই ভক্তটি ছিলেন, ততক্ষণ যেন এক পরম ব্যাকুলতা নিয়ে দেবী-দর্শন করেছিলেন। ক্ষীণ-দৃষ্টি দুর্বলদেহ শুভ্রশির তাঁর শান্ত ব্যক্তিত্ব যেন পূজার গভীরে মগ্ন হয়ে ছিল।

তারপর একসময় মন্দির-পরিক্রমা শেষ করে আমরা সমুদ্রতীর দেখতে দেখতে শহরের আর এক প্রান্তে গিয়ে পৌছলুম—'নরীম্যান্স্ পয়েন্ট'। বোম্বের এক প্রাক্তন মেয়রের নামে নতুন গড়ে-ওঠা এ অঞ্চলটি আমাদের সাগ্রহে দেখাতে নিয়ে এসেছেন ভক্তমহোদয়। তখন সন্ধ্যার পরপার থেকে এক গাঢ় নীল জ্যোতি এসে আকাশ ও সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। নানা কথায় সমুদ্রতীর ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। মনেই ছিল না যে, ভক্তটি একটু পিছিয়ে পড়েছেন, অনেক আস্তে হাঁটছেন। একটু থেমে দাঁড়াতে কাছে এসে বললেন, 'সন্ধ্যার পর ততটা দেখতে পাই না। আপনি আমার হাতটি ধরে থাকুন।'

ওই একটি কথায় এই প্রবীণ ভক্তের সংসার-জীবনের আজকের ছবিটি আমার কাছে করুণা ও মমতায় একান্ত আপন হয়ে দেখা দিল। অতুল সম্পদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অনায়াসে ত্যাগ করে এঁর একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন। মাত্র কিছুদিন আগে জীবন-সঙ্গিনীও পরপারে গেছেন এঁকে একলা রেখে। আজ এই বার্ধক্যে একান্ত আপন সব সময়ের সঙ্গী বলতে আর কেউ নেই। কিন্তু কী আনন্দে, প্রীতিতে, স্নেহে ও সৌজন্যে এই একলা মানুষটি পরিপূর্ণ হয়ে আছেন, কোন মন্ত্রবলে সব প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে পরম তৃপ্তি এঁকে মনে প্রাণে ভরে দিয়েছে! অর্থবান ভিখারী আমরা অনেক দেখি, অর্থের অন্তরালে এমন মোহমুক্ত অনাসক্তি বড় একটা চোখে পড়ে না। আমার সৌভাগ্য, কিছুক্ষণের জন্য তাঁর হাত ধরে থাকতে পেরেছিলুম। জীবনের বহিরঙ্গ প্রার্থনার শেষে আজ এই ভক্তের কাছে 'সমুখে শান্তি-পারাবার'। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে তাঁর শরণাগত আত্ম-নিবেদনে সেই শান্তিই অনুভব করেছিলাম। জীবনে পরম মুহূর্তটি কখন কেমন করে ধরা দেয়—কে জানে? একমাত্র পুত্রকে জগন্মাতার আরাধনায় নিবেদন করে হয়তো তেমন শান্তি পাওয়া যেতে পারে, যা পেলে অন্য কোনো লাভ-ক্ষতি আমাদের বিচলিত করতে পারে না!

বৈষ্ণবসাধকেরা বলেন, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অন্বেষণ মুক্তি নয়, ভক্তি। তাঁদের পরিভাষায় ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেম মানবজীবনে আর চারটি প্রধান কাম্য বস্তুর ঊর্ধ্বে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারের পারে মানুষের ভক্তি

বা প্রেমের প্রার্থনা। তাই ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিত্য সেবক সহচর হয়ে থাকে। সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য—কিছুই নয়, শুধু জন্মে জন্মান্তরে তাঁর সেবক হয়ে থাকার সৌভাগ্য, এই ভক্তের বাসনা।

মহালক্ষ্মীর মন্দিরে দেবীদর্শন থেকে সমুদ্র-দর্শনের মাঝখানে আমার মনে হয়েছিল, মানুষের হয়তো ষষ্ঠ আর এক প্রার্থনা (বা পুরুষার্থ) থাকতে পারে—যা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে ঠিক পড়ে না, যা মধুর থেকে শান্ত কোনো রসের মধ্যেই পুরো ধরা দেয় না, অথচ যে দৃষ্টির অধিকার মানুষেরই বিশেষভাবে রয়েছে। গোধূলি লগ্নের স্বর্ণ মেঘস্তর তখন সমুদ্রের সূর্যাস্তক্ষণের ঘোষণায় সর্বত্র আভা বিস্তার করে আছে মহালক্ষ্মীর মন্দির থেকে সমুদ্র-সীমান্ত অবধি অজস্র সোনালী রঙের চূর্ণ পরাগ ঝরে পড়ছে চারদিকে। দেখতে দেখতে সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, এমনও কেউ থাকতে পারে, যার কাছে সৌন্দর্যই সেই ঈশ্বর—যিনি কখনো করুণা, কখনো মুক্তি, কখনো প্রেম, কখনো সুন্দর। 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' মহালক্ষ্মী! শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের সৌন্দর্যেও ঈশ্বরের প্রকাশ নির্দেশ করেছেন। কীট্‌স্‌ আর এক ভাষায়, সত্য আর সৌন্দর্যের নিত্য সম্বন্ধের কথা বলেছেন। বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসনে' সেই 'কান্তিরূপা' মহামায়াকে প্রণাম করেছেন! পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য থেকেই কখন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের আর এক দিব্য আভাস দেখা দেয়! তিনিই শক্তি, প্রেম, মুক্তি, সৌন্দর্য—একরূপে ওই দেবী মহালক্ষ্মী।

বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসী

অত্তুর উন্নী নামবুদ্রিপাদ

অনুবাদক : শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু*

[অত্তুর উন্নী নামবুদ্রিপাদ কেরালার সাপ্তাহিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় মালয়ালম ভাষায় ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ "বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসী : কোদাঙ্গালুরে স্বামী বিবেকানন্দ"—এই নামে একটি লেখা প্রকাশ করেন। তার মধ্যে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের অনবদ্য এক কথাচিত্র রয়েছে। ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মৈত্রানন্দ তার ইংরেজী অনুবাদ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে মোটামুটি বাংলা অনুবাদ নীচে উপস্থিত করেছি।

লেখাটি খুব চিত্তাকর্ষক, তবে এর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। লক্ষণীয় যে স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' অনুসারে স্বামীজী ২৭শে অক্টোবর ১৮৯২, বেলগাঁও পরিত্যাগ করেন এবং গোয়া অঞ্চল পরিভ্রমণান্তে প্রথমে ব্যাঙ্গালোর এবং পরে দক্ষিণ ভারতের অন্যত্র গমন করেন।

— শঙ্করীপ্রসাদ বসু]

১৮৯২, সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর। প্রভাত-কাল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপরে সদ্য উদিত হয়েছেন সূর্যদেব। ক্র্যাঙ্গানোর-মন্দিরের চত্বরে যেন তাঁর কিরণ কৌতূহলে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। সেখানে বটবৃক্ষমূলে এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। তাঁর এমনই জ্যোতির্ময় আকার যে, সূর্যদেবও যেন সে দৃশ্যে বিস্মিত। প্রত্যূষে মন্দিরে অর্চনা করতে আগত মানুষেরা

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (দুই খণ্ডে), 'সহাস্য বিবেকানন্দ', 'নিবেদিতা লোকমাতা', 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্লানিং', 'ভারতচন্দ্র', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। 'বিবেকানন্দ ইন্‌ ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার্স'-গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

মন্দির থেকে বেরিয়ে সূর্যের দিকে এবং সেই সাধুর দিকে—দুই মহিমময় দৃশ্যের দিকে—বারবার তাকাতে লাগল। মন্দিরের ভিতরে তখন ঢাক-ঢোল, করতাল, ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি। তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে উদ্‌গীত হচ্ছে প্রার্থনা-মন্ত্র। ধূপ-ধূনা, চন্দন ও পুষ্পের মধুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। এই সময়ে নবোদিত সূর্যের কোমল করস্পর্শে সন্ন্যাসীর কমলনয়ন ধীরে উন্মীলিত হতে লাগল, গভীর শান্ত 'ওম্'-ধ্বনি তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত হয়ে স্পন্দিত করে দিল পারিপার্শ্বিককে। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি চারিদিকে তাকালেন। আঃ, ঐ আঁখি-দুটিতে কী না শান্তি, করুণা ও শক্তির দ্যোতনা!

আসন থেকে উঠে মহাত্মন্ মন্দিরদ্বারে গেলেন। কিন্তু প্রবেশ করতে পারলেন না, কারণ মন্দিরের দ্বাররক্ষীরা তাঁকে নিবারণ করল। এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও কোনো-প্রকার বিরক্তি বা ক্রোধ না দেখিয়ে তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই দেবীকে পূর্ণচিত্তে প্রণাম জানিয়ে বটবৃক্ষমূলে নিজের আসনে ফিরে এলেন। মন্দিরদ্বারে জয়-বিজয়ের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হয়েও তিনি ক্রুদ্ধ হন নি, সুতরাং সনৎ-কুমার নন; গেরুয়া পরে আছেন বলে শুকদেব নন; কিছু পরে আমরা তাঁর মধুর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত প্রজ্ঞাবাণী শুনেছি সুতরাং তিনি দক্ষিণমূর্তিও নন— তথাপি ব্রহ্মণ্যচেতনার গৌরবে উজ্জ্বল তাঁর মুখমণ্ডল দেখে ভাবতে ইচ্ছা হয়—তিনি ঐ তিনজনের মিলিত প্রতিমূর্তি।

মন্দির থেকে পূজাশেষে প্রত্যাবর্তনে উদ্ধত এক তরুণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তাঁর প্রতি। যৌবনের চপলতাবশে সে স্থির করল, সন্ন্যাসীকে নিয়ে কিছু মজা করবে। কিন্তু প্রশান্ত মহা-সাগরে চড়াই পাখির পাখা দিয়ে তরঙ্গ তোলা যায় না। ছোকরা তাই খুবই নিরাশ হল। হায়, তার তীরগুলি একেবারেই লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি। সে তখনকার মতো বিদায় নিলেও পরে আবার দৃশ্যপটে আবির্ভূত হল—এবার তার সঙ্গে ক্র্যাঙ্গানোর-প্রাসাদের দুই রাজকুমার—একজন কচুন্নি থামপুরণ, দ্বিতীয়জন ভট্ট থামপুরণ, রাজকুমার-দুজন সন্ন্যাসীকে দেখামাত্র বুঝলেন, তাঁরা কোনো সাধারণ সাধুর কাছে আসেন নি। এমন সুগঠিত সুঠাম সুন্দর অবয়ব, এমন সিংহসদৃশ ভাব-ভঙ্গি তো সাধারণ পরিব্রাজক-সন্ন্যাসীর মধ্যে দেখা যায় না। কচুন্নি থামপুরণ সাধুর আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বিস্ময়ে ভাবলেন—শরীরে স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের এ কী অপূর্ব সম্মিলন! উন্নত ললাট, জ্যোতিবিচ্ছুরিত পদ্মনয়ন, পেশীপুষ্ট স্কন্ধ, প্রশস্ত বক্ষ, আর দীর্ঘ লীলায়িত বাহু - বাস্তবিক অনন্যসাধারণ। থামপুরণ সামুদ্রিক শাস্ত্রে নিখুঁত পুরুষ-অবয়বের বর্ণনা পড়েছিলেন—কিন্তু তাকে বাস্তবে চাক্ষুষ করেন নি। এখন তাই সাধুর শরীর-গঠন দেখে বিশেষ প্রভাবিত হলেন। কিন্তু মাত্র বাইরের চেহারা দেখে, ভিতরের বস্তু পরীক্ষা না করে, তাকে সমাদর করবার পাত্র তিনি ছিলেন না। সুতরাং নাড়া-চাড়া করে দেখতে চাইলেন, বস্তুটা কি? সাধু তাঁর বয়সেরই। তারুণ্যের ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে তিনি সাধুর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় নামতে প্রলুব্ধ হলেন। প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রাপ্ত উত্তর থেকে কিন্তু সন্ন্যাসীর নাম ধাম গোত্র বা বয়স জানতে পারলেন না। তবে পোষাক ও ভাষা থেকে বুঝলেন, উনি কেরালার লোক নন, এই পর্যন্ত। সাধু রাজকুমারদের বললেন, তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি।

তারপর তাঁদের মধ্যে নিম্নের কথাবার্তা হল:

সন্ন্যাসী: যারা দেবীর অর্চনা করতে চায়, তাদের ভিতরে যেতে দেওয়া হয় না কেন? এই অঞ্চলে এমন রীতির কারণ কি?

রাজকুমার: এখানে এই রীতিরই চল। কেরালার লোকের জাতি কি, [পোষাক ও চিহ্নাদি থেকে] তা সহজেই বোঝা যায় এবং সেই অনুযায়ী তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় বা হয় না। কিন্তু কেরালার বাইরের লোকের জাতি [বাইরে থেকে] বোঝা যায় না। তাই বহিরাগতরা কেবল মার্চ-এপ্রিল মাসের উৎসবের সময়ে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পায়।

সন্ন্যাসী: মন্দিরে প্রবেশের জন্য জাতি-নির্ণয়ের ব্যবস্থা কেন? কোন্ অধিকারে আপনারা এ-কাজ করছেন? ও-অধিকার কি সত্যই আপনাদের আছে?

রাজকুমার: এই রীতির মূলে আছে স্মৃতির বিধান।

সন্ন্যাসী: কোনো স্মৃতি কি মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগকে মন্দিরে ঢুকবার যোগ্য এবং অন্যভাগকে অযোগ্য নির্দেশ করছে?

রাজকুমার: না, শব্দার্থে তা করে নি, তবে লক্ষণায় করেছে। স্মৃতি-অনুযায়ী নিম্ন-জাতির সঙ্গে উচ্চজাতির ঘনিষ্ঠ সংস্রব নিষিদ্ধ; আর সেই নিষেধ থেকেই ঐ লক্ষণার্থ স্পষ্টত লাভ করা যায়।

সন্ন্যাসী: কিন্তু ঐ নিষেধ আপনি কি মনে করেন না—মন্দিরে দেবসান্নিধ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য?

রাজকুমার: অমন সিদ্ধান্ত করবার পক্ষে শাস্ত্রপ্রমাণ চাই তো?

সন্ন্যাসী: হাঁ ঠিক। এই হল শাস্ত্রপ্রমাণ:

'দেবালয়-সমীপস্থান্ দেবসেবার্থমাগতান্
চণ্ডালান্ পতিতান্ বাপি স্পৃষ্ট্বা ন স্নানমাচরেৎ॥'

(দেবসেবার জন্য দেবালয়-সমীপাগত, চণ্ডাল বা পতিতদের স্পর্শ করিয়া স্নান করা বিধেয় নহে)। যখন এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ স্মৃতি-নির্দেশ, তখন অপ্রত্যক্ষ অনুমানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন কি কি প্রয়োজন লক্ষণার্থ-সন্ধানের কিংবা কষ্টকৃত যুক্তি-সন্ধানের?

সন্ন্যাসী যখন এইভাবে যুক্তিগুলি খণ্ডন করতে লাগলেন, তখন রাজকুমাররা ভাবলেন, তাঁরা আরও প্রস্তুত হয়ে না এলে হয়ত তর্কে পরাস্ত হবেন। সুতরাং সাময়িকভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁরা একযোগ হয়ে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ উল্টেপাল্টে এমন-সব যুক্তি খাড়া করলেন, যেগুলি তাঁদের ধারণায় সুচিন্তিত এবং অকাট্য। তারপর তাঁরা অধিকতর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পুনশ্চ সন্ন্যাসীর সমীপবর্তী হলেন। এবার কিন্তু সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ নূতন এক ধারায় যুক্তি-তর্ক আরম্ভ করলেন। সন্ন্যাসীর এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নূতন যুক্তিবিচারের সামনে তাঁরা দিশাহারা হয়ে প্রাসাদে ফিরলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, পরদিন যখন সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হবেন তখন তাঁদের তূণে থাকবে শাস্ত্রবিধির তীক্ষ্ণাগ্র এবং অপ্রতিরোধ্য নানা শর।

প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরে তাঁরা স্মৃতির পৃষ্ঠা উল্টে চললেন নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি-সন্ধানের জন্য। শাস্ত্র থেকে কিছু যুক্তি ও উদ্ধৃতি সংকলন করে, সেগুলিকে ধারাবাহিক সাজিয়ে, তাঁরা আশা করলেন—এসবের দ্বারা পরদিন সন্ন্যাসীকে ফাঁদে ফেলতে পারবেন। পরদিন সকালে বটবৃক্ষতলে পৌঁছে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁরা তর্কযুক্তিতে লেগে পড়লেন, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সন্ন্যাসী তাঁদের সকল

যুক্তি-শৃঙ্খলাকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। নতুন কিছু বলার নেই দেখে তাঁরা আবার পশ্চাদ্ অপসরণ করলেন, পূর্বদিনের চেয়েও অধিক নৈরাশ্যের সঙ্গে। বৈকালী আলোচনার সময়ে নতুন কয়েকটি ধারালো শর নিয়ে আবার তাঁরা গেলেন, কিন্তু ফল পূর্ববৎ। এইভাবে দুদিন কাটল।

রাজকুমারেরা অনুভব করতে লাগলেন, সন্ন্যাসী তাঁদের পক্ষে এমনই গভীর যে, তাঁর তল পাওয়া যাবে না। এমনই বিরাট যে, অতিক্রম করা যাবে না। সন্ন্যাসীর বহুমুখী মনীষা বোধ হয় আকাশতলের যে কোনো বিষয়ের মোকাবিলা করতে সমর্থ। তবে তাঁরা একটু দ্বিধায় রইলেন—কঠিন বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন্ ক্ষুরধার জিনিসটি অগ্রে ঢুকে যায়—সন্ন্যাসীর চোখ না বুদ্ধি? এবং তাঁরা এও ঠিক করতে পারলেন না—সন্ন্যাসীর কোন্‌টি অধিক ঈর্ষা-যোগ্য—তাঁর নিত্যজাগ্রত মনস্বিতা না অসামান্য বাগ্মিতা? তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি, সর্বজ্ঞ মনীষা, বিরাট পাণ্ডিত্য রাজকুমারদের অভিভূত করে ফেলল। আর, সকলকে একেবারে মোহিত করে ফেলল তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর, মনোহর আকার এবং সিংহ-তেজস্বী ভঙ্গি। "ভ্রূদ্বয়, ললাট, আনন, নেত্রদ্বয়, শরীর, কর, চরণ বা গাতিভঙ্গি —যাহাই তিনি দেখিলেন, সেইখানেই তাঁহার চক্ষু সংলগ্ন হইল। উজ্জ্বল ভ্রূ-সমন্বিত আয়ত-নেত্রবিশিষ্ট, প্রভাবিকিরণকারী শরীরধারী, পবিত্রজলহস্ত সেই ভিক্ষুকবেশধারীকে, যিনি পৃথিবীপালনের যোগ্য, দেখিয়া রাজগৃহের লক্ষ্মীদেবী সংক্ষুব্ধ হইলেন।"

তৃতীয় দিনে রাজকুমারেরা সন্ন্যাসীর কাছে আর তর্ক করতে গেলেন না—এখন তাঁর পবিত্র সঙ্গই কাম্য এবং তাঁরা যে-কোনো বিষয়েই হোক, সন্ন্যাসীর অনন্যসাধারণ বাঙ্‌নৈপুণ্য উপভোগ করতে উৎসুক। খুব ভোরে গিয়েছিলেন তাঁরা গিয়ে দেখেন সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। তাঁকে বিরক্ত না করে তাঁরা বেশ-খানিক দূরে রইলেন। সন্ন্যাসীর শান্ত স্থির জ্যোতির্ময় আকার দেখে তাঁরা বিস্ময়ে স্তব্ধ। তাঁরা অনুভব করলেন, কালিদাস-অঙ্কিত এই রূপচিত্রটি তাদের সামনে জীবন্ত আকারে এখন বর্তমান: "ত্রিলোচনের নয়নত্রয় নাসিকার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া নিহিত ছিল এবং তাহাদের তারাত্রয় যদিও স্তিমিত ও নিশ্চল কিন্তু তাহাদের উগ্রতা-তীব্রতা ঐ স্তিমিতভাবের মধ্যেই বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছিল। তাঁহার ভ্রূসমূহে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা বিক্রিয়া দেখা যাইতেছিল না, প্রত্যুত সেগুলি যেন চিত্রিতবৎ মনে হইতেছিল। সেই স্পন্দন-হীন, স্থির, নেত্ররোমাবলীবিশিষ্ট, অর্ধনিমীলিত নেত্রত্রয় নাসাগ্রে নিহিত থাকায় তাহা হইতে নিম্নদিকে একটা জ্যোতিঃ-প্ররোহ ইতস্ততঃ নিঃসৃত হইতেছিল। ত্রিলোচন তখন শরীর-মধ্যস্থ বায়ুগণকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেজন্য মনে হইতেছিল যেন তিনি বৃষ্টির ঘোষণা নাই এমন জলস্তম্ভিত সুগম্ভীর মেঘ, অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র কিংবা নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা।" এই প্রথম রাজকুমারেরা অনুভব করলেন—মূর্তিমান ধ্যানের ঐ যে-বর্ণনা কালিদাস করেছেন, তা আলঙ্কারিক কাব্যকলা নয়, বাস্তবে সম্ভবপর। যেভাবে মহাদেবের সামনে কামদেবের হস্ত থেকে ধনুঃশর অজান্তে স্খলিত হয়ে পড়েছিল ঠিক সেইভাবেই রাজকুমাদের অহং এবং তর্ক-শক্তি অজান্তে বিদূরিত হয়ে গেল। তাঁরা সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্যের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ক্রমে ধীরে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হল। তখন রাজকুমারেরা এগিয়ে গিয়ে প্রণত হলেন। নীরব তাঁরা, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ, কোনো প্রশ্ন করার ইচ্ছা আর নেই। তাঁরা অনুভব

করতে লাগলেন, এই মহাত্মার সান্নিধ্যই দূর করে দিয়েছে সংশয়-মেঘ। সুতরাং তর্ক করতে নয়, জানতে আগ্রহী হয়ে, তাঁরা বিনীতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং সন্ন্যাসী তার উপযুক্ত উত্তরও দিলেন। ঘনীভূত প্রজ্ঞার বিগ্রহ সন্ন্যাসীর মুখ থেকে অপূর্ব বাণী উৎসারিত হতে লাগল। উপনিষদের সার সত্যের অনন্য প্রকাশ তা। বিস্ময়ে আনন্দে রাজকুমারেরা তা শুনতে লাগলেন, শিহরিত হলেন ক্ষণে ক্ষণে. অশ্রু নামল নয়নে, হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। শেষে ভট্ট থামপুরণ নীরবে উঠে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রইলেন, সন্ন্যাসীর নির্বন্ধেও বসতে রাজি হলেন না। অপর রাজকুমার কচুন্নি থামপুরণ অনুরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা বোধ করলেও স্বভাব-অনুযায়ী বাহ্যত তা প্রকাশ করলেন না।

সন্ন্যাসী ও রাজকুমারদের কথাবার্তা সংস্কৃতে হয়। সন্ন্যাসী যখন কথা শুরু করেন, তখন মনে হয়েছিল তিনি বুঝি সংস্কৃত ভাষা বা শাস্ত্রে তেমন পারদর্শী নন। থেমে-থেমে কথা বলছিলেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই অপূর্ব পরিবর্তন। মনে হল, পথে যেন কোনো একটা বাধা ছিল, সেটা সরে গেছে, তার পরেই প্রজ্ঞার অবিরাম প্রবাহ। যারা সেই বন্যাতরঙ্গে ভেসে গেল, তারা সবিস্ময়ে ভাবল—ভাষা ও রীতির উপর সম্পূর্ণ অধিকার, ভাবের নবত্ব ও ঐশ্বর্যগরিমা, যুক্তির অপূর্বত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, শাণিত মনস্বিতা, চিন্তার মৌলিকতা, কিংবা স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিব্যক্তির ক্ষমতা কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর? ঋজু-ভঙ্গিতে উপবিষ্ট এই সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখ থেকে যখন নির্গলিত হচ্ছিল বাণীধারা তখন মনে হয়েছিল—তিনি নন, তাঁর ভিতরে অধিষ্ঠিত অন্য কেউ কথা বলে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ বেদান্তই এঁর নখদর্পণে। শ্রোতারা কেবলই ভাবতে লাগল—না, ইনিই স্বয়ং বেদান্ত। দেশাচার-প্রসঙ্গ দিয়ে আরম্ভ করে, সর্ববিধ জ্ঞানভাণ্ডারকে উদ্‌ঘাটন করে, 'নেতি নেতি'-র সর্বোচ্চ শিখরে উঠে পড়লেন তিনি। রাজকুমারেরা সেই প্রথম উপলব্ধি করলেন, বেদান্তকে বোঝা যত কঠিন বলা হয়, সত্যই তা নয়। এই সন্ন্যাসীর মতো যদি কোনো জগদ্‌গুরু এসে শিক্ষা দেন তাহলে সাধারণ বুদ্ধির মানুষও তাকে স্বচ্ছন্দে অধিগত করতে সমর্থ হবে। নিছক শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিরাট পার্থক্যের রূপ তাঁদের কাছে প্রকটিত হয়ে উঠল। সত্যের এমন সূক্ষ্ম, গভীর অথচ একই সঙ্গে সহজ ও দীপ্ত প্রকাশ তাঁরা আগে কখনো দেখেন নি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা অনুভব করলেন, এই প্রথম শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডের আচ্ছন্ন দিকগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছে। তাঁরা শুনেছিলেন—অগ্নিই শব্দের দেবতা যখন তাঁরা দেখলেন, সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রুতির অন্ধকারাবৃত অরণ্যাংশকে আলোকিত করে তুলল—তখন তাঁরা ঐ কথার সত্যতা উপলব্ধি করলেন।

ক্র্যাঙ্গানোর-প্রাসাদ কবি ও পণ্ডিতদের বিচরণভূমি। এই প্রাসাদরূপী বিদ্যাপীঠের বাসিন্দা ঐ দুই রাজকুমার ছিলেন মনীষায় প্রোজ্জ্বল। তাঁরা তখন সদ্য গুরুকুলের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করছেন। অধিকন্তু তাঁরা কালীভক্ত এবং দেবী-অর্চনার দ্বারা তাঁর প্রসাদ-লাভ করেছেন, এমন কথিত। তথাপি তাঁরা দিনাবসানে নীরব পক্ষীর মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন এই গৈরিকবসন সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসীর কাছে বেদান্ত-শ্রবণ যেন তাঁদের পক্ষে সমাধির অভিজ্ঞতার মতো। অমৃতের মতো ঝরে পড়েছিল তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দগুলি, রসহীন আত্মায় তা তৃষ্ণার বারি বইয়ে দিল, নবজীবন পেলেন তাঁরা, ভুলে গেলেন পারিপার্শ্বিক, আত্মীয়-স্বজন,

ঘরবাড়ি—বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত হল চেতনা। সন্ন্যাসীর বাক্য যখন স্তব্ধ হল, তখন সহসা তাঁরা দিব্যলোক থেকে স্খলিত হয়ে পড়লেন দৈনন্দিনের কোলাহলময় জগতে।

তিনদিন সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে থেকে তাঁরা দেখলেন—তাঁর মনীষা সূর্যের মতোই জ্বলন্ত, আর তাঁর হৃদয় বর্ষা-মেঘের মতোই করুণাঘন। তাঁর নয়ন গভীরে প্রবেশ করে যায়, সমগ্র সত্যকে তা অখণ্ডে দর্শন করে—সেই নয়নই আবার অবিরাম অশ্রু বর্ষণ করে মানবসমাজের দুঃখ-বেদনায়। কিসে সন্ন্যাসীর শুদ্ধ হৃদয় বিগলিত হয়—ভিতরের জ্বলন্ত জ্ঞানাগ্নিতে কিংবা সর্বজীবের প্রতি অনন্ত প্রেমে—তাঁরা স্থির করতে পারলেন না।

তাঁদের মনে হল, এই অপরিচিত সন্ন্যাসী সুষুম্না-পথে সপ্তম ভূমিতে আরোহণ করে ভূমানন্দ লাভ করবার জন্য উৎকণ্ঠিত নন—তিনি যেন অগণিত মানুষের দুঃখকষ্টকে সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় ধ্যানলোক থেকে নেমে এসেছেন স্বয়ং মহাদেবের মতো—জীবলোকের যন্ত্রণার গরল পান করবার জন্য। তাঁরা অনুভব করলেন—ইনি যেন গোটা জগৎকে এখনি একসঙ্গে আলিঙ্গন করতে ব্যাকুল, আর নিজের ইচ্ছামতো তা করতে পারছেন না বলে আর্ত হয়ে আছেন। তাঁর হৃদয় যেন মানুষের প্রতি ভালবাসায় এখনি বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

অদ্বৈতসিদ্ধ যিনি, তিনি যে কেবল পর্বতের গুহায় বা গ্রাম-নগরের মন্দিরে ঈশ্বরকে দর্শন করতে ঘুরে বেড়ান না, সে-ঈশ্বরকে দেখতে চান দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীরেও—রাজকুমারেরা সন্ন্যাসীকে দেখে তা বুঝলেন। ঈশ্বরের পাদ-পূত তীর্থভূমিতে কেবল নিজেকে আবদ্ধ না করে এই সন্ন্যাসী দুঃখীর অশ্রুজলে নিজেকে ধৌত করে পবিত্র করবার জন্য ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাজকুমারেরা উপলব্ধি করলেন, এই পরিত্রাতা-পুরুষ সচ্চিদানন্দে প্রতিষ্ঠিত, মানবের দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এসেছেন ক্র্যাঙ্গানোরে— এই স্থানকে আশীর্বাদ করতে। শ্রীভট্ট থামপুরণ ও আরও কয়েক জন সন্ন্যাসীর পবিত্র চরণযুগলের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন।

প্রাসাদের কয়েকজন বিদুষী নারী সন্ন্যাসীর দর্শনে এসে শুদ্ধ ও সাবলীল সংস্কৃতে কথাবার্তা বলছিলেন। মহিলাদের এইভাবে সংস্কৃতে কথা বলতে দেখে সন্ন্যাসী খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ ভারতের অন্য কোথাও এমন জিনিস তিনি দেখেন নি। তাঁর আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কেরালার হিন্দু-শাসকেরা মুসলমান ও খ্রীস্টানদের জন্য মসজিদ ও গির্জা নির্মাণ করে দেবার মতো ঔদার্য দেখিয়েছেন জেনে সন্ন্যাসী খুবই প্রশংসা করেছিলেন।

সন্ন্যাসীর প্রতি রাজকুমারদের ভক্তি এখন ঈশ্বরভক্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাঁরা ভাবলেন, এঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে না দেওয়া অত্যন্ত ভ্রান্তির কাজ হবে। এমন পুণ্যপুরুষ মন্দিরে প্রবেশ করলে তা যত পবিত্র হয়ে উঠবে, কোনো আচার-অনুষ্ঠানই তা করতে সমর্থ নয়। তাই তাঁরা এ-ব্যাপারে প্রবীণদের অনুমতি-ভিক্ষার ইচ্ছা করলেন। সন্ন্যাসী কিন্তু সেই ইচ্ছাকে সমর্থন করলেন না, কেন না তার দ্বারা স্থানীয় রীতি-ভঙ্গ হয়ে কিছুসংখ্যক মানুষকে অন্তত আঘাত দেবে। তাঁর মধ্যে যে-শক্তি আছে তা ত্রিজগতে ওলট-পালট ঘটাতে পারে, কিন্তু তিনি অহংশূন্য, তাই শান্তিতে স্থিত। অজ্ঞান জনগণের বিশ্বাস ও রীতিকে সহসা উৎপাটিত করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না—হয়ত সেইজন্যই তাঁকে মন্দিরে নিয়ে

যাবার জন্য রাজকুমারদের ইচ্ছার সমর্থন তিনি করেন নি। কিংবা এমনও হতে পারে, কেরালার বহির্বর্তী তাঁর ভ্রাতৃগণ যে-অধিকারে বঞ্চিত, তাকে তিনি বিশেষ সুবিধারূপে নিজে গ্রহণ করতে চান নি। রাজকুমারদের বললেন, জগন্মাতা যদি প্রসন্ন থাকেন, তাহলে বাইরে থেকে পূজা করলেও তিনি তৃপ্ত হবেন, আর যদি তা না হন, তাহলে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে পূজা করলেও কোনো ফল হবে না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় রাজকুমারেরা যখন প্রাসাদে ফিরলেন, তখন তাঁরা ভক্তি, জ্ঞান ও করুণার ত্রিবেণীধারায় স্নান করে সঞ্জীবিত। সেই রাত্রে প্রাসাদের অন্যান্য রাজকুমারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা স্থির করলেন, সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ জানাবেন প্রাসাদে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য।

চতুর্থ দিন সকালে মন্দিরে প্রতিদিনের দেবীপূজার জন্য গিয়ে তাঁরা ব্যগ্র হয়ে বটবৃক্ষের দিকে তাকালেন, যেখানে সন্ন্যাসী অবস্থান করছিলেন। কিন্তু কোথায় তিনি? উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁরা চারপাশে দেখতে লাগলেন, কিন্তু সেই জ্ঞানসূর্য কোথাও নেই। তিনি যেন এক দিগন্তে উদিত হয়ে অন্য দিগন্তের দিকে সরে গেছেন। পরম করুণাময়ের চরণ-দুখানি আবার চলেছে পরিব্রজ্যায়, ভারতের দিকে-দিকে।

রাজকুমারদের মনে হল, বটবৃক্ষমূলে যেখানে তিনি বসতেন, সে জায়গাটি অন্ধকার। মন্দিরের অভ্যন্তরও যেন তার গৌরবদীপ্তি হারিয়ে ম্লান। রাজকুমারদের হৃদয় ভেঙে পড়ল। দেবীপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে তাঁদের মনে হল, মাতা তাঁর সন্তানের বিদায়ে শোকাচ্ছন্ন। মন্দিরের বাইরে চারিদিকে একই ম্লানতা। প্রায় চার শতাব্দীর প্রাচীন বটবৃক্ষটি তাঁকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় দিয়ে ধন্য হয়েছে। রাজকুমারেরা ভাবলেন, হায়, সেই সৌভাগ্যে আমরা বঞ্চিত। ব্যর্থতার দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তাঁরা।

ঐ দিব্যদীপ্তিমান পুরুষ কে—বিদ্যুতের মতো যাঁর আগমন ও প্রস্থান? যেন দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য, কিংবা নরশরীরে বৃহস্পতি, কিংবা সরস্বতী—পুরুষমূর্তিতে! বেশ কয়েক বৎসর কোনো উত্তর পান নি তাঁরা। কিন্তু যখনই বটবৃক্ষটির দিকে তাঁদের চোখ পড়েছে, সামনে ভেসে উঠেছে সেই ওজঃশক্তিসম্পন্ন অথচ প্রশান্ত সন্ন্যাসীর মূর্তি। সেই প্রশস্ত দীর্ঘ অত্যাশ্চর্য দুই চোখ—অন্তরাগ্নিতে জ্বলন্ত তারা যেন দিনের পর দিন তাঁদের অনুসরণ করে ফিরেছে। যে-অনাহত বাণীপ্রবাহ বটবৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বের চেতন অচেতন প্রকৃতির উপরে অপার্থিব শান্তি বিস্তারিত করেছিল, তার রেশ যেন রয়ে গিয়েছিল তাঁদের কানে।

কয়েক বছর পরে অন্যতম রাজকুমার কচুন্নি থামপুরণ সংবাদপত্রে একটি ছবি দেখলেন। ছবিটি দেখেই চমকে গেলেন। কার ছবি? যেন পরিচিত! তখন মনে পড়ল। এই তো সেই জ্যোতির্ময় আনন, যাকে কয়েক-বছর আগে দেখেছেন ক্র্যাঙ্গানোরে বটবৃক্ষতলে! সংবাদপত্রে মুদ্রিত চিত্রটির দিকে তিনি ভালো করে তাকালেন—দেখলেন, ছবির তলায় লেখা আছে— **'স্বামী বিবেকানন্দ'**।

কণাদমতে ঈশ্বর

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য*

ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে চার্বাক বৌদ্ধ জৈন সাংখ্য ও পূর্বমীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। বৈশেষিকদর্শন ও ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়—ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু মহর্ষি কণাদকৃত বৈশেষিকদর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আলোচনা না থাকায় মহর্ষি কণাদ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর স্বীকার করেন কিনা—এই বিষয়ে সুধী-সমাজে মতভেদ বিদ্যমান। মহর্ষি কণাদ-রচিত সূত্রে 'ঈশ্বর'-শব্দের উল্লেখ না থাকায় এবং ঈশ্বর-সাধনের জন্য কোন প্রকরণ রচিত না হওয়ায় পূর্বোক্ত মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও পরবর্তী বৈশেষিকদর্শনের আচার্যগণ (প্রশস্তপাদ প্রভৃতি) ঈশ্বর স্বীকার করিয়া বৈশেষিকদর্শনকে সেশ্বরদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তথাপি মূল সূত্রে ঈশ্বরবিষয়ক সুস্পষ্ট আলোচনা না থাকায় এই বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটে নাই। এই বিষয়ে প্রথমতঃ কণাদরচিত যে সূত্রগুলিকে ঈশ্বরের সাধক বলিয়া পরবর্তী আচার্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তিনটি সূত্রের উল্লেখ করা হইতেছে: "তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (বৈঃ সূঃ ১-১-৩) "সংজ্ঞাকর্ম তু অস্মদ্-বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্" (বৈঃ সূঃ ২-১-১৮) "প্রত্যক্ষ-প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্মণঃ" (বৈঃ সূঃ ২-১-১৯)। এই তিনটি সূত্রের প্রথমটির অর্থ—তাঁহার বাক্য বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য বিদ্যমান। দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ—প্রত্যেকটি পদার্থের বোধক নাম ও সেই পদার্থের কার্যকারিতাশক্তি কোনও ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত। কেবল তাহাই নহে, সমাজের শ্রেণীবিভাগের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি) এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠেয় কর্মপদ্ধতিরও একজন প্রবর্তক আছেন। সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতা-শূন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও কর্মসমূহের নির্ধারণকারী হইতে পারেন না। অতএব এইরূপ বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বা সর্বজ্ঞ আমাদের অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তৃতীয় সূত্রের অর্থ—পদার্থের নাম-নির্ধারণ এবং কর্ম-নিরূপণ সেই সেই পদার্থের প্রত্যক্ষপূর্বকই হইতে পারে। এই সূত্র তিনটির নিগূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া পরবর্তী আচার্যগণ মহর্ষি কণাদকে ঈশ্বরবাদী দার্শনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বেদে বর্ণিত কতিপয় ক্রিয়া প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া বেদোক্ত সমস্ত কর্মই ফলদায়ক হইবে—ইহা অনুমান করা যায়। সুতরাং বেদে বর্ণিত যে সমস্ত ক্রিয়ার ফল আমরা প্রত্যক্ষ করি না, সেই সমস্ত ক্রিয়া-ফল (স্বর্গ নরক প্রভৃতি) যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ কোনও ক্রিয়ার ফল নিজে প্রত্যক্ষ করিলেই অপরকে সেই কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বাক্যের সাহায্যে তাহা প্রকাশ করিতে হয়। বৈদিক কর্মের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অপরেও যাহাতে সেই ফল লাভ করিতে পারে তাহার জন্য কোনও একজন সর্বদর্শী করুণাপরায়ণ ব্যক্তি বাক্যময় বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপ সর্বজ্ঞের বাক্য বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রথম সূত্রস্থিত "তৎ"

* ন্যায়-তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক। 'ক্ষণভঙ্গবাদ' ও 'মাধ্যমক-কারিকা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

শব্দটির অর্থ 'সর্বজ্ঞ'। সর্বজ্ঞের বাক্য হিসাবেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি অভ্রান্ত এবং রাগদ্বেষশূন্য। সুতরাং তাঁহার কথার প্রামাণ্য সন্দেহাতীত। বলা বাহুল্য যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নিত্য সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। অতএব বেদপ্রবক্তা নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্রের অর্থানুসারেও শব্দ এবং কর্ম প্রবর্তকরূপে একজন সর্বজ্ঞপুরুষ সিদ্ধ হয়। অতএব উক্ত সূত্র দুইটির দ্বারাও মহর্ষি কণাদ ঈশ্বরের নির্ধারণ করিয়াছেন—ইহাই পরবর্তী বৈশেষিক আচার্যদের বক্তব্য। বৈশেষিক সূত্রে 'ঈশ্বর'-শব্দের উল্লেখ না থাকার কারণ হিসাবে তাঁহারা বলেন—কোনও বস্তুর স্পষ্ট উল্লেখ না করিলেই সেই বস্তুর অস্বীকৃতি বুঝা যায় না। কারণ যে বস্তু যে দর্শনে স্বীকৃত নহে, সেই দর্শনে সেই বস্তুটির নামোল্লেখ করিয়া খণ্ডন করাই দার্শনিক রীতি। অন্ধকার একটি দ্রব্য নহে—ইহা বুঝাইবার জন্য অন্ধকারের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিকদর্শনের সূত্রে কোথাও ঈশ্বর খণ্ডিত না হওয়ায় কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করেন না—এইরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

মহর্ষি কণাদের ঈশ্বরবিষয়ক সিদ্ধান্তের মূল কথা—ঈশ্বরবাক্যরূপেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। প্রথম সূত্র হইতে তৃতীয় সূত্র পর্যন্ত সঙ্গতির অনুসন্ধান ভিন্ন এই রহস্যটি পরিস্ফুট হইবে না। অতএব এই প্রসঙ্গে প্রথম সূত্র হইতে তৃতীয় সূত্র পর্যন্ত বক্তব্য বিষয়ের পরম্পরা বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রথম সূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন—মুমুক্ষু এবং বক্তব্য বিষয় বুঝিতে সমর্থ শিষ্য বিনীতভাবে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া মোক্ষলাভের কারণ জানিবার জন্য মোক্ষের সাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় জিজ্ঞাসু শিষ্যের কল্যাণ-কামনায় তত্ত্বজ্ঞ গুরু (মহর্ষি কণাদ) লক্ষণ ও প্রমাণের সাহায্যে ধর্মপদার্থ নির্ধারণ করিবার জন্যই এই শাস্ত্র (বৈশেষিক-দর্শন) রচনা করিতেছেন।[১] ইহার পর দ্বিতীয় সূত্রে ধর্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, যাহা হইতে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম।[২] ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অভীষ্টসিদ্ধির নাম অভ্যুদয়। ত্রিবিধ দুঃখের চিরনিবৃত্তির নাম নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ। এই উভয়ই ধর্মসাধ্য। সুতরাং ইহলৌকিক কামনাসিদ্ধি অথবা স্বর্গাদি সুখসম্ভোগও ধর্ম হইতেই সিদ্ধ হয়, আবার সর্ব-কামনাশূন্য হইয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্যও ধর্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে—ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। কিন্তু সেই ধর্ম বস্তুটি কি? অর্থাৎ কিভাবে সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, মহর্ষি কণাদ সুস্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ না করিয়া তৃতীয় সূত্রে বেদের প্রামাণ্যের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে মহর্ষির নিগূঢ় অভিপ্রায় সূচিত হইয়াছে। বেদে যাহা কর্তব্যরূপে নির্ধারিত আছে, তাহাই ধর্ম—ইহাই মহর্ষির অভিপ্রায়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মহর্ষি কণাদ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। মহর্ষি কণাদের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বৈদিক ধর্ম ভারতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। সুতরাং বেদোক্ত বিধি সর্বতো-ভাবে গ্রহণ করিলেই মানবের সমস্ত রকম কল্যাণ সাধিত হইবে অন্যান্য বৈদিক দার্শনিকের মত মহর্ষিরও ইহাই সিদ্ধান্ত। মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ ধর্মেরই

১ অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। (বৈঃ দঃ ১।১।১ সূঃ)

২ যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। (বৈঃ দঃ ১।১।২ সূঃ)

ফল ইহা সমস্ত বৈদিক দার্শনিকের সিদ্ধান্ত। সুতরাং বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সমস্ত বাসনাই সিদ্ধ হয় বলিয়া মহর্ষি কণাদও স্বীকার করেন। কেবল ঐহিক বা পারত্রিক সুখ-প্রাপ্তিই নহে, সর্বদুঃখনিবৃত্তি বা মোক্ষও বেদোক্ত মার্গ অনুসরণ করিলে সিদ্ধ হয়—ইহাও মহর্ষির স্বীকৃত। পুত্র, পশু প্রভৃতি ইহলৌকিক সুখের উপকরণ লাভের জন্য বেদে পুত্রেষ্টিযাগ, উদ্ভিদ্‌যাগ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে; স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যও অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। মোক্ষলাভের জন্যও শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সুতরাং মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন, বেদে তাহার পূরণ করিবার পথের নির্দেশ আছে। এইজন্যই মহর্ষি অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায়কে ধর্ম বলিয়া নির্ধারণ করায় বেদবর্ণিত অভীষ্টসিদ্ধির উপায়কেই ধর্মরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বেদে বর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে হইলে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় আবশ্যক। বেদ যদি প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে বেদের প্রতি কোনও বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না এবং সেইক্ষেত্রে বেদবিহিত অনুষ্ঠানকে ধর্মরূপে গ্রহণ করিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এইজন্যই মহর্ষি কণাদ তৃতীয় সূত্রে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, 'তদ্‌বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' (বৈঃ দঃ ১।১।৩ সূঃ)। এই সূত্রটির অর্থ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই বেদ প্রমাণ, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণনামক বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিবার বহুবিধ যুক্তি বিভিন্ন আস্তিক দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। সেই বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক এবং ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। প্রত্যক্ষ প্রমাণই বেদের প্রামাণ্য প্রতিপাদনে সক্ষম—ইহা বুঝাইবার জন্য ন্যায়দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি গৌতম বলেন, 'মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের ন্যায় বেদবক্তা আপ্তব্যক্তির প্রামাণ্য-বশতঃ বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।' ('মন্ত্রায়ুর্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ"— ন্যায় দঃ ২।১।৬৮ সূঃ)। এখানে মহর্ষি গৌতম আপ্ত-বাক্য বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষির অভিপ্রায় এই যে—বেদ প্রমাণ, কারণ বেদ আপ্তবাক্য। তত্ত্বদর্শী, করুণাপরায়ণ, জীবের কল্যাণকামনায় নিজের উপলব্ধ তত্ত্ব উপদেশে অভিলাষী পুরুষকে 'আপ্ত' বলা হয়। সুতরাং আপ্তপুরুষের বাক্যে কোন ভ্রান্তির সম্ভাবনা না থাকায় এবং প্রবঞ্চনাদি দোষের অসম্ভাব্যতার দরুন আপ্তবাক্য প্রমাণ হইবে। বেদে বহু অলৌকিক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণের বুদ্ধির অগোচর ঐসকল অলৌকিক তত্ত্ব বলিতে হইলে বক্তার তত্ত্বদর্শন আবশ্যক। সুতরাং যিনি ঐ সকল তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাঁহাকে সেই তত্ত্বের দ্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঐ তত্ত্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারেন না। অতএব অলৌকিক তত্ত্বদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ জীবের মঙ্গলকামনায় তাহাদের যাবতীয় দুঃখবিমোচনে অভিলাষী হইয়া কল্যাণ-ফলপ্রদ বেদ উপদেশ করিয়াছেন। অতএব আপ্তবাক্য বলিয়াই বেদ প্রমাণ। বেদে বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবৃত্তিকারক যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার দ্বারা বিষ প্রভৃতি দূর হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যও সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের মূলে কি আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, উহা আপ্তবাক্য বলিয়াই প্রমাণ। যিনি মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের কার্যকারিতা-শক্তি নিজে প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই

জীবের প্রতি করুণাবশতঃ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বক্তার তত্ত্বদর্শিতা ও জীবের প্রতি দয়া প্রভৃতি তাঁহার আপ্তত্ব সূচিত করে। সুতরাং আপ্তবাক্য বলিয়া আয়ুর্বেদ ও মন্ত্র প্রভৃতির প্রামাণ্য যেভাবে সিদ্ধ হয়, সেইভাবেই বেদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ আপ্তবাক্য হিসাবে প্রমাণরূপে গৃহীত হইলে বেদও আপ্তবাক্য বলিয়াই প্রমাণ হইবে। লৌকিক বাক্যের মধ্যেও যাহা আপ্তবাক্য তাহা প্রমাণরূপেই গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাক্যবক্তা আপ্তব্যক্তির প্রামাণ্যবশতই বাক্যের প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কোন ব্যক্তির কোন কথারই যদি প্রামাণ্য স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে লোকের সমস্ত রকম ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। এইজন্য লৌকিক বাক্যের মধ্যেও বক্তার প্রামাণ্যবশতই আপ্তবাক্যকে প্রমাণ বলিয়াই মানিতে হয়। অতএব আপ্তব্যক্তির প্রামাণ্যবশতই আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য সর্বত্র স্বীকার্য। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রত্যক্ষফলপ্রদ, ইহার বক্তা আপ্তব্যক্তি – ইহাও স্বীকার্য। এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝা যায় যে, বেদে অংশবিশেষ আপ্তবাক্য বলিয়া তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে সমগ্রবেদেরও তুল্যযুক্তিতেই প্রামাণ্য নিশ্চয় করা সম্ভব। এই বেদের বক্তারূপে একজন আপ্তপুরুষকে স্বীকার করিতেই হইবে। বলা বাহুল্য যে, ঐরূপ আপ্তপুরুষই ঈশ্বর।

ন্যায়দর্শনের সূত্রকার যে যুক্তিতে ঈশ্বর সিদ্ধ করিয়াছেন, মহর্ষি কণাদও তুল্যযুক্তিতেই ঈশ্বর স্বীকার করেন, ইহাই 'তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্'—এই সূত্রের তাৎপর্য।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলেন —উল্লিখিত সূত্রের 'তৎ' শব্দের দ্বারা তত্ত্বদর্শী অভ্রান্ত পুরুষকেই বুঝা যায়। এইরূপ অভ্রান্ত পুরুষ যে ঈশ্বরই হইবেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। কারণ সমাধিপ্রজ্ঞার সাহায্যে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ অভ্রান্ত। সুতরাং বেদের প্রবক্তারূপে ঋষিগণকেই বুঝিতে হইবে। বৈশেষিক দর্শনের অন্যতম আচার্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন—'আম্নায়-বিধাতৄণামৃষীণাম্'—অর্থাৎ ঋষিগণই বিভিন্ন বৈদিক সূক্তসমূহের প্রবক্তা। ন্যায়কন্দলীর টীকাকার শ্রীধরও বলিয়াছেন—'আম্নায়ো বেদঃ তস্য বিধাতারঃ কর্তারো যে ঋষয়ঃ' (প্রশস্তপাদভাষ্যসহ ন্যায়কন্দলীটীকা, কাশী সং ১৯৬৩, পৃঃ ৬২৭)। ইহার অর্থ—আম্নায় শব্দের অর্থ বেদ। ঋষিগণই বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে "তদ্বচনাদ্ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" এই সূত্রের 'তৎ' শব্দের অর্থ আমাদিগের অপেক্ষা বিশিষ্টগুণশালী বক্তা। সুতরাং তপঃ-শক্তিদ্বারা প্রকৃততত্ত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া ঋষিগণ বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়—ইহাই মহর্ষি কণাদের অভিপ্রায়। অতএব বেদের প্রবক্তারূপে মহর্ষি কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করেন, ইহা বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। বরং বেদবাক্যকে ঋষিবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বেদের আবির্ভাবসম্বন্ধে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তমন্ত্রে বলা আছে—

'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥'

সায়নাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে বলা যায় যে সহস্রশীর্ষা ঈশ্বর নামক পুরুষ হইতেই ঋক্ প্রভৃতি বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদের অন্যান্য স্থানেও ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর বেদকর্তা, ইহা শ্রুতি-

ও যুক্তিসিদ্ধ। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সাধনের যুক্তিরূপে বেদ-রচনা-কর্তৃত্বকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, অতিমহান্ ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিদ্যার আকর। এই বেদশাস্ত্র প্রদীপের ন্যায় সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রকাশক হওয়ায় প্রায় সর্বজ্ঞসদৃশ। সুতরাং এইরূপ ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের কারণ বা কর্তা ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ, এই বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। ('মহতঃ ঋগ্‌বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যা-স্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহি ঈদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্‌বেদাদিলক্ষণস্য সর্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি' (ব্রহ্মসূঃ শাঃভাষ্য ১।১।৩ সূঃ)।

ঋষিগণ বেদের রচয়িতা হইতে পারেন না, তাঁহারা বেদার্থের প্রবক্তা মাত্র। ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্বকীয় সমাধি-প্রজ্ঞাবলে যাঁহারা বেদার্থ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ঋষিনামে খ্যাত। ঋষিনামে প্রসিদ্ধ মহর্ষিগণ জন্মসিদ্ধ ঋষি নহেন। কিন্তু স্বকীয় সাধনার ফলে সমাধি-প্রজ্ঞাজনিত তত্ত্বদর্শনের দ্বারাই তাঁহাদের ঋষিত্বলাভ হইয়াছে। সমগ্র সাধনা-পদ্ধতি বেদেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমে বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদের বিহিত সাধনার বলেই তাঁহারা অলৌকিক প্রজ্ঞালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং ঋষিত্বলাভের পূর্বেই বেদ প্রবর্তিত ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। বেদে যিনি যে মন্ত্রের ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের রচয়িতা নহেন, দ্রষ্টামাত্র। ঈশ্বর-রচিত মন্ত্রাদিরূপ বেদবাক্যকেই সমাধিপ্রজ্ঞার সাহায্যে অবগত হইয়া ঋষিগণ লোককল্যাণের জন্য তাহার প্রবচন করিয়াছেন। ঈশ্বরভিন্ন আর কেহ নিত্যসিদ্ধ সর্বজ্ঞ না থাকায় এবং সর্বজ্ঞভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে বেদপ্রণয়ন করা সম্ভব না বলিয়া ঈশ্বরকেই বেদ-প্রণেতা বলিতে হয় যাঁহারা ঋষিগণকে বেদের প্রবক্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষিগণই প্রথম প্রবক্তা কি না, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। সুতরাং সর্বজ্ঞ হিসাবে ঈশ্বরকেই বেদের প্রণেতা এবং ঋষিগণকে বেদার্থের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

প্রকৃতপক্ষে সায়নাচার্যের ভাষ্যেও ঈশ্বর প্রণীত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্যসিদ্ধির কথা পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদসংহিতার উপোদ্‌ঘাত-ভাষ্যে সায়নাচার্য বলিয়াছেন, 'কর্মফলরূপ-শরীরধারিজীবনির্মিতত্বাভাবমাত্রেণাপৌরুষেয়ত্বং বিবক্ষিতমিতিচেন্ন, জীববিশেষৈরগ্নি-বায়্বাদিত্যৈর্বেদস্যোৎপাদিতত্বাৎ। ঋগ্‌বেদ এবাগ্নেরজায়ত, যজুর্বেদো বায়োঃ, সামবেদ আদিত্যাদিতি শ্রুতেঃ, ঈশ্বরস্যাগ্ন্যাদিপ্রেরকত্বেন নির্মাতৃত্বং দ্রষ্টব্যমিতি।' (ঋগ্‌বেদসংহিতা, উপক্রমণিকা, সাঃ ভাঃ)। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরই অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যকে বেদরচনায় প্রেরিত বা প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা বেদ উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং প্রেরক হিসাবে ঈশ্বর বেদকর্তা। ইহার ফলে বলা যায় যে, ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। কারণ, ঈশ্বর যদি অগ্নি প্রভৃতির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা না করিতেন, তাহা হইলে সহস্রশীর্ষা পুরুষ হইতে বেদের উৎপত্তি-বর্ণনা সঙ্গত হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বাৎস্যায়ন ভাষ্যকার এবং অন্যান্য শাস্ত্রকার প্রভৃতির বেদকর্তৃত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কারণ তাঁহারা আপ্তপুরুষকেই বেদবক্তা বলিয়াছেন। অগ্নি প্রভৃতি সাক্ষাৎভাবে বেদের প্রবক্তা—ইহাই

ভাষ্যকার প্রভৃতির তাৎপর্য। কিন্তু মূল রচনা-কর্তৃত্ব ঈশ্বরের—ইহাই তাৎপর্য। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থে উদয়নাচার্যও ঈশ্বরভিন্ন অপর কাহারও বেদকর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর 'কঠ' প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদের 'কাঠক' 'কালাপক' প্রভৃতি শাখা রচনা করিয়াছেন।[৩] উদয়নাচার্যের অভিপ্রায় এই যে, 'কঠ' প্রভৃতি নামক বেদাধ্যায়ীর নামানুসারেই সেই সেই শাখার 'কাঠক' প্রভৃতি নাম প্রচলিত হইয়াছে—বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদী মীমাংসকগণের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অধ্যেতৃবর্গের নামানুসারে শাখার নাম স্বীকার করিলে অধ্যয়নকারীর বহুসংখ্যাবশতঃ প্রত্যেকটি শাখারও বহু নাম হইত। যাহারা সেই সেই শাখার প্রকৃষ্ট অধ্যয়নকারী, তাহাদিগের নাম অনুসারেই শাখার নাম হইয়াছে—মীমাংসকগণের এই মতবাদও সঙ্গত নহে। কারণ অনাদিসংসারে ঐ সমস্ত শাখার প্রকৃষ্ট অধ্যেতা বা প্রকৃষ্ট বক্তা কয়জন, ইহারও কোন সঠিক নিয়ামক কিছু নাই। সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তিও অসংখ্য—ইহা বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। সৃষ্টির প্রথমে যাঁহারা যে শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামানুসারেই ঐ সমস্ত শাখার নাম প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপও বলা যায় না। কারণ মীমাংসকমতে প্রলয় অসিদ্ধ হওয়ায় সৃষ্টির প্রথম কালও অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরই 'কঠ' প্রভৃতি নাম-ধারী পুরুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদের শাখা রচনা করায় 'কাঠক' প্রভৃতি নামে সেই সেই শাখা পরিচিত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরই বেদকর্তা—ইহাই উদয়নাচার্যেরও অভিমত।

উপসংহারে বলা যায় যে, বেদকর্তা ঈশ্বর, সুতরাং ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়—কণাদের এই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন যুক্তি-দ্বারাই সমর্থিত হয়। ভারতীয় আস্তিক দর্শন-সমূহ সাধারণতঃ বেদমূলক। শ্রুতিও ঈশ্বরকে বেদকর্তারূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সায়ন-ভাষ্যেও ঈশ্বরের বেদকর্তৃত্ব স্বীকৃত। সুতরাং আস্তিক দার্শনিক মহর্ষি কণাদ শ্রুতি এবং যুক্তি—এই দ্বিবিধ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই ঈশ্বরকে বেদকর্তা বলিয়াছেন। নিরীশ্বরবাদী শাস্ত্র বহুস্থলেই নিন্দিত হইয়াছে।

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।'

অর্থাৎ আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই জগৎকে ঈশ্বরভিন্ন অন্যভাবেই উৎপন্ন বলে। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন নিন্দিত শাস্ত্র নহে। সুতরাং কণাদকে নিরীশ্বরবাদী বলা সঙ্গত হয় না।

বৈশেষিক দর্শনের আচার্য প্রশস্তপাদ এবং ন্যায়কন্দলী-টীকাকার শ্রীধর সৃষ্টি ও সংহারের কর্তারূপেই ঈশ্বর স্বীকার করেন, বেদকর্তারূপে নহে। তাঁহাদের মত বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

৩ 'সমাখ্যাপি ন শাখানামাদ্যপ্রবচনাদৃতে। তস্মাদাদ্যপ্রবক্তৃবচননিমিত্ত এবায়ং সমাখ্যাবিশেষসম্বন্ধ ইত্যেব সাধ্বিতি।' (ন্যাঃ কুসুঃ ৫।১৭)
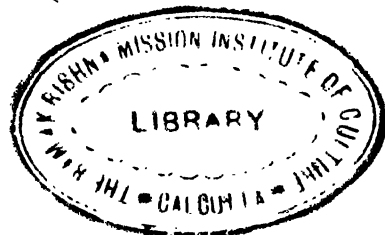
সমাধিযোগ

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

যোগ শব্দটি সাধারণভাবে "যুজির্ যোগে" সংযোগার্থক যুজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্নরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। "যুজ্যতে অনেন" অর্থাৎ যাহার দ্বারা সংযুক্ত হয় তাকে যোগ বলে। যেমন—কর্মযোগ বলতে যেরূপ কর্মের দ্বারা জ্ঞানে যুক্ত হওয়া যায়, তাকে কর্ম-যোগ বলে। অবশ্য এখানে যোগ শব্দটি উপায়ার্থক। যা জ্ঞানের উপায় তা হচ্ছে কর্মযোগ। এইরূপ সামান্যভাবে সংযোগ অর্থে অনেক প্রকার যোগ আছে। যথা—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি।

কিন্তু রাজযোগ বুঝাতে যেখানে যোগ শব্দের ব্যবহার হয়, সেখানে যোগ শব্দটি "যুজ্ সমাধৌ" অর্থে যুজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। এই হেতু যোগসূত্রের ভাষ্যকার বলেছেন—"যোগঃ সমাধিঃ স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ" অর্থাৎ সমাধিকে যোগ বলে। সেই সমাধি, চিত্তের সকল ভূমির ধর্ম। ভূমির অর্থ অবস্থা। সমাধিটি চিত্তের সব অবস্থার ধর্ম।

চিত্তের সকল ভূমির ধর্ম হচ্ছে সমাধি –এই কথা বললেই, প্রশ্ন হয়, চিত্তের ভূমি কতগুলি এবং কি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যোগ-ভাষ্যকার বলেছেন -"ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তম্, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ।" অর্থাৎ ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—এই পাঁচটি চিত্তভূমি বা চিত্তের অবস্থা। এখানে "ক্ষিপ্ত" ইত্যাদি শব্দকে ভাবার্থপ্রধানরূপে অর্থাৎ ক্ষিপ্তত্ব, মূঢ়ত্ব, বিক্ষিপ্তত্ব, একাগ্রত্ব ও নিরুদ্ধত্ব অর্থে বুঝতে হবে। কারণ ক্ষিপ্ত বললে চিত্তরূপ ধর্মীকে বুঝায়। আর ভূমি বলতে চিত্তের ধর্ম বা অবস্থাকে বুঝায়। অতএব সমাধি যখন চিত্তের ধর্ম আর ভূমিও যখন চিত্তের ধর্ম, তখন ক্ষিপ্তত্বাদি অর্থে ক্ষিপ্তাদি শব্দ বুঝতে হবে। অথবা ধর্মী ও ধর্মের অভেদ অভিপ্রায়ে ক্ষিপ্তাদিকে ভূমি বলা হয়েছে।

এখন এর উপর প্রশ্ন হয়—চিত্তের সকল ভূমিতেই যদি সমাধি থাকে, তাহলে তো জগতে কেউই অযোগী বা অসমাধিস্থ নাই বলতে হয়? অতি সাধারণ মানুষ যারা বিষয়াদিতে ঘোর আসক্ত, বিক্ষিপ্তচিত্ত বা অত্যন্ত তামসিক নিদ্রা তন্দ্রাদি যুক্ত তারাও যোগী বলে সিদ্ধ হোক্? এর উত্তরে যোগভাষ্যকার বলেছেন বিক্ষিপ্ত চিত্তে কখনও কখনও কোন বিষয়ে অতি অল্প-কাল চিত্ত একাগ্র হলেও বিক্ষেপই প্রধান বলে ঐরূপ চিত্তে যোগ বা সমাধি হয় না। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা বিক্ষিপ্ত অপেক্ষা হীন যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্ত তাতে যে যোগ হয় না, তা অনায়াসে জানা যায়। সুতরাং ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগের সম্ভাবনা নাই। একাগ্র অবস্থাতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হতে পারে। আর নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

প্রশ্ন হতে পারে—যদি ক্ষিপ্তাদি তিনটি ভূমিতে যোগ না হয়, তাহলে পূর্বে ভাষ্যকার "স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ" অর্থাৎ যোগটি চিত্তের সকল ভূমির সাধারণ ধর্ম—একথা বললেন কি করে? এর উত্তরে বাচস্পতিমিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি ভাষ্যের ব্যাখ্যামুখে বলেছেন যে, ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমিতে যদিও কোন কোন চিত্তবৃত্তির নিরোধ আছে,

যেমন ক্ষিপ্তভূমিতে মূঢ়বৃত্তির নিরোধ আছে, মূঢ়ভূমিতে ক্ষিপ্তবৃত্তির নিরোধ আছে, আবার বিক্ষিপ্তভূমিতে, ক্ষিপ্ত বা মূঢ় বৃত্তির নিরোধ আছে, তা হলেও ঐ তিনটি ভূমি যোগের লক্ষ্য ভূমি নয়, এইহেতু ঐ তিনটি হেয়। লক্ষ্য হচ্ছে একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমি—অতএব ঐদুটি উপাদেয়।[১] ভাষ্যকার প্রথমে যে "সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ" এই কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র বলেছেন—"ভূময়োঽবস্থা বক্ষ্যমাণা মধুমতী-মধুপ্রতীকা-বিশোকা-সংস্কারশেষাস্তা-শ্চিত্তস্য তাসু সর্বাসু বিদিতঃ সার্বভৌমশ্চিত্ত-নিরোধলক্ষণঃ যোগঃ, তদঙ্গস্তু সমাধির্নৈবন্তুতঃ।" অর্থাৎ ভূমির অর্থ অবস্থা, এই ভূমিগুলির কথা পরে (বিভূতিপাদে ভাষ্যকার কর্তৃক) বলা হবে, সেগুলি হচ্ছে—মধুমতী মধুপ্রতীকা বিশোকা ও সংস্কারশেষা (এর মধ্যে প্রথম তিনটি সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্গত, চতুর্থটি অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্গত)। এইগুলি সবই চিত্তের অবস্থা, এই সব অবস্থাতে জ্ঞাত যে চিত্তনিরোধ তা হচ্ছে যোগ। কিন্তু অঙ্গরূপ সমাধিটি এরূপ নয়। (অঙ্গরূপ সমাধির বিশদ আলোচনা আমরা পরে করবো।) বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, যোগের লক্ষণটি ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে অতিব্যাপ্ত হয় না। কারণ মধুমতী প্রভৃতি অবস্থাগুলি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতের মধ্যে পড়ে যায়। ক্ষিপ্তাদিতে সে অবস্থা থাকে না। অতএব "সার্বভৌম" শব্দে সর্বভূমি বলতে বাচস্পতিমিশ্রের মতে মধুমতী প্রভৃতি চারটি ভূমি বুঝাচ্ছে। কিন্তু ভাষ্যকারের ভাষ্য দেখলে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ —এই পাঁচটিকেই সর্বভূমি বুঝিয়েছেন। কারণ ভাষ্যকার "সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ" এই কথা বলার পরই "ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধম্ ইতি চিত্তভূময়ঃ।" —এই কথাই বলেছেন। আবার ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমিতে যোগের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যায় বলে তার বারণের জন্য "যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ভাষ্যকার "একাগ্র ও নিরুদ্ধ" এই দুটি ভূমিকে লক্ষ্য বলেই নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ অপর তিনটি ভূমি লক্ষ্যই নয়। বাচস্পতিমিশ্রও পরে ভাষ্য অনুযায়ী ক্ষিপ্তাদিভূমিতে যোগের লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করে তার নিবারণ করেছেন। অতএব বাচস্পতিমিশ্রের মতেও ক্ষিপ্তাদি পাঁচটি ভূমিই সকল ভূমি। তবে যে তিনি মধুমতী প্রভৃতি চারটি ভূমিকে সর্বভূমি বলেছেন, সেখানে 'সর্ব'-কথাটি সঙ্কুচিতার্থক বুঝতে হবে। অর্থাৎ যোগের লক্ষ্য সর্বভূমি হচ্ছে মধুমতী প্রভৃতি চারটি। চিত্তের সর্বভূমি কিন্তু ক্ষিপ্তাদি পাঁচটি। অতএব ভাষ্যকারের সঙ্গে বাচস্পতিমিশ্রের বিরোধ নাই।

যাই হোক্ সমাধিকেই ভাষ্যকার যোগ বলেছেন। 'সমাধি'-শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে অর্থ পাওয়া যায়—চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় চিত্তের যে অবস্থাতে সেই অবস্থাই সমাধি। সম্ (সম্যক্) আধীয়তে (একাগ্রীক্রিয়তে বিক্ষেপান্ পরিহৃত্য মনঃ) যত্র—এইরূপ অর্থে সম্ + আ + ধা (ধাতুর উত্তর) + কি (প্রত্যয়) করে 'সমাধি'-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। আর এই জন্যই যোগসূত্রকার বললেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ"—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। সাংখ্য ও যোগমতে অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ

১ "ক্লেশাদির বিরোধী চিত্তবৃত্তিনিরোধ"কে যোগের লক্ষণ বলে বুঝতে হবে এতে ক্ষিপ্তাদি তিন ভূমিতে অতিব্যাপ্তি হয় না।

স্বীকার করা হয় না, কিন্তু অভাবকে অধিকরণ-স্বরূপ স্বীকার করা হয় বলে—চিত্তবৃত্তির নিরোধ বলতে চিত্তবৃত্তির অভাবের অধিকরণ চিত্তকেই বুঝতে হবে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় যাহাতে অর্থাৎ চিত্তের যে ভূমি বা অবস্থাতে সেই অবস্থাকে যোগ বলে। ভাষ্যকার বলেছেন —"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই সূত্রে সূত্রকার 'সর্ব' শব্দটি ব্যবহার করেন নাই বলে যোগ বলতে সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত এই উভয় সমাধিকে বুঝতে হবে। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে রাজস ও তামস চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে। রাজস ও তামস চিত্তবৃত্তির নিরোধ হওয়ায় সংপ্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হলো। আর অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন চিত্তবৃত্তি থাকে না, সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় বলে, তা যোগশব্দবাচ্য। কেহ কেহ (আধুনিক কেহ কেহ) সংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে যোগ বলেন না। তাঁরা তাঁদের মত-সমর্থনে যুক্তি বলেন—সূত্রকার "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" এই সূত্রের অব্যবহিত পরেই "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" এই সূত্র বলেছেন। আধুনিক কাহারো কাহারো মতে এই সূত্রের অর্থ হচ্ছে—"তখন অর্থাৎ যোগাবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ নিজস্বরূপে অবস্থান করেন।" পুরুষ বা আত্মা কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ। তিনি সর্বদাই নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন তবে চিত্তের বৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ায় চিত্তের বৃত্তিটি যেমন যেমন হয়, চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষের বিবেক-জ্ঞানের অভাবে লোকে পুরুষকে সেইরূপ সেইরূপ মনে করে। চিত্তে সুখাকার বৃত্তি হলো, লোকে পুরুষকে সুখী মনে করলো। দুঃখাকার বৃত্তি হলো, লোকে পুরুষকে দুঃখী মনে করলো। অতএব যতক্ষণ চিত্তের বৃত্তি থাকে ততক্ষণ পুরুষ নিজস্বরূপে বস্তুত অবস্থান করলেও নিজস্বরূপে অবস্থান করেন না। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোন বৃত্তি না থাকায়, চিত্তে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে না। সুতরাং পুরুষ নিজস্বরূপে অবস্থান করেন। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে একটা না একটা বৃত্তি থাকে বলে পুরুষ নিজস্বরূপে অবস্থান করেন না। সুতরাং সংপ্রজ্ঞাত সমাধি যোগ নয়) কেবলমাত্র অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিই যোগ। আমরা যোগসূত্রকারের সূত্র দ্বারাই ইঁহাদের মত একটু পরে খণ্ডন করবো। প্রথমে অন্যান্য বহু শাস্ত্রে যে সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত এই উভয়কে যোগ বলা হয়, তার উল্লেখ করছি। জীবন্মুক্তিবিবেকে বিদ্যারণ্যমুনি সর্বানুভবযোগীর বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন— "ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽ-হঙ্কৃতিং বিনা। সংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ্ধ্যানা-ভ্যাসপ্রকর্ষজঃ॥" অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাসের প্রকর্ষ হতে অহঙ্কারশূন্য হয়ে যে ব্রহ্মাকার-মনোবৃত্তির প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

"প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদীপকম্।
অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনাং প্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ পরমানন্দপ্রকাশক বৃত্তিরহিত চিত্তই অসংপ্রজ্ঞাতনামক সমাধি—উহা যোগিগণের প্রিয়।

"প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥"
(গীতা ৬।১৪)

এই শ্লোকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলা হয়েছে। (মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥"
(গীতা ৬।১৫)

এই শ্লোকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলা হয়েছে। এখন যোগসূত্রকারের মত সংক্ষেপে

আলোচনা করা হচ্ছে। সংপ্রজ্ঞাত সমাধি যদি যোগশব্দবাচ্য না হতো, তা হলে "বিতর্ক-বিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ।" (যোঃ সূঃ ১।১৭) —এই সূত্র অনুপপন্ন হতো। আবার "বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ" (ঐ ১।১৮) এই সূত্রে "অন্যঃ" অর্থাৎ ভিন্ন কথার দ্বারা অসংপ্রজ্ঞাত যোগ সংপ্রজ্ঞাত হতে ভিন্ন এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয়। আর তার দ্বারা সংপ্রজ্ঞাত যোগও যে সমাধি তা সিদ্ধ হয়। নতুবা "অন্যঃ" কথাটি অনুপপন্ন হয়ে যায়। যোগভাষ্যকার, বাচস্পতি, বিজ্ঞানভিক্ষু, ভোজরাজ, ভাবাগণেশ, নাগোজীভট্ট, রামানন্দ, যোগচন্দ্রিকাকার, যোগসুধাকর—ইত্যাদি সকল ব্যাখ্যাকারই সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত এই উভয়বিধ যোগ স্বীকার করেছেন। সুতরাং "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" এই সূত্রে সূত্রকার দ্বিবিধ যোগই বলেছেন। ভাষ্যকারও দুইপ্রকার যোগ বলেছেন। এখন প্রশ্ন হবে সংপ্রজ্ঞাত সমাধিও যদি যোগ হয়, তা হলে—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽ-বস্থানম্" এই সূত্রের অর্থ কিরূপে উপপন্ন হবে। কারণ "তদা" পদের অর্থ করতে হবে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকালে। কিন্তু সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে বৃত্তি থাকে বলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান সম্ভব নয়। এর উত্তরে বলবো "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই সূত্রে দ্বিবিধ যোগ বলা হলেও সূত্রকার "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" সূত্রে "তদা" পদের দ্বারা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি-মাত্রকেই লক্ষ্য করেছেন। কারণ যোগসূত্রকার (চরম) অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে যোগীর লক্ষ্য-ভূত বলে ধরে, তার উপর জোর দিয়ে "তদা" অর্থাৎ অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধিকালে—এই অর্থই বুঝিয়েছেন। সূত্রকার অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধিকে প্রধান বলে ধরেছেন। লোকেও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমে "সলক্ষ্মণঃ রামঃ বনং গতঃ" বলে পরে "স হি রাবণং জঘান" বলে রামকেই প্রধানভাবে বুঝানো হয়। ভাষ্যকার এবং তদনুবর্তিগণের মতানুসারে এইভাবে "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" এই সূত্রস্থ "তৎ" পদটি দ্বিবিধ যোগের একাংশ অসংপ্রজ্ঞাতকে বুঝিয়েছে। ফলত "তৎ" পদের অর্থের সঙ্কোচ করা হয়েছে। কিন্তু ভোজ-বৃত্তিকার যে ব্যাখ্যা করেছেন—সেটা অনুধাবন-যোগ্য। তিনি বলেছেন—যাঁর বিবেকখ্যাতি (বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান—অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার) উৎপন্ন হয়েছে, তাঁর বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না। তাঁর কর্তৃত্বা-ভিমান নিবৃত্ত হয়ে যায় বলে, বুদ্ধির পরিণাম উচ্ছন্ন (নষ্ট) হয়ে যাওয়ায় পুরুষ বা আত্মা তাঁর স্বরূপে অবস্থান করেন।[২] সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়। বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হলে ক্রমশঃ বুদ্ধির পরিণাম উচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন পুরুষের স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। অবশ্য সবরকম সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যেরূপ সংপ্রজ্ঞাত সমাধি থেকে চিত্ত ধর্মমেঘধ্যানের দিকে অভিমুখ হয়, সেইরূপ সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতেই বিবেকখ্যাতি বা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন ভাষ্যকার বলেছেন—যখন চিত্তের রজঃ ও তমঃ সর্বথা অভিভূত হয়ে চিত্তের সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়, তখন চিত্তটি যেন নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন

২ অয়মর্থঃ—উৎপন্নবিবেকখ্যাতেশ্চিৎসংক্রমাভাবাৎ কর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্তৌ প্রোচ্ছন্ন-পরিণামায়াং বুদ্ধৌ চাত্মনঃ স্বরূপেঽবস্থানং স্থিতির্ভবতি॥ (১৷৩)

চিত্ত সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি (বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকার) যুক্ত হয়, সেইরূপ চিত্ত ধর্মমেঘ-ধ্যানাভিমুখ হয়। এই অবস্থাকে প্রসংখ্যান বলে।[৩] যোগদর্শনে আত্মসাক্ষাৎকার বা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিটি চিত্তেরই বৃত্তিবিশেষ। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগমতে চিত্তের কোন বৃত্তি থাকে না, কেবলমাত্র নিরোধ সমাধির সংস্কার থাকে। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতেই হয়। এই আত্মসাক্ষাৎকারের পরমনিষ্ঠা বা শেষসীমাই ধর্মমেঘসমাধি নামে কথিত হয়। যোগমতে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে ধর্মমেঘসমাধি বলা হয়নি, কিন্তু অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির কারণকে ধর্মমেঘসমাধি বলা হয়েছে—

"প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।" (যোঃ সূঃ ৪।২৯)।

ভাষ্য:—যদা অয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদঃ ততোঽপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, তত্রাপি বিরক্তস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতীতি সংস্কার-বীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাণ্যুৎপদ্যন্তে, তদা অস্য ধর্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি॥" অর্থাৎ যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বিবেকসাক্ষাৎকারেরও ফল যে সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বাদি, তাহাও প্রার্থনা করেন না, তাতে বিরক্ত হন, তখন তাঁর সর্বথা বিবেকসাক্ষাৎকারই হতে থাকে, তার ফলে সংস্কারের বীজক্ষয় হয়ে যাওয়ায় অন্যবৃত্তি (আত্মবিষয়ক-বৃত্তি ভিন্ন বৃত্তি) উৎপন্ন হয় না। তখনই সেই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির 'ধর্মমেঘ' নামক সমাধি হয়।

বাচস্পতি মিশ্র ও বার্তিককারের মতও প্রায় একরূপ।

বাচস্পতি মিশ্রের সর্বথা অনুগামী মণিপ্রভাটীকাকারও বলেছেন সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরূপ যে প্রসংখ্যান, সেই প্রসংখ্যানেও যাঁর আসক্তি থাকে না, তাঁর সেই বিবেকখ্যাতির (সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি বা আত্মসাক্ষাৎকারের) ধারারূপ 'ধর্মমেঘ' সমাধি হয়।[৪]

মোট কথা নির্বিচার নামক সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসের পরিপক্কতায় বা সাস্মিত নামক সংপ্রজ্ঞাত সমাধির প্রকর্ষে সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। এই আত্মসাক্ষাৎকারের পরাকাষ্ঠায় যখন আত্মসাক্ষাৎকারের ধারা চলতে থাকে, তাকেই যোগমতে 'ধর্মমেঘ' সমাধি বলে। যোগমতেও জ্ঞান বা আত্মসাক্ষাকার হ'তে মুক্তি স্বীকার করা হয় বলে, আত্মসাক্ষাৎকারের ধারা বা নিষ্ঠাটি অশুক্লকৃষ্ণ ধর্মকে অর্থাৎ কৈবল্যের সাধক জ্ঞানরূপধর্মকে দোহন করে বা সেচন করে বলে তার নাম হয় ধর্মমেঘ সমাধি। ধর্মমেঘ সমাধি থেকে পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, পরবৈরাগ্য দ্বারা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে থাকে।

কিন্তু বেদান্তিগণ ধর্মমেঘ সমাধিকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বা নির্বিকল্প সমাধি বলেন। যোগশাস্ত্রে যাকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয় বেদান্তে তাকে সবিকল্পক সমাধি বলে। আর যোগশাস্ত্রে যাকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে, বেদান্তে তাকে নির্বিকল্পক সমাধি বলে। অবশ্য উভয়শাস্ত্রে কিছু কিছু মতভেদ আছে। পঞ্চদশীকার নিবিকল্পক বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে

৩ তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি, তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। (যোঃ ভাঃ ১।২)

৪ তৎ প্রসংখ্যানম্, তত্রাপ্যকুসীদস্য কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদঃ রাগঃ, তদ্রহিতস্য সর্বাত্মনা বিবেকখ্যাতেরেব সন্ততিরূপো ধর্মমেঘসংজ্ঞঃ সমাধির্ভবতি।...প্রসংখ্যানে বৈরাগ্যাদ্ধর্মমেঘে সতি পরবৈরাগ্যোদয়াৎ প্রসংখ্যানস্য নিরোধো ভবতি।

ধর্মমেঘ সমাধি বলেছেন। যথা—

"ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নিবাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥"।

(পঞ্চদশী ১।৫৫)

*　　*　　*

"ধর্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ॥"

(ঐ ১।৬০)

টীকাকার রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ বলছেন—"ইমং নির্বিকল্পক-সমাধিং ধর্মমেঘং প্রাহুঃ।" অর্থাৎ যোগবিদ্‌গণ এই নির্বিকল্পক সমাধিকে 'ধর্মমেঘ' সমাধি বলেন।

বেদান্তমতে ব্রহ্মাকারাকারিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত-ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। নির্বিকল্পক সমাধিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় বলে ব্রহ্ম-বিষয়ক একটিমাত্র বৃত্তি থাকে। ইহা পঞ্চদশী-কার, আনন্দগিরি, বেদান্তসারকার প্রভৃতি বেদান্তিগণ স্বীকার করেন। পঞ্চদশীকার বলেছেন—

"বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ॥"

(পঞ্চদশী ১।৫৬)

অর্থাৎ নির্বিকল্পক সমাধিকালে আত্মবিষয়ক বৃত্তি থাকলেও তাহা অজ্ঞাত থাকে। সমাধি হ'তে ব্যুত্থিত ব্যক্তির উৎপন্ন স্মরণ আমি এতকাল সমাহিত ছিলাম এইরূপ স্মৃতি) হ'তে তা (বৃত্তি) অনুমিত হয়।

বেদান্তসারেও বলা হয়েছে—"জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি-বিকল্পলয়াপেক্ষয়া ব্রহ্মাকারাকারিতায়াশ্চিত্ত-বৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্॥"

অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এইসব বিকল্প লয় হয়ে গিয়ে ব্রহ্মাকারাকারিতচিত্তবৃত্তির ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত একীভূত হয়ে যে অবস্থান তা হলো নির্বিকল্পক সমাধি।

কিন্তু মধুসূদন সরস্বতী সুরেশ্বরাচার্যের মত অনুসারে বলেছেন—না, নির্বিকল্পক সমাধিতে কোন বৃত্তি থাকে না।[৫]

সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীও নির্বিকল্পক সমাধিতে বৃত্তির খণ্ডন করেছেন।[৬]

বেদান্তিগণের কেহ কেহ নির্বিকল্পক সমাধিকেই 'ধর্মমেঘ' সমাধি বলেন—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। যোগমতে ধর্মমেঘ সমাধি কাকে বলে তাও আমরা পূর্বে বলেছি। মধুসূদন সরস্বতী গীতার টীকায় যোগমতানুসারে 'ধর্মমেঘ' সমাধির কথা বলেছেন।

(গীঃ টীকা ৬।১৫)

৫ "ততো নিরোধসমাধিনা নির্বৃত্তিকেন চিত্তেন সংস্কারমাত্রশেষতয়া অতিসূক্ষ্মত্বেন নিরুপাধিকচিদাত্মমাত্রাভিমুখত্বাদ্‌বৃত্তিং বিনৈব নির্বিঘ্নং আত্মাঽনুভূয়তে।"

(গীতা : মধুসূদনী টীকা, ৬।২৫)

৬ "বেদান্তসারাদৌ তু নিরোধরূপেণ পরিণামোঽপি অসংপ্রজ্ঞাতঃ। স কেবলাত্মাকার-বৃত্তিরূপঃ। মনোবৃত্তিভানাভাবে সমানেঽপি মনোবৃত্তিসত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাম্ অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিসুষুপ্ত্যোঃ ভেদ ইত্যুক্তম। তন্ন। "মোক্ষে নির্বিষয়ং স্মৃতম্"……ইতি শ্রুতীনাং সূত্রাণাং চ বিরোধাৎ॥"

অর্থাৎ বেদান্তসারাদি গ্রন্থে নিরোধ রূপে চিত্তের পরিণামও অসংপ্রজ্ঞাত তাতে কেবল আত্মাকারবৃত্তি থাকে॥ সুষুপ্তি ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে মনের বৃত্তির প্রকাশাভাব সমানভাবে থাকলেও, সুষুপ্তিতে মনোবৃত্তি থাকে না, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে থাকে, এইজন্য উহাদের ভেদ আছে।

ইহা ঠিক নয়, কারণ মুক্তিতে মন নির্বিষয় ইত্যাদি শ্রুতি এবং "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" ইত্যাদি সূত্রের সহিত বিরোধ হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বেদান্তমতে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক সমাধির কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হলো। এখন আমরা প্রস্তাবিত সেই যোগমতে সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সম্বন্ধে কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা করছি। ভাষ্যকার প্রথমসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন—যোগ হচ্ছে সমাধি, সেই যোগ চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম। এখানে বাচস্পতিমিশ্র বলেছেন'—'স চ' (সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ) এইখানে "চ" শব্দটি "তু" শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে অঙ্গরূপ সমাধি থেকে অঙ্গিরূপ সমাধিকে পৃথক্ করে বুঝান হয়েছে। অঙ্গ-সমাধি বলতে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগাঙ্গের মধ্যে অষ্টম সমাধিকে বলা হয়েছে। আর "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই সূত্রে যে যোগ বা সমাধির কথা বলা হয়েছে, তাকে অঙ্গী সমাধিরূপে বলা হয়েছে। অঙ্গ সমাধির সূত্র—"যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" (যোঃ সূঃ ২।২৯)।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।" (যোঃ সূঃ ৩।৩)।

বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্ববৈশারদীটীকার ব্যাখ্যাতা রাঘবানন্দ সরস্বতী তত্ত্ববৈশারদীর ব্যাখ্যাকালে বলেছেন—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হলো অঙ্গী সমাধি। আর সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হচ্ছে অসংপ্রজ্ঞাতের অঙ্গরূপ সমাধি। বেদান্তসারকারও সবিকল্পক সমাধিকে নির্বিকল্পকসমাধির অঙ্গ বলেছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্ববৈশারদী দেখলে সংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে অসংপ্রজ্ঞাতের অঙ্গ বলে মোটেই মনে হয় না। পরন্তু সংপ্রজ্ঞাত-সমাধিও অঙ্গী সমাধি। আগেই বলেছি, বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন—"সার্বভৌমঃ, ভূময়োঽবস্থা বক্ষ্যমাণা মধুমতী-মধুপ্রতীকা-বিশোকা-সংস্কারশেষাস্তাশ্চিত্তস্য তাসু সর্বাসু বিদিতঃ সার্বভৌমশ্চিত্তনিরোধলক্ষণো যোগঃ, তদঙ্গস্তু সমাধির্নৈবন্তূতঃ।" অর্থাৎ ভূমি=অবস্থা, এই অবস্থাগুলি পরে বলা হবে —মধুমতী, মধুপ্রতীকা, বিশোকা, সংস্কারশেষা। এইসব ভূমিতে বিদিত (জ্ঞাত) সার্বভৌম চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ। কিন্তু অঙ্গসমাধি এইরূপ নয়। বাচস্পতির এই কথার দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও অঙ্গী সমাধির অন্তর্গত বুঝা যায়। কারণ মধুমতী, মধুপ্রতীকা ও বিশোকা এই তিনটি ভূমি সম্প্রজ্ঞাত ভূমি। সংস্কারশেষাটি অসংপ্রজ্ঞাত ভূমি। এছাড়া ১।২ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলেছেন "সর্বশব্দাগ্রহণাৎ সংপ্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে।" অর্থাৎ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই সূত্রে সর্বশব্দ গ্রহণ না করায় সংপ্রজ্ঞাতও যোগ নামে খ্যাত হয়। (যোগাঙ্গ নামে খ্যাত বলেন নাই)। শেষে বলেছেন—"দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ইতি।" অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ দ্বিবিধ। সূত্রকারের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তবে এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে এই যে—যোগাঙ্গসমাধি ও অঙ্গী সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে প্রভেদ কি? এর উত্তর স্পষ্টভাবে বাচস্পতি মিশ্র কিছু বলেন নাই। কিন্তু বিদ্যারণ্যমুনি তাঁর জীবন্মুক্তিবিবেকে ভেদ দেখিয়েছেন। যথা—"নমু সংপ্রজ্ঞাত সমাধিরঙ্গী স কথং ধ্যানানন্তরভাবিনোঽষ্টমাঙ্গস্য সমাধেঃ স্থান উদাহ্রিয়তে। নায়ং দোষঃ। অত্যন্তভেদাভাবাৎ।" অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিটি অঙ্গী। সেই অঙ্গী সমাধিকে কিরূপে ধ্যানের পরবর্তী অষ্টম যোগাঙ্গরূপ সমাধির স্থানে বলা হলো? (উত্তর) —এতে দোষ হয় না। কারণ অঙ্গ ও অঙ্গীর অত্যন্ত ভেদ নাই। "সাধনং, তু সংপ্রজ্ঞাতস্য সজাতীয়ত্বাদ্ধারণাদিত্রয়মন্তরঙ্গম্।" অর্থাৎ ধারণা,

ধ্যান ও সমাধিরূপ সাধন, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সজাতীয় বলে অন্তরঙ্গ।

যোগবার্তিককার বিজ্ঞানভিক্ষু অঙ্গ সমাধি ও অঙ্গী সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভেদ স্পষ্টভাবে বলেছেন। যথা—"অস্য চ সমাধিরূপস্যাঙ্গস্যাঙ্গিযোগ-সংপ্রজ্ঞাতযোগাদয়ং ভেদো যদত্র চিন্তারূপতয়া বিশেষতো ধ্যেয়স্বরূপং ন ভাসতে, অঙ্গিনি তু সংপ্রজ্ঞাতে সাক্ষাৎকারোদয়ে সমাধ্যবিষয়া অপি বিষয়া ভাসন্তে ইতি। তথা চ সাক্ষাৎকার-যুক্তৈকাগ্র্যকালে সংপ্রজ্ঞাতযোগঃ অন্যদা তু সমাধিমাত্রম্ ইতি বিভাগঃ॥" (৩।৩ সূত্রটীকা)। অর্থাৎ এই অঙ্গসমাধিটির, অঙ্গীসংপ্রজ্ঞাতসমাধি অপেক্ষা ভেদ এই যে, অঙ্গসমাধিটি ধ্যেয় বস্তুর চিন্তাস্বরূপ বলে, সেই অঙ্গসমাধিতে ধ্যেয়স্বরূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় না। আর অঙ্গী সম্প্রজ্ঞাতে ধ্যেয়বস্তুর সাক্ষাৎকার হওয়ায় সমাধির অবিষয়ভূত বিষয়ও প্রকাশিত হয়। সার কথা এই সাক্ষাৎকারাত্মক একাগ্রতাকালে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়, আর সাক্ষাৎকার না হয়ে যে সমাধি হয় তা হলো অঙ্গসমাধি। ভাষ্যকারের কথা থেকেও সংপ্রজ্ঞাত সমাধিরূপ অঙ্গী যোগ এবং অঙ্গরূপ সমাধির প্রভেদ বুঝা যায়। যথা— "তদেতদ্ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ম্ অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্বেভ্যো যমাদিসাধনেভ্যঃ। (যোঃ সূঃ ভাঃ ৩।৭)। অর্থাৎ যমাদি পূর্বের পাঁচটি সাধন অপেক্ষা এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ তিনটি অঙ্গ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। সম্যগ্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, যে যোগে, সেই যোগকে সংপ্রজ্ঞাত যোগ বলে। এই সংপ্রজ্ঞাত সমাধি সম্বন্ধে বহু বক্তব্য যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। সে সকল কথা প্রবন্ধান্তরে বলা যেতে পারে। এখন অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলে প্রবন্ধ সমাপ্ত করতে হচ্ছে। যোগসূত্রকার অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির উপায় ও স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন— "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কার-শেষোঽন্যঃ" (যোঃ সূঃ ১।১৮)। বিরাম অর্থাৎ বৃত্তিসকলের অভাব, তাহার প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ, সেই কারণের অভ্যাস দ্বারা যে সর্ববৃত্তির নিরোধ অথচ কেবলমাত্র সমাধির সংস্কারাবশিষ্ট চিত্তের অবস্থা তাকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ভাষ্যকার উক্ত সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন পর-বৈরাগ্যের অভ্যাস দ্বারা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। পরবৈরাগ্যকে বাচস্পতি মিশ্র 'জ্ঞান-প্রসাদ' বলেছেন। জ্ঞান-প্রসাদের মানে হচ্ছে নির্মল জ্ঞান। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যখন সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি বা বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বিবেকজ্ঞানের প্রসন্নতারূপ পরবৈরাগ্য হয়, তখন যোগী মনে করেন—এই বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানও পুরুষের তুলনায়, বিকারী অনিত্য, অতএব ইহাকেও নিরুদ্ধ করি। এইরূপ পর-বৈরাগ্য দ্বারা সেই জ্ঞানরূপ বৃত্তিকেও নিরুদ্ধ করে সর্ববৃত্তিশূন্য অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করেন। কিন্তু এখানে একটা আশঙ্কা হয় এই যে, সূত্রকার ও ভাষ্যকার দুই প্রকার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলেছেন ভবপ্রত্যয় ও উপায়-প্রত্যয়। ভব অর্থাৎ অবিদ্যা। অবিদ্যা হচ্ছে যে সমাধির কারণ, সেই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে 'ভবপ্রত্যয়' বলে। আর 'উপায়-প্রত্যয়' হচ্ছে শ্রদ্ধাদি উপায় দ্বারা যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। উপায়-প্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির প্রতি পর-বৈরাগ্য বা জ্ঞান-প্রসাদটি না [illegible]য় কারণ হোক্ ভবপ্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিটির প্রতি পরবৈরাগ্য কিরূপে কারণ হবে? কারণ ভবপ্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাতে তো অবিদ্যা থাকে। অতএব তার পূর্বে জ্ঞান হয় না। তার উত্তরে বলা যায় যে— "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ" এই সূত্রে বিরাম-প্রত্যয়ের

অর্থ—যার দ্বারা সকল বৃত্তির অভাব হয় তা। পরবৈরাগ্য দ্বারা সকল বৃত্তির অভাব হতে পারে, অবার প্রযত্নবিশেষ দ্বারা সকল বৃত্তির অভাব হয়। যেখানে প্রযত্নবিশেষ দ্বারা সকল বৃত্তির অভাব হয়, জ্ঞানপ্রসাদ বা পরবৈরাগ্য হয় না, সেই সমাধিই ভবপ্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত। ঐ ভবপ্রত্যয়েও কোন বৃত্তি থাকে না বলে তাৎকালিকভাবে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। এই বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা প্রবন্ধান্তরে করা যেতে পারে।

ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত*

ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। খুবই আশ্চর্যের কথা যে, এমন একটি বিষয় এ পর্যন্ত গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে আমরা একটিমাত্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার সন্ধান পেয়েছি. তার রচয়িতা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভবতোষ দত্ত। ডাঃ দত্তের মতে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের নায়কগণের মধ্যে একমাত্র রামমোহনেরই কিছু অর্থনৈতিক চেতনা ছিল, অন্যেরা তাঁদের প্রতিভাকে আবদ্ধ রেখেছিলেন ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে; এবং সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক্ষেত্রে অপর কারও পদ-সঞ্চার ঘটেনি; একেবারে শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে আমরা দেখা পাই রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নওরোজী এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডের, যাঁরা নবজাগ্রত ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ-গুলির বাস্তব রূপায়ণের উপযোগী অর্থনৈতিক সূত্রগুলির রূপ দিলেন।[১]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে, এঁরা উভয়েই প্রচুর অর্থনৈতিক চিন্তা রেখে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব উনিশ শতকের মধ্যভাগে, আর বিবেকানন্দের ওই শতাব্দীর শেষভাগে।

উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে নবজাগ্রত ভারতে যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তা মুখ্যত বিবেকানন্দের সৃষ্টি। রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক চিন্তা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে বলা যায়। রাজনৈতিক আদর্শসমূহকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজন হয় অর্থনৈতিক উপায়সমূহের। বিবেকানন্দ রাজ-নৈতিক চেতনা ঘটালেন, অথচ কোনরূপ অর্থ-নৈতিক চেতনা তাঁর নিজেরই ছিল না এ কথাটি আমাদের যুক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তা ছাড়া, ইতিহাস-চর্চাই রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক চিন্তার জন্ম দেয়।

* অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ ও বিভাগীয় প্রধান, বেথুনকলেজ, কলিকাতা। "বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন" গ্রন্থের ও শতাধিক প্রবন্ধের লেখিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা (১৯৬৬) ও অন্যান্য বহু বক্তৃতার জন্য প্রসিদ্ধ।

১ **Dr. B. Dutta : Evolution of Economic Thinking in India, (1962), p. 5.**

বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইতিহাসে বিবেকানন্দের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল—এ কথা অনেকেরই জানা আছে। এই ইতিহাসের ছাত্র নিকটবর্তীকালের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছিলেন বা তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নি তা তো সম্ভব নয়। সমকালীন জীবনের সকল দিকই গভীরভাবে তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং একালের সকল সমস্যারই মূলে প্রবেশ করবার প্রয়াস তিনি পেয়েছিলেন—এ কথা তাঁর সম্বন্ধে যাঁর কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনিই জানেন। বস্তুত, এ কালের ভারতের ঘোর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সমস্যাদি তাঁর চিন্তায় সকল সময়ই স্থান পেয়েছে, তাঁর মনোযোগের একাংশ সবসময় তাই নিয়ে ব্যাপৃত থেকেছে। তা শুধু নয়, এ কালের ভারতে তিনিই একমাত্র চিন্তাবিদ্ যিনি বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে পৌছুতে পেরেছিলেন। এ কথা যে আমরা নিছক বীরপূজার মনোভাবের বশবর্তী হয়ে বলছি না, তা আমরা তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তি-সহ এখানে আলোচনা করবার প্রয়াস পাবো।

বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের মূলকথা : বিশ্বের মূলীভূত সত্য অখণ্ড এক চেতন সত্তা যা সকল জীবে, সকল বস্তুতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। অর্থাৎ 'বহু' ও 'এক' একই সত্য। সুতরাং আমাদের সকল প্রয়াস, সকল প্রকার সংগ্রামই সত্যলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। ঐহিকে ও আধ্যাত্মিকে এদিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। নিবেদিতার ব্যাখ্যানুসারে—বিবেকানন্দের মতে—কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দির দ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র।[২]

এজন্য মানুষের জীবনকে বিবেকানন্দ দেখেছেন আশ্চর্য এক সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে। কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়, মানুষের কোনও ক্ষেত্রের বিকাশই অগ্রাহ্যের নয়। আর্থিক উন্নতিরও প্রয়োজন আছে, মানবীয় বিকাশের জন্য তার অত্যন্ত প্রয়োজন।

বস্তুত ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য, জনগণের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য তিনি সারাজীবন ধরে আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন। যখন সংস্কারকেরা বলেছেন কেবলমাত্র উঁচুতলার মানুষদের সমাজ-সংস্কারের কথা, তখন একমাত্র তিনিই বলেছেন নীচুতলার অগণিত মানুষদের দারিদ্র দূরীকরণের সমস্যার কথা। তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তাদের মর্মন্তুদ দারিদ্রের বর্ণনা করে তিনি বলেছেন : 'অপূর্বকারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটিরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা··· বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থি-মজ্জা-চর্বণ, অনশন-অর্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান···।'[৩] তাঁর সুদৃঢ় মত—'ভারতের সমুদায় দুর্দশার মূল জনসাধারণের দারিদ্র।'

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চেতনার মূলে আছে তাঁর অসামান্য ইতিহাস-জ্ঞান –একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর নিকটবর্তীকালের

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, (১৩৬৯), ভূমিকা, পৃঃ ১৵০

৩ তদেব, ৬।১৪৯

অর্থনৈতিক ইতিহাস কি ?

ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে সংঘটিত হয়—তাঁতী মলঙ্গীদের বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, দেবী সিংহের বিরুদ্ধে চাষী বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহ প্রভৃতি। সম্ভবত এই ইতিহাসই তাঁকে কৃষক শ্রমিক ও শূদ্র যুগের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে প্রথম সচেতনতা এনে দিয়েছিল।

শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও অনুরূপ গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে তিনি যে পরিপূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থ পাঠ করলে জানা যায়। সেখানে তিনি সোস্যালিজম, এনার্কিজম্, নাইহিলিজ্ম প্রভৃতি বিপ্লবাত্মক মতবাদগুলির সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চেতনার মূলে নিকটকালের ইতিহাস ছিল। এ ছাড়া ছিল অর্থনীতির শাস্ত্রীয় জ্ঞান। সমকালীন ইতিহাসে দেখা যায় ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি Adam Smith-এর অর্থনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি রচনা করেন। বিবেকানন্দও যে এঁদের মতই তৎকালীন অর্থ-নীতিশাস্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এরিক হ্যামণ্ড প্রভৃতির দেওয়া সাক্ষ্যে। এরিক হ্যামণ্ড তাঁর স্মৃতিচারণায়[৪] লিখেছেন যে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, শ্রোতারা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও ইংরাজী ভাষায় আশ্চর্য অধিকার দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু তাঁরা দেখেছিলেন যে স্বামীজী ইতিহাস ও অর্থনীতিশাস্ত্রেও (Political Economy) সমভাবেই অভিজ্ঞ। তাঁদের দেশের নিজস্ব ভিত্তিভূমির (অর্থাৎ অর্থনীতিবিজ্ঞান) উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজীকে 'শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ ছাড়া মেরী লুই বার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ বিষয়ে উদ্‌ঘাটন করেছেন। ধর্মমহাসভায় খ্যাতিলাভের পূর্বে বিবেকানন্দ American Social Science Association-এর বাৎসরিক সম্মেলনে 'ভারতে রূপোর ব্যবহার' সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[৫] সেদিনের মুখ্য*

৪ Reminiscences of Swami Vivekananda, 1961), p. 298

৫ Swami Vivekananda in America : New Discoveries (1958), p. 44

* তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Bimetallism নিয়ে experiment চলছিল। স্বর্ণের সঙ্গে রৌপ্যও মুদ্রার ভিত্তি হিসাবে চলতে পারে কিনা—এ নিয়ে তখন বহু আলোচনা হয়েছে। ভারতবর্ষেও এর পরীক্ষার প্রচেষ্টা চলছিল এ সম্পর্কে Jather & Beri-র Indian Economics (1957 Edition -এর P. 279 -এ বলা হয়েছে—"From 1874 there was persistent public agitation for a gold standard and a gold currency. The Govt. of India was, however, hoping that the attempts which were being made on an international scale in favour of international bimetallism would be crowned with success" ১৮৯৩-এ American Social Science Association-এ আলোচিত প্রত্যেকটি Paper-এর শিরোনামা দেখলেই বোঝা যায় যে মূল তর্কবিতর্ক হয়েছিল Bimetallism চলতে পারে কি না, রৌপ্যের ব্যবহার (স্বর্ণের সঙ্গে) কতটা চলতে পারে।

আলোচ্য বিষয় দ্বিধাতুতত্ত্বের (Bimetallism) অন্তর্গত ছিল এই আলোচনা। অর্থনীতিশাস্ত্রের এক দুরূহতম অংশের অন্তর্ভুক্ত এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন অজ্ঞ ব্যক্তির ঐ শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতদের সমাবেশে ঐরূপ ভাষণপ্রদান কখনই সম্ভব ছিল না। সুতরাং সন্দেহ নাই যে, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিবেকানন্দের ঐ শাস্ত্রেও বিশেষ অধিকার ছিল।

এই জ্ঞান যে তিনি শুধু Adam Smith বা J. S. Mill-এর গ্রন্থপাঠ করেই আয়ত্ত করেছিলেন তা নয়। তখনকার সংবাদপত্রগুলি —হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Hindu Patriot, শিশির ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা, অক্ষয় দত্তের তত্ত্ববোধিনী, ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Bengalee প্রভৃতি সে সময় আমাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে ইংরাজ শাসকদের অর্থ-নৈতিক নীতিসমূহ সম্বন্ধে নানা আলোচনায় পূর্ণ থাকতো। এর ফলে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। বিবেকানন্দের মতো অনন্যমননশীল ও সংবেদনশীল মানুষের ক্ষেত্রে যে সে-সচেতনতা সহস্রগুণ বেশী হয়ে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পত্রিকা-গুলির দ্বারা যদি কোন কাজ হয়ে থাকে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হল এইটি যে, বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ক্ষেত্র ও পরিমণ্ডল তারা রচনা করে দিয়েছিল।

একালের আর একটি ঘটনা বিবেকানন্দের আর্থিক চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সন্দেহ নাই। সেটি হল ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ সাল অবধি হিন্দু-মেলায় স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত দেশজ শিল্পের প্রদর্শনী। পরবর্তী কালে তিনি স্বয়ং এই সকল পুনরুজ্জীবনের আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন। পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত-ভ্রমণকালে দেশীয় রাজাদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছেন, আমেরিকায় দেশজ শিল্পজাত পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সংস্থা গড়বার প্রয়াস করেছেন, ভারতের অগণিত কর্মহীন মানুষদের জন্য কর্মসৃষ্টি ও তাদের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য তিনি এ প্রয়াস করেছিলেন।

কেবলমাত্র ইতিহাস-জ্ঞান বা অর্থনীতির পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাঁকে এক অনন্য অর্থনৈতিক সচেতনতা এনে দিয়ে-ছিল রোমাঁ রোলাঁ তাঁর জীবনের পরিব্রাজক অধ্যায়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে বলেছেন— 'তাঁহার জীবনে এমন আর একটি মুহূর্তও রহিল না, যখন তিনি গ্রামে ও নগরে কি ধনী, কি দরিদ্র, জীবিত নরনারীর দুঃখবেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যায়-অবিচার, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে থাকিতে পারিলেন…… জীবনের মহাগ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে বর্তমানের বেদনাক্লিষ্ট সকরুণ মুখখানি উন্মোচিত করিয়া ধরিল।…বিদ্বজ্জনের বিদ্যার সহিত যেমন ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, জনসাধারণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে যে গ্রাম্য ও নাগরিক অর্থনীতি, তাহার সম্পর্কেও তাঁহার ছিল তেমনি পরিপূর্ণ চেতনা।'[৬] গ্রাম্য ও নাগরিক অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় বাস্তব জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর অনন্য মহাগ্রন্থ "The Master As I Saw Him"-এ।

৬ Romain Rolland : Life of Vivekananda ঋষি দাস কৃত অনুবাদ (১৩৬৮), পৃঃ ১৯-২০

নিবেদিতা লিখেছেন যে, তাঁরা যখন স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করছিলেন তখন লক্ষ্ণৌ শহরে উপনীত হলে স্বামীজী তাঁদের লক্ষ্ণৌয়ের শিল্প ও বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের কথা, ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য যৌথ কৃষিসংগঠনের কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন এবং তাঁর ব্যাখ্যা শুনে তাঁদের মনে হয়েছিল যে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা ধরা পড়েছে তাই তাদের সামনে তুলে ধরেছেন।[৭]

বস্তুত বিবেকানন্দ যখন ভারত পরিক্রমা করছিলেন তখন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে এক মহাসঙ্কটকাল চলছিল। ইংরেজ শাসকেরা ভারতে যে ভূমি-রাজস্ব-নীতি অনুসরণ করছিলেন, যে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তারই ফলে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। শিল্প-বাণিজ্যে অবক্ষয় দেখা গিয়েছিল, কৃষি অর্থনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ঘটেছিল, শিল্পক্ষেত্র হতে কর্মচ্যুত লক্ষ লক্ষ লোক গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অপর-দিকে অত্যন্ত চড়া খাজনা দিতে অপারগ কৃষকেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এই সকল সম্মিলিত কারণের ফলে এই সময়ে ভারত প্রায় একটানা শতবর্ষ ধরে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। ১৭৭০ হতে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা ১১৭৬) ১৮৯৯ অবধি শতাধিক বৎসর ধরে ভারতের কোন না কোন অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা বিরামহীনভাবে ঘটে চলেছিল, একটি বৎসরও ব্যতিক্রম ছিল না। বিবেকানন্দ এই দুর্ভিক্ষের শতবর্ষকালের শেষদিকে (১৮৮৮-১৮৯৩) ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। একালের উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ ১৮৮৮-৮৯-এ উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার দুর্ভিক্ষ, ১৮৯১-৯২-এ আজমীঢ়-মারওয়ারের এবং মধ্য-মাদ্রাজ অঞ্চলের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যাতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ হারিয়েছিল, আরও লক্ষ লক্ষ লোক রোগ ও মহামারীর কবলে পড়েছিল।* দেখা যায় বিবেকানন্দ এই সময়ে (১৮৯১-৯২) আজমীঢ়-মারওয়ারের মধ্যাঞ্চলের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করতে করতে প্রথম গুজরাটে এসে উপনীত হন, পরে বেলগাঁও হয়ে দক্ষিণ দেশে পদার্পণ করেন।[৮] এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে করাল দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্গতি স্বচক্ষে দেখে তিনি নিদারুণ মর্মপীড়িত হন এবং এদের দুঃখ লাঘবের জন্য তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা করতে মনে মনে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের নিকট উপনীত হয়ে তাঁদের এ বিষয়ে অবহিত করার এবং জনগণের দারিদ্র ও অশিক্ষা দূরীকরণের কর্মে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস করেন।[৯]

১৮৫৪-৫৫ সাল থেকে ভারতে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। ১৮৯০ সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। এর পূর্বেই ১৮৮১ সালে ভারতে প্রথম কারখানা আইন (Factory Act) পাশ হয় মুখ্যত

৭ The Master As I saw Him, (1930), pp. 106-7

* Abraham, Sabins, Mehta and Parvati : A Text-book of Economic History (1966), পৃঃ ৮৮ এবং D. Bhattacharya : A Concise Economic History of India (Ist Edn.), পৃঃ ৫১-৬৫ দ্রষ্টব্য।

৮ স্বামী গম্ভীরানন্দ : যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১৩৭৩), ১।৩২০-৭২

৯ মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত : স্বামী বিবেকানন্দ (১৩৭০), পৃঃ ২৭৬

ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-শিল্পপতিদের উদ্যোগে।* এই আইন শ্রমিক-কল্যাণে নিযুক্ত সমাজসেবীদের সন্তুষ্ট করতে না পারায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হয়। গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করার সময় নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রমিক-জাগরণের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করেছিলেন এবং তখনই তা ভবিষ্যতে কি রূপ ধারণ করবে তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই উপলব্ধির কথা তিনি বারবার বিভিন্ন চিঠিপত্রে এবং 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বলেছেন। আমরা সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হই এ দেখে যে, তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই এ ক্ষেত্রেও ভাবী কালের চিন্তাকে প্রতিফলিত করেছেন আশ্চর্য রকম নির্ভুলভাবে।

তাঁর মতে সভ্যতার মূলশক্তি শ্রমশক্তি। এ ধারণার সঙ্গে Ricardo ও Marx এর ধারণার বেশ মিল পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে নিজের মতের সপক্ষে। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি বিশেষ আলোকপ্রদ —'ঐ যারা চাষাভুষা, তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতি-বিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে।

'হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে?'[১০]

এ প্রসঙ্গে তাঁর আরও অভিমত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তিস্বরূপ এই শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য আগামী সমাজে অনিবার্য। উচ্চবর্ণেরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। এই বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নোক্তরূপ—'এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল·· তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড়পর্বত থেকে।'[১১] এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আজ আমরা অতি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করছি।

বিবেকানন্দের মধ্যে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ও ইতিহাস-জ্ঞানের সম্মিলন ঘটায় তিনি যুগযুগান্তর ধরে ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যত্র

* তাঁরা মনে করতেন যে, ভারতে কারখানা আইন না থাকায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন খরচ কম এবং এই সুবিধার ফলে ভারতের বাজারে তাঁদের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য কমেছে।

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (১৩৬৯), ৬।১০৬ ১১ তদেব, ৬।৮১-৮২

শ্রমিক-শোষণের স্বরূপ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইংরেজ তথা পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধির মূলে যে শ্রমজীবীদের—বিশেষ করে ভারতের মত পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিকদের অবদান রয়েছে তা সেদিনের ভারতে তাঁর মতো করে আর কেউই উপলব্ধি করেন নি। স্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—'ইংরেজের ঘরে বাণিজ্য, রাজস্ব—সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন বড় জাত। …এ কথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না; ভারত—নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না; বুঝতেও চায় না।'[১২] সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পাকা অর্থনীতিবিদের মতো বিবেকানন্দ এখানে তুলে ধরেছেন।

এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার যে অচিরেই অবসান ঘটবে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী—সে কথাও তিনি বিভিন্ন স্থানে বলেছেন। বলেছেন একস্থানে, যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি, 'কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে।'[১৩] আরও স্পষ্ট করে অপর স্থানে বলেছেন—'শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সবদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজ্‌ম্, এনার্কিজ্‌ম্, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'[১৪] এখানে বিবেকানন্দ তদানীন্তন ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের তুলনায় সমকালীন কালকে অতিক্রম করে অগ্রগামী চিন্তা রেখেছেন। তাঁর পূর্বগামী বা সমসাময়িক কোন ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের চিন্তায় এই সমাজতান্ত্রিক চেতনা দেখা যায় না, এমন কি দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রানাডের চিন্তায়ও নয়। রামমোহনের চিন্তায় শূদ্র বা শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মত সুস্পষ্ট চেতনার পরিচয় আমরা পাই না, যদিও ভারতে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত করভার বিষয়ে ইংলণ্ডের আইনসভার নিকট তিনি আপত্তি জ্ঞাপন করেছিলেন দেখা যায়।[১৫] বঙ্কিম 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেও তাঁর মধ্যে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক চেতনা দেখা যায় না, কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তদানীন্তন প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারা কৃষকদের সকল অভিযোগের কারণ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। তিনি সদাশয় জমিদারগণের উপর আস্থাও প্রকাশ করেছিলেন।[১৬] বিবেকানন্দ উচ্চবর্ণের বা অভিজাতশ্রেণীর উপর কোন আস্থা প্রকাশ করেন নি, তীব্র ভাষায় তিনি বলেছেন—'কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে? অথচ ইহাদের নিষ্পেষণ করাতেই তাহাদের ক্ষমতার প্রাণশক্তি।'[১৭] মোটের উপর উচ্চশ্রেণীর হাতে সমাজ-অনুশাসন যে ন্যস্ত থাকবে না—এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের নিশ্চিত প্রত্যয়ের তুল্য প্রত্যয় বঙ্কিমের মধ্যে পাওয়া যায় না। দাদাভাই নওরোজী ভারতে ব্রিটিশ শোষণের স্বরূপ

১২ তদেব, ৬।১০৬ ১৩ তদেব, ৬।১০৬ ১৪ তদেব, ৬।২৪১

১৫ English Works of Rammohan—Evidence before the Select Committee of the British Parliament.

১৬ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য-সংসদ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭ ১৭ বাণী ও রচনা, ৭।৪

উদ্ঘাটিত করেছেন, কিন্তু সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও তার আর্থিক বুনিয়াদ সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেননি দেখা যায়। রমেশ-চন্দ্র দত্তের এ বিষয়ে ধারণা আরও অপরিণত; তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ এবং তুলাশিল্পের উপর অন্তঃশুল্কের অবসান ঘটাতে পারলেই ভারতের আর্থিক সমস্যার সমাধান ঘটবে। আর রানাডে ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে অধিকার-বৈষম্য রয়েছে, যা কিছু পরিমাণে আমাদের দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে সে বিষয়ে কোন সচেতনতা দেখাননি। তখনকার বাংলার প্রজাস্বত্ব আইনে যতটুকু অধিকার কৃষকদের দেওয়া হয়েছিল, তিনি তারও বিরোধিতা করেন।[১৮]

শুধু ভারতেই নয় পাশ্চাত্যেও বাস্তব অর্থ-নৈতিক জীবন হতে বিবেকানন্দ অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৫ সালে আমেরিকায় যখন তিনি ছিলেন, তখনকার পরিস্থিতি কবি এল্লা হুইলার উইলকক্স এইভাবে বর্ণনা করেছেন: 'ইহা সেই ভয়ঙ্কর শীত ঋতুর কথা যখন অর্থজগতে সর্বনাশ ঘটিতেছে, ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যাইতেছে ও বিধ্বস্ত বেলুনের ন্যায় কোম্পানির কাগজের দাম ভূমিস্পর্শ করিতে চলিয়াছে, ব্যবসায়ীরা হতাশার অন্ধকার উপত্যকামধ্যে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন এবং গোটা জগৎটাই যেন মনে হইতেছে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে।'[১৯] এই মন্দা প্রভৃতি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেই শিল্প-সমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ত্রুটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একটি মন্তব্যে প্রসঙ্গক্রমে বলেন: 'জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার অধিকার দাবি করাও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।......বর্তমানে যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব অধিকার দাবি করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা হয় নাই।'[২০] এই সকল একচেটিয়া ব্যবসায়ীশ্রেণী মুনাফার লোভে সাম্রাজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়েছে, নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বিদেশী বাজার অধিকার করতে চেয়েছে, বিদেশীদের স্বাধীনতা পর্যন্ত তারা এজন্য কেড়ে নিতে পিছুপা হয় নি। স্বামীজী এই শোষণ ও সম্পদ লুণ্ঠন সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য রেখেছেন: 'যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুটছে, শুষছে, তারপর সেপাই ক'রে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে। জিত হলে শাসকদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে।'[২১] ধনতন্ত্রের শোষণের পরিপূর্ণ রূপটি এই কথা কয়টির মধ্যে উদ্ঘাটিত। দেশের অভ্যন্তরে ধনিকেরা প্রজাদের শোষণ করে, আর বহিস্থ দেশগুলিকে পদানত করে রাখতে চায়। Lenin-এর Imperialism গ্রন্থ প্রকাশের বহু পূর্বে একথা বিবেকানন্দই প্রথম বলেন।

ভারতের দারিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে অর্থনীতিকদের মানদণ্ড ব্যবহার করে বলেছেন 'গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় দু টাকা'।[২২] এই সময় দাদাভাই নওরোজী ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করবার প্রথম

১৮. Dr. B. Dutta : Evolution of Economic Thinking in India.

১৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১৩৭৬), ২।২৫২

২০ বাণী ও রচনা, ৩।৩৩৮

২১ 'জনগণের অধিকার': স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় সং, শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখ সঙ্কলিত, পৃঃ ৮

২২ তদেব, পৃঃ ১৬

প্রচেষ্টা করেন। তিনি হিসাব দেন ভারতের জাতীয় আয় ৩০০ কোটি টাকা (১৮৭০ এ) এবং মাথাপিছু গড় আয় ২০ টাকা। বিবেকানন্দের হিসাব এরই কাছাকাছি। মনে হয় বিবেকানন্দ দাদাভাইয়ের জাতীয় আয় পরিগণনার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তা ব্যক্ত করে তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনানুসারে 'ভারতের কোন কোন অঞ্চলের মানুষ মাসের পর মাস বছরের পর বছর মহুয়া ফুল সেদ্ধ ক'রে খেয়ে জীবনধারণ করে। কোথাও কোথাও পরিবারের জোয়ান পুরুষেরাই কেবল ভাত খায়, নারী ও শিশুরা ফেন খেয়ে থাকে। ভারতের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে বলা যায়—মোটামুটি অনাহারই তাদের সাধারণ অবস্থা। আয়ের একটু হেরফের হলেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু।'[২৩] আজ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমরা দেখতে পাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 'গরিবী হঠাও' ধ্বনি দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে ভারতের দারিদ্র সম্পর্কে নূতন চেতনা এসেছে এবং এ নিয়ে বহু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ (যথা দাণ্ডেকার ও রথ (Dandekar ও Rauth), প্রণব বর্দ্ধন, অমর্ত্ত্য সেন প্রভৃতি) গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিবেকানন্দ প্রথম উনিশ শতকেই আমাদের ঘোর দারিদ্রের পরিচয় স্বল্প কথায় অতি সুন্দররূপে প্রদান করেন এবং তা উচ্ছেদ করবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

এ দারিদ্রের মূল কারণ তাঁর মতে দুটি - ১। ব্রিটিশ শোষণ ২। অভিজাত শ্রেণীদের নির্মম নিষ্পেষণ। এর প্রতিকার নির্দেশে তিনি যেমন জোর দিয়েছেন বিদেশী শাসনের অবসানের উপর, তেমনি অভিজাত শ্রেণীদের শোষণের অবসান ঘটানোর উপরও। এ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত তীব্র ভাষায় বলেছেন— 'আমরা গরীবদের পায়ে দলেছি অর্থলালসায়, তাদের কান্না শুনিনি। যখন তারা এক টুকরো রুটির জন্য কেঁদেছে, তখন আমরা সোনা রূপার থালায় খেয়েছি, তাদের দিকে দৃকপাত করিনি, তার ফল হল, মুসলমানেরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে কেটে পরাধীন করে ফেললে। ভারত বার বার এর ফলে পরাধীন হয়েছে।'[২৪] ইংরেজ শাসন ও শোষণ সম্পর্কেও তিনি তীব্র ভাষায় অনুরূপভাবে বলেছেন: 'ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁৎলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু শুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, আর তার ফলে পড়ে রয়েছে শ্মশানের মতো আমাদের দেশ।'[২৫]

ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাসহায়ে বৃহৎ শিল্প প্রসারের কথাও ভারতের দারিদ্র সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন। এবিষয়ে একটি মন্তব্যে তিনি বলেছেন, 'জাপানীরা বর্তমানকালের কি প্রয়োজন তা বুঝেছে। এদের দেশলাইয়ের কারখানা দেখবার জিনিস। এদের যে কোন জিনিসের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা করছে।...আর তোমরা কি...পৌরোহিত্যের আহাম্মুকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ।'[২৬] আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাসহায়ে অভূতপূর্ব ধনসৃষ্টি

২৩ তদেব, পৃ: ২১
২৫ তদেব, পৃ: ২৩
২৪ তদেব, পৃ: ২৩
২৬ বাণী ও রচনা, ৬।২৫৮

ও কর্মসৃষ্টি—এই তিনি চেয়েছেন। তার জন্য ঐহিক সভ্যতা এমন কি বিলাসিতাও' তিনি কাম্য মনে করেছেন। ভারত এজন্য লেখন ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে সহায়তা বিদেশের নিকট হতে গ্রহণ করবে, বিনিময়ে ভারতও কিছু দেবে। ভারত দেবে তাকে আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান। বৈদেশিক সহায়তার কথা কতকাল পূর্বে তিনি চিন্তা করে গিয়েছেন, আজ আমরা তাঁরই প্রদর্শিত পথেই উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

আশ্চর্যের বিষয় বৃহৎ শিল্প-সম্প্রসারণের যে কয়েকটি মন্দফল আছে সে সম্পর্কেও তিনি প্রতিবেদন রেখে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পড়লে বোঝা যায় অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যার জ্ঞান তাঁর মধ্যে কি সুন্দরভাবে সম্মিলিত হয়েছে। তাঁর মন্তব্যে তিনি বলেছেন, 'মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানার লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে—এক এক দলে এক একটা জিনিসের এক এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্ছে, তাঁতের সঙ্গে এগু পেছুই করছে। আজন্ম।...জড়ের মত কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়।'[২৭] বড় বহরের শিল্প ব্যবস্থার এটাই মূল ত্রুটি যে এতে মানুষকে যন্ত্র করে তোলা হয়, তার সৃজনীশক্তি লোপ পেতে থাকে—এ কথা বিবেকানন্দ অতি সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত করেছেন।

ভারতের মত দেশে যেখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেখানে কেবলমাত্র বড় বহরের শিল্পের দ্বারা যথেষ্ট কর্মসৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই করা সম্ভব নয়। সেজন্য ছোট বহরের কাজকর্মের ওপর তিনি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। নিবেদিতা বিষয়টির উপর আলোকপাত করে লিখেছেন, 'তিনি সকল সময়ে ক্ষুদ্র চাষী, ক্ষুদ্র সরবরাহ-কারীকে সমর্থন করতেন, এবং এ বিষয়ে যারা কেবলমাত্র বৃহদায়তন সংগঠনের পক্ষে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত, তিনি তাদের বিরোধিতা করেছেন।'[২৮] কৃষিক্ষেত্রেও ভারতে যন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, সেখানে আমেরিকার পদ্ধতিতে চাষ সম্ভব নয়, কারণ তার জোতের পরিমাণ ছোট বহরের —একথা তিনি তখনই উপলব্ধি করেছেন। আমাদের সেকথা বুঝতে এই স্বাধীনতা-উত্তর-কালেও অনেক সময় লেগেছে, অনেক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করতে হয়েছে। ভারতের অর্থ-নৈতিক বিকাশ পাশ্চাত্যের অনুকরণেই হোক এটা তিনি চাননি। পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক আর্থিক সংগঠন সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য রেখে গিয়েছেন--"দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্প-সংখ্যক লোকের করায়ত্ত। তারা নিজেরা কোন কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে।...এমন সামাজিক অবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী হতে পারে না। একথা সত্য যে কলকারখানা দ্রব্যাদি সুলভ করেছে, বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছে, কিন্তু কেউ ধনী হবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করবে, দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হবে, দলে দলে মানুষ ক্রীতদাস হবে—এ জিনিস হতে পারে না। স্বার্থপরতা এবং অহমিকাপূর্ণ বর্তমান

২৭ তদেব, ৬।৭৪

২৮ The Master As I Saw Him, 5th Edn., P. 295—লেখিকাকৃত অনুবাদ

ধনিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।'[২৯] রানাডে প্রভৃতি সকলের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি অগ্রগামী। ভারত তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী আর্থিক উন্নতির পথটি বেছে নিক, পাশ্চাত্যের অনুকরণে তার আর্থিক সংগঠন পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন নেই—এই তাঁর অভিমত। রানাডে প্রভৃতি চেয়েছেন পাশ্চাত্যের অনুকরণে উন্নতি। এখানেই বিবেকানন্দ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত, তাঁর চিন্তাধারার মূল্য সেজন্য অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। এটি হল আজকের দিনের গবেষকদের সঙ্গত ক্ষোভের কথা। বিবেকানন্দের টুকরো টুকরো কথাগুলো জুড়লে বোঝা যায় অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে দেশকে তিনি কতখানি অগ্রগামী চিন্তা দিয়েছেন। অথচ তাঁর চিন্তা যাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা এদিকটির উপর গুরুত্ব দেননি, সেজন্য অনেক মূল্যবান চিন্তা হারিয়ে গিয়েছে। ফলে গবেষকদের কাজ খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে, এবং তাঁদের দায়িত্বও অনেক বেড়ে গিয়েছে। যাই হোক, যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে, দেখা যায় তার মূল্যও অপরিসীম। যা পাওয়া গিয়েছে তা থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সমাজ-সচেতন অর্থনীতিবিদ এবং তিনি তাঁর চিন্তায় অগ্রবর্তী কালকে অতি সুন্দররূপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিফলিত করে গিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

২৯ 'জনগণের অধিকার', পৃঃ ৭-৮

একটা খবর

স্বামী চেতনানন্দ

খবরটা খুলেই বলি। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি.। সেখানে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন (Smithsonian Institution) নামে একটা খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান আছে। এর ইতিবৃত্ত অপূর্ব। যাঁর নামে সংস্থাটি, তিনি কখনও আমেরিকায় পদার্পণ করেন নি। কিন্তু আমেরিকানরা তাঁর মৃত্যুর ৭৫ বছর পরে কবর খুঁড়ে তাঁর অস্থিগুলোকে টেনে এনেছে ওয়াশিংটনে। খবরটা আজব নয় কি?

মানুষটির নাম ছিল জেমস্ স্মিথসন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। বাপ ছিলেন নর্দামবারল্যাণ্ডের প্রথম ডিউক এবং মা ছিলেন অষ্টম হেনরীর বংশোদ্ভব। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েও জেমস্ স্মিথসন কখনও বিয়ে করেন নি। নিত্য নূতন গবেষণায় ছিলেন দারুণ উৎসাহী। তিনি লিখেছিলেন, "প্রতিটি মানুষ সমাজের মূল্যবান স্তম্ভস্বরূপ। মনন, গবেষণা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ করে মানুষের সেবাই তার কর্তব্য।" ১৮২৯ সালে ইতালীর জেনোয়া শহরে জেমসের মৃত্যু হয়। তাঁর উইলে লেখা ছিল তাঁর সম্পত্তি আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি. সি. তে Smithsonian Institution প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয়িত হবে এবং ঐ সংস্থার উদ্দেশ্য হবে "increase and diffusion of knowledge among men." (মানবগণের মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রসার।) সার্থক দান। "যে দেয় তার হাত ধন্যি"—কথাটা চলতি, কিন্তু মূল্যে অমূল্য, গুণে গরীয়ান, মহত্বে মহীয়ান।

কারা এ সংস্থার ধারক ও বাহক?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত তিন জন সেনেট সদস্য ও আরও ১২ জন কংগ্রেস সদস্য।

এ সংস্থা কী ধরণের কাজ করে? বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রকাশন ইত্যাদি। এর প্রকাশন বিভাগ আজ পর্যন্ত ১০,০০০ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও পুস্তিকাদি প্রকাশ করে সারা বিশ্বে বিতরণ করেছে। ১৯৬০ সালে এর গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ছিল—৬১,০০০,০০০। এই সংস্থার বিভাগগুলির নাম The International Exchange Service, The United States National Museum, The National Gallery of Art, The Bureau of American Ethnology, The Zoological Park, The Astrophysical Observatory, National Air and Space Museums ইত্যাদি।

Smithsonian Institution-এর National Portrait Gallery বিভাগ আমেরিকার স্বাধীনতালাভের দ্বিশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। এটি তাদের তৃতীয় প্রদর্শনী। খুলেছে ৯ই এপ্রিল এবং খোলা থাকবে ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ পর্যন্ত। এতে আছে ২৯৮ খানা চিত্র। দর্শক যদি ধৈর্য ধরে হেঁটে ২৩৫ নম্বরে পৌঁছতে পারেন তবে দেখবেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বমহিমায় বিরাজিত। বিবেকানন্দ প্যাভেলিয়নে ছবির সংখ্যা আট। (১) স্বামীজীর ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিকাগো pose—যা প্রথম বের করে চিকাগোর Goes Lithographic Co. (সেপ্টেম্বর ১৮৯৩)। তাতে বড় ক'রে লেখা আছে—Swami Vivekananda, The Hindoo Monk of India এবং স্বামীজীর হস্তাক্ষর ও সইও আছে। (২) স্বামীজী ধর্মপাল ও বীরচাঁদ গান্ধী প্রভৃতির সঙ্গে চিকাগো ধর্মমহাসভার মঞ্চে উপবিষ্ট। ৩) প্যাসাডেনাতে স্বামীজীর পিকনিকের ছবি। (৪) দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী। (৫) Religious Vanity Fair (৬) If you want to be a Yogi (কার্টুন) (৭) Playbill for a performance of My Friend from India at Hoyt's Theatre, New York (1897) এবং (৮ বিবেকানন্দ কটেজ, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক।

Smithsonian Institution এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। গ্রন্থখানির নাম Abroad in America : Visitors to the New Nation (1776-1914)। আমেরিকান বিপ্লবের কাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যে সব খ্যাতনামা বিদেশী এই নূতন দেশ ভ্রমণ ক'রে তাঁদের মতামত রেখে গেছেন, তারই উপর ভিত্তি ক'রে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। এতে ২৯ জন ভ্রমণকারীর উল্লেখ আছে এবং এঁদের মধ্যে আছেন চার্লস ডিকেন্স, এইচ. জি. ওয়েলস প্রভৃতি। এঁরা এসেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আর্জেন্টিনা অষ্ট্রিয়া চীন কিউবা চেকোস্লোভাকিয়া ডেনমার্ক ইংলণ্ড ফ্রান্স হাঙ্গেরী ভারতবর্ষ আয়ার্ল্যাণ্ড ইতালী জাপান লেবানন লাইবেরিয়া নেদারল্যাণ্ড নরওয়ে পোল্যাণ্ড পর্টুগাল রাশিয়া স্কটল্যাণ্ড ও সুইডেন।

এসব বিদেশী ও বিদেশিনীরা যে কেবল আমেরিকার গুণ গেয়েছেন তা নয়; তাঁরা নবজাত যুক্তরাষ্ট্রের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান পর্যালোচনা করেছেন পত্রে-প্রবন্ধে, বক্তৃতায়-গ্রন্থে, শিল্পে-সঙ্গীতে। সত্যি বলতে কি আমেরিকা বিদেশীদের দ্বারা সৃষ্ট। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি A Nation of Immigrants গ্রন্থে

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উক্তির উল্লেখ করেছেন, "Remember, remember always, that all of us, and you and I especially, are descended from immigrants and revolutionists." বিদেশীদের রক্তে ও শক্তিতে গড়ে উঠেছে এ জাতি।

যা হোক ভারতবর্ষ থেকে বহু খ্যাতনামা অখ্যাতনামা ব্যক্তিই আমেরিকাতে এসেছেন, কিন্তু Abroad in America গ্রন্থে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ আছে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিশ্বতোমুখী দৃষ্টি ও বাণী দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আমেরিকার গণজীবনে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল—এটি ঐতিহাসিক সত্য। এবং ঐ ঐতিহাসিক সত্যের মূল্যায়ন করেছেন সি. পি. ত্রিপাঠী, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ইনি Indian Congress of American Historyর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেণ্ট। বর্তমানে এদেশে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক সংযোগের উপর গবেষণায় রত। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে প্রতি ভ্রমণকারীর বিষয় লিখেছেন তাঁরই স্বদেশের ব্যক্তি।

এখন আমরা শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠীর প্রবন্ধের আলোচনা করব। তিনি প্রথমে উদ্ধৃতি দিয়েছেন স্বামীজীর চিকাগো থেকে লিখিত (নভেম্বর ১৮৯৩) একখানি পত্র থেকে "এশিয়া সভ্যতার বীজ বপন করেছিল, ইউরোপ পুরুষের উন্নতি বিধান করেছে, আর আমেরিকা নারী ও শ্রমজীবিগণের স্বর্গস্বরূপ।...আমেরিকাবাসীরা দিন দিন উদারভাবাপন্ন হচ্ছে; আর যে আধ্যাত্মিকতা হিন্দুদের প্রধান গৌরবের বস্তু, এই মহান জাতি দ্রুত তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।"

প্রবন্ধকার স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করে চিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর সেই যুগান্তকারী উক্তির উল্লেখ করেছেন, "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এগুলির ভয়ংকর ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে হিংসায় জর্জরিত করেছে, নররক্তে রঞ্জিত করেছে; সভ্যতা হয়েছে বিধ্বস্ত এবং সমগ্র জাতিকে নিক্ষেপ করেছে হতাশার অন্ধকারে।...আমি মনে-প্রাণে আশা করি, এই ধর্মমহাসভার সম্মানার্থে আজ সকালে যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হল তা সকল ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যুধ্বনি ঘোষণা করুক; আর অবসান ঘটাক তরবারি ও লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও অসদ্ভাব।"

ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকং অর্থাৎ ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মমহাসভা পরম ধার্মিক স্বামী বিবেকানন্দের কপালে বিজয় তিলক পরিয়ে দিল। তাঁর উদ্বোধনী বাণী—"হে আমেরিকান বোনেরা ও ভায়েরা"—রাখীবন্ধন-উৎসব সৃষ্টি করল। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায়, "সাত হাজার জনতা এক অজানার উদ্দেশে অভিনন্দন জানাতে উঠে দাঁড়াল, এবং যখন উত্তেজনা কমল, দেখলাম অজস্র নারী বেঞ্চ ডিঙিয়ে তাঁর দিকে ছুটছে। আমি মনে মনে ভাবলুম, 'বাছা, তুমি যদি এ আক্রমণ সামলাতে পার, বুঝবে তুমি ভগবান'।"

স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের হৃদয়বত্তা ও সহৃদয়তার প্রশংসা করেছেন। তিনি বিন্দুতে সিন্ধু দেখতেন। নিজে বহুবার অত্যাচার সহ্য করেছেন, কিন্তু মানুষের ভাল দিকটি দেখাই তো সাধুর স্বভাব।

নারী ও গরীবদের পক্ষে আমেরিকা স্বর্গ সদৃশ। ত্রিপাঠী মহাশয় এ দুটি দিক দেখিয়েছেন বিশেষভাবে। তিনি খেতড়ীমহারাজকে লিখিত স্বামীজীর চিঠির উল্লেখ করেছেন (আমেরিক

১৮৯৪); "আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনেছি—শুনেছি সেখানে স্বাধীনতার নামে চলে উচ্ছৃঙ্খলতা, অনারীজনোচিত নারীরা তাণ্ডবনৃত্যের তালে গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তিকে দুপায়ে দ'লে ক'রে পযুর্দস্ত, আরও অনেক আজেবাজে কথা।... আমেরিকার নারীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও শোধ করতে পারব না।...প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে--যদি ভারত মহাসাগর কালির দোয়াত, সুউচ্চ হিমালয়ের পর্বতশিখর কলম, বিশাল পৃথিবী কাগজ হ'ত এবং অনন্ত কাল নিজে যদি লেখক হতেন, তবু তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসমাপ্ত থেকে যাবে।"

স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন নারীরাই আমেরিকান সমাজের প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষা-কৃষ্টি-ধর্ম-দান-সেবা সব কিছুতেই নারীরা অগ্রণী। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আমেরিকার নারী-জাতির মধ্যে মহাশক্তির উদ্বোধন। তিনি পত্রে লিখেছিলেন, "এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী,... এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা।...এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরী ক'রে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মরব।"

কাম-কাঞ্চনমুক্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তোষামোদের ধার ধারতেন না। আপসের বালাই ছিল না। সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন তিনি। তাঁর বচন যেমনি মিষ্টি তেমনি তেতো। তবে এ তিক্ততা অগ্রে 'বিষমিব' কালে 'অমৃতোপম'। স্বামীজী লিখেছেন (২৫।৯।১৮৯৪) "সব ভাল, কিন্তু ঐ যে 'ভোগ', ঐ ওদের ভগবান। টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।...শরীর হ'ল এদের ধর্ম, তাই মাজা, তাই ঘষা—তাই নিয়ে আছে। নখ কাটবার হাজার যন্ত্র, চুল কাটবার দশ হাজার, আর কাপড় পোশাক গন্ধ-মসলার ঠিক ঠিকানা কি?"

আমেরিকার পুরুষেরা মেয়েদের ভোগ্যপণ্য-রূপে ব্যবহার করে- স্বামীজী তার উপর কটাক্ষ করেছেন। পবিত্রতার বিনিময়ে বৌদ্ধিক উৎকর্ষসাধনে তৎপর এবং বিলাসিনী নারীদের দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্যের আদর্শ যে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা তা তিনি তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শাসন করা তারই শোভা পায় যে ভালবাসে। "আমি ইয়াঙ্কিদের ভালবাসি"—বলেছেন স্বামীজী।

"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—এ বাণী বুঝতে নবজাত আমেরিকার সময় লাগবে। স্বামীজী লণ্ডনে 'মায়া' বক্তৃতাতে উল্লেখ করেছেন, "আজকাল বৈরাগ্য বিষয়ে কথা বলা বড় অপ্রীতিকর। আমেরিকায় আমাকে বলত, আমি যেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বের কোন এক অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ থেকে এসে বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি।" ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিণত। ভূয়োদর্শী স্বামীজীর দৃষ্টিতে "পাশ্চাত্য দেশের লোকের পক্ষে ধর্মের উচ্চাদর্শ বুঝতে এখনও বহুদিন লাগবে। টাকাই হল এদের সর্বস্ব। যদি কোন ধর্মে টাকা হয়, রোগ সেরে যায়, রূপ হয়, দীর্ঘ জীবন লাভের আশা হয়, তবেই সকলে সেই ধর্মের দিকে ঝুঁকবে, নতুবা নয়।"

স্বামীজী আমেরিকার ভোগবাদকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পরিশোধিত ও রূপান্তরিত করবার ইঙ্গিত করেছেন। ভোগের দ্বারা ভোগ শান্ত হয় না—ভারতের এ মর্মবাণী তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে পাশ্চাত্য জগতে শুনিয়েছেন। অবশ্য জাগতিক উন্নতির দ্বারা দারিদ্র্যকে দূর করার ব্যাপারে আমেরিকার প্রচেষ্টাকে স্বামীজী অভিনন্দিত করেছেন। আমেরিকাতে মানুষের

প্রতি যে আশার বাণী ও আত্মমর্যাদা ঘোষিত হয়েছে তিনি তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন: "নিউইয়র্কে দেখতাম, আইরিশ ঔপনিবেশিকগণ আসছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃত-সর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য। সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হ'ল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishman-কে তার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট, তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হ'ল। নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে। বুকে সাহস বাঁধ। প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো। ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন। স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।"

স্বামীজী অনুভব করেছিলেন আমেরিকার প্রাণশক্তি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। স্বাধীনতা উন্নতির একমাত্র সোপান। পবিত্রতা ও প্রেম জগৎকে চালায়। তিনি ছিলেন আদান-প্রদানে বিশ্বাসী। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমবায়ে গড়ে উঠুক এক নতুন পৃথিবী। গবেষণাপ্রিয় আমেরিকাকে আত্মা আবিষ্কারে উৎসাহিত করেছেন স্বামীজী। তাই আজ স্বাধীনতা উৎসব উদ্‌যাপনের কালে আমেরিকা স্মরণ করেছে স্বামী বিবেকানন্দকে।

সমালোচনা

Spiritual Practices by Swami Akhilananda. Memorial Edition with Reminiscences by His Friends: Edited by Alice May Stark and Claude Alan Stark. Published by Claude Stark, Inc., Cape Cod, Massachusetts 02670, (1974), pp. 225 price 8.50 dollars.

স্বামী অখিলানন্দ দেশে ও বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, একটি প্রোজ্জ্বল নাম। তিনি ছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে একটানা ১৯৬২ সালে তাঁর দেহাবসান পর্যন্ত এই আচার্য-প্রবর প্রভূত কৃতিত্বের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রামকৃষ্ণ মিশনের পতাকা বহন করেন। তিনি ছিলেন বোস্টনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি ও প্রভিডেন্সে বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক। তাছাড়া তিনি ছিলেন সুবিদিত গ্রন্থকার। তাঁর লেখা Hindu View of Christ, Hindu Psychology, Mental Health and Hindu Psychology এবং Modern Problems and Religion ইতিমধ্যেই প্রায় চিরায়ত গ্রন্থরাজির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের মূলভাগটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। ১৯৭৪ সালে তাঁর আমেরিকাবাসী ভক্ত ও বন্ধুগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও

স্মৃতিচারণ সন্নিবিষ্ট করে স্মারকগ্রন্থরূপে বইখানি নবকলেবরে মুদ্রিত হয়।

বইটির অধ্যায়-সূচী এরকম: অধ্যাত্ম বিদ্যার্থীর যোগ্যতা। অধ্যাত্মগুরুর যোগ্যতা। ধর্ম কি আমাদের আবশ্যক? দীক্ষা কি? আধ্যাত্মিক রীতিপদ্ধতি। ধর্মীয় প্রতীকের মনোবৈজ্ঞানিক দিক। সার্থক ধ্যান। অতীন্দ্রিয়বাদ কাকে বলে? প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম।

মূলত, বইখানিতে অধ্যাত্মভাবনার কয়েকটি দিক ও অধ্যাত্মসাধনার কয়েকটি কার্যকর পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলি তাবৎ পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষের, নানান প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন সত্ত্বেও, একটি সাধারণ সর্বজনীন ভিত্তিভূমি হতে পারে—এমন কি অজ্ঞেয়বাদী ও পুরোপুরি নাস্তিক্যবাদীর পক্ষেও। কোন বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সঙ্গে এগুলির কোন অসঙ্গতি নেই; বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব নৃবিদ্যা মানবসমাজ-তত্ত্ব ইত্যাদি আধুনিক বিশ্বজিজ্ঞাসার সকল ক্ষেত্রের নতুন ফসলের সঙ্গেও এই সাধনার মর্ম ও রীতিগুলির নির্বিরোধ সহ-অবস্থান শুধু সম্ভব নয়, সহজ ও স্বাভাবিক।—এই হলো গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি বলেছেন যে, এ যুগের ধর্মের আসল উদ্দেশ্য: বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলোয় বিচার করে ঈশ্বর বা চরম সত্যের অন্বেষণ করা। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে ও সেইসঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অনুভব-অভিজ্ঞতা এবং তাঁর গুরুদেব ও অন্যান্য ভক্তভাইদের মুখে শোনা অনেক ঘটনার নজির দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, আত্মিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং তার দ্বারাই শুধু মানুষের জীবনের সকল শূন্যতা পূর্ণ হয়, সকল দুর্বলতা ও গ্লানি দূর হয় এবং সমাজ-সংসারে শান্তি হয়। বইটি সকল দেশের সকল সত্যান্বেষীর আন্তরজীবনের পথ-নির্দেশক পুস্তকের মতো। অত্যন্ত গভীর বিষয় অতি সহজ সুরে বলা।

হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থেই 'বলা'। বইটি কতকগুলি বক্তৃতার সংকলন। কিন্তু পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা বলে এই পথনির্দেশ দিতে হয়েছে তাঁদের পরিচিত পরিভাষায় ও তাঁদের জ্ঞাত ও অভ্যস্ত অধ্যাত্ম-দর্শনের ও সমকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের পরি-প্রেক্ষিতে। তবে পাঁচ / দশ দফা কর্মসূচী বা দ্রুত পাকপ্রণালীর মতো অতি সরল কলা-কৌশল তিনি বাতলাননি; কোন তুরীয় বটিকা সেবন বা যাদুমন্ত্রেরও তিনি বিধান দেননি। তাঁর বক্তৃতাগুলির মূল উপজীব্য—অদ্বৈতবেদান্তের আত্মতত্ত্ব; মূল সূত্রগুলির উৎস—মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র। যোগ-চতুষ্টয়ের বিশদ আলোচনা করে তিনি বলেছেন: যদিও ঠাকুরের মতো অবতার ও তাঁদের কৃপাধন্য যোগ্য আধারের পক্ষে বহুকালের জমাটবাঁধা অন্ধকার এক নিমেষে আলোয় আলোকময় করা সম্ভব, সাধারণত এপথ দীর্ঘ ও ক্ষুরধার; অনেক প্রস্তুতি ও অনুশীলনের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ধ্যানাভ্যাসের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্পষ্টত, বক্তব্য বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি।

শুধু স্বামীজীর প্রতিধ্বনি নয়। বিভিন্ন ভাষণের মধ্যে উপদেশ ও উদাহরণের পুনরাবৃত্তি আছে, যা অলিখিত বক্তৃতায় এড়ানো প্রায় অসম্ভব; পক্ষান্তরে বক্তৃতার স্বতঃস্ফূর্তি তাৎক্ষণিক আবেদন ও বেগের আবেগ গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে। সর্বোপরি, বক্তৃতা হলেও সে বক্তৃতা তো স্বামী অখিলানন্দের! তাঁর প্রতিভা প্রজ্ঞা চিন্তার

স্বচ্ছতা ও সত্যের গরিমায় প্রদীপ্ত ভাষা বইখানিকে মহিমময় করেছে। ইংরেজীজানা পাঠক মাত্রেরই শুধু মন যোগাবার জন্তে নয়, মনকে জাগাবার জন্তে, এ এক অসাধারণ মূল্যবান গ্রন্থ। প্রত্যেক উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাগারে বইটি থাকা উচিত; প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বইখানি পড়লে লাভবান হবেন।

এখন বলি, বইটির সংযোজনা, অর্থাৎ শ্রদ্ধার্ঘ ও স্মৃতিচারণ, সম্বন্ধে। আমেরিকার, বিশেষত ধর্ম দর্শন শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তানায়কগণের অনেকেই ছিলেন স্বামী অখিলানন্দের অন্তরঙ্গ—ও অধমর্ণ। প্রেমে ও প্রেরণায় তিনি ছিলেন, ইংরেজীতে যাকে বলে, তাঁদের বন্ধু দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। আবার তেমনি, বহু গরিব দুঃখী মানুষেরও—শুধু পারমার্থিক নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও—তিনি ছিলেন সহায় ও আশ্রয়। স্বামী অখিলানন্দের আমেরিকাস্থ অগণিত গুণগ্রাহীদের মধ্যে চব্বিশ জনের রচনা বইটির অভিনন্দন-অংশ। জনা তিনেক ছাড়া এঁদের মধ্যে সকলেই বিদেশী। এই লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি পড়তে লাগে কিছুটা প্রশংসাপত্রের মতো। অনেকেই স্বামী অখিলানন্দ স্বহস্তে পাক ও পরিবেশন করে তাঁদের আহারাদি করিয়ে কত তৃপ্তি পেতেন ও দিতেন তার উচ্ছ্বসিত উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, এগুলির মধ্যে থেকে স্বামী অখিলানন্দের যে ছবিটি ফুটে ওঠে তা হলো শাস্ত্রে বর্ণিত ঋষির—স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানতপস্বী, তথা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এবং সেইসঙ্গে আদর্শ কর্মযোগী। প্রবাসী বাঙালী কবির্মনীষী শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী স্বামী অখিলানন্দের যে হৃদ্য জীবনপ্রসঙ্গ লিখেছেন তার একটু অনুবাদ দিয়ে এ আলোচনা শেষ করি:

এই জ্যোতির্ময় পুরুষটি দুঃখ জানতেন। তাঁর আত্মিক আনন্দ ছিল প্রতিদিনের দুঃখ জয়ের আনন্দ—শুধু তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরে নয়, যখন তিনি শরীরের কষ্ট পেতেন: যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে অসংখ্য অসহায় নিরপরাধ মানুষের প্রতি যে অকথ্য অন্যায় করা হয়েছিল তার শরিক হয়েও অশুভ ও অনিষ্টকে জয় করতেন তিনি। সকল স্তরের, সকল অবস্থার মানুষকে তিনি কাছে টেনে নিতেন; তাঁরা তাঁদের গোপন বেদনা ও ছিন্ন বিভ্রান্ত জীবনের কথা তাঁদের এই সহৃদয় যাজক ও মনোবিজ্ঞানীকে জানাতেন। তিনি জানতেন বর্ণবৈষম্যের বলি হওয়ার যন্ত্রণা, অর্থবঞ্চিত মরিয়া মানুষের দুর্গতি, সংসারের ভাঙনের প্রত্যহের শিকার হওয়ার জ্বালা—এসব তিনি জানতেন। এঁদের জন্তে তিনি যা করতেন তা ক্ষতিপূরক ধর্মিষ্ঠতা ও শান্তিবচন সরবরাহ করার অতিরিক্ত কিছু: তিনি তাঁদের জীবনটাকে পালটে দিতেন। —**বকলম**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৪৩-তম বার্ষিক (১৯৭৪-৭৫ সালের) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ৫৭৫-টি শয্যাবিশিষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা মহানগরীর বর্তমান বৃহৎ হাসপাতালগুলির অন্যতম।

অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৬,৬৪৪। বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৮১,১৫৫, (নূতন রোগী: ৮৮,৩৮০; পুরাতন রোগী: ৯২,৭৭৫)। মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৫,৫৮৩। বহির্বিভাগে সকল রোগীই বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা-বিষয়ক

উপদেশ ও ব্যবস্থাদি লাভ করেন এবং বহু রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হন। অন্তর্বিভাগে ৪৩ শতাংশ রোগী বিনাব্যয়ে এবং ১৬ শতাংশ আংশিক ব্যয়ে চিকিৎসিত হন।

এই প্রতিষ্ঠানটিতে ২০টি বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে উহাদের কার্যাবলীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) সাধারণ চিকিৎসা বিভাগ :

এই বিভাগে বিশেষজ্ঞগণ সাধারণ রোগ ব্যতীত মনোরোগ ও স্নায়ুরোগেরও চিকিৎসা করেন। গুরুতর হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষ চিকিৎসার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত একটি ইউনিটও এই বিভাগে আছে। বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে যথাক্রমে ২৬,৫৩০ ও ১,৩৯৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

(২) সাধারণ শল্য-চিকিৎসা বিভাগ :

এই বিভাগে সর্বপ্রকার শল্য-চিকিৎসা করা হয়। বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে যথাক্রমে ১৭,৬২৩ ও ১,৩৭৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ৩৭০টি বড় ও ১,২১৮টি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়।

(৩) প্রসূতি বিভাগ :

(ক) প্রাক্‌-প্রসব ক্লিনিকের মাধ্যমে বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে যথাক্রমে ২৯,৭৪৫ ও ৮,০৪৫ জন রোগিণী চিকিৎসিত হন।

(খ) শিশুজন্ম বিভাগে মোট প্রসবসংখ্যা ৬,৩৬৭ ; মোট জীবন্ত শিশুর জন্মসংখ্যা ৬,২০৬ ; গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,২৩৪।

(৪) স্ত্রীরোগ বিভাগ :

সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগের চিকিৎসা এখানে করা হয়। বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে যথাক্রমে ১১, ৩৪০ ও ৮২৭ জন রোগিণী চিকিৎসিত হন। ৩৬৩টি বড় ও ৫৮৮টি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়।

(৫) শিশুচিকিৎসা বিভাগ :

(ক) যে-সকল শিশু নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করে বা অন্যান্য কারণে যে-সকল সদ্যোজাত শিশু অসুস্থ হয়, তাহাদের জন্য একটি পৃথক্‌ ওয়ার্ড আছে। সেখানে ২,৮৭২টি শিশু চিকিৎসিত হইয়াছিল।

(খ) প্রসবোত্তর আরেকটি বিভাগে জন্মের পর হইতে ২ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত চিকিৎসাও করা হয়। প্রসূতিগণকেও সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(গ) আরেকটি বিভাগে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু ও বালকদের চিকিৎসা করা হয়। ইহার বহির্বিভাগে ১৭,৮৬৩ ও অন্তর্বিভাগে ৮৫৫টি শিশু ও বালক চিকিৎসিত হইয়াছিল।

(৬) শিশু অস্ত্রোপচার বিভাগ :

বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৯৬৯ ও ৩৪৪। ৬২টি বড় ও ৯৩টি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়।

(৭) অস্থি শল্য-চিকিৎসা বিভাগ :

বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৯,৪২৯ ও ২৮৮। ২৫০টি বড় ও ৫৮৪টি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়।

(৮) মূত্রনালী-সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসা বিভাগ :

বহির্বিভাগে ১,৭৮০ জন এবং অন্তর্বিভাগে ৯৮ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ৮৫টি বড় ও ২৩১টি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়। স্ফীত প্রস্‌টেট গ্রন্থির শল্যচিকিৎসায় প্রয়োজন অনুযায়ী আধুনিকতম বিভিন্ন পদ্ধতি সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত হয়।

(৯) চক্ষুরোগ-চিকিৎসা বিভাগ :

বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ২০,৩৬১ ও ৩৮৭। অস্ত্রো-

পচারের সংখ্যা ৩৬২।

(১০) কর্ণ নাসিকা ও কণ্ঠ শল্যচিকিৎসা বিভাগ :

বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৮,৪৯২ ও ১৭৪। ৪৭টি বড় ও ৯৬টি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়।

(১১) দন্ত-চিকিৎসা বিভাগ :

চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫,৯০৯। এই বিভাগটি সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং বর্তমানে প্লাস্টিক সার্জারি সহ বিভিন্ন শল্যচিকিৎসা-প্রণালীর মাধ্যমে মুখাবয়বের বিকৃতি, ভগ্ন মুখাস্থি ইত্যাদি নানাবিধ জটিল রোগেরও চিকিৎসা করা হইতেছে।

(১২) চর্মরোগ-চিকিৎসা বিভাগ :

চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪,৯৫৫।

(১৩) রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসা বিভাগ :

রঞ্জন-রশ্মিসহায়ে পরীক্ষার সংখ্যা ১০,৭৮৮। ৩৫০টি ডীপ রঞ্জন-রশ্মিপাতের দ্বারা ৪৫ জন রোগীর চিকিৎসাও করা হয়।

(১৪) অবেদন-প্রক্রিয়া বিভাগ :

(ক) নবজাত শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ রোগীর প্রতি অবেদন-প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হয়।

(খ) প্রাক্-অবেদন ক্লিনিকে অবেদন-প্রক্রিয়া প্রয়োগের পূর্ববর্তী যাবতীয় পরীক্ষা প্রত্যহ করা হয়।

(গ) শ্বাসরুদ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য আধুনিকতম যন্ত্রসমৃদ্ধ একটি ক্লিনিক আছে। জল-নিমজ্জনহেতু শ্বাসরুদ্ধ কিছুসংখ্যক রোগীদের এখানে চিকিৎসা করা হইয়াছিল।

(ঘ) অবেদন-বিষয়ক নিয়মিত শিক্ষা-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

(১৫) নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষণ বিদ্যালয় :

বর্তমানে এই বিদ্যালয় ২২৫ জন ছাত্রীকে শিক্ষাদানে সমর্থ। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২০৫। মোট ৭৪ জন ছাত্রী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রত্যেক ছাত্রী মাসিক বৃত্তি পায়। কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোট ১৭৫ জন ছাত্রীর ব্যয়ভারের অধিকাংশই বহন করেন। ছাত্রীদের জন্য খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার-বিতরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। তাহাদের হোস্টেল ও বিদ্যালয়টি একটি সপ্ততল ভবনে অবস্থিত। সেখানে গ্রন্থাগার, সভাকক্ষ, প্রার্থনাকক্ষ ইত্যাদি আছে। ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

(১৬) জনস্বাস্থ্য-কর্মসূচী :

জনস্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা নার্সিং পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, নার্সিং-ছাত্রীদের জন্য গ্রামে ও শহরে একটি করিয়া অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রামাঞ্চলে (জনসংখ্যা ২,৪৯৭) ৩৫৮টি পরিবার এবং শহরাঞ্চলে (জনসংখ্যা ১,৭০৪) ৩১১টি পরিবার উপযুক্ত শিক্ষিকাদের অধীনে নার্সিং-ছাত্রীদের দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ে উপদিষ্ট হয় এবং বিনাব্যয়ে চিকিৎসাদিরও সুযোগ পায়।

(১৭) পরিবার-কল্যাণ-পরিকল্পনা কেন্দ্র :

বহির্বিভাগের ক্লিনিক ব্যতীত, অন্তর্বিভাগে বন্ধ্যাকরণের জন্য ১৫টি শয্যা নির্দিষ্ট আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে একটি অঞ্চলে (জনসংখ্যা ৬২,০০০) এই কেন্দ্রটি বিশেষভাবে সক্রিয়। আলোচ্য বর্ষে ৫,৮৫০ ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা বলা হয়। ২,৯১৪ স্বামী-স্ত্রীকে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হয়। ক্লিনিকের সংখ্যা ৩০৩, বন্ধ্যাকরণের সংখ্যা ৫৮৫, নির্বীজকরণের সংখ্যা ৩০।

(১৮) স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান ও গবেষণা বিভাগ :

'বিবেকানন্দ চিকিৎসা-বিজ্ঞান কেন্দ্র' নামে পরিচিত এই বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য অনুমোদিত। আলোচ্য বর্ষে চক্ষুরোগ-চিকিৎসা, শিশু-চিকিৎসা, সাধারণ শল্য-চিকিৎসা ও স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা বিষয়ে মোট ছয় জন ডাক্তার এম. এস. ও এম. ডি. ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিরত ছিলেন।

অধিকন্তু এই বিভাগটি ডি. সি. এইচ., ডি. জি. ও. এবং ডি. ও. উপাধির জন্যও স্বীকৃত। জুন ১৯৭৫-এর ডি. সি. এইচ. পরীক্ষায় এই বিভাগের ছাত্রীরা দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে গবেষণা করা হয়।

(১) মূত্রনালী-সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসা (২) সুপ্রজনন বিদ্যা (৩) শিশুচিকিৎসা (৪) প্রাণরসায়ন এবং (৫) চর্মরোগ-চিকিৎসা।

(১৯) ব্লাড ব্যাঙ্ক :

আলোচ্য বর্ষে ২,০৫১ বোতল রক্ত সরবরাহ করা হয়।

(২০ বীক্ষণাগারসমূহ :

মোট পরীক্ষার সংখ্যা :

জেনেটিক বীক্ষণাগার—৪,৭৬৯ ;

ক্লিনিক্যাল বীক্ষণাগার—৬৩,৮৮৩ ;

হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল বীক্ষণাগার—১,৩৯১ ;

বায়োকেমিস্ট্রি বীক্ষণাগার—২০,২২৩।

প্রকাশিত কার্যবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় আলোচ্য বর্ষে অবচয় (Depreciation) হেতু ২,০০,২২০ টাকা ছাড়াই ঘাটতির পরিমাণ ২,৭১,০০৬ টাকা। বস্তুতঃ প্রতি বৎসরই অবচয়ের অতিরিক্ত প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ে। এই ঘাটতি কিয়ৎ পরিমাণে পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হয়।

অন্তর্বিভাগে ১২৫টি নূতন শয্যা সংযোজনের জন্য, বহির্বিভাগে প্রশস্ত নূতন ভবনের জন্য এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান ও গবেষণা বিভাগাদির পৃথক্ ভবনের জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা আছে। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিবার জন্য, সঞ্চিত ঘাটতি পূরণের জন্য এবং একটি বা একাধিক শয্যার আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম গত ২৯শে অগস্ট ১৯৭৬ বাংলাদেশে একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে গ্রামের মক্তব হইতে তিনি নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় তাঁহার ছাত্রাবস্থাতেই। দারিদ্র্যহেতু সেই সময়েই তাঁহাকে নানা কাজে নিযুক্ত হইয়া অর্থ উপার্জনে মন দিতে হয়। তখন হইতেই কবিতা ও গান রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন। 'লেটো'-নৃত্যের কয়েকটি নাটকও তিনি তখন লেখেন। ১৯১৩ সালে নজরুল বর্ধমানের মাথরুন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। ইহার পর রাণীগঞ্জে সিয়ারসোল রাজ স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং ঐখানেই তাঁহার সহিত পরবর্তীকালের

বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার ঠিক প্রাক্কালে ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় পল্টনে যোগদান করিয়া নৌসেরা শিক্ষা শিবিরে যান ও তিন মাস পরে করাচীতে গমন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কোয়াটার মাষ্টার হাবিলদারের পদে উন্নীত হন। সৈনিক জীবনেও তাঁহার সাহিত্য-কর্ম অব্যাহত থাকে। ১৯১৯ সালে দেশে ফিরিয়া আসিয়া পুরোপুরিভাবে তিনি সাহিত্যচর্চায় রত হন ও রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রবেশ করেন। 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', ও লাঙল' পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

প্রায় চার সহস্রাধিক গান তিনি রচনা করেন। গানগুলিতে তিনি স্বয়ং স্বরারোপ করিতেন। তাঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীত ও শ্যামসঙ্গীতগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি যে গান রচনা করিয়া-ছিলেন তাহাতে তাঁহার ভক্ত হৃদয়ের ছাপ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গানটিও অপূর্ব। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে অগ্নিবীণা, ছায়ানট, দোলন চাঁপা, সিন্ধুহিল্লোল প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

'বিদ্রাহী' কবিতা লিখিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়া পড়েন। তাঁহার উন্মাদনাময় দেশপ্রেম ও মুক্তি-সংগ্রামের জন্য আহ্বানকারী কবিতাগুলি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভি-নন্দিত করেন ও সুভাষচন্দ্র তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ১৯২২ সালে 'আনন্দময়ীর আগমনী' কবিতা লেখায় ইংরাজ সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক দান করিয়া সম্মানিত করেন। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার তাঁহাকে সাহিত্যিক বৃত্তি দেন ও পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

দীর্ঘ ৩৪ বৎসর তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগেন এবং তাঁহার কবিকণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া যায়।

তাঁহার দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগুলি ভারত-বাসীকে চিরদিন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলি গৃহে-গৃহে মঠে-মন্দিরে গীত হইয়া হইয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে। তাঁহার বিদেহী আত্মার প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

জলবসন্তের প্রতিরোধক টিকা

গুটিবসন্ত বা আসল বসন্ত (smallpox)-এর টিকা (vaccine) বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহার সাহায্যে এই অসুখকে ভারতবর্ষ হইতে নির্মূল করা সম্ভব হইয়াছে এবং আশা করা যায়, কয়েক মাসের মধ্যেই সারা পৃথিবীতে এই রোগের লেশমাত্রও থাকিবে না। কিন্তু জলবসন্ত বা পানবসন্ত (chickenpox)-এর সেরূপ কোন টিকা ছিল না। সম্প্রতি কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডক্টর জলধিকুমার সরকারের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই রোগের সৃষ্টিকারক ভাইরাস বাহির করিয়া তাহা হইতে ইহার প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা সুস্থ মানুষ ও খরগোসের দেহে এই টিকা ইন্‌জেকসন দিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোনরূপ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া না হইয়া ইহাদের দেহে জলবসন্তের প্রতিরোধক এ্যান্টিবডি (antibody) সৃষ্ট হয়। অবশ্য যতদিন পর্যন্ত না ফিল্ড ট্রায়াল (field trial)-এর দ্বারা অর্থাৎ কিছুসংখ্যক জনসাধারণকে এই টিকা দিয়া জলবসন্তের হাত হইতে রক্ষা করা প্রমাণিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত ইহার বহুল প্রচার সম্ভব হইবে না। প্রমাণিত হইলে ইহা যুগান্তকারী আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত হারপিস্ জস্টার (Herpes Zoster) নামক অসুখের ভাইরাস ও জলবসন্তের ভাইরাস একই হওয়ার জন্য এই টিকার দ্বারা প্রথমোক্ত রোগ হইতেও রেহাই পাওয়া সম্ভব হইবে।

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ম (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৮তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্ম ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭।৹টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫।৹টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

দিব্য বাণী

স্পষ্ট্বাঽখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্ ।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥

শক্তিহীনং তু নিন্দ্যং স্যাদ্ বস্তুমাত্রং চরাচরম্ ।
অশক্তঃ শত্রুবিজয়ে গমনে ভোজনে তথা ॥
এবং সর্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে ।
সোপাস্যা বিবিধৈঃ সম্যগ্ বিচার্যা সুধিয়া সদা ॥

—দেবীভাগবত, ১।২।৫, ১।৮।৩৩-৩৪

ব্যবহারে সত্য, পরমার্থে মিথ্যা, অখিল ভুবনখানি
আপন ত্রিগুণ-শকতি-সহায়ে সৃজিয়া পালেন যিনি
বিনাশিয়া তারে কল্পশেষে একা বিহরেন আনন্দিতা
স্মরি তাঁরে আমি সবার জননী (সুরনর-প্রপূজিতা)।

শক্তিহীন হ'লে এই চরাচরে নিন্দনীয় সবে হয়,
গমনে ভোজনে অরাতি-দমনে অকর্মণ্যে কেবা চায় !
সর্বগতা শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী বিবেচিতা হন যিনি
নানাশাস্ত্র- আর সুমতি-সহায়ে বিচার্যা উপাস্যা তিনি ।

কথাপ্রসঙ্গে

শাক্ত কে?

১

শাক্ত কে?— এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, এক হিসাবে মানুষমাত্রেই শাক্ত, কারণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই শক্তির পূজারী। যখন কোন প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য কয়েক সহস্র ব্যক্তি সভাস্থলে সমবেত হন এবং উহা শুনিয়া মুগ্ধহৃদয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে থাকেন, তখন তাঁহারা সকলেই নিঃসন্দেহে বাক্-শক্তির পূজারী। যখন কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পিগণের সঙ্গীত উপভোগ করিতে শত শত গীতবাদ্যরসিক অর্থব্যয় করিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই সঙ্গীতশক্তির পূজারী। যখন কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ খ্যাতনামা কবিগণের কবিতা-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ' কাব্যরসের নন্দনলোকে উন্নীত হন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই কবিত্বশক্তির পূজারী। যখন তপস্যার ফলে ব্যক্তিবিশেষে 'সিদ্ধাই' বা অলৌকিক শক্তির বিকাশ ঘটে, তখন দলে দলে লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। কোন সন্দেহ নাই, এক্ষেত্রে মানুষ অলৌকিক শক্তির পূজারী। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে লীগ অলিম্পিক খেলার মাঠের কথা। স্মরণ করা যাইতে পারে ছায়াছবির প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গালয়ের কথা। আর স্মরণ করা যাইতে পারে শংকরাচার্য-উল্লেখিত সেই নিষ্ঠুর সত্য কথাটি—'যাবদ্ বিত্তোপার্জন-শক্তস্তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ / তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে বার্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।'—যতদিন মানুষ অর্থ উপার্জন করিতে পারে, ততদিনই তাহার পরিবারবর্গ অনুরক্ত থাকে, পরে যখন দেহ জরাজীর্ণ হয়, গৃহের কেহই কুশলপ্রশ্নাদি পর্যন্ত করে না।

দৃষ্টান্তের আধিক্য নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যা বিশ্লেষণ করিলে অনায়াসে উপলব্ধ হইবে যে, আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই বাক্‌শক্তি সঙ্গীতশক্তি কবিত্বশক্তি তপঃশক্তি স্মৃতিশক্তি ধীশক্তি কল্পনাশক্তি তথা দৈহিক শক্তির নিকট নতশির। সুতরাং অধিকাংশ মানুষই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শাক্ত।

২

তবে যিনি জ্ঞাতসারে শক্তির পূজারী, তিনিই 'শাক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। যিনি জগতের সর্বত্র এক মহাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া সশ্রদ্ধ অন্তরে সেই মহাশক্তির উপাসনা করেন, তিনিই শাক্ত। বৈদিক ঋষিগণ বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতিতে যে 'ঋতে'র —অলঙ্ঘ্য নিয়মের —সন্ধান পাইয়াছিলেন, শাক্ত সেই 'ঋতে'র মধ্যেই মহাশক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করেন। মহাকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সুশৃঙ্খল গতিবিধিতে, ঋতুসমূহের নিয়মিত আবর্তনে, জীবদেহের প্রতিটি অংশের বিস্ময়কর গঠন ও ক্রিয়াকলাপে, মানবমনের বিচিত্র বৃত্তিতরঙ্গভঙ্গে শাক্ত মহাশক্তির লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া জ্ঞাতসারে সেই অচিন্ত্য লীলাময়ী মহাশক্তির আরাধনা করেন।

বৈদিক যুগে আর্যগণ নৈসর্গিক শক্তিসমূহের পূজারী ছিলেন। নিসর্গ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ অথবা প্রচণ্ড সূর্য কিরণ, প্রবল বর্ষণ, জীমূত-নিস্বন, বজ্র-বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝাবর্ত ইত্যাদিতে শঙ্কিত ও বিপন্ন,

তাঁহাদের হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্ত স্তবস্তুতিপ্রার্থনা উৎসারিত হইত। কিন্তু সে স্তবস্তুতিপ্রার্থনা মুখ্যতঃ ইন্দ্র অগ্নি মিত্র বরুণ পর্জন্য প্রভৃতি পুরুষ দেবতাগণেরই উদ্দেশে নিবেদিত হইত। এই কারণে বৈদিক আর্যগণকে পরোক্ষভাবে শাক্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্য অদিতি দুর্গা পৃথিবী আদি দেবীর প্রতি নিবেদিত স্তবাদিতে যে প্রত্যক্ষভাবে শক্তিপূজার বীজ নিহিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বেদে জ্ঞাতসারে শক্তিপূজার নিদর্শন কিয়ৎ-পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও, শক্তিপূজা যে বেদেরই ফসল, একথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রাগ্‌বৈদিক যুগেও মানুষ জ্ঞাতসারেই প্রত্যক্ষভাবে শক্তিপূজা করিত, অর্থাৎ তখনও তন্ত্রেরই পারিভাষিক অর্থে শাক্তগণ বিদ্যমান ছিলেন।

যাহাই হউক, আমরা দেখিলাম, শাক্তগণ জ্ঞাতসারে শক্তির পূজারী। অধিকন্তু তাঁহারা শক্তিকে দেবীরূপে কল্পনা করেন এবং সর্বত্র সেই দেবীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং শাক্তের হৃদয়ের প্রথম কথা হইল :

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

বিশ্বব্যাপিনী একই মহাশক্তিকে শুভাশুভ যাবতীয় শক্তিরূপে—ক্ষুধা তুষ্টি নিদ্রা লজ্জা শ্রদ্ধা কান্তি স্মৃতি বুদ্ধি তৃষ্ণা ভ্রান্তি লক্ষ্মী অলক্ষ্মী দয়া শান্তি চিতি ইত্যাদি রূপে - প্রকাশিত দেখিয়া শাক্তগণ তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধাভরে বারংবার প্রণাম করেন।

আর যেখানে মহাশক্তির ঘনীভূত দিব্যপ্রকাশ, সেখানে যে তাঁহারা ইষ্টদেবীকে সাক্ষাৎ বিগ্রহ-বতী দেখিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য শাক্তগণ বিশেষভাবে গুরুপ্রতীকে এবং অবতার-প্রতীকে মহাশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। গুরুতে চিৎশক্তির পূর্ণ বিকাশ। গুরু 'জ্ঞান-শক্তি-সমারূঢ়ঃ তত্ত্বমালা-বিভূষিতঃ'। গুরু 'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা'র দ্বারা শিষ্যের চক্ষু উন্মীলিত করেন। সুতরাং শাক্তগণ গুরুতে চিৎশক্তির বিলাস প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শরণাগত হন। আবার সাধারণ সিদ্ধগুরু চন্দ্রসদৃশ, অবতারগণ সূর্যসদৃশ। যদিও একই চিৎশক্তি উভয়ত্র বিদ্যমান, তথাপি শক্তিসঞ্চার-সামর্থ্যে কল্পনাতীত তারতম্য থাকে। সুতরাং বহু শাক্তই গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় অবতার-প্রতীকে মহাশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

শাক্তগণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল নারী-প্রতীকে শক্তি-উপাসনা করা। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীতেই দয়া শান্তি ক্ষমা ধৃতি আদি শক্তির অধিকতর বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এবং শাক্তগণ ঈশ্বরকে মহাদেবীরূপেই কল্পনা করেন। সুতরাং নারীপ্রতীকে সেই মহাদেবীর—পরমা ঈশ্বরীর মাতৃরূপে উপাসনা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই তাঁহারা করিয়া থাকেন। তাই শাক্তের হৃদয়ের শেষ কথা হইল :

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

মাতৃত্ব নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সর্বভূতে বিদ্যমান। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপরি-উক্ত মন্ত্রই এই বিষয়ে প্রমাণ। তবে অধিকাংশ পুরুষে উহা সুপ্ত বা অভিভূত, যদিও বিরল কোন কোন পুরুষে উহার অদ্ভুত বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ

নারীর মধ্যেই মাতৃত্বের বিশেষ প্রকাশ নারীর শেষ পরিচয় নহে, সর্বকালীন পরিচয় তাহার মাতৃত্বে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা বা না করার উপর, এমন কি জায়াত্বের উপরও এই মাতৃত্ব নির্ভর করে না। নারীমাত্রেই বিশ্বজননীর অংশ। তাই শাক্তগণ সর্বভূতে—বিশেষতঃ নারীতে জগদম্বাকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা।'

৩

তন্ত্রে অবশ্য মাতৃভাব ব্যতীত জায়াভাবেও শক্তি-সাধনার কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং তান্ত্রিক আচার্যগণ অধিকারিবিশেষে জায়াভাবে সাধনারও উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি শক্তিকে জায়াভাবে উপাসনা করেন, সেই 'বীর' সাধককেও শাক্ত না বলিয়া গত্যন্তর নাই। তন্ত্রে পশুভাব বীরভাব ও দিব্যভাব—এই ভাবত্রয়ের উল্লেখ আছে। পশুভাবের সাধক অধম অধিকারী। তিনি দুর্বল এবং তাঁহাতে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের আধিক্য থাকায় তন্ত্র তাঁহাকে সর্বপ্রকার প্রলোভনের বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া গুরুদত্ত মন্ত্রজপাদিতে ও শৌচাচারে নিরত থাকিতে নির্দেশ দেন। বীর-ভাবের সাধক মধ্যম অধিকারী। তাঁহাতে পশু-ভাব অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তাঁহার প্রতি তন্ত্রের নির্দেশ এই যে, তিনি কামকাঞ্চনাদি প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বরে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ করিতে চেষ্টা করিবেন। দিব্যভাবের সাধক উত্তম অধিকারী। তাঁহার অন্তরে ভোগাভিলাষ একেবারেই না থাকায়, তিনি মাতৃভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অধিকারী—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, 'মাতৃভাব নির্জলা একাদশী।'

বীরভাবে সাধনার পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহাতে সাধকের পতন ঘটিয়া থাকে। স্বামী সারদানন্দ 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বীরভাবের প্রয়োগকুশল সিদ্ধগুরু ও অনুষ্ঠানকুশল সংযমী শ্রদ্ধাবান সাধক —উভয়ই বিরল এবং কেবলমাত্র সিদ্ধগুরুসহায় সংযমী ব্যক্তিই ঐ ভাবের উপাসনায় সিদ্ধকাম হইতে পারেন, অপরে নহে।

পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় স্টার থিয়েটারে 'সর্বাবয়ব বেদান্ত'-শীর্ষক বক্তৃতায় বামাচার সম্বন্ধে যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, মনে রাখিতে হইবে, তাহাও ঐ ভাবের সাধনার নাম করিয়া যাহারা উদ্দাম প্রবৃত্তির দাস হইয়া জঘন্য ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকে, তাহাদেরই বিরুদ্ধে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীরভাবের সাধক শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য ঠিক রাখিতে পারেন না। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবও এইজন্য বারংবার ঐ ভাবে সাধনা সম্পর্কে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, ইহা আমরা কথামৃতে দেখিতে পাই। অচলানন্দ নামে জনৈক তান্ত্রিক সাধক যখন তাঁহাকে বলেন যে, তিনি শিবের কলম মানিবেন না কেন, শিবই তো তন্ত্রে জায়াভাব ও মাতৃভাব—উভয় ভাবেরই নির্দেশ দিয়াছেন, তখন শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনি অত শত জানেন না—স্পষ্ট কথা এই যে, ঐভাব তাঁহার মনের অনুকূল নহে, মাতৃভাবই তাঁহার অভীপ্সিত। নরেন্দ্রনাথকেও তিনি বলিয়া-ছিলেন, 'কি জান, আমার ভাব মাতৃভাব—সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। স্ত্রীভাব, বীরভাব—বড় কঠিন, ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়।'

শ্রীগুরুর এই সাবধান-বাণী স্বামীজী নানাভাবে—পত্রে কথোপকথনে ও বক্তৃতায় —প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

আবির্ভাবে বীরভাবে শক্তি-সাধনার দিন যে গিয়াছে, তাহা স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন। শিষ্য হরিপদ মিত্রকে স্বামীজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: 'বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি ব'লে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।'

স্বামীজী আরও বলিয়াছিলেন, এই মাতৃ-ভাবে সাধনার পথ দেখাইতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমন; জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাবেরও প্রয়োজন: কারণ, তাঁহারাই আদ্যাশক্তি এবং যেদিন মাতৃভাবে আদ্যাশক্তির পূজা আরম্ভ হইবে, যেদিন মায়ের চরণে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে আপনি 'নরবলি' দিবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ কল্যাণ হইবে।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা: এবং কেবল-তার্কিকাঽনবগ্রাহ্যং শ্রৌতং জগৎকারণং বিষ্ণুং স্তুত্বা ইদানীং ভক্ত্যাদি-সাধন-সম্পন্নৈঃ গুরু-শুশ্রূষা-পরায়ণৈঃ এব অবগ্রাহ্যং তত্ত্বং স্তোতুম আরভতে—

মূলস্তোত্রম্:

আচার্যেভ্যো লব্ধসুসূক্ষ্মাচ্যুততত্ত্বা
বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চৈব দ্রঢ়িম্না।
ভক্ত্যৈকাগ্রধ্যানপরা যং বিদুরীশং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৫॥

যম্ ঈশং বিদুঃ সাক্ষাৎ অনুভবন্তি **তম্** ইতি সম্বন্ধঃ। কীদৃশাঽধিকারিণঃ বিদুঃ তত্র আহ—**আচার্যেভ্যঃ** ইতি। করতলামলকবৎ-সম্যক্-প্রত্যক্ষীকৃত-ব্রহ্মতত্ত্বেভ্যঃ সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাসেন সমিদাদ্যুপহার-পূর্বকং বিধিবৎ শিষ্যৈঃ উপসন্নেভ্যঃ শান্তেভ্যঃ কেবলং শিষ্যকৃপয়া এব তদ্বোধনে প্রবর্তমানেভ্যঃ **গুরুভ্যঃ সকাশাৎ** লব্ধং প্রথম-জ্ঞাতং **সুসূক্ষ্মম্** অচ্যুতস্য চ্যুতরহিতস্য কূটস্থ-নিত্যস্য শ্রীবিষ্ণোঃ তত্ত্বং যৈঃ তে **লব্ধ-সুসূক্ষ্মাচ্যুত-তত্ত্বাঃ**— 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' (ছা উ. ৬।১৪।২), 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্' (মু. উ. ১।২।১২), 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ' (কঠ উ. ১।২।৯) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। হে প্রেষ্ঠ নচিকেতঃ এষা ব্রহ্মবিষয়া মতিঃ তর্কেণ শুষ্কতর্কেণ মূলপ্রমাণরহিতেন ন আপনেয়া প্রাপণীয়া ন ভবতি। কিন্তু অন্যেন সর্বজ্ঞেন গুরুণা প্রোক্তা প্রকর্ষেণ যুক্তি-দৃষ্টান্ত-পূর্বকম্ উক্তা উপদিষ্টা সুজ্ঞানায় সম্যক্-ব্রহ্মবিষয়াঽবিদ্যানিবৃত্তয়ে ভবতি ইতি কঠশ্রুতেঃ অর্থঃ। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন' (গীতা, ৪।৩৪) ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

অনুবাদ: এইরূপে কেবল তার্কিকগণের (বুদ্ধির) অবিষয়, শ্রুতিসিদ্ধ জগৎকারণ (জগতের অভিন্ন নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ) বিষ্ণুকে (সর্বব্যাপককে) স্তুতি করিয়া বর্তমানে ভক্তি আদি সাধনসম্পন্ন ও গুরুসেবাপরায়ণ (সাধকগণ) কর্তৃক জ্ঞেয় তত্ত্বের স্তব আচার্য) আরম্ভ করিতেছেন : (মূলস্তোত্র, শ্লোক ৫ ; পৃঃ ৫৩৭ দ্রষ্টব্য)।

অন্বয়: আচার্যেভ্যঃ লব্ধ-সুসূক্ষ্ম-অচ্যুত-তত্ত্বাঃ বৈরাগ্যেণ অভ্যাসবলাৎ চ দ্রঢ়িম্না ভক্ত্যা এব একাগ্রধ্যানপরাঃ যম্ ঈশং বিদুঃ সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং তং হরিম্ ঈড়ে।৫।

স্তোত্রানুবাদ: আচার্যগণের নিকট হইতে অতি সূক্ষ্ম অচ্যুততত্ত্ব (কূটস্থ নিত্য বিষ্ণুতত্ত্ব) অবগত হইয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাসবলে দৃঢ় ভক্তির দ্বারাই একাগ্রধ্যান-পরায়ণ (সাধকগণ) যে ঈশ্বরকে জানেন, সংসারের (কারণীভূত অজ্ঞান-) অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি।৫।

টীকানুবাদ: **যম্ ঈশং বিদুঃ**—যে পরমেশ্বরকে জানেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করেন, **তম্**—তাঁহাকে (বন্দনা করি), এইভাবে সম্বন্ধ (যোজনা করিতে হইবে। কি প্রকার অধিকারিগণ তাঁহাকে জানেন, সেই বিষয়ে বলিতেছেন—**আচার্যেভ্যঃ**। সর্বকর্মসংন্যাসপূর্বক সমিদাদি উপহার-সামগ্রী লইয়া (গুরুদক্ষিণার উপযোগী) ধনাদিসহকারে যথাবিধি সমীপাগত শমদমাদিসম্পন্ন (মুমুক্ষু) শিষ্যগণের প্রতি করুণাবশতঃই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যাঁহারা প্রবৃত্ত[১] হন —এইরূপ করতলগত আমলকী ফলের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষকারী আচার্যগণের নিকট হইতে প্রথমতঃ যাঁহারা অতি সূক্ষ্ম অচ্যুত অর্থাৎ স্খলনরহিত কূটস্থ নিত্য বিষ্ণুর তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা—**লব্ধ-সুসূক্ষ্মাচ্যুত-তত্ত্বাঃ**। 'আচার্যবান্...প্রেষ্ঠ' - 'আচার্যবান্ পুরুষই তত্ত্বোপলব্ধি করিয়া থাকেন', 'ব্রহ্মতত্ত্ব অবগতির জন্য হস্তে সমিদ্‌ভার গ্রহণপূর্বক মুমুক্ষু শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাগত হইবেন', 'হে প্রিয়তম! (তোমার) এই (আত্মবিষয়িণী) বুদ্ধি (কেবল) তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না ; অন্যের দ্বারা (সর্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত আচার্য কর্তৃক) উপদিষ্ট হইলেই উহা উত্তম জ্ঞানের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের) যোগ্য হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে (পূর্বোক্ত বিষয় অর্থাৎ গুরুমুখ হইতেই তত্ত্ব লাভ করিতে হয়, ইহা প্রমাণিত হয়)। (উক্ত শ্রুতির মধ্যে তৃতীয় শ্রুতির টীকাকার-কৃত অর্থ :) হে প্রিয়তম নচিকেতা! এই ব্রহ্মবিষয়ক মতি (জ্ঞান) তর্কের দ্বারা অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণরহিত (কেবল) শুষ্কতর্কের দ্বারা 'আপনেয়া' (প্রাপ্তব্য) হয় না। কিন্তু অন্যকর্তৃক অর্থাৎ সর্বজ্ঞ গুরুকর্তৃক প্রোক্ত অর্থাৎ যুক্তি-দৃষ্টান্ত-সহকারে উত্তমরূপে কথিত অর্থাৎ

১ প্র + বৃৎ + শানচ্=প্রবর্তমান। ইহার অর্থ: প্রবৃত্তিরূপক্রিয়াবান্। ক্রিয়া যাহার প্রীতিজননের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, সেই ব্যক্তি ক্রিয়ার অভিপ্রেত। এইরূপ ক্রিয়ার অভিপ্রেত ব্যক্তিবোধক শব্দের 'ক্রিয়য়া যম্ অভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্'—সূত্রানুসারে সম্প্রদানকারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। তদনুযায়ী 'উপসন্নেভ্যঃ' এবং 'শান্তেভ্যঃ', এই দুইটি পদে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। লক্ষণীয় যে, 'প্রবর্তমানেভ্যঃ' এবং 'গুরুভ্যঃ' এই দুইটি পদে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে।

উপদিষ্ট হইলেই উহা উত্তম জ্ঞানের জন্য হয় অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যার সম্যক্ নিবর্তক হইয়া থাকে—ইহাই এই 'কঠ'-শ্রুতির অর্থ। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন', ইত্যাদি স্মৃতিও (গীতাবাক্য) এই বিষয়ে প্রমাণ।[২]

২ প্রণত, জিজ্ঞাসু ও সেবাপরায়ণ শিষ্যকেই তত্ত্বদর্শী আচার্যগণ উপদেশ প্রদান করেন—এই বিষয়ে টীকাকার কর্তৃক উদ্ধৃত তিনটি শ্রুতির ন্যায়, স্মৃতি অর্থাৎ গীতাবাক্যও প্রমাণ। গীতার সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইতেছে: 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥' (৪।৩৪)—'যে বিধি দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলিতেছি, অবগত হও। প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

কেশব সেন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে স্টীমারে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যেতে এসেছেন। সঙ্গে বহু ভক্ত। ঠাকুর নৌকায় ক'রে স্টীমারে উঠবেন। নৌকায় উঠেই সমাধিস্থ! অনেক কষ্টে একটু হুঁশ এনে তারপর তাঁকে স্টীমারে তোলা হল। তখনও ভাবস্থ। ক্রমে তাঁকে নিয়ে ক্যাবিনের মধ্যে বসান হল। ভক্তেরা সকলেই তাঁর কাছে থাকতে চান, যাতে তাঁর প্রত্যেকটি কথা তাঁরা শুনতে পান। যিনি যেমন পারলেন ভেতরে বসলেন। সকলের স্থান হল না। অনেকেই বাইরে থেকে উদ্গ্রীব হয়ে তাঁর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ - সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য!

সমাধি ভঙ্গ হ'লে ভাবস্থ ঠাকুর অস্ফুটস্বরে বললেন, 'মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারবো?' ঠাকুর কি ভাবে একথা বললেন, তা তিনিই জানেন। মাস্টারমশাই সেখানে মন্তব্য করছেন যে, সম্ভবত ঠাকুর এই বলছেন যে, এই সব জীবেরা মায়ার বেড়ার ভিতরে আবদ্ধ; তাদের কি সেখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে?—যেন জগন্মাতার কাছে তাঁর এই প্রশ্ন, এই আকুতি। তারপর ঠাকুর একই বস্তুকে যে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বলেন, সেকথা সবিস্তারে বললেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেগুলি আমরা আলোচনা করেছি।

(পাঠ:) **'এদিকে আগ্নেয়পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতেছে।... হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥'**

(১ম ভাগ, ২য় খণ্ড, সম্পূর্ণ চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ করছেন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ—অবিরল ধারায়। ভক্তেরা শুনছেন। শ্রীম বলছেন, ভক্তেরা এতই তন্ময় সেই অমৃত-পানে যে, স্টীমার যে চলছে, তা তাঁদের খেয়ালই হচ্ছে না। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের যে কথামৃত-ধারা বইছে, তা পানেই মত্ত!

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

ঠাকুর প্রথমেই বলছেন, 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ; জীব-জগৎ ; এ সব শক্তির খেলা।' ব্রাহ্মভক্তদের সামনে তিনি রয়েছেন, কাজেই উল্লেখ করলেন, 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা' ব'লে। আগে ব্রাহ্মদের 'ব্রহ্মজ্ঞানী' শব্দে অভিহিত করা হোত। তাই 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা' এইজন্য বললেন যে, কেশবের যাঁরা অনুচর, ব্রহ্মজ্ঞানী ব'লে যাঁরা খ্যাত, তাঁরা কিন্তু বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী নন। অর্থাৎ তাঁরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক নন। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে তাঁরা স্বীকারও করেন না। তাঁরা নিরাকার, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরের ভজনা করেন। নিরাকার নির্গুণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলা হয়। যখনি তা সগুণ, তা সাকারই হোক বা নিরাকারই হোক, তাকে আর ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় না, বলা হয়, 'ঈশ্বর' ব্রাহ্ম ব্রহ্মজ্ঞানীরা সেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আর বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী। তাই বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীদের ব্রাহ্ম ব্রহ্মজ্ঞানীদের থেকে পৃথক্ ক'রে ঠাকুর বলছেন, 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ; জীব-জগৎ ; এ সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু ; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।'

এইখানেই বেদান্তমত এবং তন্ত্রমতের পার্থক্য। তন্ত্রমতে শক্তিকে মিথ্যা বলে না। ব্রহ্ম যেমন সত্য, শক্তিও তেমনি সত্য। ব্রহ্ম আর শক্তি—দু'টি পৃথক্ বস্তু ব'লেও বলা হয় না। একই তত্ত্ব—দুই রূপে অভিব্যক্ত যখন সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করছেন, তখন তাঁকে 'শক্তি' বলা হয়। আর যখন সৃষ্টি-স্থিতি আদি ক্রিয়া করছেন না, তখন তাঁকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়। সুতরাং তন্ত্রমতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, শক্তিও তেমনি সত্য। তবে দুটি সত্য হওয়ায় দ্বৈতাপত্তি হ'ল কিনা? তন্ত্র বলেন, দ্বৈতাপত্তি হয় না। কারণ, ব্রহ্ম আর শক্তি অভিন্ন—একই তত্ত্ব। কিন্তু বেদান্তবাদীরা বলেন, 'শক্তি মিথ্যা (অনির্বাচ্য) ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু।' এই হ'ল বেদান্তমত আর শাক্তমতের পার্থক্য।

তারপর ঠাকুর বলছেন, 'কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।' যে অবস্থায় কোন ক্রিয়ার বোধ থাকে না, জগতের বোধ থাকে না, সেই অবস্থাকে বলছেন, 'সমাধিস্থ' অবস্থা। সেই অবস্থায় অবশ্য সাধক শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যান বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জগতের বোধ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' এই বোধ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নেই। ঠাকুর এই কথাই বলছেন, "…হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়।"—এই ব'লে ঠাকুর এই দুটি অভিন্ন বস্তুরই গ্রহণ যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, একথা বলেছেন। ঠাকুরের এই কথাটি বেদান্ত-দর্শনের দিক দিয়ে যেন একটি নতুন ধারার কথা। যদিও ঠিক নতুন বলা চলে না, বলা যায়—বেদান্ত-দর্শনে শক্তির আপেক্ষিক সত্তা মাত্র স্বীকৃত, কিন্তু ঠাকুর সেই শক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, যতক্ষণ আমরা শরীর-মনে আবদ্ধ ততক্ষণ শক্তির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়—দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয়—একথা তিনি বারংবার বলেছেন।

আপেক্ষিক সত্তা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ আমরা ব্রহ্মকে কারণ-রূপ বলছি, সেই

কারণ-রূপ যে তিনি, সেই তিনিই হলেন শক্তির স্বরূপ ; আর যখন তাঁকে কার্য-কারণের অতীত ব'লে বলি, তখনই মাত্র তিনি ব্রহ্মস্বরূপ। যখন তাঁকে জগৎ-কারণ বলি, অর্থাৎ 'ঈশ্বর' বলি, সেও শক্তিরই রাজ্যের কথা। বেদান্তশাস্ত্রে যেখানে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তাকে ব্রহ্মরূপে বলা হয়েছে, মনে রাখতে হবে সেই ব্রহ্ম কিন্তু শুদ্ধব্রহ্ম নন। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।' (তৈ. উ ৩।১) —যাঁর থেকে এই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, যাঁর দ্বারা এই সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে এবং প্রলয়-কালে যাঁতে এই সকলের লয় হয়, তাঁকে বিশেষভাবে জানতে চাও, তিনিই ব্রহ্ম। এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মের কথা বলা হ'ল, ইনি শক্তিরূপী ব্রহ্ম। এখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিরাকার সত্তা ব'লে বলা হল না। নির্গুণ যখন, তখন আর সৃষ্টি আদি ক্রিয়া হয় না। ত্রিগুণাত্মিকা যে প্রকৃতি, যে প্রকৃতি ব্রহ্মাভিন্না—সাংখ্যের প্রকৃতি নন, কারণ তন্ত্রে তাঁকে 'জড়া' বলা হয় না—এমন যে প্রকৃতি, তিনিই হলেন শক্তি, তিনিই আদ্যাশক্তি, তিনিই কালী। তিনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্রী। তাঁকেই পরমেশ্বরী বা পরমেশ্বর বা জগৎকারণ ব্রহ্ম বলা হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিতে মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর পর্যন্ত শক্তির মধ্যে, শক্তির বাইরে নন। ঠাকুর বলছেন যে, "আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।"

আমাদের মনে রাখতে হবে তোতাপুরী ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, সাক্ষাৎ অদ্বৈত তত্ত্বের তিনি অপরোক্ষ অনুভব করেছিলেন। এই সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ ঠাকুর বার বার একথা বলেছেন। সেই তোতাপুরীও এই ভ্রমে পড়েছিলেন যে, শক্তি মিথ্যা। শক্তির সত্যতা তিনি স্বীকার করেননি দীর্ঘকাল ধ'রে। পরে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ কালে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে সেই জগন্মাতাকে, আদ্যাশক্তিকে। বুঝতে পারা যায়, ঠাকুরের একটি অপূর্ব শক্তি ক্রিয়া করেছিল এই ব্যাপারে, যার ফলে চূড়ান্ত অদ্বৈতবাদী যে তোতাপুরী, তিনিও শক্তিকে মানতে বাধ্য হয়ে-ছিলেন। ঠাকুরেরও তাতে কতই না আনন্দ—তোতাপুরী অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও শক্তিকে মেনেছেন! এই যে শক্তিকে মানা, এটি হচ্ছে যেন অদ্বৈতবেদান্তী যে তোতাপুরী, তাঁরও জ্ঞানের পূর্ণতা। প্রশ্ন হবে, তোতাপুরীর কি তা হলে জ্ঞানের অভাব ছিল? না, তাঁর ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাব ছিল না। ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন তিনি। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর পূর্ণ ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রহ্মের যে কত রকমের বৈচিত্র্য হোতে পারে, তাঁর স্বরূপের ভেতর যে বৈবিধ্য কল্পনা করা যায় শাস্ত্র বলেছেন, সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন না, একথা বোঝা যায়। তিনি তাঁর সাধনের ধারায় এই ভাবটিকে একেবারে যেন উপেক্ষা ক'রেই সিদ্ধি লাভ করেছেন। সুতরাং শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সচেতন থাকার কোন কারণ ছিল না। যখন কোন একটি সাধন-পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তখন সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে যে রকম অবহিত হওয়া সম্ভব হয়, মাত্র শাস্ত্রের সাহায্যে সে রকম অবহিত হওয়া যায় না। তাই তোতাপুরীর শক্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ হ'ল ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে।

প্রথমে কিন্তু ঠাকুরের এই ভাবটি যেন তিনি বুঝতেই পারছেন না। আমরা জানি তিনি ঠাকুরকে যখন সন্ন্যাস দিতে চেয়েছেন, ঠাকুর বলছেন, 'দাঁড়াও আমি মাকে জিজ্ঞেস

করি।' মন্দিরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস ক'রে এলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বেদান্ত সাধন করবো।' তোতাপুরী একটু হাসলেন—বেদান্ত সাধন করবেন, তার জন্য তিনি গেলেন মাকে বলতে, মন্দিরের ভেতর পাষাণময়ী প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করতে! তোতাপুরীর কাছে দেবী পাষাণময়ী মাত্র। তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব তিনি জানতেন না, জানার প্রয়োজনও কখনো বোধ করেননি। সেই তোতাপুরী ক্রমশঃ ঠাকুরের সঙ্গে থেকে অনেক বিষয় ঠাকুরের কাছ থেকে শিখেছেন। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, একদিন বৈকালে পঞ্চবটীতে তোতাপুরীর কাছে বসে ধর্মপ্রসঙ্গে ক্রমে সন্ধ্যা হওয়ায় ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে লাগলেন। তোতাপুরী অবাক্—উপহাস ক'রে বললেন, 'আরে কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো?' ঠাকুর হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন, তোতাপুরী ঠাট্টা করছেন, হাত চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে রুটি তৈরী করছো কেন?—যদিও তিনি জানেন ঠাকুর অসাধারণ দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মেছেন, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। তোতাপুরী ভাবছেন, ঠাকুর তাঁর পূর্বের সংস্কার থেকে মুক্ত হোতে পারছেন না, এখনো সেই সংস্কারের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তাই হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন। ঠাকুর হেসে বলছেন, 'দূর শালা, আমি ভগবানের নাম করছি, আর তুমি কিনা বলছ রুটি ঠুকছি।' তোতাপুরী উপহাস করলেও ঠাকুর জানতেন, সময় আসবে যখন তোতাপুরী এসব সাধনকে স্বীকার করবেন। ঠাকুর তাই ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করছিলেন, যেমন তাঁর সন্তানদেরও ধৈর্য ধ'রে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যখন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছায় অষ্টাবক্র-সংহিতাদি গ্রন্থ প'ড়ে বলেছিলেন, 'মুনিঋষিদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা না হ'লে এমন সব কথা লিখলেন কি ক'রে?', তখন ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুই ঐকথা এখন নাই বা নিলি, তা বলে মুনিঋষিদের নিন্দে করিস্ কেন?' ঠাকুর ধৈর্য ধ'রে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। তারপর একদিন যখন নরেন্দ্রনাথ 'ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর!' ব'লে ব্যঙ্গ করছিলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ ক'রে অদ্বৈত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সব সন্দেহ নিরসন ক'রে দেন। তোতাপুরীর ক্ষেত্রেও ঠাকুর জানতেন যে তিনি দ্বৈতভাবে উপাসনার কথা পরে বুঝবেন। এবং বাস্তবিকই তোতাপুরীকে তা পরে বুঝতে হয়েছে।

এই যে বিভিন্ন প্রকারে ভগবানের সত্তার উপলব্ধি, এ জিনিসটি সম্বন্ধে আমরা গোড়া থেকে অবহিত না হলে পরে আমাদের অবহিত হতে হবে, অন্ততঃ যাঁরা আচার্য হবেন, তাঁদের এবং যাঁর জীবনে এরকমের বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণভাবে আসে, তাঁর জীবনই আচার্য হিসেবে পূর্ণ বলতে হবে। 'আচার্য হিসেবে' এই জন্য বলছি যে, সব সাধকদেরই সব অবস্থার ভেতর দিয়ে যাবার দরকার হয় না। একজন সাধক কোন একটি প্রণালী অবলম্বন ক'রে যদি চরম তত্ত্বে পৌঁছতে পারেন, তাঁর জীবনের পক্ষে তাই যথেষ্ট, তাতেই তাঁর পূর্ণ সার্থকতা। কিন্তু যাঁরা আচার্য হবেন, যাঁরা জগতের সকলকে পথ দেখাতে এসেছেন, তাঁদের ঐভাবে আংশিক দৃষ্টি নিয়ে চললে হবে না। কারণ, তা হলে তাঁরা মাত্র ঐ রকম মনোভাব-সম্পন্ন কতকগুলি লোককেই সাধন-জগতে সাহায্য করতে পারবেন। বহু লোক তাঁদের পরিধির বাইরে প'ড়ে থাকবে। এইজন্য ঠাকুর বলেছেন, নিজেকে মারতে হলে একটা নরুনই যথেষ্ট; কিন্তু অপরকে মারতে গেলে অর্থাৎ অপরের সঙ্গে যদি লড়তে হয়, তা হলে ঢাল

তরোয়াল দরকার হয়। ঠিক সেই রকম যাঁদের আচার্য হোতে হবে, তাঁদের ঠাকুর যেমন বলেছেন, সব ঘরের ভেতর দিয়ে নিয়ে তবে পাকাতে হবে ঘুঁটিকে। তাঁদের একদিক দিয়ে চলে গেলে হবে না। পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা পেতে হবে। সেই পূর্ণ অভিজ্ঞতা দেবার জন্য, তোতাপুরীর ঐ যে অনভিজ্ঞতা ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে, তা দূর করবার জন্য ঠাকুর হেসে বললেন, আমি ভগবানের নাম করছি আর তুমি কিনা উপহাস ক'রে বলছো, আমি রুটি ঠুকছি। ক্রমশঃ তোতাপুরী সে ভাব পেলেন এবং তার পরে আমরা জানি কিভাবে তিনি জগন্মাতার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ক'রে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন।

আমাদের এখানে জানতে হবে যে, অবতারপুরুষ যদিও তাঁর সাধন-পথে কোন কোন ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করেন, সেই গুরুরা কিন্তু তাঁর মত পূর্ণ হন না। অবতারের সান্নিধ্যে এসে, তাঁর সহায়তায় তাঁরা ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, এ কথা মনে রাখতে হবে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এ কথা তোতাপুরীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। একদিকে যেমন তোতাপুরী শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, তেমনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীও আবার অদ্বৈত-বেদান্ত সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞা ছিলেন। আমরা জানি ঠাকুর যখন তোতাপুরীর সহায়তায় অদ্বৈতবেদান্তের সাধনা করতে যাচ্ছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, 'বাবা, ওসব অদ্বৈতবাদীদের সঙ্গে অতো মেশামিশি করো না; তোমার ভাব-ভক্তি তা হলে শুকিয়ে যাবে, ওদের সঙ্গে মিশলে ভক্তির হানি হবে।' সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর যেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তেমনি তোতাপুরীরও দ্বৈতভাবে সাধনা সম্বন্ধে, শক্তি সম্বন্ধে, কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ভৈরবীও তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার ঠাকুরের সম্পর্কে এসে বাড়িয়েছিলেন এবং তোতাপুরীও তাঁর জ্ঞান আরো বেশী সমৃদ্ধ করেছিলেন ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে শক্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্নতা সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন: "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লেই আর একটিকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি;—অগ্নি মান্‌লেই দাহিকাশক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

'শক্তি-শক্তিমতোঃ অভেদঃ' এই কথা বলা হয়। শক্তি এবং শক্তিমান—এ দুটি অভিন্ন। একই বস্তু—তার একটি দিককে লক্ষ্য ক'রে আমরা বলি 'শক্তি'; তারই আর একটি দিককে লক্ষ্য ক'রে বলি 'শক্তিমান'। শক্তির যে বৈবিধ্য, সেই বৈবিধ্যকে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু সেই বৈবিধ্যের পশ্চাতে একটি নিরপেক্ষ সত্তা আছে, যে সত্তার ভেতর কোন পরিবর্তন ঘটছে না। এরকম একটি সত্তা যদি না মানা যায়, তা হলে শক্তির যে বৈবিধ্য, তাও বোঝা যায় না। একটি স্থায়ী সত্তাকে মানতে হয়। সেই স্থায়ী সত্তার বিভিন্ন প্রকারের অভিব্যক্তি হয়, সেই অভিব্যক্তিগুলিকেও স্বীকার করতে হয়।

দার্শনিকেরা অভিব্যক্তিগুলিকে দু'রকমের ব'লে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, ব্রহ্মের পরিণাম, অন্যেরা বলেন, ব্রহ্মের বিবর্ত। আসল কথা এই যে, পরিণামই বলি বা বিবর্তই বলি, এগুলি কথার কথা মাত্র। কারণ, পরিণাম যাঁরা বলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ পার্থক্য দেখে পরিণাম বলছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিবর্তিত হচ্ছেন, বলছেন।

অপরপক্ষে অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা বলেন, যা কিছু পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তা নশ্বর, তা নিত্য হোতে পারে না। ব্রহ্মের যদি পরিণাম হয়, তো ব্রহ্ম কখনো নিত্য হোতে পারেন না, অনিত্য হয়ে যান। সুতরাং তাঁতে আর ব্রহ্মত্ব থাকে না। এই দোষের জন্য তাঁরা প্রতীতি হচ্ছে যে পরিণামের সেই পরিণামকে বাস্তব না ব'লে তাকে প্রতীতি মাত্র, এই কথা বলেন। এবং তার জন্য একটি দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ করেন, যাকে বলে বিবর্ত। বিবর্তে তত্ত্ব পরিবর্তিত হয় না। পরিণামে তত্ত্ব পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। যেমন একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

'সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদীর্যতে ॥'

অর্থাৎ তত্ত্ব পরিবর্তিত না হয়ে—তত্ত্ব এক থেকে যদি তার বহুধা প্রতীতি হয়, তা হলে তাকে বলে বিবর্ত; আর যদি তত্ত্ব পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাকে বলে বিকার বা পরিণাম। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, দুধ পরিবর্তিত হয়ে পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে দই হয়। দুধটা আর দুধ থাকে না, দই হয়ে যায়। একে বলা হয় বিকার বা পরিণাম। আর বিবর্তের দৃষ্টান্ত: একটি দড়ি আছে। সে দড়িটি কখনো সাপ, কখনো লাঠি, কখনো মালা, কখনো জলধারা, কখনো বা জমিতে ফাটল বলে মনে হচ্ছে। এই যে বহু প্রকারে তার প্রতীতি, সেই প্রতীতিগুলির ফলে দড়িটি বাস্তবিক বদলে যায় না। দড়িটি যেমন দড়ি, তেমনি থাকে। একে বলে বিবর্ত।

আমাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মের এই বৈচিত্র্য বিবর্তই হোক বা পরিণামই হোক, বিশেষ কিছু যায় আসে না, কারণ আসল কথা হচ্ছে, শব্দের অতীত বস্তুর শব্দ দিয়ে আমরা একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছি মাত্র, কিন্তু সমর্থ হচ্ছি না।

শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হয়েও বহুরূপে প্রতীত হচ্ছেন; তাঁর সেই বহুরূপে প্রতীত হবার যে শক্তি, তাকেই বলা হয় অচিন্ত্য শক্তি; তাকেই বলা হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী শক্তি। ব্রহ্ম যেমন অচিন্ত্য, তাঁর শক্তিও তেমনি অচিন্ত্য কারণ, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা পরিমাপ করা যায় না এই শক্তিকে। যেমন ব্রহ্মকে পরিমাপ করতে পারি না আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, তেমনি তাঁর শক্তিকেও পরিমাপ করতে পারি না। এই জন্য দুই-ই আমাদের তর্কের অতীত হয়ে যায় এবং সেখানে আমরা এই দুটী তত্ত্বের পার্থক্য ভাবতে পারি না। কাজেই বলি দুটী এক, অভেদ। যেমন ব্রহ্ম তর্কাতীত, তেমনি তাঁর শক্তিও তর্কাতীত। সুতরাং দুটি তর্কাতীত বস্তুকে আমাদের তর্কের সাহায্যে বিভিন্ন করা সম্ভব নয় ব'লে তাঁদের আমরা অভিন্ন বলে বলছি।

সেই ব্রহ্মাভিন্ন ব্রহ্মশক্তি কখনো সক্রিয়, কখনো নিষ্ক্রিয়। 'কখনো' বলতে সময়ের কথা নয়। কারো কাছে কোন অবস্থায়, এই বুঝতে হবে। 'কখনো' নিষ্ক্রিয় বলতে কারো কাছে, কারো কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি নিষ্ক্রিয়। আবার সেই ব্যক্তিরই কাছে অন্য অবস্থায় তিনি সক্রিয়। এই দু'টি অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলা হয় ব্রহ্ম অথবা শক্তি— ঠাকুর এই কথাই বুঝাচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন, যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি, আর যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি আদি কিছুই করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। এই 'যখন' আর 'তখন' শব্দ দু'টি লক্ষণীয়। এদের তাৎপর্য কিসে? সময়েতে তাৎপর্য কি? তা যদি হয়, তা হলে ব্রহ্মের এই যে শক্তির প্রকাশ, তা কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, কালের দ্বারা পরিমেয় হয়ে যাবে। কিন্তু কালের দ্বারা এর পরিমাপ হয় না। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে সাধকের অবস্থাবিশেষে

প্রতীতির তারতম্যের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ 'যখন' মানে—যে অবস্থায়; 'তখন' মানে—সে অবস্থায়। এই কথা বললে বোধ হয় সুষ্ঠু হবে।

কেন এই কথা বলছি আমরা? জগতের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে, জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, স্থিতি হচ্ছে, লয় হচ্ছে! কিন্তু এই ধারণা অতিশয় সীমিত। যে জগৎটাকে আমরা উপলব্ধি করছি, সেই জগতের সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা। কিন্তু এই রকমের অনন্ত জগৎ যে নেই, তা আমরা কি ক'রে বলতে পারি! ঠাকুর বলেছিলেন, 'জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জানো? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে।' তাই আমাদের কাছে দেশ-কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে জগতের প্রতীতি হচ্ছে, সে রকম অনন্ত জগৎ আছে। যখন এক জগতে প্রলয় হচ্ছে, অন্য জগতে তখন হয়তো সৃষ্টির ধারা চলছে, যদিও একে বলা হয় খণ্ড প্রলয়, আর এর থেকে তফাৎ করা হয় মহাপ্রলয়কে। মহাপ্রলয় মানে যখন কোথাও সৃষ্টি থাকে না। কি ক'রে জানবো কোথাও সৃষ্টি থাকে কিনা? কে বলতে পারে, সমস্ত সৃষ্টির লোপ হয়েছে কিনা? কেউ পারে না। সুতরাং ঐ দিক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা না করে সাধকের অনুভবের ভেতর দিয়ে এই এই জিনিসটিকে বুঝতে হবে।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অর্থ কি? না, কার্য—কারণে লয় হয়। কার্য স্থূল বস্তু, তা সূক্ষ্মে লয় হয়। সূক্ষ্ম—কারণে লয় হয়। কারণ—মহাকারণে লয় হয়। এই যে লয় হওয়া, এটা কোন কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যাপার নয়। এটা অবস্থার পরিচ্ছেদ মানলে, বলতে পারি, যে অবস্থায় আমাদের কাছে স্থূল জগতের প্রতীতি হচ্ছে না, সে অবস্থায় স্থূল জগৎ সূক্ষ্মে লয় পেয়েছে। মনের যে অবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের প্রতীতি হচ্ছে না, সে অবস্থায় সূক্ষ্ম জগৎ কারণে লয় পেয়েছে। মনের যে অবস্থায় কারণেরও সত্তার প্রতীতি হচ্ছে না, সে অবস্থায় কারণ মহাকারণে অর্থাৎ কারণাতীত সত্তায় যাকে তুরীয় বলা হয়, তাতে লয় পেয়েছে। কারণাতীত সত্তা আছে ব'লেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের ক্রমবিকাশ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং আমাদের বাদ দিয়ে, অর্থাৎ দ্রষ্টা বা অনুভব-কর্তাকে বাদ দিয়ে, স্বতন্ত্ররূপে জগতের সৃষ্টি,স্থিতি.লয় অবস্থাকে লক্ষ্য করবার দরকার নেই। সেইজন্য বেদান্ত বলেন যে, এসব সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কথা যা শাস্ত্রে রয়েছে, তা কেবল আমাদের অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছে দেবার উপায় মাত্র। 'মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টি র্যা চোদিতান্যথা। উপায়: সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥' (মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।১৫) এই যে মৃত্তিকা (ছা উ. ৬।১।৪), লোহমণি (ছা. উ. ৬।১।৫), বা বিস্ফুলিঙ্গের (মু. উ. ২।১।১) দৃষ্টান্ত দিয়ে সৃষ্টির কথা নানাভাবে বলা হয়েছে, এ কেবল সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের অবতারণা করবার জন্য, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বুদ্ধিতে আরূঢ় করবার জন্য, এর আর অন্য কোন তাৎপর্য নেই; আসলে ব্রহ্মে কোন ভেদই নেই। কারণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাবস্থার কোন বাস্তব সত্তা নেই। এ-কথা ঐ মাণ্ডুক্যকারিকায় বলা হয়েছে। তা যদি হয়, তা হলে জগৎকারণতা পর্যন্ত আমাদের এই জগৎ-অনুভূতিকে অপেক্ষা ক'রে, একে আধাররূপে ধ'রে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জগৎ-স্রষ্টা অবধি কল্পনা রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'শক্তির এলাকা'র মধ্যে। যত দূর পর্যন্ত সাধনার স্তর চলতে পারে, তত দূর পর্যন্ত শক্তির এলাকা। আর যদি কেউ সাধনার সমস্ত স্তর অতিক্রম ক'রে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, ব্রহ্মসংস্থ হন, তিনি শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যান।

আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সেই সত্যে পৌঁছবার বিভিন্ন স্তরের অপেক্ষা আছে। বিভিন্ন ধাপ দিয়ে এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা শেষে লক্ষ্যে উপনীত হই। প্রত্যেকটি ধাপ আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। তা না হলে ছাতে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যখন ছাতে উঠেছি, তখন সিঁড়িগুলিকে অবাস্তব বলারও কোন সার্থকতা নেই। সেগুলি ছিল ব'লে আমাদের ছাতে ওঠা সম্ভব হয়েছে। শক্তির এলাকা আছে ব'লে আমরা শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হোতে পারি, হওয়া সম্ভব। তা যদি না হোত, তা হ'লে শুদ্ধ ব্রহ্মের আর কোন সার্থকতা থাকত না। কে তাঁকে জানতো? তিনি স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত থাকতেন। আর আমরা তাঁর যে সব ব্যাখ্যা করছি, জগৎ-কারণ ইত্যাদি ব'লে, সে সবই অর্থহীন হয়ে যেত। কারণ, আমাদের এই সব কথা নির্ভর করছে শক্তির উপরে।

ঠাকুর বলছেন: 'ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।'

'শক্তি' আর 'ব্রহ্ম' শব্দ দু'টি বললেন, তার পরেই শব্দ পরিবর্তন ক'রে বলছেন, 'লীলা' আর 'নিত্য'। লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না, নিত্যকে ছেড়ে লীলাকে ভাবা যায় না। লীলা মানে পরিবর্তন। পরিবর্তন মানেই তার পেছনে একটি অপরিবর্তিত সত্তা আছে, তা না হ'লে কার অপেক্ষায় পরিবর্তন হবে? এইজন্য 'পরিবর্তন' শব্দটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আসছে আর একটি তত্ত্ব, যা অপরিবর্তনশীল। সেটি পট-ভূমিকাতে রেখে, তার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমরা পরিবর্তনকে অনুভব করি। তা না হলে পরিবর্তন ব'লে কোন বস্তু থাকতো না। আমরা একটি ট্রেনে চ'ড়ে যাচ্ছি। সেই ট্রেনটা যেমন চলছে, ঠিক তেমনি যদি চারপাশের মাটি, গাছপালা, ঘরবাড়ি চলতে থাকতো, তা হলে ট্রেনটার চলা বোঝা যেত না। 'ট্রেনটা চলছে', এই বাক্যেরও প্রয়োগ হোত না। কারণ, সব দৃশ্যটি একই রকম থাকতো। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, আমরা ট্রেনে বসে আছি, গাছপালাগুলোকে দেখছি স্থান পরিবর্তন করছে, ঘরবাড়িগুলো সরে সরে যাচ্ছে, তখনি আমরা বুঝতে পারি একটা পরিবর্তন। পরি-বর্তনের ভেতর কোন্‌টা স্থায়ী, কোন্‌টা অস্থায়ী, সেটা পরের কথা। আমরা বলছি যে, কোন একটা স্থায়ী বস্তুকে লক্ষ্য না ক'রে, অস্থায়ী বস্তুকে পরিবর্তনকে আমরা ভাবতে পারি না। আবার অস্থায়ী বস্তুকে লক্ষ্য না করে কোন একটা স্থায়ী বস্তুকেও কল্পনা করতে পারি না। কারণ, স্থায়ী আর অস্থায়ী এমন দুটি শব্দ—অর্থ-সঙ্গতির জন্যে পরস্পর এমন ভাবে জড়িত যে, একটিকে ছেড়ে আর একটিকে ভাবা যায় না। অস্থায়ীকে ছেড়ে স্থায়ীকে ভাবা যায় না, স্থায়ীকে ছেড়ে অস্থায়ীকে ভাবা যায় না।

নিত্য আর লীলাও ঠিক সেই রকম। ভগবানের এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-লীলা চলছে, এই লীলার মানে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কল্পনাই করতে পারব না, যদি একটি স্থায়ী বস্তুকে—নিত্য বস্তুকে লক্ষ্য না করি। কাজেই নিত্যকে বাদ দিয়ে লীলাকে ভাবা যায় না। আবার লীলাকে বাদ দিয়ে নিত্যকে ভাবা যায় না, যেমন আগেই বলছিলাম। সুতরাং শক্তিকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না; ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে শক্তিকেও ভাবা যায় না। দুটি এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ—এমন অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম আর শক্তি অভিন্ন

এই দৃষ্টিতে।

তবে অনেক সময়ে আমরা ঐ দৃষ্টির একটু-খানি যেন দার্শনিক সামঞ্জস্য না রেখে বলি যে, এই যে পরিবর্তন, এটি মিথ্যা ; অপরিবর্তনীয় যেটি, সেইটিই মাত্র সত্য। কারণ, আমাদের াগতিক অনুভব থেকে আমরা জানি, যা কিছু পরিবর্তনশীল, তাই অনিত্য। কিন্তু এই পরিবর্তন, এই লীলা যদি প্রবাহাকারে নিত্য হয়, তাতে আমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে! সেটা যে অসম্ভব, এমনও আমরা বলতে পারি না। আসল কথা, যে সীমিত গণ্ডীর ভেতর আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আমাদের যুক্তি তার উপরেই আধারিত ; ত'র বেশী আমরা ভাবতে পারি না। সেইজন্য শাস্ত্র বলছেন, 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' [১]—যে সব বিষয় চিন্তার অতীত, তাদের তর্কের সাহায্যে তুমি নির্ণয় করতে যেও না কারণ, তাতে বিভ্রান্ত হবে। তর্ক যেখানে পৌছতে পারে না, সেখানে আমরা তর্ককে প্রয়োগ করি। এটা তর্কের অপপ্রয়োগ। তর্ককে আমরা অস্থানে প্রয়োগ করছি। ফলে তর্ক সেখানে ব্যাহত হয়। শাস্ত্র তাই বলছেন যা অচিন্ত্য, তাকে তর্কের দ্বারা সংযুক্ত করতে যেও না। ব্রহ্ম এবং শক্তি দুই-ই অচিন্ত্য, কারণ জগতের সূক্ষ্মতম যে তত্ত্ব, তাকেই যদি শক্তি বলি, সেই শক্তির স্বরূপকে আমরা ভাবতে পারি না। আবার দেশ, কাল, নিমিত্তের অতীত যে বস্তু, তাকেও আমরা চিন্তা করতে পারি না। কাজেই তর্কের দ্বারা যদি তত্ত্বকে বুঝতে চেষ্টা করি—সেটা সম্ভব হবে না। সুতরাং যুক্তির সাহায্যে শক্তিকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করার প্রয়াস অপপ্রয়াস মাত্র।

শক্তি সত্য কি মিথ্যা?—এই প্রশ্ন একটি কূট দার্শনিক প্রশ্ন মাত্র। তর্কের দ্বারা এর মীমাংসা হয় না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এর মীমাংসা হতে পারে। ঠাকুর অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বলছেন, শক্তি আর ব্রহ্ম—দুই-ই সত্য। বলছেন, দুটি বস্তুই নয় আসলে। শক্তি যাঁকে বলি, ব্রহ্ম তাঁকেই বলি। কেবল দুটি বিভিন্ন অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে আমরা দুটি নাম দিচ্ছি, আমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য। আসলে এ দুটি পৃথক্ বস্তু নয়। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি ; যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। এই দুয়ে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। এই দুয়ে দ্বৈতসৃষ্টি হচ্ছে না। দুটি আলাদা জিনিস নয়। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বুদ্ধিতে যেমন প্রতিভাত হয়, সেই রকম ক'রে বলি ব্রহ্ম অথবা শক্তি। যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, তখন বলি শক্তি। আর যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। ঠাকুর এই কথা বললেন এখানে।

ঐ কথাই ঠাকুর আবার বলছেন: "আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় - সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না - এই কথা যখন ভাবি,"—'এই কথা যখন ভাবি' শব্দগুলি লক্ষণীয়, এর ব্যাখ্যা আমরা আগেই করেছি—"তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন", অর্থাৎ করেন ব'লে ভাবি—"তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ। যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'।"

যেমন যেমন আমাদের অভিজ্ঞতা, তেমনি

[১] ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২৭, শাংকরভাষ্যে উদ্ধৃত পাঠ। মহাভারত, ৬।৫।১২-তে 'যোজয়েৎ' স্থলে 'সাধয়েৎ' পাঠান্তর আছে।

তেমনি আমরা এক একটি নাম দিই। 'কালী' বলি বা 'আদ্যাশক্তি' বলি বা 'ব্রহ্ম' বলি, যখন যেরকম আমাদের বুদ্ধির দৌড় বা দৃষ্টিকোণ সেই অনুসারে বলি মাত্র। তাতে তত্ত্বের প্রভেদ হয়ে যায় না। একথাটি এখানে বোঝালেন, 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'র দৃষ্টান্ত দিয়ে। জলকে যদি ওয়াটার বলা হয়, বস্তুটি ভিন্ন হয়ে যায় না। আমাদের ভাষার পার্থক্য হয়। কেউ জল বলি, কেউ ওয়াটার বলি, কেউ পানি বলি। কেন বলি?—না, আমরা যেমন শিখেছি, আমাদের যেমন সংস্কার, যেমন আমরা অভ্যস্ত, তেমনি ভাবে শব্দ প্রয়োগ করি। যখন আমাদের সংস্কার অনুযায়ী আমরা দেখি তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করছেন, তখন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁকে বলছি 'শক্তি'। আর যে অবস্থায় আমরা নিষ্ক্রিয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সেই অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে বলছি 'ব্রহ্ম'। শব্দগত ভেদ মাত্র। তত্ত্বগত কোনই ভেদ নেই। একথা খুব জোর দিয়ে ঠাকুর বলছেন এখানে।

তার পরের কথা। কেশব বলছেন—"কালী কত ভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।"

কেশব শুনেছেন সে সব কথা ঠাকুরের কাছে। তারই পুনরাবৃত্তি করাতে চান, আবার শুনবেন, অপর ভক্তদের শোনাবেন, কথাটি আরো আস্বাদন করবেন এই উদ্দেশ্যে। আগেই আমরা মনে রাখবো, ঠাকুর কালী বলতে কি বলছেন। রামপ্রসাদেরও এই ভাবের একটি কথা আছে—'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'—কালী আর ব্রহ্ম, এ দুটি ভিন্ন নয়, এই জেনেছি। জেনে 'ধর্মাধর্ম' অর্থাৎ সব রকমের উপাধি পরিত্যাগ ক'রে আমি নির্বিশেষ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। অথবা আর এক জায়গায় বলছেন,...'মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে/সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে'—যাঁকে আমি মাতৃভাবে আরাধনা করি, তাকে আর ব্যাখ্যা ক'রে সকলের সামনে কি প্রকাশ করবো? ইঙ্গিতে বলছি, বুঝে নাও। ভাব হচ্ছে এই, যাঁকে আমি 'মা' বলি, 'কালী' বলি, 'শক্তি' বলি বা বিভিন্ন দেবদেবীরূপে বর্ণনা করি, আসলে তিনি সেই এক ব্রহ্ম—এ কথা কি আর বেশী খুলে বলতে হবে!

তাহলে আমরা দেখলুম, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সাধনা করছেন, ততক্ষণ অর্থাৎ সেই চরম তত্ত্বে ওঠবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত, তিনি শক্তির এলাকায়। যখন তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিত, তখনই বলা যায় তিনি শক্তির এলাকার অতীত। কিন্তু আবার যখন তিনি সাধারণ ভূমিতে ফিরে আসছেন তখনও তিনি শক্তির এলাকায়। তাই তোতাপুরী ব্রহ্মজ্ঞ হয়েও ইচ্ছামাত্রেই নিজেকে সেই সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না, কারণ আদ্যাশক্তি মহামায়া পথ ছেড়ে দিচ্ছেন না। তোতাপুরী এ কথা বুঝতেন না। বুঝতেন না যে শক্তিরই কৃপায় তাঁর নির্বিকল্প সমাধি। তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তাই শক্তিকে মানা দরকার ব'লে তিনি মনে করতেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তাঁর ব্রহ্মাবগাহী মন বারবার চেষ্টা ক'রেও এই ত্রিগুণের রাজ্য ছাড়িয়ে সেই তুরীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হোতে পারছে না, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—এ কি ব্যাপার! আমার মন তো কখনো আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেনি। কেন এরকম হোল? যাই হোক শরীরটাই যত নষ্টের মূল মনে ক'রে স্থির করলেন শরীরটাকে ছাড়তে হবে। তখনো তিনি বুঝছেন না,

শরীরটা ছাড়া বা রাখা—এতেও তাঁর স্বতন্ত্রতা নেই, এখানেও মহামায়ার রাজত্ব, শক্তির রাজত্ব। শরীর ত্যাগ করতে যাচ্ছেন। বর্ণনা রয়েছে, গভীর রাত্রে চলেছেন গঙ্গায় রুগ্ন দেহটি বিসর্জন দিতে। ধীরে ধীরে গঙ্গায় নামলেন এবং ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হলেন, কিন্তু ডুব-জল আর পাচ্ছেন না। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় অপর পারে চলে এসেছেন, তবু ডুব-জল পেলেন না। তখন তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, 'এ কি দৈবী মায়া! ডুবে মরবার জলও আজ গঙ্গায় নেই! এ কি অপূর্ব লীলা!' যখনই এই কথা মনে উঠেছে—এটা শেষ ধাপ—তখনই তাঁর জগন্মাতার সত্তার অনুভূতি হল। তিনি জলে, স্থলে, দেহে, মনে—সর্বত্র সেই আদ্যাশক্তির লীলা উপলব্ধি করলেন। বুঝলেন, শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি ইচ্ছা না করলে তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সামর্থ্য কারোর নেই—মরবারও সামর্থ্য নেই। এবং তখনই তিনি সেই আদ্যাশক্তির বশ্যতা স্বীকার করলেন। তাঁকে জগন্মাতারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু হয়ে আসার যে সার্থকতা, তা তাঁর লাভ হল পরিপূর্ণরূপে। আমরা আগেই বলেছি, যাঁরা তাঁর গুরুরূপে এসেছিলেন, তাঁরাও এসে তাঁর কাছ থেকে কোন না কোন রকমে অপূর্ণতা দূর করে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তোতাপুরীর এই পূর্ণতা লাভ আমরা এখানে দেখছি। 'জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা/ বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।' (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৫৫-৫)—দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। 'জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি'—কাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। শরীরধারী মাত্রেই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানীই হোন না কেন, মহামায়ার এলাকায় এবং মহামায়া ইচ্ছামতো তাঁকে নিজের হাতের পুতুল ক'রে ব্যবহার করতে পারেন। গর্ব করবার কিছু নেই—'আমি উন্নত সাধক' ব'লে। অভিমান ক'রে মাথা তোলবার কিছু নেই।*

* ৬ই জুলাই ১৯৭৫, কাকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে 'কথামৃত'-আলোচনা সমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সং

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী+

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

প্রস্তাবনা

রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রের স্বামী আত্মানন্দ একটু আগেই আপনাদের বলেছেন যে, তিনি আমার মূল ইংরেজী বক্তৃতা হিন্দীতে অনুবাদ ক'রে আপনাদের শোনাবেন। তাহলেও আমার মনে হলো ইংরেজীতে বলার আগে হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা ঠিক হবে।

গতকাল এখানে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়েছে। এ সম্পর্কে আমার একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা বলবো। আমাদের অধ্যক্ষ মহারাজ

+ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উৎসর্গ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রদত্ত সভাপতির ইংরেজী অভিভাষণের বাঙলা অনুবাদ।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর অভিভাষণে আপনারা শুনেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সকল ধর্মের মেলবন্ধনের শিক্ষাগুরু এবং তাঁর উপদেশ মেনে চললে আমাদের দেশে এবং গোটা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে। তিন বছর আগে পাটনায় রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছিল; কেন্দ্রীয় দেশরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এসেছিলেন সেদিনের সভায় বক্তৃতা করতে। উৎসবের কর্ম-সচিব সভাস্থ জনমণ্ডলীর কাছে দেশরক্ষামন্ত্রীর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেন: আমাদের কেন্দ্রীয় আরক্ষামন্ত্রী খুব কর্মব্যস্ত মানুষ; তাহলেও তিনি এখানে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে। জগজীবন রামজী যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন, তিনি মুখবন্ধস্বরূপ মন্তব্যে বললেন: ভারতের আরক্ষামন্ত্রীর ভূমিকায় আমি এখানে আসিনি; আমি এসেছি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সারা পৃথিবী যদি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করে তাহলে কোন দেশই আরক্ষা-মন্ত্রীর প্রয়োজন বোধ করবে না। একথা শুনে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছিলাম; এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ও সত্যি সত্যি বোঝা, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হওয়া সম্ভব, ভ্রাতৃত্ব ও সেবার মনোভাব সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব।

হিন্দীতে এই ক'টি কথা ব'লে আমি এখন ইংরেজীতে আমার মূল ভাষণ দেব। স্বামী আত্মানন্দ পরে সেটি হিন্দীতে অনুবাদ করবেন।

বর্তমান উপলক্ষের তাৎপর্য

এই আশ্রম-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উৎসর্গ-অনুষ্ঠান এই আশ্রম, এই রায়পুর শহর ও আমাদের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যেরও পক্ষে একটা মস্ত ঘটনা। আজ সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ মহারাজ গুটিকতক বাছা বাছা শব্দে তাঁর আশীর্বচন দিয়েছেন। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-আচরিত মহিমময় আদর্শগুলি অধ্যক্ষ মহারাজ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) নাম ধারণ করে যে মন্দির, তা এই শহরের, তথা এই রাজ্যের, অধিবাসীদের উদ্দেশে আশীর্বাদ বহন করে। নাগপুরে আমাদের রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহান্ত স্বামী ব্যোমরূপানন্দ তাঁর হিন্দী ভাষণে আধুনিক জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের সুমহান দান—ধর্মসমন্বয়ের উল্লেখ করেছেন।

এর আগে রায়পুর শহরে আমি বেশ কয়েকবার এসেছিলাম। প্রথম এসেছিলাম বোধ হয় ১৯৫৭ সালে। তখন থেকে আমাদের সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি রায়পুর-বাসীদের বিপুল আগ্রহ আমি লক্ষ্য করছি। আশপাশের ভিলাই, বিলাসপুর ও দুর্গ শহরেও আমি তখন গিয়েছিলাম। এই সকল মহান আদর্শে জনসাধারণের গভীর আগ্রহ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। এরজন্যে কৃতিত্ব প্রাপ্য স্বামী আত্মানন্দের যিনি এই আশ্রমের প্রবর্তক ও মঠাধীশ। বহুকাল ধরে তিনি এ অঞ্চলের মানুষদের সেবা এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্যে কাজ করছেন এবং এ সকল কাজ করছেন পরম কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে এবং চূড়ান্ত কর্মদক্ষতার সঙ্গে। তাই আজকের এই উৎসব-অনুষ্ঠানে এ শহর ও চারপাশের অঞ্চলগুলিতে স্বামী আত্মানন্দ মানবসেবায় যে আশ্চর্য কাজ করেছেন তা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত।

আমাদের সকল আশ্রমে প্রতি বছর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিবসে উৎসব করি।

কিন্তু আজ এখানে আমরা সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-জয়ন্তী পালন করছি না। গতকাল শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মন্দিরে, সেই মন্দিরের উৎসর্গীকরণ আজ আমরা উদ্‌যাপন করছি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে আমাদের অধ্যক্ষ মহারাজ তাঁর অভিভাষণে বলেন, ঈশ্বরের পূজা হয় দেবতা ও অবতার, এই দুইরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতা ছিলেন না; আপনাদের ও আমার মতো তিনিও ছিলেন মানুষ, কিন্তু তিনি ছিলেন দেদীপ্যমান ঐশসত্তা; তাই তাঁকে পূজা করা স্বয়ং ঈশ্বরকে পূজা করা। আমাদের মহান সনাতন ধর্ম এই শিক্ষা দেয়।

রায়পুরের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অনন্য সম্পর্ক

রায়পুরের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে; কারণ এই শহরটি তাঁর প্রধান শিষ্য নরেন্দ্র—যিনি তখন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন—তাঁর স্মৃতিবিজড়িত। আপনারা সকলেই জানেন তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের কি গভীর আকর্ষণ ছিল।

রায়পুরবাসীদের উচিত তাঁদের শহরের এই পটভূমি স্মরণ করা এবং সেই পুণ্যস্মৃতি অন্তরে পোষণ করা। নরেন্দ যখন এখানে আসেন, তখন তিনি ছিলেন এক অপরিচিত তরুণ ছাত্র; আজ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ। আজ পৃথিবী তাঁকে স্মরণ করে আধুনিক ভারতের স্থপতিরূপে, ভারত ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার সেতুনির্মাতারূপে। তাই এই শহরের অনেক অনুষঙ্গ আছে—অতি ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ—নরেন্দ্রের সঙ্গে এবং নরেন্দ্রের মধ্য দিয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। এ-প্রসঙ্গে আমি একটা বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দিতে চাই। সেটা হোল এই যে, বর্তমানে এই রায়পুর আশ্রমটি সারা মধ্যপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ও একমাত্র শাখা। এখানে এইসব যা কিছু ঘটেছে সবকিছুই সম্ভব হয়েছে স্বামী আত্মানন্দ—যিনি এই রাজ্যের ছত্তিশগড় অঞ্চলের এবং এই শহরের মানুষ—তাঁর সমর্পিত-প্রাণ সেবার দ্বারা এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও অন্যান্য সহকর্মিগণের এবং ভক্তিপরায়ণ জনসাধারণের কর্মনিষ্ঠায়। গত কয়েক বছর ধ'রে স্বামী আত্মানন্দ এখানে যে কাজ করেছেন তা বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামকৃষ্ণ-মন্দিরগুলির স্বকীয়তা

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতে মন্দিরের অভাব নেই—আমাদের যথেষ্ট ছিল এবং আজও ঢের হচ্ছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যে মন্দির তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কথাটা বুঝিয়ে বলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এই রায়পুর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। এর পেছনে আছে এই এলাকার জনগণের কল্যাণকল্পে সুদীর্ঘকালব্যাপী কর্মসাধনা। সে কর্ম শুধু আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক নয়, আর্তত্রাণমূলকও। স্বামী আত্মানন্দ তাঁর কার্যবিবরণী পেশ করার সময়ে যা বলেছিলেন, তাতে আপনারা শুনেছেন যে দু'বছর আগে এ রাজ্যে খরাত্রাণকার্য পরিচালনা করতে তাঁর সময় ও শক্তি নিয়োজিত করতে হয়েছিল বোলে এ মন্দিরের নির্মাণের কাজ তখন তাঁকে স্থগিত রাখতে হয়। হাজার হাজার গরিব মানুষকে খাওয়ান হয়, শ্রম-বিনিময়ে ত্রাণকার্যের আয়োজন করা হয় এবং অন্যান্য বহুভাবে দুঃস্থদের সেবা করা হয়। ষষ্ঠ দশকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তুরা আসছিলেন, তখন এই আশ্রমকে কর্মকেন্দ্র ক'রে রামকৃষ্ণ মিশন প্রভূত ফলপ্রসূ ত্রাণকার্য করেছিলেন।

তাই বর্তমানে আমাদের দেশবাসীদের কাছে রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মন্দিরের একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। এই আশ্রম ও এই মন্দিরের লক্ষ্য এমন একটা অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া যাতে সকলে সকলকে ভালবাসবে এবং জাতি- ধর্ম- ও নরনারী-নির্বিশেষে সকলের সেবা করবে। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা আমাদের সনাতন ধর্মের একটি বড় শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ এটিকে একটি সুন্দর সূত্রের আকারে প্রকাশ করেছেন: জীবমাত্রেই শিব। জীবের সেবা শিবের উপাসনা। এ এক অসামান্য উপদেশ। উপনিষদ্ গীতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ আমাদের ধর্মগ্রন্থে যদিও বরাবর কথাটি ছিল, আমাদের আচরণে এটির তেমন চল ছিল না। এ যাবৎ এ বিধান আমরা কার্যকরভাবে পালন করিনি। অনেক মন্দির আমরা তৈরি করেছি, কিন্তু বাহির বিশ্বের সঙ্গে, আমাদের ঐহিক জীবন ও কর্মের অন্য সকল ক্ষেত্রের সঙ্গে, সেইসব মন্দিরের কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। আমরা অতীতে যা করেছি তা ভুল, কিন্তু এখন তা সংশোধন করবো। আমরা মন্দিরে যাবো, সেখানে বিগ্রহে পূজা করবো ঈশ্বরের যে জীবন্ত উপস্থিতি, আমাদের ভক্তিশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'অর্চাবতার'—'অর্চা' অর্থাৎ বিগ্রহরূপে—অবতীর্ণ যে ঈশ্বর—তাঁর পূজা করবো। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের রূপ ধ'রে যে ঈশ্বর বিরাজমান তাঁকেও আমরা অবহেলা করবো না। মন্দিরে যিনি আছেন 'অর্চা' হয়ে, সবার অন্তরে তিনি আছেন অন্তর্যামিরূপে, অন্তরাত্মারূপে। তাই যখন আমরা মূর্তি-দর্শন ও অর্চনা করি, আমাদের পূজা-অর্চনা যেন সেইখানেই শেষ না হয়; মন্দির থেকে বেরিয়ে সকল প্রাণীর মধ্যে নিহিত ঈশ্বরেরও যেন উপাসনা করি।

জীবন ও ধর্মের সংহতি

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এখন পর্যন্ত মন্দিরে পূজা-অর্চনার সমুদয় ভাবটিকে সমগ্র মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি। আমরা ভেবেছি আমরা যে কোন প্রকারের জীবনযাপন করতে পারি · স্বার্থপর হতে পারি, ঝগড়াটে মামলাবাজ হতে পারি, এমন কি আমাদের দেয় করের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিতে পারি; এবং এ সব ক'রেও যদি মন্দিরে গিয়ে কোন মূর্তির পূজা করি এবং প্রণামীর বাক্সে কিছু টাকাকড়ি ফেলে দিই, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে বহু যুগ পরে মন্দিরে উপাসনার প্রকৃত অর্থ আমরা প্রথম শিখলাম: আমরা শিখলাম যে মন্দিরে এই উপাসনা, এই মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করা। মন্দিরসমূহ থেকে আমাদের এই অনুপ্রেরণা অধিগত করতে হবে। আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের অনেক জায়গায় এ কথা বলা হয়েছে। তাই এই সত্য সম্বন্ধে যাতে আপনারা সজাগ হয়ে উঠতে পারেন তারজন্যে আপনারা দেখতে পাবেন এই মন্দির-প্রকল্পের পেছনে রয়েছে এই আশ্রমের এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত অন্যান্য আশ্রমের মানবসেবার সমুজ্জ্বল কীর্তি—হাসপাতাল, শিক্ষালয় এবং দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপর্যয়ে আর্তত্রাণের কাজ। এ সকল কাজ রামকৃষ্ণ কেন্দ্রে মন্দিরে উপাসনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দুটি দিক—বাইরে জীব-সেবা এবং দেবালয়ে ঈশ্বর-আরাধনা পৃথক্ কিছু নয়; এক সর্বব্যাপী জীবনদর্শনের অভিন্ন পূর্ণতার এই দুটি অঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, এ হলো ধ্যানে চোখ বুজে ঈশ্বরকে দেখা এবং প্রাত্যহিক জীবনে

চোখ মেলে তাঁকে দেখা। মন্দিরে গিয়ে তাঁর উপাসনা করুন আর তারপর সেখান থেকে যা পেলেন তা উজাড় করে ঢেলে দিন বাইরে এসে প্রীতিপূর্ণ প্রাণপাত সেবায়।

এই উপদেশটি হৃদয়ঙ্গম করতে ও জীবনে প্রতিফলিত করতে আমরা একটুও পারিনি। এখন এই উপদেশটি আমাদের বুঝতে হবে এবং কাজে পরিণত করতে হবে। মন্দির অবশ্যই আমাদের দরকার, কিন্তু এমন মন্দির আমাদের চাই যা আমাদের শান্তি দেবে, যা আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করবে, যা আমাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্বকে উদ্ভাসিত করবে। এসব মন্দিরের এই হলো উদ্দেশ্য। এবং যতো তাড়াতাড়ি আমাদের সব মন্দির, আমাদের সব গির্জা, আমাদের সব মসজিদকে আমরা এভাবে রূপান্তরিত করতে পারবো ততোই আমাদের মঙ্গল, সকল ধর্মের মঙ্গল। এবং এইজন্যেই ভারতে আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি উপদেশ

একটু আগের বক্তৃতাগুলিতে আপনারা শুনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের নানা সাধনার কথা—কীভাবে তিনি হিন্দুধর্মের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়, এমন কি গোটা হিন্দুধর্মের সকল বেড়া পার হয়ে বিশ্বের মহান্ ধর্মগুলির মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীর এক মঙ্গলময় উদাহরণ স্থাপন করেছেন। এইটাই শ্রীরামকৃষ্ণের সবশ্রেষ্ঠ অবদান। আমাদের সংস্কৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের সূচনা থেকেই অবশ্য এটি ছিল পাঁচ হাজার বছর আগেকার বেদে। কিন্তু এই প্রথম পৃথিবী দেখলো মানুষের সমগ্র ধর্মীয় অন্বেষণ ও উপলব্ধিকে একজনের জীবনে রূপায়িত হ'তে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যে দুটি উপদেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে: একটি মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে গভীর করে তোলা, আর দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবীর নানা ধর্মের মেলবন্ধন করা। ১৮৯৬ সালে নিউইয়র্কে My Master (মদীয় আচার্যদেব) শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতার উপসংহারে স্বামী বিবেকানন্দ এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সার নিষ্কাশিত করেন:

'বর্তমান জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এই: মতামত, সম্প্রদায়, গির্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রাখিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু অর্থাৎ ধর্ম রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এইভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহার ভিতর জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি আসিয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্মধন উপার্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, 'ধর্ম' অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। যাহারা নিজেরা ধর্মলাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই অপরের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চার করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য হইতে পারে—তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, সেই দেশ ততই উন্নত হইবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে নাই, সে দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এই: "প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।" তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমরা মুখে কেবল "ভাইকে ভালবাসি" না বলিয়া, তোমাদের কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যাও।... মদীয় আচার্যদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মূলে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।'

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মিলনের আদর্শ

আপনাদের ব্যক্তিসত্তার আধ্যাত্মিক দিক—সেই অবিনশ্বর আত্মা যা প্রত্যেকের অবিচ্ছেদ্য জন্মস্বত্ব, তাঁকে উপলব্ধি করুন এবং সেই সত্য উপলব্ধি করতে নরনারী যে কোন পথই অবলম্বন করুন, সে পথকে শ্রদ্ধা জানান। একদিকে আধ্যাত্মিকতার গভীরতা এবং অপর দিকে বোঝাপড়া ও সহানুভূতির ব্যাপকতা—এই দুই দিক পাশাপাশি চলবে। ধর্মকে মানবজীবনে একটি সৃজনশীল ও গতিশীল শক্তিতে পরিণত করবার এই একমাত্র উপায়। ভারতে বর্তমানে আমাদের এই উভয় শিক্ষার প্রয়োজন। মিলনের বিষয়ে স্বামী ব্যোমরূপানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবদান নিয়ে আগেই আলোচনা করেছেন। আমি শুধু একটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের এই দেশ, এই ভারতভূমিতে, অতি প্রাচীনকাল থেকে এই মিলনমন্ত্রটি ছিল আমাদের ধর্মসম্প্রদায়-গুলির ও রাষ্ট্রীয় নীতির প্রধান অবলম্বনস্বরূপ: প্রতিবেশীর ধর্মকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করুন এবং এই বিশাল দেশের বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করুন। বৈদিক যুগ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত আমাদের মহান আচার্যগণ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। আমাদের সাধক ও ভক্তগণ তাঁদের জীবনে এই দৃষ্টান্তই প্রতিফলিত করেছেন। আমাদের রাজ্যগুলিও ধর্মজগতে আচরণের ক্ষেত্রে মিলনের এই মহানীতি, সক্রিয় সহনশীলতা ও স্বীকৃতির এই উদার মনোভাব অবলম্বন করেছেন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোক রাজনীতির প্রত্যয়ান্বিত আদর্শরূপে এই নীতির পোষকতা করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যে পাহাড় ও স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ তাঁর লিপিগুলিতে এই মহান আদর্শ দূর দূরান্তে বিঘোষিত হতে দেখি: 'সমবায় এব সাধুঃ'—'সমবায়' অর্থাৎ সম্প্রীতিই ধর্মজগতে সমীচীন। ভারতের জনসাধারণ ও ভারতের রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে এটি এক প্রত্যয়ান্বিত আদর্শ। স্বামী ব্যোমরূপানন্দ প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা স্বর্গত টয়েনবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনের এই মহাভাবটি হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য; সেমিটিক অর্থাৎ ইহুদি, আরব প্রভৃতি জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সে ভাবটি ছিল না। কেউ গির্জায় যান, কেউ যান মন্দিরে, তৃতীয় ব্যক্তি যান মসজিদে তাতে কি যায় আসে?—সর্বত্র এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই উপাস্য।—এই হলো হিন্দুধর্মের কথা।

নানা ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যটিকে বোধ করার ক্ষমতা প্রচীন কাল থেকে হিন্দুদের কাছে স্বাভাবিক ও সহজ। এখন এই ঐক্যবোধ আপনাদের দিতে হবে খৃষ্টানদের, দিতে হবে মুসলমানদের। তাঁদের এটি ছিল না। তাঁদের সেমিটিক ঐতিহ্য ছিল বর্জনের, হিন্দুদের মতো গ্রহণের নয়, টয়েনবী তাঁর A Historian's Approach to Religion গ্রন্থে যেমন দেখিয়েছেন। কিন্তু আস্তে আস্তে আজ তাঁরা এটা বুঝছেন। এখন আমরা দেখি যে, একজন ক্যাথলিক একজন প্রোটেস্টান্টের নিকটতর হতে পারছেন হৃদ্যতায়। এটা হলো কেমন করে? হলো হিন্দুধর্মের প্রভাবে, বেদান্তের প্রভাবে—যা বলে নানান ধর্মের মধ্যে সত্য অভিন্ন। তাই কেন পরস্পরকে ঘৃণা করা? কেন সবাই মিলিত হই না? পরস্পরের প্রতি মারমুখী না হয়ে, এখন যাকে বলা হয় পারস্পরিক মুখোমুখি সংলাপ, তাই অভ্যাস করুন। পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করুন; সকল ধর্মের অধ্যাত্মসম্পদ সমবেত ক'রে মানুষের

সেবা করুন। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ পোষণ করলে এসব সম্পদ খোয়া যায় এবং গোটা ধর্মব্যাপারটাই লোকচক্ষে হেয় হয়।

মিলনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি

পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর এটা বেদান্তের প্রভাব। এই মিলনের আদর্শ ও আচরণকে ভারতে বিশেষ ঐতিহ্য বোলে আমাদের পোষণ ও পালন করতে হবে। আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাই নানা ধর্ম ও পূজাপদ্ধতি অবলম্বন ক'রে ষাট কোটি মানুষ মৈত্রীতে বসবাস করছেন।—অবশ্য সেইসব দল ছাড়া, যাঁরা মাঝে মাঝে ধর্মের ছদ্মবেশে সংকীর্ণ রাজনৈতিক উত্তেজনার বশবর্তী হন। কেন? কারণ আমাদের মুনি-ঋষিরা এই শিক্ষা দিয়েছেন; আমাদের অতীতের এবং বর্তমানেরও মহান দূরদর্শী রাজনীতিক নেতারাও এই শিক্ষা দিয়েছেন। আধুনিক যুগে এই মহান শিক্ষা যাতে আমরা বজায় রাখতে পারি এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারি তার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। তিনি মানুষের ধর্ম-সমূহের সমস্ত ধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, এক জ্যোতির্ময় জীবন যাপন করেছেন, এবং ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের অধিবেশনের অনেক আগে, তাঁর নিজের জীবনে তিনি একাই এক যথার্থ ধর্ম-সম্মেলন হয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে একটি সুন্দর প্রেরণাপ্রদ শ্লোক আছে (১. ২. ১১):

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থাৎ সেই এক অভিন্ন অদ্বয় জ্ঞান, শুদ্ধ চৈতন্যকে সত্যদ্রষ্টাগণ (দর্শনশাস্ত্রে পরম ব্রহ্ম বোলে, (অতীন্দ্রিয়বাদে সর্বোচ্চ সত্তা) পরমাত্মা বোলে এবং (ভক্তিধর্মে) ভগবান বোলে অভিহিত করেন।

ঋগ্বেদে, গীতায় এবং আমাদের অন্যান্য গ্রন্থেও এই জাতীয় উক্তি আছে।

নানাজন নানাভাবে যে সেই এক ঈশ্বরের শরণার্থী—এই শিক্ষাটি আজ ভারতে আমাদের প্রধান অবলম্বন হওয়া দরকার, যাতে এখানকার বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ও ধর্মে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসহীন সকলের মধ্যে মিলন, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার কেন্দ্রস্বরূপ এ দেশের আধ্যাত্মিক শক্তির দ্যুতি অব্যাহত থাকে। আয়ার্ল্যাণ্ড দেশকে দেখুন। সেখানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট্‌দের মধ্যে এখন কিরকম লড়াই চলছে, যদিও দুই সম্প্রদায়ই সেই অভিন্ন মহান খৃষ্টধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত! এবং আমরা দেখতে পাই বর্তমানে লেবাননেও এই একই ধরনের যুদ্ধ বেধেছে এক আরবজাতির অন্তর্ভুক্ত ও এক সেমিটিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে। এদেশেও আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি—আমাদের হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছেন। আমাদের অবশ্য ছিলেন এক বিদেশী সরকার যাঁরা সেদিন পর্যন্ত আমাদের বিভক্ত করতে এবং আত্মকলহে পরস্পরকে দুর্বল করতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এখন আমরা উপলব্ধি করছি যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে আজ যে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে তার ব্যাপক ও গভীর, সদর্থক ও সৃজনশীল উপকরণ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ক'রে আমাদের আত্মনিষ্ঠ হ'তে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীদ্বয়ের মধ্যে এই হলো একটি।

প্রকৃত ধর্ম কী?

বাণীদ্বয়ের দ্বিতীয়টি যথার্থ ধর্ম কী সে সম্বন্ধে। আমরা ভাবতাম যে মন্দির, গির্জা ও অন্যান্য পুণ্যস্থানে যাওয়া, পুণ্যতোয়া নদীতে

স্নান করা বা ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করাই ধর্ম। কিন্তু তিনি আমাদের শেখালেন যে সে-সব কাজ ধর্মের সারবস্তু নয়, সেগুলি আচার-অনুষ্ঠান মাত্র, আসল ধর্ম অনুশীলনের পদ্ধতি-মাত্র, যে সব পদ্ধতি কোন কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্মাচরণে সহায়তা করতে পারে; কিন্তু সেগুলিকেই লক্ষ্য বোলে মনে করলে প্রকৃত ধর্মের হানিই হয়ে থাকে। 'আচারসর্বস্বতা'র মানে হলো এই। ধর্মের অর্থ আধ্যাত্মিক উন্মেষ, যা আপনাদের অধ্যাত্ম বিষয়ে বিকশিত করে তোলে। আপনাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের ফলে কি আপনাদের সেই আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তো সে সব কাজ উত্তম, বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে তো সে ধর্মপরায়ণতা এক গতিহীন ধর্মিষ্ঠতায়, বা আমার স্বরচিত একটি বাক্যাংশে আমি যাকে বলি, 'ধর্মের ঝালর দেওয়া সাংসারিকতা'য় ('piety-fringed worldliness') পর্যবসিত হয়। আমাদের ধর্মপরায়ণতা কত প্রচুর ছিল, কতো না মন্দির আমাদের ছিল, কতো পূজা-অর্চনা ছিল—আমাদের ইতিহাস তার সাক্ষী। তবুও আমরা পারিনি জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তি, চরিত্রবল ও সমাজচেতনা গড়ে তুলতে, পারিনি আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে মানবিক মর্যাদা ও সাম্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে। একদিকে নিশ্চল ধর্মপরায়ণতার ক্রমবর্ধমান উচ্চরব ও জাঁকজমক, অপরদিকে শোষণ ও অবনতি দারিদ্র ক্লেশ ও ক্রমাগত বিদেশীদের আক্রমণ ও অত্যাচার। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে আমাদের দেশের পতন হয়েছিল। সত্যিকার ধর্ম থাকলে, এ সব হতো কেমন করে? সত্যিকার ধর্ম কী? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, —ধর্মের নির্যাস হলো আধ্যাত্মিকতা। অধ্যাত্মবিকাশ অধিগত করুন—প্রকৃত ধর্মের সারকথা এটাই। তথাকথিত ধর্মপরায়ণ হলে চলবে না। সেটা সহজ, বাহ্যিক ধর্মপরায়ণতা সস্তায় মেলে। প্রয়োজন আপনাদের আভ্যন্তর আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়। সুরদাস, মীরাবাঈ, গুরু নানক, তুলসীদাস প্রমুখ সকল সাধক-সাধিকাই আমাদের শিখিয়েছেন আমাদের আধ্যাত্মিক হ'তে, মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব আছে তাকে ফুটিয়ে তুলতে। আধ্যাত্মিক বিকাশই ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। এই হলো ধর্মবিজ্ঞান। মন্দিরে যান, সেখানে পাঁচমিনিট কাটিয়ে যখন বাহিরে আসবেন তখন আপনাকে অনুভব করতে হবে যে, 'আপনি এক কদম এগিয়ে এলেন ঈশ্বরের কাছে; আপনার অনন্ত সত্তার নিকটবর্তী হলেন একধাপ; আপনার অভ্যন্তরবর্তী ঈশ্বরকে আপনি আর একটু প্রস্ফুটিত করেছেন। একেই বলে অধ্যাত্ম-সাধনা। প্রত্যেক ধর্মীয় কাজ, ঈশ্বরভক্তির কাজ—বস্তুত জীবনের প্রত্যেক কাজই—আপনার আধ্যাত্মিক উন্মেষের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়া চাই।

ধর্মের এই হলো সত্যিকার বিচার। আধ্যাত্মিক বিকাশ না হলে ধর্মের ধ্বজা ধরে ঘুরে বেড়ানো নিরর্থক। হিন্দুধর্ম কী শিক্ষা দেয়? হিন্দুধর্ম শেখায় যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান: 'অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ'—গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। ঈশ্বর যদি সকল প্রাণীর অন্তরে থাকেন, আমাদের জীবনে আচারে-ব্যবহারে ও কাজে-কর্মে কি তাঁকে আমরা উদ্ভাসিত করবো না? আমরা কি তাঁর সম্বন্ধে অবহিত হবো না এবং সকল মানুষের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করবো না? সর্বদা আমার মধ্যে রয়েছেন যে ঈশ্বর তাঁকে উপলব্ধি করতে আমায় চেষ্টা করতে হবে—এইটাই হিন্দুধর্মের প্রথম

'চ্যালেঞ্জে'র মোকাবিলা করার মনোভাব। সেই এক ঈশ্বরকে সকলজনের হৃদয়স্থ দেখা এবং এইভাবে সকল মানুষকে ভালবাসা, সকল মানুষের সেবা করা—তাঁদের শোষণ করা নয়, তাঁদের সঙ্গে সংগ্রাম করা নয়, তাঁদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া নয়—এই হলো হিন্দুধর্মের দ্বিতীয় 'চ্যালেঞ্জে'র মোকাবিলা করার মানসিকতা। বিগত বহু শতাব্দী আমাদের দাসমনোবৃত্তি নিয়ে আমরা এই দ্বৈত আহ্বানের প্রতি বিমুখ ছিলাম। কিন্তু আজ এই ভ্রান্ত নিশ্চল পথ পরিত্যাগ ক'রে, মুক্ত মন বিকশিত ক'রে আমাদের দেখতে হবে যেন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অনুরাগ সেবার মনোভাব আত্মোৎসর্গের মনোভাব সবল চরিত্র এবং বিলক্ষণ কর্মনৈপুণ্য আমাদের ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়। প্রকৃত ধর্মের বিচার ও ফল-নির্ণয় হয় চরিত্র দিয়ে। মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের সত্যিকার মাপকাঠি এইটাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটার উপর বারবার জোর দিয়েছেন।

[ক্রমশঃ]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

[ভাদ্র, ১৩৮৩ সংখ্যার পর]

২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৬। রবিবার। কিছু দিন থেকে মনে একটা দারুণ হতাশার ভাব এসেছে—ধ্যান-জপ ক'রে তো কিছুই হল না। কোন কিছু আর ভাল লাগছে না। এক একবার মনে হচ্ছে, ভালভাবে, ঠিকমতো সব করতে পারিনি, তাই হয়নি। আবার মনে হচ্ছে একটু তো করেছি, তারও তো কিছু ফল হবে, কিছুই হল না কেন! স্থির করলাম, এসব ছেড়ে দেবো, কোন লাভ নেই এসব করে। খুব ভয়ও পাচ্ছি মনের এই অবস্থায়। কোথায় ভক্তিবিশ্বাস বাড়ার কথা, তা নয় এই অধঃপতন! এই সময় শুনলাম বিজ্ঞানানন্দজী বেলুড় মঠে এসেছেন। ভাবলাম, ভালই হল, তাঁর কাছে গিয়ে দীক্ষা ফেরত দেবো। ভাবতেই দারুণ কান্না পেল, ভাবলাম নিরালায় গিয়ে কাঁদি।

যাই হোক মঠে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করলাম। মন তখনো ভীষণ অশান্ত। তিনি যথারীতি "কি খবর?" জিজ্ঞেস করলেও এদিন আর কোন কথা বললাম না—মাথাটা শুধু একবার নাড়লাম। মেজেতে বহু ভক্ত বসেছিলেন—ঘর ভর্তি লোক—মনের কথা বলার কোন সুযোগ পেলাম না। ভাবছিও,—কি করে বলি; বললেও উনি হয়ত শুনে দারুণ বকুনি দেবেন। হয়তো বলবেন, জোর করে জপ-ধ্যান কর যা তখন ভালই লাগছিল না। বসে বসে উসখুস করতে করতে শেষে উঠে তাঁর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে শুধু বলতে পারলাম, "কই কিছু তো হচ্ছে না!" তিনি মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "বিশ্বাস করে লেগে থাকুন. হবে বইকি। সময়ে হবে।" কথাটা আমার ভাল লাগল না। অসন্তুষ্টই হলাম। আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো—তিনিও যথারীতি বললেন, "এইবার আপনারা উঠুন, আমাকে একলা থাকতে দিন।"

আরতিতে গেলাম কিন্তু মনে অশান্তির ঝড়

বইছে। ভাবলাম আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে যাবো। আরতির পর মহারাজের সঙ্গে একলা একটু কথা বলার প্রার্থনা জানালাম মহারাজের সেবকের কাছে। মহারাজের অনুমতি পেয়ে ঘরে গেলাম। তিনি আর আমি। সেবক দরজা ভেজিয়ে দিলেন। মহারাজ গম্ভীর। বললাম, "মহারাজ, আমার অধঃপতন ঘটেছে। আমার ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধির পরিবর্তে একেবারে লোপ পেয়েছে। ধ্যান-জপ আর ভাল লাগছেনা।...আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। আমার আর কোন আশা-ভরসা নেই। কি নিয়ে আমি জীবনে দাঁড়াবো?" যা ভেবেছিলাম তার কিছুই হল না—বকুনিও দিলেন না, কোন উপদেশও না বললেন, "সে কি! কই দেখি!"—বলে আমাকে—সামনে দাঁড়াতে বললেন। চার-পাঁচ মিনিট বড় বড় চোখ করে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, আমার আপাদ-মস্তক খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর দৃষ্টি স্বাভাবিক করে বললেন, "ও কিছু না। আপনার কোন ভয় নেই। এবার যান।" নিমেষে আমার মনের অশান্তি কোথায় চলে গেল, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা যেন ধুয়ে মুছে গেল। সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে শান্তি ও আনন্দ-ভরা মন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

* * *

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হন। ঐ বছরই গ্রীষ্মকালে বেলুড় মঠে এসেছেন।

এই সময় আমার মনে একটা সন্দেহ মাথা তুলেছিল। ঠাকুরকে যে পূজো করি, যা নিবেদন করি, তিনি কি তা সত্যিই গ্রহণ করেন? মনে হল, সকলের না, হয়তো খুব শুদ্ধচিত্ত যাঁরা তাঁদেরই শুধু গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানানন্দজীকেও যা ফল মিষ্টি প্রভৃতি দেয় ভক্তেরা, তাও তো দেখেছি হয় তিনি ভক্তদের বিলিয়ে দেন, না হয় ভাঁড়ারে পাঠিয়ে দেন নিজে তো কিছু গ্রহণ করেন না। তিনিও কি আমাদের পূজা গ্রহণ করেন?

একদিন তাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছি—কিছু নিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। দরিদ্র আমি—বেশী দাম দিয়ে ভাল কিছু কেনার সামর্থ্য নেই রাস্তায় খুব বড় অথচ কচি দুটি ডাব দেখে তাই কিনে নিলাম। বেলুড় মঠে পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো এসময় কাউকে বিজ্ঞানমহারাজ ঘরে থাকতে দেন না, আরতির পরও সাধারণতঃ কারো সঙ্গে দেখা করেন না। কাজেই দারুণ দুশ্চিন্তা হল, আজ আর বোধ হয় দর্শনই হল না! ওপরে উঠে দেখি, তখনও দরজা খোলা, মহারাজ উত্তরাস্য হয়ে ঘরে বসে আছেন। ঘরে আর কেউ নেই, কেবল সেবক দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসার জন্য তৈরী হচ্ছেন; তিনি বললেন, "আজ আর দেখা হবে না, নীচে যান দমে গেলাম—এত ছুটোছুটি সব বৃথা হল ডাব দুটি সেবকের হাতে দিয়ে বাইরে থেকেই প্রণাম করলাম। মহারাজের দৃষ্টি পড়লো, বললেন, "কি খবর? আসুন, বসুন; কি?—ডাব এনেছেন? বেশ বেশ।" ব'লে হৈ চৈ লাগিয়ে দিলেন—সেবককে বললেন—'ওহে, ডাব এনেছে, দেখ আমি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি ডাব খাব—আর ডাব এসে গেছে! কাট তো একটা, খাওয়া যাক।" বললেন, "দেখো হে, সন্ধ্যের সময়, আবার হাত কেটো না! তাহলে আমার বদনাম হয়ে যাবে। খুব সাবধান। বেশ ডাব হে!" ছেলেমানুষের মতো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সেবক

বললেন, "মহারাজ, আপনি তো বেলা তিনটার সময় ডাব খান, সন্ধ্যের সময় খাবেন?" মহারাজ বল্লেন, "হ্যাঁ গো হাঁ, খাব। তুমি কাটো।" তাকিয়ে দেখি মহারাজের ঘরেই ৭।৮ টা ডাব মজুত আছে। শুনলাম বিকাল ৪টার সময় তাঁকে ডাব খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি খেতে চাননি।

ডাব কাটা হয়ে এলে খুব আনন্দ করে খেলেন। দেড় গ্লাস জল—সবটাই খেয়ে ফেললেন। আমি আনন্দে অধীর হয়েছি—এঁরাও তাহলে পূজো গ্রহণ করেন! মনের গোপন কথা সব জানতে পারেন—ছোটখাট সব সন্দেহই সহানুভূতিমাখা কোমল স্পর্শে করেন!

তারপর ডাবেরই গল্প চললো,—মাদ্রাজে খুব ডাব খেয়েছিলেন, সিংহল না কোথায় 'গোল্ডেন কোকোনাট' খেয়েছিলেন, ইত্যাদি। রাত প্রায় আটটা হল। এর আগে কোনদিনই আরতির সময় বা পরে তাঁকে এভাবে কারো সঙ্গে গল্প করতে দেখিনি। তাই খুব আশ্চর্যও হলাম এবং নিশ্চিত ধারণা হল এই দরিদ্র সন্তানটিকে কৃপা করার জন্যই এই ব্যতিক্রম করলেন।

* * *

বেলুড় মঠে অখণ্ডানন্দজী ও বিজ্ঞানানন্দজী দুজনেই রয়েছেন। বিকেল ৪টায় মঠে গিয়ে বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করতেই অখণ্ডানন্দ মহারাজকে প্রণাম করে আসতে বললেন; স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে তিনি ছিলেন। ঘরে সেবক ছাড়া কেউ ছিল না, তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তার একটু আমার কানে এলো, "তীর্থধর্ম নিজে করার চেয়ে পরকে করানো আরো ভাল।"

বিজ্ঞানানন্দজী সেদিনই এলাহাবাদ ফিরবেন, একটু পরেই যাত্রা করবেন। একটু পরে অখণ্ডানন্দজী ঘরে ঢুকে বললেন, "প্রসন্ন, তুমি এখনই যাবে?" মহারাজ বললেন, "হাঁ মহারাজ, এবার বেরুবো।" অখণ্ডানন্দজী বললেন, "এর মধ্যে যাবে কেন? এখন সময় অনেক আছে!"

"সূর্য থাকতে থাকতে বেরুবো।"

"তোমার আবার এসব অত পালন করার দরকার কি? এখন যেয়ো না। আমি বেড়িয়ে আসি, তারপর যাবে।"—বলে হাসতে হাসতে অখণ্ডানন্দজী বাইরে গেলেন। সন্ধ্যার একটু আগে ফিরে বললেন, "প্রসন্ন, আমি এসেছি, তোমার একটু দেরী করে দিলাম।" বিজ্ঞানানন্দজী হাসতে হাসতে বললেন, "না, এমন কিছু না। এখন যাই?" অখণ্ডানন্দজী দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে মোটরে তুলে দিলেন। সকলে জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কবে আসছেন?" উত্তর আগের আগের বারের মতোই—"রামের ইচ্ছে।" অখণ্ডানন্দজীকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন, তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন

* * *

বর্ষাকাল। বিজ্ঞানমহারাজ মঠে এসেছেন। বিকালে গেছি। একজন সাধু (বাইরের) ৭।৮ টি কুমারীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, "এরা ব্রহ্মচারিণী, মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন।" মহারাজ রাজী হলেন না। বললেন "…আমার কাছে স্পেশাল কেউ নেই, আমার কাছে সবাই সমান। আর, আমার আশীর্বাদে কোন কাজ হবে না; যদি হোত, তাহলে ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করার আগে নিজের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতাম।……আমার আশীর্বাদ করবার কি অধিকার আছে, সবই সেই ঠাকুর, মা।"

…পরে, সব চলে গেলে, যখন একা আছি, আমাকে বললেন, "মনের আশীর্বাদ চেয়ে নেবেন।"

*　　*

১৯৩৭ সাল। গ্রীষ্মকাল মঠে মহারাজ এসেছেন। গেছি। কিছুকাল যাবৎ একটা কথা মনে প্রায়ই উঠছিল,—মহারাজকে প্রণাম করেছি বহুবার। সোজাসুজি তাঁর পাদস্পর্শ করার সৌভাগ্য কখনো হল না—পায়ে সব সময় মোজা পরা থাকতো। একদিন হঠাৎ আমায় বললেন, "আমার মোজাটা খুলে দেবেন?" আমি তো হাতে চাঁদ পেলাম! মোজা খোলার পর দেখি হাসছেন। বললেন, "আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবেন?" এত সৌভাগ্য কল্পনাও করিনি! কিছুক্ষণ পরে বললেন, "থাক, হয়েছে। পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল, আপনারা হাত বুলিয়ে দিতে আরাম হল।" বুঝলাম, অন্তর্যামী তিনি; কেবল স্পর্শ নয়, সেবা করার অধিকারও একটু দিয়ে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

*　　*　　*

জুলাই ১৯৩৭। মহারাজ মঠে এসেছেন। গেছি। বললাম, "মহারাজ, এলাহাবাদ যেতে ইচ্ছে হয়, সুযোগ হয় না।" বললেন, "দেখুন সুযোগ করে নিতে হয়। Where there is a will there is a way. একটা লোক সমুদ্র-স্নান করতে গিছিল। কিন্তু জলে নামতে যাচ্ছে, একটা বড় ঢেউ আসছে দেখে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলো, আবার একটু পরে নামতে যাচ্ছে, আবার একটা বড় ঢেউ, আবার পিছিয়ে এল। সমুদ্রের ঢেউও থামে না, তার আর সমুদ্রস্নানও হল না। তাই বলছি, সংসার-সমুদ্রের ঢেউ সব সময়ই চলবে, ঐ ফাঁকেই কাজ সেরে নিতে হবে। বিপদ-আপদ, বাধা-বিঘ্ন চলতেই থাকবে, ওসব উপেক্ষা করে ওরই মধ্যে কাজ সেরে নিতে হবে। হাল ছাড়লে চলবে না, অপেক্ষা করলেও চলবে না। সবই একসঙ্গে চলবে—আপনার কাজও আর বিপদ-আপদ-বাধা-বিঘ্নও। তা না হলে বুদ্ধার কাশীবাসের মতো হবে—শেষ পর্যন্ত যার কাশীবাস আর হল না।"

আরো সব কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় একজন পাশ্চাত্য মহিলা, বাঙালী মেয়েদের মতো শাড়ী-পরা, ঘরে মহারাজকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলেন। খুব হাসি-খুশী, বয়স আন্দাজ ২৪।২৫। মহারাজের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, ইংরেজীতে। শুনলাম, মহারাজের দীক্ষিতা। একটা বেল এনেছিলেন, মহারাজকে দিলেন। মহারাজ সেটি নিয়ে সমর মহারাজকে দুটি প্রসাদী আপেল দিতে বললেন। মেয়েটি খুব খুশী হয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "একটা দিলাম, দুটো পেলাম!" আরো কথাবার্তার পর তিনি চলে গেলেন।

*　　*　　*

নভেম্বর, ১৯৩৭। মহারাজ ১৭।১৮ দিন বেলুড় মঠে ছিলেন। কিন্তু শরীর খুব খারাপ থাকায় দর্শনের সৌভাগ্য বহুজনের হলেও কথা বলা নিষেধ ছিল। এমনি একদিন লাইন দিয়ে আমরা অনেকেই পরপর ঘরে ঢুকে প্রণাম করে যাচ্ছি—কথা বলা নিষেধ। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, প্রণাম করে "মহারাজ, একটা প্রশ্ন' বলতেই একটা আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, "এখানকার নিয়ম কি জানেন?" "কি?" "এই যে একটা আঙুল তুলে দেখাচ্ছি, একটি কথাও নয়, আর দর্শন এই একমিনিট!" তবু বললাম, "একটা প্রশ্ন ছিল" কিন্তু মহারাজ বললেন, "একটিও কথা নয়—এই আমার একটা আঙুল দেখছেন এক মিনিট!" কাজেই বাইরে গেলাম। আরতির পর, আরো কিছুক্ষণ মঠে

কাটিয়ে রাত ৮টায় বাড়ী ফেরার আগে বারান্দা থেকে মহারাজকে প্রণাম করে যাবো ভেবে দরজার সামনে যেতেই ডাকলেন, হাতের ইসারায়। বসতে বললেন। আর কেউ নেই ঘরে। বললেন, "এত রাত্তির হল, বাড়ী যেতে ভয় করবে না?" সেই ভয়ের কথা! আমি বললাম, "না।" আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, "কি আর করবেন! দিনান্তে একবার তাঁকে ডাকলেই হবে, দয়াল ঠাকুর।" একটু চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে হেসে আবার বললেন "না ডাকলেও হবে!"

আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। দীক্ষার সময় থেকে আমার মনে ভয় ছিল, যদি সব ঠিক মতো না করতে পারি, কি হবে! বুঝলাম, সেই ভয় ভাঙিয়ে দেবার জন্যই একথা বললেন।

এর আগে একদিন শ্রীশ্রীমাকে হাত তুলে প্রণাম করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "জগজ্জননী—মাথা নত করে বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন।"

এই সময়ের মধ্যে আর একদিনের ঘটনা। মহারাজের শরীর খারাপ বলে বাইরে থেকে প্রণাম করে যাবো ভেবে দরজায় দাঁড়াতেই "ঐ এসেছে, ঐ এসেছে আবার" ব'লে হো-হো করে হাসতে হাসতে বললেন, "আসুন, ভেতরে আসুন, বাইরে কেন, আপনিও গুলজার করুন।" ঘরে কয়েকজন সাধু-মহারাজ ছিলেন, একজন তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলেন। সব নিয়ে ৬।৭ জন হবেন। রামায়ণের কথা, শ্রীরামচন্দ্রের কথা, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদের কথা বলতে লাগলেন, তাঁদের চেহারার বর্ণনা দিতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লোক-চেনার কথা বললেন। তার পর উর্বশীর কথা পাড়লেন হঠাৎ—"উর্বশী খুব ভাল নাচতে পারেন" বলেই তার নাচের ভঙ্গী দেখাতে লাগলেন! সাধুরা ও আমি হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলাম। উচ্চহাস্যের শব্দে ততক্ষণে আরো দু-একজন সাধু এসে গেছেন—সবাই প্রাণ খুলে হাসছেন! ঘর ফাটিয়ে হাসির রোল উঠলো। বহুক্ষণ পরে হাসি থামলো। তখন আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন হোল?"

এই দিনকার এই আনন্দের রেশ আমাকে ৬।৭ দিন মশগুল করে রেখেছিল। এখনও মনে পড়লে হাসি পায়। অবাক হয়ে ভাবি, এত গুরুগম্ভীর তিনি, কি করে এমন আমাদের মতো ছেলেমানুষ হয়ে এত আনন্দ দিলেন!

*　　*　　*

১৪ জানুআরি, ১৯৩৮। মকর সংক্রান্তি। বেলুড় মঠে বিজ্ঞানানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে নূতন মন্দিরে বসালেন। সারাদিন প্রণাম করার সুযোগ পাওয়া গেল না, বিকালে ঘরে গেছি। যথারীতি প্রশ্ন করলেন, "কি খবর? কখন এলেন?" বললাম যে সকালেই এসেছি। মহারাজ বললেন, "ঠাকুরের নূতন মন্দির হল। ঠাকুরও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আমার কাজ শেষ হল। আপনাদেরই মঠ, আপনারা আসবেন এখানে। এবার আমি চল্লুম।" বললাম, "আবার কবে আসছেন?" বললেন, "আর একবার আসবো, আর আসবো না। ঠাকুরের তিথিপুজোটা মন্দিরে করে যেতে হবে। সেই সময় আসবো। আর আসবো না।"

কথাটা তখন এমনি কথার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু তাই-ই শেষে নির্মম সত্য হল।

*　　*　　*

২৭ ফেব্রুআরি, ১৯৩৮। রবিবার অপরাহ্ণ। এলাহাবাদ হতে বিজ্ঞানানন্দজী বেলুড় মঠে

এসেছেন শুনে দর্শন করতে গেছি। দর্শনের সময় লক্ষ্য করলাম মহারাজের পা দুটি খুব ফুলেছে। সামনে দাঁড়াতেই ছেলেমানুষের মতো খুব জোরে বললেন, "এই যে, এসেছেন! কেমন আছেন? ওহে আসছে শুক্রবার ঠাকুরের তিথিপূজো, রবিবার সাধারণ উৎসব—ঐ দু-দিনই আসা চাই এখানকার পকেটমাররা আপনার পকেট মেরে নেবে—কেমন হবে?" বলে খুব হাসতে লাগলেন। সবাই হাসিতে যোগ দিলাম।

দু-দিনই এসেছিলাম, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সাধারণ উৎসবের দিন সত্যিই আমার পকেটমার হল।

এর পর তাঁর এলাহাবাদ ফিরে যাবার আগে আরো দু-একবার এসেছি। কিন্তু দর্শন হয় নি শরীর খুব খারাপ ব'লে। শেষে একদিন ঘর থেকে দর্শন দিলেন জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে। সেই শেষ দর্শন।

আদিরাজ পৃথু

শ্রীশেফালিকা দেবী

কোন জাতি বা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা তথা রাজ্যের সুনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল; সে-শাসনতন্ত্র রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, এক-নায়কতন্ত্র বা যে-কোন তন্ত্রই হোক না কেন। এই সত্য ইতিহাসের পাতায় অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত।

অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা কৌটিল্যের মতে, "অধ্যাত্ম-বিদ্যা, বেদাত্মক বিদ্যা, বার্তা অর্থাৎ কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য-বিষয়ক বিদ্যা এবং দণ্ডনীতি বা শাসননীতি বিদ্যা এই চার প্রকার।'[১] প্রথমোক্ত তিন প্রকার বিদ্যার প্রাপ্তি ও রক্ষণে দণ্ডই অর্থাৎ শাসনই সমর্থ। দণ্ডবিদ্যার নীতিই দণ্ডনীতি বা শাসননীতি। এই দণ্ডনীতি অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করায়, প্রাপ্ত বস্তুকে রক্ষা করায়, রক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করায় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তুকে উপযুক্ত পাত্রে বিনিয়োগ করায়। সমাজব্যবহার এই দণ্ডনীতির উপরই নির্ভরশীল।"[২] কৌটিল্য আরও বলেন, "দণ্ডধর বা শাসকের অভাবে বলবান হীনবলকে গ্রাস করে। দণ্ড দ্বারা রক্ষিত সমাজ সবল হয়।"[৩]

সুতরাং দেশের সর্ববিধ উন্নতির মূল দণ্ড বা শাসন। আবার সেই দণ্ড যথোপযুক্ত হওয়া আবশ্যক; কারণ -"উগ্রদণ্ড শাসক সকলের উদ্বেগের কারণ হয়। মৃদুদণ্ড শাসক অর্থাৎ গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড-প্রদাতা শাসক পরাজিত হন। যিনি যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন সেই শাসক সকলের পূজ্য হন।"[৪]

১ আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।—কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ১।২

২ আন্বীক্ষিকী-ত্রয়ী-বার্তানাং যোগক্ষেমসাধনো দণ্ডঃ। তস্য নীতির্দণ্ডনীতিঃ—অলব্ধলাভার্থা লব্ধপরিরক্ষণী রক্ষিতবিবর্ধনী, বৃদ্ধস্য তীর্থেষু প্রতিপাদনী চ। তস্যামায়ত্তা লোকযাত্রা।—ঐ, ১।৪

৩ বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে। তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি। ঐ, ১।৪

৪ তীক্ষ্ণদণ্ডো হি ভূতানামুদ্বেজনীয়ঃ। মৃদুদণ্ডঃ পরিভূয়তে। যথার্হদণ্ডঃ পূজ্যঃ।—ঐ, ১।৪

অযোগ্য রাজার শাসন বা অরাজকতা শুধু জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে না, সাধারণ প্রজার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্যন্ত দুর্বিষহ করে তোলে। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর ঋষিগণ অরাজকতার পরিণাম চিন্তা করে বশিষ্ঠকে অনুরোধ করেছিলেন রাজপদে শীঘ্র একজনকে অভিষিক্ত করতে। অরাজকতার ফলে দেশের অবস্থা কিরূপ হয়, তার বিস্তৃত বিবরণ তাঁরা দিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি সর্বদেশে সর্বযুগে সত্য :

"অরাজক দেশে বীজ বপন করা হয় না। পুত্র পিতার, স্ত্রী স্বামীর বশবর্তী হয় না। অরাজক রাজ্যে কাহারও ধন বা ভার্যা গৃহে থাকে না। এইরূপে মহা-অমঙ্গল উপস্থিত হয়—সত্য ব্যবহার সেখানে কিরূপে থাকে? অরাজক দেশে লোকেরা আনন্দিত চিত্তে সভাগৃহ, মনোরম উদ্যান বা মঙ্গলময় গৃহসকল নির্মাণ করে না।…ঐরূপ দেশে নট ও নর্তকের হর্ষোৎপাদক ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকারী সামাজিক উৎসবসকলের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পায় না; পণ্যবিক্রেতাগণ সফলকাম হয় না।… অরাজক রাজ্যে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা কুমারীবৃন্দ দলবদ্ধ হয়ে সন্ধ্যাকালে ক্রীড়ার জন্য উদ্যানে গমন করে না; ধনবান ব্যক্তিগণ নিরাপদে থাকে না; কৃষক ও গোরক্ষজীবিগণ দ্বার উন্মুক্ত রেখে শয়ন করতে পারে না।…বহুবিধ পণ্যসহ দূরদেশগামী বণিকগণ নিরাপদে পথ অতিক্রম করতে পারে না। পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন, একাকী বিচরণকারী, যেখানে সন্ধ্যা-সমাগম হয়, সেখানেই অবস্থান করেন—এরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণও অরাজক রাজ্যে বাস করেন না। সেখানে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ হয় না; সৈন্যগণ শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না।…অরাজক রাজ্যের অবস্থা জলহীন নদী, তৃণশূন্য বন ও পালকহীন গাভীর ন্যায় শোচনীয় হয়। সেখানে নিজস্ব বলে কিছু থাকে না।…বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে ভক্ষণ করে, অরাজক রাজ্যেও সবল সেইরূপ দুর্বলকে গ্রাস করে।"[৫]

বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় এইরূপ মাৎস্য-ন্যায় উপস্থিত হলে দেশের মঙ্গলের জন্য "প্রকৃতিপুঞ্জ" পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল-দেবকে রাজারূপে নির্বাচিত করেছিল। তারপরে পাল বংশের শাসনকালে বাংলার সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগের সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় বর্তমান।

কুশাসন, অরাজকতা ও সুযোগ্য রাজার শাসনের ফল কিরূপ—তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবতে বেণ ও পৃথুর উপাখ্যান।

শ্রীহরির পরম ভক্ত ধ্রুবের বংশোদ্ভব রাজর্ষি অঙ্গ অপুত্রক। মুনিগণের উপদেশক্রমে যজ্ঞ ক'রে তিনি বেণ নামক পুত্র লাভ করেন। বেণের মাতামহ মৃত্যু অধর্মের অংশে জাত। শৈশবাবধি বেণ মাতামহের স্বভাবানুযায়ী নির্দয় ও দুরাচার। সে ব্যাধের বেশধারী হয়ে মৃগয়া করে। ক্রীড়াস্থলে ক্রীড়ারত সমবয়স্ক বালকদের সবলে আক্রমণ ক'রে যজ্ঞীয় পশুর মত নির্মমভাবে বধ করে। পিতা বহু চেষ্টায় পুত্রের স্বভাব সংশোধনে ব্যর্থকাম। কুপুত্রহেতু চিন্তাক্লিষ্ট নিদ্রাহীন রাজা অনেক বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে এলেন—"সুপুত্র সংসারে আসক্তি আনে; সুতরাং সুপুত্র শোকের কারণ। কুপুত্র তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ কুপুত্র সংসার ক্লেশকর করে এবং মানব নির্বেদ প্রাপ্ত হয়।"[৬]

[৫] বাল্মীকি রামায়ণঃ অযোধ্যাকাণ্ড দ্রষ্টব্য। [৬] শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।১৩।৪৬

সুতরাং একদিন গভীর নিশীথে সকলের অগোচরে রাজর্ষি অঙ্গ গৃহত্যাগ করলেন। বহু অনুসন্ধানেও তাঁর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

রাজপদ শূন্য। অরাজকতার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করে মুনিগণ প্রজাদের অসম্মতি-সত্ত্বেও অযোগ্য বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। বেণ অতি কঠোর শাসক। রাজ্য দস্যুভয়হীন; কারণ "অত্যুগ্রশাসন বেণ রাজপদে অধিষ্ঠিত শ্রবণ ক'রে দস্যুগণ সর্পভয়ে ভীত মূষিকের ন্যায় আত্মগোপন করল।"[৭]

কিন্তু রাজৈশ্বর্য ও ক্ষমতালাভে বেণ মদান্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে মহৎ জনের অবমাননা করতে লাগলেন। প্রজাদের ধর্মেকর্মে হস্তক্ষেপ আরম্ভ হল;—"হে দ্বিজগণ, তোমরা যজ্ঞ দান বা হোম করবে না—এইভাবে বেণ ভেরী-ঘোষণার দ্বারা সর্বত্র ধর্মকর্ম নিষিদ্ধ করলেন

বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করেই মুনিগণ তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়েছিল বলে মনে করেন নি; কারণ বেণের স্বভাব তাঁরা খুব ভালভাবেই অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁরা বেণের সমস্ত আচরণই লক্ষ্য করছিলেন। যজ্ঞোপলক্ষে মুনিগণ মিলিত হ'য়ে বললেন: "হায়! উভয়-দিকে প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত প্রাণীর ন্যায় প্রজাদের অবস্থা! রাজা না থাকলে তস্করের ভয়, থাকলেও রাজার ভয়! অরাজকতার ভয়ে বেণকে রাজা করা হল এখন তার থেকেই ভয় উপস্থিত। কিরূপে প্রজাদের মঙ্গল হবে?"[৯]

বেণকে মুনিগণই প্রজাদের অসম্মতিসত্ত্বেও রাজা করেছেন। সুতরাং বেণের কার্যাকার্যের জন্য তাঁরাও কিছুটা দায়ী। সেজন্য তাঁরা স্থির করলেন যে, প্রথমে বেণকে মিষ্টবাক্যে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করবেন। তাতে সফল না হলে বেণকে বধ করবেন। সুতরাং হৃদয়ে ক্রোধ গোপন ক'রে তাঁরা বেণকে অনুরোধ করলেন প্রজাদের ধর্মকর্মে প্রবর্তিত করতে; কারণ—

ধর্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ।
লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্॥
(ভাগবত, ৪।১৪।১৫)

—কায় মন বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা আচরিত ধর্ম সকাম ব্যক্তিগণকে শোকবর্জিত লোকসমূহ এবং নিষ্কাম ব্যক্তিগণকে মোক্ষপর্যন্ত প্রদান ক'রে থাকে।

রাজার অন্যান্য কর্তব্য সম্বন্ধেও মুনিগণ বেণকে অবহিত করলেন। কিন্তু বেণ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। উপরন্তু ব্যঙ্গ করলেন ও কটুবাক্য বর্ষণ করলেন। অবশেষে মদান্ধ বেণ বললেন: "বর ও শাপ প্রদানে সমর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বায়ু, যম, সূর্য, বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, কুবের, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি ও জলাধিপতি বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ রাজদেহে অবস্থিত। রাজা সর্বদেবতাস্বরূপ। সুতরাং একমাত্র রাজাই সকলের অর্চনীয়।"[১০]

বহু অনুনয়েও ভ্রষ্টবুদ্ধি বেণ মত পরিবর্তন না করায় মুনিগণের ধৈর্যচ্যুতি হল। তাঁরা বেণকে সংহার ক'রে স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। শোকার্তা বেণজননী সুনীথা মন্ত্রবলে বেণের দেহ রক্ষা করতে লাগলেন।

রাজপদ পুনরায় শূন্য। অরাজকতার বিষময় ফল দেখা দিল। মুনিগণ সরস্বতী নদীতে স্নান ও হোমান্তে যখন নদীতটে ভগবৎ-

৭ শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।১৪।৩
৮ ভাগবত, ৪।১৪।৬
৯ ভাগবত, ৪।১৪।৯
১০ ভাগবত, ৪।১৪।২৬-২৭

কথায় রত, তখন তাঁরা দেখলেন চতুর্দিকে ধাবমান দস্যুদের পদোত্থিত ধূলিরাশিতে গগন সমাচ্ছন্ন। মুনিগণ চিন্তিত হলেন। এর প্রতিকার আবশ্যক। কিন্তু সেজন্য ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। তাঁদের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। অথচ এই ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ—

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা॥
(ভাগবত, ৪।১৪।৪১)

—সমদর্শী, শান্ত ব্রাহ্মণ যদি বিপন্নদের উপেক্ষা করেন, তাহলে ভগ্নভাণ্ড হতে নিঃসৃত দুগ্ধের ন্যায় তাঁর তপোবল নষ্ট হয়।

সংসারত্যাগী, ভগবৎপদে অর্পিতমনপ্রাণ ব্যক্তিও আর্ত ও অসহায়ের বেদনায় স্থির থাকতে পারেন না। এই জগৎ অনিত্য ব'লে যাঁরা ত্যাগ করেছেন, সেই সর্বত্যাগিগণও সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন।

তাই মুনিগণ বেণের মৃতদেহের উরুদেশ মন্থন করলেন। ফলে এক ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকৃতি অতি কুৎসিত ব্যক্তির উদ্ভব হ'ল। সে নিষাদ নামে পরিচিত হ'ল এবং তার বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হ'ল অরণ্য।

এরপর মুনিগণ বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করলেন। তখন এক যুগল স্ত্রীপুরুষের আবির্ভাব হ'ল। যিনি পুরুষ, তিনি শ্রীহরির অংশে জাত, তাঁর নাম পৃথু এবং স্ত্রী যিনি, তিনি লক্ষ্মীর অংশে জাতা অর্চিদেবী। পৃথুর রূপ অনুপম, রাজোচিত। "তিনি উন্নতকায়। তাঁর বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও স্থূল। বর্ণ গৌর। নেত্রদ্বয় পদ্মের ন্যায় রক্তাভ। নাসিকা ও আনন সুন্দর। সৌম্য-মূর্তি। স্কন্ধদেশ উন্নত, দন্তপঙ্‌ক্তি ও হাস্য সুন্দর। বক্ষঃস্থল বিশাল ও কটি বৃহৎ। অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় উদরদেশ উপরদিকে বিস্তৃত, নিম্ন-দিকে সঙ্কীর্ণ এবং উহা ত্রিবলীরেখাঙ্কিত ও সুন্দর। নাভিদেশ আবর্তের ন্যায় গভীর এবং রূপ তেজোময়। উরুদ্বয় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও পদদ্বয়ের অগ্রভাগ ঈষৎ উন্নত। তাঁর কেশকলাপ সূক্ষ্ম, বক্র, কৃষ্ণ ও স্নিগ্ধ এবং গলদেশ শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাঙ্কিত।[১১]

পত্নী অর্চিসহ পৃথু রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। সমস্ত প্রকৃতি তাঁর অনুকূল হল। দেবগণ তাঁকে নানাবিধ অস্ত্র, রথ, আসন, ছত্র, অশ্ব প্রভৃতি প্রদান করলেন আর ঋষিগণ দিলেন আশীর্বাদ।

অভিষেকের পর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্তুতিপাঠকগণ স্তুতির উদ্যোগ করলে মৃদু হেসে পৃথু তাঁদের এই ব'লে নিবারণ করলেন যে, তাঁর গুণাবলী এখনও প্রকাশিত হয় নি সুতরাং স্তুতিপাঠ অনুচিত। তাছাড়া যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সত্য স্তুতিকেও গর্হিত কার্যের ন্যায় নিন্দনীয় মনে করেন। পৃথুর এই বিনয়ে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু মুনিদের প্রেরণায় স্তুতিপাঠকগণ তাঁদের কার্য সম্পন্ন করলেন। আদর্শ শাসকের গুণহিসাবে স্তুতিগাথার দুটি শ্লোক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

অব্যক্তবর্ত্মৈষ নিগূঢ়কার্যো
গম্ভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ।
অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা
পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংবৃতাত্মা॥
নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ সুতমাত্মদ্বিষামপি।
দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্মপথে স্থিতঃ॥
(ভাগবত, ৪।১৬।১০, ১৩)

—ইনি বরুণের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়গতি ও গুপ্তকর্মা

১১ ভাগবত, ৪।২১।১৫-১৭

হবেন। দেশকাল বিবেচনা ক'রে কার্য করবেন। তাঁর ধনসম্পদ সুরক্ষিত হবে। অনন্ত মহিমা ও গুণের একমাত্র নিলয় শ্রীহরি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হবেন এবং এই পৃথু সংযতচিত্ত হবেন। ইনি ধর্মপথে অবস্থান করবেন। দণ্ডের অযোগ্য শত্রুপুত্রকেও দণ্ডদান করবেন না; নিজপুত্র দণ্ডযোগ্য হলে তার শাস্তি-বিধান করবেন অর্থাৎ তিনি ন্যায়-বিচারক হবেন।

পৃথু স্তুতিপাঠকগণকে পুরস্কৃত করলেন এবং ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণচতুষ্টয়, ভৃত্য, অমাত্য, পুরোহিত, পুরবাসী, জনপদবাসী, ব্যবসায়ী ও কর্মচারিগণের যথোচিত সমাদর করলেন।

অভিষেকের পর প্রাথমিক কর্তব্যাদি সমাপনান্তে পৃথু রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। দীর্ঘকাল অরাজকতার পর রাজপদপ্রাপ্ত রাজাকে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা হ'ল খাদ্যসমস্যা। পৃথুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে যখন তাঁকে "জনতায়াশ্চ পালঃ" অর্থাৎ জনগণের পালক ব'লে নিযুক্ত করলেন, তখন পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ প্রজাগণ এসে কাতরভাবে নিবেদন করল: 'হে রাজন্! কোটরস্থ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় আমরাও জঠরাগ্নিতপ্ত। আপনি আমাদের জীবিকাপ্রদ প্রভুরূপে নির্দিষ্ট। অতএব হে শরণাগতবৎসল! আমরা আপনার শরণাপন্ন। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণের পালক এবং জীবিকার বিধানকর্তা। আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের অন্নদানে যত্ন করুন। আমরা যেন অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই।"[১২]

রাজা শুধু প্রজাদের অন্নদান করবেন না—তাদের জীবিকারও ব্যবস্থা করবেন। কারণ প্রজারা ভিক্ষুক নয়। তারা পরিশ্রমের বিনিময়ে স্ব স্ব খাদ্য অর্জন করতে চায়।

প্রজাদের বিলাপে চিন্তিত পৃথু অবশেষে পৃথিবীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য শরাসন ধারণ করলেন। ভীতা ধরিত্রীদেবী গো-রূপ ধারণ ক'রে পলায়ন করতে লাগলেন। কিন্তু কোনরূপে নিস্তার না পেয়ে অবশেষে বহু স্তুতির দ্বারা পৃথুকে প্রসন্ন ক'রে প্রথমে অনুযোগ করলেন: "হে রাজন্! পূর্বে ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট ধান্যাদি ও ওষধিসকল অসৎ ও অসংযতচিত্ত ব্যক্তিগণকে ভোগ করতে দেখলাম। প্রায় সকল লোকই চোর হয়ে উঠল। রাজগণ কর্তৃক অপালিতা ও অনাদৃতা হয়ে আমি ভবিষ্যতের জন্য ওষধিসকল গ্রাস ক'রে রেখেছি।"[১৩]

ওষধিসকল উদ্ধারের উপায়ও বলে দিলেন ধরিত্রীদেবী। ধরণী কামধেনুস্বরূপা। সকলেই স্ব স্ব অভীষ্ট বস্তু বসুমতীর বক্ষ হতেই লাভ করতে পারে। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত উদ্যোক্তা, উদ্যোগ ও পরিশ্রম। দুগ্ধ পেতে গেলে গাভীকে দোহন করা প্রয়োজন, কিন্তু সেজন্য আবশ্যক দোহন-কর্তা, বৎস এবং দোহন-পাত্র। পৃথু প্রজাগণের নিমিত্ত অন্নলাভাকাঙ্ক্ষী। তাই ধরিত্রীদেবী তাঁকে বললেন: হে মহাবাহো! ভূতপালক! যদি আপনি প্রাণিগণের ঈপ্সিত বলপ্রদ অন্ন উদ্ধার করতে ইচ্ছা করেন তবে যাতে আমি বৎসলা হয়ে দুগ্ধরূপকাম্য ওষধিসকল প্রদান করতে পারি সেজন্য অনুরূপ বৎস, দোহন-পাত্র ও দোহন-কর্তা স্থির করুন। হে রাজন্! বর্ষাকাল অতীত হলেও যেন বৃষ্টির জল সর্বত্র আমাতে বর্তমান থাকে, সেইভাবে আমাকে সমতল করুন।"[১৪]

পৃথু ধরণীদেবীর বাক্য গ্রহণ করলেন। তিনি ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পর্বতশৃঙ্গসকল চূর্ণ ক'রে

১২ ভাগবত, ৪।১৭।১০-১১ ১৩ ভাগবত, ৪।১৮।৬-৭ ১৪ ভাগবত, ৪।১৮।৯-১১

প্রায় সমতল করলেন অর্থাৎ নদনদীর প্রবাহের জন্য কিছু উঁচুনীচু রাখলেন—সম্পূর্ণ সমতল করলেন না।

এরপর দোহন-ক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। অন্ন-লাভাকাঙ্ক্ষী পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা ক'রে স্বীয় হস্তরূপ দোহন-পাত্রে সকল ওষধি দোহন করলেন অর্থাৎ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করলেন।

অন্নচিন্তা দূরীভূত হলে, অনুকূল পরিবেশে সমাজের সকল স্তরেই নানা বিদ্যার বিকাশ, চর্চা ও বিস্তার দেখা দেয় এবং ঐসকল বিদ্যার উন্নতিসাধনে তৎপর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। অধ্যাত্ম বিদ্যা ও বহু লৌকিক বিদ্যার উন্নতি উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে আরম্ভ হ'ল। পৃথু কর্তৃক বশীভূতা, সর্বকামপ্রদায়িনী পৃথিবীকে সকলেই ইচ্ছামত দোহন ক'রে অভিলষিত বস্তু লাভ করতে লাগলেন।

শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা ক'রে গো-রূপা পৃথিবী হ'তে ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন। বৃহস্পতি বেদের প্রথম অধিকারী, সেজন্য তিনি বৎসস্বরূপ এবং বাক্ মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়াদির দ্বারা বেদবিদ্যা গৃহীত হয়, সুতরাং সেগুলি পাত্রস্থানীয়।

দেবগণ ইন্দ্রকে বৎস কল্পনা ক'রে অমৃত এবং বলবীর্য ও ওজঃ অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক ও ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ করলেন।

অনুরূপভাবে দৈত্যগণ ও দানবগণ প্রহ্লাদের সাহায্যে নানাবিধ সুরা এবং পিতৃগণ আর্যমার নেতৃত্বে কব্যরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন।

বিশ্বাবসুর সাহায্যে অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি, কপিলের সহায়তায় সিদ্ধগণ অণিমাদি সিদ্ধি এবং বিদ্যাধরগণ শূন্য-পথে গমন প্রভৃতি বিদ্যালাভ করলেন। মায়াবিগণ ময়দানবের সহায়তায় নানারূপ মায়াবিদ্যা এবং মাংসভোজী যক্ষ, রক্ষ, ভূত ও পিশাচগণ রুদ্রদেবকে বৎস কল্পনা ক'রে রুধিররূপ মদ্য দোহন করলেন।

বহুবিধ সর্প ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গগণ তক্ষকের সহায়তায় মুখছিদ্ররূপ পাত্রে বিষরূপ দুগ্ধ ও পশুগণ রুদ্রদেবের বাহন বৃষকে বৎস কল্পনা ক'রে অরণ্যপাত্রে তৃণরূপ দুগ্ধ; মাংসাশী প্রাণিগণ সিংহের সহায়তায় নিজদেহরূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ; পক্ষিগণ গরুড়কে বৎস ক'রে কীট পতঙ্গ ও ফলাদিরূপ দুগ্ধ; বৃক্ষগণ বটবৃক্ষকে বৎস ক'রে রসরূপ দুগ্ধ; পর্বতগণ হিমালয়কে বৎস কল্পনা ক'রে সানুদেশরূপ পাত্রে নানাবিধ ধাতুরূপ দুগ্ধ দোহন করল।

এইভাবে সকলেই নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে বৎস কল্পনা ক'রে যথোচিত পাত্রে পৃথু কর্তৃক বশীভূতা পৃথিবী হতে ঈপ্সিত বস্তুসকল দোহন করলেন।

অন্নবস্ত্রের সমস্যার পর আসে বাসস্থানের সমস্যা। পৃথু সে সমস্যারও সমাধান করলেন।

অনন্তর প্রজাগণের জীবিকাসংস্থানকারী পৃথু স্থানে স্থানে যথাযোগ্য বাসস্থানের পরিকল্পনা করলেন। গ্রাম অর্থাৎ হাটবাজারশূন্য লোক-বসতি, পুর অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাযুক্ত লোকবসতি, নগর, নানা প্রকার দুর্গ, ঘোষপল্লী, গাভীদের বাসস্থান, সেনানিবাস, খনি-অঞ্চল, কৃষকপল্লী (খেট) এবং পার্বত্য অঞ্চলে গ্রামসকল (খবট) স্থাপন করলেন। পৃথুর পূর্বে পৃথিবীতে পুরগ্রামাদি ছিল না। এখন প্রজাগণ ঐ সকল স্থানে নির্ভয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

পৃথুর অভিষেককালে স্তুতিপাঠকগণ এই ব'লে স্তুতিপাঠ করেছিলেন:

রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ।
অথামুমাহু রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ॥
(ভাগবত, ৪।১৬।১৫)

—ইনি প্রজাগণের মনোরঞ্জক কার্যসকল অনুষ্ঠানের দ্বারা তাদের তুষ্ট করবেন, এজন্য ইনি প্রজাগণ কর্তৃক 'রাজা' বলে অভিহিত হবেন।

পৃথু সে বাক্য সফল করেছিলেন। তাই তিনি প্রথম রাজা—আদিরাজ পৃথু।

দেবীস্তোত্রম্

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য*

জটাকলাপ-মণ্ডিতা সিতেন্দু-শেখরান্বিতা
প্রতপ্ত-কাঞ্চন-প্রভা প্রভাবতোঽতিমানিতা।
অমন্দ-সুন্দরাধরা ধরা-ধরেন্দ্র-নন্দিনী
ত্বমেহি মাতরম্বিকে! বিধাতুমুত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
লসজ্জবা-পদাম্বুজাঽম্বুজাত-হার-ধারিণী
প্রভিন্ন-মাহিষাসুরা সুরার্তি-নাশকারিণী।
মহোজ্জ্বলারুণাম্বরা বরাভয়-প্রদায়িনী
ত্বমেহি মাতরম্বিকে! বিধাতুমুত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
ত্রিনেত্র-সুন্দরাননাঽধরীকৃতাব্জ-চন্দ্রমাঃ
বিলজ্জিতাহি-মণ্ডলাঽসিত-প্রলম্বি-কুন্তলা।
নবীন-যৌবনোল্লসত্তনু-প্রভাতি-ভাস্বরা
ত্বমেহি মাতরম্বিকে! বিধাতুমুত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥
মৃণাল-কোমলৈর্ভুজৈ ধৃতায়ুধৈ র্বলান্বিতা
প্রমত্ত-দানবাপহা মহারণে শুচি-স্মিতা।
অরাতি-নাশনোৎসুক-প্রচণ্ড-সিংহ-বাহিনী
ত্বমেহি মাতরম্বিকে! বিধাতুমুত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥
অখর্ব-গর্ব-দর্পিতাঽর্পিতামরেন্দ্র-বন্দনা
ত্রিভঙ্গ-ভাব-সংশ্রিতা সদর্প-দৈত্য-মর্দিনী।
কৃপা-মনস্তমো-হরা হরান্তর-প্রমোদিনী
ত্বমেহি মাতরম্বিকে! বিধাতুমুত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥
জয়ন্তি মঙ্গলে শিবে শিবেতর-প্রহারিণি!
মহেশি চণ্ডিকে সদা সদান্তরৈক-চারিণি!
সরোজ-রাজি-পূজিতেঽজিতে জিতেন্দ্রিয়াশ্রয়ে
ত্বমেহি মাতরম্বিকে! বিধাতুমুত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥
যৎপাদ-পঙ্কজ-রজোঽমর-বৃন্দবন্দ্যং
যদ্‌যোগতঃ পর-শিবঃ পরমেশ্বরোঽভূৎ।
যা সৃষ্টি-পালন-লয়ং কুরুতে ত্রিমূর্ত্যা
আয়াতু সা ভগবতী জগদেকমাতা ॥ ৭ ॥

---

* সপ্ততীর্থ। অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বেদনায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুখের ঢেউ বিলাসে যখন দিনের পরে দিন চলি নাথ ভেসে,
যাই ভুলে—ঢেউ তোলো তুমিই প্রতি সুখের, প্রেমল কৃপানিধি।
যেমনি পরে দুঃখ আসে শুধাই : "চলি কোন্ সে-নিরুদ্দেশে?
যন্ত্রণাতে চাও দিতে নাথ তোমার এ কোন্ নিঠুর পরিচিতি?"

"আঁধার বিনা আলোর বিকাশ হয় না" কবি গায় তো যুগে যুগে,
দুঃখ বিনা কেবল সুখের পাখায় ওড়া যায় না নীলাকাশে,
বিরহেরই অশ্রুজলে বান ডাকে মিলনের বুকে বুকে,
বাধা বিনা যায় না জানা কে বন্ধু কে কেমন ভালোবাসে।

বুঝি সবই, তবুও হায় দুর্বল প্রাণ হয় আমাদের অধীর।
তাই অনুযোগ করে সে—যেই সুখের পরে পায় ব্যথা বেদনা।
করতে সবল চাও তুমি, তাই দাও আমাদের শোক দুঃখ গভীর,
যাই ভুলে তোমাকে, তবু ঝরাও তুমি ফের বাঁশিমূর্ছনা।

এইটুকু নিবেদন জানাই—যে-বিধানই দাও তুমি জীবনে,
যেন ধরি' শিরে পারি বলতে : "শরণ চাই রাঙা চরণে!"

পাকা আমি

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

পুড়ে গেলে রশি তবুও তাহার
আকারটি ঠিক রয়,
তবু সে তো হায়, ছাই ছাড়া আর
অন্য কিছুই নয়।
পুড়িয়া পুড়িয়া কাঁচা আমি যবে
হয়ে যায় নিঃশেষ,
রহে না রহে না সে পোড়া আমিতে
অহংকারের লেশ।
পাকা আমি যেন পরশ পাথর
ছোঁয়ানো স্বর্ণ অসি
চির উজ্জ্বল নীল নভোতলে
কলঙ্কহীন শশী।

আবাহন ও বিসর্জন

শিবদাস

নিজের স্বরূপ হইতে মায়েরে
প্রতিমায় আনয়ন—
তা-ই মা'র আবাহন।

বাহির হইতে হৃদি-সরসীতে
জননীরে যবে আনি
সেদিন বিজয়া, জানি।

'মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি'

শ্রীশিবশম্ভু সরকার *

সিন্ধু উতাল মানস বিশাল আবেশেতে ঢেউ উঠে
কি চাহিতে হায় কি যে এসে যায় দিশি দিশি আলো ফোটে—
কোথায় বাসনা নাচে শবাসনা জাগে অভীঃ বরাভয়
মৃত্যু অসিতে অট্ট হাসিতে ডিমি ডিমি তাল কয়!
কে কহে দেবতা কে বলে দানব এলোমেলো একাকার—
সকল দ্বন্দ্ব সকল ধন্ধ সবাকার পারাপার!
নাচিছে মহেশ নাচিছে প্রমথ নাচেরে ভূমণ্ডল—
আকাশে বাতাসে একি কুতূহল সৌরভে টলমল!
কোথায় ভাগ্য কোথা অভাগ্য—উল্লাসে তোলপাড়—
চির অভীষ্ট দৃষ্ট ইষ্ট—বাঁধভাঙা মল্লার!
অনাদি এসেছে অনন্ত ওই ছোঁয়া যায়- ধরা যায়—
অপ্রমত্তে প্রমত্ত ও-যে—হোমাপাখী গান গায়!
কভু মত্ত কয় উলসে অভয় করে কি চংক্রমণ—
অসীম অপারে ভেসেছে সাঁতারে ডমরুতে-সাধা-মন!
রাতচলা সারা দিন দিশাহারা খোঁজাখুঁজি অবসান—
আত্ম-মগন বিহগিত মন মহাকাশে পাতে কান!

*　　　*　　　*

সহসা অসাড় নাই নাই সাড় স্পন্দন নিভে যায়—
নিখিল ভুবন নিপাঠ স্বপন ছুটে ভেসে গেল হায়!
চোখের কিনারে সুরধুনী ঝরে জীব-বোধ অবখীণ
নিশাস বিদায় প্রাণ পরিচয় দেহমাঝে দেহলীন!
ডুবে গেছে তার ইহ সংসার আঁখি হাসে পরমেতে
ঐশী আভাসে ঝিলিমিলি আসে সীমা আর সুদূরেতে!
মানস গহনে রুকুম বিজনে হেরে বঁধু পরকাশ
কখনো মধুর কখনো বিধুর বিহসিত মহাকাশ!
স্তব্ধ জীবন স্তব্ধ চরণ স্তব্ধ নয়নলোর
সীমার দুয়ারে অসীম বিহারে বিভাসিত হোল ভোর!

---

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ), কলিকাতা।

ছায়া-আলো

বকলম

কখনো সেটা তোমার সঙ্গ ছাড়ে না,
যেন ও তোমার চিরকালের কেনা
গোলাম। যেন একটা পোষা দানো,
তোমার দেহরক্ষী! অথচ, মজাটা জানো,
তুমি আর ও অভিন্ন। এক দুইয়ে মিলে;
জল যেমন একই—সাগরে আর বিলে।

তোমার সঙ্গে যেতে যেতে কত ধুলো-ময়লায়,
বালি-কাঁটায় ও পড়ে। কিন্তু ওর গায়ে
কোন আবর্জনা ছোঁয় না। একটি আঁচড়ও
ওর লাগে না। তুমি যতই খানা-খন্দে পড়ো,
দ্যাখো, ও থাকে নিয়ত অমলিন অনাহত।
তুমি কিন্তু আসলে ঠিক ওরই মতো।

ও তো তোমারই ছায়া, তুমিই ওকে
চালাও। তেমনি তুমিও ছায়া। নেশার ঝোঁকে
তুমি কার ছায়া, কে তোমাকে চালায়—তুমি বেবাক ভুলে
থাক। তোমার যত যন্ত্রণা, তার মূলে
এই ছায়াকে কায়া ভাবা, যন্ত্রী ভাবা যন্ত্রকেই।

জেনো, আছেন সেই তিনি, এই তুমি নেই।
তুমি আলোর দিকে এগোলে ছায়াটা পেছনে থাকে;
আর বিপরীত দিকে পথটা ছায়ার তিমিরে ঢাকে।
শেষটায় ছায়াবাজির মায়ারাজি ছেড়ে, যেতে
হয় সেদিকেই যেখানে আছেন কোল পেতে
তোমার প্রকৃত আশ্রয়, জ্যোতির্ময়। আলোর ছেলে
তুমি, কেন পথ হারাবে আলোটাকে পেছনে ফেলে?

আকুলতা

শ্রীমতী অমিয়া দেবী

আমার মনের মন্দির-মাঝে
তুমি জেগে আছো প্রভু
তুমি ডেকে যাও কত লীলাছলে
আমি তো জাগিনি তবু।

খুঁজেছি তোমায় কত না তীর্থে
কত মন্দির-মাঝে।
কেন যে শুনিনি হৃদয়ে আমার
তোমার নূপুর বাজে।

পথে পথে খুঁজি আমি পথহারা—
জীবনের তুমি জানি ধ্রুবতারা
আমার গানের বাণীতে তোমার
সুরের পরশ লাগে—
হৃদয়ের ঘন-তমসার মাঝে
তোমার দু'আঁখি জাগে।

তোমাকে দেখি না তবু আছো সাথে
জানি না কখন কোন শুভ প্রাতে
শুনিব তোমার নূপুরের ধ্বনি
শুনিব তোমার ডাক।
হৃদয়ে আমার তোমাকে পাবার
আকুলতা জেগে থাক।

মিথ্যা মায়া

শ্রীমতী হেমবরণী মুখোপাধ্যায়

কেমন করে ডাকবো তোমায়
তাও জানি না,
হৃদয়-মাঝে আকুল করা
শুধুই বেদনা।

আপন হাতে গ'ড়ে নিয়ে
নিঠুর হাতে দাও গুঁড়িয়ে,
তোমার খেলা তোমার খুশি
সইতে পা র না।

মায়ার জালে রেখে ঢেকে
আঘাত হানো ফাঁকে ফাঁকে,
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাতে
জাগাও চেতনা—
তখনই হয় মিথ্যা মায়া,
ধন্য বেদনা।

আমার দুঃখ

শ্রীসুসময় রায় চৌধুরী

আমার দুঃখ আমারি থাকুক
আমিই তাহা বইব,
গোপন করে রাখব তবু
তোমায় নাহি কইব।
দুঃখের কথা বললে তোমায়
আসবে তুমি বইতে,
আমার ব্যথা করতে গ্রহণ
পারব না তা সইতে।
তোমার দুঃখ বইব প্রিয়
তোমার দুঃখ সইব,
তোমায় সুখী দেখলে আমি
সদাই সুখে রইব।

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপন-দাতা, শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি।

সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই।

—সম্পাদক

সমালোচনা

তব কথামৃতম্‌ : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রকাশক : স্বামী তন্ময়ানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা ৭০০০২৯। (১৯৭৬), পৃঃ ৯২, মূল্য ১'২৫ টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানির প্রকাশক তাঁহার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, "রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে প্রতি বুধবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ" এবং "তাঁহার আলোচনা এবং ব্যাখ্যা অনুসরণ করে মোট পাঁচ দিনের বিষয়বস্তু এখানে সন্নিবেশিত হল। 'তব কথামৃতম্‌' যদি ভক্তজনের কাছে আদরণীয় হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দিনের আলোচনা প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।"

পাঁচ দিনের আলোচনার পাঁচটি শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে : 'মন মুখ এক করতে হয়', 'নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা', 'সমাধি : তদাকারপ্রাপ্তি', 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নতুন সভ্যতা' এবং 'জগৎ মিথ্যা'। মোটামুটিভাবে পুস্তিকাটি সুখপাঠ্য এবং তত্ত্বকথাগুলি প্রাঞ্জল করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ভাষা সহজ, সরল এবং সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষক। এই দিক হইতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের অধিকারী।

তবে বক্তৃতা ও তাহার গ্রন্থরূপ এক জিনিস নহে। বক্তৃতাদানকালে অনেক কথাই ভাবাবেগে বাহির হইয়া আসে। সেই বক্তৃতা যখন পুস্তক বা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া শাশ্বত কালের সম্পত্তি হইয়া উঠিবে, তখন তাহার সুষ্ঠু পরিমার্জনা করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন পাদটীকায় বক্তব্য বিষয়গুলির আকর-নির্দেশ করা। এই পুস্তিকায় তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। লোকেশ্বরানন্দজী বক্তৃতাকালে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকল হুবহু মুদ্রিত করিয়া প্রকাশক এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি না। যথোচিত সম্পাদনার অভাবে পুস্তিকাটিতে অজস্র ভিত্তিহীন কথা ও বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সবগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নহে। নীচে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মাত্র উল্লেখিত হইল :

১। পৃঃ ১১ : "স্বামীজীর আর একটি সাংঘাতিক উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, ভারতের অধঃপতন ঘটল যখন বুদ্ধদেব সকলকে জোর করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন। ...স্বামীজী তাই পরে বলেছেন : কেউ যদি তোমাকে এক চড় মারে, তাকে তুমি

অন্তত পাঁচ চড় ফিরিয়ে দেবে।"—বাণী ও রচনার .ম সং, ৬।১৫৩ পৃঃ আছে, 'শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্ত, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।' আলোচ্য পুস্তিকা অনুসারে স্বামীজী ইহা পরে বলিয়াছেন, আগে বলিয়াছেন বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত কথা। কিন্তু ঐ পৃষ্ঠায় আগে বৌদ্ধদেরই কথা আছে কয়েকবার, বুদ্ধদেবের কথা নাই। ১৫২ পৃষ্ঠায় গয়াসুরের কথার উল্লেখ থাকিলেও পাদ-টীকায় স্বামীজীর মত-পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। কয়েক পৃষ্ঠা পরে (১৫৭ পৃঃ) অবশ্য আছে 'বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ', কিন্তু তাহার পরই ঐ ১৫৭ পৃষ্ঠাতেই পুনরায় বৌদ্ধদের কথাই কয়েকবার আছে। সুতরাং 'বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ'—এই বাক্যটিও উপক্রম ও উপসংহার অনুসারেই ব্যাখ্যেয়, নতুবা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে। বুদ্ধদেবকে স্বামীজী কি শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, তাহা বাণী ও রচনার বহুস্থলেই লিপিবদ্ধ আছে।

২। পৃঃ ১৬-১৭: "তারা বলাবলি করছে লোকটি কে?··· চুরি করে।"—প্রামাণিক জীবনীগুলিতে এ সকল কথা নাই। "স্বামীজী মুখ খুললেন: দেখুন, রাস্তা দিয়ে যখন যাই, আহাম্মকরা কত কী বলে, অনেক সময় কুকুরও ঘেউ ঘেউ করে, তা বলে কি আমিও ওদের মতো কিছু বলব, বা ঘেউ-ঘেউ করব?"--স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত যুগনায়ক বিবেকানন্দে 'দেখুন বন্ধুগণ, আহাম্মকদের সংস্পর্শে আসা তো আমার জীবনে এই নতুন নয়।'—মাত্র এই কথাগুলি আছে। ইংরেজী জীবনীতেও ঐ একই কথা আছে ইংরেজীতে।

৩। পৃঃ ১৭: "ভারতবর্ষের নিন্দা করছিল সমানে।", "স্বামীজী···বললেন: দেখ, আমার দেশ সম্বন্ধে···।"—প্রকৃত তথ্য এই যে মিশনরী-দ্বয় হিন্দু ও হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতেছিল। তাই স্বামীজী বলেন, 'আমার ধর্ম সম্বন্ধে' ইত্যাদি।

৪। পৃঃ ২০: "মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বললেন··"—মূল গ্রন্থে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "কি রে, তোর দিকে কেন তাকাতে পারছিনে—কিছু কুকাজ করেছিস?" "শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন: না, তা-ও বলবি না···করবে না।"—অনাবশ্যক সংযোজনা। মূল গ্রন্থে নাই। তাছাড়া 'তোর দিকে কেন তাকাতে পারছিনে'—ইহার পর আর কিছু বলিবার থাকে কি?

৫। পৃঃ ২৮: "রাত নটায়"—ভিত্তিহীন কথা। "অপরিচিতা মেয়ে" সম্পর্কে মন্তব্য করিতে হইলে বহু কথা লিখিতে হয়—তাহার স্থানাভাব। "স্বামীজীকে দেখে ওরা বলছে" —কথাটি ভুল। দুইজনে দুইরকম কথা বলিয়া-ছিলেন। তাছাড়া "যেমন একদিন সবাই আসত যীশুখ্রীষ্টের কাছে, তেমনই আজ আমরা এসেছি আপনার কাছে।"—উক্তিটিও যথাযথ নহে। সঠিক উক্তিটি হইল: "যীশুখ্রীষ্ট যদি মর্তধামে এখনও থাকতেন, তাহলে তাঁর কাছে যেমন করে আসা উচিত এবং উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তেমনি ভাবে আপনার কাছে এসেছি।"

৬। পৃঃ ৩৩: "যে-বাড়িতে তিনি আছেন, সেখানে বসে কাঁদছেন: এ কী হল? ···মা, আমাকে তুমি আমার পুরনো জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এসব আমি চাই না"—প্রামাণিক জীবনীতে এসকল কথা নাই। কোথায় কাঁদিয়াছিলেন, তাহাও নাই। আছে, "যেদিন প্রথম তিনি সংবাদপত্রের স্তম্ভে আপনার অজস্র প্রশংসা ও খ্যাতির বিবরণ পাঠ করিলেন,

সেদিন তিনি 'আজ হইতে আমি নির্জনচারী সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা হারাইলাম' ভাবিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন।"

৭। পৃঃ ৩৩: "স্বামীজী…বললেন: কী বলছ তোমরা? এক মুঠো ধুলো নিয়ে যিনি শত শত বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারতেন, 'জয়' দাও তাঁর। বল: জয় রামকৃষ্ণদেবের জয়!"—সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। শিয়ালদহ স্টেশনে প্রথমেই রামকৃষ্ণদেবের এবং পরে স্বামীজীর জয়ধ্বনি উঠিতেছিল। সুতরাং স্বামীজী ঐ সকল কথা ঐ স্থানে এবং ঐ সময়ে বলিতেই পারেন না।

৮। পৃঃ ৪৩-৪৪: "ঈশ্বরপ্রেম কয়েক রকমের।" বলিয়া তিন রকমের প্রেমের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু যে কথামৃত ব্যাখ্যা করা হইতেছে, তাহাতেই চার রকমের প্রেমের কথা আছে। তাছাড়া একাঙ্গী প্রেমের উদাহরণ-স্বরূপ 'ভক্তমাল' হইতে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং সেই উদ্ধৃতির "অর্থাৎ" বলিয়া যে-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, উভয়ই অসমীচীন মনে হয়। বেশী লেখা সম্ভব নহে; পাঠকবর্গ 'ভক্তমাল' হইতে ঐ পয়ারের আগে-পরে পড়িলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

৯। পৃঃ ৫০-৫১: "আমাদের মন রবারের মতো। অধিকাংশ সময় সে থাকে টান টান অবস্থায়, অর্থাৎ সেখানে টেনশন থাকে।"—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। "সুষুপ্তির সঙ্গে সমাধির অবস্থায় তুলনা করা যায়।"—বাক্যটি সর্বাংশে সত্য নহে; সুষুপ্তিতে অজ্ঞান থাকে, নির্বিকল্প সমাধিতে অজ্ঞান থাকে না। "গীতায় সমাধিকে বলা হয়েছে 'ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'"—পাদটীকায় গীতার ২।৭২ শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ শ্লোকটির অর্থ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, 'ব্রাহ্মী স্থিতি'র অর্থ জ্ঞাননিষ্ঠা, সমাধি নহে। সমাধি-অবস্থায় কেহ যাবজ্জীবন থাকিতে পারে না। ঐ শ্লোকের পূর্ববর্তী 'আপূর্যমাণম্'(২।৭০), 'বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্' (২।৬৪) শ্লোক দুইটি হইতেও বিষয়টি স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

১০। পৃঃ ৫৪-৫৫: 'রেজারেকশন' প্রসঙ্গটি মূল বিষয়ের সহিত অসংলগ্ন। অবশ্য প্রায় এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিকতা পুস্তিকাটির বহু স্থলেই আছে। "মৃত্যুর পর তাঁর দেহ হঠাৎ অদৃশ্য হল। তাঁর দেহ কবর…মৃতদেহটি নেই। এই রেজারেকশন সম্পর্কে…"—এইরূপ লেখার রেজারেকশন সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। তাছাড়া তথ্যেরও ভুল আছে—"মেরি আর মারথা দুই বোন" রেজারেকশনের সময়ে ছিলেন না। মারথার নাম একেবারেই নাই। দুইজন মেরী ছিলেন—একজন মেরী ম্যাগডালীন, অপর জন জেমসের মাতা মেরী।

১১। পৃঃ ৬৩: শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত গল্পটি সঠিক উল্লেখিত হয় নাই। গুরু নহে—বিভীষণ। কাগজ নহে—পাতা। আরও খুঁটিনাটিতে পার্থক্য কথামৃতে দ্রষ্টব্য।

১২। পৃঃ ৭৬-৭৮: "পঁচাশি মাইল দূরে"—ইংরেজী জীবনীতে আছে, পঞ্চাশ মাইল দূরে। "আলপস পাহাড়ে খ্রীষ্টানদের একটি মঠ দেখে"—ভিত্তিহীন কথা। অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের পান্থশালাটিতে স্বামীজী গিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন উল্লেখ জীবনীতে নাই। হিমালয়ে মঠ স্থাপনের ইচ্ছা সুইজারল্যাণ্ডে যাইবার পূর্বেই স্বামীজীর মনে উদিত হয়। "প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে"—ইংরেজী জীবনীতে আছে, ৬,৩০০ ফুট; যুগ-নায়ক বিবেকানন্দে আছে, "প্রায় ৬,৫০০ ফুট"। যতদূর জানা যায় নিম্নতম স্থানটির উচ্চতা ৬,৩০০ ফুট এবং উচ্চতম স্থানটির উচ্চতা ৬,৮০০ ফুট।

সুতরাং গড়ে প্রায় ৬,৫০০ ফুটই হয়। "একজন সাধু একটি ঠাকুরঘর করেন, সেখানে ঠাকুরের একটি ছবি রাখেন। একটু আধটু ফুলও তিনি সেখানে দেন।" —যুগনায়ক বিবেকানন্দে আছে, "আশ্রমবাসী কেহ কেহ একখানি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপচারে সাধাসিধাভাবে পূজা শুরু করিয়া দিলেন।" "স্বামীজী অসন্তুষ্ট হলেন; বললেন: এই ছবি এখানে রাখা চলবে না, সরাতে হবে। স্বামীজীর আদেশ; অতএব ছবি অবিলম্বে সরানো হল"—যুগনায়ক বিবেকানন্দে আছে, "স্বশিষ্য যেসব যুবক ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে প্রত্যক্ষতঃ আঘাত দিবার ভয়ে তিনি (স্বামীজী) ঠাকুর ঘর তুলিয়া দিবার আদেশ করিলেন না।··· শুধু আশ্রমের ব্যবস্থাদির জন্য দায়ী শ্রীযুক্তা সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দকে তিরস্কার করিলেন।" "যিনি ছবিটি স্থাপন করেছিলেন, তাঁর মনে খুব দুঃখ হল। শ্রীশ্রীমাকে সব কথা জানিয়ে তিনি লিখলেন: স্বামীজীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ঠাকুরের ছবি সরিয়েছি, কিন্তু মনে বড় দুঃখ পেয়েছি। এখন, এবিষয়ে আপনি কী বলেন জানতে চাই।"—চিঠি লিখিয়াছিলেন স্বামী বিমলানন্দ, কিন্তু তিনিই যে ছবি স্থাপন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। বিমলানন্দজী চিঠিতে ঠিক কি লিখিয়াছিলেন, তাহাও অজ্ঞাত। ছবির কথা আদৌ লিখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঘটনাটি ঘটে ৩রা জানুআরি (১৯০১ খৃঃ) ও ১৭ই জানুআরি, এই পক্ষকালের মধ্যে, যখন স্বামীজী মায়াবতীতে ছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগ ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খৃঃ। বিমলানন্দজী ঠিক কোন্ তারিখে শ্রীশ্রীমাকে পত্র লেখেন, তাহা অজ্ঞাত। তবে মায়ের চিঠির তারিখ ৩১শে অগস্ট ১৯০২ এবং চিঠিতে স্বামীজীর দেহত্যাগের জন্য মনোবেদনা ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় বিমলানন্দজী স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঘটনার দেড় বৎসর পরে মাকে পত্র লেখেন এবং তাঁহার মনে দ্বৈত ও অদ্বৈতের যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সেই বিষয়েই লেখেন। মায়ের চিঠি হইতেও ইহা বুঝা যায়। "চিঠির উত্তরে শ্রীশ্রীমা জানালেন: নরেন যা করেছে, ঠিকই করেছে।"—শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিতে এই কথাগুলি নাই। চিঠিখানির প্রতিচ্ছবি পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে (উদ্বোধন, ৭৪।৫০৪—শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত 'একটি ঐতিহাসিক পত্র'-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

১৩। পৃঃ ৮১: "আমি সেই আত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।"—'ঈশ্বর' শব্দটির প্রয়োগ বিভ্রান্তিকর। জ্ঞানী নিজেকে ঈশ্বর মনে করেন না। জীব ব্রহ্ম, কিন্তু ঈশ্বর নহে।

১৪। পৃঃ ৮২: "জগৎসংসারের মিথ্যাত্ব বোঝানোর জন্য বেদান্তবাদীরা এই রকম নানা উদাহরণ দিয়ে থাকেন।"—উদাহরণগুলি যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল: (১) স্বপ্নদর্শন (২) মরীচিকা (৩) 'রজতশুক্তিবৎ' (৪) 'রজ্জু-সর্পবৎ' (৫) 'শশশৃঙ্গবৎ' (৬) 'বন্ধ্যাপুত্রবৎ'। বেদান্তবাদী বলিতে এখানে অদ্বৈতবেদান্তবাদিগণই গ্রহণীয়, কারণ দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বেদান্তিগণ জগৎকে মিথ্যা বলেন না কিন্তু কোন অদ্বৈতবাদীই জগতের মিথ্যাত্ব বুঝাইতে শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্রের দৃষ্টান্ত দেন না। শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ইত্যাদি অলীকত্বের উদাহরণ, মিথ্যাত্বের নহে। জগৎ মিথ্যা, অর্থাৎ অনির্বচনীয়, কিন্তু অলীক নহে। জগতের জন্ম মায়াতেই। কিন্তু 'বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বতো মায়য়া বাপি জায়তে।'

সমগ্র পুস্তিকাটিতে অনেক নূতন কথা,

আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে, যেগুলির আকর-নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে ঐ সকল উক্তির প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইজাতীয় কয়েকটি উক্তি নীচে দেওয়া হইল :

১। পৃঃ ৩০ : "যখন পেট কামড়ায় তখন গম্ভীর হই।"

২। পৃঃ ৪৯ : "ঠাকুর বলেছেন : কেউ কেউ যখন ধ্যান করে, তখন তাদের মুখ দেখলে মনে হয়, যেন ওদের ভিতরে একটা সংঘর্ষ চলেছে।"

৩। পৃঃ ৫০ : "শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন : শ্রীশ্রীঠাকুর দেব-লোক আর মর্ত্যলোকের মধ্যে একটা সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছেন।"

৪। পৃঃ ৬৬ : "আজও আমরা পাশ্চাত্যের সারটিফিকেটকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে থাকি। স্বামীজী দুঃখ করে বলেছিলেন : বিদেশে গেলাম কেন? এদেশে কেউ তো আমার কথা শোনেনি!"

৫। পৃঃ ৭০-৭১ : "স্বামীজী একবার তাঁর পাশ্চাত্যবাসী কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছেন।...দেখতে পাচ্ছ না!"

৬। পৃঃ ৭২ : "পাশ্চাত্যবাসীদের সম্বোধন করে স্বামীজী বলেছিলেন : তোমরা একটা আগ্নেয়গিরির মুখের উপর দাঁড়িয়ে আছ ; যে-কোনও মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যেতে পার।"

৭। পৃঃ ৭৭ : "স্বামীজী বলেন : এ তো হিমালয় ; চারিদিকে কী সুন্দর সব মূর্তি! এখানে আলাদা মূর্তির আর প্রয়োজন নেই।"

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সমালোচকের বক্তব্য বুঝিতে হইলে যদি সমালোচিত পুস্তকটি পদে পদে দেখিতে হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্যই সমালোচনার একটি ত্রুটি। আবার সমালোচনার শুধু কাঠামোটুকুই যদি খাড়া করা হয়—সমালোচনা যদি সাহিত্যরসসমৃদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা সমালোচনার আরেকটি ত্রুটি। আমি এই উভয় ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু সমালোচনার শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় আমার উপায়ান্তর ছিল না।

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সেণ্ট লুইস (মিসৌরি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) বেদান্ত সোসাইটির ১৯৭৪-৭৫ সালের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী নিম্নরূপ :

সোসাইটির মন্দিরে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ প্রতি রবিবার প্রাতে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধ্যান-পরিচালনা এবং নারদভক্তিসূত্র পাঠ ও আলোচনা করেন। অক্টোবরে উক্ত গ্রন্থ শেষ হইলে উদ্ধবগীতা আরম্ভ করা হয়। আলোচনার পর স্বামীজী জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দেন। যে কেহ এই সকল আলোচনা-সভায় আসিতে পারেন ; বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ব্যতীত খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন শাখাবলম্বী বহু গুণী ব্যক্তিরও সমাবেশ হয়।

গ্রীষ্মাবকাশে পাঠ ও আলোচনা বন্ধ থাকিলেও স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের টেপ-রেকর্ডেড ব্যাখ্যানসমূহ প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার নির্দিষ্ট

সময়ে সোসাইটির সদস্যগণ শ্রবণ করেন। অসুস্থতাহেতু স্বামীজী অনুপস্থিত থাকিলেও এই নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। কানসাস শহরে অবস্থিত শাখাকেন্দ্রটিতেও সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভা এই সকল টেপ রেকর্ডের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ শঙ্কর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের জন্মোৎসবে এবং গুড ফ্রাইডে দুর্গাপূজা খৃষ্টমাস প্রভৃতি উৎসবে মন্দিরে বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ও প্রসাদ-বিতরণ করা হয়।

৫ই জুলাই (১৯৭৪), বম্বে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শিকাগো হইতে আসেন ও ৭ই জুলাই সোসাইটির মন্দিরে 'একাগ্রতা ও আত্ম-সংযম' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

বেলুড় মঠ কর্তৃক স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের সহকারী নিযুক্ত হইয়া স্বামী যুক্তানন্দ ২৫শে নভেম্বর পৌঁছান। তিনি মধ্যে মধ্যে রবিবার প্রাতে ও নিয়মিতভাবে রবিবার অপরাহ্ণে ধর্মীয় আলোচনা করেন এবং মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজাও করেন; বাহিরেও ভাষণ দেন।

রবিবার ও মঙ্গলবারের নিয়মিত আলোচনা-সভার অতিরিক্ত সারা বৎসর বহু সভার আয়োজন করা হয়। এই সকল সভায় সাধারণতঃ স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ তাঁহাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের সমাবেশ হয়।

আলোচ্য বর্ষে বিশেষ সাক্ষাৎকারে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ প্রায় ২০০ জন জিজ্ঞাসুর ব্যক্তিগত সমস্যা বা আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমূহের সমাধান করেন।

নিজস্ব গ্রন্থাগারের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার করিয়া সোসাইটি বহু পাঠক-পাঠিকার সেবা করিয়া থাকেন। বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থাদির জন্য একটি বিক্রয়-কেন্দ্রও সারা বৎসর খোলা রাখা হয়।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ লিখিত 'The Goal and the Way : The Vedantic Approach to Life's Problems' এবং 'Swami Vivekananda's Contribution to the Present Age' নামক দুইখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি Claude Stark & Co., Massachusetts কর্তৃক প্রকাশনের জন্য গৃহীত হয়

স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) বেদান্ত সোসাইটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্যাক্রামেন্টোর কতিপয় নরনারী বেদান্তের উদার শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত মন্দিরের উপাসনা, প্রচার প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানে যথারীতি যোগদান করিতে থাকেন এবং স্যাক্রামেন্টোতে একটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করায় স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত মন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ ১৯৪৯ সালে স্যাক্রামেন্টোতে এই শাখা-কেন্দ্রটি স্থাপন করেন। ১৯৫০ সালে সাত একর জমি ক্রয় করা হয়। ক্রমে ভক্ত-গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এবং স্বামী অশোকানন্দ ও বার্কলি শাখা-কেন্দ্রের স্বামী শান্তস্বরূপানন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় সোসাইটির মন্দির ও বিভিন্ন বিভাগের আবাসগুলির নির্মাণকার্য ও ধর্মপ্রচার যথারীতি চলিতে থাকে। দীর্ঘ তের বৎসরের প্রচেষ্টায় সোসাইটির বেশীর ভাগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। ১৯৬৪ সালে পূজা অর্চনা স্তবপাঠ ভজন বক্তৃতা প্রভৃতি কার্য-

সূচীর মাধ্যমে সোসাইটির নব-নির্মিত মন্দিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গীকৃত হয়।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৯৫৭ সালে স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির সহকারী প্রচারকরূপে যোগদান করেন এবং স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রে প্রচারকার্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এই শাখা-কেন্দ্রটির পরিচালনা ও প্রচারকার্য অধিকতর সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালে ইহা একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত ও 'বেদান্ত সোসাইটি অফ্ স্যাক্রামেন্টো' নামে রেজেস্ট্রীকৃত হয় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৯৭০ হইতে ১৯৭৪ সালের মধ্যে সোসাইটির জমিতে 'সন্তোত্মান' (Garden of Saints) 'অশোক কুটীর' ও 'মাতৃকুটীর' নির্মিত হয়।

রবিবাসরীয় উপাসনা : প্রাতে মন্দিরে পূজার্চনা, ১১টায় ধর্মসভায় অধ্যক্ষ কর্তৃক বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা, সন্ধ্যা ৬টায় ধ্যান ও ভজন।

ক্লাশ : বুধবার সন্ধ্যায় বেদান্ত, শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে আলোচনা।

সাক্ষাৎকার : বক্তৃতাদির পর অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসু শ্রোতাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলির সমাধান করেন, বেদান্ত বিষয়ে প্রশ্নোত্তর দেন এবং অত্যন্ত আগ্রহশীল জিজ্ঞাসুদের ধ্যান সম্পর্কে শিক্ষা দেন।

বিশেষ উৎসব : ইস্টার, বুদ্ধ-জন্মজয়ন্তী, খৃষ্টমাস, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, দুর্গাপূজা ও কালীপূজা—বিশেষ পূজা ধ্যান ভজন স্তবস্তুতি বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপিত হয়। সুবিধামত অন্যান্য উৎসবও প্রতিপালিত হয়। সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীও নভেম্বরের এক রবিবার প্রতি বৎসরই সম্পন্ন হয়।

আশ্রমের বাহিরে বক্তৃতা : সোসাইটি কখনো কখনো স্কুল কলেজ ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বেদান্ত, যোগ অথবা অন্যান্য ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হইলে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বয়ং অথবা অন্য কোন যোগ্য প্রতিনিধি বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ : সোসাইটির ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে বেদান্ত-দর্শন ও ধর্ম, যোগ ও অন্যান্য দর্শন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবী স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে গ্রন্থসকল আছে। পাঠাগারেও ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু পত্র-পত্রিকা আছে। বিক্রয়ের জন্যও ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী রাখা হয়।

রবিবাসরীয় স্কুল ও শিশুদের তত্ত্বাবধান : শিশুদের মধ্যে নীতি ও ধর্মবোধ জাগ্রত করার জন্য রবিবার পূর্বাহ্নে ক্লাশ নেওয়া হয়। প্রবেশের নিম্নতম বয়স ছয় বৎসর।

সংস্কৃত ক্লাশ : সমিতির যে-সকল সদস্য মূল সংস্কৃতে লিখিত বেদান্তশাস্ত্রগুলি শিখিতে আগ্রহী, শুধু তাঁহাদেরই জন্য অধ্যক্ষ সংস্কৃতে ক্লাশ পরিচালনা করেন।

বেদান্তের সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি আশ্রমাধ্যক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সোসাইটির সদস্য হইতে পারেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, **স্বামী নিষ্কামানন্দ** (দামু মহারাজ) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে 'সেরিব্রাল থ্রম্বসিস'-রোগে ৭৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৭ সালে সঙ্ঘের ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। উটকামণ্ড কোয়ম্বাতুর রেঙ্গুন সেবাশ্রম সিঙ্গাপুর ও মাদ্রাজ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত পোনামপেট মায়াবতী কলম্বো কনখল ও মাদ্রাজ মঠ কেন্দ্রের কর্মিরূপেও তিনি সংঘসেবা করেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে রাখালচন্দ্র জানা

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সিঁথিনিবাসী রাখালচন্দ্র জানা গত ২০শে শ্রাবণ (১৩৮৩ সন), ৫ই অগস্ট (১৯৭৬) ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ও সরল অনাড়ম্বর কর্মী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া রাখালবাবু সহকারী সভাপতিরূপে ঐ প্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের সহিতও তাঁহার যোগাযোগ ছিল এবং ইহার ধর্মানুষ্ঠানাদিতে তিনি নানাভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা করিতেন। মিলিটারী একাউণ্টস্ বিভাগে চাকরি করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ-নির্মুক্ত আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

পরলোকে বিমলকৃষ্ণ মিত্র

গভীর দুঃখের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ ভক্ত এবং ঈশ্বরকোটি শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর পূর্বাশ্রম সম্পর্কে খুড়তুত ভাই, স্বর্গত ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের দৌহিত্র বিমলকৃষ্ণ মিত্র গত ৩রা অক্টোবর, সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে উত্তর কলিকাতায় স্বগৃহে হৃদরোগাক্রান্ত হইয়া ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থই ছিল। পূর্বদিন (বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত মতে ৺বিজয়া দশমী) তিনি বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণমঠে (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে) শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যান। ৩রা সকালেও স্থানীয় পূজামণ্ডপে যাইয়া প্রণামাদি করিয়া গৃহে ফেরেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি অসুস্থতাবোধ করেন এবং প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন হুগলী জেলার ব্যাজরা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও আইনে ডিগ্রি লাভ করিয়া পিতা ৺পরেশনাথ মিত্রের আইন-প্রতিষ্ঠান পি. এন. মিত্র এণ্ড কোম্পানীতে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এটর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি প্রভূত সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৬৩ সাল হইতে দেহান্তের পূর্ব পর্যন্ত ত্রয়োদশ বৎসর বলরাম মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, নরেন্দ্রপুর আশ্রম, অদ্বৈত আশ্রম, সারদাপীঠ, উদ্বোধন, রহড়া বালকাশ্রম প্রভৃতি বহু কেন্দ্রের নানা কাজে তিনি অক্লান্তভাবে নির্ভরযোগ্য পরামর্শাদি দিয়াছেন। বলরাম মন্দির ও সেবা-প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে তাঁহার দীর্ঘকালীন অনলস প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে সর্বতোভাবে সমর্পিত-প্রাণ ছিলেন তিনি। তাঁহার ন্যায় অমায়িক পরহিতব্রতী ধর্মপরায়ণ সদানন্দ শ্রদ্ধাবান নিষ্কাম কর্মী বিরল। তাঁহার দেহান্তে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই কার্ত্তিক। (১৩০৬ সাল) [২০শ সংখ্যা।]

বড় বউ।

(বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

ললিতাদেবীর আর উত্তর সরিল না।

ঘোরতর মকদ্দমা চলিতেছে। আর মকদ্দমা চলিলে, কিশোরীমোহন ও রাধামোহন জাল উইল আদালতে দাখিল করিয়াছে—তাহা প্রমাণ হইবে। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরী-মোহন, মাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছে। তিনি বড় বউকে বুঝাইয়া বিপদ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু বড় বউএর ধনুক ভাঙ্গা পণ, শাশুড়ির বাক্যেও অটল রহিলেন। শেষ পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধ মাতা তৃতীয় পুত্রকে, বউকে বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। প্যারীমোহনও ভা'জকে বলিল, "দাদাদের ছেড়ে দাও"। ললিতাদেবী উত্তর করিলেন, "তুই ভাবিস্ নি, আমাদ্বারা আমার শ্বশুরের ছেলেদের কোনও অনিষ্ট হ'বে না। আমি তাদের ভালর নিমিত্তই করিতেছি"! শেষ দাঁড়াইল, উভয় ভ্রাতা অর্দ্ধেক সম্পত্তি বউএর নামে লিখিয়া দিয়া, জাল হইতে নিস্তার পাইল। মনে ভাবিয়াছিল, বউএর জীবনস্বত্ব বই ত নয়। যখন দান বিক্রয়ের অধিকার নেই, আমরাই ত পুনর্ব্বার পাইব।

বড় ভা'জের আনুগত্য করিতে আসে; ললিতাদেবী দূর দূর করিয়া তাড়ান। সকলে মনে করে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেছে। সমস্ত আয় সৎ কর্ম্মে খরচ করেন। বিধবা ননদ দুইটীকে বিশেষ যত্নে রাখেন। হাঁটিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যান, পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন। স্ত্রীলোকে বলে, যে বাড়ীতে বিপদ সে বাড়ীতে যান। কিন্তু পুরুষ দেখিয়া তাদৃশ সমীহ করেন না। সকলের সহিত মুখ তুলিয়া কথা ক'ন; ইহাতে কুলোকেরাও নানা কথা কয়। বিষয় কার্য্য প্যারীমোহনই করেন। এই সময়ে প্যারীমোহনের মার হঠাৎ বৃন্দাবন লাভ হইল। ললিতাদেবী দুইটী ননদকে দিয়া সমারোহে চতুর্থী করাইলেন। কিশোরীমোহন রাধামোহনও শ্রাদ্ধ শান্তি করিল। প্যারীমোহন ঐ সঙ্গে দান উৎসর্গ করিল, কিন্তু সে সমস্তই ললিতাদেবীর ব্যয়ে। ললিতাদেবী, তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যত ব্যয় করিতে পারে যেন করে। প্যারী-মোহনের কাযে লোকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

* ভাদ্র, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

যে খরচের নিমিত্ত কিশোরীমোহন ও রাধামোহনের অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল, গণনার ভিতর এত অর্থ নেই যাহাতে তাহার কুলান হয়। শীঘ্রই উভয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইল। অন্ন জোটে না! এমন কি দুই একদিন কোন ক্রমে কাটিয়াছে! এ সময়েও অর্থ সাহায্য চাহিতে গেলে, ললিতাদেবী দেখাই করেন না। ইহাতে তাঁহার মহা নিন্দা হইতে লাগিল। নিন্দুকের জিহ্বা যাহা সৃষ্টি করিতে পারে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেন কি না সন্দেহ; আর কল্পনাশক্তিতে ব্রহ্মার চৌদ্দ পুরুষ হার মানেন। সন্তানতুল্য প্যারীমোহনের নাম, ললিতাদেবীর সহিত কুভাষায় একত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু তেজস্বিনী ললিতাদেবী যেরূপ ভাবে চলিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে উভয় ভ্রাতারই জেল হইল। ছুট্‌লি জোচ্চরীর দাবীও দুই একটা নয়, পেটের দায়ে একে ওকে ঠকাইতে হইয়াছে। একদিন ললিতাদেবী স্বয়ং জেলে গিয়া উপস্থিত। ভ্রাতাদ্বয় কাকুতি মিনতি করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী ঘৃণার সহিত থামাইলেন। বলিলেন, "চুপ কর! তোমাদের ঋণে মুক্তি দিব, যাহা জুয়োচ্চরী করিয়াছ তাহা হইতেও বাঁচাইব; কিন্তু আমার অবর্তমানে যে সম্পত্তির তোমরা অধিকারী হইবে, যদি এই দণ্ডে দেবোত্তর করিয়া দাও, তবে;—নচেৎ নয়। এবং সেই দেবোত্তর সম্পত্তি যতদিন প্যারীমোহন বর্ত্তমান থাকিবে, সে'ই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তারপর সে যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেবে, সে'ই করিবে। পরে তোমাদের পুত্র সন্তানেরা মানুষ হইলে, তাহারা সে'ই ভার পাইবে। তোমরা দুই ভাই কোনও সংস্রবে থাকিতে পারিবে না। আপাততঃ ৩০০৲ তিন শত টাকা করিয়া তোমাদের মাসোহারা দিব"। অগত্যা জেলের ভয়ে, পেটের জ্বালায় উভয়কে সম্মত হইতে হইল।

সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হইল। ললিতাদেবী তীর্থ যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কথা প্যারীমোহনকে বলিলেন। প্যারীমোহন বলিল, "কি সম্বল লইয়া যাইবে"?

ল।—আমার ত' কিছু নেই, ঠাকুরকে দিয়াছি, তবে কি লইয়া যাইব?

প্যা।—তোমার চলিবে কিসে?

ল।—ভাই, তুমি ত' শিখাইয়া দিয়াছ—ঠাকুর দিবেন।

প্যা।—ঠাকুরের অনুমতি লইয়াছ কি? আর এক কথা, তুমি কি কুলদেবতাকে কেবল তোমার সম্পত্তি দিয়াছ? কায়, মন, জীবন কি অর্পণ কর নাই? তুমি কুল-নারী, তুমি একা তীর্থে যাইলে কুলদেবতার ত নিন্দা হইবে না?

ললিতাদেবী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমি আর তীর্থে যাইব না"!

প্যা।—সেই ভাল! তুমি না থাকিলে, ঠাকুরের সেবাকার্য্য ভাল হইবে না।

ল।—বুঝেছি, ঠাকুর যে দিন কাযে জবাব দিবেন, সেই দিন যাইব, নচেৎ আমার যাবার উপায় নাই।

ললিতাদেবী প্যারীমোহনের দাড়ি ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্যারীমোহন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। একাহারেই বিধবা কুল-দেবতার সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

একদিন রাধামোহন বলিতেছে, "মেজ দাদা, উকীল বলে 'দেবোত্তর হইতে সম্পত্তি ছাড়াইয়া লওয়া যায়'। তুমি কি বল"?

কি।—ও কথা মুখে আনিও না, উকীলের কথাতেই জালের সাজা হইত! ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাঁচিয়া গিয়াছি, এবার ফাঁসী যাইতে হইবে! আমি এখন বুঝিতেছি, বউ, আমাদের ভাল করিয়াছে, ছেলেপিলে মানুষ হবে—মান সম্ভ্রম থাক্‌বে। যাহা বিষয় লইয়াছিলাম, তাহা ত' দুই দিনে ফুঁকিয়া দিয়াছি। এ পাইলেও দুই দিনে না হয় দশ দিনে ফুঁকিয়া দিব!

রা।—তবে যাউক!

কি।—রেখো! কুকর্ম্মে সুখ নেই, তুই কি আজও বুঝিস্ নি?

রা।—কাযেই বুঝিতে হইবে!

কালে রাধামোহনও বুঝিল।

ঠাকুরের সম্পত্তি প্যারীমোহনের জিম্মায়।

প্যারীমোহন ঠাকুর বাড়ীতেই থাকিয়া ঠাকুরের কর্ম্ম করেন। ঠাকুর বাড়ীতেই থাকেন। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিজনের নিমিত্ত যথাযোগ্য পাঠাইয়া, সমস্ত অতিথি সেবার পর যাহা বাকী থাকে -তাহাই খান। আদর্শ চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক, তাঁহার নিকট উপদেশের নিমিত্ত আসিতে লাগিল। প্যারীমোহন কিছুই বলিতেন না, কেবল একটি শ্লোক আওড়াইয়া প্রণাম করিতেন :—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
যাঁহার কৃপায় সরে মূকের বচন।
পঙ্গু যাঁর কৃপাবলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া চলে
করি সে পরমানন্দ মাধবে বন্দন॥

দুইটি ভাইপো প্যারীমোহনের কাছে থাকিত। তাহারা শ্লোকটি শিখিয়াছিল ও আনন্দে পাঠ করিত। শুনিয়া সকলে ভরসা করিত, বাঁড়ুয্যে বংশের কুলদেবতার পূজা বহুদিন থাকিবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

"আলো"।—কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলের কতিপয় ছাত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য অতি অল্প মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ও অসম্প্রদায়ী হৃদয়বান্ কতকগুলি যুবকের দ্বারা লিখিত একখানি এইরূপ কাগজের অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতেছিলাম। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান) বিষয়ে আলোচনা বাঙ্গালা ভাষায় কমই দেখা যায়। "আলো"র ২য় সংখ্যায় "সত্য শিব সুন্দর" ও "শক্তি বিজ্ঞান"এর মত প্রবন্ধ যত বাহির হইবে, ততই ভাষার পুষ্টিসাধন করা হইবে। একটু বক্তব্য—দর্শন ও বিজ্ঞানের ভাষা আরও সহজ ও প্রাঞ্জল হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। "আলো"র আর একটু বিশেষত্ব দেখিলাম,—একটী ইসলামবাদীর প্রবন্ধ। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে যতই পরস্পর সহৃদয়তা

প্রকাশ করিবেন, ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে। যুবক ছাত্রগণ পদ্য লেখার দিকে যেন তত দৃষ্টি না রাখেন—বৃথা সময় ও সামর্থ্য নষ্ট মাত্র; অতিশয় ভাবুক চিত্ত ও পরিপক্ক হস্ত হইতে নিঃসৃত না হইলে, পদ্য বড় মধুর লাগে না। স্বাস্থ্য-রক্ষা, চরিত্র-গঠন, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান এই কয়েকটি সম্বন্ধেই আমরা নব্য শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকট হইতে বেশী আশা করি।

শারীরক-সূত্র-রামানুজ-ভাষ্যম্।

(পণ্ডিত প্রমথনাথতর্কভূষণানুবাদিতম্।)

সানুবাদ মূলভাষ্যের কিয়দংশ—বর্ত্তমান সম্পাদক।

পরমহংসদেবের উপদেশ* ।

১। বদ্ধজীব হরিনাম আপনিও শোনে না, পরকেও শুনতে দেয় না, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করিতে থাকে; কেহ ধ্যান ধারণা করিলে তাকে নানা প্রকার ঠাট্টা করে।

২। যেমন কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারিলে অস্ত্র ঠিক্‌রে প'ড়ে যায়—তার গায়ে কিছুতেই লাগে না; তেম্‌নি বদ্ধ জীবের কাছে ধর্ম্ম কথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পারিবে না।

৩। বিবেক-বৈরাগ্য না থাক্‌লে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম্মলাভও হয় না। এইটী সৎ আর এইটী অসৎ বিচার ক'রে সদ্বস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক; বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

৪। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নেঙড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না; তেম্‌নি পুঁথিতে অনেক ধর্ম্ম-কথা লেখা আছে,—শুধু পড়্‌লে ধর্ম্ম হয় না—সাধন চাই।

৫। জাহাজ যে দিকে যা'ক না কেন কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে, তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না; মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা'হলে আর তার কোন ভয় থাকে না।

৬। "গুরু মিলে লাক লাক, চেলা না মিলে এক"; উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করে এরূপ লোক অতি অল্প মিলে।

৭। ছেলে যেমন পয়সার জন্য মার কাছে আব্দার করে,—কখন কাঁদে, কখন মারে; সেইরূপ আনন্দময়ী মাকে আপনার হ'তে আপনার জেনে তাঁহাকে দেখ্‌বার জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করেন, তাঁকে সচ্চিদানন্দময়ী মা দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পারেন না।

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত।—বর্ত্তমান সঃ

বিলাতযাত্রীর পত্র

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

মনসুন্।

পঁচিশে জুন প্রাতঃকালে জাহাজ কলম্বো ছাড়্‌লো। এবার ভরা মনসুনের মধ্য দিয়ে গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড় ততই বাড়ছে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ কর্‌ছে, অবিশ্রান্ত† বৃষ্টি, অন্ধকার; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জ্জে গর্জ্জে জাহাজের উপর এসে পড়ছে; ডেকের উপর তিষ্ঠুন দায়। খাবার-টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাঠ দিয়ে, চৌকো চৌকো খুব্‌রি করে দিয়েছে, তার নাম ফিড্‌ল্। তার ওপর দিয়ে খাবার দাবার লাফিয়ে উঠ্‌ছে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে উঠ্‌ছে, যেন বা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বল্‌ছেন, "তাইত এবারকার মনসুন্‌টা ত ভারি বিট্‌কেল!" কাপ্তেনটি বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে অনেকদিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক; আষাঢ়ে গল্প কর্‌তে ভারি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প; চীনে কুলি, জাহাজের অফিসারদের মেরে ফেলে, কেমন করে জাহাজ শুদ্ধ্ লুটে নিয়ে পালাত; এই রকম বহুৎ গল্প কর্‌ছেন। আর কি করা যায়; লেখাপড়া এ ঢুলুনির চোটে মুস্কিল। ক্যাবিনের ভেতর বসা দায়; জানলাটী এঁটে দিয়েছে ঢেউয়ের ভয়ে। একদিন 'তু' ভায়া একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এক টুকরো এসে জল প্লাবন করে গেল। উপরে সে ওছল পাছলের ধুম কি! তারি ভেতরে তোমার উদ্বোধনের কায অল্প স্বল্প চল্‌ছে মনে রেখো।

একটী পাদ্রী যাত্রী।

জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটী আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম—বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে; তার ছটী ছেলে মেয়েতে। চাকররা বলে খোদার বিশেষ মেহেরবানি। ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধ হয়। একখান কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরণী ছেলেপিলেগুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে, চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে, কেঁদে কেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার যো নাই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবড়িতে শুইয়ে, বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রীণী, কোণে চার ঘণ্টা ব'সে আমোদ প্রমোদ ক'রতে থাকে। তোমার ইউরোপী সভ্যতা বোঝা দায়! আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি,—বলে কি অসভ্য। আর আমোদ প্রমোদগুলো গোপনে কল্লে ভাল হয় না? (তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল কর্‌তে যাও!) যাহক্, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে উত্তর ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোড় ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোড়ের সৃষ্টি।

জাহাজ টালমাটালে অনেকেরই মাথা ধ'রে উঠেছে। একটি টুটল বলে ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্ছে। তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও বোগেশের ছেলেপিলের

* শ্রাবণ ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

† মূলে "উভভ্রান্ত" পাঠ আছে।—বর্ত্তমান সঃ

মা হয়ে বসেছে। টুটল বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েছে। টুটলকে জিজ্ঞাসা করলুম "টুটল কেমন আছ?" টুটল বল্লে "এ বাঙ্‌লাটা ভাল নয়, বড্ড দোলে, আর আমার অসুখ করে।" টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙ্‌লা। যোগেশের একটী এঁড়ে লাগা ছেলের বড় অযত্ন; বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের উপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, তাকে চাম্‌চে ক'রে সুরুয়া খাইয়ে যায়; আর তার পা'টী দেখিয়ে বলে—কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!

মনসুনের কেন্দ্র।

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত তার কি? তাহলে কি আর আমরা এডেন পৌঁছুতুম। ভাগ্যিস!—সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়; তাই ছ দিনের পথ চৌদ্দ দিন ক'রেও, দিন রাত বিষম ঝড় বাদলের মধ্যে দিয়েও, শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ—পুকুর, ততই বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ। আবার সে বাতাস সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্দেক হয়ে গেল। সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়্‌লো। কাপ্তেন বল্লেন, এই খানটা মনসুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পার্লেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র। তাই হলো। এ দুঃস্বপ্নও কাট্‌লো।

এডেন।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নাম্‌তে দেবে না, কালা গোরা মানে না। কোনও জিনিষ ওঠাতে দেবে না। দেখ্‌বার জিনিষ বড় নেই। কেবল ধূধূ বালি,—রাজপুতানার ভাব। বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পণ্টনের ব্যারাক। সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল; আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরাজি যুদ্ধ জাহাজ—ও একখানি জর্ম্মাণ—এলো; বাকিগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেলবারে এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে দিশি পণ্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায় বড় বড় গহ্বর তৈয়ারী করা; তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্ব্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প ক'রে, আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্চে। তা কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন ভারতবর্ষেরই একটী সহর যেন। দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পারসি দোকানদার, সিন্ধি ব্যাপারী অনেক।

এডেনের ইতিবৃত্ত।

এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান - রোমান বাদসা কন্‌সট্যান্‌ সিউস্‌ এখানে একদল পাদ্রী পাঠিয়ে, ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম প্রচার করান। পরে আরবেরা সে ক্রিশ্চিয়ানদের মেরে ফ্যালে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ান হাব্‌সি দেশের বাদসাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাব্‌সিরাজ ফৌজ পাঠিয়ে এডেনের আরবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরাণের সামানিডি বাদসাহদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর এডেন আরবদের হাতে যায়। কতককাল পরে পোর্ত্তুগিজ-সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম

করেন। পরে তুরস্কের সুলতান ঐ স্থানকে, পোর্ত্তুগিজদের ভারত মহাসাগর হতে তাড়াবার জন্য, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের বন্দর করেন।

আবার উহা নিকটবর্ত্তী আরাব-মালিকের অধিকারে যায়। পরে ইংরাজেরা ক্রয় ক'রে বর্ত্তমান এডেন করেছেন। এখন প্রত্যেক শক্তিমান জাতির যুদ্ধপোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় কি গোলযোগ হচ্ছে, তাতে সকলেই দুকথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য, রক্ষা কর্ত্তে চায়। কাযেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। এই জন্য পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চল্‌বে না ব'লে, আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান কর্‌তে চায়। ভাল ভাল গুলি ইংরেজ তো নিয়ে বসেছেন; তারপর ফ্রান্স; তারপর যে যেখানে পায়,—কেড়ে, কিনে, খোসামোদ ক'রে—এক একটা জায়গা করেছে এবং কর্‌ছে। সুয়েজ খাল হচ্চে এখন ইউরোপ আসিয়ার সংযোগস্থান। সেটা ফরাসিদের হাতে। কাযেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেডসির ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। কখনও বা জায়গা নিয়ে উলটো উৎপাত হয়ে বসে। সাতশ বৎসরের পরপদদলিত ইটালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হলো; হয়েই ভাব্‌লে কি হলুম রে!—এখন দিগ্বিজয় কর্‌তে হবে। ইউরোপের এক টুকরোও কারও নেবার যো নাই; সকলে মিলে তাকে মার্‌বে। আসিয়ায়—বড় বড় বাঘা ভাল্‌কো,—ইংরেজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, ডচ; এরা আর কি কিছু রেখেছে! এখন বাকি আছে দু চার টুক্‌রো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চল্‌লো। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা করলে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড্‌সির ধারে একটা জমি দান কর্‌লে। মতলব—সেই কেন্দ্র হতে, ইতালি হাব্‌সি রাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালিও সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাব্‌সি বাদসা মেনেলিক্‌ এমনি গোবেড়েন দিলে, যে এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণ বাঁচান দায় হয়েছে। আবার রুষের কৃশ্চানি এবং হাব্‌সির কৃশ্চানি নাকি এক রকমের। তাই রুষের বাদসা ভেতরে ভেতরে হাব্‌সিদের সহায়।

পাদ্রী বোগেশ ও রেড্‌সি।

জাহাজ ত রেড্‌সির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাদ্রী বল্লেন "এই —রেডসি,—য়াহুদী নেতা মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিসরি-বাদসা ফেরো যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা, কাদায় রথচক্র ডুবে, কর্ণের মত আটকে জলে ডুবে মারা গেল"। পাদ্রী আরও বল্লেন যে, একথা এখন আধুনিক বিজ্ঞান-যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ করবার, এক ঢেউ উঠেছে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সবগুলি হয়ে থাকে, ত আর তোমার য়াভে দেবতা মাঝখান্‌ থেকে আসেন কেন? বড়ই মুস্কিল!—যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয়, ত ও কেরামত-গুলি আজগুবি এবং তোমার ধর্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তা হলেও, তোমার দেবতার মহিমাটী বাড়ার ভাগ ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনাআপনি হয়েছে। পাদ্রী বোগেশ বল্লে "আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি"। একথা মন্দ নয়। এসব সহ্যি হয়। তবে ঐ যে একদল আছে,—পরের বেলা দোষটী দেখাতে, যুক্তিটী আন্‌তে, কেমন

তৈয়ার। নিজের বেলায় বলে, "আমি বিশ্বাস করি" "আমার মন সাক্ষ্য দেয়"; সেগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!—ওঁর আবার মন! ছটাকও নয়, তা মন কি? পরের বেলায় সব কুসংস্কার; বিশেষ যেগুলো সাহেবে বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভূতকিমাকার কল্পনা ক'রে কেঁদেই অস্থির !!

প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র।

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে। এই রেডসির কিনার—প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র। ঐ—ওপারে, আরাবের মরুভূমি; এপারে মিসর। এই—সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্ট্ দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে, রেডসি পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার ক'রে উত্তরে পেঁাছেছিল। এদের আশ্চর্য্য শক্তি বিস্তার, রাজ্য বিস্তার, সভ্যতা বিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদসাদের আশ্চর্য্য পিরামিড নামক সমাধি মন্দির, নারীসিংহী মূর্ত্তি। এদের মৃতদেহগুলি পর্য্যন্ত আজও বিদ্যমান। বাবরিকাটা চুল, কাছাহীন ধপধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে বাস করতো। এই,—হিক্সস বংশ, ফেরোবংশ ইরাণি বাদসাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ, রোমক, আরাব বীরদের রঙ্গভূমি মিসর। সেই ততকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে, চিত্রাক্ষরে তন্নতন্ন করে লিখে গেছে।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরিদের মতে—মানুষ ম'লে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃতদেহের কোন অনিষ্ট হলেই সে সূক্ষ্ম শরীরের আঘাত লাগে, আর মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ। তাই শরীর রাখবার এত যত্ন। তাই রাজা বাদসাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল !! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলের রাস্তার রহস্য ভেদ ক'রে, রত্ন-লোভে দস্যুরা সে রাজ শরীর চুরি করেছে।—আজ নয়; প্রাচীন মিসরিরা নিজেরাই করেছে। পাঁচ সাত শ বৎসর আগে এই সকল শুকনো মড়া, য়াহুদি ও আরাব ডাক্তারেরা, মহৌষধি জ্ঞানে, ইউরোপ শুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও তাই বোধ হয় ইউনানি হকিমির আসল মুমিয়া !!

এই মিসরে, টলেমি বাদসার সময়ে, সম্রাট ধর্ম্মাশোক ধর্ম্ম প্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ত, রোগ ভাল কর্‌ত, নিরামিষ খেত, বিবাহ কর্‌ত না, সন্ন্যাসী শিষ্য কর্‌ত। তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলে। থেরাপিউট্, অস্সিনি, মানিকি, ইত্যাদি; যা হতে বর্ত্তমান কৃশ্চানি ধর্ম্মের সমুদ্ভব। এই মিসরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ব্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিলো। এই মিসরেই আলেকজেন্দ্রিয়া নগর; যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন, জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। যে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চিয়ানদের হাতে প'ড়ে, ধ্বংস হয়ে গেল। পুস্তকালয় ভস্মরাশি হ'ল। বিদ্যার সর্ব্বনাশ হলো। শেষ বিদুষী নারীকে ক্রিশ্চিয়ানেরা নিহত ক'রে, নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় সকল প্রকার বীভৎস অপমান ক'রে টেনে বেড়িয়ে, অস্থি হতে টুকরা টুকরা মাংস আলাদা করে ফেলেছিল! [ক্রমশঃ।]

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ম (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৮তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্ম ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ২৷৷০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

দিব্য বাণী

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।২০।১৭

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

সকলসাধনমূল সুদুর্লভ নরতনুখানি
গুরু যার কর্ণধার কর্মক্ষম সুন্দর তরণী—
(পরম-ঈশ্বর) আমি (মুক্তিদাতা সবার আশ্রয়)
অনুকূল বায়ুরূপে হই যার গতির সহায়—
সহজে পেয়ে সে-তরী ভবসিন্ধু-পারে নাহি যায়
(ভাগ্যহীন অনাত্মজ্ঞ) সে-মানব আত্মঘাতী হয়।
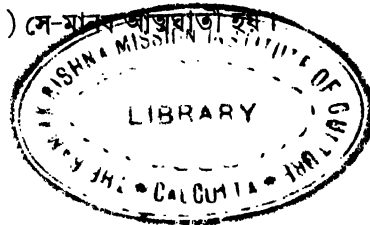
কথাপ্রসঙ্গে

পুরুষকার—আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে

১

কথামৃতে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, "ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়—মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এখনই ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড করবি।' যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত ক'রে আসি।' এই কথা ব'লে চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ ক'রে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়।" আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা, ঈশ্বর যে একান্ত আপনার জন—এই বোধ, ঈশ্বরকৃপাতেই বস্তুলাভ, ইত্যাদি উচ্চ তত্ত্বসমূহ বিশদ করিবার উদ্দেশ্যেই অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সুন্দর উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে অনুপম কথাচিত্রটি সুনিপুণ শিল্পীর মতোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, লৌকিক ক্ষেত্রেও বালক যদি আবদার না করে, না কাঁদে, নাছোড়বান্দা না হয়, তাহা হইলে সে তাহার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারে না।

ইহা সত্য যে, ক্ষুদ্র বালক জ্ঞাতসারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া অভীষ্ট বস্তু লাভ করে না, ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরিকল্পনা করিয়া সে কাঁদে না; 'বালানাং রোদনং বলম্'—বালকদের পুরুষকারের পরিচয় রোদনে, কিন্তু উহা সহজাত সংস্কারেরই ফলশ্রুতি, পরিকল্পিত প্রযত্নের নহে। তথাপি এক্ষেত্রেও সহজাত সংস্কারের দ্বারা অভিভূত, একটি সুপ্ত অনভিব্যক্ত পুরুষকারের অস্তিত্ব সম্ভবতঃ স্বীকার করিতে পারা যায়।

যাহাই হউক, বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক-বালিকাদের পুরুষকার অর্থাৎ উদ্যম উদ্যোগ বা প্রযত্নবিষয়ক মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটে। ছাত্র-ছাত্রীরা জানে যে, পড়াশুনা না করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহারা পড়াশুনায় মনোনিবেশ করে। শিক্ষাসমাপনান্তে কেহ শিক্ষক, কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনীয়ার, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ শিল্পী ইত্যাদি হয়। এবং জাগতিক যে-কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে কি কঠোর প্রয়াস করিতে হয়, তাহা তাহাদের অবিদিত থাকে না।

২

মজার ব্যাপার এই যে, লৌকিক ক্ষেত্রে পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধনভজনের উপর জোর না দিয়া 'গুরুকৃপায় বস্তুলাভ হইবে', 'কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে!', 'ঈশ্বর নিজে কৃপা করিয়া দর্শন না দিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে?', 'সময় না হইলে কিছুই হয় না' ইত্যাদি প্রচলিত উক্তিসমূহের সুবিধামতো মন-গড়া অর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকেন। কেহ কেহ আবার ধর্মকর্মের পাট একেবারে উঠাইয়া না দিলেও, নানা কাজকর্মহেতু সময়াভাব, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদির দোহাই

দিয়া নিয়মরক্ষার মতো অথবা দিনগত পাপক্ষয়ের মতো ঐগুলি করিয়া যান। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, আধ্যাত্মিকতা দুরূহতম বিদ্যা—একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান এবং দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত অনুশীলিত না হইলে উহা কিছুতেই অধিগত হইতে পারে না; লৌকিক শিল্পাদি বিদ্যায় বা বিজ্ঞানে যদি পুরুষকারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মবিদ্যায় উহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক, কারণ আধ্যাত্মিকতার পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই ধরনের তামসিকতা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় আজ সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত। ফলে খুব কম লোকই আজ পাওয়া যায়, যাঁহারা সাহস উৎসাহ ও উদ্যম সহায়ে অধ্যাত্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে প্রযত্নশীল।

৩

কিন্তু ধর্মবিষয়ে এই ব্যাপক নিশ্চেষ্ট মনোবৃত্তি একটি বিস্ময়কর অঘটন বলিয়াই মনে হয়, কারণ বৈদিক যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থে, এমন কি চরকসংহিতাদি আয়ুর্বেদ-গ্রন্থেও, পুরুষকারের মহিমা কীর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে: 'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্ / সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি।'—ঘরে বসিয়া থাকিলে মধু বা স্বাদু যজ্ঞডুমুর পাওয়া যায় না, পথ চলিয়াই উহাদের পাইতে হয়; সূর্যদেবতার শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ করো, অতন্দ্র তাঁহার বিচরণ; অতএব বিচরণশীল হও—শ্রেয়োলাভের জন্য প্রযত্ন করো।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই উক্তিটি অবশ্য লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইহা কঠোপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করো—এই ওজস্বিনী বাণীরই অনুরূপ।

গীতাতেও আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই এই পুরুষকারের কথা বলা হইয়াছে। লৌকিক ক্ষেত্রে যেমন বলিয়াছেন, 'হে পার্থ, তুমি ক্লীবভাবের আশ্রয় লইও না; এইরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না; হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও', আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তেমনই বলিয়াছেন, 'নিজেই নিজের আত্মাকে উদ্ধার করিবে, কখনও নিজেকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না; মানুষ নিজেই নিজ আত্মার বন্ধু এবং নিজেই নিজ আত্মার শত্রু।'

আর আসল কথা তো ইহাই যে, গীতাতে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের কোনও ভেদ ভগবান স্বীকার করেন নাই:

'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥'

—যে পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের কর্মচেষ্টা, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহাকে মানুষ নিজ কর্মের দ্বারা অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। তাই কর্মের উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এত জোর দিয়াছেন। আদর্শ কর্মী হইবেন 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ' ধীর ও উৎসাহী। আবার পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তিরও যে গর্ব করিবার কিছুই নাই, তাহাও বলিয়াছেন: 'পৌরুষং নৃষু', 'ব্যবসায়োঽস্মি'—আমিই মনুষ্যমধ্যে পুরুষকাররূপে বিরাজিত, উদ্যমকারিগণের অধ্যবসায় আমিই।

মহাভারতের অন্যান্য পর্বেও পুরুষকারের

অকুণ্ঠ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

দীক্ষা লইয়া যাঁহারা বলেন, 'ঈশ্বর ও গুরুই কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবেন, আমরা সাধারণ জীব, সাধনভজন করিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়!', তাঁহাদের জন্য যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণকার বলিতেছেন: পুরুষকার বিনাই যদি ঈশ্বরদর্শন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর কেন মৃগপক্ষিগণকে উদ্ধার করেন না? আত্ম-প্রযত্নহীন অজ্ঞ শিষ্যকে গুরু যদি উদ্ধার করেন, তাহা হইলে গৃহপালিত উষ্ট্র ও বলীবর্দকেই বা তিনি উদ্ধার করেন না কেন?[১]

প্রাচীন শাস্ত্র হইতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষকারের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে বহু উক্তিই উৎকলিত হইয়া একটি সংকলন-সম্ভার রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকে উপজীব্য করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এখানে বলা যাইতে পারে।

কথামৃতে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব জনৈক রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, সামান্য রসিকতায় সময় ও শক্তির অপচয় না করিয়া তিনি যেন ঐ শক্তিকে ঈশ্বরলাভের জন্য নিয়োজিত করেন, কারণ যে-ব্যক্তি লবণের হিসাব করিতে পারে, সে মিছরিরও হিসাব করিতে পারে। 'আপনি টেনে নিন'—ব্রাহ্মণের এই কথার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন: 'আমি কি করবো, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে।'

যে-ব্যক্তি লবণের হিসাব করিতে পারে, সে মিছরিরও হিসাব করিতে পারে অর্থাৎ লৌকিক ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য যে শক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সেই শক্তিই সার্থক-ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাই, আমাদেরই চেষ্টার উপর আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

অজস্র উপমা দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়াছেন। বলিয়াছেন: দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়; দুধে মাখন আছে শুধু বললেই হয় না, দুধকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাখন তুলতে হয়; সরিষার ভিতর তেল আছে, সরিষাকে পিষতে হয়; মেথিতে হাত রাঙা হয়, মেথি বাটতে হয়; সিদ্ধি সিদ্ধি বললে নেশা হয় না, সিদ্ধি আনো, ঘোঁটো, খাও, তবে নেশা হবে; পুকুরের পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না, কর্ম না করলে ঈশ্বরদর্শন হয় না; ঢিমে তেতালা হ'লে হয় না; ঈশ্বর কল্পতরু, তাঁর কাছে চাইতে হয়, ইত্যাদি।

শ্রীম-র সহিত কথা হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, সকলেরই আত্মদর্শন হইতে পারে। উত্তরে শ্রীম মন্তব্য করিতেছেন: আজ্ঞা, তবে ঈশ্বরই কর্তা; তিনি যে ঘরে যেমন করাইতেছেন, কাহারও চৈতন্যবিধান করিতেছেন, কাহাকেও অজ্ঞান করিয়া রাখিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ প্রত্যুক্তি করিতেছেন: 'না, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হ'লে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।'

ঐ কথাই কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠকেও বলিতেছেন: 'তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর করছে, কিন্তু তা ব'লে তাঁকে ডাকতে হবে, চুপ ক'রে থাকলে হবে না।' জনৈক অভি-

১। 'বিনা পুরুষযত্নেন দৃশ্যতে চেজ্জনার্দনঃ। মৃগপক্ষিগণং কস্মাৎ তদাসৌ নোদ্ধরত্যজঃ॥ গুরুশ্চেদুদ্ধরত্যজ্ঞমাত্মীয়াৎ পৌরুষাদৃতে। উষ্ট্রং দান্তং বলীবর্দং তৎ কস্মান্নোদ্ধরত্যসৌ॥'
—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ৫।৪৩।১৫-১৬

নেতাকে বলিয়াছিলেন: 'আত্মদর্শনের উপায় ব্যাকুলতা— কায়মনোবাক্যে তাঁকে পাবার চেষ্টা', 'তপস্যা চাই, তবে বস্তুলাভ হবে, শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করলেও কিছু হবে না।'

ঋষিদের পুরুষকারের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারংবার বলিয়াছেন: ঋষিরা প্রাতে কুটীর হইতে নির্গত হইয়া সারাদিন তপস্যা করিয়া সন্ধ্যায় কুটীরে ফিরিয়া সামান্য ফলমূল আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতেন; পুরুষকারের দ্বারাই তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন, অনেক তপস্যা-সহায়ে ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের নিকট পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিতেন।

যে-কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নানাভাবে বলিয়াছেন, সেই কথারই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আমরা পাই, 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থটিতে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে আপন মহিমায় সমুজ্জল এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থটিতে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষকারের কথা পরিলক্ষিত হয়। কত ভাবেই না ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র সাধন-ভজনের উপর জোর দিয়াছেন! বলিয়াছেন: 'সাধনপথে পুরুষকার দরকার। কিছু করো—চার বৎসর অন্ততঃ ক'রে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয়, তবে আমার গালে একটা চড় মেরো।'

জনৈক ভক্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস সাধুদের নিকট যাইলেই যথেষ্ট, আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ঐসকল কথায় কর্ণপাত করিতে নিষেধ করিয়া বলেন, সাধুদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ জীবন গঠন করা প্রয়োজন —নিজে কিছু না করিয়া সাধুদের নিকট যাইলেই হইবে, ইহা ফাঁকির কথা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এমন কি 'শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছি, সাধুসেবা করিয়াছি, আমাদের আর ভাবনা কি!'—এই মন্তব্য শুনিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ বলিয়াছিলেন: 'মাকে দেখলেই আর সাধু-সেবা করলেই হয় না, ধ্যান-ধারণা বিবেক-বৈরাগ্য চাই।'

'আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা এক ট্যাং কর।'—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সাধনা কত সহজ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মানুষ এত অলস, এত ফাঁকিবাজ, নিজেকে ঠকাইতে এত মজবুত যে, তৈরী রান্না জিনিস কেবল মুখে তুলিয়া খাওয়া, তাহাও তাহাদের দ্বারা হইয়া উঠিতেছে না। বাল্যকাল হইতে ফাঁকি দিতে দিতে এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, সব জিনিসই ফাঁকি দিয়া সারিতে চায়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'রাজযোগ' গ্রন্থে বলিয়াছেন: একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক প্রাকৃতিক নিয়মে লক্ষ লক্ষ বৎসরে ক্রমশঃ উদ্ভিদ্ পশু ও মানুষ হয়। মানুষ হইয়াও বিশ্বের অনন্ত শক্তি-রাশি হইতে ধীরে ধীরে শক্তিসংগ্রহ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে তাহার হয়তো আরও কয়েক লক্ষ বৎসর লাগে। কিন্তু উন্নতির বেগ বাড়াইলে এই সময়ের সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ছয় মাস বা ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন? তীব্রবেগ-সম্পন্ন হইলে মানুষ এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিবে কেন? সকলেই শেষে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এই ক্ষণেই, এই শরীরেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব না কেন? অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি এই জীবনেই লাভ করিব না কেন? আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, ইহাই যোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : প্রথমজ্ঞানেন সাকল্যেন অসম্ভাবনা-নিবৃত্ত্যসম্ভব-পক্ষে সাধনান্তরম্ অপি আহ—বৈরাগ্যেণ ইত্যাদিনা। বৈরাগ্যেণ বিষয়দোষ-বিবেকেন উৎপন্নেন। 'ব্রহ্মলোক-তৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ' (পঞ্চদশী ৬।২৮৫) ইত্যুক্ত-পরাকাষ্ঠাম্ আপন্নেন বিষয়বিক্ষেপ-রহিত-কৃতঃ যঃ নিরন্তরঃ অভ্যাসঃ শ্রবণাবৃত্তিঃ তেন যদ্‌বলং মননং তেন চ। 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' (বৃহ. উ. ৩।৫।১) ইতি অত্র তথা এব ব্যাখ্যানাৎ। তাভ্যাং দ্রঢ়িম্না সুদৃঢ়য়া ভক্ত্যা অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি একত্বেন যা ভক্তিঃ ভজনং তয়া। একাগ্রধ্যানপরাঃ প্রত্যগভিন্ন-ব্রহ্মৈক্য-বিষয়-ধ্যাননিষ্ঠাঃ সন্তঃ যং বিদুঃ ইতি অর্থঃ। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥' (কঠ উ. ১।২।২৩, মু. উ. ৩।২।৩) ; 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (মু. উ. ৩।২।৪) ; 'ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' (মু. উ. ৩।১।৮) ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। প্রবচনম্ অধ্যাপনং, মেধা গ্রন্থার্থ-ধারণসামর্থ্যং, শ্রুতম্ অনাত্মবিষয়ং বহুধা বিবক্ষিতম্। এতৈঃ ন লভ্যঃ। কিন্তু এষ সাধকঃ যং পরমাত্মানম্ এব শ্রবণাদিভিঃ নিরন্তরং প্রার্থয়তে, তেন অয়ম্ আত্মা লভ্যঃ। তস্য এবং প্রার্থয়মানস্য এষ আত্মা স্বাং তনূং সচ্চিদানন্দাত্মিকাং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি ইতি অর্থঃ। বলহীনেন তদ্‌বিষয়-মননম্ অকুর্বাণেন ইতি অর্থঃ। নিষ্কলং নিরবয়বং পরমানন্দং নিরন্তরং ধ্যায়মানঃ প্রত্যয়-সন্তত্যা বিষয়ীকুর্বন্ পুরুষঃ। তত এব ধ্যানাৎ তং পশ্যতে। অপ্রতিবন্ধেন সাক্ষাৎকরোতি ইতি অর্থঃ। তদ্ উক্তং ভগবতা 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' (গীতা, ৬।৩৫), 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।' (গীতা, ১৮।৫৫) ইতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : (শ্রবণজনিত) প্রথম জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভাবনা[১]-নিবৃত্তি সম্ভব না হইলে, (সেই স্থলে) অন্য সাধনও (আচার্য) বলিতেছেন—বৈরাগ্যেণ ইত্যাদি শব্দের

১ শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশ হইতে দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অতিরিক্ত নিত্যশুদ্ধ কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ আত্মার কথা শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষেত্রেই শিষ্য উহা সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পারে না। সাধারণ অনুভূতির অবিষয়, এইরূপ নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বিপরীত-ধারণা (অর্থাৎ আত্মা দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির স্বরূপ এবং অশুদ্ধ ও জড়, এইরূপ বুদ্ধি) এবং অসম্ভাবনা (অর্থাৎ যথোক্ত বর্ণিতরূপে দেহ-ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না, এইরূপ বুদ্ধি) জন্মে। এই বিপরীত-ধারণা ও অসম্ভাবনা দূর করিবার জন্যই মনন অর্থাৎ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে বিচার করিতে হয়।

দ্বারা। 'বৈরাগ্যেণ' অর্থাৎ বিষয়দোষের বিচার হইতে উৎপন্ন বৈরাগ্যের[২] দ্বারা। ব্রহ্মলোক যখন তৃণীকৃত হয়, উহাকেই বৈরাগ্যের চরম অবধি বলা হয়; এইরূপ পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়-বিক্ষেপশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে নিরন্তর অভ্যাস অর্থাৎ শ্রবণের আবৃত্তি (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ), তাহা হইতে সমুৎপন্ন বল অর্থাৎ মনন, তাহারও দ্বারা (ইহাই এখানে 'বৈরাগ্যেণ' শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত)। 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ'—'মননপরায়ণ হন'—এই শ্রুতির ঐরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই (বৈরাগ্য-সহকৃত) শ্রবণ ও মননের দ্বারা **দৃঢ়িম্না—সুদৃঢ় ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ একত্ববোধপূর্বক যে ভক্তি বা ভজন, তাহার দ্বারা। **একাগ্রধ্যানপরাঃ**—একাগ্রধ্যান-পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মৈক্য-বিষয়ক ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া **যং বিদুঃ**—যাঁহাকে অবগত হন, ইহাই অর্থ। কারণ মুণ্ডক শ্রুতি এইরূপই ঘোষণা করিয়া থাকেন, যথা—'নায়মাত্মা......ধ্যায়মানঃ'—(শ্রুত্যুক্ত) 'প্রবচন' অর্থাৎ অধ্যাপনা, 'মেধা' অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ-ধারণের সামর্থ্য, 'শ্রুত' বহুবিধ অনাত্মবিষয়ই এখানে 'শ্রুত' শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। এই সকলের দ্বারা (প্রবচন, মেধা ও শ্রুত দ্বারা) আত্মা লভ্য নহেন, কিন্তু এই সাধক শ্রবণাদি দ্বারা যে পরমাত্মাকেই নিরন্তর প্রার্থনা করেন, সেই পরমাত্মাই সাধক কর্তৃক লভ্য হন। এইভাবে সেই প্রার্থনাকারীর আত্মা স্বীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপটি (তখন) তাহার (সাধকের) নিকট প্রকাশ করেন, ইহাই অর্থ। 'বলহীনেন' অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ক বিচার যিনি করেন না, এরূপ ব্যক্তির দ্বারা (আত্মা লভ্য নহেন)। 'নিষ্কল' অর্থাৎ নিরবয়ব, পরমানন্দ-স্বরূপকে নিরন্তর ধ্যানকারী অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রবাহের দ্বারা (আত্মাকে) বিষয়কারী পুরুষই সেই ধ্যান[৩] দ্বারা তাঁহাকে (আত্মাকে) দর্শন করিয়া থাকেন। (দর্শনের অর্থ কি তাহা বলিতেছেন)—(সংশয়-বিপর্যয়াদি) প্রতিবন্ধ-রহিত সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ। (গীতাতেও) ভগবান তাহাই বলিয়াছেন 'অভ্যাসেন···তত্ত্বতঃ।' —হে কুন্তীপুত্র, অভ্যাস ও বৈরাগ্যসহায়েই মন নিগৃহীত হইয়া থাকে; আমি কি পরিমাণ ও স্বরূপতঃ কে—তাহা ভক্তির দ্বারাই যথার্থভাবে জানিতে পারা যায়। ৫।

২ 'রাগ' শব্দের অর্থ আসক্তি। যে ব্যক্তি হইতে রাগ বিগত হইয়াছে, তিনি 'বিরাগ'। তাঁহার ভাব 'বৈরাগ্য'। বিষয়ের দোষ অপরোক্ষরূপে উপলব্ধি না করিলে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে না। রোগ, মানসিক বিক্ষোভ, ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা প্রভৃতির ফলে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বৈরাগ্য নহে। এইজন্যই বিষয়দোষ-দর্শন হইতে উৎপন্ন আসক্তির অভাবকেই বৈরাগ্য বলা হয়। যে অবস্থায় ভোগ্য বিষয় অবাধিতরূপে লাভ করিলেও ভোগের জন্য বিন্দুমাত্র মানসিক চাঞ্চল্য জন্মে না, সেইরূপ অবস্থাকেই বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য বলা হয়। এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগদর্শনের সূত্র: 'দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্' (১।১৫)।

৩ চিত্তের বৃত্তি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্রতিনিয়ত উদিত হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয়েই চিত্তের বৃত্তি জন্মে। কিন্তু যখন একটিমাত্র বিষয়কে অবলম্বন করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে চিত্তের বৃত্তিধারা উদিত হয়, তখনই উহাকে ধ্যান বলে। এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগদর্শনের সূত্র: 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্' (৩।২)।

কঠোপনিষৎপ্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

জীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান। সেই আত্মজ্ঞান কি ক'রে লাভ করতে হয়, তা বলা হয়েছে কঠোপনিষদের 'যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী'-শ্লোকটিতে (১।৩।১৩), যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি। আত্মজ্ঞানের সাধনের কথা—উপায়ের কথা—বলা হয়েছে, কিন্তু উপায়টি শুধু জেনে রাখলেই হবে না, পুরুষকারসহায়ে সাধনপথে এগিয়ে যেতে হবে, তাই উপনিষদ বলছেন:

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥
(১।৩।১৪)

'উত্তিষ্ঠত'—ওঠো; 'জাগ্রত'—জাগো। পান্থশালায় এসে যাত্রী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। এটি তার নিজের ঘর নয়—গন্তব্যস্থল নয়, তাকে যেতে হবে বহু দূরে, সেকথা সে ভুলে গেছে। শাস্ত্রে একেই বলেছে 'প্রমাদ'। প্রমাদ মানেই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত না থাকা। ভুলে থাকা, নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা, লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ব্যাকুলতা না থাকা—এরই নাম প্রমাদ। এই প্রমাদ থেকে, এই মোহনিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য শ্রুতি বলছেন, 'ওঠো, জাগো—লক্ষ্যের দিকে পরম উৎসাহে, প্রবল প্রতাপে এগিয়ে যেতে সচেষ্ট হও।'

নিজের সম্বন্ধে অনবধানবশতঃ জীব মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন। 'আমি কে?'—এ কথা সে জানে না, বিচার করে না। আপন শুদ্ধ-স্বরূপকে বিস্মৃত হয়ে সে ঘুমিয়ে আছে। এরই নাম মোহনিদ্রা। এই মোহনিদ্রা থেকে জাগাতে চাইছেন শ্রুতি। তাই বিশ্বের সকলকে সম্বোধন ক'রে বলছেন, 'আর ঘুমিয়ে থেকো না, জাগো—লক্ষ্য সম্বন্ধে চেতনা নিয়ে এসো, সজাগ হও; ওঠো—সকল শক্তি নিয়োজিত ক'রে, পুরুষকার প্রয়োগ ক'রে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও।'

শ্রুতির এই উপদেশের তাৎপর্য হ'ল: চলার পথে ঘুমিয়ে থেকে লাভ নেই। আমরা নিরাশ্রয়—এ জগৎ আমাদের প্রকৃত আশ্রয় নয়। এখানে শান্তি নেই। এখান থেকে যেতে হবে সবাইকে। সামনে পথ পড়ে রয়েছে সুদীর্ঘ। গন্তব্য স্থল বহু দূরে। যেমন কবি বলেছেন:

যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
(—গীতাঞ্জলি)

—'সকল পথই বাকি আছে', একথা যেন মনে থাকে। এ-কথা যেন জীবনের সর্বাবস্থায় 'বেদনা'-রূপে আমাদের মনে জাগে। আর বাস্তবিকই ভগবানের করুণার এই একটি অদ্ভুত দান যে, মানুষের হৃদয়ে তিনি অনন্ত 'বেদনা' দিয়ে রেখেছেন, যার নিবৃত্তি নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। মানুষ যদি মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয় - ভুল পথেও যায়, তবু তার অন্তরে নিহিত এই ভাগবতী

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

প্রেরণা তাকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে।

তারপর উপনিষদ বলছেন: 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' 'বর' মানে শ্রেষ্ঠ আচার্য। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে 'প্রাপ্য' অর্থাৎ পেয়ে—তাঁদের সমীপে গিয়ে, 'নিবোধত' অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করো—নিজের স্বরূপকে জানো। জেনে ধন্য হও, সার্থক-জীবন হও।

কিন্তু চলার পথটি যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সহজ মোটেই নয় বরং অতি দুর্গম, সেই কথাই উপনিষদ এর পরই বলছেন: 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' 'কবয়ঃ'—কবিরা, জ্ঞানীরা, যাঁরা এই পথে চ'লে তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তাঁরা 'বদন্তি'—বলেন, 'দুর্গং পথস্তৎ'—ঐ পথটি দুর্গম। কি রকম দুর্গম, তা উপমা দিয়ে বলছেন। শুধু যে কাঁটা-খোঁচা আছে, তা-ই নয়; যেন তীক্ষ্ণ ক্ষুর পাতা রয়েছে পথটিতে। 'ধারা' মানে অগ্রভাগ। ক্ষুরের 'নিশিতা'—তীক্ষ্ণীকৃতা—ধারা 'দুরত্যয়া' অর্থাৎ অতি দুঃখে অতিক্রমণীয়া। আত্মজ্ঞানলাভের পথও ঐরকম দুরতিক্রমণীয়—এই ব'লে শ্রুতি আমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন।

কেন এত দুর্গম এই পথ? এর কারণ এই যে, আত্মবিষয়ক যে অন্বেষণ, সে অন্বেষণের জন্য বীর-হৃদয়ের প্রয়োজন। যে মানুষ কাপুরুষ—সহজেই ভীত হয়, তার জন্যে এ পথ নয়। যাঁরা এই পথে চলবার ঈষন্মাত্রও প্রয়াস করেছেন অন্তরের সঙ্গে, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে এটি মর্মে মর্মে অনুভূত হয়েছে যে, এ পথ সহজ নয়। চলতে গিয়ে দেখা যায়, যতই আমরা মনকে সূক্ষ্মে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি, ততই সে কিছুতেই বাগ মানে না। তাকে সেদিকে নেওয়াই যায় না। কারণ, যে সব বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে অন্তরের নিবিড় যোগ রয়েছে, সহস্র বন্ধনে যারা অন্তরকে বেঁধে রেখেছে, তাদের নির্মমভাবে পরিত্যাগ না করলে অর্থাৎ তাদের প্রতি অন্তরের আসক্তি সমূলে উৎপাটিত না করলে এ-পথে মানুষ এগোতে পারে না। তাই এ-পথ অতি দুর্গম।

কিন্তু পথটি দুর্গম ব'লে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না, অবসন্ন হ'লে চলবে না, ভীত হ'লে চলবে না। সাহসের সঙ্গে সমস্ত বিপদকে স্বীকার ক'রে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে, অনেক দুঃসহ দুঃখকে বরণ করতে হবে—হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হবে, ভালবাসার বন্ধনগুলি নির্মমভাবে ছিন্ন করতে হবে, অন্তরের কত যে সূক্ষ্ম তন্ত্রী কাটা পড়বে তার ঠিকানা নেই—সবই সত্যি। তবু আশায় বুক বেঁধে লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হতে হবে।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য স্বামীজী তাঁর বহু বক্তৃতায় তুলে ধরেছেন। অতি প্রসিদ্ধ শ্লোক এটি—তাঁর অতি প্রিয়। বারংবার স্বামীজী বলেছেন, 'Arise, awake and stop not till the goal is reached.' 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—উপনিষদের এই কথাগুলির একটু পরিবর্তন ক'রে স্বামীজী বলেছেন, 'ওঠো, জাগো; যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছো, ততক্ষণ থেমো না।'

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই কথাগুলির মর্মার্থ স্বামীজী নানাভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বলেছেন বিশেষ জোর দিয়ে: তোমার ভেতরে আত্মার অনন্ত শক্তি নিহিত রয়েছে, তবু তুমি নিজেকে দুর্বল হীন পাপময় মনে করছো। এই দুঃস্বপ্নকে ভাঙো। একবার জেগে উঠলেই সেই অনন্ত শক্তির সন্ধান তুমি পাবে। এই nightmare-কে— এই দুঃস্বপ্নকে ভেঙ্গে সিংহ-

বিক্রমে তুমি এগিয়ে যাও লক্ষ্যের দিকে। স্বামীজী কত ক'রেই না এই সব কথা বলতেন! তাঁর এই ধরনের কথার ভেতর শ্রুতির প্রেরণা রয়েছে।

জীবনপথের পর্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নগুলিও যে কিছুই নয়—মায়ামাত্র, দুঃস্বপ্নেরই মতো, সুতরাং ভয় পাবার কিছু নেই— একথা স্বামীজী বারংবার বলেছেন। বলেছেন, ভীত না হয়ে যদি আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে সব বাধাবিঘ্নই দূর হয়ে যাবে।

রাজার ছেলে সুরক্ষিত প্রাসাদের ভেতর মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে। সে স্বপ্ন দেখছে, জঙ্গলের মধ্যে বাঘে তাকে তাড়া করেছে আর সে ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, কিন্তু বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচবার উপায় পাচ্ছে না। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে কেঁদে উঠছে। মা তখন তাকে জাগিয়ে দেন, বলেন—জাগো, এটা তোমার দুঃস্বপ্ন; সত্যি সত্যি কোন বাঘ জঙ্গলে তোমায় তাড়া করেনি, তুমি অসহায় নও; তোমার এসব স্বপ্নের ঘোরে কল্পনা; জাগো ওঠো, দেখো তুমি সুরক্ষিত প্রাসাদের ভেতর মায়ের স্নেহময় কোলেই শুয়ে রয়েছো; তোমার কোন ভয় নেই—কোন বাঘ নেই, যে তোমাকে আক্রমণ করতে পারে, কোন হিংস্র জন্তুর প্রবেশাধিকার নেই এখানে; তোমার ক্ষতি করতে পারে, এমন কিছুই নেই এখানে; তুমি জাগো, নিশ্চিন্ত হও।

ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতেই আর এমনিভাবেই অপারস্নেহময়ী শ্রুতি-জননী দুঃস্বপ্ন-সন্ত্রস্ত সন্তানদের জাগিয়ে দিচ্ছেন: 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।'*

* ২১ শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫, রবিবার প্রাতে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে কঠোপনিষদ ব্যাখ্যার কিয়দংশ। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত। - সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্থাণু ধর্মপরায়ণতা বনাম গতিশীল আধ্যাত্মিকতা

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও লোক-দেখানো ধর্ম পছন্দ করতেন না। আজকের ধর্মের বেশির ভাগই লোক-দেখানো। তাই স্বামী বিবেকানন্দ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'পৃথিবীর ধর্মগুলি প্রাণহীন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আমাদের যা চাই তা হল চরিত্র।' চরিত্রবল আমাদের যত বেশি হবে ধর্মলাভও হবে তত বেশি। লোক-দেখানো ধর্ম আদপে ধর্মই নয়। এরকম ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। তাঁর এই উক্তি আমরা পাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে: 'কানতুলসে লোকদের সম্বন্ধে সাবধান।' কানে তুলসীপাতা গুঁজে লোকে খুব সাধুপুরুষ বোলে ভান করে; পরমুহূর্তে তারা বাইরে গিয়ে লোক ঠকায় বা অন্য খারাপ কাজ করে। এ দু'-ই একসঙ্গে চলতে পারে এবং ভারতে তাই চলে এসেছে। কিন্তু সত্যিকার অধ্যাত্মসাধক কখনও এমন করবেন না। ভালবাসা দিয়ে, মানুষের প্রতি

হৃদয়ের দরদ দিয়ে, সেবার মনোভাব দিয়ে আপনার আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন দিন। এইটাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল উপদেশ। আমাদের সকল শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থসমূহেরও সারকথা হলো এই যে, আমরা যেন ধর্মকে জীবনে প্রতিফলিত করি, আমাদের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব আছে তাকে প্রস্ফুটিত করি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে 'মানুষের মধ্যে যে ভগবানের সত্তা আগে থাকতেই রয়েছে, তাকে প্রকাশ করাই ধর্ম।' যখন সেই সত্তার এমন কি সামান্যতম প্রকাশ হবে, তখন অপরের জন্যে চিন্তা আসবে, সেবার মনোবৃত্তি আসবে, কাজে নৈপুণ্য আসবে; অপরকে শোষণ করা, মামলা-মকদ্দমা করার মনোভাব, দুর্বলতা ভয় কর্মকুশলতার অভাব এসব জিনিস আর থাকবে না। আমরা খুব ভালবাসি ঝগড়া করতে, লড়াই করতে, মামলা করতে—আগেকার দিনে ইংরেজদের প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত, আর এখন আমাদের সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত, অতি তুচ্ছ ব্যাপারে লড়ে যেতে আমরা ভালবাসি। কেন? ঐ 'ধর্মের ঝালর দেওয়া সাংসারিকতা'র জন্যে—যথার্থ ধর্মের অভাবের জন্যে। সেই হিন্দুর পরিবর্তন দরকার। এক নতুন হিন্দু দেখা দিক যে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করবে এবং যে তার ঈশ্বর-প্রেমকে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও মানুষের সেবার ধারায় প্রবাহিত করবে। মন্দিরগুলির উদ্দেশ্য আপনাদের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। পূজায় ও ধ্যানে যা আপনারা লাভ করলেন, ভালবাসা ও সেবায় তা নিঃশেষে বিলিয়ে দিন। সেই আদর্শ ও আদর্শ-অনুযায়ী আচরণ না থাকলে, মন্দিরসমূহ, পূজা ও ক্রিয়া-কাণ্ড, যেগুলি আমাদের সনাতন ধর্মে নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে মূলত সুন্দর, তা সকল আধ্যাত্মিক মর্ম ও চরিত্রফল হারিয়ে ক্রমশ অর্থহীন ও গতিহীন ধর্মধ্বজী ক্রিয়াকলাপে পর্যবসিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি সপ্তশ্লোকীয় সমুজ্জ্বল মর্মার্থ হলো এই। আমাদের দেশবাসীগণের পক্ষে এ বিষয়টির অনুধাবন ও আত্তীকরণ আজ প্রয়োজন। তবেই মন্দির ও যাবতীয় পূজাপদ্ধতি যে সব ভক্তদের অবলম্বন, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য মধুর চারিত্র-ফলরাজি ও প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিকতা লাভ করতে সমর্থ হবেন। স্থাণু ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে গতিশীল আধ্যাত্মিকতার তুলনা ক'রে কপিলাবতাররূপে ভগবান তাঁর মাতা দেবহূতিকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন: (৩।২৯।২১-২৬)

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥

—আমি সর্বদা সকল জীবের অন্তরাত্মারূপে অবস্থান করি, কিন্তু মরণশীল মানব (মানবের অন্তর্নিহিত) সেই আমাকে অবজ্ঞা ক'রে মূর্তিতে আমার পূজার নিষ্ফল আড়ম্বর করে।

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানম্ ঈশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

—সকল প্রাণীতে বর্তমান, সকলের আত্মা ও ঈশ্বর—আমাকে মূঢ়ের মতো উপেক্ষা ক'রে যে ব্যক্তি বিগ্রহের মাধ্যমে আমার পূজা করে, তার পূজা (অগ্নির পরিবর্তে) ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো নিষ্ফল।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

—যে ব্যক্তি অহংকার ও (ভ্রান্ত) ভেদ-বুদ্ধির বশে অন্যজনের প্রতি বদ্ধমূল বৈরিতা আচরণ করে, সে বস্তুত পরদেহে অবস্থিত আমার প্রতি বৈরিতা করে,—তার মন কখনও শান্তিলাভ করে না।

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥

—হে অপাপবিদ্ধা, যে ব্যক্তি সকল প্রাণীকে অবমাননা করে, সে বিগ্রহের মধ্যে আমাকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উপচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা যে উপাসনা করে, তাতে আমি আদৌ তুষ্ট নই।

অর্চাদাবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥

—সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপন হৃদয়মধ্যে দর্শন করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্তই মানুষ স্বকর্মনিষ্ঠ হ'য়ে বিগ্রহমধ্যে ঈশ্বর-রূপী আমাকে অর্চনা করবে।

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥

—যে ব্যক্তি নিজের ও অপরের মধ্যে সামান্যমাত্রও পার্থক্য করে, মৃত্যুরূপী আমি সেই ভেদদর্শীর ঘোরতর ভয় বিধান করে থাকি (অর্থাৎ তার জন্মমৃত্যুর বন্ধন ঘোচে না)।

সেবার তত্ত্ব

এই ছ'টি শ্লোকের অব্যবহিত পরেই আর একটি শ্লোক আছে, যেটিকে স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে বিখ্যাত বাণীর শাস্ত্রীয় প্রেরণা বোলে মনে করা যেতে পারে। ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে এক বিশাল জনসমাবেশে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় ঐ শ্লোকটিকে :

'দাস-মনোভাব ছাড়িয়া দাও। আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন. অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে। তোমরা আধ-মাইল পথ হাঁটিতে পার না; হনুমানের মত সমুদ্র পার হইতে চাহিতেছ! তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতে পাবে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে—কর্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? একি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ, আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবেন! এ'ক তামাশা? এসব অর্থহীন বাজে কথা। আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা; ইহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ ও পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পর বিবাদ না করিয়া প্রথমেই এই স্বদেশবাসিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমরা নিজেদের ঘোর কুকর্মের ফলে কষ্ট পাইতেছ, এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না!'

এখন শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকটি শুনুন :

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

—অতএব সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা যে আমি, এবং যে আমি (তাদের মধ্যে আমার জন্যে) মন্দির নির্মাণ করেছি, সেই আমাকে পূজা করো, সর্বজীবের অনুভূত সকল অভাব দূর ক'রে এবং তা করার সময় তাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে, এবং (এসব কিছু করো) মৈত্রী ও সমদৃষ্টি নিয়ে।

ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র শিক্ষাকে এই শ্লোকটির টীকা বলা যেতে পারে।

শ্রীভগবান বলছেন, 'সকল জীবের মধ্যে আমার পূজা করো।' কিন্তু কী ক'রে?—ভক্ত প্রশ্ন করেন। প্রভু উত্তর দিচ্ছেন : 'দান-মানাভ্যাম্'—'দান' ও 'মান'-এর দ্বারা। 'মান' অর্থে সম্মান, সমাদর। অপরকে সম্মান প্রদর্শন

করো। সে গরিব হতে পারে, হতে পারে অজ্ঞ, তার আর্থিক পদমর্যাদা হয়তো নীচু, কিন্তু তাকে সম্মান দাও, কেননা 'আমি তার মধ্যে রয়েছি', প্রভু বলছেন। 'দান' মানে দেওয়া বা দত্ত বস্তু। সে যদি ক্ষুধার্ত হয়, অভাবগ্রস্ত হয়, তার খাদ্য ও জীবিকার সংস্থান করো। সে যদি অজ্ঞ হয়, তার শিক্ষার ব্যবস্থা করো। সে যদি নৈরাশ্যে মুহ্যমান হয়, তাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দাও; এবং মানুষ ও সকল প্রাণী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে অভাব বোধ করে তা দূর ক'রে 'আমাকে পূজা করো'—'মাম্ অর্হয়েৎ'। পূজকের মনোভাব কী হবে? 'মৈত্র্যা'—নিবিড় সৌহার্দের সঙ্গে। কী সুন্দর ভাব! কিন্তু এর পরের পদটি—শেষ পদটি—আরও সুন্দর: 'অভিন্নেন চক্ষুষা'—অভিন্নতার চোখে বা আলোকে। সকলেই মূলত এক। কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র; কেউ উচ্চশিক্ষিত, কেউ অজ্ঞ। এইসব পরিবর্তনশীল বহিরঙ্গগুলি দেখো না, দৃষ্টি নিবদ্ধ করো সকল প্রাণীর অভ্যন্তরস্থ অপরিবর্তনীয় অবিচ্ছেদ্য সত্যস্বরূপ আমার প্রতি; কারণ আভ্যন্তরিক দিক থেকে, আমি—এক ঈশ্বর—তাদের সকলের প্রকৃত সত্তারূপে বিরাজ করি। 'অভিন্নেন চক্ষুষা'র মানে এই—সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখা। বেদান্তে এই অভিন্ন-চক্ষু বা অভিন্নদৃষ্টি অতি শ্লাঘনীয়, এবং এর বিপরীত যে ভিন্নদৃষ্টি তা অসত্য, তাই নীতি-বিগর্হিত ও হানিকর বোলে নিন্দিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারতীয় সমাজে বহু শতাব্দী ধরে যা চলেছিল তা হলো এই 'ভিন্নদৃষ্টি'র নারকীয় খেলা—আপনি পৃথক্, আমি পৃথক্; আমি আপনার চেয়ে একশো টাকা বেশি মাইনে পাই; আমি ব্রাহ্মণ, আপনি হরিজন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর বেদান্তদর্শনের সাম্য ও মানবিক মর্যাদার এই মহাবাণী আবার আমাদের শেখানো হয়েছে। এক অদ্বিতীয় আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান—এই শিক্ষারই আজ ভারতের প্রয়োজন—বিশ্বের প্রয়োজন। এই মহাতত্ত্বটিকে যখন আমরা বাস্তবায়িত করতে পারবো, তখনই শুধু আমরা সক্ষম হবো আমাদের দেশে এক ঐক্যবদ্ধ সুসংহত সবল সৃজনশীল প্রগতিশীল ও মানবিকতা-মণ্ডিত জাতি গড়ে তুলতে। তখন—শুধু তখনই—ভারতের পরিপূর্ণ উন্নয়ন বাস্তবে পরিণত হবে।

তাই, গোড়াতে যেমন বলেছিলাম, এই আশ্রমের পটভূমিকায় আছে সুস্থ আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মহাতত্ত্ব—শোষণের পরিবর্তে সেবা, এমনকি সেবার পরিবর্তে পূজা। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের পূজার মধ্য দিয়ে আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি ঈশ্বরকে—যিনি সদাই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। এবং এভাবে যাঁদের সেবা আমরা করবো তাঁদেরও মধ্যে এই সৃজনধর্মী মনোভাবটি যেন আমরা উদ্দীপ্ত করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন 'কাঁচা আমি' আর 'পাকা আমি'-র কথা। এই সেবাকার্যের মধ্য দিয়েই 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি'তে পরিণত হবে। 'কাঁচা আমি'-র উদাহরণস্বরূপ তিনি বলতেন সেই 'আমি'র কথা, যে বলে: আমি ব্রাহ্মণ বা আমি চণ্ডাল, আমি হিন্দু বা আমি মুসলমান, আমি বিত্তবান শক্তিমান সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ: এই 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি'তে রূপান্তরিত করো। 'পাকা আমি' বলে: আমি সকলের সেবক, সকলের বন্ধু, ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের ভক্ত। এতোকাল তথাকথিত ধর্মপরায়ণতা আমাদের ছিল প্রচুর, আমাদের 'আমি'-টা ছিল 'কাঁচা'; তাই আমরা ভাল বিশেষ করতে পারিনি বরং মন্দ করে-

ছিলাম অনেক। শ্রীরামকৃষ্ণ এখন আমাদের আহ্বান করছেন, এই 'কাঁচা আমি'কে বিনাশ ক'রে 'পাকা আমি' গড়ে তুলতে। আধ্যাত্মিক হবার তাৎপর্য এই—মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক আয়তনের কিছুটা প্রকাশ করা। এই হলো আধ্যাত্মিক বিকাশ—আধ্যাত্মিক বিস্তার—আত্মবিকাশ, অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তিত্বে পরিণত করা—ব্যক্তিত্বকে আবার বিকশিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করা। কেবলমাত্র এই এক অনন্ত ধরনের বিকাশের সূচনা হলেই নরনারী দলবদ্ধ হয়ে অন্য নরনারীর সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে, পরস্পরের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া না ক'রে ও পরস্পরকে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও জাতিকে ধ্বংস না ক'রে কাজ করতে পারে।

সংসারে বাস করা বনাম সাংসারিকতা

মানুষের আত্মবিকাশের এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি উদাহরণ দেন: সংসারে বাস করো, তাতে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু সংসারকে তোমার মধ্যে বাস করতে দিও না। নৌকো জলে থাকবে, নৌকোর পক্ষে সেইটাই ঠিক জায়গা; কিন্তু নৌকোর মধ্যে জল থাকবে না। নৌকোর মধ্যে যদি জল ঢোকে তাহলে নৌকোটা কাজের অনুপযোগী হবে। সংসারে থাকা আর সংসারী মানুষ হওয়া এক কথা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণও সংসারে ছিলেন। ধর্মের অনুশাসন সংসারের বিরুদ্ধে নয়—সংসার-ভাবের, সাংসারিকতার বিরুদ্ধে। বস্তুত, আমাদের হিন্দুদের ভেতরে অত্যধিক 'সংসার' ছিল। সেইজন্যেই আমরা ঝগড়া করেছি, লড়াই করেছি, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছি এবং আমাদের সমাজকে শোষণ, দুর্নীতি ও হীনতম মানবিক বিকৃতির গহ্বরে পরিণত করেছি।

এখন আমাদের সুমহান শিক্ষাগুরুগণের প্রেরণায় এক নতুন ভারতবর্ষ জেগে উঠছে, যার সৃজনী ভাবধারা এবং প্রগতিশীল ও মানবিকতা-মণ্ডিত মনোবৃত্তিনিচয় ক্রমশ অধিকতরভাবে আমাদের চিন্তা, কর্ম ও আচরণকে প্রভাবিত করছে। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে, আমরা এমন চরিত্র গঠন করি যা হবে সমুদ্রের মতো গভীর এবং আকাশের মতো ব্যাপক; তিনি চেয়েছিলেন যে, আমরা আমাদের চরিত্রে ধর্মান্ধের বিশ্বাসের তীব্রতার সঙ্গে জড়বাদীর দৃষ্টির ব্যাপকতা সংযুক্ত করি

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের বাণী ঠিক এ-ই। রায়পুরে এই মহাপ্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে মানবতার বিকাশ ও উন্নতি সাধনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে রয়েছে নব ভারতের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের অন্যতম—ভিলাই ইস্পাত কারখানা, যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতীক। এবং এখানে—এই রায়পুরে—আমাদের রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির, যা কিনা আমাদের চিরাচরিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের গবেষণাগার। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে আমরা এই পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের একটা সমন্বয় করি; এবং আমাদের বেদান্তদর্শনকে এই সংশ্লেষণরূপেই উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই দুটি শক্তিসম্পদকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে তিনি আমাদের আহ্বান করেছিলেন।

জীবনই ধর্ম

এই রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ ধরনের ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির মতো নয়, যেখানে জীবন ও ধর্মের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই ব্যবধানের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন করতে এবং আমাদের এই শিক্ষা দিতে যে,

জীবনই ধর্ম। জীবনকে তার একত্বে বা পূর্ণত্বে দেখতে তিনি আমাদের আহ্বান করেছিলেন। এইটাই ভগবদ্গীতার 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'—যেখানে লক্ষ্যের একত্বের সঙ্গে আছে, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের একত্ব। সকল চরিত্রগঠনের এইটাই ভিত্তি। আজকের যুব-সম্প্রদায় দেখতে চান যে ধর্মের ভেতর চরিত্রের অভ্যুদয় হচ্ছে, তা না হলে তাঁরা ধর্ম বা ধার্মিক লোকেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন না। আপনারা যদি ধর্মের কথা বলেন কিন্তু চরিত্রে তা প্রতিফলিত না করেন, তাহলে ধর্মের প্রতি ও আপনাদের প্রতি যুবকদের কোন শ্রদ্ধা থাকবে না; ফলে তাঁরা অসূয়কভাবাপন্ন হয়ে পড়বেন। কিন্তু যখন আপনারা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে চরিত্রের নিদর্শন দেন, তখন তাঁরা শ্রদ্ধাবান হন। এবং কথাটা এখানে সত্য; বিদেশেও—আমেরিকা, ইউরোপেও—সত্য; সর্বত্র একথা সত্য। তাই সকল ধর্মের সামনেই এই 'চ্যালেঞ্জ'—সে ধর্ম কি চরিত্রের নিদর্শন দিতে পারে এবং দেয়? আপনারা যে খাদ্য আহার করেন তা যেমন আপনাদের শরীরের শক্তিতে প্রকাশ পাবে, তেমনি আপনারা যে ধর্ম সাধন করেন তাও ফুটে ওঠা চাই আপনাদের চরিত্রের আভ্যন্তর ঐশ্বর্যে, আপনাদের সেবার মনোভাবে, কার্যক্ষেত্রে আপনাদের কর্ম-নৈপুণ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল উপরি-উক্ত বাণীর সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে। এবং এ-প্রসঙ্গে তৃতীয় একজনের উল্লেখ আমি অবশ্যই করবো—তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবী, মা ভগবতী, যিনি ছিলেন সরল নিরভিমান এবং পবিত্রতা ভালবাসা ও করুণার প্রতিমূর্তি। এই আধ্যাত্মিক ত্রিমূর্তি আছেন রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পেছনে—যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো, শুধু ভারতকে নয়, তাবৎ বিশ্বকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রদীপ্ত ও তেজোদৃপ্ত করা। শ্রীরামকৃষ্ণের এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক তথা মানবিক আকর্ষণ আছে। আমি দেখেছি দেশে ও বিদেশে সর্বত্র মানুষ কীভাবে—অত্যন্ত আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা শুনতে চান।

১৯৬৮ সালের ২রা ডিসেম্বর ওটাওয়ার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ১৯৭৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর টোকিওতে ইনটারন্যাশনাল হাউসে আমার বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন করেছিলেন উদ্যোক্তারা—শ্রীরামকৃষ্ণ। বক্তৃতার পরে সভাকক্ষের পরিবেশ ছিল কী অপূর্ব! সকলেই তা অনুভব করেছিলেন এবং সেকথা প্রকাশ করেছিলেন। যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করা হয়, সে স্থান পবিত্রতাময় ও উদ্গতিসাধক হয়। এই সকল অভিজ্ঞতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সত্যতা উপলব্ধি করতে আমাকে সাহায্য করে। সেই মহাগ্রন্থ থেকে দুটি সুন্দর শ্লোক বলি (১।১।১৯ ও ১০।৩১।৯):

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

—নিরতিশয় প্রখ্যাত (শ্রীকৃষ্ণের) বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তিকাহিনী শুনে আমরা পরিতৃপ্ত হই না, কারণ রসজ্ঞগণ সে লীলাকথা শুনতে শুনতে তা অনুক্ষণ মধুর অপেক্ষাও মধুর বোলে মনে করেন।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

—সংসারসন্তপ্ত জনগণের প্রাণপ্রদ, জ্ঞানিগণ কর্তৃক স্তুত, পাপনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলকারক,

অতিশয় শান্তিদায়ক তোমার অমৃতরূপী কথা যাঁরা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন, তাঁরা মানুষের মধ্যে বদান্যতম।

কী সুন্দর ভাবাবেগ! শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা ও তাঁর সম্বন্ধে কথা তপ্তপ্রাণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায়—তাঁর জীবনকথা ও শ্রীমুখের কথা অমৃতস্বরূপ। পৃথিবীর সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ প্রত্যহ সেই মহাগ্রন্থ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত - থেকে দু'এক পৃষ্ঠা পাঠ করেন। এর রচয়িতা শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটি তাঁর গ্রন্থের সূত্ররূপে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : মানবিক অধ্যাত্মঐতিহ্যের মূর্তপ্রতীক

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সহজ সুন্দর স্তোত্রটি রচনা করেছেন, সেটি আবৃত্তি ক'রে এই বক্তৃতা শেষ করার চেয়ে আরো ভাল কিছু হতে পারে না। গতকাল আমরা এখানে মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মূর্তি স্থাপন করেছি। তাই যে সময়ে ও যে উপলক্ষে ঐ স্তবটি স্বামীজীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল তা সহজেই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। ১৮৯৭ সালে পশ্চিম থেকে স্বামী বিবেকানন্দের ফেরার এক বছর পরে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের এক গৃহী ভক্ত নবগোপাল ঘোষ হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে তাঁর নতুন বাড়ীতে একটি ছোট্ট ঠাকুরঘর করেছিলেন। তিনি ও তাঁর গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী সেই ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের প্রস্তাবে স্বামীজী রাজী হলেন এবং যথাসময়ে সদলবলে তাঁদের বাড়ীতে হাজির হলেন। মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ছোট ঘর। মার্বেল পাথরের মেজে। রামকৃষ্ণ-মূর্তির সামনে স্বামীজী পূজকের আসনে ব'সে ভক্তিভরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আবাহন করলেন। পূজান্তে এই শ্লোকটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর শ্রীমুখ থেকে উৎসারিত হলো :

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ

উপস্থিত সকলেই এই মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করলেন।

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আমাদের সকল কেন্দ্রে সন্ধ্যারতির সময় এই প্রণাম-মন্ত্রটি উদ্গীত হয়। এটির তাৎপর্য :

শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার করি, যে তুমি (ধরায়) অবতীর্ণ হয়েছিলে ধর্মসংস্থাপন করতে (তোমার নামাঙ্কিত কোন নতুন ধর্ম নয়, কিন্তু পৃথিবীর) সকল ধর্মের স্বরূপ হ'য়ে এবং যে তুমি (সেই কারণে) ঈশ্বরের সকল অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

উপসংহার

এই প্রণাম-মন্ত্রটি আধ্যাত্মিক গুরুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত চরিত্র পরিস্ফুট করে এবং এটি পৃথিবীতে তাঁর বিশেষ-কার্যের অনন্ত সম্ভাবনার দ্যোতক। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা স্থাপনের জন্যে তিনি এসেছিলেন : কিন্তু তাঁর নামধারী কোন নতুন ধর্ম নয়, রামকৃষ্ণধর্ম বা রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় নয়, না মোটেই ঐ ধরনের কোন কিছু নয় ; তিনি সর্বধর্মস্বরূপ সকল ধর্মের মূর্ত প্রতীক। তাঁর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ধর্ম যথার্থ অধ্যাত্মশক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে উন্নীত ও বিকশিত হবে। তাঁর সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিকতায় খৃষ্টান আরো ভালো খৃষ্টান হবে, মুসলমান হবে আরো উচ্চস্তরের মুসলমান, হিন্দু উন্নততর হিন্দু। তাই ভগবানের সত্তার এমন মহিমময় উদ্ভাসকে—সেই রামকৃষ্ণকে প্রণাম জানাই : 'অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।'

স্বামীজীর গানের খাতা

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

[আশ্বিন ১৩৮৩ সংখ্যার পর]

া—৩৯

[জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা।
জয় গোবর্দ্ধন চেতন শিলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ॥
চেতন যমুনা, চেতন রেণু।
গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ॥]

বৃন্দাবনী সারঙ্গ

ঢিমে তেতালা

মম মারে সাসা নিসরেসা নি্প্পা সারে মা-মমম গম রেরে সাসা
জয় বৃন্দা বন জয়নর লীলা জয় গোবর্দ্ধন চে—তন শিলা

রে মা রে সা সা নি সা ধা পা মম গ্মা গ্মারে সা সা
না রা আ য় ণ না-রা—য় ণ না—রা আ য় ণ

মা মম মমম গ্মা রেরে সা সা | —মমম সা-রে সা সা পা-নিনি—সাসা
চে-তন যমুনা চে তন রে ণু | গহন কু-ঞ্জ—ব ন ব্যা-পিত বে-ণু
নারা-য়ণ ঐ ঐ ঐ।

পৃষ্ঠা—৪০

[মন ক'রো না কাজে হেলা।
চলা নয় ধিকি ধিকি, এখন ঝিকি-মিকির বেলা ॥
তপন যায় বসতে পাটে, আর কি বিলম্ব খাটে,
সঙ্গী জোটে না জোটে একাই কর মেলা ॥
বাঁধ অনুরাগে কোমর ক'সে, চল আলোর সঙ্গে আলোর দেশে,
আনন্দে থাক্ রে ব'সে শমন এসে চুষবে কলা ॥]

বাউল

মা গ রে সা—র্সা-রে গ্মা পা সা সা-রে গ ম প্পা ধা নি প ধ্ নি ধ পা
মন্ ক রো না—কা-জে হে—লা | চ লা নয় ধি কি ধি কি এ খ ন্ ঝি কি
গমা গ রে সা—
মি কির বেলা—

সা ম ম্ম ম ম্ম ম প্মা—গা সারে গ গ'গ রে সা | নি নি নি সা সা—রে রে—
তপন্ যায় বস্‌তে পাঠে—আর্ কি বিলম্ব থাটে | স ঙ্গী যো টে না যো টে
ম ম্ম ম ম্ম গা—রে সা॥
একাই ক র মে— —লা॥

পা পা—ম পা ধ সা সা রে—রে—সা | সা সা সা রে গ´রে সা সা নিধা-পা
বাঁ ধ অ নু রা গে কোমর্ ক—সে | চ ল আলোর সঙ্গে আলোর দেশে—-
ধ ধ ধ পা—ধ ম পা—প ধ নি ধ প—ম ম গ রে সা॥
আ ন ন্দে থাক রে ব সে—শ ম ন্ এ সে চু ষ্ বে ক লা॥ কাজে হেলা॥

পৃষ্ঠা—৪১

[তাথৈয় তাথৈয় নাচে ভোলা, বব বং বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমুর বাজে, দুলিছে কপাল-মাল॥
গরজে গঙ্গা জটা-মাঝ, উগরে অনল ত্রিশূল-রাজ।
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলী-বন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥][১]

এই পৃষ্ঠায় স্বামীজী গানটি স্বরলিপিসহ রচনা করিয়াছেন—উহা বিস্তারিত বিবরণসহ উদ্বোধন পত্রিকার ৭৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় (পৃঃ ৪৫৭) প্রকাশিত হইয়াছে। গানটির রচনাকাল ফেব্রুআরি, ১০৮৭, সম্ভবতঃ ২১শে ফেব্রুআরি শিবরাত্রির দিন প্রভাতে অথবা তাহার দু-একদিন পূর্বে।[২]

---

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' এবং 'সঙ্গীত-কল্পতরু'তে গানটি পাওয়া যায়, সামান্য পরিবর্তিত আকারে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আছে (৪র্থ ভাগ, বরাহনগর মঠ): তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্ বাজে গাল। ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল। গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে। ধক্ ধক্ ধক্ মৌলি বন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥

সঙ্গীত কল্পতরুতে আছে (৩য় সং, পৃঃ ৫০২) : [ইংরাজি সুর একতালা।] তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা; বব বম্ বব বম্ বাজে গাল। ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে—/ দুলিছে কপাল মাল। গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে, ধক্ ধক্ ধক্ মৌলী বন্দ / জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥— [নরেন্দ্রনাথ দত্ত।]

২ এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি (উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫২)—স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতি-অনুযায়ী গানটি ১৮৮৬-র শিবরাত্রির দিন রচিত, মাষ্টার মহাশয় ১৮৮৭-র শিবরাত্রির দিনের কথায় লিখিতেছেন, গানটি 'নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, বরাহনগর মঠ, পৃঃ ২৯০)। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত অনুসরণ করিয়াছি; গানটি খাতায় লেখাও রহিয়াছে 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' এবং 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' গান দুটি যে সব পৃষ্ঠায় রচিত হইয়াছে তাহার অনেক পরের পৃষ্ঠায়।

এ প্রসঙ্গে কথামৃতে মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন: "মাষ্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা'। তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুজনেই নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।......আজ সোমবার শিবরাত্রি, ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৮৭।"

পৃষ্ঠা—৪২

তোমার সব কলে—কলে—তুমি কল দিয়ে সকল শিখালে (?)—
তোমার কলে চন্দ্র সূর্য্য তোমার কলে তারা জলে
কলে শুকন অচল জোগায় যে জল, তোমার
সাগর শুকায় তা না—হলে— ।

পৃষ্ঠা—৪৩

[হরি বোল্ বোল্ বোল্ রে মাধাই ।
মোদের নিতাই চৈতন্য বই আর গতি নাই ॥
রাধে গোবিন্দ জয় ।
(জয়) শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র জয় ॥
জয় শ্যাম জয় কিশোরীর জয় ॥]

মা ম্মা　গ্ মা　গ্ মা　গ্ মা　সারে গমা—গ ।
হ রি　বোল্　বোল্　বোল্　রে মা— —ধাই । ৩ ।

সা সা　নি সা　নি সা - নিসা　নি নি　ধাধধানী　পা ॥
হ রি　বোল　বোল্ বোল্　রে মা　ধা আআআ ই ॥ বোল ২ ॥ ॥

গ ম　মপা— পধ নিসা　সা—নি ধ পা　মম　গমপা　ম
মোদের　নিতাই　চৈ ———— ত　ন্য বই আর্ গতি　না—— ই

সা সা　সাসা　মা—ম্ম　গমা—গম　পাপ প-প　পপ-পপ　পধনির্ধ　6
রা ধে— এ গো　বি　ন্দ　জ য় ।　(জয়) শ্যাম সু ন্দ র ম দ ন মো—হন্
জয় রাধে গোবিন্দ জ-য় রাধে—

পা—ম　পা প　মা ম্ম　গ মা—॥　জয় শ্যাম্ জয়—কি-শো রীর্ জয় ॥
বৃ ন্দা　ব- ন　চ- ন্দ্র　জ য় ॥

পৃষ্ঠা—৪৪

[কোথা গো প্রেমময়ী রাধে রাধে ।
তুমি মহাভাব-প্রসবিনী, রাধে রাধে ॥
তুমি প্রেমদাতার শিরোমণি, রাধে রাধে ॥]

গ ম পা　ধ্ প ম গ　সা—সা—গা　সা গ মা—
কোথা গো　প্রে ম ম　য়ী　রা—ধে　রা- আ- ধে -

মপ ধধ ধধ স্া নি ধপ্ম গা—
তুমি মহা ভা-ব প্র—সবিনী রাধে রাধে।
তুমি প্রে-ম দাতার শি—রো মণি etc.

পৃষ্ঠা—৪৫

[বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্
প্রিয়ে চারুলোচনে মুঞ্চ ময়ি মানং নিদানম্।।[৩]
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনি
দেহি খরনয়নশরাঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥
রাধে ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনি॥][৪]

গারে সাসা সাসা সাসা সাসা মারে গারে সানি সারেগম গম—(পাম)
বদ সিয দিকি— ঞ্চি দপি দ—ন্ত রুচি কৌ——মুদী—
মমপা—র্ধপ মম গগগ গমপা—ম।
হরতি দর তিমি রমতি ঘো———রং। বদসি যদি etc.

মম পপপ পা—পপ পাধ্ র্নি র্নি র্নি র্নি পধনিধ পাম—
স্ফুর দধর সী—ধবে তব বদন চ——ন্ দ্র মা

সাসা ধনি ধাপম গমপ গমপা ম॥ সাসা সা-রে—সাসা
রোচ য়তি লোচন চ কো———রং॥ প্রিয়ে চা-রু লোচনে

ম-ম মগ মম গা-মপা-ম।গ-রে সাসা সাসা সাসা
মুঞ্চ ময়ি মানং নি দা—নং।স-ত্য মেবা— সি যদি

৩ মানমনিদানম্—'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্'
৪ গানটি স্বরলিপিসহ ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠা—দুই পৃষ্ঠায় আছে; এখানে একসঙ্গে দেওয়া হইল

পৃষ্ঠা— ৪৬

সা রে সা—নি নি সারেগমা—প ম্ম | মা-প মপধা—প
সু দ তি ম য়ি কো — — পি নি | দে হি মু খ — —র
ম ম সগ গ গ গ মপা—ম্ম ম ম পা ম প মা প্প প
ন য় ন শ রা—ঘা—— —তং | ঘ ট য় ভু জ ব—ন্ধ নং

প ধ নি নি ন্নি নি প ধ নি ধ পম মা - প ধা-প ম গ
জ ন য় য় দ থ——— গুনং | যে ন বা ভ ব তি

গ ম গমপা— ম | (নি নি) নি সা রে—সা সা সা—সা সা সা সা রেগ গগ
সু খ জা- —তং | রা ধে ত্ব ম সি ম ম ভূ ষ ণং ত্ব ম সি মম

সা রে গ রে সা নি | ধ ধ নি সা সা—নি সা রে রে সা—র্নী সা
জী———·ব নং | ত্ব ম সি ম ম ভ ব জ ল ধি র—ত্নং—

সা সা রে সা রে গ গ রে রে রে ম ম ম ম | সা রে গ মা রে সা
ভ ব তু ভ ব তী হ ম য়ি স ত ত ম নু | রো — — — ধি নি

পৃষ্ঠা- ৪৭

[চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালি
মাধব হে।
কেলি চলন মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী ॥]

ধা—ধ ধ নী নি ন্নি ধা প ধ নি সা—সা সসা—
চ ন্দ ন চ র্চ্চি ত নী ল ক লে — ব র

নী ধা ধা—প্প ম গ সা রে গা ম—গা— প প ম প ধ নি
পী — ত ব স ন ব ন মা লি মা— ধ ব হে— —
ধ প ম ॥

কে-লি চলন মণি কুণ্ডল মণ্ডিত — গণ্ডযুগস্মিতশালী =

পৃষ্ঠা - ৪৮

[মগ চলত কান মন আটকী
দহিবে যো বন যাত
গুঞ্জরিয়া ঝপটী ছীন মটকী পটকী ॥]

পরজ

রে সা নি ধ ধ ধ পা মা প ধা নি নি সা—ধ ধ নি সা—মা মা নি সা রে রে

মার্স ম গ চ ল ত কা-ন ম ন আ ট কী—। দহি বে যো— ব ন যা— — —ত

সা—নি নি সা— সা গ গ রে´·সা নি নি সা— নি ধ পা—

গহলনি) গু ঞ্জ রি য়া ঝ প টী ছী ন ম ট কী প ট কী (মগ etc.)

সাহানা

(এখানে জায়গা ফাঁকা আছে, কোন গান লেখা নাই।)

পৃষ্ঠা—৪৯

সুখময়-সাগর—মরুভূমি—ভে-ল
জলদ নেহা—রি চাতকী—মরি গে—ল
শ্যাম নব—জলধরে—বারি কইরে কইরে (?)
হরি গের মধুপুরে সই—হাম কুল বা—লা—
বিপথে পড়লো—যে সে মা—লতী মা—লা
নয়নকো নিন্দ গেলো—বয়ানকো হাঁস্‌
সুখ গেয় পিয়া—সঙ্গ দুঃখ হম পা—শ

পৃষ্ঠা—৫০

দুর্মতি* (?) কিল কো-কিল কুল উজ্জ্বল (?) কলনা—দং—
জৈমিনিরিতি ২ জল্পতি সবিষাদং –
নীল নলিন মাল্য মহহ বীক্ষ্য পুলক বী—তা –
গরুড় ২ গরুড়েত্যেতি রৌতি পরম ভী—তা—
মা – ধব তব ঘো—র বিরহে-- নিপতিতা অতি রা—ধা--

পৃষ্ঠা—৫১

চিন্‌বো—কেমনে—হে তোমা—য়, ওহে বন্ধুয়া [য়]—
ভুলে—আছ মথুরায় হে—
হাতি চড়া—জোড়াপরা—ভুলেছ—কি ধেনু—চরা—
ব্রজের মাখম্‌ চুরি—করা—মনে কিছু—হয়—
আমরা ব্রজের ব্রজবাসী--গো—প বে—শ ভাল বাসি—
রাজবে—শ দেখে—হরি--, মনে হাঁসি—পা – য়—হে—

* 'দুর্দান্ত'-ও হইতে পারে।

পৃষ্ঠা - ৫২

রাধার্ প্রে - ম্ কি পায়্ সকলে -
রাধার্ ব্যথা কি পায়্ সকলে -
যুবতী সকলে- শিশু লয়ে কোলে,
আয়্ চাঁদ্ আয়্ ডাকে কুতূহলে -
শিশু তায় ভোলে—
চাঁদ্ কি তায়্ ভোলে -
গগন ছেড়ে চাঁদ্ কি—উদয়্ হয় ভূতলে।

পৃষ্ঠা—৫৩

যদি গোকুল চ—ন্দ্র ব্রজে না এলো—
আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে
শঙ্খের কুণ্ডল প—রি,
আমি যোগিনী—র্ বেশে, যাব সেই দেশে—
যথা নিঠুর হ—রি—।
আমি মথুরা নগরে- প্রতি ঘরে—২, খুঁজিব যোগিনী হো—এ
যদি কো—ন ঘরে মিলে প্রা - ণ বঁধু—, বাঁধিব আঁচল দি—য়ে—

পৃষ্ঠা—৫৪

আমি আপন বঁধুয়া—আপনি বাঁধিব
রাখিতে নারিবে কেউ রে—
যদি রাখে কেউ—ত্যজিব এই জিউ নারিবধ দিব তা—রে—

পৃষ্ঠা—৫৫

কোন ধনি জ- ল আনি দেও—লো বদনে—
সাসা গাগা ম—ম রেসা
কোন ধনি—শ্যাম না—ম শুনাও—শ্রবণে—
রে রে

শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে—, ধনি ইতি—উতি চা—য়্
সম্মুখে—তমাল হেরি—ধরিবারে ধা—য়
বলে বঁধু হোথায়—কেন—, অভাগিনী—র্ প্রাণ বঁধু
পরের মত হো থা-য় কেন—। বলে এসো ও বধু এসো
আধ—আচলে—বসো । নয়নো—ভরিয়ে—দেখি
আরো মান্ হবে না—হে—দেখি—

পৃষ্ঠা—৫৬

রাধা না - থ না হইলে—রাধার মা—ন্ কি সাজে—
বলে সখি একি হলো—, অভাগিনীর্ করম্ দোষে—
শ্যাম না হয়ে—তমা—ল হলো—।

।—৫৭

একরূপ সুর[৬]

তাঁরে´ আ-রতি করে—চ—ন্দ্র তপন—দে-ব মানব
বন্দে—চরণ—। আ—সীন সেই ´বিশ্ব শরণ—
তাঁ—র জগত ম—ন্দিরে (তাঁরে etc.)—।
অসীম কা- ল অন—ন্ত গগ—নঅ, সে—ই মহিমা—[৭]
মহিমা—মগন—। তাহে তর—ঙ্গ উঠে সঘ—নঅ
অ´ানন্দ নন্দ নন্দ রে।

পৃষ্ঠা—৫৮

হাতে লয়ে ছ´য়্ ঋতুর ডা—লি—দেয়—ধরা—
কত কুসুম ডা—লি, কতই—গ-ন্ধ—কতই বরণ—
কত সুখ কত শান্তি রে—।
বিহগ গী—ত গগন ছা য়অ্, জলদ গা—য়অ্ জলধি গায়অ্
মহা—প´বন হরষে ধা- য় ; গা—য়অ গিরি কন্দরে (তারে etc.)

পৃষ্ঠা—৫৯

[বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি প্রাণের প্রাণ।
কতই কৃপা বরষিছে,
প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেম সমীরে,
(মেরে) দুঃখ তাপ সকলি হয় অবসান,
সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান॥][৮]

---

৬ 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' গানটির মতো সুর। স্বামীজীর গানের খাতা, পৃঃ ২০)।

৭ অসীম।

৮ গানটি স্বরলিপি সহ ৫৯ পৃষ্ঠা ও ৬০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। এখানে একসঙ্গে দেওয়া হইল। এই গানটিও স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গাহিয়া শুনাইয়াছেন।

মেঘ ধ্রুপদ

\+　১　২　+　১　২
বি-শ্ব ভু ব ন র ঞ্জন ব্র-হ্ম পরম জ্যো-ও-তি।
মা-গ গগমম পা-ম+ সা-ধ ধপপ ম প—ম

\+　১　২।+　+　১　২
অ না দি দে—ব জ গ প তি প্রা—র্আ—ণে-র্ প্রা আ আ আ ণ
মা মা রে রে-রে সা রে সা সস সা মা মা—ম্মা ম প ম পা ম

\+
ক ত ই কৃ পা ব র ষি ছে
ম প র্নি নি সা সা সা সা সা

\+　+
প্রা আ ণ জু ড়া—য় সু ম ধু—র প্রে—ম স মী ই রে
নি সা রে রে র্মা সা নিসা ধ—প সা—ধ প ম প ম

(মেরে) দুঃ খ তা—প স ক লি হ য় অ ব সা আ আ আ আ আ র্আ আ ন্
ম ম গ্ ম রে রে রে রে সাসা সা সা রে মা মা পা ম প ম ধ নি

পৃষ্ঠা—৬০

স বা-কা র তু মি হে পি তা—বন্ধু মা র্আ তা, অ ন ন্ত লো—ক ক রে ত ব
ম মা রে রে সা রে সা সা সাসা—ধপ ম প ম—মমারে রে-রে সারে সাসা
প্রে এ মা মৃত পা আ আ র্আ ন | কতই কৃপা বরষিছে etc.
সা ম ম্মা মম ম প ম ধা প |

পৃষ্ঠা—৬১

। ২ । সীতাপতি রাম*

ধন্য ধন্য ধন্য আ—জি দিন আন—ন্দ কা—রী -
সবে মিলি—তব সত্য ধ—র্ম ভারতে—প্র—চারি—
গগনে গগনে তোমারি ধা—ম দিশি দিশি দিশি তব পুণ্য না—ম
ভ-ক্ত জন সমা—জ আ—জ স্তুতি করে—তোমা—রি
নাহি চাহি প্রভু ধন জন্ মা—ন্ না—হি আ—ছে অন্য কা—ম্
প্রার্থনা করে তোমা—র আ—কুল নর না—রী—॥

স্বামীজীর গানের খাতার একদিক হইতে লেখা গান, স্বরলিপিসহ গান, স্বরগ্রাম প্রভৃতি এইখানেই শেষ। ইহার পর সাদা পৃষ্ঠা।

খাতাটির অপর দিক হইতে লেখাগুলি মাঘ সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।　[ক্রমশঃ]

---

* "সীতাপতি রামচন্দ্র" গানটির মতো সুর

শত শত নাম

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কবে শুনিলাম কথা!—আর সেই কত নাম!
শ্রবণে নয়নে মনে জাগে ক্ষণে ক্ষণে শত শত নাম!
স্বজন-বান্ধব নয়—নাহি জানি কারো জন্ম-তিরোধান
দেশ-জাতি-ধাম।
সন্ধ্যা-তারকার মতো ফুটিয়াছে একে একে অনন্ত বিস্ময়
দেশকালহীন মনের আকাশ-ভরা অপূর্ব সঞ্চয়!

নিবেদিতা—ধীরামাতা—জো জো. ও ক্রিস্টীন
হেল-কন্যা-পিতা-মাতা—অমর গুডউইন!
রাইট-ড'সন-স্টার্ডি—রোমাঁ রোলাঁ—পুণ্যনাম সেভিয়র
সায়ন-আচার্য যেন শ্রীমোক্ষমূলর!
কোন্ প্রীতি কোন্ সাধ কোন্ যোগক্ষেম—
পরশ মণির স্পর্শ সবারে করিল সোনা—নিকষিত হেম!

মেরী লুই বার্ক—হ্যানগু এরিক, কতো আরো অনামিক—
চাহে কেহ ভক্তি, কেহ মুক্তি—কেহ দার্শনিক!
জ্বলিছে ঝলিছে আলো জ্যোতির্ময় করি দশ দিক!
দেশ দেশ এক করি জ্বলে শত শত নাম
হাতে চিত্তদীপ
মাগিছে শরণ, রাখে উদ্দেশে প্রণাম।

হেরি পিছনে সমুখে জ্বলে আরো জীবন-প্রদীপ
অগণন আরো জাগে নাম—
হের হের সব যেন প্রত্যক্ষ প্রণাম!

দয়াময়ী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নেই কোনো গুণ আমার জানি, নেবে না কি তবুও টানি'
পায়ে আমায়—তুমি ছাড়া কে বলো আর আমার আছে?
তাই শুধু গাই চোখের জলে : "শরণ দিও চরণতলে
অকৃতী সন্তানে তোমার—মা বিনা কি শিশু বাঁচে?"

জানতে আমার নেই মা বাকি— তুমি ছাড়া সবই ফাঁকি.
বেসুর লাগে সুরেও যদি বাঁশি তোমার মা না বাজে।
"আমার আমার' ক'রে কেন কাঁদন কাঁদি তবুও হেন?
"সবই তোমার"—সাধি যেন এই ধুয়াই আজ, হৃদয় যাচে।

থেকো না মা তাই দূরে আর, আজ ক'রে নাও আমায় তোমার,
ক্লান্ত আমি, সন্ধ্যাবেলা টেনে নাও ঐ বুকের মাঝে।
যে যা বলে বলুক না মা, তুমি যদি হাসো শ্যামা—
ব্যথাও হবে প্রার্থনা মা, তোমার বরে প্রতি কাজে।

নেই যে কিছুই সম্বল আমার— জানি মা, চাই তাই তো কৃপার
পাখায় তোমার পেরিয়ে আকাশ উড়ে যেতে তোমার কাছে।
নাই বা হলাম আমি ধনী, তুমি যখন পরশমণি—
তোমার ছোঁওয়ায় মরুর বুকেও জাগবে সোনার ফোয়ারা যে!

নিবেদন

শ্রীমতী শিবানী মুখোপাধ্যায়

আলো দাও মোরে আলো দাও
হে মহাশকতি, করি গো মিনতি
আলো দাও মোরে আলো দাও।

জীবন-আঁধারে ঘুরি বারে বারে
মরীচিকা মোরে দিশাহারা করে
জগৎকারণ করি গো স্মরণ
সাড়া দাও ওগো সাড়া দাও।

মরমের বাণী শুনি বারেবার
তুমি চির-প্রিয় আমা সবাকার
শরণ দাও হে চরণে তোমার
কাছে নাও মোরে কাছে নাও।

ফিরিয়া যাইব যবে

শ্রীশ্যামবরণ চৌধুরী

একা আসি মোরা একা চলে যাই
আপন বলিতে কেহ কারো নাই—
কত তো শুনেছি, তবু শোনা সার!
একথা বুঝিব কবে?

আঁখি মুদি' মোরা মেতেছি খেলায়
ধন জন লয়ে; সবই চলে যায়—
ভুলেও ভাবিনা খেলা শেষ হলে
একাই ফিরিতে হবে।

সময় থাকিতে খুলায়ে নয়ন
তোমার কথাই করাও স্মরণ
যাতে পাই চির-আপন তোমারে
ফিরিয়া যাইব যবে।

'অমৃতত্বমিচ্ছন্'

শ্রীসুনীলচন্দ্র পালিত

আমি যে বেসেছি ভাল সুন্দর ভুবন,
সুদুর্লভ এ ধরার মানব-জীবন,
মনের বিচিত্র যত মধুর ব্যঞ্জনা,
সুখ-দুঃখ যেথা আঁকে কত আলপনা।
এ আকাশ, এ বাতাস, কুসুম-সুবাস,
মানুষের দুঃখজয়ী আনন্দ-আশ্বাস,
জীবনের পথে ফোটা যত ভাবরাশি
মনের গোপনে ঝরা যত কান্নাহাসি—
সবি লাগে ভাল মোর, সবি মনোহর,
তবু বিদায়ের সুরে কাঁপে যে অন্তর—
ভাবিতে পারি না কভু, আমি আর নাই।
ব্যাকুল হইয়া আমি খুঁজিতেছি তাই—
বিনশ্বর এ জীবনে খুঁজিতেছি তাঁরে
যিনি নিত্য, চির সত্য আমারি মাঝারে।

আর্তি

শ্রীমতী মানসী বরাট

প্রভাত গেল, কাটলো সাঁঝও
মার্জনা তো হয়নি আজও
হৃদয়-আঙিনা।
এলো যে তোর পূজার লগন
বল্ দেখি ঐ রাতুল চরণ
কোথায় রাখি মা?

নাই আয়োজন, নাই উপচার,
নাই মা জানা মন্ত্র পূজার,
তাই বলে মা হয়ে—
এসেও কিগো যাবি ফিরে,
ভাসিয়ে আমায় নয়ন-নীরে,
লগন যাবে বয়ে!

নাটকপ্রসঙ্গে

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী*

নাটককে সাহিত্যের একটি বিশেষ ভঙ্গিমা বলা চলে। এই ভঙ্গিমা কাব্য এবং উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কবিতা হইতেছে কবি-মনের বিচিত্র প্রকাশ। তাহার রস ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য কবিকে অথবা পাঠককে আর কাহারও উপস্থিতিকে কল্পনা করিতে হয় না। উপন্যাসেও তাহাই। লেখক তাঁহার কল্পনা বা সৃষ্ট চরিত্রের সার্থকতার জন্য নিজের মনকে অনেকখানি উদ্ঘাটিত করিতে পারেন কিন্তু নাটকে এই ধরনের Subjectivity-র স্থান নাই। দৃশ্য কাব্য বলিয়াই নাটককে হইতে হইবে বিশুদ্ধরূপে Objective. কাব্য ও উপন্যাসে থাকে ভাবের ও ঘটনার বিবৃতি আর থাকে বর্ণনা। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এই সকলের কোন অবকাশ নাই। তাহার মধ্যে থাকা প্রয়োজন কথা ও কাজের সাহায্যে বাস্তব ঘটনার অনুবৃত্তি বা অনুসরণ। নাটকের ধর্ম হইতেছে অভিনেতার সাহায্যে নাটকে বর্ণিত কথা ও চরিত্রকে পূর্ণতর করিয়া দর্শকের দৃষ্টি ও মনের অনুভবের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। নাটক উপন্যাসের ন্যায় 'a personal impression of life' মাত্র নয়, নাটককে বলা যাইতে পারে 'an impersonal representation of life'.

নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে আমাদেরই জীবন-নাট্যের দৃশ্যগুলিকে রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতার সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত রস দর্শক-সমাজে পরিস্ফুট করা। সেইজন্য সাহিত্যের এই বিশেষ ভঙ্গিমা অভিনেতা, অভিনয়-মঞ্চ ও দর্শকের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। শুধু পুস্তকের মধ্যে তাহার সমস্ত কথা ও ঘটনার বিবৃতি পাঠ করিয়া নাট্যরসের উপলব্ধি কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। নাটকের এই বিশেষ ভঙ্গিমা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত, ইউরোপীয় পুরাতন গ্রীক নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কালাবধি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। নাট্যরীতির আদর্শ দেশে দেশে কালে কালে পরিবর্তিত হইয়াছে—সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের কালিদাস, ভবভূতির নাটক, গ্রীসের এ্যাটিক্ ট্র্যাজেডি, ইংলণ্ডের ক্লাসিক ট্র্যাজেডি অথবা তাহার পরবর্তী কালেও রোমান্টিক যুগের নাটকগুলি পর্যন্ত নাটকের এই মূল সূত্রটিকে কেহই অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যে নাটকের মধ্যে এক নূতন রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। Romantic revival-এর ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যে Wordsworth, Shelley, Bodlair, Poe প্রভৃতি মনীষিগণের মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতিকে একটি অপরূপ, অবাস্তব রহস্যের দিক্ হইতে—ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় symbolical or mystical দিক্, সেই দিক্ হইতে জানিবার ও বুঝিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রয়াস সর্বাপেক্ষা অধিক ফুটিয়াছে নাটকে, কবিতায়

* এম. এ., সাহিত্যবিশারদ। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়া দেবী কলেজ ; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ। গ্রন্থকার।

ও ছোটগল্পে। তাহার ফলে মেটারলিঙ্ক, স্ট্রাণ্ডবার্গ, ইয়েটস্, অণ্ডে-এর রূপক-নাটকগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

রূপকের আবার দুইটি রূপ—একটি allegorical, অপরটি symbolical; কোন একটি ভাবকে, বিশেষ করিয়া নীতি-উপদেশমূলক ভাবকে আখ্যানের সাহায্যে রূপ দেওয়াই allegory-র কাজ। কিন্তু symbolic বা সাঙ্কেতিক রচনায় কোন বিশেষ মতবাদকে রূপ দেওয়া হয় না। ইহার লক্ষ্য হইল একটি অতীন্দ্রিয় রহস্যময় জগৎ—যাহার সহিত স্পর্শ-গন্ধ-শব্দাত্মক জগতের কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা হইতেছে অপার্থিব, অশরীরী ও অনন্ত এবং বস্তুজগতের নিকট দুর্জ্ঞেয়। প্রেম ভক্তি করুণা সৌন্দর্যবোধ ক্রোধ লোভ ভয় প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে, তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের পিপাসা যে রসকে জাগায় তাহার ধারণা তেমন স্পষ্ট কখনই সম্ভব নহে। ইহার কারণ, এই বিশেষ অনুভূতিটি কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না। সেইজন্য তাহাকে প্রকাশ করা সহজ হয় না। সে ক্ষেত্রে symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়। অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইশারায় সেই রসকে আভাসিত করিতে হয়। এই যে রূপের সাহায্যে রূপাতীতের সঙ্কেত, ইহাই symbolism. কিন্তু এই symbolism-এর মধ্যে রূপক বা allegory-রও একটু স্থান আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে যে জগৎ আছে, মেটারলিঙ্কের 'ব্লুবার্ড' নাটকে তাহাকেই প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু শিশু দুইটি যখন পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সত্যের সন্ধানে বাহির হইল, তখন তাহাদের সহিত রহিল একটি আলো। এই আলো জ্ঞানের প্রতীক। এখানে সাঙ্কেতিক বা symbolic রচনার মধ্যে রূপক বা allegory আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্যই অনেকে symbolic বা সাঙ্কেতিক নাটককে রূপক-নাটক বলিয়া অভিহিত করেন।

কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটকে রূপকের স্পর্শ থাকিলেও অরূপ বা অসীমের সন্ধানই তাহার প্রধান লক্ষ্য। এই শ্রেণীর নাটকের মূল সুর হইল অজানার প্রতি একটি অনির্দেশ্য ইঙ্গিত বা ইশারা, মানবচিত্তকে একটা অনির্বচনীয় অস্পষ্ট ও অব্যক্ত তত্ত্বের আভাসে উচ্চকিত করিয়া তোলা। সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে অনন্ত রহস্যময়তা—পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু, তাহারই পরিচয়ে রহিয়াছে একটি অজানা অব্যক্তের ইঙ্গিত। এই রহস্যময়তা, এই অজ্ঞেয়তা—'the wait of this unintelligible world',—কোন একটি আঙ্গিক, ইংরাজীতে যাহাকে বলে form, তাহার মধ্য দিয়া আমাদের চিত্তে জাগাইয়া তুলিবার জন্যই রূপক-নাটকের সৃষ্টি। এই নাটকগুলি কেবলমাত্র নিছক জীবনচিত্র নয়—ইহাদের সার্থকতা হইতেছে জীবনার্থের শিল্পে অথবা তত্ত্বার্থের শিল্পরূপে। সুতরাং symbolic নাটকের শিল্প-সমাধানের লক্ষণই হইতেছে intellectuality বা জ্ঞানময়তা। ইহা সর্বত্র আলম্বন ও উদ্দীপনকে অস্পষ্ট করিয়া যাহা সিদ্ধ করে, তাহা একটি বোধায়নী বা জ্ঞানময়তা প্রাপ্তি মাত্র। তাত্ত্বিকতা বা শিল্পে ভাবরসকে গৌণ করিয়া একটি দার্শনিক উপলব্ধিকে ইহা জাগ্রত করিয়া তোলে। Symbolic নাটকের ইহা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

রূপক-নাটক lyric বা গীতি-কবিতার মত অনেকটা সঙ্গীতধর্মী—সঙ্গীতের ন্যায় ইহা অনেকটা eventless বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতশূন্য। ইহার মধ্যে কোন ঘটনা নাই, ঘাত-প্রতিঘাত নাই, জীবনের বহিরঙ্গে কিছু তার চিত্তব্যাপ্তি বা সহানুভূতি নাই। সঙ্গীতের ন্যায়ই

উহার মধ্যে আছে একটি অব্যক্ত ও অরূপের ব্যঞ্জনা, অনির্বচনীয় রূপের ইঙ্গিত। অজানাকে জানিবার ও বুঝিবার জন্য মানুষের মনে যে একটি চিরন্তন ব্যাকুলতা জাগ্রত হইয়া আছে, তাহাকেই একটি প্রতীকের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা হইতেছে মোটামুটিভাবে symbolic বা সাঙ্কেতিক নাটকের উদ্দেশ্য।

Symbolic নাটকের আদি সৃষ্টি যদিও ইউরোপেই হইয়াছে, তবুও symbolism বা প্রতীকধর্মিতা আমাদের দেশে নূতন নহে বা অপরিচিত নহে। ইহা আমাদের নিজস্ব সম্পদ। হিন্দু সংস্কৃতির সমস্ত মর্মকে উদ্ঘাটন করিয়া এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম আচার-অনুষ্ঠান সব কিছুই তো ভাবের বিগ্রহ, আগাগোড়া ভাব-মণ্ডিত! হিন্দু একথা কোন দিনই বলে না যে, ভাবকে কোন দিন জানিয়া, বুঝিয়া, ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্যই সে চিহ্ন মানে, বিগ্রহ মানে। রূপকে চোখের সামনে রাখিয়া রূপাতীতের ধ্যানই হইতেছে হিন্দুর মূর্তিপূজার আন্তর-রহস্য। উপনিষদ বলিতেছেন, 'একোঽহং বহু স্যাম্'। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রহিয়াছে সেই অনন্ত পুরুষের লীলাবৈচিত্র্য; সীমাবদ্ধ প্রতি রূপের মধ্যেই রহিয়াছে সেই অরূপের রূপের প্রতিচ্ছায়া।

বৈষ্ণব সাহিত্যে আসিয়া এই symbolism আরো প্রত্যক্ষ, আরো স্পষ্ট হইয়াছে। রাধা-রূপী মানবাত্মা সংসারের বাধা নিষেধে আবদ্ধ, কিন্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্ম সেই আবদ্ধ আত্মাকে মুক্ত হইবার জন্য প্রতি নিয়তই বাঁশীর সুরে অসীম প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন—সেই সুমিষ্ট অথচ সুনির্মম সুরই মানবাত্মাকে অনন্ত অভিসারের পথে যাত্রা করিবার জন্য টানিয়া বাহির করিয়া আনিতেছে। কোথায় সেই পরম প্রেমিক, সেই চিরন্তন প্রেমাস্পদ! তাঁহারই অন্বেষণে যুগে যুগে মহামানবের দল অনন্ত পথের পথিক হইবার জন্য পার্থিব জড় বস্তুর সর্ব সুখ, সর্ব আনন্দ মাটির ঢেলার মত ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন।

ভারতীয় symbolism-এর এই বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথের রূপক-সৃষ্টির মধ্য দিয়া অপূর্ব সার্থকতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যগুলি পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে রচিত হইলেও তাঁহার symbolism-এর সহিত মেটারলিঙ্ক, ভার্লেন, স্ট্রাণ্ডবার্গ ও ইয়েটস্ প্রভৃতির symbolism-এর প্রভেদ অনেকখানি। মেটারলিঙ্ক প্রমুখ symbolist-রা বলেন, আমাদের জীবন অনন্ত রহস্যময়, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি জানিনা, কোথায় যাইব তাহাও আমাদের জানা নাই—অনন্তকাল ধরিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি, অনন্তকাল ধরিয়া চলিব—আমাদের জীবন এই মহাপথ-যাত্রার প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জীবনের চারিপাশে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে যে মহারহস্যের ঘনঘোর অন্ধকার, জীবন-প্রদীপের ম্লান আলোকে তাহারই রহস্যময়তা আরো ঘনঘোর ও নিবিড় হইয়া উঠে মাত্র—"It is that light which makes darkness more visible." জীবনের কোন অর্থ, কোন সত্যই বাস্তবিকপক্ষে আমরা জানিতে পারি না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারাও ধরিতে পারি না—তাই নিখিল সৃষ্টি আমাদের চক্ষে এক অজ্ঞেয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আমাদের জীবনে আছে অতীতের জের, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, বর্তমানের অবিচ্ছিন্নতা—শুধু এই জীবন ঘিরিয়া রহিয়াছে এক উদ্দেশ্যবিহীন ধাবমানতা। সৃষ্টির আদি কি, ইহার অন্তই বা কোথায়—ইহা

আমরা কোনদিনই জানিতে পারি নাই। সুতরাং রহস্যময়তাই এই অনাদি অনন্ত সৃষ্টির একমাত্র সত্য—কিন্তু এই যে রহস্য ইহাকেও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাই ইঙ্গিতের দ্বারা, ব্যঞ্জনার দ্বারা এই রহস্যময়তার সুরটিকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই শিল্পের চরম সার্থকতা। কাজেই ইউরোপীয় symbolism-কে আমরা mystification নাম দিতে পারি—ইহাকে mysticism বলা চলে না। ইউরোপীয় symbolism-এর অন্তর্ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক Symson বলিয়াছেন—

"The doctrine of mysticism with which all the mystical literature has so much to do, presents us not with a guide for conduct, nor with a plan for our happiness, nor with an explanation of mystery, but with a theory of life which makes us familiar with mystery." Mysticism-এর অর্থ যদি infinite বা অসীমকে প্রকাশ করা বোঝায় ও romanticism অর্থে যদি বুঝি indefinite বা অজানাকে প্রকাশ করা, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্য symbolist-দের symbolism-কে an extreme form of romanticism বলিলে অন্যায় বা অযৌক্তিক হইবে না—mysticism তাহাকে বলা চলে না।

বাংলা সাহিত্যে mysticism-এর সাক্ষাৎ আমরা পাইলাম রবীন্দ্রনাথে আসিয়া। পাশ্চাত্ত্য symbolist-রা সংশয়বাদী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদী। রবীন্দ্রনাথও সৃষ্টির মধ্যে দেখিয়াছেন একটি অজ্ঞেয়তা, একটি রহস্যময় আবরণ। সুদূরের প্রতি একটি অজানা আকর্ষণ প্রতিনিয়তই তিনি নিজের মনে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই romanticism বা অজানার আকর্ষণই তাঁহাকে একটি চরম সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়াছে—জীবনের কোন একটি শুভ মুহূর্তে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এই অজ্ঞেয়তা, এই রহস্যময়তার অন্তরালে রহিয়াছে এক অদ্বিতীয় অনন্ত সম্ভাবনাময় সত্তা—এই অনন্ত বা অসীম সত্তাই সৃষ্টির মধ্য দিয়া আপনাকে অজস্র ধারায় সেই অনাদিকাল হইতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেকটি খণ্ড রূপের মধ্যে সেই অখণ্ড অনন্তের পরিচয় রহিয়াছে বলিয়াই তাহা এত রহস্যময়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টি তাঁহার অন্তর-চেতনায় এই অনুভব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথ romanticism-এর মধ্য দিয়া mysticism এ উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু মেটারলিঙ্কের Sightless অথবা Blue Bird-এর শিল্প-প্রণালী বুঝিতে গেলেই মনে হয় কোন দিকে কোন স্থিরতা নাই। স্থায়ী ভাব বা স্থায়ী রস এই symbolic আদর্শের বিরোধী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে প্রণালী ধরিয়া মোটামুটি একটা অর্থসিদ্ধি, তত্ত্বসিদ্ধি এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ভাবের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্ত্য symbolism-এর বিরোধী। কিন্তু ইহাই ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার সর্বোত্তম আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় আদর্শেরই পূজারী। উপনিষদের সুন্দরসে পুষ্ট হইয়া তিনি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে symbolism-কে নূতন বেশে আবিষ্কার করিয়াছেন—এইখানেই তাঁহার স্বকীয়তা।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে ডাকঘর, রাজা ও রক্তকরবীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এই ধরনের নাটক বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন হইলেও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' প্রভৃতি রূপক কবিতার সহিত 'ডাকঘর' ও 'রাজা' নাটক দুইটির একটি সুন্দর মিল দেখা যায়। ইহাদের মূল ভাব এক, কেবল রূপ স্বতন্ত্র।

'সোনার তরী' অপরূপের দ্যোতক—কোন বিশেষ রূপের নয়। এই অপরূপের ব্যঞ্জনাই 'ডাকঘরে'র ভাষা, চরিত্র ও দৃশ্য-পরিকল্পনার মধ্য দিয়া এমন একটি মায়াময় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহার মাধুর্যে মন অভিভূত না হইয়া পারে না। কবির সমগ্র জীবনদর্শনকে যেন আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে 'ডাকঘরে'র মধ্যে দেখিতে পাই। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে সুরু করিয়া 'গীতালি','গীতাঞ্জলির' যুগ পর্যন্ত কবির জীবনের যে বিশিষ্ট ভাবধারা ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া একটি চরম পরিণতিতে গিয়া স্থির হইয়াছে, 'ডাকঘরে'র পটভূমিকায় কবি যেন তাহারই ছবি আঁকিয়াছেন কয়েকটি মাত্র সূক্ষ্ম রঙের রেখায়। কবি প্রথম জীবনে ছিলেন romantic, কিন্তু ক্রমে তিনি mystic হইয়া উঠিয়াছেন—সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই যে romantic-ধর্মিতা হইতে mystic-ধর্মিতায় পরিণতি, ইহাই 'ডাকঘরে'র মূল সুর বলিয়া মনে হয়।

'ডাকঘরে'র পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সরল। মাধব দত্ত সংসারী ব্যক্তি—সে তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছে। বালকটি রুগ্ন—শরৎকালের রৌদ্র ও বাতাস তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া কবিরাজ মাধব দত্তকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যেন তাহাকে বাহিরের আবহাওয়ায় আনা না হয়। মাধব দত্ত কবিরাজের নির্দেশমত অসুস্থ অমলকে পরম যত্নে রুদ্ধ ঘরের পাঁচিলের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বালক অমলের সৌন্দর্যমুগ্ধ কল্পনাপীড়িত চিত্ত বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল—বাহিরের পৃথিবীতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু সংসাররূপী মাধব দত্ত ও শাস্ত্রানুশাসনরূপী কবিরাজ তাহার সুদূরপ্রসারী চিত্তকে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধিয়া রাখিতে চায়। অমলের মন বাহির হইতে না পারায় ব্যথায় ছটফট করে। সে তাহার ঘরের জানালার নিকট বসিয়া থাকে—দূরে পাহাড়ের তলদেশে ঝর্ণা, ঝর্ণাতলায় ডুমুর গাছ—জানালার সম্মুখে রাজপথ। ফিরিওয়ালা সুর করিয়া সেই পথে ফিরি করিয়া যায়, রাজার প্রহরী মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। ঐ দূর বন, ঐ পাহাড়, ঝর্ণা, ঐ ফিরিওয়ালার সুর এবং ঘণ্টার ধ্বনি অমলকে আনমনা করিয়া দেয়। কোন সুদূরের ডাক তাহার মনে আসিয়া অনুরণিত হয়! ঐ সুদূরের জন্য যখন তাহার শিশু-হৃদয়টি ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন হঠাৎ একদিন তাহার নজরে পড়ে তাহাদের বাড়ীর সুমুখেই রহিয়াছে ডাকঘর—রাজার ডাকঘর। ডাকঘরের সন্ধান পাইয়া অমলের মন সুদূরের আকাঙ্ক্ষায় আর চঞ্চল হইয়া উঠে না; তখন কেবলমাত্র একটি ইচ্ছা, একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা তাহার সমস্ত জীবনে একান্ত হইয়া উঠে—রাজার চিঠি চাই—তাঁহার শুভাগমন বার্তা লইয়া কবে তাহা আসিবে? রাজার চিঠির জন্য অমল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। মোড়লের নিষ্ঠুর পরিহাসে মনে সংশয় জাগে, কিন্তু ঠাকুরদার আশ্বাস ও নির্ভরতায় মধ্যে সংশয় কাটিয়া যায়—বিশ্বাস আবার দৃঢ় হইয়া উঠে। অবশেষে একদিন ঐ অবিশ্বাসী মোড়লের হাত দিয়াই রাজা তাঁহার অক্ষরশূন্য চিঠি পাঠান। সে চিঠি পড়িয়া অমল জানিতে পারে রাজা তাহার কাছে আসিতেছেন। অর্ধরাত্রে সে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহার পর রাজদূত ও রাজবৈদ্যের আগমন ও অমলের চিরসুপ্তি—ইহাই মোটামুটিভাবে নাটকটির আখ্যান-ভাগ।

এই আখ্যানের আবরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তর-পিপাসাকে রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু এই রূপক আখ্যানটির আবরণ এমনই সুকুমার, এমনই স্বচ্ছ যে, সে আবরণ সরাইয়া নাটকের মূল ভাবটিকে দেখিয়া লওয়া কিছুমাত্র কঠিন নহে। অমল সহজ ও সংস্কার-বিহীন মানবাত্মার প্রতীক, লোকধর্মের শৃঙ্খল হইতে সে মুক্তিপিপাসী। কবিরাজ আমাদের লৌকিকতা, সমাজ-ধর্ম ও বিধিব্যবস্থার প্রতিনিধি—একটা বাঁধাধরা পথের পথিকমাত্র। মাধব দত্ত আমাদের সংস্কার ও বাসনারূপী সংসার—যাহা পদে পদে লৌকিক ধর্মের অনুশাসনে আমাদের মুক্ত আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। অমলের ন্যায় আমাদের সৌন্দর্যপিপাসু মন বিশ্বের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু সংসাররূপী মাধব দত্ত ও শাস্ত্রানুশাসনরূপী কবিরাজের দল আমাদের চিত্তকে সংসারের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে চায়; বিধিনিষেধ ও স্নেহের অত্যাচারে আমাদের করিয়া তোলে রুগ্ন ও পঙ্গু। আমরা সহজ মনে বাহির হইতে চাই। কিন্তু আমাদের অন্তরে বাহিরে জড়াইয়া আছে নানা বাধা—সাংসারিক বাধা, সামাজিক বাধা। কিন্তু বদ্ধ ঘরেও সেই সুদূরের আহ্বান আসিয়া পৌছায়—অভিসারের বাঁশী বাজিয়া ওঠে:

> "ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে
> বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
> কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
> সে কথা যাই যে পাশরি।"

দূরে আকাশছোঁয়া পাহাড়ের চূড়া, নাগরাজুতা-পরিহিত বাঁশের লাঠিটি স্কন্ধে লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রী পথিক, ডুমুর গাছের তলা দিয়া বহিয়া-যাওয়া ঝর্ণা প্রভৃতির দৃশ্য যখন অমলের মনে সুদূরের আহ্বান বহন করিয়া আনে, তখন অভ্যস্ততম, পরিচিততম বস্তুগুলিও তাহার নিকট পরম বিস্ময়কর হইয়া উঠে। দৃষ্টি দিয়া যে সৌন্দর্যকে আমরা দেখি তাহাই সবখানি নয়, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি অজানা অব্যক্তের ইঙ্গিত। দধিবিক্রেতা পথ দিয়া বিচিত্র সুরে হাঁকিয়া যাইতেছে, সে একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন একক মানুষ নয়, তাহার চারিদিকে কত দূরদূরান্তরের সৌন্দর্য ঘিরিয়া আছে—সেই পাঁচ-মাথাওয়ালা পাহাড়ের নিম্নদেশের সৌন্দর্য, সেই শামলী নদীর প্রবহমান সৌন্দর্য, সেখানকার লাল মাটির পথটি, অভ্রভেদিগাছগুলির ছায়া, পাহাড়ের গায়ে যে গরুগুলি চরিতেছে, তাহাদের সৌন্দর্য্য, গোপবধূরা লাল শাড়ী পরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই দৃশ্যের সৌন্দর্য, সেই গ্রামখানির কত স্নেহ প্রেম মাধুর্য—এই সমস্তই সেই দধিবিক্রেতাকে বেষ্টন করিয়া আছে—তাই সে এত রমণীয়। তাই তাহার ফেরির সুরটিকে এত সকরুণ বলিয়া মনে হয়—বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মাহাত্ম্যই নাই—সার্থকতাও নাই।

তেমনি অমলের জানালার সুমুখের পথটি—তাহারও রহস্য ঐখানেই। ঐখানে সে বহুদূরের যাত্রীকে ক্ষণিকের মত একবার একটি জায়গায় দাঁড় করাইয়া অনন্ত প্রবাহের একটিমাত্র পরিপূর্ণ মুহূর্তের ছবিখানি দেখিয়া লইতেছে। আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা তো ক্রমাগতই আমাদের আয়ত্তের বাহিরে সরিয়া যাইতেছে। আমরা তাহার আদিও জানি না, অন্তও জানি না—জানি শুধু তাহার খণ্ড একটু-খানি কালের কথা। সেই খণ্ড কালের যেটুকু দেখিতেছি, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া যদি আমরা আঁকড়াইয়া ধরি, তাহা হইলে তাহাকে আমরা হারাই। তাহার যথার্থ স্বরূপকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যদি সেই খণ্ড

কালের খণ্ড বস্তুর উপর তাহার অনাদি অতীত ও অখণ্ড ভবিষ্যতের একটি আলো ফেলিয়া সেই খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডের পরিচয় পাই, তাহা হইলেই সেই বস্তু আশ্চর্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এই পর্যন্ত কবি রোমান্টিক —"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" সুদূরের বাঁশীর আহ্বান তাঁহার মর্মস্থলে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে—সঙ্গীত-মাধুর্যে তিনি মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণকে সেই সুর আকুল করিয়া তুলিয়াছে। ঐ বাঁশীর আহ্বানে মনে পূর্বরাগের উদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কে বাঁশী বাজাইতেছে? কোথা হইতে বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, তাহার কোন সন্ধানই তাঁহার জানা নাই। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা ও নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কালের প্রহরী ঘণ্টা বাজাইতেছে ঢং ঢং ঢং। জীবনস্রোত তো বহিয়া চলিল, কিন্তু তাহার পরিণতির সন্ধান মিলিল কই! এই ব্যাকুলতার, এই চঞ্চলতার মধ্যে সহসা একদিন চোখে পড়িল 'রাজার ডাকঘর'—এই বিশ্বসৃষ্টিটিই তো সেই বিধাতা-পুরুষের ডাকঘর—পৃথিবীর প্রতিটি খণ্ড সৌন্দর্যই সেই পরিপূর্ণ অখণ্ড সৌন্দর্যের আহ্বানলিপি বহন করিয়া আনে।

এই যে অখণ্ড সৌন্দর্যের লিপি, তাহার বাহ্যিক কোন নিদর্শন নাই। সে লিপি আমাদের একান্ত আশা ও নির্ভরতার মধ্য দিয়াই আসিয়া পৌঁছায়। ডাকঘরের সন্ধান পাইয়া অবধি অমলের মন আর বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করে না। ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতেই এখন তাহার ভাল লাগে— "একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছুবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশী হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি।" এইরূপে কবির জীবনও আধ্যাত্মিক জীবনে মিলিয়া যায়,—তখন ঐ একটিমাত্র ইচ্ছা সমস্ত প্রাণ জুড়িয়া বাজে—তাঁর চিঠি চাই, তিনি কবে আসবেন? এইখানেই সমস্ত বিচিত্রতার অবসান, সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা।

কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংশয় যায় না। অবিশ্বাসী মোড়লের নিষ্ঠুর পরিহাস মনে সংশয় জাগাইয়া তোলে। এই মোড়লটি হইলেন দার্শনিক বুদ্ধিজীবী লোকদের প্রতিনিধি। কিন্তু বুদ্ধিই মানুষের শেষ সম্বল নয়। অধ্যাত্ম প্রকৃতির গভীরতার পরিমাপ করিতে আমাদের বুদ্ধি একেবারেই অক্ষম। বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি —আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমগ্রতা তাহার মধ্যে নাই। কাজেই আধ্যাত্মিক সত্যকে সকল সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বুঝা যায় না। বুদ্ধির উপরে আছে intuition বা সহজ প্রত্যয়। বুদ্ধি যেখানে নাগাল পায় না, সেখানে এই intuition বা সহজ প্রত্যয়ের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া যাহা ধরা যায় না, তাহা অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের নিকট হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়। রাজা যে অমলের মত ছেলেমানুষের কাছে আসিতে পারেন একথা মোড়লজাতীয় বুদ্ধিজীবী লোকেরা বিশ্বাস করে না। তাহারা জানে যে, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞানী গুণী ও বড় বড় মানুষকেই দেখা দেন। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অংশটিতেও যে স্রষ্টার প্রয়োজন আছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সীমার মধ্য দিয়াই যে তিনি নিজেকে উপভোগ করিতেছেন, ইহা কি মোড়লজাতীয় বুদ্ধিজীবীরা বুঝিতে পারে! বিন্দুকে না পাইলে সিন্ধুর অস্তিত্বই বা কোথায় থাকিত? নিজের অনন্ত প্রেম-সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অমলের মত ক্ষুদ্র বালককেও তাঁহার প্রয়োজন। তিনি তো কোন্ অনাদিকাল হইতে তাহাকে পত্র প্রেরণ করিতেছেন, কতবার সেই লিপির

আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে তাহা কি মোড়লজাতীয় বুদ্ধিজীবীরা জানে? না, মাধব দত্তের ন্যায় ঘোর সংসারীরা জানে? একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এই বার্তাটুকু জানেন তিনি ঠাকুরদা।

'শারদোৎসব' নাটক হইতে এই ঠাকুরদাকে কবির প্রয়োজন হইয়াছে। এই ঠাকুরদাই হইতেছেন একটি মুক্তপ্রাণ আনন্দময় পুরুষ। পরিপূর্ণ আনন্দকে জানেন বলিয়াই তিনি বালকের ক্রীড়াসহচর ও বন্ধু। কবির কল্পনা-গুলিকে সমর্থন করিবার জন্য ঠাকুরদার চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। 'সোনার তরী', 'ক্রৌঞ্চ দ্বীপ', 'হালকা দেশ' প্রভৃতি অবাস্তব সৌন্দর্যলোক যে সত্যসত্যই আমাদের অন্তরে আছে ঠাকুরদার ন্যায় মুক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছাড়া সে কথার সাক্ষ্য আর কে দিবে? সহজ পথে সহজ প্রেমের মধ্যেই যে ভগবানের আহ্বান-লিপি পাওয়া যায়, সে ভরসাই বা ঠাকুরদা ব্যতীত আর কাহার কাছে পাওয়া যাইবে? ঠাকুরদা বলিতেছেন—"শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে।" কিন্তু কবে?

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে!"

অমল বলিতেছে "তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা' মনে পড়ে না···আমি দেখতে পাচ্ছি রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন, কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্ণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে···আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে—সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে···যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।" এই যে চিঠি ইহা সাধারণ চিঠি নহে। এই চিঠি সেই চিঠি যাহা বলে আমি তোমাকে বড় আদর করিয়া আমার এই আহ্বান-লিপি পাঠালাম— তুমি আমার, তোমাতে আমার আনন্দ আছে।

এই চিঠি পাওয়ার ভরসার উপর নাটকের পরিণামে আসা গিয়াছে। এই পরিণাম মৃত্যুর ভিতর দিয়া পরিপূর্ণতা-লাভ। "আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হ'য়ে আসছে··· কথা কইতে আর ইচ্ছা করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না?" এইখানে নাট্যকার পরিপূর্ণরূপে mystic হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা নিশ্চয়ই আসিবেন—খবর পাওয়া গেল—এখন শুধু তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা।

তাহার পর রাজদূতের প্রবেশ ও রাজ-কবিরাজের আগমন। দ্বার ভাঙিয়া গেল, প্রদীপ নিভিয়া গেল; ঘরের দরজা জানালা এক নিমিষে খুলিয়া গেল। অর্ধ রাত্রে রাজা আসিবেন শোনা গেল। অমল স্থির করিল সে রাজার নিকট হইতে তাঁহার ডাকহরকরার কাজটি প্রার্থনা করিবে। বাস্তবিকই কবি কি সেই কাজই করেন না? শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো তাঁহার সর্বপ্রধান কাজ। মাধব দত্ত-রূপী সংসার ভগবানের নিকট সুখ, সমৃদ্ধি প্রভৃতি প্রার্থনা করে, কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের রাজাকে সকলের কাছে বহন করিয়া আনাই কবির একমাত্র কামনা ও লক্ষ্য।

ইহার পর আকাশের তারার আলোয় একটি স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে অমলের মৃত্যু হইল। কিন্তু কবিরাজ তাহাকে মৃত্যু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, বলিয়াছেন ঘুম—"এল, এল, ওর

ঘুম এল।" এবং রাজা আসিয়া ডাকিলেই অমলের ঘুম ভাঙিবে—এ আশ্বাসও দিয়াছেন। এই ঘুম ও জাগরণের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখনও এ জীবনের পরিসমাপ্তি ভাবিতে পারেন নাই। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করি—একথা কবি বহুবার বলিয়াছেন। মৃত্যু তো জীবনের একটি সীমারেখা মাত্র—সে সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করিলেই আমরা অসীমের সাক্ষাৎ পাইতে পারি—

"সে এলে সব আগল যাবে টুটে
সে এলে সব বাঁধন যাবে ছুটে।"

মৃত্যু কবির নিকট ছেদ নহে—তাহা পরিপূর্ণতা।

এ পর্যন্ত নাটকের বালিকা-চরিত্র—সুধা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয় নাই। এই চরিত্রটিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন আছে। সুধাকে কবি কিসের প্রতীক হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন সুধাকে কবি সৃষ্টি করিয়াছেন as a relief এবং 'ডাকঘরে'র সাংকেতিকতা সুধার আবির্ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা সুধার মধ্যে অবশ্যই একটি অনস্বীকার্য ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ যতই সুদূরসন্ধানী হউন না কেন, পৃথিবীর এই সুখ-দুঃখময় প্রেম-মাধুর্যকে তিনি কোনদিনই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। মা ধরণী অপার স্নেহে প্রতি তৃণখণ্ডকে বক্ষে ধরিয়া রাখিতে চান—"তৃণ ক্ষুদ্র অতি তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী কহিছেন প্রাণপণে যেতে নাহি দিব।" অমঙ্গলভয়ে বাহিরের শত আকর্ষণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্নেহাস্পদকে একান্ত স্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরার যে সুমধুর মোহ তাহারই প্রতিমূর্তি সুধা। অমলের রুদ্ধ ঘরের যে আধখানা দ্বার খোলা ছিল, সুধা তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এত মায়া, এত স্নেহ সত্ত্বেও তো পৃথিবীতে কাহাকেও চিরদিন ধরিয়া রাখা যায় না—"হায় তবু যেতে দিতে হয়—তবু চলে যায়।" কিন্তু চলিয়া গেলেও স্নেহের এই ক্ষণিক মোহটুকু পৃথিবীর বুকে চিরন্তন হইয়া থাকে—"(ও যখন জাগবে তখন) বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলেনি।" এই ধরণীর শোভা, ইহার প্রীতি, ইহার আনন্দ, ইহার বেদনা কবি-চিত্তকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে, ইহাদের বাদ দিয়া কবি তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনেও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। নাটকের অতি অল্প স্থানই সুধা অধিকার করিয়াছে—কিন্তু নাটকের পরিণামে এই সুধার কাহিনীই যেন আমাদের নিকট প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের শেষে যে বস্তুটি আমাদের চিত্তকে সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ করে, তাহা বিশেষ কোন তত্ত্ব নহে, কোন সঙ্কেত নহে, তাহা স্নেহ-মাধুর্য-পরিপূর্ণ সুধার শেষ কথাটি—"বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলেনি।" কবি-জীবনের একটি গভীর অনুভূতি এইভাবে সুধা-রূপকের মধ্য দিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যার ৪৩২ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ১৪শ পঙ্‌ক্তিতে 'মহারাজ' স্থলে 'সমর মহারাজ' পড়িতে হইবে।—বর্তমান সঃ

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ

আবেদন

আগামী ৫ই জানুআরি ১৯৭৭ হইতে ৫ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। এই মেলায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং বিদেশ হইতেও বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এই সব তীর্থযাত্রীদের জন্য চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে হয়।

সমবেত তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (এলাহাবাদ) মেলাপ্রাঙ্গণে একটি অবৈতনিক বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাকেন্দ্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলিবেন। ইহার জন্য আনুমানিক ১,০০,০০০·০০ টাকা প্রয়োজন।

এই জনহিতকর কার্যে অকুণ্ঠ সাহায্যদানের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এলাহাবাদ সেবাশ্রম আবেদন জানাইতেছেন। আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্য নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলিতে সাদরে ও সকৃতজ্ঞহৃদয়ে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে :

১। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ—২১১০০৩

২। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ,
(হাওড়া) ৭১১২০২, (পঃ বঃ)

'RAMAKRISHNA MISSION SEVASHRAMA, ALLAHABAD'—এই নামে চেক লিখিবেন ; ক্রস্‌ড্ চেক দিবেন, এবং অবশ্যই রেজিস্ট্রি করিয়া পাঠাইবেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য এলাহাবাদ সেবাশ্রমের সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

২১শে অক্টোবর, ১৯৭৬

স্বামী বীতভয়ানন্দ
সেক্রেটারী,
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,
মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ—২১১০০৩

সমালোচনা

যেমন শুনিয়াছি, তৃতীয় ভাগ (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর উপদেশ): স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। প্রকাশক: শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলানগর, পোঃ অভয়নগর, হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৯৩, মূল্য পনের টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের নাম ও কার্যাবলী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে পরিচিত কোনো ব্যক্তির নিকটই অজানা নয়। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'তুই অরূপের ঘরে উঠেছিস', 'ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান',

'নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেরকম তুইও পারবি' ইত্যাদি। পরবর্তী কালে ঠাকুরের এই সকল উক্তির সার্থক রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত-ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এবং অসংখ্য নরনারীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। বাগ্মী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী এবং তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনাও করেছিলেন। লেখক এই গ্রন্থের প্রারম্ভে অভেদানন্দজীর যে ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য দিয়েছেন, তার অব্যবহিত পরবর্তী পরিচ্ছেদে তেত্রিশখানা গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন। কলকাতায় ও দার্জিলিং-এ বেদান্ত মঠ-প্রতিষ্ঠা অভেদানন্দজীর অন্যতম কীর্তি।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ অভেদানন্দজী মহারাজের সেবক ও শিষ্যরূপে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর অমূল্য কথোপকথনের অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটি মূলতঃ অভেদানন্দ স্বামীর বিভিন্ন দিনের নানা মূল্যবান উক্তির সংকলন এবং এই সকল উক্তি থেকে তাঁর যে ভাবময় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। তাছাড়া এতে তাঁর কিছু ভাষণ, রচনা ও পত্রের অংশও সংকলন করা হয়েছে। পরিশেষে সংযোজিত হয়েছে অভেদানন্দ-রচিত অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত স্তবমালা এবং তাঁরই কৃত ঐগুলির বঙ্গানুবাদ। তাছাড়া অভেদানন্দজী যেসব প্রাচীন স্তবস্তোত্রাদি আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন, সেগুলিও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের কয়েকখানি সুন্দর আলোকচিত্র গ্রন্থটির শোভাবর্ধন করেছে।

গ্রন্থটির কয়েকটি ত্রুটিও লক্ষণীয়। প্রথমতঃ গ্রন্থ-প্রণেতা স্বামী অভেদানন্দজীর রচনা ও ও উক্তিগুলির কালানুক্রমিক বিন্যাস করেননি। বিন্যাসের জন্য অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কিনা সন্দেহ। গ্রন্থের মধ্যে তাঁর নিজের একক এবং অন্যান্যের সহিত তোলা কয়েকটি আলোকচিত্রের (যার মধ্যে তিনটি আবার রঙীন) সংযোজন বিসদৃশ ব'লে মনে হয়। এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সুদীর্ঘ সাতপৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনার এবং 'মহা-জীবন' নামক অন্য একটি গ্রন্থেরও অনুরূপ সাত-পৃষ্ঠাব্যাপী উৎকলনও মাত্রাতিরিক্ত, এমন কি নিরর্থক ব'লেও মনে হয়। এই চৌদ্দটি পৃষ্ঠা এবং দামী কাগজে ছাপা উল্লিখিত ছবিগুলি বাদ দিলে গ্রন্থটির মূল্য পনের টাকার কম করা সম্ভব হত।

বলা বাহুল্য উল্লিখিত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও স্বামী অভেদানন্দজীর তথা শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীর জীবনালোকের প্রতিফলন হিসাবে গ্রন্থটির অশেষ মূল্য অনস্বীকার্য আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা গত ১৩ই আশ্বিন হইতে দিবসত্রয় মহাসমারোহে যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আবহাওয়া ভাল থাকায় প্রচুর জনসমাগম হয়। পূজার তিন দিন প্রত্যহ হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয় এবং মহাষ্টমীর দিন প্রায় ৩০,০০০ ব্যক্তি প্রসাদ পান।

গত বৎসরের ন্যায় এইবারেও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নোক্ত ২২টি কেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

আসানসোল বালিয়াটি বোম্বাই কাঁথি ঢাকা গৌহাটি জলপাইগুড়ি জামসেদপুর জয়রামবাটী কামারপুকুর করিমগঞ্জ লখ্নৌ মালদহ মেদিনীপুর নারায়ণগঞ্জ পাটনা রহড়া শেলা (চেরাপুঞ্জি) শিলং শিলচর শ্রীহট্ট ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, **স্বামী জিতেন্দ্রানন্দ** (যতীন মহারাজ) গত ২৭শে আশ্বিন রাত্রি ১-১০ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য-হেতু ৬২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেবক ছিলেন। বেলুড় মঠ ব্যতীত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান, বৃন্দাবন সেবাশ্রম, কাশী সেবাশ্রম ও লখ্নউ সেবাশ্রমের কর্মিরূপেও তিনি সংঘসেবা করেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ-জয়ন্তী

আগড়তলা বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল শাখাকেন্দ্র কর্তৃক গত ১৪ই ফেব্রুআরি ১৯৭৬ স্থানীয় শিশু উদ্যানে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় কুড়ি হাজারেরও বেশী লোক সমবেত হন। স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং জনসাধারণ, এমন কি নিকটস্থ গ্রামের আদিবাসীরাও বর্ণাঢ্য গীতবাদ্য-মুখরিত শোভাযাত্রায় যোগ দেন। ধর্মসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী, বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শাখার সভ্যগণ মহামণ্ডলের সংঘগীতি এবং স্থানীয় মহিলা কলেজের ছাত্রীবৃন্দ গীতার অংশবিশেষ সঙ্গীতাকারে পরিবেশন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন শাখা-সম্পাদক শ্রীচন্দন সরকার। তাহার পর অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী যুক্তানন্দ ভাষণ দেন। পরিশেষে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণে বলেন :

"স্বামীজী আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, মানুষের অভাব হলে কোন কিছুই হতে পারে না। আজকে এ কথার দাম আমরা খুব ভাল-ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। ভারতের যত সব সমস্যা আজকে—কেন দেখা দিচ্ছে? এই মানুষের অভাবে। এই মানুষের অভাবেই আমাদের কোন কিছুই হচ্ছে না। মানুষ কি-ভাবে তৈরী হয়? মানুষ তৈরী হয় ধর্মজীবন গঠিত ক'রে।

এই জন্যে স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন : তোমাদের ভিতর যে আত্মা আছেন, সেই আত্মাকে অনাবৃত ক'রে তাঁর শক্তিতে তোমরা কাজে লাগো। ধর্মকে ধ'রে তোমরা কাজে নামবে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে। ধর্ম ছাড়া ভারতবর্ষের উন্নতি হতে পারে না। ধর্মই হচ্ছে ভারতবর্ষের জীবনীশক্তি। আর এই জীবনীশক্তি যদি ঠিক থাকে, তবে সব ঠিক থাকবে। বাস্তবিকই আমরা দেখছি, ভারতের জাগরণ শুরু হল, যেদিন স্বামীজী আমেরিকাতে ধর্মসভায় বক্তৃতা দিলেন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে। সমস্ত জগৎ দেখলে যে ভারতবর্ষ ঘুমোয় নি, মরে নি,—সে জীবিত। জীবিতই শুধু নয়, ভারতবর্ষ দিগ্বিজয় করবে, সমস্ত জগৎ জয় করবে। কিসে সে জয় করবে? সে কি এটম্ বম্ দিয়ে জয় করবে? না। স্বামীজী যা বলেছেন—শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী দিয়ে। এই আদর্শ দিয়ে সমস্ত জগৎকে এক ক'রে ফেলবে, সমস্ত ভেদ নষ্ট ক'রে ঐক্যবদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবে।

ধর্মই ভারতীয় জীবনের ভিত্তি। ধর্মে যখন আমাদের প্রথম নব জাগরণ এল স্বামীজীর চেষ্টায়, তারপরে আমরা দেখেছি, সমস্ত দিক দিয়ে ভারতবর্ষে জাগরণ এল—শিক্ষা সাহিত্য কলা অর্থনীতি রাজনীতি সব দিকে। স্বামীজী আমাদের সেই জন্যে ধর্মকে ধ'রে থাকতে বলেছেন। অনেক কিছুই আমাদের দরকার হতে পারে। কিন্তু সব কিছুকেই ধর্মের ভিত্তিতে পেতে হবে। এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না।

বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সদস্যদের আমি বলব, তোমরা প্রথমে মানুষ হও, তারপরে কাজ-কর্ম। মানুষ হতে না পারলে কাজকর্ম করা যাবে না। কাজকর্ম করতে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি এই সবই হবে। সেই জন্যে তোমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে—মানুষ হওয়া, ধার্মিক হওয়া। চরিত্রগঠনের দিকে তোমরা জোর দাও। এইটাই তোমাদের বিশেষ করে বলব। স্বামীজীর এই আদর্শ ছিল। এই বাণী ছিল। শুধু যুবকদের প্রতিই নয়, সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিই তাঁর নির্দেশ ছিল: তোমরা সকলে মানুষ হও।

আমি স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের শক্তি দেন যাতে আমরা মানুষ হতে পারি। মানুষ হয়ে ভারতবর্ষকে মহত্তর ক'রে গড়তে পারি। স্বামীজী বলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ভারত-বর্ষকে দাবিয়ে রাখতে পারে। এই হ'ল স্বামীজীর বাণী। ভারতবর্ষ জেগেছে। ভারতবর্ষ জগৎ-সভায় তার উপযুক্ত স্থান অবশ্যই লাভ করবে। আমি স্বামীজীর কাছে আরও প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের শক্তি দেন যাতে আমরা ভারতবর্ষের জন্যে, জগতের জন্যে কাজ করতে পারি; যেন জগতের সব হিংসা-দ্বেষ দূর করে ঐক্যবদ্ধ এক জগৎ সৃষ্টি করতে পারি; সমস্ত জগতের মানুষ যাতে এক হতে পারে, তার জন্যে যেন আমরা চেষ্টা করতে পারি—স্বামীজী আমাদের এই আশীর্বাদ করুন।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ১০ ও ১১ এপ্রিল '৭৬ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব পালিত হয়। ঐ উপলক্ষে ১০ এপ্রিল বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ভবনে 'ভূপতি বসু চ্যারিটেবল ট্রাস্টে'র আনুকূল্যে 'ভূপতি বসু স্মৃতিকক্ষে'র উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—" . এই আশ্রমে আমি বহুবার এসেছি। স্কুলেও এসেছি। এই আশ্রমটি সুন্দর গড়ে উঠেছে। এই সুন্দর ঘরটি হলো—এর দ্বারা ভাল কাজ হবে। ভক্তদের দ্বারাই এসব গড়ে উঠছে এবং এভাবেই হওয়া উচিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব এত বিরাট যে, সেটা জনকয়েক সাধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবার জন্য নয়। তিনি এসেছিলেন সব মানুষের হৃদয়কে এক করতে, প্রেমের দ্বারা আলোকিত করতে, নতুন পথ দেখিয়ে দিতে। আর বাস্তবিকই স্বামীজী যেমন বলেছিলেন, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, মানুষের ক্রমাগতই আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'য়ে হ'য়ে এমন অবস্থা দাঁড়াবে যখন মানুষমাত্রেই আধ্যাত্মিকতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করবে। আমরা আইন-কানুন ইত্যাদি ক'রে নানা-ভাবে উন্নতি করছি। একদিক থেকে এসব খুব ভাল। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করছি, খুবই ভাল। কিন্তু মানুষের মনগুলো গড়া দরকার, যাতে আত্মার কল্যাণ হয়, তারও চিন্তা করা দরকার। নইলে প্রকৃত মানুষে আর সাধারণ জীবেতে তফাতটা কোথায়? ঠাকুর তো এসেছিলেন মানুষকে 'মান-হুঁশ' ক'রে দিতে। তুমি ভাল ক'রে বোঝ তুমি কে? সেইদিকে হুঁশ থাকুক। সেইটি করিয়ে দেবার জন্য ঠাকুর এসেছিলেন এবং সে-ভাবটা সারা দুনিয়াকেই নিতে হবে এবং নিচ্ছেও তাই, এটি আমরা প্রত্যক্ষ ক'রে আনন্দিত হচ্ছি। মিশনের কাছে জাপান থেকে আহ্বান আসছে, আমেরিকা থেকে আসছে, জার্মানী হল্যাণ্ড বেলজিয়াম, কত জায়গা থেকে আসছে। আমরা সব ডাকে সাড়া দিয়ে উঠতে পারছি না—পারা

সম্ভবও নয়। কারণ, কাজের চাহিদার তুলনায় ত্যাগী কর্মীর সংখ্যা অনেক কম। তাই ভক্তদের এগিয়ে আসতে হবে। ঠাকুর সকলের জন্য, কোটি কোটি লোকের জন্য তিনি। ভক্তেরা এ আশ্রমটি গড়ে তুলছেন, আরো অনেক কিছু হবে, সুন্দর হবে। এইটিই ঠিক ঠিক পথ। ঠাকুর সেইজন্যই এসেছিলেন—সকলেরই জন্য, শুধু আমাদের দু'-পাঁচজনের জন্য নয়।"

এরপর সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ। তিনি তাঁর ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমা—এই তিনজন যে একই তত্ত্ব, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপক ডঃ নিমাইসাধন বসু 'ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের দান ও জনজীবনে তার প্রয়োগ' বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন।

দ্বিতীয় দিনের সাধারণ সভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী যুক্তানন্দ, স্বামী উমানাথানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। উভয় দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠা

হোজাই (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতিতে গত ১৩ই মে (১৯৭৬) আসাম মন্ত্রি-সভার সদস্য শ্রীশান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত ও অন্যান্য রামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আনুমানিক চল্লিশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী।

১২ই মে অর্থাৎ মন্দির-প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন বাস্তুযাগ অভিষেকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন হইতে শুরু করিয়া প্রতিদিনই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁচটি দিন অতীব আনন্দের সহিত অতিবাহিত হয়।

১৩ই মে প্রত্যুষে পুরাতন মন্দিরে মঙ্গলারতি, সংকীর্তন ও ভজনের পর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ভূতেশানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামী গহনানন্দ শ্রীমা সারদাদেবীর এবং স্বামী ইজ্যানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি বহন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে নবনির্মিত মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন। এই শোভাযাত্রা ও সুসজ্জিত যজ্ঞমণ্ডপে পাঁচশতাধিক ভক্ত নরনারীর সমাবেশ এবং মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি এক অপূর্ব ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। সাতবার নবনির্মিত মন্দিরটি পরিক্রমা করিবার পর স্বামীজীমহারাজগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীমা সারদাদেবীর ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিত্রয় নির্দিষ্ট সিংহাসনে স্থাপন করিলে বিশেষ পূজা, গীতা- ও চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়। স্বামী আশুতোষানন্দ ও স্বামী ইজ্যানন্দ সুসজ্জিত মন্দিরে পুণ্যাহবাচনান্তে মণ্ডপপূজা ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় কৃত্যাদি সম্পাদন করেন। পূজা ও আরাত্রিকাদি শেষ হইতে বেলা প্রায় দুই ঘটিকা হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত অন্যূন দুই হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। পূজাশেষে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলা প্রায় চারি ঘটিকায় স্বামী ভূতেশানন্দজী আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারো-দ্ঘাটন করেন এবং সর্বসাধারণের প্রবেশের জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হয়। অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত ভক্ত ও সুধীজনের সমক্ষে স্বামী ভূতেশানন্দজী ও স্বামী গহনা-নন্দজী ভাষণ দেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেন:

'শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র এত গভীর ও ব্যাপক যে, তা ধারণা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য, মহান আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ, যাঁর বক্তৃতাবলী পাঠ ক'রে দেশবিদেশের মানুষ আজ আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত, তিনিও নিজে বলেছেন যে, তাঁর পক্ষেও অসম্ভব।

স্বামীজী বলতেন, অলৌকিক ব্যাপার দেখানো বড় বেশী কথা নয়, কিন্তু ঠাকুর যে মানুষের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙতেন, পিটতেন, গড়তেন—স্পর্শমাত্রেই নতুন ছাঁচে ফেলে নতুন ভাবে পূর্ণ করতেন, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আর কিছুই দেখা যায় না।

স্বামীজীর তো যথেষ্ট বাগ্মিতা রয়েছে, তবু তিনি কেন বক্তৃতা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করেন না—একথার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, তার কারণ এই যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অতি অল্পই বুঝেছেন; শ্রীরামকৃষ্ণকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে ভয় হয়—পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে তাঁর অল্প শক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে পাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে ছোট ক'রে ফেলেন।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করতে হ'লে কতখানি শুদ্ধ বুদ্ধি, কতখানি পবিত্রতা, কতখানি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের থাকা দরকার, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। আমরা তাঁর নাম প্রচার করি আর না করি—কিছু এসে যায় না। তাঁকে বুঝতে হ'লে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী জীবন গড়তে হবে। স্বামীজী লিখেছেন: তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ, তাঁর শিক্ষা ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস?

গুটিকতক অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছাড়া নিজেকে তিনি চিরকাল ঢেকে রেখেছেন সকলের কাছে। বুদ্ধিসহায়ে সে-আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর মহত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সুকঠিন। একেবারে সাদাসিধে আত্মভোলা মানুষটি! শিশুর মতো সরল! শিশুর মতোই অসহায় যেন। সরল অসহায় শিশুকে দেখলে যেমন ভালোবাসা জন্মে, তাঁকে দেখলেই তেমনি স্বাভাবিকভাবেই ভালোবাসতে ইচ্ছে হ'ত। আর এই ভালোবাসার মাধ্যমেই তিনি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করতেন। তাই তাঁকে ভালোবাসতে হবে, যদি তাঁর মহিমার কিছুটা উপলব্ধি করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে সেবাব্রত শেখাবার জন্য প্রথম প্রকাশ করলেন সেবাধর্মের মূলমন্ত্র। প্রচার করলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। স্বামীজী বলেছেন, এই সেবার আদর্শ জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে, চারিদিকে এই সেবার আদর্শ প্রচার করতে হবে। বলেছেন, যার যা অভাব আছে, তার সেই অভাব দূর করো—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান। অন্নদান প্রথম কথা। ঠাকুর বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। স্বামীজী তাই বলেছেন যে, ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের অবস্থায় প্রথম কাজ হচ্ছে অন্নের সংস্থান করা। মানুষ অন্ন পেলো, তার ক্ষুধা সাময়িকভাবে মিটলো, কিন্তু তার মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য মনের উন্নতিরও প্রয়োজন। তাই স্বামীজী বলেছেন, অন্নদানের চেয়ে বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। বিদ্যার দ্বারা মনের অপূর্ণতা দূর হবে, মন বিকশিত হবে—উচ্চ তত্ত্ব ধারণা করতে সমর্থ হবে। এরও ওপরে আছে। আমরা দেখছি যে, পাশ্চাত্যবাসীরা জড়বিদ্যায় অভিজ্ঞ, তারা প্রাচুর্যের মধ্যে, ভোগের মধ্যে আছে, তবু তাদের ভেতর

সীমাহীন দারিদ্র্য রয়েছে ধর্মের দিক দিয়ে। জীবনে কোন আদর্শ তারা খুঁজে পাচ্ছে না, যেটাকে ধ'রে তারা বাঁচার মতো বাঁচতে পারে। একটা ব্যর্থতার মধ্যে, হতাশার মধ্যে, বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। তবে আমরা যেন মনে না করি, আমরা ভারতবাসীরা সকলেই এই দারিদ্র্য থেকে মুক্ত। আমাদের দেশেও ধর্মহীনতা আছে প্রচুর, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অগাধ ঐশ্বর্যও আছে, যার সঙ্গে পরিচয় আমাদের নেই। ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের এই অশেষ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য পুঞ্জীভূত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণে। তাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁর প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ বোধ করছে সবাই আর পিপাসার্ত জগৎ তাঁর কাছে শান্তির বারি পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগতে নবযুগের আবির্ভাব হয়েছে—স্বামীজী বলতেন, সত্যযুগ এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সত্যযুগের ধর্ম যারা গ্রহণ করবে, তারা বেঁচে যাবে জগন্নাথের রথ চলবে; জগন্নাথের রথ চলে জগন্নাথের শক্তিতে; ভক্তেরা কেবল সেই রথের দড়ি ছুঁয়ে নিজেদের ধন্য ক'রে নিতে পারে। আমরা তাঁর এই যুগ-প্রবর্তনের সময়ে ধর্মরথের রজ্জুকে স্পর্শ ক'রে নিজেদের জীবনকে সার্থক ক'রে নিতে পারি। আমরা এই শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে তাঁর ওপর আমাদের সমস্ত ভার ছেড়ে দিতে পারবো কি? ভাবতে হবে। যদি পারি, আর কোন চিন্তা নেই।

সমস্ত জগতে তাঁর প্রভাব অমোঘভাবে চলবে। যুগসন্ধিক্ষণে আমরা এসে পড়েছি। তাঁর হাতের যোগ্য যন্ত্র হবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। যদি সেই চেষ্টার ভেতরে কপটতা না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সাহায্য করবেন। আমাদের সমস্ত অপূর্ণতা দূর ক'রে, সমস্ত মলিনতা ধুয়ে মুছে আমাদের গ্রহণ করবেন। আমাদের ইহকাল পরকালের ভার নিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত ক'রে দেবেন। তাঁকে ধ'রে থাকলে মানুষ অভয় হবে। এই অভয়স্বরূপকে সামনে পেয়েও যদি আমরা অভয় হতে না পারি, শঙ্কিত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি, তবে আমাদের দুর্ভাগ্য। তিনি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আমাদের গন্তব্যস্থল - এটি যেন আমরা সর্বদা মনে রাখি। তাহলে সংসারের কোন কোলাহল আমাদের বিব্রত করতে পারবে না, কোন কলুষ, কোন কালিমা আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না—তাঁর জীবনকে অনুধ্যান ক'রে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে আমরা আশ্রয় লাভ করবো।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকলকে সেইরকম মতি দিন, যাতে আমরা তাঁকে জীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর পদপ্রান্তে আমাদের পথের পরিসমাপ্তি করতে পারি।'

উৎসব

ভগবানপুর-মনোহরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মজয়ন্তী বিগত: ২রা ও ৩রা মার্চ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ২রা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজান্তে প্রসাদ বিতরিত হয়। ৩রা প্রায় আট হাজার দরিদ্রনারায়ণ খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী শ্যামানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীঅরবিন্দ অধিকারী শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রাত্রিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রানুষ্ঠান হয়।

পাণ্ডু (আসাম) বিবেকানন্দ পাঠচক্র কর্তৃক বিগত ৩রা মার্চ মঙ্গলারতি ভজন বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রসাদ-বিতরণ ও লীলা-

গীতি পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই উপলক্ষে ১৮ই মার্চ হইতে ২২শে মার্চ পর্যন্ত বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রায় প্রতিদিনই মঙ্গলারতি ভজন পূজা প্রসাদ-বিতরণ লীলাগীতি-পরিবেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন শ্রীমতী রমাজী শ্রীমতী ইন্দিরা মিরি শ্রীনিমাইচন্দ্র মহাপাত্র স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রী এস. কে. সুদান ডঃ ভবানী সরকার ও অধ্যাপক পি. উপাধ্যায়। শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত তিন দিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন। শেষ দিন রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক বিগত ১৪ই ও ১৫ই মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৪ই প্রভাতে শোভাযাত্রা, পরে পূজার্চনা ও মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচশতাধিক দর্শক ও ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ছাত্র-সম্মেলনে আবৃত্তি- সংগীত- ও বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় স্কুলকলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় জনসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও প্রধান অতিথি ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। ১৫ই অপরাহ্নে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীপাঠ, স্তব ও প্রার্থনা এবং ভক্তিমূলক সংগীতের পর জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্মরণানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সভায় ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করে। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক পুরস্কার দান করেন। সর্বশেষে শ্রীঅভয়চরণ রায় রচিত ও পরিচালিত বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন শ্রীঅখিল রায়।

দোমড়া (বর্ধমান) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ২০শে ও ২১শে মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ২০শে মার্চ মঙ্গলারতির পর নামকীর্তন হয় এবং সন্ধ্যায় 'মাথুর' পালাকীর্তন পরিবেশন করেন শ্রীবিমল দাস। পরদিন মঙ্গলারতি প্রভাতফেরি বিশেষ পূজা হোম এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। অপরাহ্নে কথামৃতপাঠ এবং সন্ধ্যারতির পর ভজনগান হয়।

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে বিগত ২১শে হইতে ২৩শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন প্রত্যুষে স্তোত্রপাঠ ও ভজনাদির পর সংকীর্তন-দল শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা করিয়া নগর পরিক্রমা করে। দুঃস্থ বালক-বালিকাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রায় ৭০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। বৈকালীন জনসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী মিত্রানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী তথাগতানন্দ। ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীহীরালাল সরখেল। দ্বিতীয় দিন সান্ধ্য সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘের সভ্যাবৃন্দ। প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পর্যালোচনা করেন। পরে স্বামীজীর জীবনাবলম্বনে তথ্যচিত্র এবং 'ভারতের সাধক' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। শেষদিন সন্ধ্যায় শ্রীসুবোধকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাভারত ও শ্রীঅরুণ বিশ্বাস রামায়ণ পাঠ করেন এবং যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসমরেশ ব্যানার্জী। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী-অবলম্বনে অঙ্কিত একটি চিত্র-প্রদর্শনী সকলের মনোরঞ্জন করে।

সরোজিনী নগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে বিগত ২৯শে ফেব্রুআরি ও ২৭শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ইংরেজী হিন্দী বাংলা তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে। ৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ২৭শে মার্চ জনসভায় অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী অনিমা বসু স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্বামী বন্দনানন্দের ভাষণান্তে ভজন ও সমাপ্তি-সঙ্গীত গীত হয়।

শিকড়া-কুলীন গ্রাম (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ২৭শে মার্চ এক কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উহাতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীসহ সহস্রাধিক ব্যক্তির সমাবেশ হয়। কবিতা প্রবন্ধ চিত্রাঙ্কন গল্প বলা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী গহনানন্দ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দ। সভান্তে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরিত হয়।

উল্লেখ্য যে, 'স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটি' বিগত ১৬।২।৭৬ হইতে ৩।৩।৭৬ তারিখ পর্যন্ত চৌদ্দটি বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। স্বামী অকুণ্ঠানন্দ উক্ত কমিটিকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসংঘ কর্তৃক বিগত ১০ই ও ১১ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ স্বামী নির্জরানন্দ ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং ভাগবতপাঠ ও ভজন-গান হয়। ১১ই মঙ্গলারতি উষাকীর্তন ও বেদপাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও কথামৃতপাঠ হয়। বৈকালে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ স্বামী নির্জরানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। সংঘসম্পাদক সম্পাদকীয় বিবৃতিতে সংঘের বিগত বৎসরের জনকল্যাণ- ও সেবা-মূলক কাজের বিবৃতি দিয়া জনসাধারণের নিকট সংঘ-পরিচালিত হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্ম অর্থসাহায্যের আবেদন জানান।

পাঁচগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে বিগত ১৭ই হইতে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় দুইদিন ব্রহ্মচারী অমিতচৈতন্য পৌরোহিত্য করেন। শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে ভাষণ দেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্পর্কে কথকতা করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতাদির প্রতিযোগিতা হয়। বহরমপুর রামকৃষ্ণ ব্যায়াম মন্দিরের সভ্যগণ নানাবিধ ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করেন। বালকগণ কর্তৃক 'বালক বিবেকানন্দ' নাটিকা মঞ্চস্থ হয়। কৃষ্ণযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে প্রায় চৌদ্দশত ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পান।

আরিট (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ২৪শে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে

ছাত্র-সম্মেলনে স্বামীজীর জীবন ও বাণী এবং সমাজসেবা বিষয়ে আবৃত্তি আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ ও স্বামী নির্জরানন্দ। রাত্রে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পরদিবস পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ পল্লী-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা ও হোমাদি, মধ্যাহ্নে প্রায় দেড় সহস্র নর-নারীকে প্রসাদবিতরণ এবং সন্ধ্যায় 'ভারতের সাধক' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য **সুরেশচন্দ্র ঘোষ** গত ১৯শে অগস্ট ঝাড়গ্রামস্থ নিজ বাটীতে প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর-গণের মধ্যে অনেকেরই কৃপাধন্য। তাঁহার জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) অন্তঃপাতী কিশোরগঞ্জ মহকুমার সহস্রাম গ্রামে। তিনি প্রায় ৩৫ বৎসর রাঁচী একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কার্য করেন। ১৯৫৬ সালে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঝাড়গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন।

গত ১০ই অক্টোবর রবিবার রাত্রি আনুমানিক ১-৫৫ মিনিটে তিনসুকিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ সেবাসমিতির সভাপতি **বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত** মহাশয় করোনারি থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫৭ বৎসর বয়সে তিনসুকিয়াস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা কলমা- (ঢাকা) নিবাসী ৺বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের পত্নী **ইন্দুবালা দাশগুপ্ত** গত ২৭ অক্টোবর, ১৯৭৬ বেলা ২-২৫ মিনিটে ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। আনুমানিক ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন একনিষ্ঠভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর ধর্মাদর্শ-রূপায়ণে উৎসর্গীকৃত ছিল। তিনি মিষ্টভাষী নিঃস্বার্থ ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। জীবনের নানা দুর্যোগেও তিনি অবিচল ঈশ্বরনির্ভরতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বগৃহে স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের সেবা করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দের বিশেষ স্নেহধন্যা ছিলেন। কলমায় তাঁহার সংসারে সাধু ও ভক্তগণের আগমনের বিরাম ছিল না। স্বামীর ছাত্রকুলেরও প্রতিপালন তিনি কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়াও অজস্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একটি রচনাও কোথাও প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন নাই। এমনই আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন তিনি। জীবনের শেষ তিন বৎসর তিনি ঠাকুর-পূজা ও নামজপাদিতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলেও তাঁহার প্রিয় কয়েকটি গান—'আর চলে না, চলে না চলে না, জননী তোমা বিনা দিন আর চলে না', 'মায়ের শ্রীপদ ভুলো না ভুলো না' ইত্যাদি তাঁহার কণ্ঠে সজ্ঞান অবস্থার শেষপর্যন্ত প্রায় দিবারাত্রি নির্ভুলভাবে শোনা যাইত। শেষ একমাস তিনি ইউরিমিয়া রোগে বাহ্যতঃ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে প্রথম দুই কন্যা দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা অগ্রহায়ণ। (১৩০৬ সাল) [২১শ সংখ্যা।]

রামানুজ চরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

[১ম ভাগ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের কিয়দংশ —বর্তমান সঃ]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

আর এক পরিচ্ছেদ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

আমাদের অনেকে শিখাইয়া দিয়াছিল, তিব্বতীয়েরা পরিচয় চাহিলে বলিও আমরা কাশীলামা। 'লামা' অর্থে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, কাশী শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করিলে উহাতে হিন্দু সন্ন্যাসী বুঝায়। এখানে অনেক যুবককে দেখিলাম; সকলে বলিতে লাগিল, ইহার অনতিদূরে এক-স্থানে একটী বৃহৎ তাঁবুর ভিতর অনেক লামা বাস করিতেছেন। তাঁহারা ঐ তাঁবুর ভিতর বর্ষার চারি মাস থাকিবেন। এই স্থান হইতে নেপালে যাইবার পথ আছে। এখান হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে 'খোচরনাথ' নামক এক তীর্থ (নেপালের পথে) আছে। সকলে আমাদিগকে উহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। উহাতে নাকি এক অপূর্ব্ব রাম মূর্ত্তি আছে।

পাধান আমাদিগকে কাষ্ঠ, ডাল, চাল, ঘি প্রভৃতি দিল। আমরা ডাল ভাত রাঁধিয়া খাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজ-রাজ্য হইতে এধারে এবার ব্যবসা করিতে দিবার গোল-যোগ চলিতেছে। এই জন্য এবার অধিক তাঁবু পড়ে নাই বা অধিক ব্যবসায়ী আসে নাই। তবে শুনিলাম, অনেকে গোপনে গোপনে অনেক ব্যবসা চালাইতেছে। এখানে অন্যান্য সময়ে তিব্বতীয়দের নিকট হইতে বক্কু নামক এক প্রকার জামা কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে এবং তাহা শীত নিবারণে অত্যন্ত সহায়তা করে। আমরা তাহা পাইলাম না। আমরা ৪ জনের জন্য ১০ টাকায় ৪ খানি কম্বল কিনিলাম। Thibetan জুতা (Lum) দুই জনের দুই জোড়া ও কয়েক জোড়া মোজা (নাম মাত্র মোজা—থলে বলিলেই হয়) কিনিলাম।

* চৈত্র, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

জুতা দুইটী ২৸০ ও মোজা ৵০ করিয়া এক একটী। এখানে ইংরাজ রাজ্যের টাকা সিকি চলে। তাম্রের পয়সা প্রভৃতি চলে না। রাত্রে আবার পাধান ময়দা প্রভৃতি ভিক্ষা দিল, তাহাতে রুটি ডাল হইল। আমরা পাধানকেও দুই একখানি রুটি খাইতে অনুরোধ করিলাম। পাধান আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিল।

পাধানের এ তাঁবু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। তাহারই ভিতর আমরা স্থান পাইয়াছি, যতদূর আরামে সম্ভব, আছি। কাল প্রাতে মানস-সরোবর-যাত্রা করিতে হইবে। পাধানের সহিত মানস-সরোবরের গল্প হইতেছে। পথে একটা ভয়ানক ঠাণ্ডা হাওয়া চলে। ঝড়ের মত উড়াইয়া লইয়া যায়। এতদূর ঝড় উঠে যে, কখন কখন পাথরের কুঁচি উড়িতে থাকে। পথ প্রস্তরখণ্ড ও কঙ্করময়। আন্দাজ এখান হইতে ৩০ মাইল হইবে। পথে থাকিবার স্থানের মধ্যে এক গুহা আছে, নাম—গৌরী উডিয়ার। কাষ্ঠাদি কি ভিক্ষাদি অপ্রাপ্য—গাছ পালা কিছুই নাই—বৃষ্টি বড় হয় না।

প্রাতে একটু চা খাইয়া যাত্রা করিলাম। পাঠক মহাশয়, এ সব স্থানে চা বিলাসের দ্রব্য নহে, একটী অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ (necessity) ; চা এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই খায়। ইহারা চায়ে, আমরা যেমন দুধ দিই, তেমনি মাখন দেয়। পথে একটু আধটু চড়াই উতার, তা না হইলে সবই সমতল। মাঝে মাঝে যেন সুরকির মত—ঘোরলাল কতকটা মাটির স্তূপ কি বলিতে পারি না। স্থানে স্থানে খুঁটির উপর নানা রঙ বেরঙের নেকড়া টাঙ্গান। গাছ পালা কিছুই নাই। বেলা আন্দাজ ১০ দশটার সময় ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতে লাগিল। যেন ঝড়ের মত বেগে উড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমরা নিজেদের শক্তিতে অথবা বায়ুর শক্তিতে চলিতেছি, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তেমনি রৌদ্রের ঝাঁঝ কি ভয়ানক। সময়ে সময়ে এক আধ দল বকরা লইয়া যাইতেছে বা আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক আধজন অশ্বারোহী যাইতেছে।

আমাদের ভুটিয়ারা বলিয়া দিয়াছিল, রাস্তায় ভিক্ষা করিলে শুষ্ক গোবর পাওয়া যাইতে পারে। উহা জ্বালাইয়া চা তৈয়ারী করিয়া তার সহিত গুড়পাপড়ি বা ছাতু খাইও। শুধু জল পান করিও না, করিলেই অসুখ হইবে। আমরা খানিকটা দূর গিয়া লোকালয় থাকিতে থাকিতেই এইরূপ চা প্রস্তুতের জন্য গোময় ভিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু শুষ্ক গোময়াভাবে চা তৈয়ারী হইল না, কাযে কাযেই মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইলেই গুড়পাপড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর তুষার শীতল সলিল পান করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে তিব্বতীয়েরা জিজ্ঞাসা করে, কে তোমরা ? আমরা বলি, কাশীলামা। তাহারা একরূপ হাসে আর কটমট করিয়া চাইয়া থাকে। আপনাদের রাজ্যনাশের জন্য কি ভীতি! সকলেই চর ঠাওরায়।

পথে যাইতে যাইতে দাওয়া সিং বলিল, এই খান দিয়া কৈলাসের পথ গিয়াছে। যাহা হউক, চলিতে চলিতে এক ধর্ম্মশালায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিব্বতীয় এ ধর্ম্মশালা অদ্ভুত রকমের, আবার ছাদ নাই। চারি ধারে পাথরের দেয়াল মাত্র। সেখানে খানিক বসিয়া হাওয়ার হাত হইতে এড়াইলাম, আর আনন্দের সহিত গুড়পাপড়ি ভোজন হইল। তারপর আবার সেই চলিতে আরম্ভ; ক্রমশঃ রৌদ্র কমিয়া আসিতে লাগিল। দাওয়া বলে, এই—আর

তিন মাইল আছে। আমরা পদে পদে বুঝিতেছি, তাহার কোন মাইলের জ্ঞান নাই; তথাপি তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসিতেছি। আমাদের আজকার থাক্‌বার আড্ডা, গৌরী উডিয়ার গুহা। অনেকক্ষণ পরে, প্রায় বৈকালে গৌরী উডিয়ার গুহা দেখা গেল।

উহার সাম্‌নে এক ক্ষুদ্র নদী। দেখা যাইলে কি হইবে? ক্রমশঃ যাওয়া যাইতেছে, তথাপি নিকট হয় না! শেষে নদীর এপারে পঁহুছিলাম, এখন সকলে মিলিয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির হইতে লাগিল। দাওয়া বলে, গুহাতে থাকিয়া কায নাই, রাত্রে ডাকাত আসিয়া অত্যাচার করিতে পারে। এখানকার ডাকাত সম্বন্ধে আশ্চর্য্য গল্প শুনা যায়। ডাকাতেরা সন্ন্যাসী গৃহস্থ মানে না। যাহা পায়, তাহা লয়। বাধা দিলে মারিয়া ফেলে। সঙ্গে বন্দুক থাকে। আর বাধা না দিলে কাপড় পর্য্যন্ত লইয়া নগ্ন করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। তারা বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী অথবা স্ত্রী পুরুষ কিছুই বিচার করে না। এমন কি, শুনলাম, ঝঙপঙের উপর কখন কখন লুট হয়। কিন্তু ইংরাজের গন্ধ পাইলে ৮০।৯০ মাইল তফাতে পলায়। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতেছি,—দেখিলাম, নদীর এপারে তিব্বতীয়দের, এক তাঁবু রহিয়াছে। তাহাতে কতকগুলি তিব্বতীয় লোক কিম্ভূত বেশে বিরাজমান, নিকটে একটী বৃহৎকায় কুকুর ও কতকগুলি বক্‌রা। আমরা সেই স্থানে গিয়া দাওয়া সিংএর দ্বারা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদিগকে বলিল, আমাদের তাঁবুর পার্শ্বে শয়ন করিও না। কারণ রাত্রে কুকুর কামড়াইতে পারে। সুতরাং আমরা নিকটবর্ত্তী একটী উচ্চ ভূখণ্ডে সকলে আপনাপন আসন রচনা করিলাম। মধ্যে মধ্যে কাঁটা গাছ, উপরে এক অনন্ত নভোমণ্ডল চন্দ্রাতপস্বরূপ। এতদিনের পর এই একদিন বাধ্য হইয়া নীলগগনতলে শয়ন করিতে হইল। এ অবস্থায় বৈরাগ্য-শতকের সেই—

মহীশয্যা শয্যা বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানঞ্চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ।
স্ফুরদ্দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখং শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব॥

(পৃথিবী যাঁহার শয্যা, হস্তই যাঁহার বালিশ, আকাশ চন্দ্রাতপ, অনুকূল বাতাসই যাঁহার পাখা, চন্দ্রই যাঁহার উজ্জ্বল দীপ, যিনি নিবৃত্তিরূপ স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দিত, এরূপ শান্ত মুনি রাজারই ন্যায় অক্ষীণৈশ্বর্য্য হইয়া সুখে শয়ান থাকেন) অথবা স্বামী বিবেকানন্দের—

Have thou no home. What home can hold thee friend?
The sky thy roof, grass thy bed &c.

(গৃহশূন্য হও, হে বন্ধো; কোন্ গৃহ তোমায় ধারণ করিতে পারে? আকাশ তোমার গৃহের ছাদ, তৃণ তোমার শয্যা ইত্যাদি) মনে পড়ে।

ভ্রমণে নানারূপ ক্লেশ প্রভৃতি শত দোষ থাকিলেও উহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা-বৃদ্ধির যে অতিশয় সহায়তা করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আজ আমাদের আলেখিয়া-বন্ধুগণের অন্যদিনের মত স্তবপাঠ নাই, আজ তাহাদের প্রিয় ধুনিও নাই, আমাদের সব এক

দশা। যাহা কিছু কাপড় চোপড় ছিল, সব চাপাচুপি দিয়া রাত্রি কাটিল। ঠাণ্ডা হাওয়াটী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল, বলা বাহুল্য, রাত্রে কাহারও নিদ্রা হয় নাই।

তার পরদিন ভোরে নদী-পার। শুধু পায়ে পার হওয়া গেল। এখানকার ছোট ছোট নদী সকলের উপর শিলাখণ্ড পড়িয়া থাকে। তাহার উপর দিয়া অনায়াসে অনেক সময় জুতা পায়ে দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এখানে পাথরগুলি ডুবিয়া রহিয়াছে, সুতরাং জুতা পায়ে দিয়া যাওয়া চলিল না। এখানে পা হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিল। বরফেও পা এত ঠাণ্ডা হইয়া যায় না, এই ঠাণ্ডা বরফ জলে এত ভোরে পা যেন জমিয়া গেল। তারপর খানিকটা চড়াই করিতে হইল। এই পাহাড়টীর উপর উঠিয়াই এতদিনের অভিলষিত মানসসরোবর দৃষ্টিগোচর হইল।

নীল জল—অগাধ, অসীম মনে হইল, খুব নিকটে। কিন্তু ক্রমাগত চলিতেছি, সরোবর আর পাই না। আজ প্রায় ৫।৬ মাইল চলিয়াছি। কোন নদী বা জলাশয় পাই না। দুই চারিটী নদী, সব শুখাইয়া গিয়াছে, খাত মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আজ দাওয়া সিংকে জিজ্ঞাসিতেছি, আর কত দূর ? আর কতদূরে জল পাইব ? দাওয়া বলে—এক মাইল, কখন অর্দ্ধ মাইল, কখন দু মাইল। মধ্যে সে 'অলক' 'অলক' ত করিতেছেই। মধ্যে মধ্যে দুই একটী হরিণ লম্ফ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিলাম ; শেষে এক নদী পাইলাম, সেইখানে আবার গুড়পাপড়ি ভোজন। আজ প্রায় সারাদিন চলিলাম। কালকার দিনের মতই সব—মাঠ বৃক্ষশূন্য—মাঝে মাঝে একটু ছোট ছোট কাঁটা গাছ। সর্ব্বদাই মানসসরোবরের সেই সুনীল জল দেখিতে পাইতেছি, আর দেখিতেছি চারিধারে বরফের পাহাড়।

আজ মানসসরোবরের অপর পারে দূরে আর এক অতি সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল। যেন একটী স্বর্ণমন্দির। আমাদের অদৃষ্টে আর অতদূর যাওয়া হইয়া উঠিল না। শুনিলাম, উহাই ভূতভাবন মহাদেবের নিবাসভূমি কৈলাস। যাহা হউক, ক্রমশঃ বৈকালে কতকগুলি নদী পাইলাম। প্রায় ১০।১২টী—সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পার হইয়া খানিক দূর গিয়া দূরে কতকগুলি লোকালয় দৃষ্ট হইল। সেই দিকে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ তথায় পঁহুছিলাম। দেখিলাম—কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর মানসসরোবরতীরে। লোকে একটী ধর্ম্মশালা দেখাইয়া দিল, কিন্তু তাহা চাবি দেওয়া। উহার ভিতর ঝঙপঙের জিনিষ পত্র সব আছে। লোকে আর একটী ঘর দেখাইয়া দিল ; বলিল, এও একটী ধরম-শালা। সেখানেই রহিলাম। দেখিলাম, সেখানে একদল ব্যবসায়ী তাহাদের মালপত্র লইয়া পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া আছে। আমরা বাকি স্থান টুকুতে কষ্টেসৃষ্টে আসন করিয়া লইলাম।

দাওয়া সিং কতকগুলি কাঁটা গাছ সংগ্রহ করিয়া দিল। তাহাতেই আমাদের অতি কষ্টে ডাল রুটি প্রস্তুত হইল। আলেখিয়ারা ময়দা ও ডাল চারিটী সংগ্রহ করিয়া ঝুলিতে রাখিয়াছিল। তার পরদিন সরোবরের তীরে স্নান। মানসসরোবরে সে হংস কোথায়, কমলই বা কোথায় ? কিছুই ত দেখিলাম না। জল স্থানে স্থানে নির্ম্মল, স্থানে স্থানে ঘোলা। অতি শীতল জল, দুটী ডুব দিয়াই আড়ষ্ট। সরোবরে ঢেউ আছে, কিনারায় সর্ব্বদা একটা ঢেউ লাগিতেছে। তীরে অগাধ বালুরাশি। এখানে আর অন্য তীর্থের মত পাণ্ডার হেঙ্গাম নাই। পাণ্ডা কেহ নাই, পয়সা কেহ চাহে না। আসে কে এখানে ? মানসসরোবর একটী পুষ্করিণী

নহে, উহা একটী হ্রদ। পরিক্রম করিতে ৩।৪ দিন লাগে। এ দেশীয়েরা ইহাকে মানতালাও কহে। শুনিলাম নিকটে আর একটি হ্রদ আছে, কৈলাস যাইবার পথে উহা দেখা যায়। নাম—রাক্ষসতালাও; বোধ হয়, রাবণ হ্রদ।

বৈকালে নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধমন্দিরে গেলাম। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজিত। দুই একজন লামা থাকেন। লামা মূর্ত্তি দেখাইলেন। আমাদিগকে একটু প্রসাদী জল ও একটু রেশমের সুতা প্রসাদস্বরূপ দিলেন। আমরা ধর্ম্মশালায় বসিয়া আছি, আমাদের নিকটে একজন লোক শুষ্ক মৎস্য বেচিতে আসিল, বলা বাহুল্য, উহা লই নাই। জানিতাম না—উহা মানসসরোবরের প্রসাদ। তৎপরদিনেই এখান হইতে আলমোড়ার দিকে রওনা হইলাম।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

রামদাস নামক পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক ব্রাহ্মণ ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বহুদিন গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি পেন্‌সন্ পাইয়া নিশ্চিন্তমনে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহ যেন সদাচারের লীলা-ভূমি, অতিথিজনের পান্থশালা ও দীনদুঃখীর পিত্রালয় বলিয়া অনুমিত হইত। রামদাস কপটতার ধার ধারিতেন না; স্পষ্টবক্তা বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার গৃহিণী যেন সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী, দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, স্বামীভক্তির সর্ব্বোচ্চ আদর্শস্থানীয়া। রামদাসের বদান্যতা, সহৃদয়তা, মিষ্টালাপ, অতিথিসৎকার ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ বলিয়া অনুমান করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া রামদাস বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

স্বীয় গুরু, পুরোহিত, তিন চারিটী গ্রামিক বন্ধু ও স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তীর্থদর্শন উপলক্ষে একদা তিনি বারাণসী যাত্রা করেন। চিরকাশীবাসী হইবার জন্য তিনি এবার তীর্থ-যাত্রা করিয়াছিলেন কিনা আমরা অবগত নহি; তবে যাত্রাকালে স্বীয় সুযোগ্য পুত্রকে সংসারের বিষয় সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেছিলেন দেখিয়া গ্রামিকলোক মনে করিয়াছিল, রামদাস আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না।

যথাকালে বারাণসী উপস্থিত হইয়া রামদাস দশাশ্বমেধ ঘাটের অনতিদূরে বাঙ্গালি-টোলায় বাসা লইয়াছিলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুরধুনীর অনুপম শোভা, বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণচূড় মন্দির, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া রামদাস মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া রামদাস সকলকেই নারায়ণ-জ্ঞানে অভিবাদন করিতেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া রামদাস দুই ঘণ্টাকাল জপধ্যানে নিরত থাকিতেন।

একদিন রামদাস জপধ্যান-সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় অমিততেজা কোন এক যুবক সন্ন্যাসীকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন; সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় দীপ্তি, চক্ষুতে উদাসীনতা, হৃদয়ে নির্ভীকতা ও প্রশান্তি অবলোকন করিয়া রামদাস পথ-প্রান্তে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপর সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, প্রভো! অনেক ভাগ্যবশে আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শনলাভ আজ ঘটিল। অনুগ্রহ করিয়া যদি এ দাসের অবস্থান-গৃহ একবার পবিত্র করেন, আমি কৃতার্থ হই। দেখিয়া বোধ হইল, যেন সন্ন্যাসীটী পথশ্রমে পরিক্লান্ত, অনশনে ক্লান্তমুখ; তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। রামদাসের ভক্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে চলিলেন; কিন্তু বলিলেন ভিক্ষা গ্রহণান্তে পুনরায় তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাত্রি যাপন করিবেন।

রামদাস গৃহে সমাগত হইয়া পাদ্যাদিদানে সন্ন্যাসীকে যথাবিধি পূজা করতঃ গৃহিণীকে সাধু-সেবার আয়োজন করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার ফল মূল ও মিষ্টাদি দ্রব্যে সন্ন্যাসীকে জলযোগ করান হইল। অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ করিবেন বলিয়া, পরে তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর নামধাম জিজ্ঞাসা করিতে নাই, একথা রামদাস অবগত ছিলেন। সুতরাং কি উপায়ে ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, রামদাস প্রথমতঃ তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে সেইজন্য প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভৌতিক দেহ কোন্ দেশের পবিত্র মৃত্তিকায় গঠিত হইয়াছিল"? সন্ন্যাসী প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাণিহাটীর"। রামদাস তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী অবগত হইয়া যেন একটু সাহস পাইলেন; বলিলেন, আমিও বঙ্গদেশী; তবে একটু পূর্ব্বদেশীয় "বাঙ্গাল"। সন্ন্যাসী রামদাসের সরলতা দেখিয়া একটু অস্ফুট হাস্য করিলেন। স্বদেশীয় লোকের নিকট যেমন অসঙ্কুচিত চিত্তে কথা বলিতে পারা যায়, ভিন্নদেশীয় লোকের নিকট তেমনটী হয় না। তাই নবাগত সন্ন্যাসীকে সাহস করিয়া এবার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহার নাম ধীরানন্দ।

রামদাস ও ধীরানন্দের যে কথোপকথন হইতেছিল, রামদাসের সহযাত্রী জনৈক গ্রামবাসীর নিকট তাহা অবগত হইয়া পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

রামদাস। মহাশয়, সন্ন্যাসীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, শাস্ত্রমুখে ইহা অবগত হইয়াও আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ধীরানন্দ। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনি যাহা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু আপনাকে সাবহিত করিয়া দিতেছি, সন্ন্যাসীকে কখনও আর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিবেন না। অভ্যাগত অতিথি কি সন্ন্যাসীর সেবা হইয়াছে কিনা, গৃহস্থের ইহাই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

রামদাস। যদি অভয় দেন, দুই একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে আমার বড় উপকার হইবে; পরহিতকল্পেই আপনাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়।

ধীরানন্দ। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

রামদাস। আপনার নবীন বয়স, শরীর সুগঠিত, অথচ আকৃতি প্রতিভাব্যঞ্জক, অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং জ্ঞানী। আপনি ত সংসারাশ্রমের যুদ্ধে বেশ সফল হইতে পারিতেন। এ অবস্থায় গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন কেন? সত্য কি তবে, গার্হস্থ্য-শ্রমে ধর্ম্মলাভ হয় না?

ধীরানন্দ। গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ করা অতীব সুকঠিন। চতুর্দ্দিকে প্রলোভনের জিনিষ, কামকাঞ্চনের লেলীহমতী জিহ্বা বিজ্ঞ গৃহস্থকেও ভীতি দেখায় এবং অবশেষে হয় ত বিনাশ সাধনও করিতে পারে।

রামদাস। সন্ন্যাসী হইলেই কি কামকাঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

ধীরানন্দ। প্রলোভনের জিনিষ হইতে দূরে অবস্থান করিলে, শীঘ্র কি কামকাঞ্চনে প্রলুব্ধ হইতে পারে?

রামদাস। সন্ন্যাসীকেও প্রতিনিয়তই গৃহস্থের সঙ্গ করিতে হয়। পরন্তু কামকাঞ্চনের রাজ্য কোথায় নাই?—বিশ্বামিত্র ঘোর অরণ্যে অবস্থান করিয়াও শকুন্তলার জন্মদাতা হইয়াছিলেন।

ধীরানন্দ। আপনি যাহা বলিলেন সত্য বটে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রলোভনের ও পতনের যত সম্ভাবনা, সন্ন্যাসাশ্রমে তত নয়।

রামদাস। সে কথা আমি ত স্বীকার করি। কিন্তু কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, প্রকৃত ত্যাগ মনের; গীতাও বলিয়াছেন "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"; কাম্য কর্ম্মের ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তাঁহাদের বিবেচনায় গৃহে থাকিয়াও তাহা সাধিত হইতে পারে। জনকাদি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

ধীরানন্দ। জনক হওয়া কি সহজ কথা! অনেক তপশ্চর্য্যা করিলে 'জনক' হওয়া যায়। 'জনক' অর্থে ত আমরা 'পরমহংস' বুঝি। পরমহংস হওয়া কি মুখের কথা! অনেক সাধনার পর আগে পরমহংস হউন, তবে 'জনক' উপাধি লইবেন। কেবল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলে কি ত্যাগী হইতে পারে? ত্যাগী পুরুষের প্রকৃতিই পৃথক্। জনক ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী অন্য কোন গৃহস্থের নাম অবগত হইয়াছেন কি?

রামদাস। আচ্ছা,—স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া প্রতিবারেই গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বন কেন করিয়াছিলেন?

ধীরানন্দ। ভগবানের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানবের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না। আরও, বুদ্ধগৌরাঙ্গাবতারে ত তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

রামদাস। আচ্ছা,—প্রথমাবস্থায় সকলেই গৃহী, তৎপর সন্ন্যাস; ইহাই ত ধর্ম্মের ক্রমনিয়ম ও শাস্ত্রানুমোদিত?

ধীরানন্দ। তীব্র বিবেকীর পক্ষে দৃষ্টান্তও প্রযুজ্য নয়, শাস্ত্রানুশাসনও প্রযুজ্য নয়। তাঁহার বিধি নিষেধ নাই। সাধারণ লোকের ক্রমোন্নতি পন্থা। তীব্র বৈরাগ্যবানের এক লম্ফেই সাগর পার। এই শ্রেণীর লোকই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা হইতে একবারে সন্ন্যাস লয়েন। শাস্ত্রেও

তাহার বিধান আছে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" শ্রুতিও সেমত সমর্থন করিতেছেন।

রামদাস। তবে মন্বাদি শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে না। ব্রহ্মচর্যাদির পর গৃহধর্ম্ম; তৎপর বানপ্রস্থ তার পর সন্ন্যাস। ইহাই ত শাস্ত্রাদিষ্ট পন্থা। জীবনের অন্তকালেই সন্ন্যাস অবলম্বনীয়।

ধীরানন্দ। এ সকল নিয়ম নিম্নাধিকারীর পক্ষে। মন্বাদি শাস্ত্র বেদের পরে রচিত; ইহা সত্য হইলেই শ্রুতিমতে "যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনি সন্ন্যাস লইবে" একথার সার্থকতা থাকে। সন্ন্যাস অবলম্বনের কালাকাল নাই; জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত কাল জানিবে। আর ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে দুইটী মাত্র আশ্রম দৃষ্ট হয়। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাশ্রম। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচলন দৃষ্ট হয় না। আর, হয় গৃহী নয় সন্ন্যাসী এই দুয়ের একেতর অবলম্বন করাই বর্ত্তমান যুগে এক্ষণে ধর্ম্ম বা জ্ঞানলাভের উপায়।

রামদাস। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম এক্ষণে ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমের বিধান নাই। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য এই দুইয়ের একেতর অবলম্বন ধর্ম্মলাভের উপায় হইলেও, গৃহস্থের জ্ঞান হইবে না, একথা আপনি বলিতে পারেন না।

ধীরানন্দ। আমি অবশ্য সেকথা বলিতে পারি না। তবে গৃহস্থের জ্ঞান হওয়া বর্তমান কালে বড়ই দুরূহ।

রামদাস। সন্ন্যাসীর পক্ষেও সে কথা। আজকাল কত গেরুয়াধারী দেখা যায়; বলুন দেখি, কয় জনের জ্ঞান হইয়া থাকে?

ধীরানন্দ। যদি কাহাদেরও ভিতরে বেশী জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সন্ন্যাসীদের মধ্যেই হয়। গৃহস্থদের মধ্যে যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। তবে, যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ নীচসংসর্গ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা ও পরদোষান্বেষণই গৃহীদের প্রধান সাধন।

রামদাস। তেমন, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর মধ্যেও ঘোরতর ভণ্ডামী ও মূর্খতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে, তাহাদের বাহ্যিক ত্যাগব্রত গৃহস্থের শিক্ষার বিষয় বটে, এইমাত্র যা উপকার।

[ক্রমশঃ]

ভ্রম-সংশোধন

কার্তিক ১৩৮৩ সংখ্যার ৫৮৪ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত 'পরমহংসদেবের উপদেশ'—সংকলনটির উপরে '**১লা অগ্রহায়ণ; ২১শ সংখ্যা; ১৩০৬ সাল।**' পড়িতে হইবে।—বর্তমান সঃ

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

দিব্য বাণী

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্তা জননীং স্মরন্তি॥

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং
পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধ-পরম্পরাবৃতং
নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্॥

—শংকরাচার্য : দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্, ১০, ১১

করুণা-বরুণালয়া দুর্গা পরমা ঈশ্বরী
অকূলে পড়িয়া মাগো তোমারে স্মরণ করি।
ভেবো না শঠতা করি—(তুমি অন্তর-যামিনী
করম-বিপাক মোর সকলি জানো জননী)।
ক্ষুধা-পিপাসায় যবে সন্তান কাতর হয়
জননীর স্মৃতিই তো হৃদয়ে হয় উদয়।

পরিপূর্ণ কৃপা তব মোর 'পরে যদি রয়
জগতের জননী গো আশ্চর্য কি আছে তায়!
শত শত অপরাধে অপরাধী সন্তানেরে
(স্নেহময়ী) মাতা কভু উপেক্ষা তো নাহি করে।

কথাপ্রসঙ্গে

করুণারূপিণী

১

শ্রীমা সারদাদেবী বলিয়াছিলেন : 'দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়, কৃপায় মন্ত্র দিই। নইলে আমার কি লাভ ?'

সহজ সরল কথা। ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর ব্যাখ্যাসাপেক্ষই যদি হয়, তো শ্রীশ্রী-মায়ের কথার সঠিক ব্যাখ্যা কেই বা করিতে পারে! তথাপি যাহার যেরূপ বুদ্ধি, সে সেই-ভাবেই তাৎপর্য-নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইহা চিরাচরিত শিষ্টাচার-সম্মত রীতি। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মায়ের কথাগুলি যেভাবে প্রতিভাত হয়, তদনুযায়ী আলোচনা করা যাইতে পারে।

মা বলিয়াছেন, 'দয়ায় মন্ত্র দিই।' দয়ায় মন্ত্র অবশ্য সদ্‌গুরুমাত্রেই দিয়া থাকেন। ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে মুক্তিপথের সন্ধান দিতেই সদ্‌গুরুর দীক্ষাদান। প্রতিদানে তিনি কিছুই চাহেন না। একমাত্র করুণা ব্যতীত তাঁহার দীক্ষাদানের আর কোনই হেতু নাই। তথাপি মায়ের ক্ষেত্রে বিস্তর প্রভেদ আছে। সাধারণ গুরুবর্গ জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপভার গ্রহণ করিতে পারেন না—একমাত্র অবতাররাই উহা পারেন। এ বিষয়ে স্বামী বিরজানন্দ তাঁহার রচিত 'পরমার্থ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কেহ কাহারও পাপের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না, গুরুও না। মন্ত্রদীক্ষা দিয়া গুরু শিষ্যের যাবতীয় পাপের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন, মনে করা মহাভ্রম। এক ভগবানের অবতাররাই তাহা পারেন ও করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা অহেতুক-কৃপাসিন্ধু, পাপী তাপী উদ্ধারের জন্যই তাঁহাদের আগমন।

সুতরাং সাধারণ গুরুবর্গের করুণার সহিত শ্রীশ্রীমায়ের করুণার তুলনা করা চলে না। করুণায় যাঁহার অবতরণ, করুণায় যাঁহার প্রাণ-ধারণ—করুণায় যাঁহার দীক্ষাদান ও অশেষ দুঃখ-বরণ, তাঁহার অন্তহীন করুণার তুলনা কোথায় মিলিবে!

আলোচ্য উক্তিটির পরের অংশ হইল—'ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়, কৃপায় মন্ত্র দিই।' বাস্তবিক কত শত সংসারতাপতপ্ত নরনারী যে মায়ের নিকট দীক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া অন্তরের আর্তি ও আকূতি প্রকাশ করিয়াছে, মা কী পরিস্থিতিতে, শারীরিক কী অবস্থায় আছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে উৎপীড়িত পর্যন্ত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মা অপার করুণায় অকাতরে সকলকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'এহো বাহ্য', আরও কথা আছে। যাহারা ধরে নাই, কাঁদে নাই, আর্তি নিবেদন করে নাই, মা অযাচিত ভাবে তাহাদেরও কৃপা করিয়াছেন। জীবনের কোন্ অপ্রত্যাশিত পটপরিবর্তনে কাহার কি প্রয়োজন হইবে, মা তাহা জানিতেন, তাই কৃপা করিতেন। অন্ধ জীব নিজের বর্তমানকেই বুঝে না—ভবিষ্যৎকে কী বুঝিবে! এইজাতীয় দীক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জনৈক শিষ্য সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দজী একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, শিষ্যটি না চাহিলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বেচ্ছায় তাহাকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন; কারণ সে নিজেকে যত চিনিত, শ্রীশ্রীমা তাহাকে তদপেক্ষা অধিক চিনিতেন। এমন একটা সময় আসিবে

যখন সে উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া উহাকে সমাদর করিতে বাধ্য হইবে।

এইরূপ অযাচিত-কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যের সংখ্যা যে কত, কে তাহা নির্ণয় করিবে!

আলোচ্য উক্তিটির শেষাংশ হইল—'নইলে আমার কি লাভ?' লাভের কথা দূরে থাক, বহু বৎসর নির্বিচারে দীক্ষাদান করিয়া করুণা-রূপিণী মা দীর্ঘকাল দৈহিক অসুস্থতায় কতই না কষ্ট পাইয়াছেন! তথাপি যোগ্য-অযোগ্য পাপী-পুণ্যবান ধনী-নির্ধন স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেরই শিরে তাঁহার করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছে। বিধি-নিষেধের প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহার করুণাস্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। এমন কি পরম স্নেহভাজন একনিষ্ঠ সেবক সারদানন্দজীরও আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া অসুস্থ দুর্বল শরীরেও মা দীক্ষাদানে বিরত হন নাই। নিজমুখে বলিয়াছেন: 'মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।'

শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাদান ধ্যানের বিষয়। এবং ধ্যানলোকেই আমরা করুণারূপিণী জগজ্জননীর অনন্ত মাধুর্যময় করুণাঘন বিগ্রহ সন্দর্শন করিতে পারি। তাঁহার জীবনীতে এই ধ্যানের অবলম্বন অনেক পাওয়া যায়। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পত্র লইয়া তিনজন দীক্ষার্থী একদা জয়রাম-বাটীতে উপস্থিত হন। মা মানুষ চিনিতেন এক নজরেই—খেদোক্তি করিলেন: 'শেষে কিনা রাখাল আমার জন্যে এই পাঠালে! ছেলে বিদেশে গিয়ে কত ভাল জিনিস পাঠায়, আর রাখাল কিনা আমার জন্যে এই পাঠালে!!' শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশেও বলিলেন: 'ঠাকুর, কালও তোমার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, দিন যেন বৃথা না যায়। শেষে তুমিও কিনা এই আনলে!' পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া দীক্ষাদানে সম্মত হইয়া বলিলেন: 'যতক্ষণ শরীর থাকে, ঠাকুর, তোমার কাজ করে যাই।' দীক্ষাদানের কিছু দিন পরে বেলুড় মঠে এই ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজী যুক্তকরে বলিলেন: 'কৃপা, কৃপা! এই মহিমময় কৃপা দ্বারাই মা আমাদের রক্ষা করছেন সর্বক্ষণ…।'

২

করুণারূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের এই নির্বিচারে দীক্ষাদান-প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দজী একটি পত্রেও লিখিয়াছিলেন: "অনন্ত শক্তি—অপার করুণা!…স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখি নি। তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই ক'রে' লোক নিতেন।…অদ্ভুত, অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন…।" যে-কথা স্বামী প্রেমানন্দজী লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীমায়ের স্বকীয় উক্তিতেও তাহা পাওয়া যায়। মায়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী যোগীন-মা একবার হাসিতে হাসিতে বলেন, 'মা আমাদের যতই ভালোবাসুন, তবু ঠাকুরের মতো নয়। ছেলেদের জন্য তাঁর কি ব্যাকুলতা, কি ভালোবাসা দেখেছি, তা বলবার নয়।' উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, 'তা হবে না? তিনি নিয়েছেন বাছা বাছা ছেলে ক'টি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে পিঁপড়ের সার।' এই 'পিঁপড়ের সারে'র সকলকে গ্রহণ করাতেই শ্রীশ্রীমায়ের অন্তহীন করুণার পরিচয়।

প্রেমানন্দজীর উক্তির অনুরূপ উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের অনেকেই করিয়াছেন। পূজ্যপাদ দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের

চেয়ে মা দয়াল!' স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছিলেন: 'মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হ'লে তাঁর কৃপা হয় না। মা—বড় ভাল।' স্বামী বিবেকানন্দেরও অনেকটা এই ধরনেরই উক্তি আছে। তিনি একটি প্রসিদ্ধ পত্রে লিখিয়াছেন: 'রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলেই সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে!' স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলিয়াছিলেন: 'মার দয়ার কি তুলনা আছে? মা কি আমাদের কাছ থেকে কিছু আশা করেন? কোন আশা নেই, কেবল এইটুকু তাঁর অহেতুকী দয়া—যদি সকাল-সন্ধ্যায় একটু নাম করে এবং পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে—তাই স্থান দেন। এই ছেলেটাকে দেখছো, কথা বলতে জানে না, কোথায় বাড়ী তার ঠিক নেই—একেও কৃপা করলেন।...মার কত দয়া! যদি কেউ মার কাছে বলে—মা, আমি ডাক্তার হবো, উকিল্ হবো, মা বলেন—তা বেশ তো, তাই হয়ো।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কয়টি লোকের পক্ষে এই ধরনের নিঃসঙ্কোচ বৈষয়িক অভিলাষের কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হওয়া সম্ভব, ইহা যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর সহিত সম্যক্ পরিচিত, তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

৩

দীক্ষাদানই করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সন্দেহ নাই। কারণ, অন্নদান প্রাণদান বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান—এই চতুর্বিধ দানের মধ্যে জ্ঞানদানেই মানুষের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। তথাপি সকলের প্রয়োজন একরূপ নহে, যাহার যাহা অভাব তাহার দূরীকরণ ব্যতীত মানুষের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এইজন্য দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীমায়ের করুণা দীক্ষাদানেই—আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানেই—সীমাবদ্ধ ছিল না। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত।

স্বামী সারদেশানন্দ লিখিয়াছেন: "শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত, বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগের সময়ে আমি বলরাম মন্দিরে ছিলাম। রামবাবুর শরীর যাইবার দুই-চারিদিন পূর্বে তিনি একটি উইল করেন। তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অসুস্থ অবস্থায় উদ্বোধনে ছিলেন। ঐ উইল হইবার পরদিন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট ঐ উইলের কথা জানাইয়া বলেন যে, রামবাবু তাঁহার উইলে ঠাকুরসেবা ও অনেক সাধুদের সেবার জন্য বহু টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি সেই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত ছিলাম। সরলা দেবীর ঐ কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গরীব-দুঃখীর জন্য কিছু করলে?'[১] আমি কিছু জানিতাম না। শ্রীশ্রীমায়ের গরীব-দুঃখীর প্রতি দরদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শুধু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।"

গরীব-দুঃখী বিপন্ন রোগগ্রস্ত অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের জন্য মায়ের করুণার নিদর্শন তাঁহার জীবনীতে ও অন্যান্য গ্রন্থে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ দেখা যায়। স্বামী সারদেশানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা'-শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধেও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে।

১ উইলে উল্লেখিত বলরাম মন্দির সংক্রান্ত ট্রাস্ট ডীডে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী পরিচালনার নির্দেশ আছে।

কিন্তু গ্রন্থগুলিতে বা প্রবন্ধে কয়টি ঘটনা আর বিবৃত হইয়াছে! যে-জীবন অনাড়ম্বর সুষমামণ্ডিত শান্ত-সমাহিত 'আমিত্ব'-রহিত—জাগতিক সমস্ত কোলাহলের ঊর্ধ্বে আপন নীরব মহিমায় বিভাসিত, সে-মহাজীবনের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও তো গ্রন্থগুলিতে পাওয়া সম্ভব নহে। তবে যেটুকু আমরা পাই, সেইটুকুরই অনুধ্যান করিতে পারি। স্মরণ করিতে পারি বেলুড় মঠের সেই ভৃত্যের কথা, চুরির অপরাধে যাহাকে স্বামী বিবেকানন্দ মঠ হইতে বিতাড়িত করেন। নিরুপায় ভৃত্য কলিকাতায় গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শরণাপন্ন হইলে করুণাময়ী মা তাহাকে রাখিয়া স্নানাহারাদি করাইলেন এবং সেইদিনই বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দজী আসিলে তাঁহাকে বলিলেন: 'দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে! সংসারে বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' প্রেমানন্দজী ভৃত্যটিকে লইয়া মঠে প্রবেশ করিবামাত্র স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, 'বাবুরামের কাণ্ড দেখো—ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে!' প্রেমানন্দজী মায়ের করুণার কথা আনুপূর্বিক বলিলে স্বামীজী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

স্মরণ করিতে পারি উদ্বোধনের সামান্য কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্তের কথা। কীর্তিনাশা পদ্মা তাঁহার পূর্ববঙ্গের বাড়ীঘর গ্রাস করায় বিষমসঙ্কটাপন্ন তাঁহাকে নূতন জমি ক্রয় করিবার জন্য শ্রীশ্রীমা গোপনে তিনশত টাকা অর্থসাহায্য করেন। তখনকার দিনে তিনশত টাকার মূল্য বড় কম ছিল না। আর শ্রীশ্রীমায়ের টাকাই বা কত ছিল! তথাপি কর্মচারীকে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল এবং আশাতিরিক্ত সাহায্যদানে তাঁহাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্মরণ করিতে পারি জয়রামবাটীতে বালক-ভৃত্য গোবিন্দের কথা। খোসপাঁচড়ায় ভুগিতে দেখিয়া মা নিজেই তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্বহস্তে শিলনোড়াতে নিমপাতা-হলুদ বাটিয়া দিতে লাগিলেন এবং কিভাবে লাগাইতে হইবে দেখাইয়া দিলেন। মায়ের এই করুণার স্পর্শে গোবিন্দের প্রাণমন ভরিয়া উঠিল—মায়ের মধ্যেই সে আপন স্নেহময়ী গর্ভধারিণীকে পাইয়া মুগ্ধ হইল। বাস্তবিক মায়ের দৃষ্টিতে তো কর্মচারী, ভৃত্য ইত্যাদি ভেদ ছিল না—সকলেই তাঁহার সন্তান—সমভাবে তাঁহার স্নেহকরুণার অধিকারী। করুণারূপিণী বিশ্বজননী তিনি!

রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা শ্রীশ্রীমা যতটা পারিতেন নিজেই করিতেন—উপায়ান্তর না থাকিলে অপরকে দিয়া করাইতেন—জয়রামবাটীতে জনৈক বিধবার কানের ভিতর ঘা হওয়ায় তিনি খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসার অভাবে ঘা পচিয়া ভিতরে বড় বড় পোকা হয়, দুর্গন্ধে কেহ কাছে যাইতে পারে না। শ্রীশ্রীমা নিমপাতার জল গরম করিয়া একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া পিচকারি দিয়া ঘা ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিয়া আসেন। এবং দীক্ষিত সন্তানদের সাহায্যে কোয়ালপাড়া আশ্রমে রাখিয়া রোগিণীর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

রোগীদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ করুণা। নানা ঘটনায় নানাভাবে উহা ব্যক্ত হইত। কাশী সেবাশ্রমে রোগীদের আবাসকক্ষগুলি, তাহাদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখিয়া মা অতীব প্রসন্ন হন এবং

'শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে নিজে বিরাজ করছেন…'—এই মন্তব্য করেন। পরে বাসায় ফিরিয়া সেবাশ্রমে দানস্বরূপ দশ টাকা পাঠাইয়া দেন। সাধু-সন্ন্যাসীরা রোগীদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসিদ্ধ কোন কোন ভক্ত প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই, তখন শ্রীশ্রীমায়ের অভ্রান্ত দৃষ্টিতে এইজাতীয় সেবা যে সাধনভজন অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে, তাহা অনায়াসেই ধরা পড়িয়াছিল। চিত্তের প্রসারতাই জপধ্যানের উদ্দেশ্য—করুণায় উহা অনায়াসলভ্য। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: 'দয়া যার শরীরে নেই, সে কি মানুষ? সে তো পশু। আমি কখনও কখনও দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই, ভুলে যাই যে, আমি কে।' করুণায় এই আত্মবিস্মৃতিতেই তো জীবনের চরম চরিতার্থতা। মা সেই আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন - কাজে এবং কথায়।

শ্রীমায়ের করুণা মনুষ্য-সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মনুষ্যেতর প্রাণীর জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন: 'আমি সকলেরই মা, ইতর জীবজন্তুরও মা।' এই বিষয়ে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে একটি সুন্দর ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার লিখিতেছেন: "জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রি প্রায় ভোরের সময় বহির্বাটীতে একটি গো-বৎস বড়ই চীৎকার করিতেছিল। দুধের জন্য তাহাকে তাহার মায়ের নিকট হইতে দূরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। চীৎকার শুনিয়া মা এই বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিলেন—'যাই, মা, যাই, আমি এক্ষুণি তোকে ছেড়ে দেবো, এক্ষুণি ছেড়ে দেবো।' আসিয়াই গো-বৎসের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। আমি অবাক হইয়া জগন্মাতার সর্বভূতে করুণাময়ী মূর্তি দেখিলাম।"

ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই উহার অসামান্যতা উপলব্ধ হইবে। আর শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠোচ্চারিত সেই করুণা-কথা তো আমরা গ্রন্থে পড়িতেছি মাত্র—ভাগ্যবান তিনি, যিনি উহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন, উহার অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরিত করুণারসে স্বহৃদয় নিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং 'অবাক হইয়া জগন্মাতার সর্বভূতে করুণাময়ী মূর্তি' সন্দর্শন করিয়াছিলেন!

পৌষ মাসে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব; প্রতি বৎসর এসময় আমরা তাঁহার অনুধ্যান করিয়া থাকি। তাঁহার পুণ্য আবির্ভাব-তিথি স্মরণে মাতৃ-আরাধনায় এই অনুধ্যানটি অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করি, জগজ্জননীর করুণাঘন প্রকাশ আমাদের সকলেরই অন্তরে চির-জাগরূক থাকুক এবং জীবনের সকল দুঃখ-দুর্বিপাকে ও অন্তিম ক্ষণেও এই বিশ্বাস আমাদের পরম নিশ্চিন্ত করুক যে, প্রকটাবস্থায় যেমন অপ্রকটাবস্থায়ও তেমনি তাঁহার স্থির করুণাদৃষ্টি সকল সন্তানকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে সর্বদা রক্ষা করিতেছে।

'হে পাঠক, যদি শোকতাপদগ্ধ জীবনে শান্তি পাইতে চাও, তাহা হইলে একদিন অপরাহ্নে গিয়া সেই করুণাময়ীর পদপ্রান্তে উপবেশন করিও।'

—শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : একাগ্রধ্যানপরাঃ বিদুঃ ইতি উক্তং, কেন ক্রমেণ কেন প্রকারেণ চ তে বিদুঃ ইতি আকাঙ্ক্ষায়াম্ আহ—

(মূলস্তোত্রম্ :)

প্রাণানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুধ্বা
নান্যৎ স্মৃত্বা তৎ পুনরত্রৈব বিলাপ্য।
ক্ষীণে চিত্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদুর্যং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥

প্রাণান্ ইতি। প্রাণান্ বাগাদীন্দ্রিয়াণি **আয়ম্য** উপসংহৃত্য, অনন্তরম্ **ওম্ ইতি** লপন্তঃ এব **চিত্তম্** অন্তঃকরণম্ **হৃদি** হৃদয়াকাশে ব্রহ্মণি **রুধ্বা** নিরুধ্য ; 'ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত' (মহানারা.উ. ১৭।১৩), 'ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্' (মু. উ. ২।২।৬) ইতি শ্রুতেঃ। আত্মানং চিত্তং যুঞ্জীত নিরুধ্যাৎ ইতি অর্থঃ। 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্' (গীতা, ৮।১৩) ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। অথবা ওম্ ইতি উচ্যমানে ওঙ্কারবাচ্যে হৃদি হৃদয়াকাশে চিত্তং রুধ্বা, **অন্যৎ** রূপরসাদি **ন স্মৃত্বা** প্রাপ্তাম্ অপি বিষয়স্মৃতিং বিষয়দোষ-দর্শনেন হিত্বা। 'সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥' ইতি স্মৃতেঃ। (গীতা, ৬।২৪-২৬)।

অনুবাদ : একাগ্রধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিগণ (তাঁহাকে) জানিয়া থাকেন, একথা বলা হইয়াছে। কি ক্রমে, কি প্রকারে তাঁহারা তাঁহাকে) জানিয়া থাকেন এই প্রশ্নের উত্তরে (আচার্য) বলিতেছেন : (মূলস্তোত্র, শ্লোক ৬ ; উপরে দ্রষ্টব্য)।

অন্বয় : প্রাণান্ আয়ম্য ওম্ ইতি চিত্তং হৃদি রুধ্বা অন্যৎ ন স্মৃত্বা পুনঃ তৎ অত্র এব বিলাপ্য চিত্তে ক্ষীণে ভাদৃশিঃ অস্মি ইতি যং বিদুঃ, সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং তং হরিম্ ঈড়ে।৬।

স্তোত্রানুবাদ : প্রাণাদি (বাগাদি-ইন্দ্রিয়) (বিষয় হইতে) প্রত্যাহৃত করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে চিত্তকে হৃদয়ে (হৃদয়াকাশে) নিরুদ্ধ করিয়া অন্য বিষয়ের স্মরণ পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় তাহাকে (অন্তর্লীন চিত্তকে) এখানেই (হৃদয়াকাশস্থিত ব্রহ্মেই) বিলীন

করিয়া—চিত্ত ক্ষীণ হইলে (অর্থাৎ চিত্তের সমুদয় বৃত্তি রুদ্ধ হইলে)—'আমি স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ' —এইরূপে (মুমুক্ষুগণ) যাঁহাকে (পরমাত্মরূপী বিষ্ণুকে) জানেন, সংসারের (কারণীভূত অজ্ঞান-) অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি।৬।

টীকানুবাদ : **প্রাণান্** বাগাদি-ইন্দ্রিয়সমূহকে **আয়ম্য**—(বিষয় হইতে) প্রত্যাহৃত করিয়া, তদনন্তর **ওম্ ইতি**—ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে **চিত্তং**—অন্তঃকরণকে **হৃদি**—হৃদয়াকাশে ব্রহ্মে[১] **রুদ্ধ্বা**—নিরুদ্ধ করিয়া…। এবিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ : 'ওমিতি আত্মানং যুঞ্জীত'—ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক আত্মাকে যোগযুক্ত করিবে ; 'ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্'—প্রণবরূপেই আত্মার ধ্যান করিবে। (প্রথম শ্রুতিবাক্যে) আত্মাকে অর্থাৎ চিত্তকে যোগযুক্ত করিবে অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিবে, ইহাই অর্থ। এবিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ : 'ওমিত্যেকাক্ষরং… অনুস্মরন্'—'ওম্', এই একাক্ষর ব্রহ্ম (অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম) উচ্চারণপূর্বক আমাকে অবিচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করিতে করিতে, ইত্যাদি।

অথবা[২] (মূলশ্লোকে) উক্ত 'ওম্', এই শব্দটির প্রতিপাদ্য ওঙ্কার-নামক হৃদয় অর্থাৎ হৃদয়াকাশ, সেখানে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া **অন্যৎ**—অন্য রূপরসাদি বিষয় **ন স্মৃত্বা** স্মরণ না করিয়া অর্থাৎ বিষয়ের স্মৃতি উপস্থিত হইলেও বিষয়ের দোষদর্শন দ্বারা (তাহা পরিত্যাগ করিয়া…। এ বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ : 'সঙ্কল্পপ্রভবান্…বশং নয়েৎ॥'—সঙ্কল্পপ্রসূত কামনা-সমূহ নিঃশেষে পরিত্যাগপূর্বক (বিবেকযুক্ত) মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্ববিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে উপরত হইবে (অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিবে) এবং মনকে আত্মস্থ করিয়া আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। যে যে বিষয়ে চঞ্চল ও অস্থির মন ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ইহাকে (মনকে) আত্মাতেই স্থির করিবে। [ক্রমশঃ]

১ হৃদয়াকাশ ব্রহ্ম নহে। কিন্তু হৃদয়াকাশ ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান বলিয়া উহাকে ব্রহ্ম বলা হয়। ইহা বুঝাইবার জন্যই টীকাকার হৃদয়াকাশের অর্থ ব্রহ্ম করিয়াছেন।

২ মূলশ্লোকের 'ওম্ ইতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধ্বা', এই অংশটির প্রথম ব্যাখ্যায় টীকাকার 'জপন্তঃ' শব্দটির অধ্যাহার করিয়া 'ওম্', এই শব্দটিকে উচ্চারণ-ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ঐ প্রথম ব্যাখ্যায় 'হৃদি', এই শব্দটির অর্থ 'হৃদয়াকাশে' অর্থাৎ 'ব্রহ্মে' বলিয়াছেন। 'অথবা' বলিয়া তিনি আলোচ্য অংশের যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 'ওম্', এই শব্দটি 'হৃৎ'-শব্দের বিশেষণ এবং 'হৃৎ'-শব্দের অর্থ হৃদয়াকাশ, ব্রহ্ম নহে।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[চৈত্র, ১৩৮২ সংখ্যার পর]

ভক্ত-অলি ভগবানের পাদপদ্মের মকরন্দ-পানে সদা লালায়িত, শ্রীভগবানও ভ্রমররূপে ভক্তহৃদয়-কমলের মধু আস্বাদন করেন। এই হৃদয়কমলনির্যাস—জীবান্তঃকরণের সূক্ষ্মতম শুদ্ধতম সুন্দরতম বস্তু রসরূপে প্রবাহিত হইয়া বিষয়-আশ্রয়ভেদে আধার অবলম্বন করিয়া যে বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করে, তাহাই শান্ত-দাস্যাদি রস নামে পরিচিত। মায়িক জগতের নশ্বর বস্তু, জীব-জীবনের ক্ষণিক অভিব্যক্তিও এই রসধারাতেই সঞ্জীব ও পুষ্ট। এই রস-সঞ্চার ও তাহার প্রকাশ-আনন্দের স্ফুরণ ভিন্ন প্রাণশক্তির ক্রিয়াও অচল হইয়া যাইত। তৃণ-লতা-গুল্ম হইতে উচ্চ উচ্চতর জীব মনুষ্য পর্যন্ত রসে ওতপ্রোত, আনন্দে উজ্জীবিত, জ্ঞাত- বা অজ্ঞাতসারে। রসের পরিপূর্ণ বিগ্রহরূপে শ্রীভগবান রসস্বরূপ। ভক্তকে এই রস আস্বাদন করাইবার জন্যই শ্রীভগবান যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করিয়া আসেন। বর্তমান যুগে মানব-সমাজকে সেই রস আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি আদর্শ সন্তান, ত্রিগুণাতীত শিশু শ্রীরামকৃষ্ণরূপে, মহাভাবময়ী 'নিখিল মাতৃহৃদয়-সাগর-মন্থনসুধা-মূরতি' জগজ্জননী শ্রীসারদাদেবী-রূপে আবির্ভূত। এই অদ্ভুত মানবী-লীলার বিষয়-আশ্রয় ও আশ্রয়-বিষয় মাতা-পুত্র পিতা-কন্যা ভাবাশ্রয়ে মা- ও মেয়েরূপে যুগোপযোগী লীলার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার আগ্রহেই এই আলোচনা।

বহুকাল পূর্বের কথা, একদিন জনৈক বন্ধুর সহিত বহুদিন পরে দেখা করিতে গিয়াছি তাঁহার আলয়ে। বন্ধুটি ডাক্তার, বয়স চল্লিশ আন্দাজ, পসার প্রতিপত্তি বেশ, ভাল ডাক্তার বলিয়া সুনাম আছে। দুইটি পুত্রসন্তানের পর একটি কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন, কন্যার বয়স তখন দেড়বছরের মতো। বন্ধুবর ছোটবেলা হইতেই তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, অতিশয় ফিটফাট, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও গেলে আসন খুব পরিষ্কার না দেখিলে নিজে ঝাড়িয়া মুছিয়া বসেন, নতুবা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাজ সারেন। তাঁহার ধুতি চাদর জামায় কেহ কখনও বিন্দুমাত্র ময়লা, কোন দাগ কিংবা ভাঁজভাঙ্গা এলোমেলোভাব দেখে নাই। বন্ধু দেখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন, বহুদিন পরে সাক্ষাৎ, দুইজনেই পরম প্রীত, নমস্কারাদি বিনিময় করিয়া কুশল-প্রশ্নাদি করিতেছি। ইতিমধ্যে তাঁহার স্নেহপুতলী দুহিতা কোনওপ্রকারে চলিয়া আসিয়া আধ আধ মিঠা বুলিতে 'বাবা' বলিয়া হাত বাড়াইয়া ধরিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া তুলিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া মুখচুম্বন করিয়া বন্ধুকে কৈফিয়তের সুরে বলিলেন, "এর জন্যে আমার সব গিয়েছে, বাবুগিরি পর্যন্ত। কিছুতেই ছাড়বে না, দেখলেই কোলে করতে হবে। 'ডাক' থেকে ঘুরে আসি, ভাল জামাকাপড় ছাড়বার জো নাই, ধুলোয় গড়াচ্ছে, দেখতে পেলেই ছুটে এসে ধুলোশুদ্ধ জড়িয়ে ধরবে, কোলে তুলতেই হবে, না হলে রক্ষে নেই, 'বা-বা' করে কেঁদে ভাসাবে। ছেলেদের দূরে দূরে রেখেছি, কোলে চড়তে পারে নাই; কিন্তু এর হাত থেকে আর রক্ষে পেলুম না! এই দেখুন না, মাটিতে গড়াচ্ছিল, কত ধুলো গায়ে, দেখেছে

দাঁড়িয়ে আছি, অমনি ছুটে এসেছে।" বলিতে বলিতে বন্ধু মেয়েকে দেখিতেছেন. বুকে জড়াইতেছেন, চুমা খাইতেছেন আর হৃদয়ের আনন্দ চোখে মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিলাম, শুনিলাম, ভাবিলাম। এই মধুর রসাস্বাদনের জন্যই ত সংসার। পুত্র জন্মেছে কম বয়সে, তখনও হয়ত হৃদয়কমল সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই—স্নেহমধুর অপ্রাচুর্য ছিল। বন্ধুর সুখের সংসার দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন চারকুড়ির মত, জরাগ্রস্তদেহ, অথর্ব, অচল, তখন খবর পাইয়াছিলাম, সেই কন্যারত্নই বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রবৎ লালনপালন করিয়াছেন। স্নেহভক্তিতে পিতার সেবাশুশ্রূষা করিয়া নিজ জীবনের সার্থকতা ও পিতার দুঃখকষ্টের লাঘব করিয়াছেন। বন্ধুবরের মেয়েই তখন মা!

পথের পাশে বহুদিন পূর্বে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, ভুলিতে পারি নাই, এখনও চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবস্ত্রপরিহিত, দীর্ঘকায়, শ্মশ্রুগুম্ফাচ্ছাদিত-মুখমণ্ডল ভীষণাকার একটি লোক ততোধিক মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত একটি শিশুকে দুই হাতে ধরিয়া বুকে জড়াইয়া মস্তক নুয়াইয়া সমস্ত মনপ্রাণ যেন ঢালিয়া দিয়া চুম্বন করিল; তৎপরে পার্শ্বে দণ্ডায়মান সেইরূপ মলিন-জীর্ণ-বস্ত্রপরিহিতা একটি মেয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে সতৃষ্ণনয়নে শিশুর মুখের দিকে বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে তাকাইতে সম্মুখে ছুটিয়া চলিল ধাবমান মহিষদলের পিছনে। না গেলে নয়, তাই যেন প্রাণকে রাখিয়া শূন্য-দেহে ছুটিতেছে! আর এই প্রাণপুতলীকে খাওয়াইবার পরাইবার সুখে স্বচ্ছন্দে রাখার জন্যই তো তাহার বনে জঙ্গলে মহিষচারণা! বিস্ময় জন্মিল, আপাতদৃষ্টিতে কঠিন প্রস্তরসদৃশ এই শুষ্ক কর্কশ বক্ষাভ্যন্তরে মা মহামায়া! তুমি এমন স্নেহবাৎসল্য-প্রস্রবণরূপে লুক্কায়িত আছ! সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা মহাদেবী! সন্তশ্ছিন্নগ্রীবা রক্তপায়ী ব্যাঘ্রীর স্তনেও তুমি স্নেহ-দুগ্ধ-প্রবাহ! 'পুত্রতরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে প্রেমের প্রেরণ!!'

জয়রামবাটীর মুখুজ্যে পরিবারে শুভলগ্নে কুলোজ্জ্বলকারী দীপশিখা এক কন্যারত্নের আবির্ভাব! মুখুজ্যেরা চারিভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, তাঁহারই প্রথম সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহামায়া গৃহ আলোকিত, গৃহবাসীকে পরমানন্দিত, পাড়া-পড়শী আত্মীয়স্বজনকে সুখী পরিতৃপ্ত করিলেন। পরবর্তী কালেও উল্লসিতহৃদয় প্রতিবাসিনী বৃদ্ধাদের প্রসন্নমুখে মায়ের শুভ জন্মের অলৌকিক বৃত্তান্তের কথা শুনিয়া ধারণা হইয়াছে যে, এই অসাধারণ বালিকা জন্মমুহূর্ত হইতেই সকলের চিত্তাকর্ষণের পরমাদরের সামগ্রী ছিলেন। মায়ের মা তাঁহার পিত্রালয়ে শিহড়ে একদা একটি বিল্ববৃক্ষতলে বসিয়া থাকাকালে অলৌকিক সৌন্দর্য-মাধুর্য-মূর্তি এক শিশু-বালিকা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কন্যা হইয়া জন্মিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সেই দিব্যস্পর্শে তাঁহার আনন্দে বিস্ময়ে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সারদার জন্ম। কাজেই জন্মিবামাত্রই কন্যা সকলের 'দুলালী' হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে পরিণত বয়সেও তাঁহার খুল্লতাত অবিবাহিত ঈশ্বরচন্দ্র যে-সব কথা বলিতেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে আমাদের স্বচক্ষে দৃষ্ট একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিব। মায়ের এক খুড়ী ছিলেন ভাবি মাসীর মা। বৃদ্ধা তখন অন্ধ অচল; মা কলিকাতা যাত্রার পূর্বে জনৈক সন্তানকে পাঠাইলেন বৃদ্ধার

কাছে, হাতে কিছু দিয়া, তাঁহার প্রণাম জানাইয়া, আশীর্বাদ লইয়া আসিবার জন্য; শরীর খারাপ থাকায় তিনি নিজে যাইতে পারিবেন না। মা বলিয়া দিলেন, 'খুড়ীমাকে আমার ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে বলবে, দেহ অসুস্থ থাকায় আমি নিজে গিয়ে তাঁর পদধূলি ও আশীর্বাদ নিতে পারলুম না, যেন দুঃখিত না হন, অপরাধ ক্ষমা ক'রে স্নেহাশীর্বাদ করেন।' বৃদ্ধাকে মায়ের উক্তি নিবেদন করিলে তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'সারদা আমার কুলের গৌরব। বেঁচে থাকুক দীর্ঘকাল সুস্থদেহে সুখে স্বচ্ছন্দে ভগবানের কৃপায়; তাকে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আশীর্বাদ ভাল করে বলবে।' তৎপরে বৃদ্ধা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জোড়হস্তে কাতরভাবে সাশ্রুনয়নে ভগবানের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলেন, কুলের গৌরব সারদাকে দীর্ঘকাল সুস্থদেহে সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচাইয়া রাখার জন্য। বৃদ্ধার এই স্নেহমমতা দেখিয়া সন্তান বিস্মিত হইলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া মাকে নিবেদন করিলে মায়ের মনও পুলকিত হইল।

বৃহৎ পরিবারের এই স্নেহ-সমুদ্রের মধ্যে বালিকার উদয়। স্নেহরসের ভিতর লালন-পালন, স্নেহসুধায় পুষ্টি-বৃদ্ধি। মায়ের পিতৃকুল গরীব ব্রাহ্মণ, কায়িক পরিশ্রমে জীবিকার্জন। বাল্যকাল হইতেই বালিকার স্নেহ-বাৎসল্য-রসাস্বাদনে তাঁহারা ক্লান্ত দেহের, অবসন্ন মনের ক্লান্তি অবসাদ দূর করিতে আরম্ভ করিলেন। গরীবের পরিবারে সকলের সমবেত চেষ্টায় যেখানে ভরণপোষণ নির্বাহ হয়, তথায় পরস্পরের সৌহার্দ্য বেশী থাকে। স্নেহপাত্র শিশু-সন্তানগণ সেই যোগসূত্রের তন্তু। মা মুখুজ্যে পরিবারকে স্নেহপাশে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ করিলেন। আবার একটু বড় হইতে না হইতেই ঘরসংসারের কাজে সকলকে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন; বালিকা তখন বসিয়াছেন তাঁহাদের হৃদয় জুড়িয়া। খুকীকে যে দেখে সেই ভালবাসে, আদর করে, মায়ের কোলে চড়িয়া যেখানে যান, সেখানে সকলের দৃষ্টি পড়ে তাঁহার উপর।

বালিকা-বয়সেই তিনি শিহড়ে মামা-বাড়ীতে বনভোজনের সময় একত্রিত লোকদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে পতিরূপে নিজেই বরণ করিয়াছিলেন; 'কাকে বিয়ে করতে চাস?' এ প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গুলি-নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখাইয়াছিলেন। তখন ইহা হাসি-ঠাট্টার বিষয়রূপে গৃহীত হইলেও ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিয়াছিল, এবং আমরা জানি, কামারপুকুরে এই বালিকা বধূটি সকলের কাছেই পরম স্নেহ পাইয়াছিলেন, কন্যারূপে। এই স্নেহ-সিঞ্চনে ধনীও বাদ যায় নাই।* শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এই সময় অল্পকাল দেখা হইলেও তাঁহার অপার স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ তিনি প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন।

কিভাবে যৌবনের উন্মেষের পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহগন্ধ-হীন অপার ভালবাসার স্পর্শ আবার পাইলেন, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা ষোড়শী দেবী জ্ঞানে পূজা করিয়া এবং আরো বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তাঁহার মধ্যে বিশ্ব-মাতৃত্বের বিকাশ ঘটাইলেন এবং সেই মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া নিজেদের তাহাতে পরিপ্লাবিত করিয়া ধন্য হইবার জন্য কিরূপে অসংখ্য নর-নারী 'মা' 'মা' বলিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল, তাহা আমরা সকলেই জানি।

* ধনীর অনুজা শঙ্করীও পরবর্তী কালে মায়ের সেবা-শুশ্রূষায় জীবন সার্থক করেন।

কিভাবে নরঘাতক ডাকাত তাঁহার মুখে 'বাবা, আমি তোমার মেয়ে, সারদা'—এই একটি মাত্র কথা শুনিবামাত্রই সত্যসত্যই তাঁহাকে নিজ কন্যা বলিয়া মনে প্রাণে গ্রহণ করিল, তাহাও আমরা জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে সাক্ষাৎ জগৎ-জননী রূপেই দেখিতেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।"—বলিয়াছিলেন তিনি।

এসবই আমাদের সুপরিচিত ঘটনা, তাই আর বেশী পুনরুল্লেখ করিলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর মা ভক্তগণ-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন ও কিছুকাল সেখানে বাস করেন। সেখানে তাঁহার শোকতপ্ত হৃদয় অনেকটা শান্ত হইল, তিনি কঠোর সাধন-ভজনে মগ্ন হইলেন। এখানেই তাঁহার বিশেষ কৃপাবিতরণের আরম্ভ,—বলা যায় কৃপানির্ঝরিণী প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল—শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে তিনি স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষা দেন। এই কৃপাস্রোত ক্রমবিস্তৃত হইয়া পরবর্তী কালে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য অধ্যাত্মপিপাসুর তৃষ্ণা মিটাইয়াছিল, অসংখ্য পাপী-তাপীকে 'ক্ষমারূপা' মায়ের কোলে টানিয়া আনিয়া গায়ে লাগা ধূলা-কাদা মুছাইয়া অমৃতলোকের, আনন্দলোকের সন্ধান দিয়াছিল।

বৎসরাধিককাল শ্রীবৃন্দাবনে কাটাইয়া মা হরিদ্বার, হৃষীকেশ, পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি দর্শনান্তে কামারপুকুরে ফিরিয়া আসিলেন। গোলাপ-মা সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরেই মাকে তথায় একা রাখিয়াই তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিতে হইল, সেখানে তাঁহার থাকা সম্ভব নয়, মা-মেয়ে উভয়েরই কষ্ট বাড়িবে। কামারপুকুরে নিঃসঙ্গ-জীবন মায়ের মন উধ্বর্লোকে বিচরণ করিত সর্বদা এবং বাহ্যিক অভাব-অনটন, শারীরিক সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট কিছুই গ্রাহ্য হইত না। সেই সময়ে কামারপুকুরে মায়ের ভাসুর রামেশ্বরের স্ত্রী, পুত্র রামলাল ও শিবরামের স্ত্রী, কন্যা লক্ষ্মীদিদি প্রায়ই থাকিতেন এবং রামলাল দাদা দক্ষিণেশ্বরে বেশীর ভাগ থাকিলেও মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরেও আসিতেন। মায়ের ভিক্ষাপুত্র শিবরাম প্রায় সর্বদাই তথায় উপস্থিত থাকিয়া রঘুবীরের পূজা, বাড়ীঘর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। মায়ের মন তখন সর্বদাই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল। সেইজন্য তিনি সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া আপনার ভাবেই চলিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে যে ঘরখানা দিয়াছিলেন, পৃথক্‌ভাবে সেই ঘরেই বাস করিয়া পাকশালের একাংশে স্বহস্তে রন্ধন ও ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া শাকান্ন-প্রসাদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভাসুর-পুত্রগণের সংসারের ঝঞ্ঝাটে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক রহিল না।

সেই সময় লাহাকন্যা বৃদ্ধা প্রসন্নময়ী ও ঠাকুরের ভিক্ষামাতা ধনী কামারিণীর দেহত্যাগের পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শঙ্করী মাকে পুত্রবধূ বা মেয়ের মতোই স্নেহ-যত্ন করিতেন শুনা যায়। আরও একটি বালবিধবার কথা শুনিয়াছি, তাঁহার নাম মনে পড়িতেছে না—তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যকালের সখা বৃদ্ধ ভক্ত শ্রীনিবাস বা চিনু শাঁখারীর কন্যা। তিনিও কিঞ্চিৎ সঙ্গতিশালিনী ছিলেন এবং প্রসন্নময়ীর মতো দেবসেবা সাধুসেবা ও ধর্মকর্মে তাঁহার খুব মতি ছিল। সন্তানহীনা এই রমণীত্রয়ের ছিল ঠাকুর-মায়ের উপর বাৎসল্য-ভক্তি এবং

কামারপুকুরে বাসকালে, যতদিন মা সেখানে থাকিতেন, তাঁহারা জীবিত থাকা পর্যন্ত মাকে কন্যার মতো স্নেহ করিতেন, সদাসর্বদা খোঁজ খবর লইতেন, নানাবিষয়ে সহায়তা করিতেন। এমন কি প্রয়োজনানুসারে রাত্রে আসিয়া শঙ্করী তাঁহার ঘরে বাসও করিতেন। ঠাকুর দিব্যভাবে অবস্থান করিয়া মন্দিরের পূজাকার্য ত্যাগ করিলেও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষ তাঁহার জন্য নিত্য প্রসাদ ও তাঁহার পূর্বের মাসিক বৃত্তি নিয়মিতভাবে পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। টাকাটা তিনি গ্রহণ না করায় মাতাঠাকুরানীকেই দেওয়া হইত, কিন্তু মা দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিলে পর উহা বন্ধ হয়, যদিও নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিষ্য-সন্তানগণ উহা কায়েমী রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু ফলোদয় হয় নাই। ঠাকুর মায়ের জন্য সামান্য কিছু টাকার ব্যবস্থা রাখিয়া যান। তাহা হইতেই মাসে মাসে কিছু পাওয়া যায়, এই সম্বল। আর ঠাকুর শিহড়ে জমি ক্রয় করাইয়া রঘুবীরের নামে দেবোত্তর করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই জমির ধানের অংশ ও কামারপুকুরে সুখলাল গোস্বামী তাঁহার শ্বশুর ক্ষুদিরামকে লক্ষ্মীজলায় যে এক বিঘা দশ ছটাক জমি দিয়াছিলেন সেই জমির ধানে তাঁহার একটা অংশ, মা যাহা পান, তাহা স্বহস্তে ঢেঁকিতে কুটিয়া চাল তৈরী করেন, আর যখন যেমন জুটে শাক তরকারী স্বহস্তে রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদে জীবনধারণ করেন। তাঁহার মন অতীন্দ্রিয়লোকেই থাকে সদাসর্বদা, কাজেই বাহ্যিক দুঃখকষ্ট গ্রাহ্য হয় না। ঠাকুর তাঁহাকে কামারপুকুরে থাকিতে বলিয়াছিলেন, মা সেই আজ্ঞা পালন করিতেছেন। মায়ের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সন্তান-গণের নিজেদেরই মাথা রাখিবার স্থান নাই, পেটে দিবার অন্নের অভাব, তাঁহারা মায়ের কি সেবা করিবেন? তাছাড়া তাঁহারা কামার-পুকুরে এই কালে মায়ের খাওয়া-পরার কষ্টের কথা জানিতেনও না। তথাপি মায়ের অভাব-অনটন ও শারীরিক কষ্টের কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইবামাত্র গৃহী ভক্তদিগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া মায়ের থাকার সুব্যবস্থা করিয়া কামারপুকুর হইতে মাকে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন।

এখন হইতে মা কলিকাতা ও কামারপুকুর উভয় স্থানেই মধ্যে মধ্যে বাস করেন। পরে কামারপুকুরে বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া তাঁহার গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরী প্রাণের দুহিতাকে অনেক বলিয়া কহিয়া পিত্রালয়ে বাস করিতে রাজী করাইলেন। গর্ভধারিণীর প্রতি কন্যার অতিশয় অনুরাগ শ্রদ্ধা ভক্তি, মায়েরও কন্যার প্রতি টান স্নেহ মমতা অপরিসীম, তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। জয়রামবাটীতেও প্রথমে মায়ের অধিক-কাল থাকা হইত না এবং যখন থাকিতেন সাংসারিক কার্যে গর্ভধারিণীর সর্বপ্রকারে সহায়তা ও স্বহস্তে অনেক কার্য নিষ্পন্ন করিলেও মন ঊর্ধ্বলোকেই বিচরণ করিত। অধিকাংশ সময়ই আপনার ভাবে তন্ময় থাকিতেন; সংসারের সঙ্গে, সংসারী লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। কেহ তাঁহার সমীপস্থ হইতেও সাহস পাইত না। অবশ্য ভক্ত সন্তান-গণের সঙ্গে মায়ের সস্নেহ ব্যবহার সর্বদাই ছিল, তাঁহারা বহু কষ্টে দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করিয়া সময় সময় তাঁহাকে দর্শন করিতেও আসিতেন, কিছুকাল তাঁহার চরণপ্রান্তে বাস ও অপার্থিব স্নেহসুধা আস্বাদন করিয়া প্রাণ জুড়াইতেন। পরে রাধির আবির্ভাব হইল, মায়ের মন নীচে নামিল, মায়ের অপার স্নেহ-কৃপা সর্বসাধারণ আস্বাদন করিতে পাইল।

মা উত্তরাঞ্চলে যেমন সন্তানগণসঙ্গে তীর্থদর্শন ও উচ্চ অনুভবাদি করিয়া ঐসকল স্থানের মহিমা খ্যাপন করেন, সেইরূপ দাক্ষিণাত্যেও ভক্ত সন্তানগণের বিশেষ আগ্রহে সদলবলে গিয়া রামেশ্বর মীনাক্ষী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করেন এবং ঐসকল স্থানে মায়ের বিশেষ উচ্চ অনুভব হয় এবং সঙ্গিগণও আনন্দ লাভ করেন। তখন মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ মঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মা বহু ভক্তকে কৃপা করেন। ভিন্নদেশীয় ঐসকল স্ত্রীপুরুষ মায়ের ভাষা বুঝিতেন না, মাও তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অতীব উল্লসিত ও নিজেদের পরম কৃতার্থ মনে করিতেন, মাও তাঁহাদের আন্তরিক ভাবভক্তিতে খুব সন্তুষ্ট হইতেন। পরস্পর সম্পূর্ণ অজানা অচেনা—আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত ভিন্ন, বাক্য-বিনিময় সম্ভব নহে, তাহা সত্ত্বেও এই যে আত্মসমর্পণ ও গ্রহণ, ইহা কিরূপে সম্ভব? দুই-একটি শব্দ-উচ্চারণ, আর হাবভাব, দৃষ্টি কিরূপে এই চিরস্থায়ী মধুর সম্পর্কে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ করিল বহু নরনারীকে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় সত্য; কিন্তু যখনই মনে পড়ে মায়ের ও সন্তানের হৃদয়ের চিরমিলনের কথা, তখন আর কোন সংশয় থাকে না। ছোট শিশু ও তাহার মায়ের সম্পর্ক কি মায়ের সঙ্গে সুন্দর সুস্পষ্ট বাক্যবিনিময়, কিংবা সুষ্ঠু শোভন আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে? মা চাহিলেন সন্তানের দিকে, সন্তান চাহিল মায়ের মুখের দিকে—বড়জোর দুই জনের দুইটি অস্পষ্ট বাক্য 'মা' 'বাবা' ধ্বনিত হইল! আর কি কিছু প্রয়োজন আছে? বাহ্যিক আড়ম্বরে ঢাক ঢোল শানাই কাঁসি বাজাইয়া রাশীকৃত পুষ্পমাল্য চন্দন অগুরু ধূপ দীপ সাজাইয়া মনোহর চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াও মন! তুমি এমন অনাবিল আনন্দ পাও নাই, অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের পিয়াস মিটে নাই, অশান্তি আরও বাড়াইয়াছ মাত্র। দেখ-বুঝ-শিখ এই নূতন প্রণালীর দীক্ষা-সাধনা। তোমার শত জন্মের যত পাপ এক মুহূর্তে জুড়াইবার জন্য জগৎকারণের কি করুণা! সব ভুলিয়া সব ছাড়িয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চল মায়ের কাছে—মা বলিয়া ডাক, জননী তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিবেন, স্নেহের ডাক শুনিবে—'বাবা, এসো'; তোমার দীক্ষা-সাধনা-সিদ্ধির সেই মুহূর্তেই পরিসমাপ্তি।

দাক্ষিণাত্যবাসিগণের ন্যায় অন্য ভাষাভাষী অন্য দেশের ও অন্য জাতির আরও ভক্তগণকে মা এইরূপে বিভিন্ন সময়ে কৃপা করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই এইভাবে নিজ নিজ অন্তরে মায়ের অপার স্নেহকৃপা উপলব্ধি করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিয়াছেন। ভগবান পরমাত্মা পরব্রহ্ম-তত্ত্ব—আমি তাঁহার দাস, তাঁহার অংশ, 'তিনিই আমি'—উপলব্ধি করার সর্বাপেক্ষা সহজ সরল সুগম মার্গ—'তুমি মা, আমি সন্তান'—ইহকাল পরকাল চিরকাল! স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ কারণ-দেহ তোমা হইতে প্রাপ্ত, তোমাতেই আশ্রয় করিয়া আছে, তোমাতেই মিলিয়া যাইবে, তুমিই মহাকারণ, জগজ্জননী! আমি সর্বকালে সর্বদেহে সর্বদা তোমারই স্নেহাঙ্কে আছি, যখনই অন্য অভিলাষে তোমাকে ভুলি, তখনই দুঃখ কষ্ট পাই, কাঁদি—তুমি শান্ত কর; এবার আর ভুলিব না, আর কিছু চাহিব না—চিরশান্তি দাও। এই নব যুগের দীক্ষা পাইয়া বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ-স্বদেশী-বিদেশী বহু লোক জীবন সার্থক করিয়াছে।

মা একবার ৺বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু ও তাঁহার জননী এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গের বিশেষ আগ্রহে কোঠারে তাঁহাদের জমিদারী-

দেবালয়ে গিয়া কিছুদিন থাকেন। সেই সময়ে জনৈক দেশী খৃষ্টান ভক্তকে মা কৃপা করেন। তখনকার দিনে এইরূপ সমাজবিরুদ্ধ কার্যের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তথা হইতে ৺জগন্নাথদর্শনে গিয়া পুরীতেও কিছুকাল ছিলেন। উড়িষ্যাবাসী অতি আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান কোন কোন ভাগ্যবান তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মায়ের অলৌকিক দর্শনাদি, উচ্চ ভক্তিভাব সকল তীর্থেই প্রকাশিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মা ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে কাশীতেও গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছেন এবং সেই মুক্তি-ক্ষেত্রের বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার প্রত্যক্ষ দর্শন ও মহিমার কথা সন্তানদের নিকট মুক্তকণ্ঠে বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর গয়া বা পুরীতে যান নাই, গেলে অতি উচ্চভাবারূঢ় হইয়া তাঁহার দেহত্যাগের আশঙ্কা! শুনিয়া ভক্তগণ আশঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি নিজেও এজন্য উৎসাহ করেন নাই। মাকে ঠাকুর গয়াতে গিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডদানের কথা বলিয়া-ছিলেন। মা সেখানে গিয়া ঐসকল কার্য সুসম্পন্ন করেন অতীব বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা সহকারে। তারকেশ্বরে মা গিয়াছিলেন ঠাকুরের অসুখের সময়, হত্যা দিয়া স্বামীর অসুখ সারাইবার জন্য, কিন্তু দৈবশক্তিতে জানিতে পারিলেন, ইহা অসম্ভব। নিজের অসুখের জন্যও পিত্রালয়ে থাকিতে 'মানত' ছিল, সেই মানত-পূজাদির জন্য পূর্বেও একবার মা তথায় গিয়াছিলেন।

সকল দেবদেবীর পূজা ব্রত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠানে মায়ের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল এবং সাধ্যমত ঐসকল পালনও করিতেন। এইভাবেই বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে অবস্থানকালে একসময় দুঃসাধ্য পঞ্চতপা সাধন করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মের রৌদ্রে ছাদের উপর ঘুঁটের চারিটি আগুন জ্বালাইয়া তন্মধ্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থিতি। এইরূপ ক্রমাগত সাত দিন উদয়াস্ত তপস্যা। যোগীন-মাও তাঁহার সঙ্গে এই ব্রতানুষ্ঠান করেন। তীর্থযাত্রা ব্রত পূজা ইত্যাদি সকল ধর্মকর্মেই তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ অনুষ্ঠান, প্রচলিত প্রথাদির অনুসরণ, পাণ্ডা-পূজারী-ব্রাহ্মণগণকে সম্মান প্রদর্শন ও যথোপযুক্ত দক্ষিণাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করা এবং সর্বোপরি লোকব্যবহারে কাহাকেও কোন প্রকারে কষ্ট না দেওয়া, এমনকি যাহারা কাছে থাকিত না, তাহাদেরও সেবাশুশ্রূষার জন্য, তাহাদের অন্তরে কোন প্রকারে অসন্তোষের সৃষ্টি না হওয়ার জন্য সতত চেষ্টা—অতীব হৃদয়গ্রাহী। যাঁহারা তাঁহার সেবা করিবার জন্য সঙ্গে থাকিতেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি জননীতুল্য স্নেহ-ব্যবহার করিয়া সুখী রাখিতেন এবং নিজে সেবা গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁহাদিগকেই সেবা করিয়া সুখী রাখিতে তৎপর হইতেন সর্বদা।

সামান্য দৈনন্দিন ব্যবহারিক বিষয়েও মা পরের মন দেখিয়া চলিতেন সব সময়ে, যাহাতে কোনও কথায় বা কাজে কাহারো মনে কখনও আঘাত না লাগে। আবার জগতের কোন বস্তুরই অপেক্ষা নাই তাঁহার, সর্বদাই স্বাত্মস্থা! মায়ের এই অদ্ভুত ভাব, ভাবাতীত অবস্থা পূজনীয়া যোগীন-মা ও গোলাপ-মাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষ করিতেন। সেইজন্যই দেখা যাইত তাঁহাদের মন প্রাণ যেন সর্বদাই মায়ের কাছে রহিয়াছে, আর দৈনন্দিন ব্যবহারের ভিতর একদিকে যেমন সাক্ষাৎ ইষ্টদেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তির অন্ত নাই, অন্যদিকে তেমনি মায়ের-মেয়ের দেহকে সুস্থ সবল নীরোগ ও আরামে রাখিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন উদ্যম। মাও উভয় ভাবেই তাঁহাদের ভক্তি সেবা ও

স্নেহবাৎসল্য স্বীকার করিয়া পরম পুলকিত করিতেছেন। আর যিনি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সারদানন্দ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন, সেই মাতৃগতপ্রাণ মায়ের দ্বারী মহাভাবময়ী দেবীকে উভয় ভাবেই যুগপৎ প্রত্যক্ষ করেন। উদ্বোধনে দ্বারের সংলগ্ন ঘরে বসিয়া মহারাজ পাহারা দিতেন, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন যখন তখন গিয়া মাকে বিরক্ত না করেন, তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়; অবাঞ্ছিত অনধিকারী মাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার পবিত্র দেহে পীড়া উৎপাদন না করে, হাঙ্গাম হুজুগের অবকাশ না পায়। মায়ের একখানি ফটো পাওয়াও অতীব কঠিন ব্যাপার! মা গোপনে থাকিতে চান, শরৎ মহারাজ সেজন্য সর্বপ্রকারে সতত যত্নশীল; আবার যখন মা কোন ভক্তকে স্বয়ং বিশেষভাবে কৃপা করেন, তখন ভক্তিবিনম্রচিত্তে মস্তক অবনত করিয়া বলেন, 'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন'। গোলাপ-মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—ভাবুক ভক্ত ভাবের আতিশয্যে মায়ের অস্বস্তি উৎপাদন না করে। সেজন্য জনৈক ভক্ত মায়ের শ্রীপদে অঞ্জলি প্রদান ও প্রণামান্তে ন্যাস প্রাণায়াম করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিতে থাকিলে গোলাপ-মা তাঁহাকে ধমক দিলেন, 'এ কি কাঠের ঠাকুর পেয়েছ যে, ন্যাস-প্রাণায়াম ক'রে তাঁকে চেতন করবে? মা যে ঘেমে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন!' দেখিয়া গোলাপ-মার প্রাণ অস্থির, তাড়াতাড়ি তুলিয়া আনিয়া, গায়ের চাদর খুলিয়া দিয়া, সুস্থির হইলেন। এরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে কি হইবে? জগদম্বা কখন কখন সব নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া নিতান্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকেও কৃপা করেন, নিজে দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াও। গোলাপ-মা, যোগীন-মা নীরবে দেখেন অশ্রুপূর্ণ-লোচনে। মেয়ে কাঁদেন মায়ের জন্য, মা কাঁদেন মেয়ের জন্য, উভয় পক্ষে পরস্পরের প্রতি সমান টান, মারূপে মেয়েরূপে অদ্ভুত লীলা।

জয়রামবাটীতে মা ম্যালেরিয়াতে ভীষণ অসুস্থ। পূজনীয় শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা গিয়াছেন কলিকাতা হইতে অতি ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া; সঙ্গে সেবক-সেবিকা, দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার—হোমিওপ্যাথ কাঞ্জিলাল, এ্যালোপ্যাথ সতীশ বাবু। তাঁহারা আসিতেছেন শুনিয়াই ভাবনা বাড়িল মায়ের অন্তরে। এই দুর্গম রাস্তায় না জানি কত কষ্ট হইয়াছে তাঁহাদের! নিজের অসুখের কথা মনে নাই। 'এই মোটা শরীরে এতদূর আসা, শরতের না জানি কত কষ্ট হইয়াছে—যোগেন, গোলাপ তাহারাই বা কত কষ্ট করিয়া আসিতেছে!' এই সব উক্তি করিতেছেন, আবার নিকটবর্তী সন্তানকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'হ্যাঁগা, শরতের কেন এত কষ্ট ক'রে আসা?' তিনি নানা কথা বলিয়া অবুঝ বালিকাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের পৌঁছিবার সময় নিকটবর্তী হইলে মা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, 'বেলা হলো, রোদে তাহারা কত কষ্ট ক'রে এতদূর হেঁটে আসছে!' তাঁহাদের বিষ্ণুপুর হইতে কোয়ালপাড়া পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়া, সেখান হইতে জয়রামবাটী পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া আসিবার কথা। তাঁহারা মায়ের বাড়ী পৌঁছিলেন। শরৎ মহারাজ বাহির ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যোগীন-মা, গোলাপ-মা ভিতরে গিয়া মায়ের শয্যাপার্শে উপস্থিত।

যোগীন-মাকে দেখিয়াই দুঃখিতভাবে মা বলিলেন, 'হ্যাঁগা যোগেন, তোমাদের কেন এত কষ্ট ক'রে আসা?' যোগীন-মাও অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, 'তোমায় না দেখে যে থাকতে পাচ্ছিলুম নি, মা। অসুখ শুনে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল, তাই ছুটে এলুম।' চিকিৎসা-যত্নে, ঔষধ-পথ্যে মা শীঘ্রই সারিয়া উঠিলেন। [ক্রমশঃ]

গীতাপ্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

আগের দিন আমরা পড়েছি যে, যে ব্যক্তিকে সুখদুঃখ, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব পীড়া দিতে পারে না, তিনি অমরত্ব লাভ করেন।[১]

বলা বাহুল্য, সুখদুঃখাদি মনের উপরে প্রতিক্রিয়া করবে। সুখে সুখবোধই হয়, দুঃখে দুঃখবোধই হয়। সুখ আর দুঃখকে তুল্য বোধ করা মানে অনুভবশক্তির অভাব। তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান বলেছেন যে, সুখ এবং দুঃখ যাকে পীড়া দিতে পারে না, সে অমরত্বলাভের যোগ্য হয়। সুখ আর দুঃখ যাকে পীড়া দিতে পারে না—এ কথার আপাতপ্রতীয়মান অর্থ নিলে, বলতে হয় মানুষ কি তাহলে গাছপাথর হবে? কিন্তু গাছপাথর হওয়া তো আর অমরত্ব নয়! সুতরাং শ্রীভগবানের উক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হবে।

অমরত্ব মানে হল আত্মার অপরিবর্তনশীলতা—আত্মার অবিকারিত্ব। আত্মার অবিকারিত্ব যিনি জেনেছেন, তিনি সুখদুঃখকে আত্মধর্ম ব'লে গ্রহণ করেন না। সুখ বা দুঃখ আত্মার ধর্ম নয়—অন্তঃকরণের ধর্ম। এবং অন্তঃকরণ আত্মবস্তু নয়। এইটি জানলে তখন আর সুখদুঃখ আত্মাকে পীড়া দিচ্ছে, একথা মনে হয় না। এরই নাম অমরত্ব-লাভ। অমরত্ব-লাভ মানে এ নয় যে, অনন্ত কাল ধ'রে একজন এই শরীর-মন নিয়ে জগতের বিষয়গুলিকে ভোগ করবে।

দেহ মাত্রেই পরিণামী। যা কিছু সাবয়ব বস্তু, তা-ই পরিণামী বিকারী পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনের দুটি দিক—প্রথমটি হ'ল জন্ম আর শেষটি হ'ল মৃত্যু। জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি—ভাববস্তুর এই ছটি বিকারের কথা শাস্ত্র বলেছেন। ভাববস্তু মানে বিদ্যমান বস্তু। তার এই ছটি বিকার হয়। এমন কোন সাবয়ব বস্তু নেই, যার এই ছটি বিকার হয় না। উৎপত্তি এবং বিনাশ হ'ল প্রথম ও শেষ বিকার—মাঝখানের চারিটি হ'ল স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয়। এইগুলি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, যদি কেউ দেহধারী হন, তা হলে তিনি অমর হতে পারেন না।

মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এক একটি মানুষ মরে যায়, এক একটি প্রাণী মরে যায়—এই রকম বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখে শেষে মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দেহধারী মাত্রেই মরণশীল। ন্যায়শাস্ত্রে একে induction বলে অর্থাৎ 'বিশেষ' থেকে 'সামান্য' সিদ্ধান্তে আসা।

যুক্তির দ্বারা আমরা বুঝি এই নিয়ম মনুষ্যলোকেও যেমন সত্য, দেবলোকেও তেমনি সত্য। দেবতাদের অমর বলা হয়। প্রশ্ন হল: দেবতারা দেহধারী কিনা? যদি দেহধারী হন, তাঁদেরও বিনাশ হবে। আধুনিক তার্কিক মন দেবগণের অমরত্ব স্বীকার করতে পারে না—শাস্ত্রও দেবগণের অমরত্বকে আপেক্ষিক বলেন।

মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, সে অমর হবে। যদি এই দেহে সে অমর না হতে পারে, তা হলে কল্পনা করে একটি স্বর্গের, যেখানে গিয়ে সে

---

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট)।

১ যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ (গীতা, ২।১৫)

অমর হয়ে থাকবে। এবং সেই অনুসারে শাস্ত্রের সমর্থনও সে বেছে নেয়। শাস্ত্র বলেছেন যে, 'অপাম সোমম্ অমৃতাঃ অভূম' (ঋগ্বেদ সংহিতা, ৮।৪৮।৩)। কোন সময়ে দেবতাদের মধ্যে বিচার হয়েছিল—'আমরা কি ক'রে অমর হয়েছি?' বিচারে নিশ্চয় ক'রে তাঁরা বলেছিলেন, 'আমরা সোম(রস) পান করেছিলুম, তাই) আমরা অমর হয়েছি।' অর্থাৎ আমরা এককালে যাগ-যজ্ঞাদি করেছিলুম এবং সেই যাগ-যজ্ঞাদি করার ফলে আমরা অমরত্ব লাভ করেছি। পরবর্তী কালে উপনিষদে আমরা এর প্রতিবাদ দেখতে পাচ্ছি। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন: 'তদ্ যথা ইহ কর্মচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে, এবম্ এব অমুত্র পুণ্যচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে' (ছা. উ. ৮।১।৬)—যেমন এই জগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই রকম পরলোকেও—স্বর্গাদি লোকেও - পুণ্যের দ্বারা অর্জিত ভোগ্যবস্তুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষ থেকে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল এবং অননুভূত যে বিষয় অর্থাৎ দেবলোকে দেবগণের তথাকথিত অমরত্ব সম্বন্ধে অনুমানের দ্বারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, উপনিষদও সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করছেন। মুণ্ডক উপনিষদও বলছেন (১।২।৭):

'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥'

—এই যে আঠারোটি লোক মিলে যাগযজ্ঞ করা হয়, এ সব হচ্ছে বিনাশশীল; অর্থাৎ যজ্ঞের যত কিছু উপকরণ, বাহ্য বস্তু এবং ষোলজন ঋত্বিক, যজমান ও যজমানপত্নী—সবই এবং সবাই বিনাশশীল। এসব যাগযজ্ঞ অবর—অতি নিকৃষ্ট; যে সব মূর্খ এগুলিকে শ্রেয়োলাভের উপায় মনে ক'রে সমাদর করে, তারা কিছুকাল স্বর্গভোগের পর আবার জরামৃত্যুর অধীন হয়—তাদের মুক্তি হয় না। এবং এই কারণেই ঐ সব সকাম যাগযজ্ঞের নিন্দা করা হয়েছে। গীতাতেও এগুলির নিন্দা করা হয়েছে। শ্রীভগবান বলছেন (২।৪২-৪৪):

'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

—হে অর্জুন, অবিবেকী লোকেরা বেদোক্ত যাগযজ্ঞের প্রশংসা করে; তাদের মতে ঐ সব যাগযজ্ঞের চেয়ে বড় আর কিছু নেই; তারা সকাম—স্বর্গে যেতে চায়। তারা জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ বহু ক্রিয়াকাণ্ডের প্রশংসা ক'রে থাকে। তাদের সেই সব আপাতমনোরম বাক্যের দ্বারা বিমূঢ়, ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত লোকেদের অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উদিত হয় না অর্থাৎ তাদের মন আত্মবস্তুতে স্থির হয় না।

মানুষের মন চাইছে, 'আমি একটা সহজ উপায়ে অমরত্ব লাভ করবো, ইহকালের সুখসমৃদ্ধি পরকালেও স্থায়ী ক'রে রাখবো।' তাই মানুষ স্বর্গে অমরত্বের কল্পনা করে। এই যে মানুষের মনের কল্পনা, এটি তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত। শাস্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, কল্পনা যতই করো, তা সোনালী কল্পনাই। তা কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। বার বার ক'রে শাস্ত্র এ সম্বন্ধে দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছেন। মানুষের মনের এই যে সোনালী

স্বপ্ন, তা ভাঙবার জন্য শাস্ত্র বার বার আঘাত করছেন। যুক্তিও এর প্রতিকূল। তা সত্ত্বেও মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হোতে পারে না। এই হল সাধারণ পরিস্থিতি।

আমরা আগেকার কথায় ফিরে যাই। যে-শ্লোকটির আমরা আলোচনা করছি, তার প্রতিপাদ্য হ'ল—সুখদুঃখাদি যা আমার ধর্ম নয়, সেগুলিকে আত্মার ধর্ম মনে ক'রে মানুষ পীড়া বোধ করে। যদি সে বুঝতে পারে যে, এগুলি আত্মধর্ম নয়, আত্মার উপরে এগুলি আরোপিত হচ্ছে মাত্র এবং এই আরোপের দ্বারা আত্মাতে বাস্তবিক কোন পরিবর্তন হয় না, আত্মা কখনো পরিণাম প্রাপ্ত হন না—যদি সে বুঝতে পারে যে, আত্মা দেহের ধর্ম, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, অন্তঃকরণের ধর্ম, এসব ধর্মের অতীত, তাহলেই সে স্বাভাবিকভাবেই অমরত্ব লাভ করতে পারে।

বলা বাহুল্য, অমরত্ব এমন একটি বস্তু নয় যা বর্তমানে নেই, কর্মাদি ক'রে ভবিষ্যতে লাভ করতে হবে। যদি এরকম হোত, তা হ'লে অমরত্ব আর স্থায়ী হোত না। 'যৎ কৃতকং তদ্ অনিত্যম্'—যা কিছু কর্মের পরিণাম, তাই অনিত্য। সুতরাং, শুভকর্ম, যাগ-যজ্ঞই হোক, উপাসনাই হোক, এমনকি ব্রহ্মবিচারই হোক, তার দ্বারা যদি এই আত্মস্বরূপ অর্জিত হোত, তা হলে সে আত্মস্বরূপের বিনাশও হয়ে যেত। সুতরাং, শাস্ত্র বলেন যে, আত্মস্বরূপটি অর্জিত হয় না। এটি হল আমাদের স্ব-ভাব, স্ব-রূপ। মাত্র আমরা এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই। এই স্বরূপে আমরা এখন প্রতিষ্ঠিত থেকেও নেই। কেন নেই?—না, আমরা মনে করছি আমরা আত্মা থেকে ভিন্ন। আত্মস্বরূপ যা, তা বিস্মৃত হয়ে আত্মাকে দেহাদিধর্মবিশিষ্ট ব'লে মনে করছি। আমাদের ভেতরে এমন কে আছেন, যিনি না মনে করছেন, 'আমি অমুক ব্যক্তি, আমার অমুক সালে জন্ম, আবার এক সময়ে মৃত্যু হবে'? তা এই যে মানুষের নিজের উপরে জন্ম-মৃত্যু আদির আরোপ, এটি অজ্ঞান থেকে হচ্ছে। অজ্ঞান দূর হলেই মানুষ জানতে পারে যে, সে চিরকাল অমর—তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, অজর অমর অভয় আত্মা সে। সুতরাং, করার যা-কিছু তা শুধু অজ্ঞান দূর করবার জন্য—চিত্তকে শুদ্ধ করবার জন্য। চিত্ত শুদ্ধ হলেই আত্মার অমরত্ব সেই শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত হয়।

কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব কথা শুনেও ধারণা করতে পারে না। সে সুখ খোঁজে, বোঝে না যে, সুখটাও দুঃখরূপ। যে সুখ স্থায়ী নয়, যে সুখ পরিণামে থাকবে না, সে সুখ দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। সুখ যদি অনিত্য হয়, তার আসল স্বরূপ হ'ল দুঃখ। এইজন্য গীতায় ভগবান বলেছেন: 'অনিত্যম্ অসুখং লোকম্'। এই জগৎটা অনিত্য; সুতরাং, সুখকর নয়। এই সিদ্ধান্ত আমরা ভুলে যাই আর শাস্ত্র থেকে নিজের মনের অনুকূল উক্তি খুঁজে বের করি এবং সে-সব উক্তির গভীরে না গিয়ে নিজেদেরই মনগড়া অর্থ ক'রে থাকি।

উপনিষদ বলছেন: 'অনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি' (বৃহ.উ. ৩।১।৯)—মন অনন্ত ব'লে প্রসিদ্ধ, কারণ মনের বহু বৈচিত্র্য—অসংখ্য তার বৃত্তি; বিশ্বদেব নামক দেবতাগণও অনন্ত। এই সাদৃশ্য আছে ব'লে মনকে বিশ্বদেবগণরূপে উপাসনা করলে অর্থাৎ মনে বিশ্বদেব-দেবতাদৃষ্টি করলে উপাসক অনন্তলোক জয় করেন। এই যে অনন্তলোক জয় করা, এটা আমরা বুঝতে পারছি শ্রুতির শেষ সিদ্ধান্ত নয়। লোক হলে সেটা অনন্ত হবে না। লোক হলে দৈশিক আনন্ত্য থাকবে না, কালিক

আনন্ত্য থাকবে না এবং বস্তুগত আনন্ত্যও থাকবে না অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুর দ্বারা তা পরিচ্ছিন্ন হবে। দেশ কাল বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সমস্ত ভোগ্য বস্তুই। সুতরাং, ভোগ্য বস্তুগুলিকে যদি কেউ অপরিচ্ছিন্নরূপে ভোগ করবার আশা রাখে, সে মূর্খ হবে। সে যুক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করছে।

শাস্ত্রে ঐ ধরনের কথা আরও আছে:

'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতম্'

(আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ২।১।১)

—চাতুর্মাস্য যাগ যাঁরা করেন, তাঁদের পুণ্যফল অক্ষয় হয়।

আমাদের দেশে মেয়েরা ব্রত করেন, অনন্ত চতুর্দশী ব্রত। বলা হয়, তাতে অনন্ত ফল লাভ হয়। এ সব কথা গীতার ভাষায় 'পুষ্পিতা বাক্' মাত্র। আপাতমনোরম পলাশাদি ফুলের মত। ব্রতের ফল নেই যে, তা নয়। ফল আছেই, কিন্তু তা কখনো অনন্ত হোতে পারে না; চাতুর্মাস্য যাগাদিরও ফল অক্ষয় হোতে পারে না। এই হল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, যুক্তির সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্ত আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা যে ভ্রমে পতিত, তা থেকে উদ্ধার পাবার উপায় হ'ল, এই রকম বিচার করা যে, সুখদুঃখ আদি আমার—আত্মার—ধর্ম নয়। সুতরাং সেগুলির সঙ্গে নিজেকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ মনে ক'রে যেন কষ্ট না পাই। আসলে সুখ-দুঃখাদি তো আত্মাকে স্পর্শই করতে পারে না। এই বিচারসহায়েই আমরা অমরত্ব লাভ করবো, অন্য উপায়ে নয়। এই কথা বলেছেন বৃহদারণ্যক উপনিষদ। বারংবার আমি সে-কথাটির উদ্ধৃতি দিই:—আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু-সঞ্জ্বরেৎ' (বৃহ. উ. ৪।৪।১২)—যদি আত্মাকে কেউ 'আমি ইনি' এইভাবে জানতে পারেন, তা হলে তিনি আর কি ইচ্ছা ক'রে, কি প্রয়োজনে এই দেহের দুঃখ অনুসারে দুঃখভোগ করবেন? একথা বলার তাৎপর্য কি?—না, দেহের দুঃখকে তিনি আত্মার দুঃখ ব'লে মনে করেন না, দেহের সুখকে তিনি আত্মার সুখ ব'লে মনে করেন না, দেহের ধর্মকে আত্মার উপর আরোপিত করেন না। কারণ, তিনি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। আত্মস্বরূপ কি রকম? —না, অনন্ত অপার আনন্দস্বরূপ, যে আনন্দের পার নেই, যে আনন্দ দেশের দ্বারা, কালের দ্বারা বা কোন অন্য বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়—ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য যে আনন্দের কখনো ব্যাঘাত হবে না, কখনো লোপ হবে না। যিনি এই আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অমরত্ব লাভ করেছেন। এই কথাই গীতার ঐ 'যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে…' শ্লোকটিতে (২।১৫) বলা হয়েছে।*

* ৯ই অগস্ট ১৯৭৫, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে গীতা-আলোচনার প্রথমাংশ। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

আমন্ত্রণ*

স্বামী বিবেকানন্দ

[অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ]

রোদন কিহেতু সখা ? সর্বশক্তি তোমারি তো অন্তরে নিহিত।
জ্ঞান-বীর্য-প্রদ সেই নিজ দিব্য স্বরূপেরে কর উদ্বোধিত—
ত্রিলোকে যা কিছু আছে সবই তব পাদমূলে আসিবে তখন।
আত্মার শক্তিই হয় চিরজয়ী—জড়শক্তি নহে কদাচন।

ত্রিভুবন উপাড়িব, তারকা চিবায়ে খাব [করি অট্টহাস]!
জান না কি কেবা মোরা ? বীর গতভয় মোরা রামকৃষ্ণ-দাস।

দেহকেই 'আমি' ভাবে—নাস্তিক্য ইহারি নাম—যারা অনুক্ষণ
'ক্ষীণ মোরা, দীন মোরা' বলি করে তাহারাই করুণ ক্রন্দন।
রামকৃষ্ণ-দাস মোরা—[দেহাতীত অবিকারী অমৃত অভয়
সত্তাকেই 'আমি' জানি] অভয়-পদেতে স্থিত হয়েছি যখন—
আস্তিক্য ইহারি নাম—হইয়াছি মোরা সবে বীর, গতভয়।

সংসার-আসক্তি ত্যজি, ত্যজি সর্ব-দ্বন্দ্ব-মূল স্বার্থপরতায়,
পরামৃত পান করি, ধ্যান করি সর্ববিধ কল্যাণ-নিলয়
শ্রীগুরু-চরণাম্বুজ, ধরাবাসী সবাকারে করি নমস্কার
অমৃতের পূর্ণপাত্রে পান তরে আমন্ত্রণ করি বারংবার—
পূর্ণ যেই পাত্রখানি অনাদি-অনন্ত-বেদ-
পয়োধি-মন্থন-লব্ধ অতুলন ধনে,
যাহে শক্তি প্রদানিলা প্রজাপতি-নারায়ণ-
মহেশাদি শক্তিমান সর্ব দেবগণে,
পরিপূর্ণ যাহা সর্ব-অবতার-প্রাণসারে—
পূর্ণ যাহা সবাকার মিলিত সত্তায়—
সে অমৃত-পূর্ণপাত্র ধরিয়া মানবদেহ
রামকৃষ্ণ-রূপ লয়ে এসেছে ধরায়।

---

* ২৫.৯.১৮৯৪ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রের মধ্যে স্বামীজীর সংস্কৃত রচনার বঙ্গানুবাদ। খণ্ডিতভাবে এবং কিছুটা অন্য ছন্দে এটি পূর্বে উদ্বোধন-এ 'দিব্য বাণী'তে দেওয়া হইয়াছিল।—সঃ

মা

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

সৃষ্টির আদি অন্ধকার,
আদি জ্যোতি, আদি শক্তি করুণায় প্রেমে
সংহত করেছ মাতা গৃহকোণে প্রদীপ শিখায়।

যুগের অপার তুঙ্গে হিমবাহ কঠিন আকারে
যত দুঃখ জমেছিল, গলে যায়; গলে গলে যায়—
অদিতির বিবস্বতী কল্পনার সূর্য হয়ে ওঠা
আদিগন্ত আশীর্বাদ নেমে আসে মৃত্যু চেতনায়
ফোটাতে অমৃতবহ শুচিশুভ্র সৌরভে নিথর
পূজার প্রসন্ন ফুল মধুময়
প্লাবিত প্রসাদে।

কোথায় তোমার রূপ দেবতার তেজে উদ্ভাসিত
কোথায় তোমার রুদ্র পিনাক টংকার
ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল তীব্র মহিয়সী পরাশক্তিময়ী
পরম ঈশ্বরী সত্তা! সুমঙ্গলী মাতৃমহিমায়
এবার এসেছ নেমে হৃদয়ের খুব কাছাকাছি,
পরিচিত ভাষা দিয়ে তোমাকে চেনার
সহজ সম্বোধিদানে
করেছ সম্মান।

তুমি মাতা, আমি শিশু, এর চেয়ে তুলনাবিহীন
আর কোন শব্দ আছে? আদি শব্দ
যার ব্রহ্মময়
অনাহত ঝঙ্কারের ভাষা কাঁপে ব্যাপ্তির বিকাশে?
প্রণবের মত যার ক্রমাগত উচ্চারণ শেষে
অনন্ত তুরীয়-রেশ আতিশয্যে
সমুদ্র বিস্তার।

তাইতো প্লাবনী প্রেম
পূর্ণ থেকে পূর্ণ উচ্ছলনে
ক্ষুরের ধারের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার প্রতিশ্রুতি ভুলে
আতটপূর্ণতা মগ্ন নির্ঝরিত আনন্দলীলায়।
এ যেন দুহাত মেলে জননীর কোলে
ঝাঁপ দিয়ে পড়া শুধু,
এ যেন ভাবের
ঘনীভূত নীল জলে তরঙ্গরহিত
অনায়াসে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা পাওয়া ;
এ যেন বুকের কাছে পূর্ণিমার আনন্দধারায়
অভিষিক্ত মাতৃমূর্তি
শুধু দেখে, শুধু স্পর্শ করে
ভালোবেসে মুক্তি লাভ—পরম নির্বাণ

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীমতী বীণা সেনগুপ্ত*

শ্বেত মর্মরের কক্ষ ধূপে সুবাসিত
অনন্ত নিদ্রায় মাতা ছিলেন শায়িত
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি, মুক্ত কেশদাম
তরঙ্গিয়া মহাশয্যা লয়েছে বিশ্রাম।

গৈরিকে আবৃত তনু প্রিয় পুত্রগণ
দাঁড়াইয়া জননীর শয়নের পাশে
শান্ত সমাহিত মূর্তি আনত বদন
গভীর ওঁকার ধ্বনি উঠিছে আকাশে।

ডালি-ভরা ছিল ফুল, বালিকা সকল
অঞ্জলি প্রদানি পদে করিনু প্রণাম।
ভাবিতেছি জীবনের সায়াহ্ন বেলায়
সেদিন সে ফুলদলে কারে পূজিলাম!
তিনিই কি জীবধাত্রী লোকমাতা ? আর
স্মরিতেছি জীবনের সৌভাগ্য অপার।

সারদা-প্রশস্তি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার কাঞ্জিলাল

মা আমার স্নেহময়ী করুণার খনি,
তোমারে স্মরণ করি সারদা জননী।
তপস্যার প্রতিমূর্তি, ত্যাগের প্রতিমা,
রসনায় তব রূপ দিতে নারে সীমা।
শক্তিরূপা সনাতনী শিবের সঙ্গিনী,
সাক্ষাৎ বাৎসল্য তুমি, সেবাস্বরূপিণী।
আমি বড় অসহায় আজ তোমা বিনে,
তুমি না মা দিলে ধরা কে তোমারে চিনে!
মূর্তিমতী দয়া তুমি, দয়া কর মোরে,
তরি যেন ভবার্ণব এই মায়া ঘোরে।
বাসনায় জ্বলে মরি বিষয়-সংসারে,
দিও মা আশ্রয় অঙ্কে, শান্তি-পারাবারে।
কৃপা কর কৃপাময়ী অধম সন্তানে,
সব তাপ দূরে যাক তব নাম গানে।

* শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের সময় লেখিকা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন।—সঃ

যীশু

বকলম

দু'জন মাছ ধরছিল সাগরে ঃ
প্রথমে তাদের ধরে তুমি নামলে আরো মানুষ ধরতে।
ক্রমশ কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে
তোমার স্বেচ্ছা-শিকার হলো।
সারা জীবন কেঁদে কেঁদে মো'লো।

তুমি নিজেই তোমার প্রথম শিকার ঃ
জন্মালে ছুতোরের ঘরে, খড়ের বিছানায়, খাটালে।
সৃষ্টিধরের পুত্র জন্ম নিলে সূত্রধরের ঘরে!
কী পুরস্কার পেলে উপচিকীর্ষার?
বিদ্রূপে বৈরিতায় নিগ্রহে নিঃস্ব জীবন কাটালে।
দেশের লোকেরা ঢিল মারলে, থুথু দিলে তোমার গায়ে।
এতো সৌভাগ্যলাভ করলে পিতার কী বরে?
শেষে ক্রুশবিদ্ধ হলে, কাঁটার মুকুট পরলে
দেশদ্রোহিতার দায়ে;
আর্তনাদ করে বললে তুমি ঈশ্বর-পরিত্যক্ত,
তবু অন্যায় অবিচারকে তুমি ক্ষমা করলে।
তাতে লাভ হলো কী কার?
উত্তর মেলে না এসব প্রহেলিকার।

যারা তোমার অকপট ভক্ত
তাদেরও জীবনভোর যন্ত্রণা, যন্ত্রণা;
তারাও তোমার ক্রুশ বয়;
কাঁটায় পেরেকে তাদের সমস্ত শরীর বিদীর্ণ,
গাময় ঘা রক্ত,
কিন্তু কী যে তোমার মনোহর মন্ত্রণা ঃ
তবু তারা তোমার অনুগামী অনুরক্ত;
কোন নালিশ করে না, প্রতিকার চায় না;
বালিতে মুখ গুঁজে অবিরাম কশাঘাত সয়।
হোক না পৃথিবী যতই কদর্য কুটিল কলুষ-পরিকীর্ণ—
তাদের চোখে এইটাই তোমার অসীম রূপের সসীম আয়না।

কিন্তু তুমি কী করে চুপ করে ছাখো তাদের এতো ব্যথা ?
এই কি তোমার ভক্তবৎসলতা ?

তুমি বলেছিলেঃ নিঃস্বরাই, নিরীহরাই হবে ধরার উত্তরাধিকারী ;
স্বর্গরাজ্য ধনীদের জন্যে নয় ;
বৃথাই ধনদৌলতের জন্তে মারামারি ;
ক'দিন টি'কবে বালির ওপরে বাড়ি ?
আসল সম্পদ—দরদী বিনম্র হৃদয় ।
বলেছিলে পাকা ঘর বাঁধতে সেই পাথরের ভিতে,
আগ্রাসীকে জয় করতে ভালবেসে,
এক গালে চড় খেলে অন্য গালটা বাড়িয়ে দিতে ।
কিন্তু কী ফল হলো তোমার হিতোপদেশে ?

হিংস্র হানাহানি, প্রবলের দুর্দম দাপট চলেছে সমানে ।
তুমিই বলো :
কী ফল হলো
তোমার স্বর্গজয়ের অভিযানে ?
এতো দুঃখবরণের আত্মহননের কী মানে ?

না কি এসব বাহু ?
যারা পাবার তারা ঠিক পেয়েছে ঠিকানা :
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে তারা পৌঁছেছে বেথলেহেমে,
নিজেদের মনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে স্বর্গরাজ্য—
প্রত্যয়ে প্রত্যাশায় প্রেমে !
দেখতে পায় না যারা বাঁশবনে ডোমকানা ?
হয়তো, যারা জ্ঞানের লক্ষ বাণে জর্জরিত
তাদের কাছে ধরা দেয় না অজ্ঞেয় ;
তর্কে মেলে না এমন সত্য আছে তর্কাতীত ;
এমন অমিয় আছে যা অমেয় ।

যারা নির্বোধ, নির্বিরোধী, তোমাতেই যাদের জীবন উদ্দিষ্ট—
তাদের দুঃসহ কষ্টই কি দুর্লভ খৃষ্ট ?
আপামর আর্ত বৃদ্ধ-বনিতা-শিশু—
তারা সকলেই কি এক একটি যীশু ?

আবার ম্যালেরিয়ার বিভীষিকা

ডক্টর জলধিকুমার সরকার*

আজকাল খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন যে, ম্যালেরিয়া (Malaria) অসুখটি নিয়ে বেশ হৈচৈ হচ্ছে। অল্পবয়স্কদের কাছে 'ম্যালেরিয়া' শব্দটি নূতন হ'লেও, প্রত্যেক যৌবনোত্তর বাঙ্গালীর কাছে এটি বাংলা শব্দের মতই পরিচিত। কারণ বিশ তিরিশ বছর আগে, বর্ষার পরে বাংলার ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যেত। আর কয়েকটি জেলার গ্রামাঞ্চলে পথে ঘাটে শীর্ণকায় স্ফীতোদর লোকের সংখ্যা কম ছিল না। তৎকালীন বহু কাব্যে ও উপন্যাসেও এই রোগ স্থান পেয়েছে। সে সময় চিকিৎসকরা অনেকক্ষেত্রে রোগী না দেখেই কুইনাইন মিকস্চার পাঠিয়ে দিতেন। অর্থাৎ তৎকালীন বাঙ্গালীর জীবনে ম্যালেরিয়া জ্বর ও কুইনাইন যেন অপরিহার্য অঙ্গরূপেই ধরা হ'ত। কথাটি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বলা হ'লেও, ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক প্রদেশের অবস্থাও অনেকটা অনুরূপ ছিল। তারপরে ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, তখন মিলিটারির তাগিদে দেশের অনেক জায়গাকেই ম্যালেরিয়া-মুক্ত করা হোল। যুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যুগ্ম প্রচেষ্টায় সারা পৃথিবীকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করার জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে ষাটের দশকের শেষার্ধে ভারত-বর্ষের সব প্রদেশেই ম্যালেরিয়া প্রায় নির্মূল হয়ে যাবার মত হয়। কিন্তু ১৯৭০ সাল হ'তে এই রোগ আবার মাথা তুলেছে। সব প্রদেশেই শহরে ও গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান হওয়ায়, সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আবার কি গ্রামবাংলা বা অন্যান্য অঞ্চল এই রোগে উজাড় হয়ে যাবে? এই বিষয় আলোচনা করতে হ'লে আমাদের একটু গোড়ার কথায় যেতে হবে; অর্থাৎ এই রোগ কেন হয়, কিভাবে ছড়ায় বা এর প্রতিকার-ব্যবস্থা কি হ'তে পারে —এই সব।

ম্যালেরিয়া বহু পুরাতন রোগ। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হিপোক্রেটিসের সময়ে এর উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে ইউরোপের বহু দেশেও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। ১৮৮০ সালে ল্যাভেরান নামক একজন সাহেব দেখালেন যে, এই অসুখের কারণ একরকমের জীবাণু—ম্যালেরিয়া জীবাণু। এটি একটি প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium) জাতীয় প্রোটো-জোয়া (Protozoa), যা খালি চোখে দেখা যায় না। ১৮৯৪ সালে ম্যানসন দেখালেন যে, এই রোগ মশার দ্বারা হয়; তবে তাঁর ধারণা ছিল যে, যে জলে মশা জন্মায়, সেই জল খেয়ে ম্যালেরিয়া হয়। হয়তো এই ধারণা তৎকালে প্রচলিত হয়েছিল বলেই স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন, 'জল ফুটিয়ে নেবে, তা হ'লে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন'।[১] ১৮৯৮ সালে রস্ (Ross) নামক একজন সাহেব কলিকাতার একটি হাসপাতালে (বর্তমানে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল) কাজ করার সময় প্রমাণ করলেন যে ম্যালেরিয়া জীবাণু মশার দেহে বংশবৃদ্ধি করে, এবং সেই মশার কামড়ের ফলে ম্যালেরিয়া হয়।

* স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। এফ. এন. এ.

১ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩৮

ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে, আবার মশার দেহের মধ্যেও বংশবৃদ্ধি করে। অর্থাৎ এই জীবাণুর বংশরক্ষার জন্য মানুষ ও মশা দুই-ই দরকার। কারণ এদের জীবনবৃত্তের (life cycle) খানিকটা অংশ মানুষের দেহে, খানিকটা মশার দেহে ঘটে। জীবাণুগুলি অনেক শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের বংশবৃদ্ধি করে। মশা কামড়াবার সময় মানুষের দেহে যে ম্যালেরিয়া জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়, সেই অবস্থার জীবাণুকে বলে স্পোরোজয়েট (sporozoite) সেগুলি যকৃতে (liver) গিয়ে যকৃতের কোষের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে এবং পরে যকৃত হ'তে বার হয়ে অসংখ্য রক্তকণিকাকে (red blood cell) আক্রমণ করে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর হয়। সেই সময়ে রক্ত পরীক্ষা করলে রক্তকণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়া জীবাণু নানা অবস্থায় দেখা যায়, যেমন ট্রোফোজয়েট (Trophozoite), সিজণ্ট (Schizont), মেরোজয়েট (Merozoite) প্রভৃতি। রক্তকণিকার মধ্যে এইভাবে এরা বংশবৃদ্ধি ক'রে কণিকাগুলিকে ফাটিয়ে দিয়ে বার হয় এবং আবার নূতন রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে। এইভাবে চলতে চলতে, কিছু ম্যালেরিয়া জীবাণু রক্তকণিকার মধ্যে একটি নূতন রূপ নেয় যাকে বলে গ্যামিটোসাইট (gametocyte). এই গ্যামিটোসাইট-অবস্থার জীবাণুগুলির আর বংশবৃদ্ধি হয় না, যতক্ষণ না তারা মশার দেহে যেতে পারে।

মশা যখন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খায়, তখন রক্তকণিকার মধ্যে থাকা ট্রোফোজয়েট, সিজণ্ট, মেরোজয়েট এবং গ্যামিটোসাইট—সব অবস্থার জীবাণুই নিয়ে নেয়। গ্যামিটোসাইট ছাড়া অন্য সব অবস্থার জীবাণুগুলি মশার পাকস্থলীর রসে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গ্যামিটোসাইটগুলি (যাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামিটোসাইট আছে) নষ্ট হয় না। মশার দেহের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামিটোসাইটের মিলনের ফলে, অসংখ্য স্পোরোজয়েটের সৃষ্টি হয়। এই নবজাত স্পোরোজয়েটগুলি মশার লালাগ্রন্থির (salivary gland) মধ্যে অপেক্ষা করে, কখন সেই মশা আবার নূতন লোককে কামড়াবে এবং ওরা নূতন লোকের দেহে আবার বংশবৃদ্ধি করতে পারবে। এইভাবে চলতে থাকে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিবর্তন। এইখানে বলা দরকার যে, মানুষ ছাড়া অন্যান্য বহু জন্তুর (যেমন পাখী, হনুমান প্রভৃতি) ম্যালেরিয়া হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ম্যালেরিয়া জীবাণু বিভিন্ন এবং একের জীবাণু সাধারণতঃ অন্যকে আক্রমণ করতে পারে না।

এইবার মশার কথায় আসা যাক। মশা বহু রকমের আছে; তাদের মধ্যে কেবল এ্যানোফিলিস (anopheles) মশাই ম্যালেরিয়া ছড়ায় (যেমন ইডিস মশা ডেঙ্গুজ্বরের কারণ, কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়ার, ইত্যাদি)। আবার এ্যানোফিলিস মশার বহু প্রকারভেদ আছে, সব রকমের এ্যানোফিলিস ম্যালেরিয়া ছড়ায় না। আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতের এ্যানোফিলিস ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করে। কলিকাতায় এ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই (A. stephensi) ম্যালেরিয়া ছড়ায়, পল্লীগ্রামে এ্যানোফিলিস ফিলিপেনসিস (A. philippensis)। কলিকাতায় এ্যানোফিলিস মশা বাড়ীর আশেপাশে ছোট পাত্রে, ভাঙ্গা শিশি বা কৌটায়, চৌবাচ্চায় বা ছাদের খোলা ট্যাঙ্কে বর্ষার যে জল জমে, তাতে ডিম পাড়ে; ময়লা নর্দমার জল এরা পছন্দ করে না। এমনকি খাবার রাখার জাল-আলমারির নীচে পিঁপড়ে বন্ধ করবার জন্য যে জলপাত্র রাখা হয়, তাতেও তারা

ডিম পাড়তে পারে। পল্লীগ্রামে মাঠে যে জল জমে, অথবা ছোট ছোট জলা জায়গায়, বিশেষতঃ গাছের ছায়ায় এরা ডিম পাড়তে ভালবাসে। এ্যানোফিলিস মশা রাত্রে কামড়ায়। সাধারণতঃ এরা সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে ঢোকে এবং ভোরে বার হয়ে যায়। এদের ওড়বার সময় অন্য মশার ন্যায় গুন্ গুন্ শব্দ হয় না, এবং দেওয়ালে বসবার সময় সোজা হয়ে বসে, ঘাড় কুঁজো হয়ে নয়। ডিমের অবস্থা হ'তে সাবালক মশা হ'তে ৮।১০ দিন সময় লাগে।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, একমাত্র স্ত্রী মশা-ই আমাদের কামড়ায়, কারণ এরা রক্ত না খেলে ডিম পাড়তে পারে না। এরা প্রায় মাসখানেক বাঁচে, তবে ম্যালেরিয়া জীবাণু একবার এদের শরীরে গেলে, এরা মৃত্যু পর্যন্ত জীবাণু ছড়াতে পারবে। পুরুষ মশাগুলি স্বল্পায়ু হয় এবং ফুলের মধু ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে।

কোন লোকের ম্যালেরিয়া হ'লে, সাধারণতঃ তার হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে এবং সঙ্গে মাথাধরা বমি ইত্যাদি হয়। কয়েক ঘণ্টা বা দুই একদিন জ্বর থাকার পরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। কারও বা একদিন বা দুইদিন অন্তর পালা জ্বর হয়। বহুদিন ভুগতে ভুগতে রোগীর রক্তাল্পতা হয়, প্লীহা বড় হয়, এবং শরীর ক্রমে শীর্ণ হ'তে থাকে। মশা কামড়ানর ১০।১২ দিন পরে জ্বর দেখা যায়, কারণ এই সময়টা আক্রান্ত ব্যক্তির যকৃতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করতে লাগে। ম্যালেরিয়া জীবাণু চার রকমের আছে। তবে এক রকমের জীবাণু—প্লাসমোডিয়াম ফ্যাল্‌সিপেরাম (Plasmodium falciparum) সাংঘাতিক রকমের ম্যালেরিয়া করে, যার নাম ম্যালিগনাণ্ট (malignant) ম্যালেরিয়া বা পার্নিসাস (pernicious) ম্যালেরিয়া। এ হ'লে রোগী সংজ্ঞাহীন হ'তে পারে, অথবা কলেরার মত পাতলা দাস্ত হয়; কারও কারও বহু সংখ্যক রক্তকণিকা নষ্ট হয়ে কাল রঙের প্রস্রাব হয়, যাকে ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার (Blackwater fever) বলে। এই-জাতীয় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার অনেক বেশী।

উপরি-উক্ত বর্ণনা হ'তে বোঝা যাচ্ছে যে, ম্যালেরিয়া রোগকে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করতে হ'লে, দুই পথে আক্রমণ চালাতে হবে একদিকে মশার বিরুদ্ধে, অন্যদিকে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিরুদ্ধে।

প্রথমে মশার কথায় আসা যাক। মশাকে জন্মাতে অর্থাৎ ডিম পাড়তে সুযোগ দেওয়া হবে না। বাড়ীর আশেপাশে ভাঙ্গা শিশি, কৌটা প্রভৃতি, যাতে বর্ষার জল জমতে পারে, সব নষ্ট করে দিতে হবে। জাল-আলমারির নীচের জলপাত্রে এক ফোঁটা ফিনাইল বা ডেটল দিতে পারেন, অথবা ঘন ঘন জল পালটাতে পারেন। পল্লীগ্রামে অপ্রয়োজনীয় ছোট খানা-ডোবা বুজিয়ে ফেলা উচিত। বাড়ী বা রেলপথ তৈরীর সময় যাতে ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি না হয়, ইঞ্জিনিয়ারদের সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জলের উপর তেল ছড়িয়ে দিলে শাবক মশা (larva), যা ডিম হ'তে বার হয়, সেগুলি নিঃশ্বাস নিতে না পেরে মারা যাবে। এছাড়া ভাবতে হবে, পূর্ণবয়স্ক মশাকে কিভাবে মারা যায় বা তাদের কামড় হ'তে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। ঘরের জানালা দরজা সন্ধ্যার ঘণ্টা খানেক আগে বন্ধ ক'রে দিলে ওরা ঘরে ঢুকতে পারে না। মশারি খাটান যে দরকার তা বলাই বাহুল্য। যদি সম্ভব হয় জানালা দরজায় সরু তারের জাল লাগাতে পারেন, এবং মুখে হাতে মশকনিবারক ক্রিম লাগাতে পারেন। ঘরের দেওয়ালে ডি.ডি.টি. (D.D.T.) ছড়ায় কেন জানেন? স্ত্রী মশার অভ্যাস, রক্ত খাওয়ার পরে দেয়ালে বসে

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া; এবং তা করতে গেলেই দেওয়ালে লেগে থাকা ডি. ডি. টি. মশার পায়ে লেগে তাদের শরীরে বিষক্রিয়া করবে।

এবার ম্যালেরিয়ার জীবাণু-নাশের ব্যাপারে আসা যাক। আমরা যদি ওষুধের দ্বারা সব মানুষের শরীরে জীবাণুগুলি নাশ করতে পারি, তা হ'লে মশা কামড়ালেও ম্যালেরিয়া ছড়াবে কি ক'রে? আগেই বলেছি যে, কেবলমাত্র গ্যামিটোসাইট অবস্থার জীবাণুই মশার শরীরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। সেইজন্য ম্যালেরিয়া রোগীকে চিকিৎসা করার সময় ওষুধের দ্বারা ট্রোফোজয়েট, সিজণ্ট বা মেরোজয়েটগুলি মেরে দিয়ে জ্বর ছাড়ালেই চলবে না, রোগীর রক্ত-কণিকার মধ্যে যে গ্যামিটোসাইটগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে, সেগুলিকেও মারতে হবে। এই কারণে বর্তমানে ডাক্তাররা ক্লোরোকুইন (chloroquin) জাতীয় ওষুধের পরে গ্যামিটো-সাইট-বিনাশক প্রাইমাকুইন (primaquin) জাতীয় ওষুধ দেন। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া জীবাণু-বহনকারী মশা কামড়ালেও যাতে দেহের মধ্যে জীবাণুগুলি বংশবৃদ্ধি করতে না পারে সেইরকম ওষুধও আছে, যেমন প্যালুড্রিন (paludrin), যা ম্যালেরিয়া অঞ্চলে যে কেউ প্রতিরোধক হিসাবে খেয়ে যেতে পারে। ম্যালেরিয়ার-প্রতিরোধের ব্যাপারে আর একদিকে একটা আশার আলো দেখা দিচ্ছে। সেটা হোল ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক টিকা (vaccine) তৈরী, যে ব্যাপারে কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, মশার বিনাশ ও ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিনাশ—এই দুই পথে আমরা যদি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি, তা হ'লে ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ ত বটেই, এমনকি সমগ্র পৃথিবী হ'তে এই অসুখ নির্মূল করাও সম্ভব। অবশ্য এর জন্য, যেসব দেশে ম্যালেরিয়া হয়, সেই সব দেশকেই একসঙ্গে চেষ্টা চালাতে হবে। কারণ কোন একটি দেশে রোগের জীবাণু থাকলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াতের মাধ্যমে তা অন্য দেশে ছড়িয়ে যেতে পারবে। মনে রাখা দরকার যে, রক্তে জীবাণুবহনকারী একজন লোক যেমন অন্য দেশে রোগ নিয়ে যেতে পারে, উড়োজাহাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জীবাণু-বহনকারী মশাও ঠিক সেই কাজ করতে পারে।

পরিশেষে এ বিষয়ে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা বলা দরকার। দেখা যাচ্ছে যে, অনেক স্থানের মশা ডি.ডি.টি.তে মরছে না; আবার কিছু কিছু ম্যালেরিয়া জীবাণু রোগীকে চালু ওষুধ খাইয়েও মারা যাচ্ছে না। অর্থাৎ এরা ওষুধ-প্রতিরোধক ক্ষমতা (resistance) লাভ করেছে। যাই হোক সব সমস্যারই সমাধান আছে এবং এ দুটি সমস্যারও সমাধান বার হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। সরকার, মিউনিসিপালিটি বা করপোরেশনের অনেক কিছু করণীয় আছে নিশ্চয়, কিন্তু সাধারণ মানুষেরও এ বিষয়ে অনেক কর্তব্য আছে।

টেলিভিশন

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত*

১৯৭৫ সালের ৯ই অগস্ট দিনটি বৃহত্তর কলকাতাবাসীর কাছে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, এই দিনটিতে কলকাতা শহরে টেলিভিশন অথবা দূরদর্শন প্রেরক কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। বলা যেতে পারে অগণিত মানুষের অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপায়ণ, অনেক উন্মাদনার সফল পরিপূর্তি এবং সর্বোপরি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটল ঐ বিশেষ দিনটিতে। দূরদর্শন কথাটির চাইতে টেলিভিশন কথাটি আমাদের কাছে অনেকখানি বেশী পরিচিত। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে টেলিভিশন এসেছে দূরদর্শন নাম নিয়ে এই সেদিন, অপরদিকে বিদেশে টেলিভিশন নামক যন্ত্রটির আবিষ্কার বহু বৎসর আগের ঘটনা। সুতরাং দূরদর্শন অপেক্ষা টেলিভিশন শব্দটি তো আমাদের কাছে বেশী পরিচিত হবেই। "টেলি" অর্থাৎ দূর এবং "ভিশন" অর্থাৎ দর্শন। সুতরাং টেলিভিশন বা দূরদর্শন হল সেই রকম একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে চক্ষুর নাগালের বাইরে সংঘটিত দৃশ্যাবলীও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। পারি শত শত মাইল দূরের কোন চলমান ঘটনা ও বর্ণনাকে একই সঙ্গে দেখতে এবং শুনতে।

আমরা জানি উন্মুক্ত চক্ষুতে যা দেখা যায় না, সেই সব অনেক অনেক দূরের বস্তু অথবা অতি ক্ষুদ্র কণিকাগুলিকে দেখবার জন্য বিজ্ঞান আমাদের উপহার দিয়েছে অতি বিস্ময়কর দুটি যন্ত্র—দূরবীক্ষণ বা টেলিস্কোপ এবং অণুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ। এই যন্ত্রদুটির আবিষ্কার হয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে—যদিও এখনও এগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ-কৌশল এবং কারিগরী কৌশলের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানিগণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং তার সীমাহীন জিজ্ঞাসা কখনই বিজ্ঞানকে স্থির থাকতে দেয় না, ভবিষ্যতে কোন দিন দেবেও না। বিজ্ঞান সর্বদাই গতিশীল এবং বলা যেতে পারে এই সদা-চঞ্চলতা ব্যাপারটি বিজ্ঞানের এক অতি বিশিষ্ট চরিত্র। কান যেখানে পৌছোয় না, সেখানে সংবাদ আসে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অথবা সরাসরি বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে। সুতরাং বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের কান আজ সুদূর-প্রসারী। বহুদূরের কোন নিভৃত গৃহকোণের মৃদুকণ্ঠের আলাপন আজ আমরা শুনতে সক্ষম হচ্ছি মুহূর্তের মধ্যে বিনা আয়াসে। টেলিভিশন যন্ত্রটিতে মানুষের মহামূল্যবান দুটি ইন্দ্রিয়—চক্ষু এবং কর্ণ—যুগপৎ পরিতুষ্টি লাভ করতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের শত সহস্র চমকপ্রদ কীর্তির যে বিচিত্র তালিকা আমাদের জানা রয়েছে, তার মধ্যে 'টেলিভিশন' কথাটি অবশ্যই উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত থাকবে।

টেলিভিশন-আবিষ্কার তথা তার ক্রমবিকাশের সূত্রপাত হয়েছে আজ হতে প্রায়

* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি.। স্পেকট্রোস্কপি সম্পর্কে ইঁহার উচ্চতর গবেষণা দেশে ও বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ফরেনসিক সায়েন্স গবেষণাগারে' পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত।

আশি বছর আগে—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেনডিস্ লেবরেটরিতে স্যার জে. জে. টমসন-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে যখন গবেষণা চলছিল পরমাণুর গঠন-রহস্য উন্মোচনের জন্য—টেলিভিশন-জাতীয় কিছু একটা আবিষ্কারের চেষ্টা সেই তখন হতেই চলেছে। অবশেষে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নিরূপণ; তার প্রকৃতি-নির্ধারণ এবং তার নামকরণ করা হয় এই ক্যাভেনডিস্ লেবরেটরি থেকেই এবং স্যার জে. জে. এই অসাধারণ কার্যগুলি সমাধা করেন। (কেমব্রিজ ক্যাভেনডিস্ লেবরেটরির ছাত্র এবং সহকর্মিগণের কাছে অধ্যাপক জে. জে. টমসন জে. জে. নামেই পরিচিত ছিলেন।) ঐ দশকেই জগদ্বিখ্যাত কুরিদম্পতি প্যারিসে ও অধ্যাপক রুত্‌গেঁ জার্মানীতে যথাক্রমে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা ও এক্স-রশ্মি আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ সমকালীন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর পদক্ষেপগুলির সূত্রপাত তখন থেকেই। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের এক একটি 'রীইনফোর্স্‌ড' স্তম্ভ যখন গঠিত হচ্ছে, ঠিক তখন প্রয়োগবিজ্ঞানীরা কি ধরনের ব্যস্ততার মধ্যে তাঁদের দিনগুলি অতিবাহিত করছিলেন জানতে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তাঁরাও ছিলেন সেদিন অতিব্যস্ত—অর্থাৎ প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের বিজয়-অভিযানও অব্যাহত ছিলো এবং একে একে টেলিফোন টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর অতি প্রত্যূষে (১৯০১) প্রথম সাগরপারের বেতার-সংকেত প্রেরণ করা হয়। বেতার-সংকেত প্রেরণ করার গৌরবময় এই অধ্যায়টি রচিত হয়—ভারতবর্ষের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ইটালির সিনর মার্কনির দ্বারা। অবশ্যই এটি তাঁদের পৃথক্ পৃথক্ প্রচেষ্টার ফসল।

আধুনিক বেতার-যন্ত্রে যে-সব ভালব ব্যবহৃত হয়, সেগুলি মূলত এক একটি ইলেকট্রন টিউব, যে টিউবগুলির মধ্যে তাপ-প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত ইলেকট্রনগুলি নিয়ন্ত্রিত গতিতে চলাচল করে। আমরা জানি ইলেকট্রন হল জড় পদার্থের লঘুতম এবং ক্ষুদ্রতম মৌল কণিকা (Fundamental particle)। অসংখ্য মৌল কণিকার মধ্যে আমাদের পরিচিত আরো কয়েকটির নাম হল প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, মেসন ইত্যাদি। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত একটি কেন্দ্রক (nucleus) থাকে এবং পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রককে বেষ্টন করে কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষে অভাবনীয় দ্রুতগতিতে নিয়ত আবর্তনশীল। পরমাণুর এই মডেলটিকে চিন্তা করার জন্য একটি স্থূল এবং সুপরিচিত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মডেলটি হল সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে পৃথিবী ও সৌরজগতের অপর গ্রহসকল নিজ নিজ কক্ষে যে সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে আবর্তন করে অনেকটা তার মতো। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বলতে গেলেই সাধারণত এই উদাহরণটি দেওয়া হয়। এটি একটি আশ্চর্য উদাহরণ। কারণ, এই উদাহরণটিতে পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত ব্যাপারে মিলের চাইতে অমিলই বেশী। অমিল বেশী বলছি এই কারণে, যে পরমাণুতে থাকা ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তি তলে (Energy level) নির্দিষ্ট একটি সংখ্যায় থেকে ($n_2, n_2 p_6$ কাঠামোতে) নির্দিষ্ট একটি গতিতে কেন্দ্রককে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সৌরজগতের গ্রহগুলি প্রতিটি কক্ষপথে একক ভাবে থাকে এবং সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন গতিতে সূর্য পরিক্রমা করে। অর্থাৎ কারুর গতি কারুর সঙ্গে সমান নয়। তাছাড়া গ্রহদের আবার উপগ্রহ আছে—যদিও ইলেকট্রনের উপগ্রহ বলে কিছু নেই। এ ধরনের আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অমিলের

কথা বলা যেতে পারে। যাই হোক বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মিলের দিকটাই আলোচনা করব। সূর্যের সর্বাপেক্ষা কাছে থাকা গ্রহ বুধের (Mercury) প্রতি সূর্যের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী এবং দূরবর্তী গ্রহগুলির প্রতি সূর্যের আকর্ষণ ক্রমশ কমে যেতে থাকে। পরমাণুর কেন্দ্রকের মধ্যেও সূর্যের এই চরিত্রটি লক্ষ্য করা গেছে। ইলেকট্রনগুলির মধ্যে যেগুলি কেন্দ্রকের সবচেয়ে কাছে এবং সবচেয়ে দূরে থাকে, তাদের উপর কেন্দ্রকের আকর্ষণ অথবা বন্ধনশক্তির ক্রিয়া যথাক্রমে সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে কম। অর্থাৎ যথাক্রমে আকর্ষণ দৃঢ় এবং শিথিল। যেহেতু দূরবর্তী ইলেকট্রনগুলির প্রতি কেন্দ্রকের আকর্ষণ অর্থাৎ বন্ধনশক্তি যথেষ্ট শিথিল, সেহেতু বাইরের উত্তেজনায় অর্থাৎ বিদ্যুৎ-শক্তি, আলোক-শক্তি অথবা তাপ-শক্তি প্রয়োগের ফলে ঐ শিথিল বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রনগুলি পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে।

এবার পূর্ব কথায় আমরা আবার ফিরে আসি—রেডিওর ভালবের ক্ষেত্রে ভালবের ফিলামেণ্টকে উত্তপ্ত করলে অথবা তনুকৃত (Rarefied) গ্যাসের ভিতর বিদ্যুৎক্ষরণ (Electric discharge) করা হলে অথবা বিশেষ বিশেষ ধরনের কয়েকটি ধাতব পাতের উপর আলোকরশ্মি আপতিত হলে ঐসকল ধাতব পদার্থ হতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। ইলেকট্রনের ঝাঁকগুলি যখন অবিরাম-গতিতে আসতে থাকে তখনই সৃষ্টি হয় তড়িৎ-প্রবাহের। ভালবের ফিলামেণ্টকে উত্তপ্ত করলে অর্থাৎ তাপশক্তি প্রয়োগ করলে যে ইলেকট্রন নির্গত হয়, তাকে বলা হয় থার্মো-ইলেকট্রন অথবা থার্মো-এমিশন (Thermo-electron বা Thermo-emission)। অনুরূপ-ভাবে ধাতব পাতের উপর আলোকরশ্মি আপতিত হওয়ার ফলে যে ইলেকট্রন নির্গত হয়, তাকে বলা হয় ফটো-ইলেকট্রন (Photo-electron) এবং এই ফটো-ইলেকট্রনের প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহকে বলা হয় ফটো-ইলেকট্রিসিটি (Photo-electricity)। রেডিও অর্থাৎ বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেমন থার্মো-এমিশন ভালব অর্থাৎ সেগুলি হতে নির্গত থার্মো-ইলেকট্রিসিটি, ঠিক তেমনি টেলিভিশনের ক্ষেত্রে অনিবার্য হল ফটোসেল এবং ফটো-ইলেকট্রিসিটি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার কতখানি ফটো-ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হবে, তার মান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দুটি বস্তুর উপর—ফটোসেলে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের ধাতব পাতটির উপর এবং সেই পাতের উপর আপতিত আলোকের তীব্রতা ও তার তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর। যে পাত্রে বা প্রকোষ্ঠে এই ক্রিয়া ঘটানো হয় তাকে ফটো-তড়িৎ কোষ অথবা তড়িৎ-চক্ষু (Photo-electric cell বা Electric eye) বলে। টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রে এই ধরনের হাজার হাজার তড়িৎ-চক্ষু থাকে। সুতরাং টেলিভিশন যন্ত্রের একটি অপরিহার্য যন্ত্রাংশ হল ফটো-তড়িৎ কোষ অথবা তড়িৎ-চক্ষু। এই যন্ত্রের আর একটি অত্যাবশ্যক যন্ত্রাংশ হল ক্যাথোড রশ্মি নল (Cathode ray tube)। এই নলের মধ্যে ফটো-ইলেকট্রনের গুচ্ছগুলি প্রচণ্ড বেগে আলোকরশ্মির মতো ধাবিত হয়। আলোকরশ্মির মতো প্রবাহিত ইলেকট্রন-গুলিকে বলা হয় ক্যাথোড রশ্মি Cathode ray)। টেলিভিশনের প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রে ক্যাথোড রশ্মির দুটি পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার লক্ষ্য করার বস্তু, এছাড়া টেলিভিশন যন্ত্রের মধ্যে বেতারযন্ত্রের যাবতীয় সরঞ্জামও রাখতে হয়, কারণ টেলিভিশনের দৃশ্যমান চলচ্চিত্রকে বেতার তরঙ্গের দ্বারা সবাক চিত্রে পরিণত করা হয়।

এইবার আমরা সামগ্রিকভাবে টেলিভিশন যন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করবো। যে চিত্রটিকে অথবা চলচ্চিত্রকে টেলিভিশন-যোগে প্রেরণ করা হবে, প্রথমে সেই চিত্রটিকে একটি বিশেষ ধরনের লেন্সের ভিতর দিয়ে একটি পর্দার উপর ফেলা হয়। এই পর্দাটি অবশ্য কোন সাধারণ পর্দা নয়, এটি হল একটি বিশেষ ধরনের পর্দা। এই পর্দার নাম—'ফটো-তড়িৎ মোজেইক পর্দা' (Photo-electric mosaic screen)। পর্দাটি একটি পাতলা অভ্রের পাত দিয়ে তৈরী। পর্দার পিছনে থাকে একটি ধাতব পাত আর সামনের দিকে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্টভাবে সাজানো থাকে হাজার হাজার ক্ষুদ্র তড়িৎ-চক্ষু অর্থাৎ ফটো-তড়িৎ কোষ। এই অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-চক্ষুগুলিকে গ্লোবিউল (globule) বলা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে হাজার হাজার ফটো-তড়িৎ কোষের সাহায্যে পর্দায় পড়া ঐ চিত্রটিকে হাজার হাজারটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ক'রে নেওয়া হয়। এক একটি গ্লোবিউল এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জায়গায় ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং পর্দাটির এক বর্গ ইঞ্চিতেই গ্লোবিউলের সংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি। সুতরাং সমগ্র ফটো-তড়িৎ মোজেইক পর্দায় থাকা গ্লোবিউলের সংখ্যা হাজার হাজার না ব'লে লক্ষ লক্ষ বললেই ঠিক বলা হয়। উপরে বর্ণিত সম্পূর্ণ এই অংশটির নাম "আইকনোস্কোপ" (Iconoscope)। "অর্থিকন" (Orthicon) নামে একটি যন্ত্রও এ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আইকনোস্কোপ যন্ত্রের এক প্রান্তে থাকে মোজেইক পর্দা এবং অপর দিকে থাকে একটি বিশেষ ধরনের ক্যাথোড রশ্মি নল। বিজ্ঞানের চলতি ভাষায় ক্যাথোড রশ্মি নলকে "তড়িৎ বন্দুক" বলা হয় (Electric Gun)। তড়িৎ বন্দুক নলের প্রান্ত থেকে সূক্ষ্ম ক্যাথোড রশ্মি গুচ্ছ (Electron beam) ঐ মোজেইক পর্দার উপর দিয়ে অতি দ্রুত গতিতে একপ্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু ক'রে অপর প্রান্তে যাতায়াত করে। ক্যাথোড রশ্মিগুচ্ছ এই যাতায়াতের সময় পর্দায় থাকা সহস্র সহস্র তড়িৎচক্ষুর প্রত্যেকটিকে ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ ক'রে যায়। টেলিভিশনের প্রেরক যন্ত্রের এই অতি বিচিত্র এবং বিশেষ ক্রিয়াটির নাম "স্ক্যানিং" (scanning)। টেলিভিশনে স্ক্যানিং যত নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হবে, তার উপরেই প্রেরক যন্ত্রের সাফল্যের মান নির্ভর করে। এই স্ক্যানিং প্রক্রিয়া এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে, এক একটি তড়িৎচক্ষুর উপরে ইলেকট্রন রশ্মি-গুচ্ছ এক সেকেণ্ডের পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র থাকে। এছাড়া প্রতিটি ছবিকে প্রত্যেক সেকেণ্ডে তিরিশবার করে মোজেইক পর্দার উপর স্ক্যান করা হয়। দু' রকমের স্ক্যানিং টেলিভিশনের প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—প্রগ্রেসিভ (Progressive) এবং ইণ্টারলেসড (Interlaced)। প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিং-এর চেয়ে ইণ্টারলেসড স্ক্যানিং-এ কাজ হয় ভালো। কলকাতার টেলিভিশন ব্যবস্থায় ইণ্টারলেসড স্ক্যানিং করা হয়। এ ধরনের স্ক্যানিং-এ মোজেইক পর্দাটিকে পঁচিশ অথবা ত্রিশটি ফ্রেমে ভাগ করে নেওয়া হয়। এর অর্ধেকগুলি জোড় ফ্রেম (Even frame) এবং বাকিরা বিজোড় ফ্রেম (Odd frame)। গ্লোবিউলগুলি ঐসব ফ্রেমে এমনভাবে সাজানো আছে, যেন সেগুলি এক একটি বইয়ের পাতা। বই পড়ার সময় যেমন আমরা বাঁ দিকের সবচেয়ে উঁচু লাইন হতে এক একটি ক'রে লাইন পড়ে একেবারে সবচেয়ে শেষ লাইনটির ডান দিকে এক সময় চলে আসি—অনেকটা ঠিক এরকম ভাবেই মোজেইক পর্দায় ৬২৫টি

লাইন বরাবর স্ক্যান করা হয়—সুতরাং জোড় ফ্রেমের জন্য ৩১২'৫ এবং বিজোড় ফ্রেমের জন্য ৩১২'৫ লাইন স্ক্যান করা হয় এবং এরকম কাণ্ড হয় সেকেণ্ডে পঁচিশ বার। (সম্মিলিতভাবে যদিও জোড় ও বিজোড় ফ্রেম মিলে পঁচিশ পঁচিশ —পঞ্চাশ বার স্ক্যানিং হচ্ছে বলে মনে হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু স্ক্যানিং হচ্ছে পঁচিশ বারই।) বই পড়ার সময় যেমন অনুভূমিক লাইনটি শেষ করে লম্বভাবে নেমে পরের লাইনটিতে চোখ নিয়ে যেতে হয়—স্ক্যানিং-এর ক্ষেত্রেও অনেকটা সেরকমভাবে যথাক্রমে অনুভূমিক স্ক্যানিং (Horizontal Scanning) এবং লম্ব স্ক্যানিং (Vertical Scanning) হয়ে থাকে। কলকাতায় টেলিভিশনে অনুভূমিক এবং লম্ব স্ক্যানিং-এর কম্পাংক হল যথাক্রমে ১৫৬২৫ সাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে এবং ৫০ সাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে। এক একটি গ্লোবিউলের উপর অনুভূমিক এবং লম্ব স্ক্যানিং-এর স্থায়িত্ব অতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য এবং এদের মান হল যথাক্রমে ০'০০০০০৬৪ সেকেণ্ড এবং ০'০০২ সেকেণ্ড (Horizontal—64 μ sec. এবং Vertical— 20 m sec.)। আমরা খবরের-কাগজে, পত্র-পত্রিকায় এবং পুস্তকে মুদ্রিত কালো সাদা (black and white) চিত্রগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব—চিত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য কালো কালো বিন্দুর গাঢ়ত্বের তারতম্যে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ রঙের গাঢ়ত্বের তারতম্যের (Light and Shade) ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপন্ন হয়েছে এ ধরনের এক একটি চিত্র। টেলিভিশনের ফটো-তড়িৎ মোজেইক পর্দার উপর সন্নিবিষ্ট সহস্র সহস্র তড়িৎচক্ষুর উপর যখন কোন একটি চিত্রের অংশ বিশেষ এসে পড়ে তখন চিত্রটির সেই অংশের রঙের গাঢ়ত্বের উপর আপতিত আলোকের তীব্রতা কতখানি হবে তা নির্ভর করে। এবং এই আপতিত আলোকের তীব্রতার অনুপাতের সঙ্গে ফটো-তড়িৎ প্রবাহের মানও পরিবর্তিত হয়। এইভাবে ছবির বিভিন্ন অংশের আলোকের গাঢ়ত্ব অনুযায়ী ফটো-তড়িৎ প্রবাহের মান দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। দ্রুত পরিবর্তনশীল তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে তড়িৎকম্পনের উদ্ভব হয় সেই তড়িৎকম্পন আবার সৃষ্টি করে দৃশ্যমান কম্পাঙ্কের অথবা 'ভিডিও'-কম্পাঙ্কের (Vidio-frequency)। এখানে আমাদের জানা দরকার স্ক্যানিং-এর ফলে যে দৃশ্যমান কম্পনের সৃষ্টি হয় তার কম্পাঙ্ক হল সেকেণ্ডে বেশ কয়েক লক্ষবার।

টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রটির সঙ্গে যে বেতার যন্ত্রটি থাকে তা থেকে বেতার বাহক তরঙ্গ (Radio carrier wave) সৃষ্টি করা হয়। এই কম্পাঙ্কের নাম রেডিও কম্পাঙ্ক (Radio frequency)। টেলিভিশনের প্রেরক যন্ত্রের মোজেইক পর্দায় চিত্রের সঙ্গে যে শব্দ আসে সেই শব্দ-তরঙ্গকে তড়িৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। তড়িৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত শব্দ-তরঙ্গের কম্পাঙ্ককে বলা হয় শ্রুতি-কম্পাঙ্ক অথবা অডিও-কম্পাঙ্ক (Audio-frequency)। উপরের আলোচনায় আমাদের প্রাপ্তি তিন প্রকারের কম্পাঙ্কের— ভিডিও-কম্পাঙ্ক, রেডিও-কম্পাঙ্ক এবং অডিও-কম্পাঙ্ক। সম্মিলিতভাবে এই তিন প্রকারের কম্পাঙ্ককে বলা হয় "মড্যুলেটেড কম্পাঙ্ক" (Modulated frequency)। মড্যু-লেটেড তরঙ্গ পরিবর্ধিত (Amplified) হয়ে প্রেরক যন্ত্রের শেষ সীমায় অবস্থিত টেলিভিশন টাওয়ারটির মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। টেলিভিশন টাওয়ার থেকে নির্গত মড্যুলেটেড তরঙ্গ একটি টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রের এ্যান-টেনাতে (Antenna) আঘাত করে অথবা বলা যেতে পারে গ্রাহক যন্ত্রের এ্যানটেনায়

আপতিত হয়। বাড়ীর ছাদে লাগানো টেলিভিশনের এ্যানটেনাটিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো—সাধারণত তিনটি ধাতব দণ্ড ফাঁক ফাঁক করে অপর একটি ধাতব দণ্ডের সাহায্যে গ্রথিত থাকে। মাঝেরটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাঁজ করা একটি দণ্ড। এর নাম—ফোল্ডেড ডাইপোল (Folded dipole)। ফোল্ডেড ডাইপোলের দুই প্রান্তের দু'টি দণ্ডের মধ্যে যেটি লম্বায় বড় সেটি হল প্রতিফলক (Reflector) এবং অপরটি দিকনির্দেশক (Director)। এই দিকনির্দেশক দণ্ডটি টেলিভিশন প্রচারকেন্দ্রের স্তম্ভটি যেদিকে আছে সর্বদা সেই দিকে সমান্তরালভাবে বসানো থাকে। আপতিত তরঙ্গকে পরিবর্ধিত ক'রে টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে থাকা কম্পাঙ্ক নিয়ন্ত্রক (Frequency changer) যন্ত্রটিতে পাঠানো হয়। সেখানে তরঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে দুটি পৃথক্ পৃথক্ পথে পাঠানো হয়; যার একটি পথ হল শব্দ-তরঙ্গের পথ। এই পথে আসা তরঙ্গটিকে পরিবর্ধক (Amplifier) ও ডিটেকটরের (Detector) মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে সর্বশেষে লাউড্‌স্পিকারে এনে ফেলা হয়। দ্বিতীয় পথটি হল চিত্র-তরঙ্গের পথ। এই পথে আসা তড়িৎ-তরঙ্গটি পরিবর্ধকের ভিতর দিয়ে গিয়ে ক্যাথোড রশ্মি স্পন্দবীক্ষণ (Cathode ray oscilloscope) যন্ত্রের উপর আপতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ ক্রিয়াশীল হয়। কলিকাতার টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রের শ্রুতি-তরঙ্গের কম্পন (Audio frequency) এবং দৃশ্যমান তরঙ্গের কম্পনের (Vidio frequency) মান হল যথাক্রমে ৬৭'৭৫ মেগাসাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে এবং ৬২'২৫ মেগাসাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে। এই কম্পাঙ্ক দুটিকে পরিবর্ধকে পাঠানোর আগে—কলকাতার কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট একটি তরঙ্গ কম্পন হতে (Local oscillation) সে দুটির মানকে বিয়োগ ক'রে নেওয়া হয়। সর্বদার জন্য দুটি ধ্রুবক (ধ্রুবক না বলে নির্দিষ্ট বা স্থির বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়।) কম্পাঙ্ক সংখ্যা বিয়োগফল হিসাবে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিটিং (Beating) বা হেট্রোডাইং (Hetrodying)। কলকাতার জন্য নির্দিষ্ট তরঙ্গের কম্পাঙ্কটি হল ১০১'১৫ মেগাসাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে এবং বিয়োগফল হিসাবে (বিটিং-এর ফলে পাওয়া) কম্পাঙ্ক দু'টি হলো ৩৩'৪ মেগাসাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে (শ্রুতি-তরঙ্গ কম্পাঙ্কের জন্য) এবং ৩৮'৯ মেগাসাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে (দৃশ্যমান তরঙ্গ কম্পাঙ্কের জন্য)। এই অসিলোস্কোপটিকেও সাধারণভাবে একটি ক্যাথোড রশ্মি নল বলা যেতে পারে। ক্যাথোড রশ্মি নলের ভিতর থেকে যে ইলেকট্রন গুচ্ছ অবিচ্ছিন্নভাবে বের হতে থাকে তার উপরে 'স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র' (Oscillating Electric Field) প্রয়োগ করলে ঐ ইলেকট্রন রশ্মি বা ক্যাথোড রশ্মির পথ পরিবর্তিত হয়। রশ্মি নলের পিছনের পাত্রটি হল একটি বিশেষ ধরনের 'প্রতিপ্রভ পর্দা' (Flurescent Screen) বিশেষ। এই ধরনের প্রতিপ্রভ পর্দায় ক্যাথোড রশ্মি এসে পড়লে সেটি আলোকিত হয়ে উঠে যেহেতু ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কম বেশী, সেহেতু প্রতিপ্রভ পর্দায় আলোকিত অংশের তীব্রতাও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কম অথবা বেশী এবং আলোক-তীব্রতার এই কম বেশী ব্যাপারটির ফলশ্রুতি হলো টেলিভিশনের প্রতিপ্রভ পর্দায় কোন চিত্রের আত্মপ্রকাশ। টেলিভিশনের এই যন্ত্রাংশটির নাম 'কিনেস্কোপ' (Kinescope)। প্রেরক যন্ত্রের আইকনোস্কোপে এর সাহায্যে ফটো ইলেকট্রিক মোজেইক পর্দায় যে চিত্রটি এসে পড়ে

কিনেস্কোপ যন্ত্রটির প্রতিপ্রভ পর্দায় অবিকল সেই চিত্রটির প্রতিকৃতি দেখা যায়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে একটি চিত্রকে হাজার হাজার ভাগে ভেঙ্গে সেগুলিকে বেতারযোগে প্রচারিত করলে গ্রাহক যন্ত্রে তার সম্পূর্ণ একটি প্রতিচ্ছবি দেখা যায় কেমন করে? পাঠানো হল ভাঙ্গা ভাঙ্গা সহস্রটি অতি ক্ষুদ্র চিত্রাংশ অথচ গ্রাহক যন্ত্রটি আমাদের উপহার দিল একটি পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত চিত্র। এটা কেমন করে হচ্ছে? এর উত্তরে বলব—এর জন্ম প্রকৃতপক্ষে কৃতিত্ব কিন্তু পাওয়া উচিত দর্শকের। আমাদের মস্তিষ্কের একটি ধর্ম হল, আমরা যা কিছু দেখি এবং শুনি —সেই দেখা এবং শোনার অনুভূতির রেশ ঐ দৃশ্য এবং শব্দ সরে যাওয়ার পরেও এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় অনুরণিত হয়ে থাকে। এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে যদি আবার অন্য কোন দৃশ্য অথবা শব্দ আমাদের চক্ষু এবং কর্ণের গোচরে আসে তবে আমাদের মস্তিষ্ক সেটিকে আগের দৃশ্য বা শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা পৃথক্ ক'রে অনুভব করতে পারে না। যেমন একটি সিলিং ফ্যান তার স্থির অবস্থা থেকে যখন ঘুরতে শুরু করে, তখন প্রথম দিকে কিছুক্ষণ সেই ফ্যানটির ব্লেডগুলিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু ফ্যানের গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্লেডগুলিকে আর পৃথক্ দেখা সম্ভব হয় না। তখন মনে হয় যেন নিটোল একটি বৃত্তাকার চাকতি ফ্যানের তলায় ঘুরছে। চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় সেকেণ্ডে ষোলখানি ক'রে চিত্র তোলা হয় এবং চলচ্চিত্রের প্রদর্শনকালে ঐ ছবিগুলিকে একই হারে পর্দার উপর ফেলা হয়। প্রতি দু'টি ফিল্মের অন্তর্বর্তী স্থানে কিছুটা জায়গায় চিত্র অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমাদের চোখ কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ছেদ দেখতে পায় না। টেলিভিশনের স্ক্যানিং কালে প্রতিটি চিত্রের সবটুকু অংশে প্রতি সেকেণ্ডে তিরিশ বার ক'রে স্ক্যান করা হয়, ফলে ঐ চিত্রটি হাজার হাজার ভাগে ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের চোখের কাছে সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ভিন্ন কিছু নয়। মোটামুটিভাবে এই হল টেলিভিশনের প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের কার্যবিবরণী। রেডিও ও ট্রানজিসটারের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি মিটার (Meter) এবং ব্যাণ্ড (Band) নির্দিষ্ট থাকে (যেমন কলিকাতা-ক বেতার কেন্দ্রের জন্ম ৪৪৭'৮ মিটার এবং মিডিয়ম ওয়েভ ব্যাণ্ড হল একটি পূর্বনির্দিষ্ট ব্যাপার—এই মিটারে অন্য কোন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান কখনও শোনা সম্ভব নয়।), তেমনি টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও থাকে নির্দিষ্ট সব চ্যানেল (Channel) সংখ্যা। কলকাতার টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দেখা এবং শোনা যাবে চ্যানেল—৪-এ। তাছাড়া অনুভূমিক স্ক্যানিং এবং লম্ব স্ক্যানিং যা গ্রাহক যন্ত্রের নিকট প্রেরিত হবে তার নির্দিষ্ট মান হল যথাক্রমে ১৫৬২৫ কিলো-সাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে এবং ৫০ কিলো-সাইকলস্ প্রতি সেকেণ্ডে। বিশ্বের প্রতিটি টেলিভিশন কেন্দ্রের কার কত চ্যানেল সংখ্যা এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক হবে তা ঠিক ক'রে দেবার জন্ম একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। এর নাম Comite Consultalit International Des Radio Communication অথবা সংক্ষেপে C. C. I. R.। প্যারিস নগরীতে এই সংস্থার সদর দপ্তরটি অবস্থিত। প্রেরক যন্ত্র হতে স্ক্যানিং করার সময় যে ভাবে পর পর চিত্রটিকে গ্রাহক যন্ত্রের কাছে পাঠানো হয়—গ্রাহক যন্ত্রে ঠিক সেই ভাবেই পর পর স্ক্যানিং লাইনগুলি তার পর্দায় দ্রুত সাজিয়ে নিতে হয়। প্রেরক যন্ত্র হতে আগের স্ক্যানিং করা লাইন পরে এবং

পরেরটা আগে এই ভাবে যদি গ্রাহক যন্ত্রে সেগুলিকে ধরা হয় তবে বলা বাহুল্য পর্দায় ফুটে ওঠা চিত্রটির কোন অর্থই থাকবে না। যথাযথভাবে সাজানোর জন্য সিনক্রোনাইজার (Synchronizer) লাগানো থাকে প্রেরক এবং গ্রাহক যন্ত্রে। প্রেরক যন্ত্রের শেষ সীমার প্রহরী 'টাওয়ারে'র মাধ্যমে প্রতিটি স্ক্যানিং লাইনের সঙ্গে 'দেহরক্ষী' হিসাবে একটি করে সিনক্রো-নাইজেসন পালস্ (Synchronization pulse) ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ দেহরক্ষীদের কর্তব্য হলো গ্রাহক যন্ত্রে ঠিক পরপর ভাবে সেগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া।

টেলিভিশন বর্ণনাকালে রঙিন টেলিভিশন (Coloured T. V.) সম্পর্কে দু'চার কথা বলা দরকার। সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে রঙিন টেলিভিশনের প্রচার ব্যবস্থা আমাদের দেশে অদূর ভবিষ্যতে করা হবে। "সাদা কাল" চিত্র প্রচারের জন্য ক্যামেরার প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র একটির। রঙিন চিত্র প্রচার করার জন্য কিন্তু প্রয়োজন হয় বেশ কতকগুলি ক্যামেরার। ঐ ক্যামেরাগুলি কেবল মাত্র এক একটি রঙের চিত্রই তুলতে সক্ষম; যেমন ধরা যাক কোন একটি ক্যামেরা—"প্রচার যোগ্য বস্তুর" মধ্যে থাকা লাল রঙটির চিত্রই কেবল-মাত্র তুলবে, কোনটি তুলবে নীল রঙের, কোনটি হলুদ রঙের আবার কোন ক্যামেরা চিত্র তুলবে শুধুমাত্র সবুজ রঙের। এই ভাবে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরার সাহায্যে — "প্রচার যোগ্য বস্তুর" সমস্ত রঙগুলি যথাযোগ্য-ভাবে চিত্রায়িত করে নিয়ে টেলিভিশনের প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে প্রচার করা হয়। বলা বাহুল্য এতগুলি ক্যামেরা হতে পাওয়া "রঙীন তথ্য" গুলিকে 'সিনক্রোনাইজ' করে প্রচারিত করা কারিগরীর দিক হতে যথেষ্ট জটিল।

টেলিভিশন—এই কারীগরী কৌশলটির উদ্ভাবনে অংশগ্রহণকারী দলের প্রধানের নাম J. L. Baird। Baird-ই সর্বপ্রথম ১৯২০ সালের জানুয়ারিতে লণ্ডন শহরে টেলিভিশন প্রচারের সার্থক প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জনসাধারণের জন্য টেলিভিশন প্রচারিত হয় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (BBC) কর্তৃক এবং এই প্রচার হয়েছিল লণ্ডনের আলেকজান্দ্রা প্যালেস হতে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে। টেলিভিশনের এই প্রচারব্যবস্থা অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি—কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপাদাপি তখন শুরু হতে চলেছে। চারিদিকে সৈনিকের হেলমেট, ভারী বুটের পা-ঠোকা আর কখনও কখনও মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক অতি ব্যস্ত বিমানের আনাগোনা— সুতরাং ও-সব বিলাসিতা বন্ধ। তারপর যুদ্ধশেষে আবার ১৯৪৬ সাল হতে টেলিভিশন প্রচারব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে আসন পেতে নেয় ওদেশে। দ্বিতীয় টেলিভিশন কেন্দ্রটি চালু হয় ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে বি. বি. সি. কর্তৃক পরিচালিত মিডল্যান্ডের সাটন কোল্ডফিল্ডে। তৃতীয় কেন্দ্রটি ১৯৫১ সালে হোমমসে। তারপরের ইতিহাস অতি দ্রুত। পাশ্চাত্যের প্রায় প্রতিটি দেশে একে একে এটি এসেছে—প্রাচ্যেও এসেছে জাপান, হংকং ইত্যাদি দেশ ঘুরে অবশেষে আমাদের দেশে।

চিরচঞ্চল বিজ্ঞান তার শত সহস্র দল বিস্তার করে বিকশিত হবার জন্য সদা ব্যাকুল। যা কিছু নিছক কল্পনা— হয়ত বা স্বপ্নবিলাস, আগামী কাল তা-ই বাস্তবে রূপায়িত করছে বিজ্ঞান। পৃথিবীর পথ-পরিক্রমা যেমন এক সত্যকে কেন্দ্র ক'রে, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার পথ-পরিক্রমার নিত্য সঙ্গী হল অনন্ত জিজ্ঞাসা, এবং কেন্দ্র হল এক চিরসত্য। অনন্ত

অসীম অভিনবত্বের মাঝে টেলিভিশন বা দূরদর্শন একটি নাম। কালের সুকঠোর পরীক্ষায় সে কালজয়ী হবে কিনা,—তার আজকের সমাদর অটুট থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা তাকেই দিতে হবে। তবে আমরা আশা করবো টেলিভিশনের সহস্র লক্ষ চোখ দিয়ে যেন আমরা সত্যকে দেখতে সমর্থ হতে পারি—সত্যকে দেখার এবং শোনার এক পবিত্র যন্ত্র হিসাবে বিজ্ঞানের এই উপহারটিকে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি।

অতুলনীয়া মা

শ্রীমতী রমা দত্ত

জীবন-জটিলতার অকূল পাথারে যখন আমরা পথ হারিয়ে ফেলি, তখন ধ্রুবতারার মতো আমাদের পথনির্দেশ করে কে? কাকে অনুসরণ ক'রে আমরা অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ করি? অবতীর্ণ ভগবান বা ভগবতী সেই ধ্রুবতারা; যাঁরা ছিলেন, আছেন, থাকবেন—চিরকাল আমাদের উপলব্ধিতে, আমাদের অস্তিত্বে। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কেউ চেতন মনে, কেউ অর্ধচেতন মনে, কেউ বা অবচেতন মনে। তবে ঈশ্বরকে আমরা দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করা তাই সুকঠিন। কিন্তু অবতীর্ণ ভগবান বা ভগবতীকে দেখে বা তাঁদের জীবন ও বাণীর আলোকেই আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। মানবজীবন কী এবং কীই বা তার উদ্দেশ্য, তা বুঝতে পারি এঁদের জীবনবেদকে জেনে। তাই এঁরা মানব ও মানবী হিসাবে আদর্শ, ঈশ্বর হিসাবে আরাধ্য।

যুগের প্রয়োজনে এঁদের আবির্ভাব। প্রত্যেক যুগেই রাষ্ট্র সমাজ ধর্মের বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠান এক থাকে না। রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়, সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় মানুষের মন—তার চিন্তাধারা। নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষা-সভ্যতায় মানুষ যখন হয় দিশাহারা, খুঁজে ফেরে আলোর দিশারীকে, তখনই যুগ-প্রয়োজনানুযায়ী আবির্ভাব ঘটে আদর্শ মহা-মানবের। যুগধর্মের প্রয়োজনে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ শ্রীচৈতন্য—প্রত্যেক মহামানবের জীবনধারাতেও তাই পার্থক্য। ভারতে যে সময়ে সহজ সরল জীবনযাপনের যুগের অবসান হচ্ছে, ভোগৈশ্বর্য এবং বিলাসিতাপূর্ণ জটিল যুগের উদয় হচ্ছে,—ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সভ্যতার দ্বন্দ্ব চলছে, স্বভাবতই রাষ্ট্রে সমাজে ধর্মে জাগছে বিশৃঙ্খলা, অনাগতকালের দুর্বোধ্য ইশারায় বিভ্রান্ত মানুষ যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে ভাবছে কোনটা তার পথ, কোনটা বিপথ, সেই জটিল যুগের প্রয়োজনে আবির্ভাব তিন মহা-মানব-মানবীর,—যাঁদের জীবনে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়,—যাঁরা প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় ক'রে একটা জটিল যুগের পথনির্দেশ করে দিয়ে গেছেন। তাঁরা হ'লেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ।

মহাসাগরের মতো অগাধ এবং মহাকাশের মতো ব্যাপক এঁদের চারিত্রগুণের পরিমাপ করে কার সাধ্য! বলা বাহুল্য আমাদের সে ধৃষ্টতা নেই। তবে শ্রীশ্রীমা চির-অবগুণ্ঠিতা—

মানবীরূপের অবগুণ্ঠনেই তাঁর ঐশী প্রকাশ আবৃত। তাই তিনি আমাদের চিরকালের মা। মাতৃত্বের মহাসৌরভে যিনি এযুগের আকাশ-বাতাস পূর্ণ ক'রে দিয়ে গেছেন, সাধারণ মানুষের একান্ত আপন সাধারণী সে মায়ের মহিমা কোথায়? যুগযুগান্ত থেকে সাধ্বী পত্নীর আদর্শরূপে পৌরাণিক যুগের সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি মহীয়সী নারীরা পুজিত হ'চ্ছেন; বিশিষ্ট বিদুষী মহীয়সী নারীর আদর্শরূপে গার্গী, খনা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন; তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা নারীরও অভাব নেই ভারতের ইতিহাসে, যাঁদের জীবনকাহিনী আমাদের বিস্মিত করে, আনন্দ দেয়, শ্রদ্ধায় মাথা নত করায়। কিন্তু সে কাল অনেক দূর অতীতের। তাছাড়া সেইসব মহীয়সীদের বারবার প্রণাম জানিয়েও একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের জীবনের মাত্র একটি দিকই বিশেষভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু নারী-জীবনের তিনটি পর্যায়—কন্যা, জায়া ও মাতার পর্যায় সমভাবে পরিস্ফুট হ'য়েছে এমন পরিচয় পাইনি, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে অর্থাৎ মাতৃত্বে উজ্জ্বলতম হ'য়েছেন এমন নিদর্শন মেলে না। জায়াধর্ম পালনের কর্তব্য সব নারীর জীবনে থাকে না, কিন্তু মাতৃত্ব নারীর সহজাত ধর্ম; এ ভাব সকল যুগের সকল নারীরই থাকে। সে ক্ষেত্রে যে মহামানবীর জীবনের তিনটি পর্যায় সমভাবে উজ্জ্বল এবং শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে যিনি উজ্জ্বলতম, পূর্বকালের আদর্শ নারীদের তুলনায় যাঁর জীবনের বিপুল স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুভবযোগ্য, বিশ্বমাতৃত্বের সার্থক রূপায়ণ যাঁর দিব্যচরিত্রে, তাঁকেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে —সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নারী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি না কি? জটিল যুগের সরল পথপ্রদর্শিকা শ্রীশ্রীমা,—পূর্ণ মানবতা, পূর্ণ মাতৃত্ব, পূর্ণ ঈশ্বরীয়ত্বের প্রতিমূর্তি তিনি!

স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দুসমাজে মাতৃত্বের মহিমা দিব্যালোকমণ্ডিত। পার্থিব সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই মাতা-সন্তানের পবিত্র সম্পর্ক। সহজাত স্নেহ ও ত্যাগের প্রতীক এই মাতৃত্ব। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন— "ভারতের এই মহান 'মা' শব্দটির ভিতর কত উচ্চভাবই না নিহিত রহিয়াছে! যে ভালবাসা কখনও কিছু পাইবার কথা ভাবে না, শুধু ভালবাসিয়াই তৃপ্ত হয়, যে ভালবাসা শুধু দান করিয়াই চলে, প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না, যে প্রেম-বিকিরণ স্বপ্নেও আমাদের ধারণার অতীত, কিন্তু যাহার উজ্জ্বল চিরদীপ্তিকে অন্তর-বাহির আপ্লুত করিতে দিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই—সেই ভালবাসাকে লক্ষ্য করিয়াই এই 'মা' শব্দটি পরিকল্পিত নয় কি?" ভারতীয় নারী মাতৃ-সুলভ কমনীয়তা মাধুর্য ও মহিমার জন্য বিশ্ব-বন্দিতা। গর্ভজাত সন্তানের জন্য জননীর অফুরন্ত স্নেহ সেবা ত্যাগ যদি সৃষ্টিরই ধর্ম হয়, তবে আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? নিবে-দিতার উল্লিখিত কথাতেই তার সন্ধান পাওয়া যাবে। গর্ভজাত নয়, যার সঙ্গে নেই কোনো রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তাবন্ধন, এমন সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ, অসীম করুণা। কাছের-দূরের, স্বদেশের-বিদেশের সবাই তাঁর সন্তান। তিনি পাতানো 'মা' নন, তাঁর স্নেহের গুণে প্রত্যেক সন্তানের উপলব্ধিতেই তিনি আপন মা, শুধু মৌখিক সম্বোধনের মা নন। সীতা, সাবিত্রীর মতো সাধ্বী পত্নীর ভূমিকাতেও শ্রীশ্রীমা নবভাবের এক উচ্চতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। কিন্তু সর্ববিষয়ে স্বামীর মতানুবর্তিনী পতিব্রতা পত্নী মাতৃত্বের এলাকায় সবক্ষেত্রে স্বামীর নির্দেশ মানতে পারেননি। সৎ-অসৎ সবাই তাঁর মাতৃস্নেহের

আস্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে। নির্মলচরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানরাও যেমন মায়ের অসীম স্নেহ মমতা লাভ ক'রেছেন, কুকর্মকারী ডাকাতও পেয়েছে তাঁর অপার স্নেহ। দুর্দান্ত শাসক ইংরেজদেরও তিনি মা ছিলেন, শোষিত নিপীড়িত ভারতীয় জনগণেরও তিনি মা। মানুষের মা, ইতর জীবজন্তুরও মা। অবতীর্ণ ভগবান শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং সর্ববিজয়িনী এই মাতৃত্বশক্তিকে সম্মান ক'রেছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী লিখেছেন: স্বয়ং ঠাকুরও বাজিয়ে বাছাই ক'রে লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে··· ? অদ্ভুত, অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন। ··· মা! মা! জয় মা !!

অগণিত সন্তানের অসংখ্য অন্যায় আবদার সয়েছেন, তাদেরই 'কর্মফলস্বরূপ বিষের জ্বালা হাসিমুখে সহ্য ক'রেও ব'লেছেন: ভয় কি? সব সময় মনে কোরো আমার একজন মা আছেন।

কোন্ যুগে, কোন্ দেশে, দুঃখকাতর লক্ষ লক্ষ সন্তানকে, জাতিধর্মনির্বিশেষে, কে এমন মধুর স্বরে সান্ত্বনা দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, শান্তি দিয়েছেন?

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিরও কি অপূর্ব সমন্বয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে! পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর ছিল না একথা সত্যি, কিন্তু জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তিনি যে তার ঘনীভূত মূর্তি! শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি উক্তিই একথার সত্যতা প্রমাণ করবে—'ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, জ্ঞান দিতে এসেছে।' বেদবেদান্ত, শাস্ত্রগ্রন্থ প'ড়ে জ্ঞানী তিনি হননি, কিন্তু তাঁর জীবনই যে বেদবেদান্ত, শাস্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা! শিক্ষার প্রকৃত অর্থ তো বহু পুঁথিপত্র পাঠ এবং উপাধি ইত্যাদি লাভ করা নয়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনুষ্য-জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন। সেই মাপকাঠিতেও আমাদের অলোকসামান্যা দেবীমাতা উচ্চশিক্ষিতা। জ্ঞানের অনেক রকম সংজ্ঞাই অনেকে দিতে পারেন, কিন্তু সরলতম সহজতম সংজ্ঞা শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়েছেন: "এক-জ্ঞান জ্ঞান।" এই সংজ্ঞাসূত্র ধ'রে জীবনপথে এগিয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান। পূর্ণ-জ্ঞানের অধিকারিণী শ্রীশ্রীমা আমৃত্যু নিজের জীবনে নিয়মিত অনুশীলন ক'রে দেখিয়ে গেছেন এই জ্ঞানলাভের পথ। 'কর্ম' সম্পর্কে, সংসারাশ্রম সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, অসাধারণ মা আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ জীবনযাত্রার মাধ্যমে সে বাণীর মর্ম বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। কত অনাড়ম্বর ও অনাসক্ত সে জীবন! প্রত্যুষ থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কর্ম আর সে কর্মের রূপই বা কত বিভিন্ন! একই হাতে রান্না করা, বাসন মাজা, ঘুঁটে দেওয়া, শাক বোনা, আবার পূজা পাঠ, ধ্যানজপ, সন্তানদের মঙ্গল-কামনা, দীক্ষাপ্রদান ইত্যাদি। 'যখন যেমন, যেখানে যেমন' কর্তব্যগুলি সামনে এসে পড়বে তা-ই হাসিমুখে নিষ্ঠাসহকারে আনন্দের সঙ্গে ক'রে যাওয়া, এই ছিল তাঁর উপদেশ। যিনি জগজ্জননী, রাজরাজেশ্বরী, সহস্র সহস্র ভক্তের আরাধ্যা, তিনি সামান্য রমণীর ন্যায় সংসারে কি কর্মবহুল জীবনযাপন করেছেন তা আমাদের কল্পনারও অতীত। আর তাঁর কর্মময় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভক্তি। শত কর্মের মধ্যেও জপ-ধ্যান, পূজা-প্রার্থনা যে অবশ্য করণীয়, ভগবানে ভক্তি ছাড়া যে মানুষ দাঁড়াতেই পারে না এ কথা মা বারংবার বলে গেছেন। যে দাঁড়াতেই পারে না, সে ছুটবে কেমন করে? ভক্তি না হ'লে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কোথায়? এইভাবে দেখা যায় মায়ের জীবন ও বাণীতে সকল সাধন-

পথের সমন্বয়।

লোকশিক্ষার জন্য মানবীরূপে অবতীর্ণা মা 'আপনি আচরি ধর্ম' জীবেরে শিখিয়েছেন। 'ধর্ম' কথাটা শুনে আমরা সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হই, না জানি কত কৃচ্ছ্রসাধন, কত কষ্ট স্বীকার করতে হবে ধর্মপালনের জন্য! আমাদের প্রয়োজন কী জটিল ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায়? ধর্মের সহজ ও জীবন্ত ভাষ্য তো স্বয়ং শ্রীশ্রীমা। জীবনকে যা ধারণ ক'রে আছে অর্থাৎ যা দিয়ে মনুষ্যজীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকে, যা মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে, সেই বিশেষ গুণগুলির অনুশীলন এবং মনুষ্যোচিত কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করাই তো ধর্ম। স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিভিন্ন ভূমিকায়, যেমন মাতা পিতা ভগ্নী কন্যা পুত্র বন্ধু রাজা প্রজা গুরু শিষ্য ইত্যাদিতে পালন করতে হয়, এগুলিই মানুষের ধর্ম। দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুসারে সেই ধর্মের মূলনীতি হ'চ্ছে—স্নেহ প্রেম মমতা নম্রতা সরলতা সহিষ্ণুতা ক্ষমা সহানুভূতি অহিংসা সত্য নিঃস্বার্থপরতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন; যুক্তি ও বিচার দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণ; অবিচল ন্যায়নিষ্ঠা; মহৎ কল্যাণের আদর্শ; মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদাদান; মহত্তর ও বৃহত্তর হৃদয়বৃত্তির প্রেরণাকে স্বীকার এবং সর্বোপরি সর্বভূতে পরমাত্মার অনুভূতি—মানবাত্মার বন্ধনমুক্তি। এই ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করলেই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তারপর দেবত্ব লাভ করতে পারি এবং ঈশ্বরের নিত্য সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি। নিজের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী এবং চিত্তাকর্ষক সুন্দর সুন্দর সহজ সরল উপদেশের মাধ্যমে এই ধর্মপালনের উপায় ব'লে দিয়েছেন মা।

গ্রাম বাংলার সরলতার প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়—*রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার* সমন্বয়। ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষণশীলতার—যা কিছু এযাবৎকাল প্রচলিত আছে তাকেই সযত্নে রক্ষা করা, আঁকড়ে ধরা। সমাজ-প্রচলিত রীতিনীতি, আচারব্যবহার সবগুলিই পরবর্তী যুগের পক্ষে মঙ্গলজনক নাও হ'তে পারে। যাঁদের থাকে ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অথচ ভবিষ্যৎদৃষ্টিযুক্ত ও সহানুভূতিপূর্ণ গতিশীল মন, সেইসব মহামানব ও মহামানবী যুগের অনুপযোগী রীতিনীতিকে বর্জন ক'রে মঙ্গলকর নূতন রীতিনীতিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। প্রগতিশীলতা তথা আধুনিকতার সংজ্ঞা যদি হয় সংস্কারমুক্ত সংকীর্ণতামুক্ত যুক্তিবাদী গতিশীল উদারতা, তবে 'মা' কি প্রগতিশীলা নন? অন্ধ কুসংস্কার, জাতিভেদের গোঁড়ামি, কূপমণ্ডূকতা ইত্যাদি প্রাচীন দেশাচার যখন সমাজজীবনকে দুর্বিষহ ক'রে তুলতো, সেই যুগে, আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা না হ'য়েও 'মা' যে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, আজকের যুগের প্রগতিশীল মানুষেরাও তাতে বিস্মিত। হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা, কুলবধূ, আজীবন নারীর চিরন্তন ভূষণ লজ্জাশীলতায় আবৃতা হ'য়ে অন্তঃপুরবাসিনী হ'য়ে থাকলেও দেশাচার, লোকাচারকে নির্মম আঘাত না দিয়েও তিনি অনেক নিয়মকানুনকেই যুগোপযোগী ক'রে দিয়ে গেছেন। নারীর বাল্য-বিবাহ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার একান্তই প্রয়োজন, জাতিভেদের গোঁড়ামিতে সমাজের ভিত্তি দুর্বল হয়, নির্জলা উপবাস ইত্যাদিতে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ধর্মপালন হয় না ইত্যাদি উপদেশাবলীতে তিনি সবাইকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। নিজের দেশের কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় অভাব, সব খবরই যেমন

রাখতেন, তেমনই তৎকালীন বিশ্বের যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির সংবাদও শুনতেন। ভারতের উন্নতির জন্য আত্ম-নিবেদিত ভগিনী নিবেদিতা যে সময়ে তাঁর স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রক্ষণশীল পরিবারের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, কিন্তু বিধর্মী বিদেশিনী ব'লে অনেকের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পাননি, সেইকালে 'মা' স্বয়ং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারের কন্যা ও বধূ হ'য়েও নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সহিত একত্রে আহার পর্যন্ত করেছেন। যে কালে সাগরপারে গেলে জাতিভ্রষ্ট হ'তে হোত, প্রায়শ্চিত্ত করতে হোত, সেকালে প্রগতিশীলা 'মা' পাঠালেন সন্তানকে বিদেশে, তাঁর আশীর্বাদ ও অনুমতি নিয়েই স্বামীজী আমেরিকা যাত্রা করেন। দেশাচার, লোকাচারের চাপে বিভ্রান্ত-বিপর্যস্ত মানুষ তাঁর কাছে গেলে স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী 'মা' তাদের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ক'রে দিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জগদ্‌বরেণ্য মহামানব স্বামীজী লিখেছিলেন: "মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।...মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

'প্রদীপ হ'য়ে মোর শিয়রে
কে জেগে রয় দুখের ঘরে
সেই যে আমার মা,
বিশ্বভুবন মাঝে তাঁহার নেইকো তুলনা।'

উনবিংশ শতাব্দীতে শক্তির জাগরণ

স্বামী ভর্গানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে তাঁর এক গুরুভাইকে লিখেছিলেন: 'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।...শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

শক্তি ছাড়া ব্যষ্টি বা সমষ্টি, জাতি বা গোষ্ঠীর উন্নতি সম্ভবে না। মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা নিয়ে একটি জাতি আরেকটি বিশাল সংখ্যাবহুল জনসমাজকে নিজের বশে রাখে মাত্র শক্তির প্রভাবেই। তাই স্বামীজী লিখেছেন, 'শক্তির কৃপা না হলে কি ছাই হবে!'

আদিম যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত প্রামাণ্য ও স্বীকৃত গ্রন্থের নায়ক এই এক শক্তিরই উপাসক। এই শক্তির উপাসকই পরে আনুষ্ঠানিক-ভাবে পুজো পাচ্ছেন অবতার বা অবতার-লীলাসঙ্গিনীরূপে।

মানুষ তার নিজের মনুষ্যত্ব-বিকাশে ব্যস্ত। তবে, রাস্তা আলাদা, ক্রমে ঠিক-ঠিক ও সোজা রাস্তায় এসে এই খোঁজার মাধ্যমে যে শক্তির প্রকাশ সে পায়, তা পরে তাকে করে তোলে আসল মানুষ—দেবতা। মানুষের কাছে তার ধর্মটা হোল আগুনের দাহিকা শক্তিরূপ

ধর্মের মতই—মনুষ্যত্ব। এইটিই তার শক্তি। এই শক্তির উপাসনায় ক্রমে সাধনালব্ধ ধনে মানুষ হয় দেবতা, তখন তার দেবত্বশক্তিই তার ধর্মরূপে প্রত্যক্ষ পরিচয় দেয়। তাই আদিম মানুষের আদি দেবতা হোল শক্তি। এই শক্তি সাধারণতঃ দেবীরূপেই পূজো পেয়ে আসছেন, তাই দেখা যায় মানুষ আদিম কাল থেকে শক্তিরূপ দেবতার কাছে মানতও মেনে আসছে।

বৈদিক যুগে এ শক্তি তাঁর নিজের আসনে সুষ্ঠুভাবে সমাসীনা। কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী ইন্দ্রাদি দেবতাদের শক্তি যোগাচ্ছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার (৬।৪।৫) মন্ত্রও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বেদ ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি যা সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাতে দেখা যায় মানুষের খোঁজার পথে যে চিরন্তন ধারাবাহিক ধারা, তার শেষ পর্যায়ে এসে জেনেছে সে নিজেকেই। এই নিজেকে জানা-রূপ বিজ্ঞানকে এদেশ সব চেয়ে উঁচু স্থান দিয়েছে। এটাও ঘটেছে শক্তির আরাধনার মাধ্যমে, (তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥ তৈ. আ. ১০।১।৬)। শুধু আত্মানুভূতি নয়, সংসারে বিভিন্ন স্তরের জীবন-যাত্রানির্বাহে সফলতার কামনায় মানুষ থেকে দেবতা পর্যন্ত সকলেই শক্তির কৃপা-ভিখারী। দুর্গাসপ্তশতীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাইতো তিনি 'কৃপাবলম্বন-করী'

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানবিদ্‌দের বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারে ও বস্তুর খোঁজে ব্যস্ত। তাঁদের সাধারণভাবে মোটামুটি মাধ্যম হোল দূরত্ব, ভর ও সময়।

প্রাচীনকালের 'বিজ্ঞানী'রা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর স্থিতিতে আস্থাবান, আর সেই বস্তুর খোঁজে থাকতেন রত, তাঁদের মাধ্যম ছিল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এই খোঁজের শেষ পর্যায়ে তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন নিজেদেরই সত্তাকে। আমরা সাধারণভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে সেই সত্তাকে বলি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তি-মান ও সর্বজ্ঞ। বোঝবার জন্যে ও চর্চার জন্যে ছোট্ট কথায় বলে থাকি 'ব্রহ্ম'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি অভেদ।' বোঝাতে গিয়ে বলেছেন: 'সাপকে ছেড়ে তির্যক্ গতি ভাববার যো নাই।' তাই শক্তি চিরন্তনী। ব্রহ্ম সনাতন—শক্তি সনাতনী।

সত্যসন্ধ ঋষির ধ্যানস্তব্ধ হৃদয়ে একদিন এই সত্য প্রতিভাত হয়েছিল যে, শক্তি অসীম দেশকালের অধিষ্ঠাত্রী, বিশ্বাত্মিকা ও দেশ-কালের অতীত বিশ্বোত্তীর্ণা, চিদানন্দময়ী - সর্বব্যাপিনী সর্বশক্তিমতী ও সর্বজ্ঞা।

মনে হয়, আমরা প্রথম এই শক্তির প্রাধান্যের পরিচয় পাই ঋগ্‌বেদে মাতৃপ্রধানা সর্বদেবময়ী সর্বেশ্বরী ব্রহ্মস্বরূপিণী অদিতিতে। বৈদিক দেবমণ্ডলে পুরুষদেবতাদের প্রাধান্য থাকলেও বেদসংহিতায় অনেক দেবীর উল্লেখ রয়েছে। এঁরা শক্তির মহিমায় ও মাতৃ-প্রধানতার উৎকর্ষে মহীয়সী। উপনিষদ অংশেও দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়; শ্রুতির ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকেও উল্লেখ আছে। মহীয়সী 'বাক্' তো শ্রুতি ও স্মৃতি জুড়ে ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিরূপে পূজো পাচ্ছেন। 'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম।' (বৃহ. উপ. ৪।১।২) ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তের (১০।১০।১২০) ঋষিই হলেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্। তিনি নিজেকে পরব্রহ্মময়ী, আদ্যাশক্তি বলছেন। এভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে ও অনুভূতিতে মহীয়সী আরো অনেকে রয়েছেন—ভারতী, সরস্বতী, ইলা প্রভৃতি। সকলেই

সেই এক আত্মাশক্তিরই বিভিন্ন দিক্ ও ধারার প্রকাশে অবতীর্ণা।

তবে এই অদিতি মনে হয়, অনুভূতিতে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়ে মহিমার উত্তুঙ্গ শিখরে সমাসীনা—আপন শক্তির প্রখর-স্নিগ্ধ প্রকাশের বিকিরণে ভাস্বতী। বৈদিক মন্ত্রে দেখা যায় দেবতাদের কাছে প্রার্থনায় অদিতির কাছেই কল্যাণ কামনা করছেন সমাজসেবী ও আত্মতত্ত্বে নিপুণ অনুভবীরা: বাজস্যনু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে। যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং নিযচ্ছাৎ॥ (অথর্ববেদ ৭।৬।৪) —(সমৃদ্ধি তিনি [অদিতি] দেন) তাই সমৃদ্ধি দেবেন বলেই মহামায়ী দেবী অদিতিকে আমরা তাঁর নাম ধরে আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁরই কোল জুড়ে রয়েছে বিশাল অন্তরিক্ষ। তিনি (কৃপা ক'রে) আমাদের 'ত্রিবরূথং' ত্রি-সমবায়ের (শরীররূপ রথের রথগুপ্তির - দেহ মন ও প্রাণের) কল্যাণ বিধান করুন।

বৈদিক যুগ থেকে এসে তন্ত্র-প্রধান যুগে শাক্ত শাস্ত্রেও দেখা যায় শক্তির আধারস্বরূপিণী ভগবতী সমস্ত সমৃদ্ধিদায়িনী। তন্ত্রশাস্ত্র শক্তি-প্রধান। মহাকালী এখানে শক্তির বিরাট আধার ও সমস্ত সমৃদ্ধিদাত্রী ও কৃতকর্মের ফলদাত্রী আর ব্রহ্মানুভূতির দ্বার-উন্মোচন-কর্ত্রী।

ধর্মার্থকামমোক্ষদা নিত্যং চতুর্বর্গফলপ্রদাঃ।
যেন তেন প্রকারেণ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥
[কুব্জিকাতন্ত্র ৫।৬]

কামধেনু তন্ত্রে দেখা যায় 'শূন্যগর্ভে স্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী'। যোগিনী তন্ত্রে আছে, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখানোর মত 'ঘোর' অসুরকে দেবী বলছেন—'ইদানীং পশ্য মদ্রূপং ব্রহ্মানন্দং পরং পদম্'।

পৌরাণিক যুগে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গা-সপ্তশতীতে দেবী শক্তিরূপে আরাধিতা। শক্তির আবির্ভাব ও তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গিমার ঘটনা এখানে নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল। সমস্ত দেবতারা তাঁদের নিজেদের শক্তি দিয়ে এই মহিমময়ী মূর্তির সৃষ্টিতে অভিনিবিষ্ট। আবার পরে পূজা ধ্যান গান ও স্তোত্রের মাধ্যমে সেই অপূর্ব মহাশক্তির তুষ্টি-কামনায় রত। কৃতকর্মের ফলপ্রসূ দিব্য মূল্যায়নে দেবতারা উপকৃত ও স্বশক্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

ঐতিহাসিক ধারাক্রমেও শক্তির আরাধনা প্রতিটি কার্যে সুষমায় স্নিগ্ধ। মহাভারতে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন দু'জনেই শক্তিকে স্তব-স্তুতির মাধ্যমে সন্তুষ্ট ক'রে বর-কামনায় ব্যস্ত। যুধিষ্ঠিরের স্তবে দেখা যায়—

'নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি।
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে॥'

অর্জুন দুর্গাস্তুতির শেষে কেমন নিজের জয়ের জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

'সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্নবান্।'

রামায়ণে রামচন্দ্র নিজেই দুর্গাদেবীর আরাধনায় নিজের চক্ষু-উপচারে শক্তি-আহরণে ব্যগ্র। পুরাণ ইতিহাস 'শক্তির আরাধনা ও তাঁর জাগরণ' ছড়িয়ে রেখেছেন অপূর্বভাবে বর্ণনার মাধ্যমে।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখি কবি-মনে শক্তি যোগাতে ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির আবাহন ও প্রশস্তি। কালিদাস তাঁর রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই পার্বতীপরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন। ভবভূতি (মালতীমাধব), সুবন্ধু ও ভাস (বাসবদত্তা), অভিনন্দ (রামচরিত কাব্য), কহ্লণ (রাজতরঙ্গিণী) প্রভৃতি ধুরন্ধর পণ্ডিতেরা তাঁদের কাব্যরচনায় দেবীরূপিণী শক্তির আরাধনায় ও উপস্থাপনায়, কুশল-কার্য-সাফল্যকামনায় ও বন্দনাগানে সিদ্ধহস্ত

বৃহত্তর ভারতে ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের নিদর্শনে এবং বিভিন্ন রাজা, মহারাজ ও সম্রাট আখ্যাধারী দিগ্‌গজদের রাজ্যশাসনের প্রতীকে ও পরিচালনায় দেবীই শক্তিরূপে বিরাজমানা।

দেবীকে শক্তির আধার জেনে বা শক্তিকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, তাঁকে সামনে রেখে, দিকে দিকে স্থাপনা ক'রে তবেই মানুষ নিজের কর্তব্য-সাধনে, তার ফল-মূল্যায়নে জয়ের আশা নিয়ে চলার পথে এগিয়ে যায়। শক্তির প্রসাদে ধন্য হওয়ার জন্যেই স্থানে স্থানে মন্দির ও পীঠ। তাঁর কৃপাভিখারী মানব-সমাজ চলার পথে অসফলতার সম্মুখীন হলেও সফলকাম হওয়ার আশায় উন্মুখ। ভিন্ন মার্গের সাধকদেরও নিজ নিজ অধিকারের উপাসনায় দেখা যায় সেই মহাশক্তিরই মহিমার স্বীকৃতির স্বাক্ষর।

সেই এক মহাশক্তির মহিমা সর্বত্র লক্ষণীয়। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমাজের নানান পরিবর্তনে, ক্রমবিকাশের সন্ধিক্ষণে সর্বত্র সেই এক মহাশক্তির অনুকম্পা-ভিক্ষা অব্যাহত।

আধুনিক যুগে, এইমাত্র চলে-যাওয়া শতাব্দীতে আদ্যাশক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ সারা জগতে মহাশক্তির যে প্রচার ও প্রসার করে গেলেন, তা' আজ আমাদের ধ্যানের বস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য যে অসম্ভব তপস্যা ও সাধনা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে—এক শুভ দিনে জগতের হিতকামনায়, তাঁর সেই সব তপোলব্ধ শক্তি তাঁরই শক্তিরূপিণী সারদাদেবীকে সঁপে দিয়ে হয়েছিলেন নিশ্চিন্ত। লোকসংগ্রহের জন্যে যে যোগাসনে বসে শক্তির আরাধনায় তিনি অভূতপূর্ব অধ্যবসায় ও লোকবিস্ময়কর সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই পূজাসনে বসে আজ তিনি—"মন্ত্রপূত কলসের জল লইয়া··· বারংবার শ্রীশ্রীমায়ের (সারদাদেবীর) অভিষেক করিলেন। তারপর তাঁহাকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরি, সিদ্ধি-দ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীমায়ের) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

এঘটনার আগেও সারদাদেবীর আচরণে প্রকাশ পেত তাঁর অতিমানবীয় সত্তার পরিচয়। একবার 'বাবা' বলে পিতৃ-সম্বোধনে নরঘাতী দস্যুকে পরিবর্তন ক'রে তিনি বসিয়েছিলেন তাকে দেবতার আসনে। এ-ভাবের অনেকানেক ঘটনাবলী তাঁর অমেয় শক্তির পরিচয়বাহী। "এত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইয়াও যেভাবে তিনি (সারদা-দেবী) একদিকে সাধারণ গৃহকর্ত্রীর মত জীবন-যাপন ও অন্যদিকে আর্ত ভক্তের কাতর প্রার্থনায় 'ঠাকুর যা করেন তাই হবে বাবা' বলিয়া নিজের কর্তৃত্ব-অভিমানের সম্পূর্ণ বিসর্জনের পরাকাষ্ঠা নিজের জীবনচর্যায় দেখাইয়াছিলেন তাহা সত্যই জগতে বিরল; আবার অধ্যাত্মপিপাসুদিগের সর্বোচ্চ আদর্শ ব্রহ্মানুভূতির আনন্দ-আস্বাদনের উপলব্ধি তেমনটি করাইতে সফল গুরুর মত অনায়াস ও আড়ম্বরহীন কর্তব্যসাধনায় যেমন রত ছিলেন তাহাও আজ ধ্যানের বস্তু।"

প্রাচীন যুগের অবতার, অবতারকল্প পুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মময়ী মাতৃকাকুলের পরিচয় তাঁদের স্তবস্তুতি বা কীর্তিগাথার মাধ্যমে গ্রন্থাদিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে মহামায়ার অতিমানুষিক দৈবীসম্পদের যে প্রকাশ, তার চাক্ষুষ দর্শনে সৌভাগ্যবান অনেকেই আজও জীবিত।

প্রতীক বা প্রতিমা একদিকে যেমন দেব-পূজার আধার, অন্যদিকে তেমনি দেবতা-প্রত্যয়ের আলম্বন। সেইজন্যে প্রতীক বা

প্রতিমায় পূজোর সময় আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ধ্যানের মাধ্যমে নিজ আত্মিক সত্তাকে প্রতীকে বা প্রতিমায় আরোপণের বিধি। তাতেই প্রতীক বা প্রতিমা হন জীবন্ত।

সেই জীবন্ত প্রতীক বা প্রতিমার কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই, আকুতি-মিনতি করি, উদ্দেশ্য—সফলকাম হওয়া। এখন সামনে কিন্তু সেই চৈতন্যময়ী— জীবন্ত বরদাত্রীরূপে বিরাজমানা। তাই বলা যায় ভক্ত গায়কের ভাষায়: 'নে রে তুলে যার যত হয় প্রয়োজন, (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ)।' জীবোদ্ধারে সারদাদেবী নিজের অসহায় অবস্থা ব্যক্ত করলে শ্রীরাম- কৃষ্ণদেব বলেছিলেন তাঁকে—'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিল বিল করছে, তুমি তাদের দেখো।' তাই মনে হয়, ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির জীবন্ত বিগ্রহ সারদা- দেবীতে পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণ অভিষিঞ্চনে ও মন্ত্রোচ্চারণে করেছিলেন সেই জীবোদ্ধারিণী শক্তির যুগোপযোগী জাগরণ।

কোন কোন অবতারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তির তিরোভাব ঘটেছে অবতারের লীলাসংবরণের আগেই বা প্রয়োজন না থাকায় শক্তির অবতরণই ঘটেনি। তাই বলা যায়, অবতারপুরুষদের সমস্ত বা আংশিক প্রেরণাশক্তির প্রতিভূরূপে তাঁদের স্বরূপ- শক্তিরা প্রত্যক্ষরূপে সমাজের সামনে আসেননি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে তার ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে ব্রহ্মময়ী সারদাদেবী অনন্যা।

বৈদিক মন্ত্রে অদিতিকে বলা হয়েছে ঋতের স্ত্রী। ঋতের অর্থ হোল সত্য, এই সত্যই ব্রহ্ম; কারণ 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম'। সেই 'ঋতে'র নিত্যসংগিনী, হ্লাদিনী শক্তি—সর্ব- মঙ্গলা, সর্বসিদ্ধিদায়িনী মহাশক্তি অদিতি। ঋত-রামকৃষ্ণের অদিতি-শক্তি সারদাদেবী ছিলেন মোক্ষকামীদের কাছে মোক্ষদাত্রী, আবার সমাজে আদর্শপ্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠায় মহীয়সী নারী। সারদাদেবীর অন্যতম জীবনী- কার লিখেছেন, 'যাঁহার সান্নিধ্যে মন শান্ত হইত, পাপী-তাপী সন্তাপ ভুলিত, যাঁহার দর্শনে ভক্তের অন্তর বিমলানন্দে ভরিয়া উঠিত…' ইত্যাদি। বাস্তবিকই তাঁর কৃপাদৃষ্টি সংসারের সব জ্বালা চুকিয়ে দিয়ে অনাবিল আনন্দের আস্বাদ করাত। মোক্ষকামীদের কাছে উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য প্রয়োজন হয় শান্তমনে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। কারণ মানুষের মন 'চঞ্চল, প্রমাথি, বলবদ্দৃঢ়'। সারদাদেবীর সান্নিধ্য এই বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত ক'রে মুক্তিকামীদের খোরাক জোগাত। আবার সমাজে আদর্শ- রূপে অবস্থানও তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনায় প্রমাণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলেছিলেন-'ও (শ্রীমা) সারদা-সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।' অন্য সময়ে বলেছিলেন—'ও জ্ঞান- দায়িনী মহাবুদ্ধিমতী, ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।'

সেই ব্রহ্ম-শক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে হয়ে- ছিলেন জাগরিতা। তাঁর কাছে আজ সকলের সঙ্গে একমনে একপ্রাণে একতানে প্রার্থনা জানাই-

'প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥'

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন : (পঞ্চদশ ভাগ) : স্বামী নিত্যাত্মানন্দ : প্রকাশিকা : শ্রীমতী ঈশ্বরী গুপ্তা, সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম-প্রকাশন ট্রাস্ট, ৫৭৯ সেকটার ১৮-বি, চণ্ডীগড়; পরিবেশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩। (১৩৮১), পৃঃ ৪৭১, মূল্য : পনের টাকা।

'শ্রীম-দর্শন' পঞ্চদশ ভাগ এই গ্রন্থমালার সর্বশেষ ভাগ। এই ভাগটিতে বাইশটি অধ্যায় ও দুইটি পরিশিষ্ট আছে।

লেখক স্বামী নিত্যাত্মানন্দ সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনে মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীম) পূত সান্নিধ্যে আসেন ও তদবধি তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীরামকৃষ্ণকথা সাগ্রহে শ্রবণ করিতেন। পরে মননের সাহায্যে তাহা দিনপঞ্জীরূপে লিখিতেন এবং অবসর সময়ে শ্রীমকে শুনাইতেন। শ্রীম তাঁহাকে দিনপঞ্জী-রচনার কৌশলও শিক্ষা দেন। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া তপঃক্ষেত্র হৃষীকেশে তিনি ইহার সাহিত্যরূপ দেন। প্রথম ভাগ হইতে পঞ্চদশ ভাগ প্রকাশের কালিক ব্যাপ্তি চৌদ্দ বৎসর।

এই গ্রন্থে 'শ্রীম'র জীবন-বাণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের আংশিক ভাষ্যও এই ভাগের সৌষ্ঠব বর্ধিত করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শপূত কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত নবীন তীর্থসমূহের তালিকা—প্রাচীন নাম, নানা বিবরণ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে একটি মূল্যবান সংযোজন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর একটি জীবন্ত আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার লোকব্যবহার সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সত্যই অনবদ্য। এই ডায়েরী পাঠ শুনিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অমর লেখক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল : 'বাঃ কি উদ্দীপক বিবরণ! ভবিষ্যতে মঠের ইতিহাসে এ সব জীবন্ত ছবি থাকবে। কত লোকের উপকার হবে এই ডায়েরীতে। তত্ত্বকথার চাইতে এই সব জীবন্ত বিবরণ অধিক মূল্যবান সাধকদের কাছে।' (পৃঃ ৩৬৭)।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন—বিভিন্ন পৃষ্ঠায় খণ্ড ও ভাগের পার্থক্য মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। 'শ্রীম-দর্শন' ভাগে বিভক্ত, খণ্ডে নহে; ভিতরের বিষয় অধ্যায়ে নির্দেশিত —যেমন কথামৃত পাঁচ ভাগে বিভক্ত; ভিতরের বিষয় খণ্ড ও পরিচ্ছেদে নির্দেশিত। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থে ২৩ পৃষ্ঠায় 'শ্রীম-দর্শন' পঞ্চদশ খণ্ড ও 'কথামৃত' পাঁচ খণ্ড ইত্যাদি কথা ভ্রমপূর্ণ। এজাতীয় সামান্য সামান্য ত্রুটি পরবর্তী প্রকাশনে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই সুরুচিসম্মত। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রসঙ্গত

গত কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'তব কথামৃতম্'-এর সমালোচনা সম্পর্কে সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় বসু রায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্র নারায়ণ সাহা একটি পত্রে সমালোচনার অন্তর্গত 'অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের পান্থশালাটিতে স্বামীজী গিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন উল্লেখ জীবনীতে নাই'—এই উক্তিটির সম্বন্ধে জানাইয়াছেন যে, (কোন জীবনীতে না

থাকিলেও) প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৭৩ সংখ্যায় স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ লিখিত 'বিবেকানন্দ ইন্ সুইজারল্যাণ্ড, ১৮৯৬'-শীর্ষক প্রবন্ধে আছে যে, স্বামীজী উক্ত সন্ন্যাসীদের মঠটি পরিদর্শন করেন।

অধিকন্তু আকর-নির্দেশ প্রসঙ্গে উল্লিখিত পত্রলেখকগণ জানাইয়াছেন যে, 'বিদেশে গেলাম কেন? এদেশে কেউ তো আমার কথা শোনেনি!' — স্বামীজীর এই উক্তির অনুরূপ উক্তি মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী', ৩য় খণ্ডে আছে এবং 'যখন পেট কামড়ায় তখন গম্ভীর হই' —এই উক্তির অনুরূপ উক্তি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ৩য় খণ্ডে আছে।

উপরি-উক্ত তথ্য পরিবেশনের জন্য পত্রলেখকগণ ধন্যবাদার্হ।

—সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

উদ্বোধন কার্যালয়ে (শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে) গত ১৩ই ডিসেম্বর, সোমবার শ্রীশ্রীমায়ের ১২৪তম জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থান ও উদ্বোধন কার্যালয়ের জন্য এই বাটীটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এ বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ ঘটে। সেই সময় হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতায় আসিলে শ্রীশ্রীমা এই বাটীতেই থাকিতেন।

যে ঘরটিতে তিনি থাকিতেন, সেটি ঠাকুর-ঘরও ছিল; সেই ঘরেই স্থূলদেহ ত্যাগের পর শ্রীশ্রীমাও পূজিতা হইয়া আসিতেছেন; উৎসবের দিন এখানে তাহার চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য ভোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে পূজা হোম ভজন প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। নূতন বাড়ীর 'সারদানন্দ হল'-এ সকাল হইতে ভজন, 'ইচ্ছাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায়' কর্তৃক কালীকীর্তন, স্বামী তীর্থানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা, রহড়া আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক ভজন ও বাউল গান এবং সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক ভজন ও বাউল গান পরিবেশিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ২৮শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত শিশুশিক্ষণ-ক্রীড়ানুষ্ঠান, পূজার্চনা, ভোগরাগ প্রসাদবিতরণ বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীদেবাশীষ ত্রিপাঠী ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শ্রীকমলকুমার প্রামাণিক শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ১লা মে প্রাতের সভায় সভাপতি স্বামী অচ্যুতানন্দ শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ সম্পর্কে ভাষণ দেন। শ্রীধনপতি মাইতি উদ্বোধন- ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমুখোপাধ্যায়, শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীত্রিপাঠী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা অগ্রহায়ণ। (১৩০৬ সাল) [২১শ সংখ্যা।]

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

। পূর্ব্বানুবৃত্তি ।*

ধীরানন্দ। যে সকল সন্ন্যাসী ভণ্ড বা মূর্খ, তাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। কেন?—ভাল সন্ন্যাসী, ভাল সাধু কি কখনও কোথাও দেখ নাই?—এত ত বেড়ালে।

রামদাস। হাঁ, তা বটে। তবে যে সকল গৃহী কুটিল স্বার্থপর ও পরদোষান্বেষী তাহারাও প্রকৃত গৃহী নহে। গৃহীদের মধ্যেও অনেকে ভাল আছেন।

ধীরানন্দ। তার সন্দেহ কি? কিন্তু দেখুন, ত্যাগ না হইলে, সন্ন্যাসব্রতগ্রহণ না করিলে, অপরোক্ষানুভূতি বা সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

রামদাস। সন্ন্যাস অর্থ যদি গেরুয়া কাপড় পরা হয়, তবে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারি না। মনুও বলিয়াছেন "ন লিঙ্গং ধর্ম্ম-কারণং"। আর সন্ন্যাস অর্থ যদি বাসনাত্যাগ হয়, তবে গৃহীও সে সাধনার অধিকারী।

ধীরানন্দ। লিঙ্গ (অর্থাৎ ত্যাগের কোনও রূপ চিহ্ন) ধারণ করিলে অনেকে ত্যাগের পথে বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন, "তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ"। অলিঙ্গ বা সন্ন্যাসের কিছু চিহ্নরহিত তপস্যায় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং লিঙ্গধারণেরও আবশ্যকতা আছে। মনু হইতে বেদের প্রমাণ অধিক।

রামদাস। বেদে ইহাও আছে "বিদ্বান্ লিঙ্গবিবর্জ্জিতঃ"। আমার মতে বাসনাত্যাগই সন্ন্যাস। তা গৃহে থাকিয়াও হইতে পারে। শিহ্লোন মিশ্রও বলিয়াছেন, "গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ" "নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং"। গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপস্যা করা যাইতে পারে। নিবৃত্তবাসনা-লোকের পক্ষে গৃহই তপোবন।

ধীরানন্দ। "বিদ্বান্" মানে—যাঁর জ্ঞান হইয়াছে। জ্ঞান হইলে ত সন্ন্যাসাশ্রমেরও পারে যাওয়া হইল। তখন আর 'লিঙ্গ'ই বা কি, আর 'অলিঙ্গ'ই বা কি? সন্ন্যাসের প্রথমাবস্থায় লিঙ্গাদি বড়ই উপকার দেয়। আর দেখুন, কামকাঞ্চনের ঘরে বাস করিয়া নিবৃত্তি-পথে যাওয়া সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। কালো ঘরে থাকিলে কোন সময়ে বুঁদ লাগিবেই লাগিবে।

* অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

রামদাস। সাবধানীর কাছে অসম্ভব কিছুই নাই। অনেক গৃহীও সন্ন্যাসীর অনুকরণীয় আছেন।

ধীরানন্দ। যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। তাঁহারা যে প্রকৃত বীর সাধক, সেকথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

রামদাস। সন্ন্যাসীর মধ্যে ত যাঁহারা প্রকৃতজ্ঞানী, তাঁহারা আমাদের আদর্শ। কিন্তু নামমাত্র সন্ন্যাসী, ভণ্ড গেরুয়াধারী, আমাদের গৃহী অপেক্ষাও অধম। আর দেখুন,—বেদের উপনিষদ্ ভাগের বক্তা অনেকেই ক্ষত্রিয় রাজা। পুরাণপ্রণেতা বেদব্যাস গৃহী ছিলেন। মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণও গৃহী ছিলেন। তবে আমি একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, সন্ন্যাসীরাই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছেন।

ধীরানন্দ। গৃহস্থ যদি ঠিক্ ঠিক্ গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার জ্ঞান হইতে না পারে এমন নয়। কিন্তু তাহা বড়ই কঠিন। লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে যদি একটী প্রকৃত গৃহস্থরূপে উতরাইয়া যায় ত ঢের; কিন্তু লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে কমবেশ এক শ'টা সাধু নিশ্চয়ই উতরাইবে।

এইরূপে রামদাস ও ধীরানন্দ কথোপকথন করিতেছিলেন। রামদাসের গ্রামবাসী সহযাত্রী তাঁহাদের কথা শুনিতে শুনিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের কথোপকথন আমরা এই পর্যন্তই জানিতে পারিয়াছি।

পাণিনীয়মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

ভাষ্য-মূল। এবং তর্হি নাপি জ্ঞানে এব ধর্ম্মো নাপি প্রয়োগে এব। কিং তর্হি।

শাস্ত্রপূর্ব্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেন*।

শাস্ত্রপূর্ব্বকং যঃ শব্দান্ প্রযুঙ্ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যতে। তত্তুল্যং বেদশব্দেন। বেদশব্দা অপ্যেবমভিবদন্তি। "যোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ"। "যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনমেবং বেদ"। অপর আহ,—তত্তুল্যং বেদশব্দেনেতি। যথা বেদশব্দা নিয়মপূর্ব্বমধীতাঃ ফলবন্তো ভবন্তি এবং যঃ শাস্ত্রপূর্ব্বকং শব্দান্ প্রযুঙ্ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যতে ইতি। অথবা পুনরস্তু জ্ঞানে এব ধর্ম্ম ইতি। ননু চোক্তং জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথাধর্ম্ম ইতি। নৈষ দোষঃ, শব্দপ্রমাণকা বয়ং, যচ্ছব্দ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্। শব্দশ্চ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মমাহ, নাপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মমাহ। যচ্চ পুনরশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধং নৈব তদ্দোষায় ভবতি নাভ্যুদয়ায়। তদ্যথা,—হিক্কিতহসিতকণ্ডূয়িতানি নৈব তদ্দোষায় ভবন্তি নাভ্যুদয়ায়। অথবাভ্যুপায় এবাপশব্দ-জ্ঞানং শব্দজ্ঞানে। যো হ্যপশব্দান্ জানাতি শব্দানপ্যসৌ জানাতি। তদেবং জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি ব্রুবতোঽর্থাদাপন্নং ভবতি, অপশব্দজ্ঞানপূর্ব্বকে শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি।

* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইলে শব্দের জ্ঞানেও ধর্ম্ম নাই এবং প্রয়োগেও ধর্ম্ম নাই। তবে কি? শাস্ত্রপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অভ্যুদয় হয়, তাহা বেদ শব্দের তুল্য।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রপূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে) শব্দসকলকে প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তি অভ্যুদয় (অর্থাৎ ধর্ম্ম) লাভ করেন। তাহা বেদ শব্দের তুল্য। বেদশব্দও এইরূপ বলেন,—"যোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ"। "যিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করেন এবং যিনি ইহাকে এই প্রকারে জানেন"। "যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনমেবং বেদ"। যে ব্যক্তি নাচিকেত (অর্থাৎ নচিকেতার নন্দন) অগ্নিকে চয়ন করেন এবং যিনি ইহাকে এই প্রকারে জানেন"। অপর ব্যক্তি বলেন, (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেন,)—তাহা বেদ শব্দের তুল্য। যেমন,—বেদের শব্দসকল নিয়মপূর্ব্বক অধীত হইলে ফলবান্ হয় (অর্থাৎ বেদের শব্দসকলকে নিয়মপূর্ব্বক অধ্যয়ন করা হইলে ফললাভ হয়) এইরূপ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে শব্দসকলকে প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তি অভ্যুদয় লাভ করেন। অথবা শব্দের জ্ঞানেই ধর্ম্ম হউক। যদি বল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—"যদি জ্ঞানে ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মও আছে"। ইহা দোষ নহে, আমরা শব্দপ্রমাণক (অর্থাৎ শব্দই আমাদিগের প্রমাণ), শব্দ যাহা বলেন তাহাই আমাদিগের প্রমাণ, শব্দশাস্ত্রও শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম বলেন নাই। কিন্তু যাহা অশিষ্ট অথচ অপ্রতিষিদ্ধ (অর্থাৎ যাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই) তাহা দোষের জনক হয় না এবং অভ্যুদয়ের জনকও হয় না। যেমন,—হিক্কিত (অর্থাৎ হেচ্‌কি তোলা), হসিত (হাস্য) ও কণ্ডূয়িত (চুলকান) দোষের জনকও নহে এবং অভ্যুদয়ের জনকও নহে। অথবা শব্দজ্ঞানে অপশব্দজ্ঞানই উপায়। যে ব্যক্তি অপশব্দ জানেন, সেই ব্যক্তি শব্দও জানেন। অতএব এই প্রকারে "শব্দের জ্ঞানে ধর্ম্ম" ইহা বলিতে গেলে অপশব্দের জ্ঞান পূর্ব্বক শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম ইহাই অর্থ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাষ্য-মূল।—অথবা কূপখানকবদেতদ্ভবিষ্যতি। তদ্যথা,—কূপখানকঃ কূপং খনন্ যদ্যপি তদীয়মৃদা পাংসুভিশ্চাবকীর্ণো ভবতি, সোঽপ্সু সঞ্জাতাসু তত এব তং গুণমাসাদয়তি, যেন স চ দোষো নির্হণ্যতে ভূয়সা চাভ্যুদয়েন চ যোগো ভবতি, এবমিহাপি যদ্যপ্যপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মস্তথাপি যস্ত্বসৌ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মস্তেন স চ দোষো নির্ঘানিষ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে "আচারে নিয়মঃ" ইতি। যাজ্ঞে কর্ম্মণি স নিয়মোঽন্যত্রানিয়মঃ। এবং হি শ্রূয়তে। যর্ব্বাণস্তর্ব্বাণো নাম ঋষয়ো বভূবুঃ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণঃ পরাপরজ্ঞাঃ বিদিতবেদিতব্যা অধিগতযাথাতথ্যাঃ। তে তত্রভবন্তো যদ্বানস্তদ্বান ইতি প্রয়োক্তব্যে যর্ব্বাণস্তর্ব্বাণ ইতি প্রযুঞ্জতে, যাজ্ঞে কর্ম্মণি পুনর্নাপভাষন্তে। তৈঃ পুনরসুরৈর্যাজ্ঞে কর্ম্মণ্যপভাষিতং ততস্তে পরাভূতাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—কিম্বা ইহা কূপখানকের ন্যায় হইবে, যেমন, কূপখানক কূপ খনন করিতে করিতে যদিও সেই মৃত্তিকা ও ধূলি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তথাপি, সেই কূপখানক জল উত্থিত হইলে সেই কূপ হইতেই বহু ফল লাভ করে, যদ্দ্বারা সেই দোষ নষ্ট হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা ধূলি প্রভৃতিকে বিধৌত করা যায় এবং অতিশয় অভ্যুদয়েরও যোগ হয়, অর্থাৎ সেই কূপ খনন দ্বারা সেই ব্যক্তি মহান্ ধর্ম্ম লাভ করে।* যদিও বলা হইয়াছে, আচারে নিয়ম, তথাপি সেই নিয়ম যজ্ঞ কর্ম্ম বিষয়ে,

* এখানে অনুবাদ অসম্পূর্ণ—বর্তমান সঃ

আর কোথাও তাহা নিয়ম নহে, শ্রুতিতে এইরূপ শুনা যায়, যর্ব্বা ও তর্ব্বা নামে ঋষিরা ছিলেন ; তাঁহারা প্রত্যক্ষধর্ম্মা অর্থাৎ যোগিপ্রত্যক্ষ-দ্বারায় সকলই জানিতে পারিতেন। পরাপরজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রবিভাগ জানিতেন। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েই তাঁহাদের জ্ঞান ছিল এবং তাঁহারা সকল বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। মাননীয় সেই ঋষিরা যদ্বা ও তদ্বা প্রয়োগ করিতে গিয়াই যর্ব্বা তর্ব্বা প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু যজ্ঞকর্ম্মে অপভাষা প্রয়োগ করিতেন না অর্থাৎ যদ্বা ও তদ্বাই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অসুরগণ যজ্ঞকর্ম্মে অপভাষা প্রয়োগ করিত, সেই হেতুই তাহারা পরাভূত হইয়াছিল।

ভাষ্য-মূল।—অথ ব্যাকরণমিত্যস্য শব্দস্য কঃ পদার্থঃ। সূত্রম্।

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্নঃ*।

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থো নোপপদ্যতে। ব্যাকরণস্য সূত্রমিতি।

কিং তর্হি তদন্যৎ সূত্রাদ্‌ব্যাকরণং যস্যাদঃ সূত্রং স্যাৎ।

শব্দাপ্রতিপত্তিঃ *।

শব্দানাং চাপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। ব্যাকরণাৎ শব্দান্ প্রতিপদ্যামহ ইতি। নহি সূত্রতঃ এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। কিং তর্হি, ব্যাখ্যানতশ্চ। নন্থ চ তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতি। ন কেবলানি চর্চ্চাপদানি ব্যাখ্যানং বৃদ্ধিঃ আৎ ঐজিতি, কিং তর্হ্যুদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহারঃ ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—"ব্যাকরণ" এই শব্দের পদার্থ কি ? সূত্র।

সূত্ররূপ ব্যাকরণেতে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ উপযোগী নহে।

সূত্ররূপ ব্যাকরণে 'ব্যাকরণের সূত্র' এই ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ উপপন্নই হইতে পারে না। অর্থাৎ ব্যাকরণ গ্রন্থই সূত্রাত্মক, অতএব 'ব্যাকরণের সূত্র' এই বাক্যস্থিত 'ব্যাকরণের' এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদটীর প্রয়োগ হওয়াই উচিত নহে, যেহেতু সূত্র ও ব্যাকরণ এই দুইটী পৃথক্ পদার্থ নহে, পৃথক্ পদার্থেরই সম্বন্ধ হয়, সেই স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে।

ব্যাকরণ কি তবে সূত্র হইতে বিভিন্ন ? যাহার এই সূত্র হইবে।

অর্থাৎ ব্যাকরণ ও সূত্র এই দুইটী শব্দ বিভিন্ন নহে, অতএব ব্যাকরণের সূত্র এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে না।

শব্দসকলের অপ্রতিপত্তিও ঘটিয়া উঠে। ব্যাকরণ হইতেই শব্দসকলকে পাওয়া যায়। সূত্র হইতেই কথনও শব্দ পাওয়া যায় না। তবে কি ? ব্যাখ্যা হইতেও পাওয়া যায়। সেই সূত্রই গৃহীত হইলে, অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলে ব্যাখ্যা হয়, কেবল চর্চ্চাপদসকল অর্থাৎ সূত্রস্থ পদসকল ব্যাখ্যা নহে। যেমন—(বৃদ্ধিরাদৈচ্ এই সূত্রে) বৃদ্ধিঃ আৎ এবং ঐচ্ এই তিনটী পদমাত্রই ব্যাখ্যা নহে। তবে কি ? উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ ও বাক্যের অধ্যাহার (উহ্য বাক্য) এই সকল একত্র হইলেই তাহাকেই ব্যাখ্যা কহে।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি শব্দঃ।

শব্দে ল্যুড়র্থঃ *।

যদি শব্দো ব্যাকরণং ল্যুড়র্থো নোপপদ্যতে ব্যাক্রিয়ন্তে শব্দাঃ অনেনেতি ব্যাকরণম্। নহি শব্দেন কিঞ্চিৎ ব্যাক্রিয়তে কেন তর্হি। সূত্রেণ।

ভবে *।

ভবে চ তদ্ধিতো নোপপদ্যতে। ব্যাকরণে ভবো যোগো বৈয়াকরণ ইতি। নহি শব্দে ভবো যোগঃ। ক্ব তর্হি সূত্রে।

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ *।

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ নোপপদ্যন্তে। পাণিনিনা প্রোক্তং পাণিনীয়ং আপিশলং কাশকৃৎস্নমিতি। নহি পাণিনিনা শব্দাঃ প্রোক্তা কিং তর্হি সূত্রম্। কিমর্থমিদমুভয়মুচ্যতে ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি। ন প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইত্যেব। ভবেঽপি তদ্ধিতশ্চোদিতঃ স্যাৎ। পুরস্তাৎ ইদমাচার্য্যেণ দৃষ্টং ভবে চ তদ্ধিত ইতি তৎ পঠিতং ততঃ উত্তরকালমিদং দৃষ্টং প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি তদপি পঠিতম্। ন চেদানীমাচার্য্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্ত্তয়ন্তি। অয়ং তাবদদোষঃ যদুচ্যতে শব্দে ল্যুড়র্থঃ ইতি। নাবশ্যং করণাধিকরণয়োরেব ল্যুড় বিধীয়তে। কিং তর্হি। অন্যেষ্বপি কারকেষু কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি। তদ্যথা প্রস্কন্দনং প্রপতনমিতি। অথবা শব্দৈরেব শব্দাঃ ব্যাক্রিয়ন্তে তদ্যথা গৌরিত্যুক্তে সর্ব্বে সন্দেহাঃ নিবর্ত্তন্তে নাশ্বো ন গর্দ্দভ ইতি। অয়ং তর্হি দোষঃ ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অতএব বলিব শব্দই ব্যাকরণ।

যদি শব্দই ব্যাকরণ হয়, তবে ল্যুট্ প্রত্যয়ের (মুগ্ধবোধ মতে অনট্ প্রত্যয়ের, কলাপ মতে যুট্ প্রত্যয়ের) অর্থ উপপন্ন হয় না। যাহা দ্বারা শব্দ ব্যাকৃত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ব্যাকরণ কহে। শব্দের দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না, তবে কাহার দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)? সূত্র দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)। ভবার্থে অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই স্থলে উক্ত ভবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ও যুক্তিসঙ্গত নহে, ব্যাকরণে যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাকে বৈয়াকরণ কহে। (অর্থাৎ শব্দ স্বয়ং ব্যাকরণ নহে, কারণ তাহা দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না)।

শব্দেতে যে যোগ বা ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না, তবে কাহাতে বিদ্যমান যোগ দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)? সূত্রে বিদ্যমান যোগ দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)।

প্রোক্তাদি তদ্ধিতও উপপন্ন হয় না (অর্থাৎ 'তেন প্রোক্তং' তিনি বলিয়াছেন এই অর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। যথা পাণিনি যাহা কহিয়াছেন, তাহাকে পাণিনীয় কহে, এইরূপ 'কহিয়াছেন' প্রভৃতি অর্থে যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকেই প্রোক্তাদি তদ্ধিত কহে। সেই প্রোক্তাদি তদ্ধিতও এস্থলে যুক্তিসিদ্ধ নহে)। যাহা পাণিনি কর্তৃক প্রোক্ত অর্থাৎ কথিত, তাহাকেই পাণিনীয় কহে, আপিশল, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতিও এইরূপ। পাণিনি শব্দ বলেন নাই। তবে তিনি কি বলিয়াছেন? সূত্র (বলিয়াছেন)। "ভবে" "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এই দুইটী সূত্র কেন বলা হইল? কেবল "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এইটী বলা হয় নাই। "ভবে" ভবার্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হয় বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ আচার্য্য অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি দেখিলেন, ভবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তখনই তাহা সূত্রে বলিলেন। তাহার পরে দেখিলেন, প্রোক্তাদি তদ্ধিত প্রত্যয় আছে, তখন তাহাও বলিলেন। এক্ষণে আচার্য্যেরা সূত্র করিয়াই নিবৃত্ত হন না। যাহা বলা হইয়াছে

"শব্দে লুড়র্থঃ" ইহাতে দোষ নাই, কেবলমাত্র করণ ও অধিকরণ কারকেই লুট্ প্রত্যয় বিধান করা হয় নাই। তবে কিরূপ (বিধান করা হইয়াছে) ? "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" অর্থাৎ কৃত্য প্রত্যয় ও ল্যুট্ প্রত্যয় বহু প্রকারে হয়। এই সূত্রদ্বারা অন্য সকল কারকেও হয়, ইহা বিধান করা হইয়াছে। যেমন প্রপতন ইত্যাদি। প্রপতন শব্দের অর্থ পড়িয়া যাওয়া, এই স্থলে যাহা দ্বারা বা যাহাতে পড়িয়া যাওয়া সেই পদার্থমাত্রকে বুঝা যায় না, এস্থলে ভাবে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা শব্দ দ্বারা শব্দ ব্যাকৃত হয়, যেমন গৌঃ এই কথা বলিলেই ইহা অশ্ব নহে,·ইহা গর্দ্দভ নহে, এই সন্দেহ মিটিয়া যায়। "ভবে" ও "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এই দুইটি তবে দোষ।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি।

লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্ *।

লক্ষ্যং লক্ষণঞ্চৈতৎ সমুদিতং ব্যাকরণং ভবতি। কিং পুনর্লক্ষ্যং লক্ষণঞ্চ।

শব্দো লক্ষ্যঃ, সূত্রং লক্ষণম্ এবমপ্যয়ং দোষঃ সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ অবয়বে নোপপদ্যতে। সূত্রাণি চাপ্যধীয়ান ইষ্যতে বৈয়াকরণ ইতি। নৈষঃ দোষঃ।

সমুদায়েষু হি শব্দাঃ প্রবৃত্তাঃ অবয়বেম্বপি বর্ত্তন্তে। তদ্যথা পূর্ব্বে পঞ্চালাঃ উত্তরে পঞ্চালাঃ, তৈলং ভুক্তং, ঘৃতং ভুক্তং, শুক্লো নীলঃ কৃষ্ণ ইতি। এবময়ং সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ অবয়বেঽপি প্রবর্ত্ততে। অথবা পুনরস্তু সূত্রম্। ননু চোক্তং সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্ন ইতি। নৈষ দোষঃ। ব্যাপদেশিবদ্ভাবেন ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে শব্দাপ্রতিপত্তি-রিতি। নহি সূত্রতএব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে কিং তর্হি ব্যাখ্যানতশ্চেতি পরিহৃতমেতৎ। তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি। ননু চোক্তং ন কেবলানি চর্চ্চাপদানি ব্যাখ্যানং বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ ইতি। কিং তর্হ্যুদাহরণম্ প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহারশ্চেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি অবিজানত এতদেবং ভবতি। সূত্রত এব হি শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। আতশ্চ সূত্রত এব যো হ্যুৎসূত্রং কথয়েন্নাদো গৃহ্যেত।

বঙ্গানুবাদ—অতএব তবে।

লক্ষ্য লক্ষণকে ব্যাকরণ কহে। লক্ষ্য ও লক্ষণ এই উভয় একত্রিত হইলে তাহাকে ব্যাকরণ কহে। লক্ষ্য কাহাকে কহে ? এবং লক্ষণই বা কাহাকে কহে ? শব্দকে লক্ষ্য এবং সূত্রকে লক্ষণ কহে। এইরূপ হইলে এই দোষ উপস্থিত হয়, সমুদায়ে অর্থাৎ লক্ষ্য ও লক্ষণ একত্রিত হইলেই তাহাতে ব্যাকরণ শব্দ প্রবৃত্ত হয়, অবয়বে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বুঝায় না ; যাহারা সূত্রসকলকে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকেও বৈয়াকরণ বলা যায়। ইহা দোষ নহে। সমুদায়ে যে শব্দ প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অবয়বেতে প্রবৃত্ত হয়, যেমন পূর্ব্ব পঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল, তৈল খাওয়া হইয়াছে, ঘৃত খাওয়া হইয়াছে, শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ ইত্যাদি। (যেমন সমষ্টিভাবে পঞ্চাল একটী শব্দ কিন্তু ব্যষ্টিভাবে পূর্ব পঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল এইরূপ বলা যায়। খাওয়া হইয়াছে একই কথা, কিন্তু তৈল খাওয়া হইয়াছে, ঘৃত খাওয়া হইয়াছে, এরূপ বিভিন্নভাবে প্রয়োগ হইয়াছে। বর্ণ শব্দ শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ, হরিত, কপিশ প্রভৃতিতেও সমষ্টিভাবেও প্রযুক্ত হয়, এবং শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ ব্যষ্টিভাবেও প্রয়োগ হয়।) এইরূপ ব্যাকরণ শব্দও সমুদায়ে প্রবৃত্ত হইলেও অবয়বেও প্রবৃত্ত হয়। কিম্বা সূত্রই হউক। পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে "সূত্রে ব্যাকরণে

ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্নঃ" অর্থাৎ সূত্ররূপ ব্যাকরণে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা দোষ নহে। ব্যপদেশিবদ্ভাবে হইবে (অর্থাৎ যেমন 'রাহুর শির' রাহুশির ব্যতীত আর কিছুই নহে, তথাপি লোক 'রাহো শিরঃ' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে)। যদিও "শব্দাপ্রতিপত্তিঃ" এই বার্ত্তিক বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও "নহি সূত্রতঃ এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে কিং তর্হি ব্যাখ্যানতশ্চ" সূত্র দ্বারাই শব্দসকল প্রতিপন্ন হয় না, তবে কাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়, এই সকল বলাতেই উক্ত দোষের পরিহার হইয়াছে। সেই সূত্রই বিগৃহীত অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলেই তাহাকে ব্যাখ্যান কহে, ইহাও বলা হইয়াছে, চর্চ্চাপদসকল অর্থাৎ সূত্রস্থ পদ সকলই ব্যাখ্যা নহে, যেমন "বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্" এই তিনটী পদমাত্রই ব্যাখ্যা নহে। তবে কি উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যে অধ্যাহার ইহারা একত্রিত হইয়াই ব্যাখ্যা হয়। যাহারা জানে না তাহাদের পক্ষে এইরূপই অর্থাৎ এই সকল একত্রিত হইয়া ব্যাখ্যা হয়। সূত্র হইতেই শব্দসকল প্রতিপন্ন হয়, এই হেতু সূত্র হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। যে উৎসূত্র অর্থাৎ সূত্র সকলকে অতিক্রম করিয়া বলে, তাহা গৃহীত হয় না।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই অগ্রহায়ণ। (১৩০৬ সাল) [২২শ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ* ।

১। এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে এনে কোন রকমে দুঃখেকষ্টে দিন কাটাত। একদিন জঙ্গল থেকে সরু সরু কাঠ কেটে মাথায় করে আনছে, হঠাৎ একজন লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে ডেকে বল্লে, "বাপু এগিয়ে যাও"। পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল দেখ্‌তে পেলে ; সে দিন যতদূর পাল্লে, কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী পয়সা পেলে। পরদিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন ; ভাল, আজ আর একটু দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দন কাঠের বন দেখ্‌তে পেলে। সে সেই চন্দন কাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশী টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে মনে কল্লে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে এক তামার খনি দেখ্‌তে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে ক্রমে রূপো, সোনা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়্‌ল। ধর্ম্মপথেরও ঐরূপ। কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ, জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই লাভ করে আহ্লাদে মনে ক'র না যে—আমার সব হয়ে গেছে।

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত।—বর্ত্তমান সঃ

২। একজন সমস্ত দিন ধরে আকের ক্ষেতে জল ছেঁচে দিয়ে শেষে ক্ষেতে গিয়ে দেখ্‌লে যে, এক ফোঁটা জল ক্ষেতে যায় নি ; দূরে কতকগুলো গর্ত্ত ছিল, তা দিয়ে সমস্ত জল অন্য দিকে বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয়-বাসনা, সাংসারিক মান সম্ভ্রম ইত্যাদির দিকে মন রেখে সাধনা করেন, তিনি যদি সারা জীবন ঈশ্বর-উপাসনা করেন, শেষে দেখ্‌তে পাবেন যে, ঐ সকল বাসনারূপ ছেঁদা দিয়ে তাঁর সমুদায় বেরিয়ে গেছে।

৩। যেমন, মেঠো পুকুরের জল ছেঁচতে না থাক্‌লেও আপনি তিল ২ ক'রে কমে যায়, সেই রকম মানুষ যদি ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, তা হ'লে তার কাম ক্রোধ রিপু সকল আপনা হতে কমে যায়।

বিলাতযাত্রীর পত্র

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

আরাব।

আর দক্ষিণে—বীরপ্রসূ আরাবের মরুভূমি। কখন আলখাল্লা ঝোলান, পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা, বন্দু আরাব দেখেছ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনও দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্চে,—সেই আরাব। যখন ক্রিশ্চিয়ানদের গোঁড়ামি আর জাঠদের বর্ব্বরতা প্রাচীন ইউনান্ ও রোমান সভ্যতালোককে নির্বাণ করে দিলে ; যখন ইরান্ অন্তরের পূতিগন্ধ ক্রমাগত সোনার পাত দিয়ে মোড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল ; যখন ভারতে পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি অস্তমিত, উপরে মূর্খ ক্রূর রাজবর্গ, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আবর্জ্জনা-রাশি ; সেই সময়ে এই নগণ্য পশুপ্রায় আরাবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌লো।

ঐ ষ্টীমার মক্কা হতে আস্‌ছে যাত্রী-ভরা। ঐ দেখ ইউরোপী পোষাকপরা তুর্ক, আদাইউরোপিবেশে মিসরী, ঐ সুরিয়াবাসী মুসলমান ইরাণী বেশে, আর ঐ আসল আরাব ধুতিপরা কাছা নেই। মহম্মদের পূর্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ কর্‌তে হত ; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মোসলমানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর, আরাবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফরি, সিদি হাব্‌সি রক্ত প্রবেশ ক'রে, চেহারা, উদ্যম সব বদ্‌লে দেছে। মরুভূমির আরাব পুনর্মূষিক হয়েছেন। যারা উত্তরে তারা তুরস্কের রাজ্যে বাস করে চুপ চাপ ক'রে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চিয়ান প্রজারা তুরস্ককে ঘৃণা করে, আরাবকে ভালবাসে। "আরাবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়,"—তা'রা বলে। আর খাঁটি তুর্করা বড়ই ক্রিশ্চিয়ানদের উপর অত্যাচার করে। [ক্রমশঃ]

* কার্তিক, ১৩০৮ সংখ্যার পর।—বর্তমান সং